ছবির তালিকা

১ কারতালাব খানের মসজিদ, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
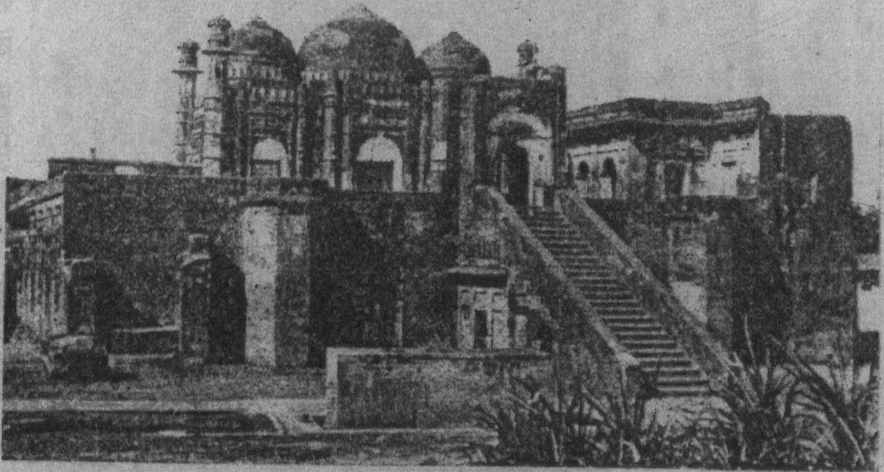
২. খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১

তৃতীয় খণ্ড

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

৩. কাটরা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)
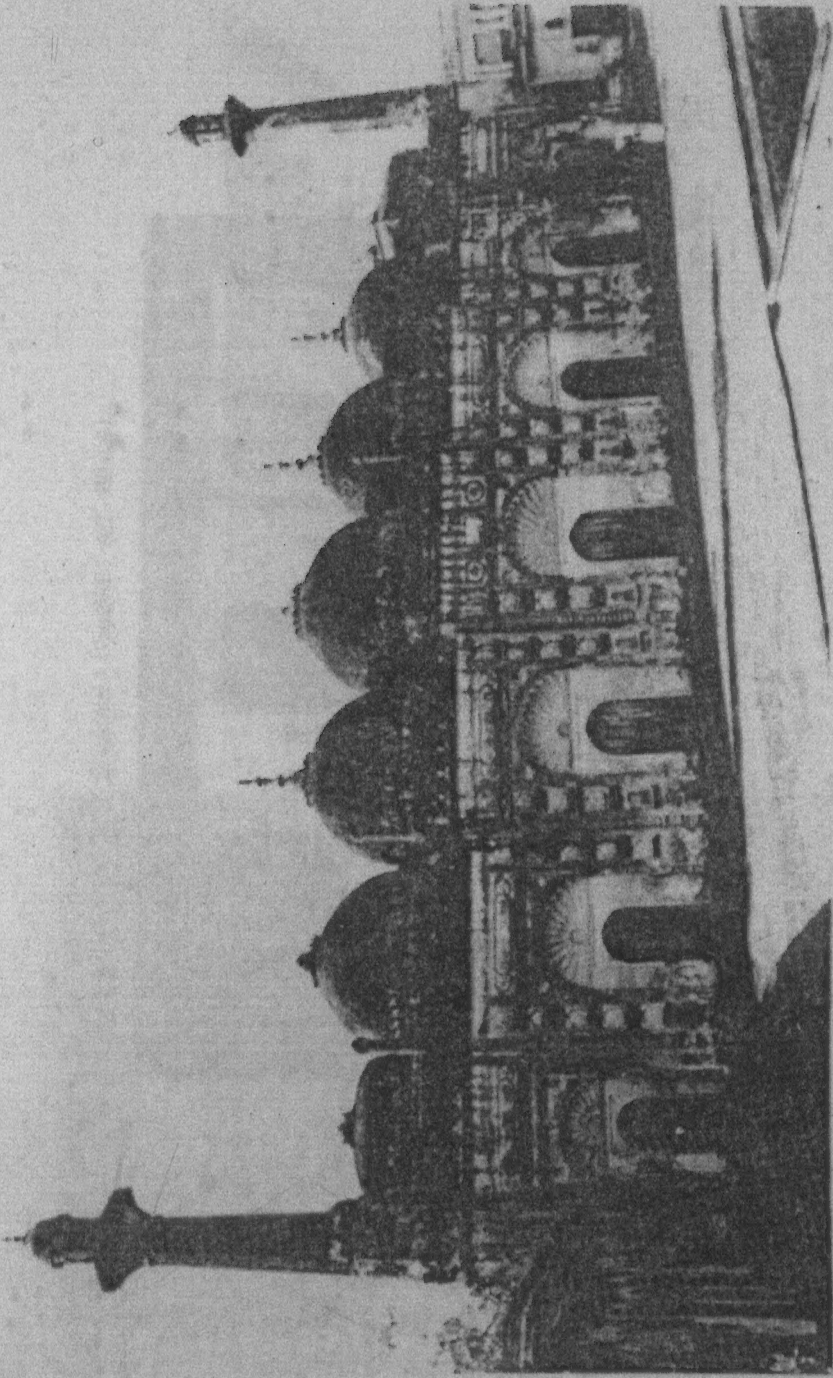
৪. চক মসজিদ, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।
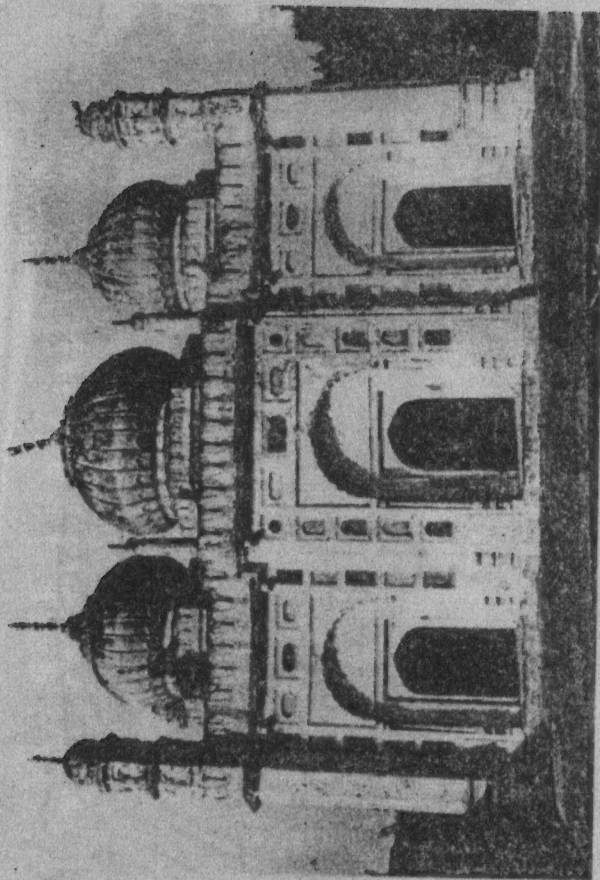
৫. ইতওয়ার খানের মসজিদ, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

৬. সরকারের মঠ, মাহিলারা, বাকেরগঞ্জ

(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
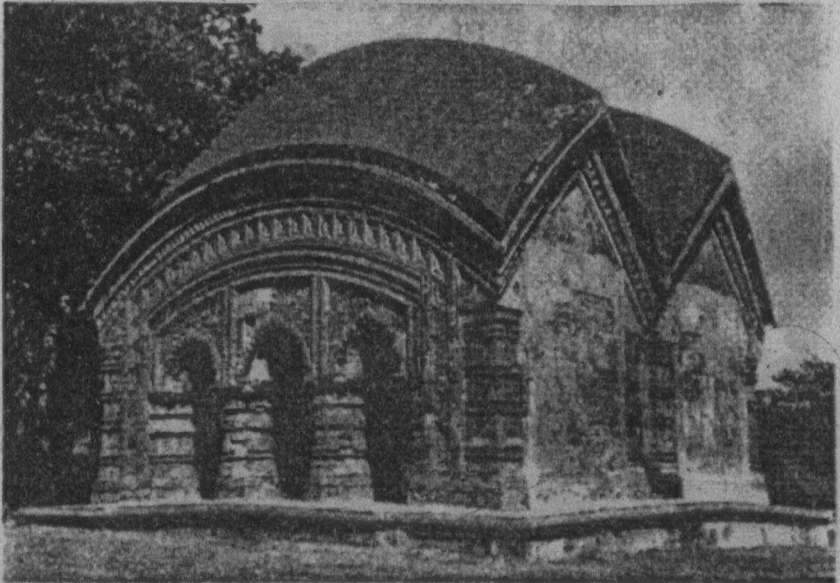
৭. জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

৮. চার-চালা গোবিন্দ মন্দির, পুঠিয়া
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
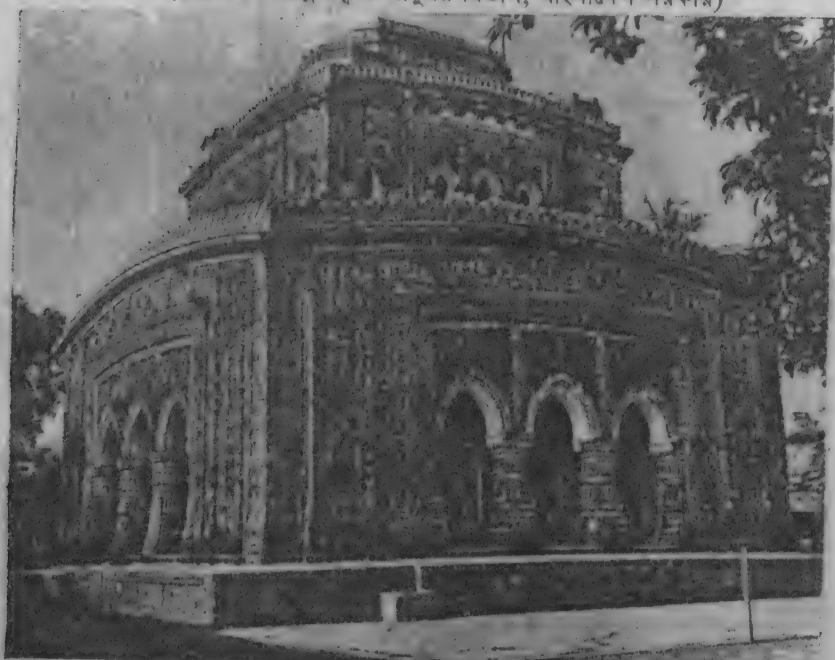
৯. কান্তজীর মন্দির, দিনাজপুর। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

১০. রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা। (সৌজন্য : জ. আর্চার)

সূচিপত্র

১১. হলি রোজারীর গির্জা, ঢাকা।

১২. আর্মেনীয় গির্জা, ঢাকা।

১৩. বেক-এর সমাধি সৌধ, ঢাকা।

১৪. রাজবাড়ী প্রাসাদ, নাটোর। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

১

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়। বর্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাদি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় সবশেষে আলোচনা করা অনেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে এ যুক্তিতে যে, যেহেতু মানুষের ধীকল্প (idea), চিন্তা, কর্মপরিকল্পনা উৎপত্তিলাভ করে মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে, সেহেতু ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত সমাজ-সংস্কৃতিই। মার্কসীয় চিন্তাবিদদের ধারণা, অর্থনীতিই হচ্ছে সকল সম্পর্কের নিয়ামক; স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতির আলোচনা স্থান পাওয়া উচিত সর্বাগ্রে। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বিষয়ানুসারে সাজাতে গিয়ে পণ্ডিতগণ প্রথামাফিক রাজনৈতিক বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এ যুক্তিতে যে, ক্ষমতাই হচ্ছে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে ক্ষমতা কি ঘটনার কারণ না ফল এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক করা যেতে পারে। যাহোক, বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সরকার ও সরকারি ক্ষমতার প্রভাব সর্বগামী ও সর্বগ্রাসী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ শাসন করেছে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী, যাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি এবং সবশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাঙালি সমাজকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণেই। বাঙালি জাতির ধর্ম, বর্ণ, সংস্কার, অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আইনকানুন প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদেশী শাসক শ্রেণীর ছাপ সুস্পষ্ট এবং সেটা রাজনৈতিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল।

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
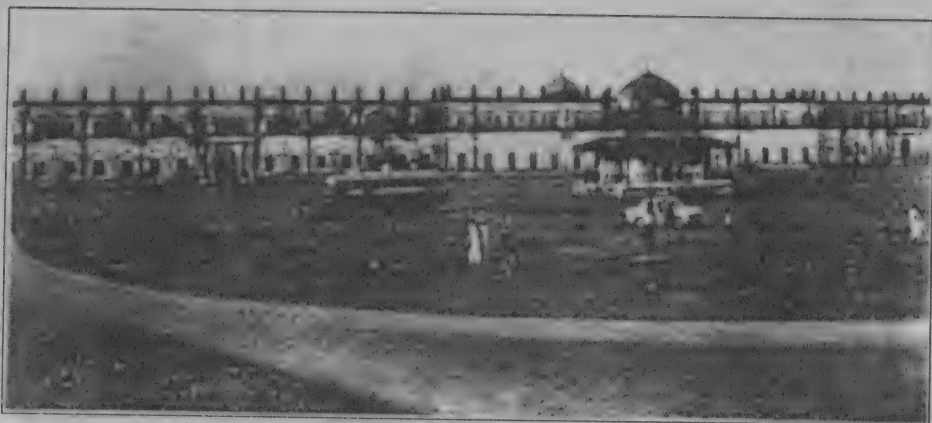
১৫. ইমামবাড়া, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

১৬. গোলাম মুহম্মদের মসজিদ, কলকাতা। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

তবে, ইতিহাসকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত না করে একে একক ও অখণ্ডিতভাবে বিচার করাই সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। ঘটনার গভীরে গিয়ে বিচার করলে স্পষ্টতই ধরা পড়ে যে, যাকিছু রাজনৈতিক তা সামাজিক-অর্থনৈতিক, এমনকি ধর্মীয়ও বটে। ইউরোপীয় চার্চ, ভারতীয় বর্ণ ও আফ্রিকার টটেমিজম-এর ইতিহাস এ বক্তব্যের সমর্থনে অকাট্য যুক্তি। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-বিশ্লেষণে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতিকে একে অপর থেকে পৃথক করে দেখার বিপদ লক্ষ্য করেই বৃটিশ ঐতিহাসিক জর্জ ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত বৃটিশ সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে সামাজিক ইতিহাস কি এ মর্মে কোন সংজ্ঞা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। সাধারণভাবে তিনি শুধু মন্তব্য করেন, "সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে রাজনীতি ব্যতিরেকে একটি জাতির ইতিবৃত্ত"।[১] এ সংজ্ঞা দিয়ে তিনি এটাই বলার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছাড়া বাকি সবই সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার বিপদ জেনেও আমরা একে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাখায় বিচার করার চেষ্টা করছি এজন্য যে, আধুনিক ইতিহাসশাস্ত্র এত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং মানবকর্মকাণ্ডকে ঐতিহাসিকগণ এত ব্যাপক ভিত্তিতে স্থাপন করে বিশ্লেষণ করছেন যে, ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসের সকল শাখার বিচার-বিশ্লেষণ অবিমিশ্রভাবে করা একদিকে যেমন এক দুঃসাধ্য কাজ, অপরদিকে পাঠকের জন্যও তা হবে অতি দুর্বোধ্য ও দুরতিপাঠ্য।

কোন জাতিরই সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠন সহজসাধ্য নয়। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের পরিধি অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপক। একটি দেশের প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দৈনন্দিন জীবনে এর সকল মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। সমাজে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ড রূপলাভ করে পরিবারে, জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে, গ্রামে/শহরে তথা সমগ্র দেশে এবং সর্বস্তরে ব্যক্তির ঐ চিন্তা ও কর্মকাণ্ড অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের ও রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানাদি যেমন, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস, পাপ-পুণ্য ও ন্যায়নীতিবোধ, সমিতি, দল, শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি দ্বারা। এসবই সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এগুলির মূল্যায়ন থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে বিশেষ সমাজের গতিধারা।

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। এই স্থিতিশীলতায় যারা অবদান রাখেন তারাই সমাজের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সদস্য। তবে সমাজ যেহেতু একটি জীবন্ত সত্তা, সেহেতু স্থিতিশীলতার পরিবেশেই সুপ্ত থাকে পরিবর্তনের বীজ। অঙ্কুরিত হবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের

---

১. G M. Trevelyan, *English Social History*, (London 1962 edition), vii
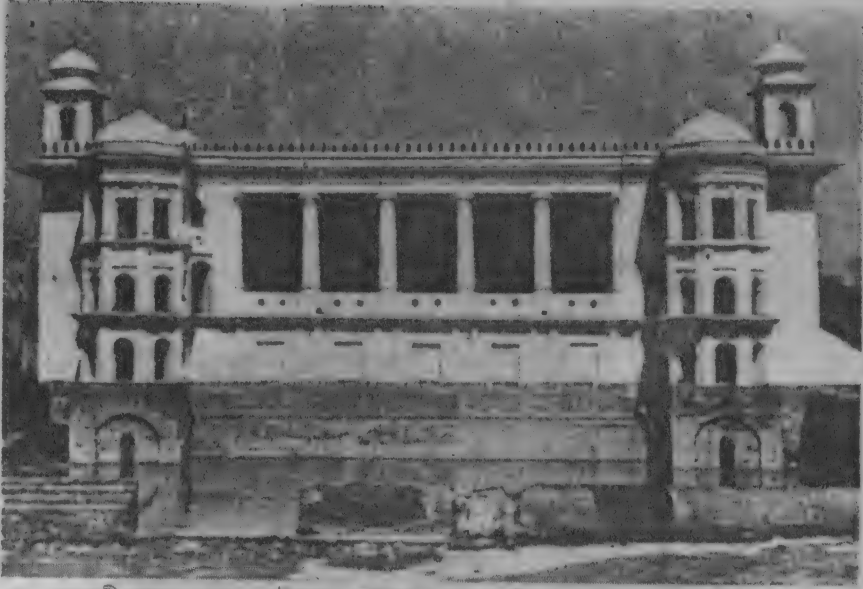
১৭. হোসেনী দালান, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

১৮. পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির, পুঠিয়া (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

অপেক্ষায় থাকে সে বীজ। তাই আমরা দেখতে পাই, কখনো কখনো সমাজে এমন ব্যক্তিত্বেরও আবির্ভাব ঘটে, যিনি নতুন প্রশ্ন তোলেন, ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেন, সমাজে বিদ্যমান অবস্থায় দুর্বলতা চিহ্নিত করেন এবং আদর্শ হিসেবে অনুসরণের জন্য প্রদর্শন করেন নতুন পথ। এখানে নতুন পথপ্রদর্শক ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক। এ দ্বন্দ্বে যেকোন একটি শক্তি জয়লাভ করে বা উভয় শক্তির মধ্যে কখনো কখনো আপোষ-সমঝোতাও ঘটে। নতুন চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিজয় ঘটলে সমাজসত্তায় আসে নতুন গতিধারা, সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। অতএব, সামাজিক সত্তা ও সংগঠনে, চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সকল পরিবর্তন এবং পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যক্তিত্বসহ সকল আন্দোলন ও বিপ্লবও সামাজিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের সব সদস্য সমান মেধা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী নয় এবং সবার রুচি-অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষও একমাত্রিক নয়। অতএব, পেশাগত ও মেধাগত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সমাজ সম্পর্ক ও সংগঠনে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি, অস্থিরতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাও সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিষয়। সমাজে মানুষ যেন সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে পারে সেজন্য প্রণীত হয় নানা রকম আইন-অনুশাসন, রীতিনীতি ও আচার-প্রথার নিয়মনিগড়। এসবের উৎপত্তি ও বিকাশ সনাক্ত করা এবং সামাজিক স্থৈর্য ও পরিবর্তনধারায় এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করাও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য। এককথায়, সামাজিক ইতিহাসের ছায়া পড়ে সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজসত্তার সর্বক্ষেত্রে—ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি-সংগঠন, সংস্কার-আন্দোলন, সাহিত্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, লোকগাথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃশ্রেণী সম্পর্ক, দল ও দলাদলি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলায়। এসবই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে হলে এসব উপাদানের কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু এই আদর্শ অর্জন করা সামাজিক ঐতিহাসিকের পক্ষে কতটুকু সম্ভব ? প্রেক্ষাপটের প্রকৃতি ও বিশালতা তাঁকে বাধ্য করে বাছাইনীতি অবলম্বন করতে। প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে তিনি বাধ্য হন সমাজসত্তার সবদিক একযোগে আলোচনায় না এনে বিশেষ একটি সমস্যাকে বেছে নিয়ে এর গভীরে যেতে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভাসা ভাসা বা স্রেফ আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায় লেখকের অনুসন্ধানপদ্ধতির প্রশ্নটি। আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করলে ইতিহাস রূপকথায় পরিণত হবার ঝুঁকি থাকে। আংশিক উপাত্তকে ভিত্তিকরে সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছানোর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন । সামাজিক ঐতিহাসিকও অনুরূপ পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

বিচার-বিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : মৌলিক সমস্যা এবং গৌণ বা অনুসম্ভূত সমস্যা। সমাজের নিজস্ব সত্তা ও ঐতিহ্যই মৌলিক সমস্যার উৎস। আর গৌণ সমস্যার উৎপত্তি হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপসর্গরূপে।

১৯. আট-চালা মন্দির, কুমিল্লা
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

২০. দোলমঞ্চ, পুঠিয়া। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

এই উপসর্গগুলি সমাজ-সংস্কৃতির মৌল প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কোন্ ধরনের সম্পর্ক তৈরি করে—প্রতিযোগিতার না সহযোগিতার, তা সনাক্ত করা সামাজিক ঐতিহাসিকের প্রথম কাজ; নচেৎ বিশ্লেষণ হবে পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সিদ্ধান্তও হবে ভ্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নবাবি রাষ্ট্রকাঠামোয় দেশীয় আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর আবির্ভাবের ঘটনা। এই ঘটনাকে সমকালীন বর্ণ ও জাতভিত্তিক সমাজ কিভাবে দেখেছিল? প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় এই নব্যশ্রেণী সাদরে স্বীকৃত হয়েছিল, কেননা অনুসম্ভূত আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী সমাজের প্রতিষ্ঠিত বর্ণ ও জাতব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ না করে বরঞ্চ একে আরো জোরদার করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষাজাত তথাকথিত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম বাবুদের বেলায় ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নব্যশ্রেণী বর্ণ ও জাতব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা। তবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নতুন শক্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারলেও পরাজিত করতে পারে নি। পরিশেষে নব্যগোষ্ঠী সংস্কারের নামে মৌল ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিশে যেতে বাধ্য হয়। এককথায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সামাজিক ঐতিহাসিককে প্রথমেই জানতে হবে তার আলোচ্য সমস্যাটি মৌল না অনুসম্ভূত। অনুসম্ভূত হলে প্রথমেই বিচার করতে হবে কোন্ মূলকাণ্ড থেকে আলোচ্য শাখা বা প্রশাখাটি উদ্ভূত, তারপর দেখতে হবে মূলের সঙ্গে অনুসম্ভূত সমস্যার সম্পর্ক কি সংঘাতের না সহযোগিতার। আরো দেখতে হবে মূলের ভিতরেও মূল রয়েছে কিনা। যেমন, যুক্তিবাদী ইয়ং বেঙ্গলদের মূল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবকগণ সবাই কট্টর রক্ষণশীল হিন্দু, যেমন ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপক ও অভিভাবকগণ। তাহলে শুধু হিন্দু কলেজেই প্রতিবাদী যুক্তিবাদের উদয় হলো, অন্যান্য কলেজে অনুরূপ ঘটলো না কেন? কারণ অন্যান্য কলেজে হেনরি ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার-এর মতো যুক্তিবাদী শিক্ষক ছিলেন না। মূল অন্বেষণে অনেক সময় দেখা যাবে যে, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় এক উদ্দেশ্যে, কিন্তু ফল দাঁড়ায় আরেক। হিন্দু কলেজের স্থপতিদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করে ইঙ্গরাজের অধীনে চাকুরির জন্য উপযুক্ত করে তোলা—সনাতন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু কার্যত ঘটলো এর বিপরীত। গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি নিজের উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন ইংরেজ আমলাদের এদেশীয় ভাষা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। কিন্তু পরিশেষে এই কলেজ পরিণত হলো বাংলাসহ ভারতীয় ভাষা উন্নয়নের এক অসাধারণ কেন্দ্রে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছিল ভারতীয়দেরকে 'চামড়ায় কালো অথচ রুচি-অভিরুচি-মনোভঙ্গিতে ইউরোপীয়' বানানোর জন্য। কিন্তু কার্যত তা না হয়ে ইংরেজিশিক্ষিতরা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি আরো অনুরক্ত হয়ে উঠলো, বৃটিশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো এবং

২১. প্যাগোডা, কক্সবাজার।
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

২২. কিয়াং,কক্সবাজার। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

উদ্বুদ্ধ হলো জাতীয়তাবাদী চেতনায়। এহেন বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী ঠেকলেও সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পারলে দেখা যাবে যে, ওটাই হওয়া স্বাভাবিক।

সামাজিক ইতিহাস রচনার একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে প্রশ্ন উত্থাপন। সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়া অনেক সময় সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন তুলতে হবে প্রশ্নের খাতিরেই। অনেক সময় প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমেই অনুসন্ধানী গবেষক এমন সুরাহা পেয়ে যান, যা তার মূল তত্ত্বকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারে, দিতে পারে নতুন সত্যের সন্ধান। উপমাস্বরূপ ধরা যাক, আমরা ১৭০৪ সনের ঢাকা শহরের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে—তখন শহরের জনসংখ্যা কত ছিল এবং কাদের নিয়ে গঠিত ছিল ঐ নগরসমাজ ? শহরের মোট লোকসংখ্যার কত অংশ ছিল অভিজাত এবং কত অংশ অনভিজাত ? কারা ঐ অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর মানুষ ? অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল ? শহরে কতগুলো হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ, গাভী বিচরণ করতো এবং কারা ছিল ওগুলোর মালিক এবং কেন এরা শহরে পশুপালন করতো ? শহরের কোন্ এলাকায় কারা বাস করতো এবং তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল ? শহরবাসীদের গৃহনির্মাণপদ্ধতি কি ছিল ? গৃহনির্মাণের জন্য কি কোন পরিকল্পনা ছিল ? শহরবাসীদের চলাচলের বাহন কি ছিল ? সুবাদারের হারেমের সদস্য কারা এবং কতজন ছিল ? হারেমে খোজা রাখা হতো কেন এবং কারা ছিল ঐ খোজা ? খোজা বানানোর প্রযুক্তি কি ছিল ? কাদেরকে খোজা করার জন্য বাছাই করা হতো ? শহরের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি কি কি ছিল ? কিভাবে বিভিন্ন আমোদ-উৎসব উদযাপিত হতো ? সামাজিক নেতা কারা ছিলেন ? তাদের নেতৃত্বের ভিত্তি কি ছিল ? সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চায় কারা নিযুক্ত ছিলেন ? কারা ছিলেন তাদের পৃষ্ঠপোষক ? এমনিতরো অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, যা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বহুবিধ প্রশ্ন তোলা গেলেও উপাদান-উপকরণের অভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তবে সামাজিক ঐতিহাসিকদের মতে, শুধু উত্তর পাওয়ার জন্যই প্রশ্ন উত্থাপন নয়, অনুসন্ধানকে নিগূঢ় পর্যায়ে নিয়ে সত্য আবিষ্কারের অন্বেষায় সব রকম প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলতে হবে চিন্তাকে বহুমুখী করে তোলার জন্য। প্রকৃত প্রেক্ষাপটে কাহিনীকে সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করতে পারলেই সামাজিক ইতিহাস পরিবেশন করবে পূর্ণসত্য। এ সত্য কবিতার মতো। এখানে তথ্যের পাশাপাশি ক্রিয়াশীল থাকে লেখকের সহজাত অভিজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি।

তাহলে কিভাবে আমরা বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে অগ্রসর হতে পারি ? কোন্ তারিখ থেকে আরম্ভ করা যায় এই ইতিহাস ? ১৭০৪ সন থেকে আমরা রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছি এই বোধগম্য কারণে যে, রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে এই তারিখ থেকে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক যুগান্তকারী

২৩. গভর্নমেন্ট হাউস, কলকাতা। (Chardes D'Dyly, *Views of Calcutta and its Environs*, (প্লেট-১ (লন্ডন ১৮৪৮)। সৌজন্য : জ. আর্চার)

২৪. সন্ত থমাসের গীর্জা, ঢাকা।

পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তো কোন বিশেষ সন-তারিখ ধরে সূচিত হয় না। বলা যাবে না ভরতনাট্যম কবে থেকে কারা শুরু করেছে, যেমন বলা যাবে না বৈষ্ণববাদ ঠিক কোন্ তারিখ থেকে কে সূচনা করেছে, কোন্ তারিখ থেকে খনার বচন তৈরি হয়েছে। হিন্দু সমাজে বর্ণ বা মুসলমান সমাজে শরাফত প্রতিষ্ঠানটি কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে শুরু হয় নি। এসব প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটেছে শতাব্দীর ক্রোড়ে এবং ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে। তেমনি বিবাহ, একান্নবর্তী পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যাভ্যাস, আদব-কায়দা, কবিতা, গান-বাদ্য, শিল্প, কারুকার্য, খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব ও আরো অসংখ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভব ও বিকাশ কোন নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু বা শেষ হয় নি। একদিন শিকার অভিযান ছিল একটি রোমাঞ্চকর খেলা। এখন আর এর কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনি নেই গণভোজ, বাঈজীনাচ, জলসাঘর, দাসপ্রথা, সতীপ্রথা, চড়ক, কীর্তনীয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গ্রামসরঞ্জামি, গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত ও আরো কত প্রথা-প্রতিষ্ঠান। এসবের উত্থান-পতনপ্রক্রিয়া চলে মানুষের অলক্ষ্যে, অবচেতনে।

এমন অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলির উদ্ভব ঘটেছে অন্য এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থেকে। নতুন পরিস্থিতিতে এসব মৌল প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটলে এগুলোর অনুসম্ভূত প্রতিষ্ঠানেরও পতন ঘটে। যেমন, মুগল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামসরঞ্জামি, গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ আমলে ঐ মৌল প্রতিষ্ঠানগুলির বিলুপ্তি ঘটার পর এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিলুপ্তি ঘটে। এমনিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিলুপ্তি ঘটেছে গণভোজ, দাসপ্রথা, বাঈজীনাচ, জলসাঘর, সতীপ্রথা ইত্যাদি। আবার ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, যেমন অফিসকেন্দ্রিক বাবু, কাছারিকেন্দ্রিক নায়েব-গোমস্তা, আদালতকেন্দ্রিক উকিল-মোক্তার, মামলাবাজ, নকলনবিশ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নানা পেশাদার শ্রেণী ।

কিন্তু এমন অনেক শাশ্বতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি সময়ের ব্যবধানে এবং নতুন পরিবেশে বিবর্তিত হয়, রূপ বদলায়, কিন্তু বিলুপ্ত হয় কদাচিৎ। এগুলি সমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত মৌল প্রতিষ্ঠান। যেমন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, বিবাহ, পরিবার, অলঙ্করণ, কারুশিল্প প্রভৃতি। সমাজের কোন্ দিকটি চিত্রিত করা হবে বা প্রধানত কোন্ সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে এটা চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা সামাজিক ঐতিহাসিকের প্রথম কাজ। রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার আপেক্ষিক সুবিধা এই যে, এটি আবর্তিত হয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এবং ঘটনা ঘটে বিশেষ সময়ে ও স্থানে এবং ঘটনার নেপথ্যে থাকে বিশেষ শক্তি, যা সহজেই সনাক্ত করা যায়। অতএব, সত্য উদঘাটনের জন্য আমরা ঘটনাস্থলে দাঁড়াতে পারি, ঘটনার নায়ক

২৫. নর্থব্রুক হল, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

২৬. রূপলাল হাউস, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

ও পরিবেশকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে পারি; কিন্তু এ সুবিধাটি সামাজিক ঐতিহাসিক ভোগ করেন না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা একদিকে যেমন ঘটে বিশাল সময় ও স্থানের পরিসরে, অপরদিকে এর ব্যাপ্তিও থাকে প্রায় সীমাহীন। অনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের পরিমণ্ডলে সামাজিক ঐতিহাসিকের বিবেচনার জন্য রয়েছে অসংখ্য বিষয়। শুধু ব্যক্তিত্ব চিত্রণ করলেই আমরা পাই সমাজপতি, সংস্কারক, ধর্মনেতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, বাউল, চিত্রকর, বাদক, গায়ক, নাট্যকার, নর্তক-নর্তকী, ক্রিড়াবিদ, শিক্ষাবিদ ও আরো অনেককে। বিমূর্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, যেমন শ্রেণী, বর্ণ, জাত, সমাজবিন্যাস, সামাজিক দ্বন্দ্ব, আচার-প্রথা, রেওয়াজ-দস্তুর, ক্ষমতা, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি। গ্রাম, শহর, বস্তি, বাস্তুহারাও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্গত। শুধু কারুশিল্প নিয়েই বহু খণ্ডের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব, যদিও এটা মোটেই আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোন বড় অংশ দখল করে নেই। উপমাস্বরূপ, শ্রী রামকান্ত চক্রবর্তী বাংলার বৈষ্ণববাদের মাত্র কতিপয় দিকে আলোকপাত করে এক বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২] অনুরূপভাবে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশাল আকারের খণ্ডের পর খণ্ড ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা সম্ভব । কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির সকল সমস্যাকে একত্রীভূত করে একটি বিশেষ গ্রন্থ একজন বিশেষ পণ্ডিত লিখতে গেলে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁকে অনেক কিছুই বলি দিতে হবে এবং নিঃসন্দেহে এর প্রথম শিকার হবে সত্য। এককথায়, যেহেতু গোটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস একসঙ্গে একজনের পক্ষে সফলভাবে রচনা করা সম্ভব নয়, সেহেতু লেখককে বাছাইনীতি অবলম্বন করতেই হবে। হাজারো বিষয়ের মধ্যে বিচারের জন্য যেকোন একটিকে বাছাই করা বাঞ্ছনীয়, নচেৎ সমস্যার গভীরে গিয়ে মৌলিক অনুসন্ধান চালানো অসম্ভব। নির্বাচিত বিষয়টি হবে এমন, যা বিদ্যমান সাহিত্যে অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত বা একেবারেই অনালোচিত। যেসব বিষয় নিয়ে পণ্ডিতগণ ইতিমধ্যেই আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন, সেসব বিষয় পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে তখনই, যখন নতুন তথ্য বা ব্যাখ্যার আলোকে প্রচলিত সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সমাজ-সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পর্কিত রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে। একটির উপর অপরটির প্রভাববিস্তারের মাত্রা নির্ভর করে ক্ষমতাকাঠামোর উপর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামো যদি সমাজকাঠামো থেকে উৎসারিত না হয়, অন্য কথায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের ভূমিকা যদি থাকে গৌণ বা শূন্য, তাহলে ক্ষমতাকাঠামোর উপর সমাজকাঠামোর প্রভাবও থাকবে অনুরূপ। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকা অস্বাভাবিক। এখানে জীবন্ত সত্তা হিসেবে সমাজের রূপ

২. Ramakanta Chakrabarty, *Vaishnavism in Bengal, 1486-1900,* (Calcutta 1985).

২৭. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

২৮. নাখোদা মসজিদ, কলকাতা। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

বদলালেও আর্থ-রাজনীতিক রূপ থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। কারণ, ক্ষমতাসীন শক্তিকাঠামোর রয়েছে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রেখে অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে থাকার অসাধারণ গুণ। বর্ণবৈষম্য, আভিজাত্যিক আধিপত্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকাঠামোয় পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। হতে পারে এ পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত ধীর, কিন্তু কখনো তা স্থবির থাকে না। যেমন, ভারতচন্দ্রের যুগের কাব্যরূপ মধুসূদন দত্তের যুগে অচল, আর মধুসূদন যুগের কাব্যরীতি নজরুল ইসলামের যুগে হয়ে পড়ে অপ্রচলিত। কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, সতী, বাঈজীনাচ প্রভৃতি ছিল আঠারো শতকের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান সমাজের মূল্যবোধ ভিন্নরূপ। আঠারো শতকের শিল্প ও স্থাপত্যরীতি আর বর্তমানের শিল্প ও স্থাপত্যরীতি এক নয়। কিন্তু আঠারো শতকের ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে বর্তমান ক্ষমতাকাঠামোর এখনো বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। নবাবি যুগের মুৎসুদ্দি, ফৌজদার, কোতোয়াল, আমিল, কানুনগোরা যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি আমলারাও প্রায় একই ক্ষমতার অধিকারী। পার্থক্য শুধু রূপ ও নামকরণের। নবাবি যুগের শেঠ-বসাক পরিবার আর বর্তমানের একচেটিয়া পারিবারিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যেও পার্থক্য নেহাতই নামের। নবাবি যুগে ক্ষমতাসীনরা অনুকম্পা প্রদর্শনের বিনিময়ে অধস্তনের কাছ থেকে গ্রহণ করতো সেলামি, নজরানা, পেশকাশ, তুহুরি, ভেট, উপরি ইত্যাদি। এই অনুপার্জিত নগদ লাভের চর্চাটি এখনো চলছে, কিন্তু ভিন্ন নামে ও কায়দায়। আঠারো শতকে সুবাদারসহ আমলা-মুৎসুদ্দিরা বেনামীতে ব্যবসা করতো, এই বিশ শতকেও এ অপবাদ থেকে সরকার ও সরকারি আমলারা মুক্ত নয়। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি সমাজ থেকে উত্থিত না হয়, তাহলে বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর প্রবণতা থাকে পরিবর্তনকে রোধ করার দিকে। তখন সমাজ এগিয়ে চললেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী থাকে স্থিতিশীল, যার ফলে সমাজ ও ক্ষমতাসীনের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক, যা অনেক সময় রক্তাক্ত সংঘাতেরও রূপ নিতে পারে। পলাশী থেকে পাকিস্তানের শেষদিন পর্যন্ত সকল বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, আন্দোলন এবং সবশেষে বাংলাদেশ বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা এ তত্ত্বকাঠামোয় ফেলে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের কোন ভূমিকাই ছিল না, তবুও সরকার ও সমাজের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কদাচিৎ। অথচ বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই শাসক-শাসিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এ বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? বৃটিশপূর্ব সরকারের লক্ষ্য ছিল বংশীয় শাসন ও আধিপত্য কায়েম করা এবং সে লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয় রাজানুগত এক শক্তিশালী সুবিধাভোগী সামরিক-বেসামরিক রাষ্ট্রীয় অভিজাত শ্রেণীব্যবস্থা। এই অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য স্থিতিশীল রাখার জন্য একই মডেলে সৃষ্টি করা হয় অধীনস্থ আঞ্চলিক

২৯. বায়তুল মোকাররম মসজিদ ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
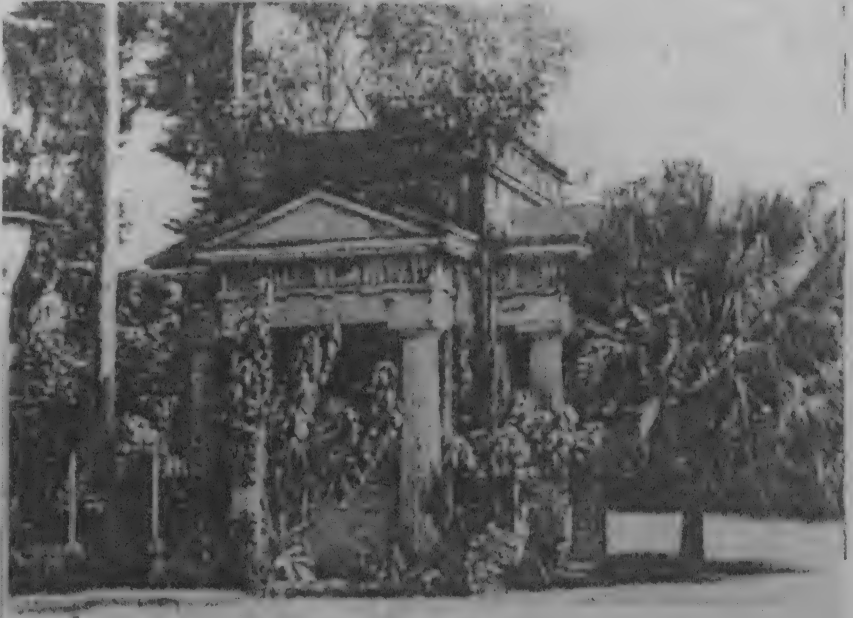
৩০. গ্রিক মেমোরিয়েল, ঢাকা।

অভিজাত শ্রেণী, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম, বর্ণ ও ভূমিনিয়ন্ত্রণ। আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণীর অধীনে সাধারণ মানুষের দর্শনে পারলৌকিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেন জাগতিকতা তাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে না তোলে। ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠে পরজাগতিক। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি, জীবনমান, মানবিক অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে সমাজ থাকে উদাসীন। ধর্ম, বর্ণ ও সনাতন প্রথা-প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না ঘটলে রাষ্ট্রক্ষমতায় কে আসে কে যায় এ সম্পর্কে জনগণ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে মধ্যযুগীয় সরকার কখনো আঘাত করে নি, ফলে প্রতিঘাতও আসে নি। তাছাড়া, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় শাসনকে কখনো স্থানীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত করা হয় নি, যেজন্য স্থানীয় সমাজ ছিল এর চিরাচরিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত এক আধা-স্বাধীন সত্তা। অতএব, এ ব্যবস্থায় সরকার ও সমাজের মধ্যে বিরোধের অবকাশ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিঘাতে উচ্চ ও আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণীর পতন ঘটে; দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। উৎপাদন উপায়ের উপর উৎপাদক শ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পৌঁছায় গ্রামের পর্ণকুটির পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে এমনসব আইন-কানুন ও প্রশাসনব্যবস্থা প্রণীত হয়, যা শুধু মানুষের জাগতিক স্বার্থকেই নয়, তাদের চিরাচরিত ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থাকেও আঘাত করে। সুতরাং, সরকারের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য ছিল মূলত কোম্পানি আমলের। কোম্পানি-উত্তর যুগের দ্বন্দ্ব ছিল ভিন্নরূপ। কোম্পানি শাসনের প্রভাবে ক্রমশ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এমন সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, প্রশাসন পরিচালনায় দেশীয়দের অংশগ্রহণ আরো সম্প্রসারিত করার জন্য উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এরা সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে সে হারে শাসিতের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর উদারনীতি বৃদ্ধি পায় নি, ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পকের্র এমন অবনতি ঘটতে থাকে যে, পরিশেষে বিশ শতকের প্রথম পাদে এসে বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ এমনকি বৃটিশবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা পর্যন্ত শুরু করে।

আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, সমাজের সমগ্র দিক অন্তর্ভুক্ত করে কোন একক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। বৃহৎ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করলে সামাজিক ঐতিহাসিককে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করে স্থির করতে হবে তিনি পাঠকের সামনে কি বক্তব্য পরিবেশন করতে চান এবং আরো স্থির করতে হবে সফলভাবে সে বক্তব্যটি উত্থাপন করার জন্য তিনি কি গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একটি সাধারণ সফল কৌশল হচ্ছে ঘটনার বিকাশপ্রবণতার মূলধারাটি সনাক্ত করা। মূলধারার যথার্থ পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে এর অন্তর্নিহিত উপধারাগুলি

৩১. কার্জন হল, ঢাকা।

৩২. পুরনো হাইকোর্ট, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

সহজভাবেই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। উপমাস্বরূপ, আমরা যদি নবাবি আভিজাত্যের আচার-অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে পৃথক পৃথকভাবে দেশের সকল অভিজাত পরিবারের কাহিনী পরিবেশন করে পাঠককে ভারাক্রান্ত না করে শুধু মুর্শিদাবাদ দরবারের চিত্রটি তুলে ধরাই যথেষ্ট। কারণ এটা সর্বজনবিদিত যে, আচার-আচরণে দেশের সকল অভিজাত পরিবার মুর্শিদাবাদ দরবারকে অন্ধ অনুকরণ করতো। এ নমুনাপদ্ধতি অবলম্বন করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাদের সামাজিক ইতিহাসের মূলধারাভিত্তিক আলোচনা করেছেন । যেমন তারা পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকের ইউরোপীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, প্রটেস্টানটিজম, হিউম্যানিজম, রোমানটিসিজম প্রভৃতি মূলধারায় ফেলে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নে অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ না করে অবলম্বন করা হয়েছে এক ধরনের পঞ্জিকাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রচ্ছন্নভাবে আমরা সমাজের অনেককিছু খুটিনাটি বিষয় পাই, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সমগ্রকে দেখতে পাই না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে, সতেরো ও আঠারো শতকে হিন্দু বর্ণ ও পৌত্তলিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। এ প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে নানা আন্দোলন ও নতুন পৌত্তলিক প্রতীক প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অখণ্ডভাবে এবং সামগ্রিকভাবে বিচার না করে খণ্ডিতভাবে দেখানো হয়েছে, যার ফলে আমরা প্রটেস্টানটিজম-এর মতো কোন সাধারণ বোধগম্য মূলধারার আন্দোলন দেখি না, দেখি শুধু নতুন দেবদেবীর নাম, নতুন ধর্মাচারপন্থীদের, যেমন বৈষ্ণববাদী,সখীভব, রামানুজী, রামানন্দী, কবিরপন্থী, নানকপন্থী, চার্বাকপন্থী, রাধাবল্লভী, সৌরপত্ত, গণপত্ত, শক্তি, দুর্গা, কালী, তারা, মনসা, তন্ত্র, চরণদাসী, কর্তাভজা, স্পষ্টদেখা, স্বামীনারায়ণ, বলরামী, সাতনামী ও আরো বহু মতবাদ-বিশ্বাসের অনুসারী, পূজক-পূজারী। এসবই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ইউরোপে প্রতিবাদ ঘটেছিল পোপের বিরুদ্ধে, এখানে ঘটেছে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইউরোপের প্রতিবাদকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রটেস্টানটিজম নামে আর বাংলার অনুরূপ প্রতিবাদের ঘটনাগুলোকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে একটি জড় পঞ্জিকারূপে, যেখানে আমরা পাই হাজারো দেবদেবীর নাম, শুভ-অশুভ দিবস, পূজাপার্বণে করণীয়-অকরণীয় বিষয়, শুচি-অশুচি, শ্লোকের শুদ্ধাশুদ্ধির কথা। এই পঞ্জিকা-ইতিহাসে আমরা হাজারো নতুন মতবাদ, নতুন দেবদেবীর সন্ধান পাই বটে, কিন্তু যে সামাজিক মানস-মনোভঙ্গি, পরিবেশ ও প্রস্তুতি ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এসবের অভ্যুত্থান ঘটালো এর কোন সামগ্রিক চিত্র আমরা পাই না।

সতেরো ও আঠারো শতকের নতুন চিন্তার ধারা তৈরি করেছে মূলত অ-ব্রাহ্মণ মনীষীরা। তাদের চিন্তাধারা এবং ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতি ছিল এক অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিক কারণেই ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সৃষ্ট ঐতিহ্যভঙ্গকারী আন্দোলনসমূহ ছিল ঐতিহ্যানুগত বর্ণহিন্দুদের চোখে 'অবক্ষয়',
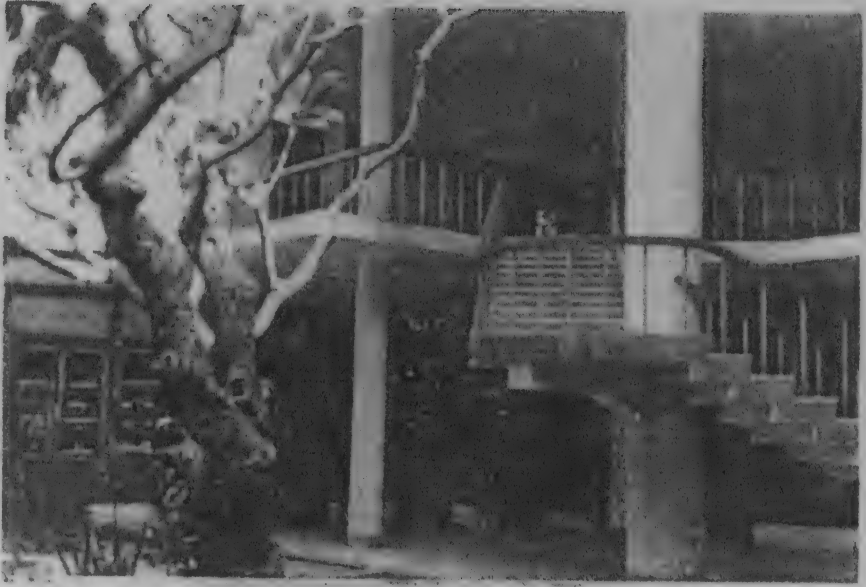
৩৩. চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
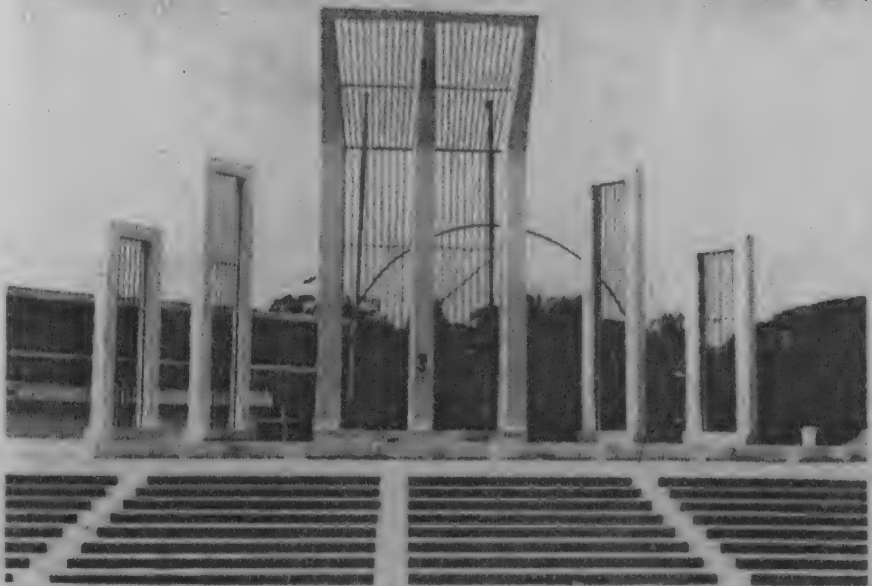
৩৪. শহীদ মিনার, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

'বিকৃত রুচি' ও 'চারিত্রিক অধঃপতন'। এ অপবাদগুলি প্রথম শোনা যায় কলকাতার রক্ষণশীল দলপতিদের আশ্রিত পণ্ডিতদের মুখে। কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং ইউরোপীয়দের সান্নিধ্যে এসে কলকাতায় একটি দেশীয় ধনাঢ্য বানিয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের বিষয়টি আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ধনাঢ্য বানিয়া শ্রেণীটির উদ্ভব ও বিকাশ যেহেতু ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু আমাদের প্রত্যাশা করা অমূলক নয় যে, ঐ ঐশ্বর্যশালী বানিয়ারাই হবে বাংলায় আধুনিকতার অগ্রপথিক। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, বানিয়ারা শুধু প্রচণ্ড রক্ষণশীলই নয়, তারা হচ্ছে বর্ণবাদের শ্রেষ্ঠ ধ্বজাধারী এবং নতুন প্রতিবাদী চিন্তাধারার পরম বিরোধী পক্ষ। তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় বর্ণবাদের পুনরুত্থান আন্দোলন, যে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মতবাদকে 'অবক্ষয়িত' ও 'বিকৃত রুচিসম্পন্ন' বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ সমাজ কর্তৃক একে বর্জন করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কলকাতা তথা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কলকাতাকেন্দ্রিক রক্ষণশীল বানিয়া পরিবারগুলির প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। তাদের সৃষ্ট পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, স্কুল-কলেজগুলিতে সতেরো-আঠারো শতকের ভিন্নমতবাদকে বিকৃত রুচির ধারক বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি বিশ শতকের অনেক ঐতিহাসিক আলোচনায়ও উক্ত সময়ে সমাজে 'বিকৃত রুচির' প্রাদুর্ভাবের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এ মর্মে যে, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণে সমাজের বাঁধন ঢিলে হয়ে পড়ে এবং সর্বত্র সুরুচি ও সদাচরণে অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু মুগল সাম্রাজ্যের পতন কি আসলে কোনভাবে সমকালীন বাঙালি সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল? উত্তর ভারতের বেলায় তা হয়তো সত্য হতে পারে—কে.কে. দত্ত যেমন মতপ্রকাশ করেছেন যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ায় সমাজে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল।[৩] কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবা বাংলার আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অবস্থার এমন উন্নতি ঘটে এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, যা সার্বিকভাবে বিচার করলে বলা যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমভাগ ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। এ যুগে মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, নাটোর, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভৃতি ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় কর্মকোলাহলপূর্ণ কেন্দ্র। এ যুগে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জমিদারপরিবারগুলি ও সরকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার জন্য উদারভাবে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি দান করে।[৪] এর প্রভাবে এ যুগে শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটে

---

৩. Kalikinkar Datta, *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century, 1707–1813*, (Calcutta 1961), 10

৪. বিস্তাবিত তথ্যের জন্য দেখুন, Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, (Dhaka 1977 reprint), 171-175

৩৫. জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা। সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)
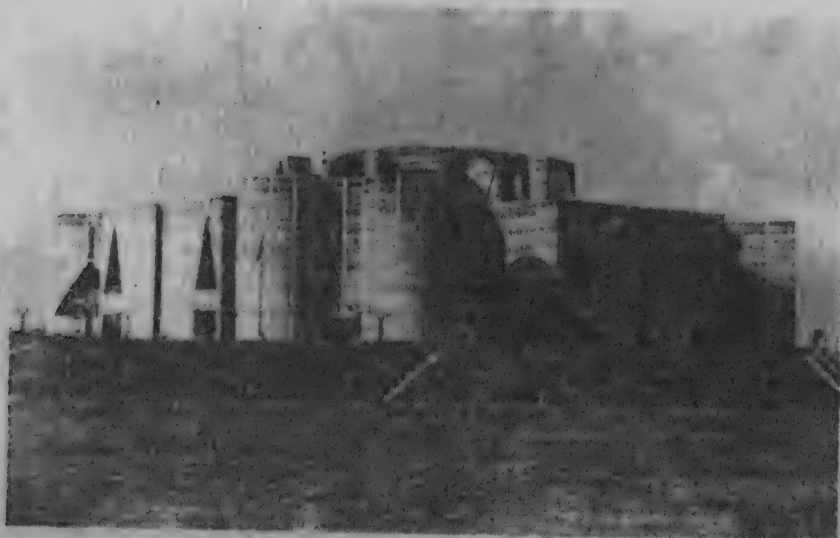
৩৬. সংসদ ভবন, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

অভূতপূর্ব জাগরণ।[৫] তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগকে অধঃপতিত, অবক্ষয়িত ও বিকৃত পর্ব বলে বর্ণনা করতে পারি ? আঠারো শতকের তথাকথিত নৈতিক সঙ্কটের প্রসঙ্গ তুলে অবধারিতভাবে উদাহরণ দেয়া হয় ভারতচন্দ্রের ঐতিহ্যবহির্ভূত নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা। কিন্তু সেটা কি ভারতচন্দ্র ও তাঁর শ্রেণীর বিকৃত রুচি নাকি ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির হঠকারিতা ও নিপীড়নমূলক নৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ? উল্লেখ্য যে, রেনেসাঁ-যুগের সৃষ্টিশীলতাও সমকালীন রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক অনুরূপভাবে 'অবক্ষয়ের' ও 'বিকৃতি'র অপবাদ লাভ করেছিল। আঠারো শতকের নবজাগরণের দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে অঙ্কুরেই এর বিনাশ। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও অন্যান্য সকল ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে যখন নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো এবং নবাবি শাসন ও নবোত্থিত ভূস্বামী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় যখন শিল্প-সংস্কৃতিসেবীরা এক নতুন দিগন্তে পৌঁছার প্রয়াস পেলো, তখনই হঠাৎ অবসান ঘটলো বাংলার স্বাধীনতার এবং এর সঙ্গে স্তিমিত হয়ে গেল নব্যধারার সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা। কোম্পানির শাসনে সুগম হলো কলকাতার রক্ষণশীল বানিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ। তবে আঠারো শতকের চ্যালেঞ্জ একেবারে তলিয়ে যায় নি। নতুন করে এর আবির্ভাব ঘটলো রামমোহন ও তাঁর শ্রেণীর মাধ্যমে। মানবগোষ্ঠীর ঐক্য, সৃষ্টিকর্তার ঐক্য, পৌত্তলিকতার নিরর্থকতা প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রশ্ন ইতিপূর্বে তুলেছিলেন চরণ দাস (জন্ম ১৭০৩), অলকচাঁদ (মৃ.১৭৬৯), রামশরণ পাল, রূপরাম কবিরাজ, বলরাম হরি, ইয়ারি শাহ (মৃ.১৭২৫), ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, লালন শাহ এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর বঙ্গীয় অনুসারীগণ, সেসব প্রশ্নই আরো সুসংগঠিত ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন রামমোহন রায়। রামমোহন অবশ্য তাঁর পূর্বসূরিদের অবদানের কথা কোথাও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। সতেরো শতকের সাহিত্যধারার অন্তত তিনটি নতুন উপাদান যোগ হয়েছে আঠারো শতকে। এগুলি হচ্ছে দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ এবং কবিওয়ালা। দোভাষী পুঁথি ছিল বাংলার সঙ্গে আরবি, ফার্সি, উর্দু মিশিয়ে পদ্যে ভাব প্রকাশের এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন প্রধানত মুসলিম লেখকগণ, যদিও ভারতচন্দ্রসহ অনেক হিন্দু লেখকও এ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। দোভাষী পুঁথির বিষয়বস্তুও ছিল বিদেশী, কিন্তু সাহিত্যের এ অভিনব ধারা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। দোভাষী পুঁথির প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানি আমলে মৌলবাদী হিন্দু পণ্ডিতরাও চেষ্টা করেছে সংস্কৃতঘেষা বাংলা প্রবর্তন করতে। তবে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বাংলা ভাষাকে এর স্বাভাবিক গতিধারা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রাচীনপন্থী ছাড়া হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে বাংলা ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) গদ্যরীতির প্রশংসায় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন

৫ দেখুন ২ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়, ওয়াকিল আহমদ, "আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য"।

৩৭. বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রতিকৃতি, আঠারো শতক
(সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর ঢাকা)

৩৮. কালীঘাট পট উনিশ শতক।
(সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

বলেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। ... যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"[৬]

উনিশ শতকের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঙালির বহুভাষাচর্চা। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন, ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষানীতি, ইউরোপে প্রাচ্য ভাষাবিষয়ক গবেষণা, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উপর ব্যাপক গবেষণা ও চর্চার ফলে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যচর্চা এমন প্রসার লাভ করে যে, এমনকি এসব ভাষায় অনেক সংবাদপত্র-সাময়িকী পর্যন্ত প্রকাশিত হতে দেখা যায়।[৭] কিন্তু এই বহুভাষিক চর্চার ঐতিহ্য বিশ শতকে এসে নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পরিণতির প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৈপ্লবিক অগ্রগতি ও জাতীয়তাবাদের বিকাশকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি জাতিগঠনপ্রক্রিয়া গতিলাভ করে প্রধানত দু'টি কেন্দ্রে—একটি গ্রাম আরেকটি শহর। এ দু'টিকে আলাদাভাবে বিচার করতে হবে এজন্য যে, উৎপাদন, জীবনযাত্রা ও সাংগঠনিকভাবে গ্রাম ও শহর একে অপর থেকে অনেক ভিন্ন। গ্রাম ও শহরের ভিন্নতা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে। গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আর শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, নবাবি যুগে মুসলমান সম্প্রদায় গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের অতিক্রম করে গেলেও শহরে তাদের সংখ্যালঘুত্ব আগের চেয়ে আরো অনেক বেড়ে যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং শহুরে সমাজে হিন্দু প্রাধান্যবিস্তারের বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বটে।

নগরায়ণ ও নগরসমাজের সমস্যাদিতে লক্ষ্য করার অনেকগুলি দিক রয়েছে। নবাবি যুগের নগরায়ণ ও ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ণের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার। পার্থক্যবিচারের মাপকাঠি হতে পারে জনসংখ্যা, ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সংখ্যানুপাত, পেশা, সুযোগ-সুবিধা, শহর-গ্রামসম্পর্ক, উৎপাদনসম্পর্ক, বসতিবিন্যাস, নাগরিক সমাজসংগঠন ও সমাজসম্পর্ক, শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসম্পর্ক, নগর-প্রশাসনব্যবস্থা ইত্যাদি।

---

৬. সারোয়ার জাহান, "বঙ্কিমচন্দ্র", উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভা : স্বাতন্ত্র্য বিচার,* (ঢাকা ১৯৮৭), ১৩ ।

৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ,* (ঢাকা ১৯৮৬)।

৩৯. মিছিল দৃশ্য, উনিশ শতক। (সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

৪০. হস্তলিপি, উনিশ শতক। (সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

কৃষি ও কুটিরশিল্পপ্রধান অর্থনীতি ও সামরিক আভিজাত্যপ্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে সেনাছাউনি আর প্রশাসনসদরের মধ্যেই নগর সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এ প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি সতেরো শতকের নগরায়ণে। কিন্তু আঠারো শতকের প্রারম্ভে নগরায়ণে আসে নতুন স্রোতোধারা, নতুন বৈচিত্র্য। বিশ্বযোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ইউরোপে বাণিজ্যবিপ্লব, বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি, একটি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, নবাবি শাসননীতির ফলে একটি প্রশাসন ও ভূভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় এবং সর্বোপরি বাংলার বিভিন্ন উৎপাদন ও যোগাযোগকেন্দ্রে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক বসতি স্থাপন প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ বাংলার নগরায়ণপ্রক্রিয়ায় আনে নতুন উপাদান, নতুন চাপ, নতুন পরিবেশ। এসবের ফলে আমরা দেখতে পাই নগরায়ণে দ্রুতগতি, দেশের সর্বত্র ছোটবড় নগরবসতি, যেমন প্রশাসনিক সদর শহর মুর্শিদাবাদ, বাণিজ্যিক শহর ঢাকা, কাশিমবাজার, কামারখালী; বিদেশী বাণিজ্যিক বসতিশহর কলকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর; জমিদারি শহর বর্ধমান, নদীয়া, নাটোর, দিনাজপুর, রাজনগর এবং আরো অসংখ্য শহরতুল্য হাট, বাজার, গঞ্জ ইত্যাদি জমিদারি শহর ছাড়া বাকি সব নগরকেন্দ্রে ঘটেছিল বহুজাতিক সমাবেশ।

কিন্তু আঠারো শতকের প্রথমার্ধে গড়ে উঠা ঐসব শহরবসতি শীর্ণরূপ ধারণ করে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। ব্যতিক্রম শুধু নতুন রাজধানী শহর কলকাতা। ঔপনিবেশিক শাসন সৃষ্টি করলো এক নতুন পরিস্থিতি, যার অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ধ্বংস হলো নবাবি নগরায়ণ এবং এরই ধ্বংসস্তূপের উপর এককভাবে গড়ে উঠলো মহানগরী কলকাতা। সারা বাংলা তথা সমগ্র উত্তর ভারত পরিণত হলো কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমিতে। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হলো জেলা শহর—কলকাতার শাসক শ্রেণীর ভাষায় মফস্বল শহর।[৮] বাংলায় নগরায়ণের এই উত্থান-পতনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সুগভীর। আমরা অনুমান করতে পারি যে, একটি শহরের উত্থান মানে ঐ শহরকে কেন্দ্র করে নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি শহুরে সমাজের উদ্ভব, আর এর পতন মানে ঐ শহুরে সমাজের বিলয়। আমরা আরো অনুমান করতে পারি যে, কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে বিশেষ কোন নগরের অবলুপ্তি ঘটলে জাতীয় জীবনে এর প্রভাব পড়বে একরকম, আর এ প্রভাবের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করবে যদি একটি বাদে একযোগে বাকি সবক'টি শহর আবার গ্রামীণ জীবনে রূপান্তরিত হয়। ঠিক তাই ঘটেছিল আঠারো শতকের শেষার্ধে। নবাবি যুগে বিকশিত বাণিজ্যিক শ্রেণী, দ্রুত সম্প্রসারণশীল বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রশাসনিক আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী, ভূ-নিয়ন্ত্রক রাজা-মহারাজা শ্রেণী,

---

৮. Sirajul Islam, "Life in the Mofussal Towns of Nineteenth Century Bengal", in Kenneth Balhatchet and John Harrison (eds.), *The City in South Asia : Pre-Modern and Modern*, (London 1980), 225 - 230

৪১. "ঝড়ে গরু" কালি ও মোম, ১৯৭২-৭৩। জয়নুল আবেদীন। (সৌজন : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

আধা-স্বাধীন নবাবি রাষ্ট্রের আমির-ওমরাহ, কোতোয়াল-কানুনগো, ফৌজ ও ফৌজদার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাতেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শ্রেণীর নগরকেন্দ্র। বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ায় শহরভিত্তিক শ্রেণীসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে নবাবি নগরায়ণেরও অবলুপ্তি ঘটে। নবাবি শাসক শ্রেণীর পতনের প্রশ্নটি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু যা এখনো তাদের বিবেচনায় তেমন আসে নি সেটি হচ্ছে পতিত শাসক শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল শহুরে নানা পেশাজীবী শ্রেণীর ভাগ্য এবং সমাজ-সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব-পরিণতি।

ঔপনিবেশিক নগরায়ণ নবাবি নগরায়ণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নবাবি আমলে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল কোন না কোন উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে। এমনকি রাজধানী মুর্শিদাবাদও ছিল নানাভাবে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৯] ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের পরও এ নগরের লোকসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, কারণ এর ফলে ঢাকার উৎপাদনব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য লক্ষণীয়ভাবে ব্যাহত হয় নি।[১০]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মফস্বল শহরগুলির আবির্ভাব ঘটে জেলাপ্রশাসনকে কেন্দ্র করে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেজন্য মফস্বল শহরগুলির জনসংখ্যা সীমিত থাকে এর প্রশাসনিক প্রয়োজনের মধ্যে, অর্থাৎ সরকারি জেলা কর্মকর্তা-কর্মচারী, অধস্তন পিয়ন-দারোয়ান-বরকন্দাজ, উকিল-মোক্তার আর এদের ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী কিছুসংখ্যক দোকানি, কারিগর, ঠিকাদার, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মফস্বল শহরগুলি ছিল প্রায় নারীবর্জিত, কারণ এসব সদ্য গজিয়ে উঠা মফস্বল শহরে পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিবেশ তখনো তৈরি হয় নি। গ্রামই ছিল মানুষের স্থায়ী ঠিকানা ও পরিচয়। চাকুরেদের জন্য শহর ছিল অস্থায়ী নিবাস। স্বাভাবিক কারণেই পূজা-পার্বণ, ঈদ বা অন্য কোন সামাজিক উৎসবে সরকারি ছুটি হলে মানুষ ছুটে যেতো পৈত্রিক নিবাস গ্রামে, শহর হয়ে পড়তো জনশূন্য। বেভারিজের ভাষায়, "শহরে তখন থাকতো শুধু বেশ্যা (সেযুগের ভাষায় পেশাগার), যাদের শহর ছেড়ে যাবার জন্য ছিল না অন্য কোন স্থান।"[১১]

কিন্তু নবাবি যুগের নগর ছিল এর বাসিন্দাদের স্থায়ী বসতি। তাঁতী, কামার, কুমোর, পোদ্দার, গোয়ালা, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, পটুয়া, সূত্রধর, সর্দার (পালকিবাহক), মিস্ত্রি, বায়েন-গায়েন, কায়েত (কেরানি), কারিগর, কসাই, মাহুত, ধোবা, ধাঙ্গড়, ডোম, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা ছিল স্থায়ী পেশাজীবী নগরবাসী। পেশা ও বর্ণ অনুসারে এরা

---

৯. Khan M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad, 1765-1793*, (Dhaka 1964), 79-81.
১০. Abdul Karim, *Dacca · The Mughal Capital'*, (Dhaka 1964), 79-81.
১১. H Beveridge, *The District of Bakarganj : Its History and Statistics*, (London 1876, reprint Barisal 1970), 329

৪২. "তিন কন্যা" তৈলচিত্র, ১৯৮৩, কামরুল হাসান।
(সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)।

সপরিবারে বসবাস করতো শহরের বিভিন্ন মহল্লায়, যেগুলি ছিল তাদের স্থায়ী আবাসস্থল। যেমন মুগল আমলে পেশা অনুসারে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার নাম ছিল তাঁতীবাজার, বানিয়ানগর, কামারনগর, কুমারটুলী, পটুয়াটুলী (চিত্রকরদের মহল্লা), সূত্রাপুর (ছুতোরদের স্থান), শাঁখারীবাজার, যুগীনগর, কায়েতটুলী ইত্যাদি। শহরসীমার ভিতরে এগুলি ছিল সামাজিকভাবে এক একটি আবাসিক পেশাপল্লী। গ্রামের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল মূলত উৎপাদন বিনিময়ের।

সনাতন নগরায়ণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর সামাজিক স্থৈর্য। এক পেশা থেকে অন্য পেশায় গমন আচারসিদ্ধ ছিল না। বসতিবিন্যাসও ছিল পেশা ও বর্ণভিত্তিক। এক বসতির লোক অন্য বসতিতে গিয়ে তার পেশা পরিচালনা করতে পারতো না। টোলা, টুলী, খানা, মহল্লা, পাড়া, বাজার, গোলা, চক, ঘাট, বন্দর, পট্টি, বাড়ি, বাড়িয়া, বাগ প্রভৃতি ছিল বসতিসমূহের সাধারণ শেষনাম এবং নাম থেকেই বোঝা যেতো কোন্ এলাকায় কাদের বাস এবং কি তাদের উৎপাদন ও পেশা। নবাবি নগরবসতির আরেকটি দিক এই যে, এখানে উৎপাদন, বিক্রয় ও বাসস্থান একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত রাখা হয়, যা ছিল সমকালীন ইউরোপীয় নগরবসতিরও বৈশিষ্ট্য।

নবাবি আমলের নগরবসতি ও পেশাবিন্যাসের অসচল অনড় বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে ক্রমশই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তবে এটা ঠিক যে, অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও সনাতন নগরায়ণের পেশা ও বর্ণভিত্তিক বসতি ও সমাজবিন্যাস দীর্ঘকাল টিকে থাকে। প্রদীপ সিংহ দেখিয়েছেন যে, বর্ণ ও গোষ্ঠীভিত্তিক বসতিবিন্যাস ও দলাদলি কলকাতায় লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকেও। তাঁর মতে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিল্পায়নবিহীন নগরায়ণ।[১২]

নবাবি বা ঔপনিবেশিক সব আমলেই নগরের জনসংখ্যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। হতে পারে নবাবি আমলের নাগরিক সমাজ ছিল বৃটিশ আমলের চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু তখনো গোটা জনগোষ্ঠীর এক দশমাংশও নগরবাসী ছিল বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষভাগে সারা বাংলায় জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ফলে গ্রাম থেকে শহরে আগমনের প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু তবুও বিশ শতকের শুরুতে দেখা যায় যে, প্রকৃত শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা পাঁচ ভাগের কম।[১৩] গ্রাম ও শহরের এ আনুপাতিক বৈষম্য চলতে থাকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত।

---

১২. Pradip Sinha, "Social Change", in N K Sinha (ed), *The History of Bengal, 1757-1905*, (Calcutta 1967), 384

১৩. *Census of India* 1901, "Bengal Report", 480-81.
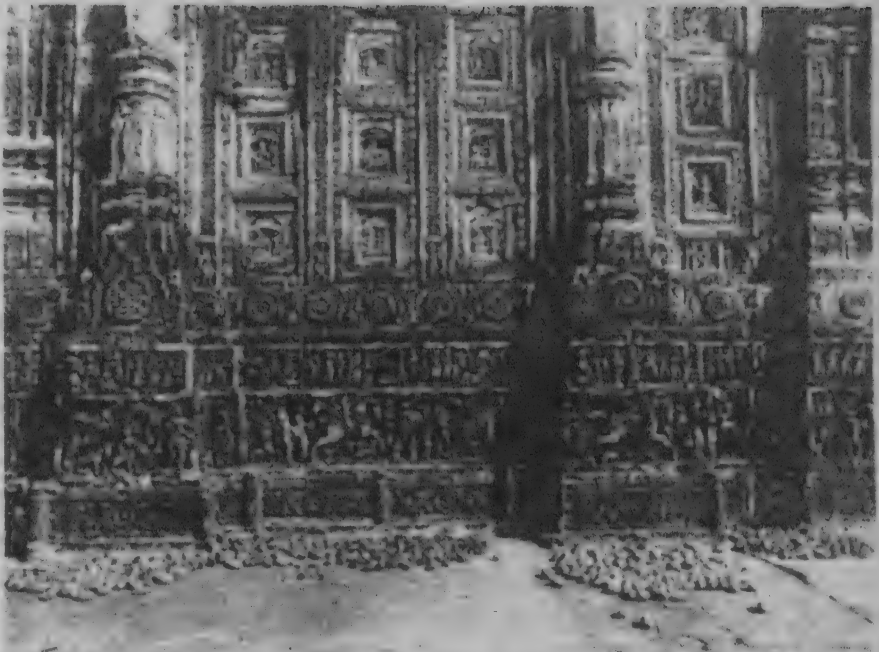
৪৩. কান্তজীর মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক, দিনাজপুর।

অতএব এককথায় বলা যায় যে, বাঙালি সমাজ মানেই গ্রামীণ সমাজ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজ এবং এর প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র করেই। গ্রামীণ প্রথা-প্রতিষ্ঠান শহুরে সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে অতি প্রত্যক্ষভাবে। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত শহরে বিদ্যমান আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, রীতিনীতি, পরিবার, গোষ্ঠী, উৎসবাদি ছিল গ্রামেরই অনুকরণ মাত্র। নগর গ্রামের মানুষকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে শুধু কর্মসংস্থানের অভাবের জন্যই নয়, সাংস্কৃতিক কারণেও।[১৪] গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি প্রায় একই রকম হলেও সাংগঠনিকভাবে গ্রাম ছিল অনেক বেশি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল। গ্রামের মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো গ্রামেই। জীবিকার জন্য গ্রামত্যাগ করার প্রয়োজন পড়লে মানুষ অভিবাসন করতো গ্রামাঞ্চলেরই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। যেমন, ১৮৯৬ সনের লেবার কমিশন লক্ষ্য করে যে, কলকাতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও নদীয়ার মজুরেরা নিকটস্থ কলকাতায় গিয়ে শ্রম বিক্রি না করে চলে যেতো সুদূর সুন্দরবন এলাকায় ।

বাংলার প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে এর নিজস্ব ইতিহাস। প্রতিটি নদ-নদীর রয়েছে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস, রয়েছে প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী হাট, বাজার, গঞ্জের উৎপত্তি ও বিকাশের কাহিনী। গ্রামীণ বাংলার মানুষের আচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-অনুষ্ঠান, লোকগীতি, লোকশিল্প, কবিগান, যাত্রা, ভোজবাজি, লাঠিয়াল সবই ইতিহাস রচনার আকর্ষণীয় বিষয়। কিন্তু সে ইতিহাস এখনো লিখা হয় নি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় গ্রামের ইতিহাস লিখার প্রয়োজনীয়তাকে আরো তীব্র করে তুলেছে সন্দেহ নেই। গ্রামের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এর প্রত্যয়কাঠামো কি হবে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামের কি কোন রাজনৈতিক ইতিহাস আছে ? সর্বযুগে গ্রামীণ সমাজ অবস্থান করেছে শাসিতের দলে। কৌলীন্য ও আভিজাত্যের যুগে কৃষক শ্রেণীর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা থাকার কথা নয়। তখন তাদের ভূমিকা ছিল শুধু উৎপাদনের, আর অকৃষক উচ্চবর্ণের অবস্থান ছিল ভোগের। ঔপনিবেশিক যুগে গ্রাম ছিল রাজস্বসংগ্রহের ক্ষেত্র। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে নির্বাচিত সংসদ ও সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে গ্রামীণ মানুষ লাভ করে ভোটদানের রাজনৈতিক অধিকার। ভোটার হিসেবে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিতে গুরুত্ব অর্জন করে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে নি। তবে বিশ শতকের গোড়া থেকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখে শোনা যায় 'ভিলেজ পলিটিকস' বা গ্রাম্য রাজনীতির কথা, যা আসলে ছিল বৃটিশ প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য নেতৃবর্গের গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোয় তাদের সনাতন ক্ষমতা বজায় রাখার রাজনীতি। এ রাজনীতি বস্তুত নেতিবাচক এবং

---

১৪. Sirajul Islam, "Mofussal Towns", 245 - 47.
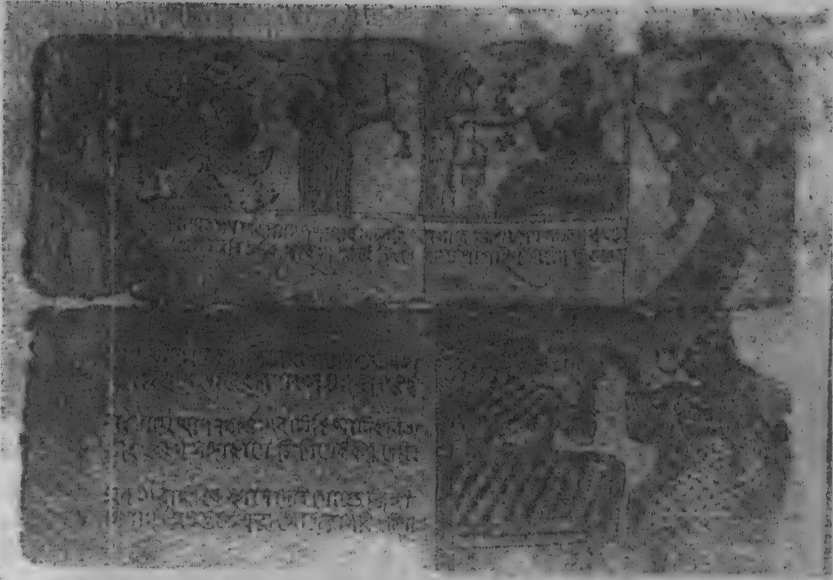
১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের পট, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

২. গাজীর পট, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

৩. রূপকথা পট, পশ্চিমবঙ্গ, উনিশ শতক
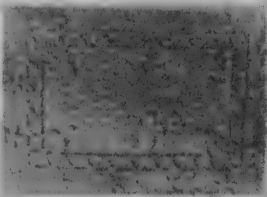
৪. খোদাইকৃত পিঁড়ি, নোয়াখালী, উনিশ শতক

৬. মুখোশ চিত্র (লাউ) ময়মনসিংহ, বিশ শতক

৫. লক্ষ্মীসরা, বিক্রমপুর, ঢাকা, বিশ শতক

সাংগঠনিকভাবে অস্বীকৃত। এককথায়, গ্রাম বরাবরই ছিল উৎপাদনকেন্দ্র, ক্ষমতার কেন্দ্র নয়। সুতরাং গ্রামের তেমন কোন ইতিবাচক রাজনৈতিক ইতিহাস নেই, নেতিবাচক ভিলেজ পলিটিকস ছাড়া। কিন্তু এর সামাজিক ইতিহাসের পরিধি বিশাল। আমাদের প্রত্যয়মতে গ্রামের সমাজ, সামাজিক সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বসতিবিন্যাস, কৃষিবিন্যাস, ধর্মবিশ্বাস, উৎসবাদি এমনই ঐতিহ্যবাহী ও বর্ণাঢ্য যে, এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা না করলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস মোটেই পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে না।

গ্রামীণ ইতিহাস পুনর্গঠনকাঠামোর প্রথমেই স্থান পাওয়া উচিত বসতিবিন্যাস, কারণ বসতিবিন্যাসে নিহিত আছে গ্রামের আদিকথা এবং সমাজসংগঠনের অন্তর্নিহিত অর্থ। প্রতিটি গ্রামের বসতিচরিত্র পৃথকভাবে যাচাই করা অসম্ভব এবং হয়তো এর প্রয়োজনও নেই। কারণ, গ্রাম অসংখ্য হলেও বসতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু অসংখ্য নয়। বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে বিশেষ ধরনের গ্রামীণ বসতি। গ্রামীণ বসতির ঐ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলে গোটা গ্রামীণ বসতিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা তৈরি করা সম্ভব। এ ধারণা থেকে আমরা লাভ করতে পারি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সমন্বয় ও সমঝোতার সামগ্রিক চিত্র। এ চিত্র বসতিসম্পর্কিত ঐসব সমস্যা বিশ্লেষণের সহায়ক হতে পারে, যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সহজাত সমন্বয় থেকে আগত। যেমন, গৃহনির্মাণকৌশল, পোশাক-পরিচ্ছদ, যোগাযোগপ্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। একজন বিদেশীর চোখে বাংলার সব গ্রামই একই রকম ও একঘেয়ে ঠেকতে পারে, কারণ তিনি দেখছেন শুধু এর বাহ্যিক দিক, বাঁশবনঘেরা একই রকম কুটিরগুচ্ছ, একই রকম লতাগুল্ম-বৃক্ষরাজি ও একই রকম কৃষক-মজুর-কারিগর। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়ে গঠিত এর ভিতরের উপাদানগুলি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল যে এর প্রকৃত ছবি অঙ্কন খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জীবন, চিন্তা, কর্মকাণ্ড, সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানাদি, উৎপাদন, ভোগবিলাস, আনন্দ-উৎসব, সংগঠন, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি উপাদান সম্বলিত প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে এর দীর্ঘ ইতিহাস। উৎপাদন, সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে এত ভিন্ন হতে পারে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, দুই অঞ্চলের দু'টি সমাজ যেন দু'টি আলাদা জগত। এ পরিস্থিতিকেই প্রবাদে বলা হয়েছে— 'এক অঞ্চলের বুলি অন্য অঞ্চলে গালি'। এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কাঠামোগত ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন, যেকোন একটি অঞ্চলের পাশাপাশি দু'টি গ্রামের সমাজসংগঠনের কথা ধরা যাক। একটি গ্রামের সমাজ গঠিত কৃষক, কুম্ভকার, চর্মকার, জেলে, তাঁতী, ধোপা, সূত্রধর, বেপারি ও বেদে সমবায়ে, আর অপর একটি গ্রামের সমাজ গঠিত শুধু কৃষক বা জেলে বা যেকোন একটি

৭. জামে মসজিদ, আতিয়া, টাঙ্গাইল, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ

৮. জোড় বাংলা মন্দির, পাবনা, সতেরো শতক
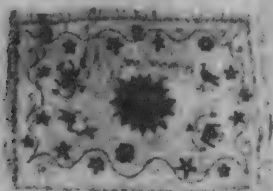
১০. নকশি কাথা (বরের আসন কাথা), শেরপুর, জামালপুর, বিশ শতকের প্রথমার্ধ

৯. নকশি কাঁথা

পেশাজীবী শ্রেণী নিয়ে। একই অঞ্চলে অবস্থিত হলেও উক্ত দু'টি গ্রামের সমাজকাঠামো ও সমাজসম্পর্ক হবে ভিন্ন প্রকৃতির। একইভাবে, কোন নতুন জেগে উঠা চরে একটি গ্রামের পত্তন হলে এর সমাজকাঠামো পার্শ্ববর্তী স্থায়ী গ্রামের সমাজকাঠামোর চেয়ে হবে ভিন্নতর। আমাদের বক্তব্য এই যে, আঞ্চলিকভাবে গ্রামীণ সমাজ-সংগঠন-সংস্কৃতি একে অপর থেকে ভিন্নতো বটেই, এমনকি পরিবেশ-প্রতিবেশে একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের সমাজকাঠামোর মধ্যেও ভিন্নতা বিরাজ করতে পারে। অতএব, বিবেচনার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম বা অঞ্চলকে ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করলে সে গ্রাম বা ইউনিট সম্পর্কে তথ্যলাভ করতে পারি বটে, কিন্তু এ থেকে গোটা গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির সঠিক চিত্র পাওয়া অসম্ভব।

সব গ্রামের আয়তন সমান নয়, আবার সব গ্রামের বসতিব্যবস্থাও একই রকম নয়। কোন কোন গ্রাম অনেক বড়, আবার কোন কোন গ্রাম অনেক ছোট। মনে রাখা দরকার যে, ক্ষুদ্র গ্রামটি ইচ্ছে করলেই বড় আকার ধারণ করতে পারে না। গ্রামের বিদ্যমান সম্পদ যতো লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার বেশি লোকসংখ্যা গ্রামে অবস্থান করা সম্ভব নয়। শহরের বেলায়ও অবশ্য একই কথা প্রযোজ্য। মৃত্যু ও বহিরভিবাসনের মাধ্যমে লোকসংখ্যা সম্পদানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহিরভিবাসনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পত্তন হয় নতুন গ্রামের এবং এ প্রক্রিয়া চলছে অনাদিকাল থেকে। প্রশ্ন উঠে, কিসের ভিত্তিতে এই প্রাকৃতিক ছাটাইপ্রক্রিয়া চলে ? কারা গ্রামত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসতিস্থাপনে বাধ্য হয় ? অনুমান করা যায় যে, গ্রামে যারা প্রান্তিক বা ভূমিহীন হয়ে পড়ে বা গ্রামীণ সমাজ কর্তৃক যারা পরিত্যক্ত হয়, তারাই গ্রামত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসতিস্থাপন করে। কিভাবে কিছু গ্রামবাসী ভূমিহীন বা অগ্রহণযোগ্য হয় সেটি আরেক বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তর থেকে বেরিয়ে আসবে গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও সম্পর্ক। গ্রামের বাড়তি বা পরিত্যক্ত মানুষ যত্রতত্র গিয়ে বসতিস্থাপন করে না। নতুন গ্রাম পত্তনে তারা বিবেচনা করে নানা বিষয়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মূল গ্রাম থেকে দূরত্ব। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানগত কারণে তারা পৈত্রিক গ্রামের পাশাপাশি স্থানে গিয়েই বসতিস্থাপন করার প্রবণতা দেখায়।[১৫] অন্যান্য বিবেচনার মধ্যে থাকে ভূস্বামীর সঙ্গে আবাদের শর্তাবলী, মাটির উৎপাদনক্ষমতা, পানির উৎস ও যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি।

গ্রামের জনসংখ্যা যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় এর বিদ্যমান সম্পদ দ্বারা, তেমনি গ্রামের বসতিব্যবস্থাও নির্ধারিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা। নদীর পাড়ে প্রতিষ্ঠিত বসতি লম্বালম্বি, আর বন্যামুক্ত সমতল এলাকায় গ্রাম পত্তন হয় দীঘি বা কোন জলাশয়কে কেন্দ্র

---

১৫. Sirajul Islam, *Villages in the Haor-Basin of Bangladesh*, (Tokyo 1985), 23 - 28.
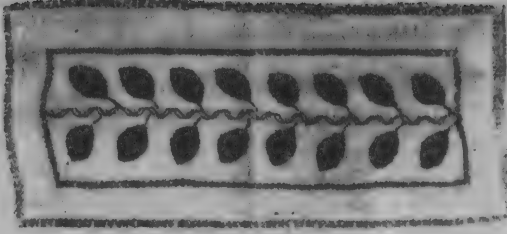
১১. আরশিলতা, ময়মনসিংহ, বিশ শতক প্রথমার্ধে

১২. নকশি পাখা, ময়মনিসংহ, বিশ শতক

১৩. নকশি পাখা,

১৪. নকশি পিঠা, আমসত্ত্বের ছাঁচ, পাবনা, বিশ শতক
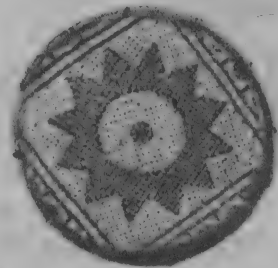
১৫. বাঁশের কুলা, বিশ শতক

করে এবং এক্ষেত্রে গ্রামের বসতিরূপ হয় গোলাকার। দক্ষিণ বাংলার অধিকাংশ এলাকার কৃষিভূমি সমতল ও বন্যামুক্ত। অতএব সেখানে গ্রামের বসতবাড়ি থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেখানে কৃষক তার কৃষিভূমির কোন এক সুবিধাজনক জায়গায় গড়ে তোলে তার বসতবাড়ি। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ হাওর এবং উত্তাল নদীবক্ষে চর এলাকায় গ্রামবসতি থাকে বিশাল আকারের এবং গৃহনির্মাণপদ্ধতি থাকে সামান্য খড়কুটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[১৬] এসব এলাকার সমাজসংগঠন ও ব্যক্তিগত জীবনধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের অসীম সাহস, অসম ভূমিনিয়ন্ত্রণ, দলাদলি, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ইত্যাদি। ঠিক বিপরীত পরিবেশে উত্তরবঙ্গে গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সলজ্জ সারল্য ও অলস জীবন। পরিবেশ-প্রকৃতিই সেখানে তৈরি করেছে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক।[১৭]

অতীত জীবন সম্পর্কে প্রত্যেক গ্রামেরই রয়েছে মৌখিক কিংবদন্তি, লোকজ শিল্প-সাহিত্য, যা গ্রামের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে লিখিত আকারে জমি সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া গ্রাম সম্পর্কে গবেষকের কাছে আর তেমন কোন উপাদান-উপকরণ নেই। লিখিত তথ্যের অভাবে গ্রামীণ সমাজের বৃত্তান্তের জন্য ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত জীবন্ত গ্রামকেই তাদের উপাদান-উপকরণের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। যেসব অঞ্চলে নগরায়ণের প্রভাব ক্ষীণ, সেসব অঞ্চলের গ্রামগুলির পরিবার, গোষ্ঠী. ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, উপকথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিষয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যে, গ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রস্তুতের জন্য এগুলোকে ইতিহাসের জীবন্ত উপাদান-উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১৮]

গৃহায়নরীতি, গৃহায়নসামগ্রী, বসতিবিন্যাস, অভিবাসন, বাজার, জমির মালিকানাকাঠামো, মামলা-মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, শাস্তি ও পুরস্কার, গবাদি পশু, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি সবই গ্রামীণ সত্তার বাহ্যিক দিক। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীরে পৌঁছে এর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে অনুসন্ধানীকে এর বাহ্যিক জগতকে অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মাটি ও জলের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে হবে। কৃষকের দর্শনে শিবের ভূমিকা কৃষি-সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। শিবের স্ত্রী দুর্গার অপর

---

১৬. F Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Bakkergunge*, (Calcutta 1868), 6

১৭. Francis Buchanan's *Survey of Rongpore*, 1807, (India Office MS records in microfilm at Dhaka University Library), 328 - 29

১৮. এ সমস্যার উপর শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছেন Robert Redfield, *The Little Community The Viewpoints for the Study of a Human Whole*, (Chicago 1955) গ্রন্থে।
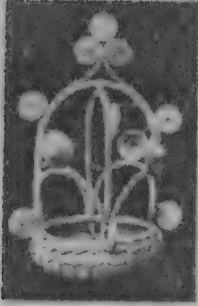
১৬. বাঁশের ঝাঁপি, বিশ শতক

১৭. নকশি পাটি, জায়নামাজ, সিলেট, বিশ শতক
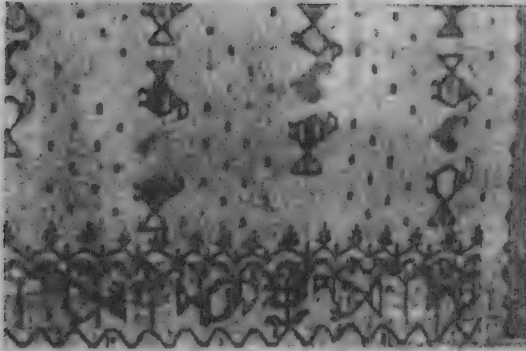
১৮. জামদানি, সোনারগাঁ, লোকশিল্প যাদুঘরের কর্মশালায় প্রস্তুত, বিশ শতক
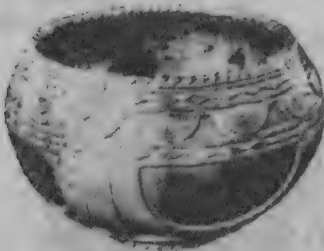
১৯. পিতলের সের, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

২০. পিতলের কুলা, কুমিল্লা, উনিশ শতক

নাম অন্নদা, অন্নপূর্ণা। কৃষকের জীবনকে নবান্নের আনন্দে ভরপুর করে তোলে অন্নপূর্ণার অনুকম্পা। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বৃষ্টি, খরা, প্লাবন, লাঙ্গল, মহামারী, গবাদিপশুর মড়ক, মৎস্য, বৃক্ষ-লতা সব কিছুর দায়িত্বে রয়েছে কোন না কোন দৈবশক্তি। অজস্র নামের ঐসব দেবদেবীদের মধ্যে আছে আবার নানা বিবাদ-বিসংবাদ। অতএব, এক দেবতা বা দেবীকে তুষ্ট করতে গিয়ে যেন অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদেবী রুষ্ট না হয়ে উঠে সেজন্য গ্রামবাসীকে নিতে হয়েছে নানা ছল-চাতুরির আশ্রয়। মুসলিম কৃষকসমাজেও ছিল নানা আচার-প্রথা, যা কৃষির অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে থাকে, যেমন বৃষ্টির জন্য গণপ্রার্থনা; মহামারী, গো-মড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পীর-ফকিরের কাছে মানত; স্থল ও নৌপথে ভ্রমণে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দরগা-খানকায় দোয়া-প্রার্থনা; জিন-পরীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঝাড়ফুকের আশ্রয়গ্রহণ; অধিক ফলনের জন্য মুষ্টি রাখা; বাড়িতে সম্পত্তি ও মাঠে ফসলচুরি রোধ করার জন্য যথাক্রমে বাড়িবন্ধ ও ক্ষেতবন্ধ দোয়া প্রয়োগ ইত্যাদি ঐশী উপাদানের আশ্রয় নেয়া। কৃষকের ধীকল্পে জন্ম-মৃত্যু, খরা-প্লাবন, অধিক ফলন বা ফসলহানি, গবাদি পশুর মড়ক, ফলমূল, মাছ-মাংসের প্রাচুর্য বা অভাব সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ঐশ্বরিক খেয়ালখুশিমতো। কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মানুষ তার সত্তার সঙ্গে ভূস্বামী থেকে সৌরশক্তি পর্যন্ত যে বৃহৎ কল্পজগৎ নির্মাণ দ্বারা বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করেছে, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানী উদাসীন হলে তারা হয়তো গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির শুধু বাহ্যিক দিকটিই সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু এর মূলে পৌঁছাতে পারবেন না ।

ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো যেকোন একটি গ্রাম বা অঞ্চলের এমন বিশেষ উপাদান অবলম্বন করে অনুসন্ধান শুরু করা, যে উপাদানটি যোগায় ঐ পরিবেশে মানুষের জীবন-জীবিকার মূল প্রেরণাশক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলেগ্রামের জীবিকা বাস্তবতা লাভ করে জাল ও বড়শিকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে অন্যান্য বিষয় আসে আনুষঙ্গিকভাবে। উনিশ শতকে সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল ধান। যেমন অন্যান্য অঞ্চলে ছিল পাট, রেশমপোকা, তামাক, আফিম বা অন্যকিছু। সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ঐ প্রধান জীবিকা-উৎস থেকে বেরিয়ে আসে এবং মানুষের কল্পনা ও বাস্তব জীবনে ঐ উৎসশক্তিই প্রাধান্য পায়। যেমন, নদীবাহিত অঞ্চলে জেলেগ্রামের দেবদেবী এবং পূজনীয়-আরাধ্য সম্পর্কযুক্ত জল ও মাছের সঙ্গে। অনুরূপভাবে অরণ্যচারী পাহাড়ী মানুষের আরাধ্য আবার অন্য কিছু। বাকেরগঞ্জে ধান ছিল জীবিকার এমনি এক কেন্দ্রীয় বস্তু যে, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শুভযাত্রা, শুভাগমন ও সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ে ধান-দুর্বার ব্যবহার ছিল সর্বজনীন। বিবাহযোগ্য পুত্রের জন্য কন্যা নির্বাচন করতে গিয়ে কৃষক, কুম্ভকার, কর্মকার, জেলে, গোয়ালা, তাঁতী প্রভৃতি পেশাজীবীর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন

২১. কাঁসার পাত্র, বিশ শতক
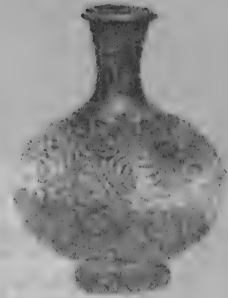
২২. মৃৎপাত্রের কলস,
খুলনা, বিশ শতক

২৩. মন্দিরের টেরাকোটা, করতাল
বাদিকা, ঈশ্বরীপুর, খুলনা, বিশ শতক

২৪. পোড়ামাটির পুতুল, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে। ঐ মানদণ্ডটি জীবন-জীবিকার প্রধান উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমাজবিশ্লেষণে ঐ মানদণ্ডটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

ঐ উৎস আবিষ্কারের পর অনুসন্ধানীর জন্য থাকে আরো অনেক জটিল সমস্যা। যেমন, ভূমিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, ভূমিব্যবহার, বিনিময়ব্যবস্থা, সমাজবিন্যাস ও কাঠামো এবং বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পাপ-পুণ্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি স্থায়ী সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠানাদি। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক নির্ণয় গবেষকের জন্য আরেকটি বড় বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কের ভিত্তি ভূমিরাজস্বসংগ্রহ এবং ভূমিব্যবস্থা। ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সমাজসম্পর্ককে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মুগল সরকার রায়তকে জমির ভোগদখল দিয়েছে, কিন্তু মালিকানা রেখেছে নিজের হাতে। ফৌজদার, কানুনগো, জমিদার, পাটোয়ারি, গ্রামপ্রধান প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে প্রত্যক্ষভাবে। এ ব্যবস্থাধীনে ভূমিতে কৃষকের বংশানুক্রমিক ভোগদখলের অধিকার ছিল, কিন্তু ভূমিহস্তান্তরের অধিকার ছিল না। এর আর্থ-সামাজিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, সরকারকে রাজস্বপ্রদান সাপেক্ষে সবাই যেহেতু জমি আবাদ করতে পারতো এবং কোন আবাদি জমিই যেহেতু হস্তান্তর করা যেতো না এবং যেহেতু আবাদের জন্য আশেপাশে পাওয়া যেতো বিস্তর কৃষিযোগ্য পতিত জমি, সেহেতু ভূমিহীনতা সমস্যারও উদ্ভব হয় নি। গ্রামে ভূমিহীনতার সমস্যা না থাকায় সৃষ্টি হলো কৃষিশ্রমিক সমস্যার। মজুরের অভাবে কৃষিকর্ম নির্ভর করেছে শুধু পারিবারিক শ্রমের উপর। এ ব্যবস্থায় ভূমিহীনতার যেমন ভয় ছিল না, তেমনি ভূমিকর্ষণ করে বিত্তশালী হবার সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ছিল অর্থনৈতিকভাবে এক বৈষম্যহীন সত্তা। শ্রমবাজার না থাকায় সৃষ্টি করা হলো আন্তঃপরিবার শ্রমবিনিময়ব্যবস্থা। গ্রাম পর্যায়ে বাজার অর্থনীতি না থাকায় সৃষ্টি করা হলো পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়, শ্রমের সঙ্গে শ্রমের। অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ভূমি চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হলো কৃষিদাস ও বেগারব্যবস্থা।

এরকম ব্যবস্থায় গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্থিতিশীলতা গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার উপর। শাহ রায়ত বা গ্রামপতি ছিল গ্রামের কর্তা। তাকে পরামর্শ দিত গ্রামপঞ্চায়েত। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিমান ও সততা-সহযোগিতায় সেরা লোকদের নিয়ে গঠিত হতো ঐ পঞ্চায়েত। প্রতি গোষ্ঠী ও পাড়া থেকে বাছাইকৃত কর্মোদ্যোগী যুবকদের নিয়ে গঠিত হতো গ্রামসরঞ্জামি নামে এক গ্রামসভা । এ প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল গ্রামের সাধারণ সমস্যা দেখা, যেমন গ্রামের নিরাপত্তাবিধান এবং বাঁধ, রাস্তা, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। এগুলি ছাড়া ছিল আরো অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেগুলি সমাজকে স্থিতিশীল, একতাবদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তায় পরিণত করতে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে। এর মূলে রয়েছে ঐ বিশেষ ভূমিব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্ক।
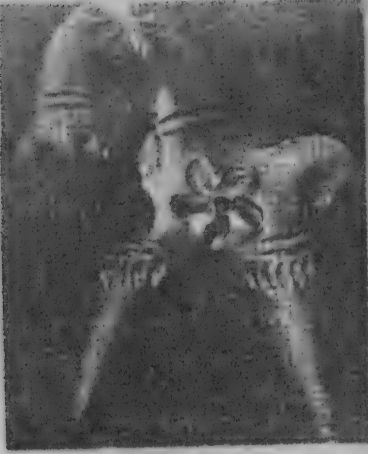
২৫. মাটির গোড়া, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

২৬. চাকাওয়ালা কাঠের হাতি,
সোনারগাঁ, বিশ শতক

২৭. সখের হাঁড়ি, রাজশাহী
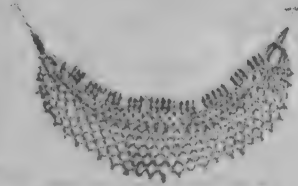
২৮. রৌপ্য অলঙ্কার, সাতনরী হার,
কিশোরগঞ্জ, বিশ শতক
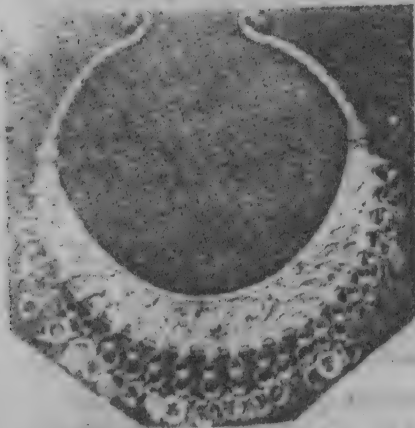
২৯. রৌপ্য অলঙ্কার, হাঁসুলীসখের হাঁড়ি,
রাজশাহী ঢাকা, বিশ শতক

৩০. রৌপ্য অলঙ্কার, খাড়ু, ঢাকা, বিশ শতক

মুগল ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলো ঔপনিবেশিক যুগে এবং এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবর্তন ঘটলো সনাতন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ও সম্পর্কেরও। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ব্যবস্থায় জমির একচ্ছত্র মালিকানাস্বত্ব প্রদান করা হলো জমিদারকে। এ ব্যবস্থাধীনে রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তের সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন হলো। সাবেক সরকারআশ্রিত ভোগদখলকার রায়ত এখন পরিণত হলো জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়। সেই শাহ্ রায়ত বা গ্রামপ্রধান, গ্রামপঞ্চায়েত, গ্রামসরঞ্জামি, পাটোয়ারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থান দখল করলো জমিদার-তালুকদার, ইজারাদার, তহশিলদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। কাজি-কানুনগোর স্থান দখল করলো জেলা আদালত। গ্রাম পর্যন্ত বাজার অর্থনীতি প্রসারিত হবার ফলে ক্রমে তিরোহিত হলো পূর্বেকার পণ্য ও শ্রম বিনিময়ব্যবস্থা এবং তদ্‌ভিত্তিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ত স্থবিরতা দূরীভূত করে পুঁজিবাদ প্রবর্তন করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সনাতন সমাজকাঠামো ও সমাজবিন্যাস ওলটপালট হয়ে গেলেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত পুঁজিবাদের সঞ্চার হয় নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে সৃষ্টি হয় এক বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী সমাজ। তালুকদার, ওসাত তালুকদার, পত্তনিদার, দার-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, হাওলাদার, নিম-হাওলাদার, ওসাত-নিম-হাওলাদার, মিরাসদার, মিরাস-ইজারাদার, জোতদার প্রভৃতি বিচিত্র নামের এইসব মধ্যস্বত্বাধিকারীরা কৃষিউৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হলেও তারা জীবিকানির্বাহ করেছে অনর্জিত কৃষিআয় থেকে এবং তাদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষা দেবার ব্যয়ভারও বহন করা হয়েছে ঐ অনর্জিত কৃষিআয় থেকেই। জমিদার থেকে গ্রামের জোতদার পর্যন্ত সবাই নির্ভর করেছে কৃষকের খাজনার উপর। ভূমিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সম্পর্কটি দাঁড়ালো এই যে, উৎপাদনে লিপ্ত থাকে কৃষক-মজুর আর সে উৎপাদন ভোগ করে উপরস্থ জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী সমাজ। অনিবার্য কারণবশতই এই ব্যবস্থায় কৃষকের নেহাত খায়খোরাকি বাদে সকল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয় খাজনা, সেস, সেলামি, আবওয়াব আকারে।

ভূস্বামী ও অন্যান্য পরজীবী শ্রেণীর শোষণ অনেক সময় প্রজাকুলকে প্রতিরোধের পথে ঠেলে দেয়। কৃষক-ভূস্বামী সম্পর্কে ঘোরতর অবনতি ঘটে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। পাবনাসহ বিভিন্ন জেলায় কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে ঔপনিবেশিক সরকার বাধ্য হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে। এ পরিবর্তনধারা সূচিত হয় ১৮৫৯ সনের খাজনা আইন-এর মাধ্যমে। ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্কে বড় রকমের পরিবর্তন আনা হয় ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-এর মাধ্যমে। এই আইন প্রণয়নের ফলে কৃষক লাভ করলো ভূস্বামীকে সেলামি প্রদানসাপেক্ষে ভূমিহস্তান্তরের অধিকার। ভূমিতে প্রজার অধিকার আরো জোরদার করা হয় ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সনের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা।

৩১. লোকবাদ্যযন্ত্র, একতারা, বাউল সঙ্গীত, পরিবেশনা, বিশ শতক
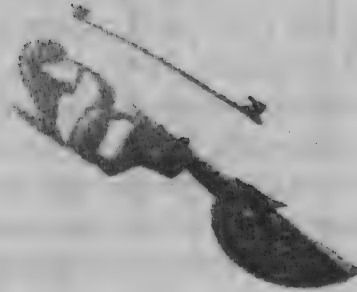
৩২. লোকবাদ্যযন্ত্র, সারিন্দা, ফরিদপুর, বিশ শতক

৩৩. লোকবাদ্যযন্ত্র, খোল, বিশ শতক

ভূমিতে প্রজার স্বত্বপ্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঐ সম্পর্কে সম্পদ বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণে দেখা দেয় অভূতপূর্ব বৈষম্য। প্রজা কর্তৃক ভূমিহস্তান্তর ও ভূমিবন্ধক দেবার অধিকার লাভের ফলে গ্রামপর্যায়ে সৃষ্টি হলো ভূমি কেনাবেচার বাজার। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখতে পাই ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর আবির্ভাব এবং গ্রামীণ ঋণিতা। ক্রমাগত স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকের সংখ্যাহ্রাস ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার, অন্যকথায় মজুরের ক্রয়ক্ষমতাও দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। জীবিকার অন্বেষণে প্রান্তিকীকৃত ও ভূমিহীন মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে শহরে। এর ফলে নগরায়ণে পড়ে নতুন চাপ, যোগ হয় নতুন মাত্রা।

আঠারো শতকে ভাষাসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিকতা ছিল এমনি প্রকট যে, এর মধ্যে 'জাতীয়' উপাদান চিহ্নিত করা ছিল খুবই কঠিন। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়া অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ছিল আঞ্চলিকভাবে একে অন্যের চেয়ে এত আলাদা যে, মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড, আত্মীয়তা ও অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ রেখেছে নিজেদের গ্রাম ও অঞ্চলের মধ্যেই। এ বিচ্ছিন্নতা সামাজিকভাবে মানুষকে এমনই এক সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল যে, এদের চোখে নিজের অঞ্চলটি ছিল তাদের দেশ আর অন্য অঞ্চল ছিল বিদেশ। 'বিদেশে' যাবার প্রাক্কালে এবং 'বিদেশে' অবস্থানকালে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহসঙ্গীত গ্রামীণ সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই 'দেশ' ও 'বিদেশ' ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দেশ-বিদেশকে অতিক্রম করে সমন্বিত বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে।

গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। জীবিকার তাগিদে গ্রাম বা অঞ্চল ছেড়ে গ্রামীণ মানুষের 'ভিনদেশে' যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতএব আন্তঃঅঞ্চল গমনাগমনের দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। 'ভিনদেশে' বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা 'ভিনদেশে'র রেওয়াজ পালন করা ছিল রীতিবিরুদ্ধ কাজ। অতএব, এহেন সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ভাষাশৈলী, শব্দসমাহার, প্রকাশভঙ্গি, প্রবাদ-প্রবচন. উচ্চারণ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, রীতিনীতি, রেওয়াজ, আচার-আচরণ, ব্যবহারবিধি, লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, রন্ধনপ্রণালী প্রভৃতি বিকশিত হয়েছে এমন আঞ্চলিক চরিত্র নিয়ে যে, এখানে 'জাতীয়' বা সাধারণ বাঙালি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া ভার। এমনকি ধর্মীয় আচার-প্রথার মধ্যেও সুস্পষ্ট আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিকতার প্রাচীর ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সত্তার পতন, বাজার অর্থনীতির বিকাশ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, আইন-আদালত, আধুনিক নগরায়ণ, শিক্ষাব্যবস্থা, আভিজাত্যের পতন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের বিকাশ, আন্তঃজেলা যোগাযোগ উন্নয়ন, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সভা-সমিতি গঠন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সংস্কার আন্দোলন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি অঙ্গনে অনুকরণীয় জাতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ও অন্যান্য কারণ মানুষকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গীয়, এমনকি ভারতীয় পর্যায়ে তাদের পরিচয় উন্নীত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কিন্তু বঙ্গবোধের উদয় আঞ্চলিকতার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে একথা বলা যায় না। কলকাতা এবং অন্যান্য মফস্বল শহরে আঞ্চলিক সমিতিগুলির কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা বিতরণে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও পরিবারের অঞ্চলপ্রীতি, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে আঞ্চলিক তৎপরতা, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কস্থাপনে অঞ্চলের অগ্রাধিকার পরিষ্কার ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এমনকি বিশ শতকের চল্লিশের দশকেও 'দেশী ভাই'-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। দেখা গেছে শহরের কোন কোন পেশায়, কলকারখানা বা দপ্তরে বিশেষ অঞ্চলের লোকদের আধিপত্য। বসতিবিন্যাসেও দেখা যায় যে, বিশেষ অঞ্চলের লোকেরা শহরের একটি বিশেষ এলাকাকে বেছে নিয়েছে। 'দেশী ভাই' সমস্যাটি স্বাভাবিক কারণেই পরিলক্ষিত হয় শহরে, যেখানে চাকুরি, পেশা ও কর্মসংস্থানের জন্য সমাগম ঘটেছে সকল অঞ্চলের মানুষের। এ সমস্যা বাঙালি জাতিত্ববোধের অগ্রযাত্রাকে আসলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, কিন্তু ব্যাহত করে নি। তবে, আঞ্চলিকতাবোধ থেকে শহরকে অস্থায়ী ও গ্রামকে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করার মনোভঙ্গি সৃষ্টি হওয়ায় সুসমন্বিত শহুরে সমাজ গঠনে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার নগরায়ণে যেমন দেখতে পাই অতি সংগঠিত ও সুসমন্বিত নাগরিক সমাজের উত্থান, তেমনটি এখানে ঘটেনি বললেই চলে।[১৯]

'অঞ্চল' থেকে উত্তরণ ঘটার মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষে যেসব কারণ ছিল ক্রিয়াশীল, সেসব কারণের মধ্যেই আবার নিহিত ছিল জাতিভেদের বীজ। নবাবি শাসনামলে সমাজের উচ্চস্তরে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ও হিন্দু আমলা-মুৎসুদ্দি- জমিদার-বানিয়া শ্রেণীর মধ্যে ছিল অসাধারণ সহযোগিতা-সম্প্রীতির সম্পর্ক। নিম্নস্তরেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্ক। বঙ্গে ইসলামচর্চায় প্রচুর হিন্দু উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-উৎসবাদিতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল না। প্রজা হিসেবে গ্রামের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবারই অধিকার ছিল সমান এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল প্রায় অভিন্ন। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ছিল অজ্ঞাত।[২০] কিন্তু উনিশ

১৯. A.D.King, "Colonialism and the Development of Modern South Asian City : Some Theoretical Considerations" in *City in South Asia*, 2.

২০. Syed Razi Wasti, *Memoirs and other Writings of Syed Ameer Ali*, (Delhi 1985 reprint), 18.

শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উভয় ধর্মেই সংস্কার- আন্দোলনের ফলে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে ঐক্যমুখী ধর্মসমন্বয়জাত উপাদান ছিল সেগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দু'টি ভিন্ন স্রোতোধারা সৃষ্টি হলো।

এদিকে আঠারো শতকের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীনতা উনিশ শতকে এসে চরম বৈষম্যের রূপ ধারণ করলো। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে মুসলিম অভিজাত শাসক শ্রেণীর পতন ঘটলো বটে, কিন্তু ভূমিনিয়ন্ত্রণ ও ভূমিরাজস্ব শাসনের মাধ্যমে হিন্দু ভূস্বামী ও আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী বহুলাংশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এরাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম শতাব্দীর স্তম্ভ এবং এদের প্রজন্মই গঠন করে প্রাথমিক ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের 'বাবু' শ্রেণী এবং ঐ বাবুদের দ্বারাই প্রথম গঠিত হয় ঔপনিবেশিক শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আনুগত্য ও ইংরেজি শিক্ষার বলে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করলো ঐ বাবু শ্রেণী। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও ঔপনিবেশিক শহুরে জনগোষ্ঠীতে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকে নামেমাত্র। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল বাবুদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। উগ্র বাবুদের মধ্যে এমনকি অনেকে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদের বোঝানোর চেষ্টা করে এবং 'হিন্দু মেলা' জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে 'হিন্দু রাজ' কায়েমের প্রত্যয় ঘোষণা করে। সুসমন্বিত বাঙালি জাতি গঠনপ্রক্রিয়ায় এর প্রভাব ছিল মারাত্মক। কারণ এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান নেতৃত্বও চিন্তা করতে শুরু করে 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার।

এ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বৃটিশ রাজ। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করলো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর এর চূড়ান্ত সাফল্যে অবদান রাখলো একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে উত্তর ভারতীয় মুসলিম রাজনীতি। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'হিন্দু রাজ' ও 'ইসলামী হুকুমত' প্রত্যয়দু'টি ছিল দুই সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যশিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[২১] দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি লোক বাস করতো পল্লী অঞ্চলে, যেখানে মানুষ 'অঞ্চল'কেই পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করেছে, সম্প্রদায়কে নয়।

গ্রামবাংলার মানুষের মনোভাবকে শহুরে বর্ণহিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ততোটা গুরুত্ব দেয় নি, যতোটা দিয়েছে মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব। মুসলমান ও হিন্দু নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি সংহতি ঘোষণা করেছে লখনৌ চুক্তিতে (১৯১৬), অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে (১৯১৯-২২), বেঙ্গল প্যাক্টে (১৯২৩), এ.কে. ফজলুল হকের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে (১৯৩৭, ১৯৪১) এবং 'সর্বশেষ' হোসেন

---

২১. এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বজলুর রহমান খান *Politics in Bengal, 1927 - 1936* (Dhaka 1987) শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাবে (১৯৪৭)। কিন্তু দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের (১৯১১) পর থেকে বঙ্গীয় বর্ণহিন্দু রাজনীতিতে ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বাংলার মুসলমান নেতৃত্ব সরকার গঠনের যে ক্ষমতা লাভ করলো, সে ক্ষমতাকাঠামো আর কখনো বদলানো যাবে না এমন একটি ভীতি বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তারা তখন ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে হিন্দু আধিপত্য তাদের অধিকতর আকৃষ্ট করে। তখন থেকেই বাঙালি স্বকীয়তা রক্ষায় কৃষক প্রজা পার্টি, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও অন্যান্য মুসলিম ও তফসিলী দল-সমিতিগুলিই ছিল সবচেয়ে বেশি তৎপর।

যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগ ছিল 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ', যারা বাংলাভূমি ও বাঙালি জাতির ঐক্য বজায় রাখার জন্য আয়োজন করেছিল রাখিবন্ধন উৎসবের এবং যাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থাকে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে রায় দিল। ইতিহাসের এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। সমাজ বদলায়, এর সঙ্গে বদলায় সমাজে বাস করার সিদ্ধান্তসমূহও। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে বাঙালি জীবনসত্তা সংক্রান্ত ১৯০৫ সনের সিদ্ধান্তসমূহ ১৯৪৭-এ এসে সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যেমন বাঙালি মুসলিম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ১৯৪৭ সনের 'পাকিস্তান' সিদ্ধান্ত সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো ১৯৬০-এর দশকে এসে।

বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষাগ্রহণের মতো বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্তু তা ছিল আপেক্ষিকভাবে অনেক ধীরগতিতে। দেখা যায় যে, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিকাশের পাশাপাশি তারা প্রণয়ন করছে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের রূপরেখাও। মুসলিম সুধীজন কর্তৃক স্থাপিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪২), পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২) প্রভৃতি ছিল লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি। এ প্রবণতারই সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে দেশবিভাগের প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রস্তাবে'।[২২] কিন্তু ১৯৪০-এর পর থেকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে বৃটিশ রাজের অবস্থানে এমন দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে, সাধারণ সমাজ ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। বৃটিশ রাজের রেখে যাওয়া রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারার প্রতিযোগিতায় মত্ত শহরভিত্তিক হিন্দু ভদ্রলোক ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে গৌণ হয়ে গেল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-

---

২২. দেখুন, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হারুন-অর-রশিদ রচিত নিবন্ধ, "অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ"।

ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন, মাটি ও মানুষের সম্পর্ক। হিন্দু ভদ্রলোকের দেশভাগাভাগির প্রস্তাব মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী মেনে নেয় এবং এ ভাগাভাগিতে পৌরোহিত্য করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজ। ক্ষমতায় আসার সময় বৃটিশরা লাভ করেছিল মানুষ ও সম্পদের দিক থেকে একটি বৃহৎ একক বঙ্গরাজ্য আর ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবার সময় এরা একে ভাগ করে গেল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দু'টি অংশে। আপাতদৃষ্টিতে দেশবিভাগের মাধ্যমে উভয় শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ হলো—বিশেষ অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রলোক মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে রেহাই পেলো আর অন্য অঞ্চলের মুসলিমরা রেহাই পেলো সেখানকার হিন্দু জমিদার, মহাজন, আমলাদের আধিপত্য থেকে।

১৯৪৭-এর বাংলাবিভাগের ঘটনা বাঙালির ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারার মধ্যে পড়ে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দূর অতীতে এ অঞ্চলের অসংখ্য স্থানীয় রাজা, মহারাজা, ভূস্বামীদের পরাভূত করে প্রথম বৃহত্তর বঙ্গশাহী প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানি আমলে এবং শাহী সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশলাভ করে বঙ্গভাষা, বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি আরো সুসংহত হয় পাঠান ও মুগল শাসনামলে, যখন বাংলাকে প্রতিবেশী অহম, ত্রিপুরা, আরাকান, উড়িষ্যা ও পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলীয় আগ্রাসন থেকে সযত্নে রক্ষা করে সৃষ্টি করা হয় এর নিজস্ব সত্তা ও পরিচয়।[২৩] তখনই উৎপত্তিলাভ করে বঙ্গসমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ। মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় প্রায় স্বাধীন নবাবি রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফলে আঠারো শতকের শেষ অব্দি, এমনকি উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্তও বঙ্গসংস্কৃতি ছিল হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন উত্তরাধিকার।

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং এর ফলশ্রুতিতে দেশবিভাগ বাঙালি সংস্কৃতির এই অভিন্ন উত্তরাধিকারকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও অচিরেই পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার সচেতন ছিল এবং সে ব্যবধানকে অতিক্রম করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল বিশেষ ভাষা ও শিক্ষানীতি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন্স। কিন্তু পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে গণভিত্তিক করা সম্ভব তো হয়ই নি, উপরন্তু পাকিস্তান অর্জনে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন এমন বহু নেতা পর্যন্ত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে আস্থা হারিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এর সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলন থেকে। বাঙালি তার সভ্যতা-সংস্কৃতির শেকড় সন্ধানের এক নতুন যাত্রা শুরু করে এ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সে অন্বেষারই যৌক্তিক পরিণতি ষাটের দশকের প্রথম স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, যা অনতিকাল পরেই রূপ নিল একাত্তরের বাংলাদেশ বিপ্লবে।

---

২৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন M. R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal 1494-1538 : A Socio-Political Study,* (Dhaka 1965)

নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ

শিরীণ আখতার*

প্রাক আধুনিক বাংলায় সমাজের মূল ধারকশক্তি হিসেবে ভূসম্পত্তি ছিল সমাজের প্রায় সকল কাঁচামাল সরবরাহ, জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং এর 'মালিকের' সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের ভিত্তি। এ দেশের বিভিন্ন ভূম্যধিকারের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রকৃত অবস্থা কার্যত ও ন্যায়ত এমনই জটিল যে এর মধ্য থেকে আলোচ্য সময়ের ভূমির স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না। *আইন-ই আকবরীতে*[১] সমকালীন ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। সতেরো শতকের রাজস্ব-ইতিহাসের মৌলিক তথ্যসূত্রের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে মুগল প্রশাসনিক ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৫৮২ সালের *তুমার-তাকসীম-জমা* (বণ্টক রাজস্ব তালিকা) প্রবর্তনের পর সময়ের প্রয়োজনে বেশ কিছু পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন করা হয়। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দেশের জটিল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি-অর্থনীতির বেশ পরিবর্তন ঘটে। আঠারো শতকের প্রথম দিকে সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় মুগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাঙন এবং আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয়ের কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান ও আর্থিক বিনিয়োগের ধরন পরিবর্তিত হতে থাকে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিবর্তন

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভূসম্পত্তির মালিকানা সরাসরি শাহী শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও বাংলার অবস্থা ছিল ভিন্নতর। একটি পরস্পর সম্পর্কিত সম্প্রদায়ের উপর বাংলার

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, 3 Vols., Vol. I, H, Blochmann (tr), Calcutta. 1927: Vols. II and III, H. S. Jarrett (tr), Calcutta, 1949, 1948.

রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সরাসরি কৃষকদের সাথে জমি বন্দোবস্তের লক্ষ্যে সৃষ্ট সম্রাট আকবরের *জবতি* বা *প্রবিধান*-এর বাস্তবায়ন ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অঞ্চল সুদূর সুবা বাংলার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুবা বাংলা, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল ছিল সমতল এবং নদীবিধৌত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে সমগ্র এলাকা পূর্ণ বা আংশিক প্লাবিত হতো। এ কারণে জমির সীমানা নির্ধারণ ও লেখ্যপ্রমাণ (দলিল) প্রস্তুত করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

অধিকন্তু জালের মতো বিস্তৃত নদী,খাল ও ঘন জঙ্গলের কারণে যাতায়াত ও সৈন্য পরিবহন ছিল দুরূহ। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো *রায়তওয়ারী* ব্যবস্থা বা একক গ্রামভিত্তিক চাষপদ্ধতি বাংলাদেশে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।[২] মধ্যবর্তী কৃষক, বংশানুক্রমিকভাবেই হোক বা *মনসবদার* এবং *মজুমদার, চৌধুরী* প্রভৃতি আংশিক কর্মকর্তা কিংবা ভূঁইয়ার মতো আঞ্চলিক প্রধান হোক, মুগলদের ভাষায় 'জমিদার' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এর অন্তর্নিহিত নীতি ছিল ভূমির বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূসম্পর্কিত সকল ব্যক্তিকে একই আখ্যা প্রদান করে সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারে পৃথক স্থানীয় অধিবাসী ও কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার মধ্যে এমন একটা বশংবদ সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যারা এই দুই গোষ্ঠীর যোগসূত্র রক্ষাকারী ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে।[৩] অন্যদিকে ত্রিপুরা বা কুচবিহারের রাজাদের মতো স্বশাসিত করদ নৃপতি, বর্ধমানের মহারাজার মতো বড় জমিদার, কিংবা জমিদারি খাজনা হিসেবে মাত্র এক রুপী দু'আনা *জমা* (রাজস্ব) প্রদানকারী চট্টগ্রামের দেবী বসন্তের মতো পাতি ভূস্বামী[৪] এদের সবাইকে একই শ্রেণীভুক্ত করে মুগলরা তাদের ঐতিহ্যিক ক্ষুদ্র নৃপতিদেরকে অবদমিত রাখার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় শাসকের সাথে জমিদার শ্রেণীভুক্ত রাজন্যবর্গের সম্পর্ক অন্যান্য অধিকাংশ জমিদারদের মতো রাজস্বভিত্তিক না হয়ে মূলত সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন মধ্যবর্তী ও পাতি জমিদারদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর এবং বাদশাহী *সনদে* তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিল।[৫] একটি বিষয় উল্লেখ্য, ফার্সি 'জমিনদার' শব্দের অর্থ ভূসম্পত্তির অধিকারী, অথচ সুবা বাংলায় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভূসম্পত্তির খাজনা আদায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে জমিদার বলা হতো। ফলে, এ অঞ্চলের জমিদার প্রকারান্তরে জমির প্রকৃত মালিক না হয়েও খাজনা

---

২. *Ain* II, 44-45; B. H. Baden-Powell, "Origin of the Zamindari Estates in Bengal". *Quarterly Journal of Economics*, 1896, Vol. XI, 40.

৩. R. F. Frykenberg, "The Traditional Process of Power in South India: A Historical Analysis of Local Influence". R. F. Frykenberg (ed.), *Land control and Social Structure in Indian History* (New Delhi 1979), 223.

৪. A. M. Serajuddin, The Revenue Administration of ***Chittagong*** (London University Ph. D. Dissertation, 1964). 303, 338.

৫. ১৭৩৫ ও ১৭৩৬ সালে রাজশাহীর জমিদার রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, J. Shore's Minute, April, 1788, quoted in W. K. Firminger (ed).) The Fifty Report. I, vii.

আদায়ের মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। জমির মালিক প্রকৃতপক্ষে ছিল *রায়ত*, যার নাম গ্রামের *পাটোয়ারি* তালিকাবদ্ধ করতো।[৬] আঠারো শতকে একচেটিয়া জমিদারি ব্যবস্থাপনার উদ্ভব এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে জমিদারদের উপর নবাবদের নির্ভরশীলতা কৃষিব্যবস্থাকে জটিল করে তুলেছিল এবং জমির মালিকানার বিষয়টি জটিলতর হয়ে উঠে। ফলে বৃটিশ শাসক কর্তৃক জমিদার এবং *তালুকদারগণ*ই জমির প্রকৃত মালিক বলে পরিগণিত হতে থাকলো, যাকে বৃটেনের জমিদারি ব্যবস্থার ছায়া হিসেবে দেখা যেতে পারে। ফলে জমির স্বত্বাধিকারী হিসেবে বিভিন্ন জমির মালিকদের প্রকৃত অবস্থা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আইনানুগ করা হলো।

মুগল শাসনামলে সরকারি তালিকায় একজন জমিদারকে চিহ্নিত করা হলো সরকারি রাজস্ব আদায়কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে। এ ছাড়া জমিদারদের উপর অর্পিত দায়দায়িত্বের অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করে বেসরকারিভাবেও বেশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রাম বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই প্রকার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো। সুবিধার্থে সৃষ্ট *হুজুরী তালুকদার* (স্বাধীন তালুকদার) পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা সরাসরি তাদের খাজনা *খালসায়* প্রদান করতো, বিনিময়ে জমিদারদের পরেই তারা সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতো।[৭] সুবা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নানা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম প্রতিপালনের দায়িত্বে পরবর্তী পদমর্যাদায় ছিল *মুজকুরী* (অধস্তন) *তালুকদার, তরফদার, তপ্পাদার, দিহিদার, হাওলাদার* প্রভৃতি পদের লোকজন। এ ছাড়া ধর্মীয় কার্যক্রম বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নামমাত্র খাজনায় বা বিনা খাজনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জমির বন্দোবস্ত দেয়া হয়, এগুলি *ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, মদদ-মাশ* নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮] জমিদারদের যেসকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা রাজনৈতিক অনুসারী জমিদারদের জমিদারি পেতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, তাদেরকে বিনা খাজনায় জমিদারগণ কিছু জমি বরাদ্দ দিতেন। এর পরিবর্তে জমিদারগণ বার্ষিক খাজনা থেকে রেয়াত পেতেন।[৯] এভাবে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার জমিদারিতে সৃষ্ট *লাখেরাজদার* (নিষ্কর ভূস্বামী) বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন ও দূরবর্তী অঞ্চলের উপর নজর রাখার শর্তে *জঙ্গলবাড়ি* তালুক নামে মধ্যস্বত্বাধিকারীর উদ্ভব ঘটায়।[১০] তদুপরি আঠারো শতকে সৃষ্ট বৃহৎ জমিদারিগুলি দেশের

---

৬. Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society* C1760-1850 (New Delhi 1979), 7-8; Ainslie T, Embree, "Landholding in Indian and British Institutions", in Frykenberg (ed.), *Lnad Control and Social Structure,* 42-43.

৭. British Museum Additional Manuscripts (henceforth referred to as B. M. Add. MSS) 29, 086, 3a; S. Islam The *Permanent Settlement in Bengal,*(Dhaka 1979),5

৮. H. Blochmann (tr.), *Ain,* I., 140-141; Shah Nawaz Khan and Abdul Haqq, *The Maasir-ul-Umara,* I. H. Beveridge (tr.), (Calcutta 1911), 525.

৯. *Proceedings of the Controllng Council of Revenue at Murshidabad* (পরবর্তীতে P. C. C. R. M.), April 30, 1771, V, 118.

১০. S. Islam. "The Problem of Madhya-Svatva in Nineteenth Century Bengal". *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Vol XXXII. 1987, 5.

বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে এককভাবে দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না বলে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নতুনভাবে সৃষ্ট ভূম্যধিকারী শ্রেণীর দুর্বল শক্তির ভিত্তির কারণেও মধ্যবর্তী রাজস্ব আদায়কারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। উত্তর ভারতে সাধারণত গোষ্ঠীভিত্তিক জমিদারি ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও বাংলার জমিদারি শক্তিধর ব্যক্তি বা পরিবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের এ ভিত্তি সংহত করার জন্য বড় জমিদারগণ সাধারণত অনেকগুলি ক্ষুদে জমিদার সৃষ্টি করেন। অনেক সময় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না বলে ভূমি ভোগদখলে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের প্রথম দিকে ভূমি ব্যবস্থাপনার এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে অনেককে জমিদারি ক্ষমতা অর্পণ করেন। মুর্শিদকুলী খানও কেন্দ্রে অধিক পরিমাণে ও নিয়মিত খাজনা পাঠাবার তাগিদে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ 'মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং বহু সংখ্যক অনুচর পরিবৃত স্থানীয় শাসকের সাথে পরিচিত' বাংলার জনগণের দৃষ্টিতে ভূসম্পত্তি এবং তদসম্পৃক্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্মানের নিদর্শন বলে পরিগণিত হতো। জমিদারি বা তালুকদারি ক্ষমতা প্রাপ্তির সাথে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণেই এই উদ্যোগ গ্রহণে অনেকেই সচেষ্ট থাকতো। বিনিয়োগের ভিন্ন কোন আকর্ষণীয় সুযোগের অনুপস্থিতিতে জমিই বিনিয়োগের সবচেয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। মুর্শিদকুলী খান তাঁর পৌত্র মির্জা আসাদুল্লাহর নামে কুলহেরিয়ার জমিদারি[১১] ক্রয়ের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন :

> পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে ভাগ্যবিড়ম্বিত হলে যেন আহার্যের সংস্থান করতে পারে, তাদের প্রাণপ্রাচুর্য যেন অটুট রাখতে পারে, সরকারি রাজস্ব পরিশোধের পর যেন কিছু অতিরিক্ত অর্থ লাভ করতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।[১২]

ভান্সিটার্টের রচনা থেকে এই ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় :

> সামরিক বা আর্থিক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির উন্নতি দেখা দিলে, সে প্রথমেই তার নিজ গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী দু'তিনটি গ্রামের কর্তৃত্ব অর্জনে আগ্রহী হয়, যাতে অবসরে সেখানে তার পরিবারের সঙ্গে বৈভবের মধ্যে কালাতিপাত করতে পারে। সে ব্যক্তি বহিরাগত হলে এমন কিছু অর্জনে আগ্রহী হয়, যা ভাগ্যবিড়ম্বনাব সময়ে তার আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখা দেবে। তখন সে পাঁচ-ছয়টি গ্রাম স্থানীয় জমিদারের নিকট থেকে ক্রয় করে বা নবাবের নিকট থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পত্তনি গ্রহণ করে। তার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।[১৩]

---

১১. মুর্শিদাবাদ জেলার চুনাখালী পরগনায় অবস্থিত।

১২. Salim Allah, *Tawarikh-i-Bangalah*, F. Gladwin (tr.), (Calcutta 1788), 100-101.

১৩. "March from Ballasore to Sambulpoore" Geogre Vansittart Papers, Dep. b. 66. 6.

ইংল্যান্ডের মতো বাংলাতেও আঠারো শতকের জমিদারগণ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১৪] সমাজের বিভিন্ন পেশা ও বিচিত্র সংস্কৃতির ব্যক্তি, অর্থাৎ নিম্নতম করণিক, আইন ও সামরিক পেশাজীবীরা ভূমির মালিক হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চতর পদে উন্নীত হয়। বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে কেবলমাত্র জমিদারি পেশা সমানভাবে গ্রহণীয় হওয়ায় সকল বর্ণের লোকই এ পেশা গ্রহণে আগ্রহী ছিল।[১৫] যদিও বাংলার জমিদারদের মধ্যে কায়স্থ বর্ণের ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ছিল, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জমিদারও দেখা যায়। নিম্নবর্ণের তিলি, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, বাগদী বর্ণের জমিদারও ছিল। অন্যদিকে দরবারের প্রশাসনিক ও সামরিক চাকুরির সুযোগ কমে গেলে মুসলমানরা কলম ও তলোয়ারের কাজের বিকল্প হিসেবে চাষভিত্তিক কাজে ঝুঁকে পড়লো।[১৬] নবাবি আমলে জমিদারি কার্যক্রমে মুসলমানদের অংশগ্রহণের হার যথেষ্ট কম ছিল।[১৭] (সারণি ১)

সারণি ১ : বর্ণ/গোত্রভেদে উল্লেখযোগ্য জমিদারদের তালিকা

জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
বীরভূম	পাঠান
বিষ্ণুপুর	রাজপুত
বর্ধমান	ক্ষত্রিয়
কলিকাতা	ইংরেজ
দিঘাপাতিয়া	তিলি
দিনাজপুর	কায়স্থ
ফতেসিং	ব্রাহ্মণ
ইদ্রকপুর	কায়স্থ
যশোর (চাঁচড়া)	কায়স্থ
লস্করপুর	ব্রাহ্মণ
মাহমুদশাহী (নলডাঙ্গা	ব্রাহ্মণ
মেদিনীপুর	সদ্‌গোপ, কৈবর্ত (চাষী) এবং অন্যান্য
মোমেনশাহী	ব্রাহ্মণ
মুক্তাগাছা	ব্রাহ্মণ
নদীয়া	ব্রাহ্মণ
পাচেত	রাজপুত

১৪. G. E. Mingay, *English Landed Society in the Eighteenth Century,* (London 1963), 26.

১৫. Collection of 'Smritis' quoted in G. S. Ghuyra, *Caste and Race in India* (London, 1932).

১৬. K. F. Rubbee, *The Origin of the Musulmans of Bengal* (Calcutta, 1895), 10.

১৭. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society* (Dhaka 1980), 28-63.

জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
রাজনগর	বৈদ্য
রাজশাহী	ব্রাহ্মণ
রোকনপুর	কায়স্থ
সরাইল	পাঠান
শিলবর্ষ	সৈয়দ
ত্রিপুরা	রাজপুত

সূত্র : S. Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982), 21, Ratnalekha Ray, *Change*, 27-30.

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবা বাংলা কার্যত স্বাধীন নবাবি শাসনের অধীনে আসে। এ সময়ের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আরও লক্ষণীয় ছিল মুর্শিদকুলী খানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ,পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণ। ১৭৬৫ সালে কোম্পানিকে দীউয়ানি প্রদান এবং পরবর্তীতে ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃক পূর্ণ দীউয়ানি ক্ষমতা লাভ এ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময়ের অস্থিতিশীল অবস্থায় উচ্চশ্রেণী, সামরিক ব্যক্তি, ক্ষমতাশালী কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। জমিদারগণও জমির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। এ টানাপড়েনের সময় সুবা বাংলার জমিদারশ্রেণী ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনায় মুর্শিদকুলী খানের কার্যকাল (১৭০০ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত ও ১৭১০ থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে সুবার দীউয়ান হিসেবে এবং ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত সুবাদার হিসেবে) গুরুত্ববহ। ১৭১৩ সালে ফর্‌রুখশিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের পর প্রাদেশিক কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য কেন্দ্র থেকে মনসবদার পাঠানোর কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বাংলায় আশ্রয় বা চাকুরির আশায় ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকে আসলেও[১৮] দিল্লী, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে মুগল কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলিব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সুবা বাংলার প্রায় সমস্ত উচ্চতর পদগুলি তখনও মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয়-পরিজনেরাই দখল করেছিল।[১৯] কিন্তু তাদের পেছনে মুগল *মনসবদারির* নিয়মানুগ সামরিক বা প্রশাসনিক সমর্থন ছিল না। তদুপরি এও প্রতীয়মান যে ১৭২০-এর দশকে শাহী উজির নিজাম-উল-মুলক-এর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কারণে আঞ্চলিক মনসবদারগণ তাদের আধিপত্য হারিয়েছিলেন।[২০] করিমের ব্যাখ্যানুযায়ী মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের নিকট

---

১৮. রেজা খানের পরিবারের মত অন্যান্যরা।

১৯. A Karim, *Murshid Kuli Khan and His Times* (Dhaka 1963), 69-70

২০ Report of the English Council at Calcutta, Bengal Public Consultations (পরবর্তীতে B P C), April 16, 1772, RI/5

বরাবর বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রেরণে সক্ষম ছিলেন বলেই দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন।[২১] এ কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি এমন এক শ্রেণীর জমিদারদের সাথে সমঝোতায় আসেন, যারা ছোট ছোট ভূস্বামীদের কাছ থেকে অধিক খাজনা আদায় করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।[২২]

১৭২২ সালের পরিবর্তিত রাজস্ব বন্দোবস্ত, *জমা-কামিল-তুমারী* (সম্পূর্ণ রাজস্বতালিকা) দ্বারা ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদেরকে *চাকলাদার* (চাকলা ছিল নতুন এক প্রশাসনিক অঞ্চল) হিসেবে মনোনীত কতিপয় বড় জমিদারদের অধীনস্ত করা হয় এবং তাদের কাছেই ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ খাজনা দিতে বাধ্য থাকতো।[২৩] ১৭২৮ সালে সুজা খান প্রবর্তিত *জমা-তুমারী-তাশখিস* (সংশোধিত রাজস্বতালিকা) উপর্যুক্ত ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে ৬১৫টি পরগনা এবং ত্রিপুরা নিয়ে বিস্তৃত সুবা বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে ১৫টি বৃহৎ জমিদারিতে বিভক্ত করে। এই জমিদারিগুলির দেয় খাজনা ছিল পঁয়ষট্টি লক্ষ রুপী—সুবা বাংলার বাৎসরিক খাজনার প্রায় অর্ধেক (সারণি ২); বাকী পরগনাগুলি ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এটা প্রতীয়মান যে ক্ষুদ্র জমিদারদের কার্যক্রমের তদারকি করার জন্য বৃহৎ জমিদারগণ নিয়োগ পেতেন কর্মকর্তা হিসেবে, জমির মালিক হিসেবে নয়। এ প্রেক্ষিতে মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রাচীন জমিদার শ্রেণীকে ধ্বংস করে দেন[২৪] বলে প্রচলিত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মসনবদার ও জমিদার এবং প্রভাবশালী জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সেটা নিশ্চিত। আঠারো শতাব্দীতে আয়তন ও দেয় খাজনার পরিমানের ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক জমিদারি একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।

সারণি ২ : ১৫টি প্রধান জমিদারির খাজনা

জমিদারি	পরগনার সংখ্যা	বার্ষিক খাজনা (রুপী)
বীরভূম	২২	৬৬,৫০৯
বিষ্ণুপুর	২	১,২৯,৮০৩
বর্ধমান	৫৭	২০,৪৭,৫০৬
কলিকাতা	২৭	২,২২,৯৬৮
দিনাজপুর	৮৯	৪,৬২,৯৬৪

২১. A. Karim, *Murshid Kuli Khan*, 79, 89-93

২২. P. B Calkins, "The Formation of Regionally Oriented Ruling Group in Bengal 1700-1740", *The Journal of South Asian Studies (J. S A. S)*, 1970, 800, 803.

২৩. N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, II (Calcutta 1968), 16-17.

২৪. J. N, Sarker (ed.) *History of Bengal*, II (Dhaka 1948), 409.

জমিদারি	পরগনার সংখ্যা	বার্ষিক খাজনা (রুপী)
ফতেসিং	১১	১,৮৬,৪২১
ইদ্রাকপুর	৬০	৮১,৯৭৫
যশোর (চাঁচড়া)	২৩	১,৮৭,৭৫৪
লস্করপুর	১৫	১,২৫,৫১৬
মাহমুদশাহী (নলডাঙ্গা)	২৯	১,১০,৬৩৩
নদীয়া	৭৩	৫,৯৪,৮৪৬
পাচেত	২	৮,২০৩
রাজশাহী	১৩৯	১৬,৯৬,০৮৭
রোকনপুর	৬৬ (সম্পূর্ণ বা ভগ্নাংশ)	২,৪২,৯৪৩
ত্রিপুরা (আদি স্বাধীন পার্বত্য ত্রিপুরার অংশ)		৪৭,৯৯৩
মোট ১৫টি	৬১৫	৬২,১২,১২১

সূত্র : J. Grant, "Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal in W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report* 3 Vols, (Calcutta 1917-1918); "The Territorial Aristocracy of Bengal", *The Calcutta Review*, 1872, 1873, Vols, LIV, LV; N, K, Sinha, *Economic History of Bengal*, 170; Ratnalekha Ray,*Change*, 28-29.

এ সম্পর্কে কলকিন বলেন, 'আঞ্চলিক জমিদার-শাসকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সাথে মুগলদের একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে'। তিনি আরও বলেন, দেশের মধ্যে বড় বড় ব্যাংকার, অর্থ লগ্নিকারী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহকারীরা এ অংশীদারিত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খানের ক্ষমতারোহণের সুবিধার জন্য সরফরাজ খানকে উৎখাত করতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিভিত্তিকা রাখে।[২৫] এই তিন শ্রেণীর সুবিধার্থে উদ্ভূত ক্ষমতার নতুন এই বিভাজন সমাজে এক নুতন মাত্রা সংযোজন করে। নবাবি সংকটকালে জমিদারগণ এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে তাদের জন্য মঙ্গলকর পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। নবাব সুজা খানের প্রতি প্রতীকী বশ্যতা ও হৃদ্যতা প্রদর্শনকারী অনেক জমিদার নবাব সরফরাজ খানের স্বার্থ উপেক্ষাপূর্বক নবাব উৎখাতকারী আলিবর্দী খানের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে দ্বিধা করে নি।[২৬] আবার, ১৭৫৬-৬৫-এর অস্থিতিশীল বছরগুলোতে মুখ্য জমিদারগণ তাদের স্বাধিকার ও আর্থিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে প্রথমে ইংরেজ ও মীর জাফর আলী খানকে সমর্থনপূর্বক নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটায়; পরে প্রাপ্ত সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে তারা ইংরেজ ও নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধাচরণ করে। আঠারো শতকের

---

২৫. P B. Calkins, *J S. A. S.*, 1970, 800, 803-806.

২৬. F Gladwin (tr), *Tawarikh*, 122, 161, 166.

বড় জমিদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি এ আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সে সময়ে বেনারস অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পর্কে Cohn[২৭] ও Misra[২৮] মন্তব্য করেন যে বৃহৎ জমিদারির ক্রমবৃদ্ধি অযোধ্যার নবাবদের নীতিমালার কারণে কিম্বা তাদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে গড়ে উঠে নি। একইভাবে ধরে নেয়া যায়, প্রধান জমিদারবৃন্দ কর্তৃক চাকলাদারি ক্ষমতার অপব্যবহার বাংলার নবাবদের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধেই হয়েছিল।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ এবং রাজস্ব আদায়পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কারণে আলোচ্য সময়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছিল কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ণয়ে এ সময়ে উদ্ভূত সামরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখে, বাংলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে মুগলরা আঞ্চলিক প্রধানদের সামরিক সহযোগিতার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নবাবদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বড় জমিদারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা যায়।

প্রভুত্ব স্থাপনের দীর্ঘ পদ্ধতি,অধিকতর ভূখন্ড দখল এবং পরবর্তীতে স্থিতিশীলতা ও শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বস্ত আর্থিক কর্মীগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। মুর্শিদকুলী খানের আগে ভূসম্পত্তির যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাতে শুধু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরই পরিবর্তন ঘটে, কার্যক্রমের নয়। ফলে তাদের দায়-দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত অথবা উর্ধতন-অধস্তনের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ভূমির সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ এ ধরনের মুসলিম নীতিমালার প্রয়োগপরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে নি। এ সময়ের দু'টি পরিবর্তন—সরকারের অংশ ১/৩ বা ১/২-এ বৃদ্ধিকরণ এবং খাজনা হিসেবে পণ্যের পরিবর্তে অর্থ প্রদান[২৯] বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলী খানের *মাল-জমিনী* পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। খাজনা বৃদ্ধিকরণ এবং সময়ানুযায়ী খাজনা আদায় ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। মুর্শিদকুলী এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রথমত বাংলার উর্বর জমিতে বরাদ্দকৃত জায়গীরগুলিকে উড়িষ্যার অপেক্ষাকৃত কম উর্বর ভূমিতে স্থানান্তরিত করে অধিক রাজস্ব আদায়ের পথ সুগম করেন। দ্বিতীয়ত তিনি সমগ্র ভূমি জরিপ করিয়ে গত কয়েক বছরের গড় উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্য করেন এবং তৃতীয়ত *আমিল* নিয়োগ করে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়হ্রাস ও দ্রুত অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্যে তিনি সুবাকে পূর্বের ৩৪টি *সরকারের* স্থলে ১৩টি *চাকলায়* বিভক্ত করেন এবং ছোট জমিদারদেরকে *চাকলাদারদের* অধীনস্ত করে দেন। যদিও ফৌজদার ও আমিল চাকলায়

---

২৭ B. S. Cohn, "Political Systems in Eighteenth Century India : The Benaras Region", *Journal of the American Oriental Society*, 1962, 314-315, Also "Structural Change in Indian Society 1595-1885", Frykenberg (ed.), *Land Control*, 85.

২৯. F. Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, A Constable (tr.) (Westminster 1891), 224-225; W. H. Moreland, *From Akbar to Aurangzeb*, (London 1923), 247-248

কর্মরত থাকতেন, মুর্শিদকুলী রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে কিছু বাছাই করা বড় জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। নিয়ম লঙ্ঘনকারী জমিদার অথবা অধস্তন কৃষকদের চিহ্নিত করে বাদ দেন, আয়ের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধানে আমিলদের নিয়োগ করেন। এভাবে যখন তিনি টোডরমলের বন্দোবস্ত সংশোধনে সক্ষম হন, তখন নির্দিষ্ট পরিমাণের খাজনা নির্ধারিত সময়ে জমাদানের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন।[৩০] অবশ্য তাঁর জোটবদ্ধকরণ নীতি (Policy of agglomeration) ক্ষুদ্র জমিদারের সংখ্যা হ্রাসে কোন দ্রুত ফল লাভ করে নি, কারণ মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বিভক্ত ১৬৬০টি পরগনার মধ্যে ১০৪৫টি পরগনাতে তখনও হুজুরী তালুকদার সহ অনেক ক্ষুদ্র পাতি জমিদার খাজনা প্রদান করতেন।[৩১] প্রধান জমিদারদের খালসার উপর খবরদারি করার নীতিমালায় তাদের ক্ষমতা ও অবস্থান যুক্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, প্রতিশ্রুতিশীল জমিদারদের সরকারি দায়িত্ব অর্পণের সুযোগ প্রদানের ফলে রাজদরবারে তাদের ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায়। এ কারণে আঠারো শতকের মাঝামাঝি রাজস্বব্যবস্থাপকের ভূমিকা থেকে ভূস্বামীর পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়।[৩২]

ভূমি ব্যবস্থাপনার বিন্যাস সরকার কর্তৃক ক্ষমতা ব্যবহারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। জমিদারদের সব সময়ে সবকিছু আয়ত্তে রাখতে হতো। কিন্তু আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর কেবল মীর কাশিমের সময়কাল বাদ দিয়ে সুবা বাংলার প্রশাসন জমিদারদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ অথবা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো শক্তিশালী ছিল না। অধিকন্তু, কেন্দ্র থেকে কোন সহায়তা না পাওয়ায় উপর্যুপরি মারাঠা অভিযানের সম্মুখীন নবাবগণ জমিদারদের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে আলিবর্দী খান মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে সমঝোতায় আসার জন্য বর্ধমানের রাজার সহায়তা ও প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করেছিলেন।[৩৩] পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় জমিদারগণ দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। নবাবদের সহায়তা প্রদানের বিনিময়ে তারা অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের ভূখন্ডের সম্প্রসারণে নবাবের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতেন। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারদের খাজনা প্রদানে অপারগতার কারণে ক্ষমতাচ্যুত করা হতো এবং তাদের জমিদারি নবাব বা ফৌজদারের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের দিয়ে দেয়া হতো।[৩৪] আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিক মিত্রদেরকে জমির বন্দোবস্ত দেয়ার অনেক দৃষ্টান্তও আছে।[৩৫]

---

৩০. J. N. Sarkar (ed.) *History of Bengal*, II, 408-409.

৩১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 16-17.

৩২. B. H. Baden-Powell, *The Land Systems of British India*, I (Oxford 1892), 183-186.

৩৩. Ghulam Hussain Tabatabai, *Sier-al-Mutakhkherin*, Haji Mustafa (tr.) (Calcutta 1902), 382.

৩৪. Board of Revenue Consultations (পরবর্তীতে B. R. C), April 6. 1773, R49/39; *Bengal District Gazetters* (পরবর্তীতে *B. D. G.)* Midnapur, 225.

৩৫. G. Vansittart to Controlling Council of Revenue at Murshidabad (পরবর্তীতে C. C. R. M.)., October 16, 1770, *P C. C. R M* December 31, 1770, II, 144.

সুবা বাংলায় বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের পর ভূমি ব্যবস্থাপনার পরবর্তী কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়। পলাশী (১৭৫৭) ও বক্সারে (১৭৬৪) ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের সাথে সাথে একদিকে নবাবদের আধিপত্যের অবসান হয়, অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। নতুন নবাব মীর জাফর আলী খান তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূর্বতন নবাব কর্তৃক কলকাতা অবরোধকালীন কোম্পানির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ১৭৫৮ সালের প্রারম্ভে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও ঢাকার কয়েকটি জমিদারির রাজস্বআয় কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এত বিস্তৃত এলাকার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা দেশের নিগূঢ় অর্থনৈতিক সংকটেরই পরিচায়ক।[৩৬] এ ব্যবস্থা ছিল গভীর তাৎপর্যবহ, কারণ তা কোম্পানির নিকট দেশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলে চাওয়ার পথ সুগম করে। ১৭৬০ সালে মীর জাফর কোম্পানির নির্দেশে নিতান্ত অনিচ্ছায় উমিচাঁদকে বর্ধমানের দীউয়ান নিযুক্ত করেন[৩৭], যা একজন মুখ্য জমিদারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যাপারে প্রথাগত ক্ষমতার সঙ্কোচন ঘটায়। মীর জাফরের দেউলিয়া সরকার কোম্পানির সকল দাবি পূর্ণ করতে অপারগ হওয়ায় কোম্পানি দেশের উপশাসকের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রার্থী মীর কাশিমের সাথে একটি সমঝোতায় আসে। ১৭৬০ সালে সুবার নিয়মিত রাজস্বব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বাংলার রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্জনকারী বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জায়গীরদারি কোম্পানির হাতে অর্পণ করা হয়।[৩৮] অবশেষে, ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্রাট শাহ আলম বার্ষিক মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি ক্ষমতা কোম্পানিকে অর্পণ করে তাকে সমগ্র এলাকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩৯] ফলে নবাবদের সাথে জমিদারদের অংশীদারিত্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় সুবার প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকিতে নিযুক্ত সুবাদার বা নওয়াব, *দীউয়ান-ই-সুবা* এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রতিনিধিরা চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক আঞ্চলিক অর্ধ-স্বাধীন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলেও জমিদার শ্রেণী রাজ্যের খাজনা আদায়ের ঠিকাদার হিসেবে রায়ত ও সরকারের মধ্যবর্তী লভ্যাংশ আদায় করে নিত। কিন্তু বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের ক্ষমতা হস্তান্তর ও সুবার প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণের পাশাপাশি নবাবকে এক নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দীউয়ানি ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হওয়ার কারণে জমিদারগণ এতকাল রায়ত ও সরকারের মাঝে যে কাজ করতো তা কোম্পানির হাতে চলে গেল।

---

৩৬. A. M. Khan, *The Transition in Bengal* 1756-1775, (Cambridge 1969), 23

৩৭ Hastings to Clive, January 19, 1760, B. M Add MSS, 29096, 201, see also the petition of the Rani of Burdwan, B R. C , December 27, 1774, R49/48.

৩৮. *B. P. C.* November 10, 1760, RI/32, 644-645.

৩৯. Haji Mustafa (tr), *Sier* III, 9, C. U. Aitchison, *A Collectin of Treaties, Engagements and Sanads* II, (Calcutta 1930), 241

ফলে রাজস্ব-ইজারাদারের অবস্থান বদলে গেল কোম্পানির খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল নিম্নতর ইজারাদার হিসেবে। এর পর থেকে সম্রাটকে নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে এ এলাকার সকল সুযোগ কোম্পানির ভোগদখলে চলে যায়।

প্রাক-আধুনিক ভারতের বেসামরিক প্রশাসন মূলত রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। ফলে ভূমির মালিকানা প্রাপ্তির সঙ্গে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্বও বর্তায়। অধিকাংশ মধ্যস্তরের কর্মকর্তা রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় ও প্রাপ্ত অর্থ কর্তৃপক্ষকে প্রদান এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান ও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সৈন্য সরবরাহে বাধ্য থাকতো।[৪০] জমিদারদের রাজস্ব, আইন-শৃঙ্খলা ও সৈন্য সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একটি সার্বিক জরিপ করলে জানা যাবে খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত উৎপাদনের অংশ লাভ ও স্থানীয় ঐতিহ্যগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকারী এ ভূম্যধিকারী শ্রেণী তাদের উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য কতটা যোগ্য ছিল।

রাজস্ব কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

অধস্তন স্থানীয় সরকারের প্রধান হিসেবে জমিদারশ্রেণীর প্রধান দায়িত্ব ছিল নিয়মিত খাজনা আদায় করা ও সময়মতো তা কেন্দ্রে পাঠানো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্বের প্রকৃত রূপায়ণের উপর নির্ভরশীল ছিল সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক। জমিদারি অধিকার প্রদানের সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, জমিদার রাজভাণ্ডারে *পেশ্‌কাশ* (জরিমানা/উপহার) ইত্যাদি এবং *কিস্তিবন্দি* অনুযায়ী[৪১] উদ্বৃত্ত জমা দেবে, নির্দিষ্ট নিয়মে প্রতি বছর *মুজকুরাত*[৪২] বা *নানকার*[৪৩] প্রভৃতির প্রাপ্য গ্রহণপূর্বক ভূসম্পত্তির সার্বিক আয় প্রভৃতি যথানিয়মে জমা দেবে।[৪৪] এ প্রধান দায়িত্বের পাশাপাশি এও বলা হয়, জমিদার ও তালুকদাররা 'রায়তদের সৌহার্দ্য অর্জন করবে ও তাদের উৎসাহিত করবে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী হবে'।[৪৫]

বাংলার জমিদার *পেশকাশি বা মাল্‌-ওয়াজিবী* যাই হোন না কেন, এক নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতেন[৪৬] এবং এ হার অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃদ্ধি করা হতো। যদিও মুর্শিদকুলী খান জমির পরিমাপ করে একটি খাজনার তালিকা তৈরি করেছিলেন, বাংলার সকল অংশে

---

৪০. S. Nurul Hasan, "Zamindars under the Mughals" in Frykenberg (ed.) *Land Control*, 26, 28.

৪১. বাৎসরিক জমার কিস্তির পরিমাণ, তারিখ ইত্যাদি সম্বলিত চুক্তি।

৪২. জমিদারি পরিচালনা ও খাজনা আদায় খরচ সহ জমিদারের ব্যক্তিগত ভাতা এবং ধর্মীয় ও দাতব্য বিষয়ক খুচরা খরচাদি।

৪৩. জীবনধারণের নিমিত্ত মঞ্জুরীকৃত ভাতা।

৪৪. রাজশাহীর জমিদার রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report* I, xivivivii.

৪৫. ঐ।

৪৬. *Ain.* II, 141; Chahar Gulshan, J. N. Sarkar (tr.) *India of Aurgangzib*, (Calcutta 1901).

এ হার যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতো কি না তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।[৪৭] মাল-ওয়াজিবী জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করতেন কৃষিযোগ্য ভূমির উপর ভিত্তি করে। জমিদারদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল জঙ্গল ও পতিত জমি উদ্ধার করা। উদ্ধারকৃত ভূমির উন্নতির একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন খাজনা দিতে হতো না।[৪৮] জমিদারগণ সরকারকে উদ্ধারকৃত ভূমির জন্য অধিক হারে খাজনা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন, ফলে অধিক হারে পতিত জমি ও জঙ্গল উন্নয়নে তাদের তেমন আগ্রহ থাকতো না। উদ্ধারকৃত ভূমিকে *খামার* বলা হতো, যার উৎপাদন কৃষক আর জমিদারদের মধ্যে ভাগাভাগি হতো। এর মাধ্যমে জমিদারগণ একটা নিয়মিত অতিরিক্ত আয় পেতেন।[৪৯] উদাহরণস্বরূপ, দিনাজপুরের জমিদারিতে খামার থেকে ৩০,০০০ রুপী আয় হতো, যা ভ্যানসিটার্ট-এর মতে উক্ত খাতে অধিকাংশ জমিদারের প্রাপ্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম।[৫০] এতে অনুমেয় যে বড় জমিদারদের প্রকৃত আয় ছিল তাদের খাজনা থেকে প্রাপ্ত আয়ের অনেক বেশি। সুবাদারগণ এ বিষয়ে অবহিত হবার কারণে সম্ভবত জমিদারদের উপর আবওয়াব (সেস) ধার্য করা হতো। এমনই একটি সেস, *নজরানা মুকাররারি* ছিল রাজ দরবারে জমিদারদের খরচের যোগান দেবার একটি স্থায়ী আর্থিক সুবিধা, যার মাধ্যমে জমিদারগণ রাজস্ব মওকুফসহ বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতো এবং *হুস্তাবুদ*-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমিলদের তাৎক্ষণিক খবরদারি থেকে পরিত্রাণ পেতো। বস্তুত এভাবেই জমিদারগণ রাজদরবারে দুই ঈদের সময় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে নজরানা পাঠানোর খরচ পুষিয়ে নিত।[৫১]

সুবাদারি আবওয়াব ধার্য করার নীতি ছিল প্রচলিত প্রথাবিরোধী। প্রাথমিকভাবে কিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রথা মুর্শিদকুলী চালু করেন, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে এর হার অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, রাজনগর জমিদারিতে বার্ষিক খাজনা ৩২,৯০০ রুপী হলেও আবওয়াব ছিল ৫১,৭৬১ রুপী।[৫২] মীর কাশিমের অধীনে আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ছিল খালসা ও জায়গীর থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমান। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি যে আমিল ও *শাজাওয়াল* নিয়োগ করেন, তাতে জমিদারদের আয় এবং কিছু প্রচলিত সুবিধা কমে যায়।[৫৩] কিছু মুখ্য জমিদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপে রায়ত ও নিম্ন কৃষকরা

---

৪৭. A. Karim, *Murshid Quli Khan*, 83.

৪৮. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 7-8.

৪৯. J. Shores Minute, September 18, 1789. W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, 479.

৫০. G. Vansittart to Controlling Council, October 16, 1770, P. C. C. R. M., December 31, 1770, II, 144.

৫১. J. Grant, "Historical and Comparative Analysis", in W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, II, 209.

৫২. Proceedings of the Committee of Circuit at Dacca (পরবর্তীতে P. C. C. D.,) October 8, 1772, R70/15, 314.

৫৩. J. Shore's minute, June 18, 1789, paras 33-37, 45, 66, in W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, 9, 12, 17.

দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। খেলাফী ও অনাদায়ী জমিদারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।[৫৪] অন্যদিকে জমি কিম্বা রায়তদের কল্যাণের প্রতি অনাগ্রহী অস্থানীয় ও সাময়িকভাবে নিয়োজিত আমিল বা শাজাওয়ালদের হাতে কৃষকরা যথেষ্ট নিগৃহীত হতে থাকে।

ভূম্যধিকারীগণ ভূমিরাজস্ব ব্যতীত সড়ক, সীমান্ত ও ফেরীর জন্য আদায়কৃত *রাহদারি* ও ব্যবসায়ীদের ভূমি বা আবাসস্থলের উপর প্রযোজ্য *পান্ডেরীর* সমন্বিত রাজস্ব সায়ের (tolls and excise) আদায় ও বিলিবণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ঘাট বা *চৌকি* এবং হাট খাজনার মতো এই খাজনাও জমিদারের এলাকার সকল দ্রব্য ও সেগুলির পরিবহন এবং বাজারে এগুলি বিক্রয়ের সুবিধার উপর ধার্য করা হতো। হাট, বাজার বা গঞ্জে সরকারি শুল্ক আদায়কেন্দ্রের পাশাপাশি জমিদারগণ তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব কেন্দ্র স্থাপন করতেন। নিয়োগকৃত কর্মচারী বাজারের খাজনা ধার্য করতো, ওজন, পরিমাণ এবং বিক্রীত মালামালের মান পরীক্ষা করতো।[৫৫] যেসকল জমিদার তাদের এলাকার ঘাট ও হাটের দায়িত্ব গ্রহণ করতো, তাদেরকে খাজনা দিতে হতো, তবে যে স্থানে বাজার বা শুল্ককেন্দ্র স্থাপিত হতো সে জায়গার খাজনা মওকুফ করা হতো।[৫৬]

জমিদারি খাজনার এক ভিন্ন ধরনের উৎস ছিল *বাজি-জমা*। জরিমানা, ক্রোক এবং ব্রাহ্মণ ও মৌলবিদেরকে প্রদত্ত বিবাহের সম্মানির উপর ধার্য হালদারি বা *মারোচা* নামক কর প্রভৃতি থেকে বাজি-জমা আদায় হতো।[৫৭] বাজি-জমার উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল নিঃসন্তান মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি। গৃহে প্রস্তুত মদ, সরকারি জমিতে গবাদি পশু চরানো, কাঠ বা খড় কাটার উপর ধার্য খাজনাও এই খাতে ধরা হতো।

প্রতি অর্থবছরের প্রারম্ভে দুই ধরনের পত্তনি, সরকারের সাথে জমিদারের মধ্যে *সদর বন্দোবস্ত* এবং রায়তের সাথে জমিদারের মধ্যে *মফস্বল* বন্দোবস্ত সম্পাদিত হতো। মুর্শিদাবাদের খালশায় পুন্যাহ[৫৮] অনুষ্ঠানে সদর বন্দোবস্তে পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক হিসাবনিকাশ করা হতো এবং পরবর্তী বছরের চুক্তি সম্পাদিত হতো।[৫৯] জমিদারগণ তালুকদার-*কুতকিন্দারদের* সাথে এবং যেসকল রায়ত সরাসরি জমিদারদের খাজনা দিত তাদের সাথে হিসাব মিটাতেন ও নতুন চুক্তি করতেন। সকল জেলার গ্রাম থেকে মহকুমা,

---

৫৪. Reza Khan's Note,May 25, 1775. *Calendar of Persian Correspondence*, 1662. (Henceforth referred to as C P C.), IV

৫৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, *সমশের গাজীর পুঁথি, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়*, ২য় খন্ড, (কলিকাতা ১৯১৪), ১৮৫৩।

৫৬. H Cottrell to B. R., January 17, 1771 P C C. R M February 4, 1771, III, 103

৫৭. C. W. B. Rous to Hastings, August 19, 1772, *Letter Copy Book of the Supervisor of Rajshahi* (henceforth referred to as L. C. B S.R.,), 47.

৫৮. পূন্যাহ জমিদারদেরকে খিলাত অথবা সম্মানে ভূষিত করা এবং জমিদার কর্তৃক নবাব ও দরবারের অন্যান্য উচ্চ পদস্থদেরকে নজরানা দেবারও অনুষ্ঠান ছিল।

৫৯. A Karim, *Murshid Quli Khan*, 90

মহকুমা থেকে মূল কাছারিতে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে এই সকল কাজ করা হতো।[৬০] কৃষিজমির খাজনা কিস্তির মাধ্যমে ফসল উঠার সময় আদায় করা হতো, অন্যদিকে আবাসিক কর ও সায়ের প্রতি মাসে আদায় করা হতো।[৬১]

জমিদারদের উপর প্রযোজ্য খাজনা নির্দিষ্ট হারে থাকলেও জমিদারগণ প্রত্যেক কৃষকের খাজনার হার ইচ্ছানুযায়ী ধার্য করতে পারতো। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে খাজনার হার নির্ণয় করা দুরূহ। জমির উৎপাদনশক্তির বিভিন্নতা, শ্রমের মজুরি, সেচব্যবস্থার সুবিধা এবং স্থানীয় সামাজিক ও ভূমিভিত্তিক প্রথার কারণে বিভিন্ন প্রকার খাজনাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়। কৃষকপিছু উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ *আসল* (মূল খাজনা) হিসেবে স্থির করা হয়।[৬২] সরকারি ফরমানে কোন অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ ছিল, অধিকন্তু অভাবী রায়তদের তৈজসপত্র, বীজ, হাতিয়ার এবং *তাকাভী* (ঋণ) দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হতো।[৬৩] কিন্তু বাস্তবে, টোডরমল ও মুর্শিদকুলী খানের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আবওয়াব এবং *মাথট* (মাথাপিছু ধার্য কর) আদায় করা হতো। এর ফলে মোট আদায় অনেক বেড়ে যায়। মুর্শিদকুলী খানের সময়ের বিঘা বা কানিপ্রতি দশ আনা খাজনা ১৭৬১ সালে ২ রুপীতে উন্নীত করা হয়।[৬৪] বিঘাপ্রতি ভাড়া আবওয়াব আর মাথট বাদেই ২২ রুপীর কম ছিল না।[৬৫]

খাজনা সুষ্ঠুভাবে আদায়ের লক্ষ্যে বড় বড় জমিদারিকে কয়েকটি পরগনা, তরফ, *তপ্পা* বা *দিহি*তে বিভক্ত করা হতো। এ সকল বিভক্তিতে একটি করে *কাছারি* স্থাপন করা হতো, যেখানে জমিদারের কাজ সম্পাদন করা হতো। এসকল কাছারির দায়িত্বে থাকতো নায়েব। পরগনাকাছারিতে কয়েক জন কর্মচারী থাকতো, এদের সংখ্যা পরগনার এলাকা ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করতো।[৬৬] যে দুই ব্যক্তি গ্রামের খাজনার বিষয়টি দেখাশুনা করতো

---

৬০. C W B Rous to R, Becher,June 22, 1770, L. C B S R , 24

৬১. Aurangzib's farmans in J N. Sarkar, "The Revenue Regulations of Aurangzib". *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1906, II, 228.

৬২ *Risalat-i-Zirat* (1750), Edinburg MS., 144, f12b.

৬৩. Roy Royan's answer, J H. Harington, *Extract from Harington's Analysis* (Calcutta, 1866), 164

৬৪. B M Add MSS. 19504, 44 পাণ্ডুলিপিটিতে ১৬২ বঙ্গাব্দ (১৭৫৫-১৭৫৬) এবং ১১৬৭ বঙ্গাব্দে (১৭৬০-১৭৬১) একজন খুদকাস্ত ও একজন পাইকাস্ত রায়তকে দানকৃত দু'টি পাট্টা রয়েছে। প্রথমটিতে ২ রুপী হারে আবাদযোগ্য ও আবাসযোগ্য জমির খাজনার কথা লিপিবদ্ধ। দ্বিতীয় পাট্টায় আঞ্চলিক আবওয়াব হিসিবে অতিরিক্ত দেয় সম্পর্কে বলা আছে;

৬৫. Hastings' Minute, B. R. C , November 12, 1776, R49/65.

৬৬. C. C R. M. to Board of Revenue, (পরবর্তীতে B. R) June 23, 1774· B R. C., June 28, 1774, R49/46.

তাদের মধ্যে *কর্মচারী* খাজনা সংগ্রহ আর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকতো। পাটোয়ারি জমির নথি সংরক্ষণ করতো আর আদায় হিসাববদ্ধ করতো। *হালসানাহ* নামক একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা রায়তপিছু জমির পরিমাপ ও সীমানা নির্ণয় করতো, নতুন রায়তকে জমি বরাদ্দ দিত এবং যে জমির খাজনা ফসলের মাধ্যমে আদায় করা হতো তার ফসল আদায় করতো।[৬৭] এই সকল গ্রাম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে গ্রামের *মণ্ডল* (মোড়ল) সহায়তা করতো।[৬৮] গ্রামের কোন কোন অংশের কৃষকদের মধ্যে দেয় খাজনা বণ্টন করে দিতে এক বা দুই জন মণ্ডল আমিনকে সহায়তা করতো। একই সাথে গ্রামে অধিক পরিমাণ ভূমি কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যগত ও সরকারি প্রধান হিসেবে মণ্ডলকে দায়িত্ব দেয়া হতো।[৬৯] এ কারণে এই এলাকায় আগত নতুন বসতি স্থাপনকারীদেরকে উৎসাহিত করা তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। একচেটিয়া জমিদারদের উপর অধিক হারে নির্ভরশীলতা এবং মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে আমিলদের পুনঃ পুনঃ নিযুক্তি হেতু গ্রামপ্রধানদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে মণ্ডল জমিদারি কর্মকর্তায় পরিণত হয়, যাকে জমিদার নিয়োগদান ও বরখাস্ত করতে পারতেন। রাজস্বপুলিশ হিসেবে মণ্ডল এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।[৭০]

মধ্যম বা বড় জমিদারিতে প্রশাসন দু'ধরনের কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হতো। রাজবাড়ীর কর্মীবাহিনীকে *হুজুরী*, এবং পরগনা বা গ্রাম এলাকায় খাজনা আদায় ও জমিদারি কাজকর্ম প্রতিপালনে ব্যাপৃতদের *মফস্বল* নামে আখ্যায়িত করা হতো।[৭১] প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে ছিল সাধারণত কেন্দ্রে স্থাপিত *সদর কাছারি* বা প্রধান কার্যালয়, যার প্রধান *দীউয়ান* সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তদারক করতেন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। *বকশি* একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং সকল ব্যয়ভার তাঁর তদারকিতে নির্বাহ করা হতো। অন্য উল্লেখযোগ্য কর্মচারী *উকিল* জমিদারি *আদালত* বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জমিদারের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৭২]

জমিদারির এ দীর্ঘ প্রশাসনিক সূত্রের এক অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল এই যে নিম্ন পর্যায়ে *আমলা* জমিদারের নিকট জমি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না দিয়ে অন্য কর্মচারীর যোগসাজশে

৬৭.. B. M. Add. MSS. 29, 086, 3.

৬৮. এছাড়াও কোন কোন অঞ্চলে মুকাদ্দাম, মুখিয়া বা পরমানিক বলা হতো।

৬৯. W. H. Moreland, *The Agrarian System of Moslem India* (Cambridge 1929), 135.

৭০. I. Habib, *The Agrarian System of Mughal India* (London 1963), 132, 134, J. Grose to C. C. R. M., October 31, 1770, P C C. D., November 15, 1770, I, 194-195.

৭১. C Russell to H. Verelst, August I, 1767, para 15, B. P. C, September 28, 1767. RI/41.

৭২. C P C., IV, 2038.

জমিদারকে সহজেই প্রবঞ্চিত করতে পারতো। *নায়েব* ও গোমস্তা প্রায়শই যথার্থ বিত্তশালী, সুখ্যাত ও সৎ ছিল না এবং রায়তদের সাথে প্রতারণাপূর্ণ লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে ব্যাপৃত থাকতো[৭৩]। আবার আমলাদের কূটকৌশলে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থতা হেতু জমিদারির একাংশ বিক্রয় হলেও এ সকল নীতিহীন আমলা প্রকাশ্যে অথবা বেনামীতে সেসব জমি কিনে নিত।[৭৪] জমিদারের মৃত্যুতে বা জমিদারের অবর্তমানে দীউয়ান বা গোমস্তা তাঁর নাবালক সন্তানের অর্থ নানাভাবে আত্মসাৎ করতো, জমি বেনামীতে বেহাত করতো এবং সমগ্র জমিদারিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতো।[৭৫]

জমিদারির বিস্তৃত ও বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির ব্যবস্থাপনার চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায়ের সুবিধাজনক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীন জমিদারগণ নিম্ন কৃষক *কুত্‌কিন্দার* বা তালুকদারদের সাথে চুক্তি করে পত্তনি দিতেন। সুবার কোন কোন এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা এ ধরনের কৃষকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। ঢাকা জেলার কোন কোন জমিদারের *নিজ-জমার* পরিমাণ তালুকদারি জমার চেয়ে কম ছিল।[৭৬] অন্যদিকে, জমিদারগণ কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে জমি কর্ষণের অযোগ্য আখ্যায়িত হওয়ার কারণে সরকারের রাজস্ব খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোন কোন জমিদার তার জমিদারির বিস্তীর্ণ এলাকাকে বাজি-তালুক হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর আশ্রিত, আস্থাভাজন বা অধস্তনদের *বন্দোবস্ত* দিত। অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ব্যক্তিগত বিনোদনের জন্য পৃথককৃত তালুক নিম্নতর হারে ভাড়ায় প্রদান করে জমিদার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত খাজনা আদায়ে তৎপর থাকতেন। সুপারভাইজার রাউস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাজশাহী জমিদারিতে কিছু কিছু তালুক কেবল রানী ভবানীর আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসই নয়, তার দেওয়ান দয়ারামেরও আয়ের উৎস ছিল।[৭৭] এ ধরনের নিম্ন হারের জমি

৭৩. C. W. B. Rous to R. Becher, June 22, 1770, L. C. B. S. R., 24.

৭৪ C. P. C , II, 895.

৭৫. R. Wilmot to R. Becher, October 22, 1770, P. C C R. M. October 29, 1770, 1131-132.

৭৬.

জমিদারী	স্বীয় জমা	তালুকদারের জমা	মোট সমা	তালুকের সংখ্যা
পরগনা জালালপুর	১১,০০০	৭৬,০০১	৮৭,০০১	২,১২৮
পরগনা চন্দ্রদ্বীপ	১৭,০০০	৭২,৭২৫	৮৯,৭২৫	৪০০
পরগনা বিক্রমপুর	২,০১০	২৫,৬৪২	২৭,৬৫২	২৬৮
পরগনা রাজনগর	৯২,৫৫৫	২,০১,১১৮	২,৯৩,৬৭৩	৪০০
তপ্পা মৈসুরদী	৪০০০	১৪,০০৪	১৮,০০৪	৫৬১
পরগনা ইসাখাবাদ	১,৭০০	২,০০০	৩,০০০	২০০
তপ্পা হায়দ্রাবাদ	১,২৩৫	৭৫০	১,০৮৫	২০০

৭৭. P. C. C. R. M., June 10, 1771, V, 254.

পরবর্তীতে সরকারের ব্যপক ক্ষতি বয়ে আনে। অধিকন্তু, তালুক সৃষ্টির কারণে বাংলার কৃষকসমাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই জমিদারের অধীনে সকল রায়ত সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো না। ফলে দুর্দশাগ্রস্ত রায়তদের অনেকে জমি ত্যাগ করতে বাধ্য হতো।[৭৮]

দেশের সকল স্থানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে জমিদারদের আবশ্যকতা ও অধিকার সমরূপ ছিল না। তাদেরকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ হারে রেয়াত দেয়ার বিধানের আওতাধীন *নানকর* নামক নিষ্কর জমি বরাদ্দ দেয়া হতো।[৭৯] জমিদারগণ বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত মালিকানা অথবা *হক-ই-জমিদারি* নামক ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আদায়ের অংশীদারিত্ব ভোগ করতেন। বাংলায় এ ব্যবস্থা *রসুম* (নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত পাওনা) নামে পরিচিত ছিল।[৮০] প্রাপ্ত হার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ছিল। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আঠারো শতকের জমিদারগণ মোট আদায়ের ১০% রসুম আদায় করতেন।[৮১]

মুগল শাসনামলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। রাজধানীর সর্বোচ্চ পদ *দীউয়ান-ই-সুবা* থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে গ্রামের পাটোয়ারি পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার রাজস্ব আদায় ও বিলি-বণ্টনে নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ফৌজদারগণ পুরোপরি ও সময়মতো রাজস্ব আদায়ে দায়বদ্ধ ছিল।[৮২] *কানুনগো দফতর* গ্রাম, ভূমি, নির্ধারিত রাজস্ব, বিক্রয়ের দলিল এবং স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান, এবং বিশেষত ইচ্ছাকৃতভাবে জমির তথ্য গোপন ও হস্তান্তর এবং রায়তদের উপর অধিক খাজনা আরোপ প্রভৃতি পর্যালোচনা করে একটি তালিকা প্রণয়ন করে জমিদারদের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতো।[৮৩] রাজস্ব আদায় ও তদারকির জন্য প্রতি সরকারে একজন প্রধান *আমিল* থাকতেন, যাঁকে পরগনা ও গ্রাম পর্যায়ে *আমিল, শিকদার,* আমিন, *বিতিক্চি, মুনসিফ, থানাদার, পাটোয়ারি* পদের ব্যক্তিবর্গ সহায়তা করতো।[৮৪] এছাড়া চৌধুরী ও মণ্ডলদের কাছ থেকেও সহায়তা পাওয়া যেত। আমিলদের স্ব স্ব এলাকার কানুনগোদের নিকট খাজনার প্রকৃত জমা, বকেয়া, হ্রাস-বৃদ্ধি ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব জমা দিতে হতো, এবং কানুনগো জমিদারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হিসাবের সাথে সেগুলি মিলিয়ে দেখতেন। আমিলদের সাধারণত বড় জমিদারিতে নিয়োগ দেয়া হতো না, তবে কোন নিয়মের লঙ্ঘন তদন্ত করতে এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্ব-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার

---

৭৮ Select Committee Consultations (পরবর্তীতে S. C. C.), August 16, 1769, R/A, 9.

৭৯. *Reports, House of Commons*. IV, 95; I. Habib, *Agrarian System*, 173-174.

৮০. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, II, 14.

৮১. *Risalah-i-Zirat* (1750). Edinburgh Ms., 144, fllb; B. R. C., August 3, 1773, R49/41

৮২. B. M. Add. MSS OR. 19505, 7a; P. Saran, *The Provincial Government of the Mughals* (Allahabad 1941) 208

৮৩ কানুনগোদের আবেদন পত্র, B. R. C., May 25, 1774, R49/49.

৮৪. *Ain*, II, 46.

জন্য নিয়োগ দেয়া হতো।[৮৫] মুর্শিদকুলী খানের সময়ের পর থেকে আমিলদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অপর গুরুত্বপূর্ণ অফিসার *সাজোয়াল* ভূস্বামী বা রায়তদের কাছ থেকে অনাদায়ী খাজনা আদায় করার জন্য নিয়োজিত হতো।[৮৬] এছাড়াও *ওয়াকাই-নিগার* (ঘটনাবলীর বিবরণরক্ষক) এবং *সাওয়ানি-নিগার* (পত্রলেখক)-এর দায়িত্ব ছিল নিজেদের এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা। হাট-বাজারে মাপ-জোখের উপরে নজর রাখার জন্য নিয়োজিত ছিল *মুহতাসিব*। ১৭৭১ সালে দিনাজপুর থেকে কট্রেলের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তখনও শাহী কর্মচারী হিসেবে সম্মানিত, ওয়াকাই-নিগার, সাওয়ানি-নিগার এবং মুহতাসিবগণ জমিদারদের উপর খবরদারি করার জন্য নিয়োজিত ছিল।[৮৭]

জমিদার-রায়ত সম্পর্ক

মুগল শাসনামলে সুবার সর্বময় দায়িত্ব যেমন ছিল সম্রাটের হাতে, জমিদারিতে জমিদারের তেমনই একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল এবং রায়তদের সন্তুষ্টির উপরই জমিদারির উন্নতি নির্ভর করতো। স্বার্থগত দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও রায়তদের অধিকার ও ঐতিহ্যগত সুবিধা সংরক্ষণ জমিদারদের দায়িত্ব ছিল, কারণ তাদের শ্রমের উপরই জমিদারদের সুখ-শান্তি নির্ভর করতো। রায়তদের সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে উৎসাহ দানের জন্য আদিষ্ট বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব-পত্তনিদারদের সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করে দেয়া হতো যেন তারা রায়তদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি না করে। জমিদারদের প্রদত্ত সনদে নির্দেশ দেয়া হতো জমিদারি ক্ষমতারোপের পাশাপাশি 'রায়ত ও সাধারণ জনগণের সাথে প্রশংসনীয় ব্যবহার করতে'।[৮৮] এই তাত্ত্বিক আচরণের বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক পরিব্রাজকদের রচনা ও সাহিত্যে দেখা যায়, জমিদার ও রায়তশ্রেণী পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার্থে মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় রাখতো। জমির উপর কোন বিশেষ চাপ না থাকায় জমির মালিক ও প্রজাদের অধিকার নিশ্চিত করা হতো। একই সাথে, পর্যাপ্ত কৃষকের অভাবে জমিদারগণ রায়তদের জমি ত্যাগ করে চলে যাওয়া থেকে বিরত করতো এবং তাদেরকে সকল কৃষিযোগ্য জমি চাষ করতে উদ্বুদ্ধ করতো।[৮৯]

বহুধাপবিশিষ্ট ভূমিভিত্তিক সমাজে যেমন বিভিন্ন ধাপের রাজস্ব-আদায়কারী ছিল, তেমনি বিভিন্ন প্রকারের রায়তও ছিল। কৃষকদের সাথে জমিদারদের দু'ধরনের চুক্তি

---

৮৫ Reza Khan's Account, February 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 345.

৮৬. Haji Mustafa (tr.), *Sier* I, 325.

৮৭. Cottrell to Controlling Council, P C C R M., July 2, 1771, V 337.

৮৮. J. Shore's Minute, April, 1788 quoted in W. K. Firminger (ed.)., *Fifth Report,* I. xi.

৮৯. S. Nurul Hasan, "Zamindars Under the Mughals", R. E. Frykenberg (ed.), *Land Control,* 20, শিনকিচি তানিগুচি, "বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে দিনাজপুর জমিদারির প্রশাসনিক কাঠামো", নিবন্ধটি এস.ইউ. আহমদ সম্পাদিত "দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য" শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ১৮৪।

সম্পাদিত হতো—রেওয়াজ মাফিক ও চুক্তিভিত্তিক। প্রথম ক্ষেত্রে খাজনা *নিরক্* পদ্ধতিতে ধার্য করা হতো, অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে উৎপাদিত পণ্যের ধরন ও মোট উৎপাদন এবং সেই এলাকার প্রচলিত সংস্কারের উপর ভিত্তি করে বিঘাপ্রতি হার নির্ধারিত হতো।[৯০] বংশপরম্পরায় যে রায়ত নিজের জমিতে চাষাবাদ করতো, *খুদকাস্ত* নামে অভিহিত সে রায়ত নির্ধারিত হারে নিরক্ প্রদান করতো। বিধিবদ্ধভাবে জমির স্বত্বাধিকারী হওয়ায় এদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন *পাট্টা* দেয়া হতো না বা তারা নিজেরাও পাট্টা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না, কারণ তাদের ধারণা ছিল, এর কারণে তারা জমিদারের আজ্ঞাবাহক হয়ে যাবে, এবং জমিদার পরবর্তীতে যাকে ইচ্ছা তাকে জমির পত্তনি দেবে।[৯১] জমিদারকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান সাপেক্ষে *পাইকাস্ত* (অনাবাসিক) রায়তরা আবাদি বা অনাবাদি জমি যে ধরনেরই হোক না কেন, তার পাট্টা লাভ করতো।[৯২] খুদকাস্ত রায়তরা প্রাক-মুগল যুগের জমির মালিক বা গ্রামসমাজের সদস্যের খণ্ডিত অংশ।[৯৩] পাইকাস্তদের জমির প্রতি কোন আগ্রহ না থাকলেও তারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে কাজ করতো। সবচেয়ে নিম্নতম রায়ত ছিল *আধিয়ার*, বর্গাদার বা ভূমিহীন কৃষক, যারা অন্যের জমিতে কাজের বিনিময়ে ফসলের ভাগ পেত।[৯৪] বিত্তশালী রায়ত ও *শাহ রায়ত*দের অধীন অনেক জমি থাকতো, যার সবটুকু তারা নিজের কৃষক দিয়ে চাষ করাতে পারতো না, অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কিষাণদেরকে দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশের বিনিময়ে চাষ করিয়ে নিত। শাহ রায়তরা অর্থশালী হওয়ায় ঋণ প্রদানে সক্ষম ছিল, ফলে এরা অনেক কম মূল্যে জমি চাষ করিয়ে নিতে পারতো। আঠারো শতকের দিকে উচ্চতর ভূমি-অধিকারিক ও নিম্নতম রায়তের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের জমির মালিক থাকার কারণে এই দু'শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছে। বৃহৎ জমিদারিতে, যেখানে প্রকৃত ব্যবস্থাপনা দীউয়ান, চৌধুরী আর গোমস্তাদের হাতে ন্যস্ত থাকতো, সেখানে মণ্ডল, প্রামাণিক বা সম্পদশালী রায়তদের সাথে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা ছিল, কারণ তারা নিজেদেরকে ঐ শ্রেণীর কর্মচারীদের থেকে উচ্চ শ্রেণীর বলে মনে করতো, এবং কৃষকদের অধিকার খর্ব করতে ব্যাপৃত থাকতো।

কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দীউয়ানি লাভের পর ঐতিহ্যগত ভূমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। বংশানুক্রমিক শাসকদের কার্যক্রম পরিবর্তিত হয়ে গেল নগণ্য রাজস্ব-ঠিকাদার ব্যবস্থাপনায়। বিভিন্ন জেলায় ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ, তুচ্ছ

---

৯০. Royroyan's answer, J. H. Harington, *Extract*, 155.

৯১. S. Bird to B. R., January 14, 1788, Board of Revenue Proceedings (পরবর্তীতে B. R. P). May 6, 1788, R70/41.

৯২. ঐ।

৯৩. R. H. Hollingbury. *The Zemindary Settlement of Bengal*, Vol. I, (London 1868), 8.

৯৪ S. Islam, *Permanent Settlement*, 5.

কারণে আমিল, *শাজাওয়াল বা ওয়াদ্দার* প্রভৃতি কর্মচারী প্রেরণ, জমিদারদের প্রচলিত অধিকার খর্ব করে উচ্চতর দরদাতার নিকট জমির পত্তনি দেয়া বা সেটা *খাস* হিসেবে রাখা[৯৫] জমিদারি শাসনব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি করে। জমিদারগণ তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। সুপারভাইজারদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা খর্ব করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও জমিদারগণ তাদের জমিদারি এলাকার জরিপ ও প্রকৃত মূল্যায়ন করার কাজে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। তারা সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল-এর দলকে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রতিপালনে অনীহা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করতে অস্ত্র ধারণও করেছিল।[৯৬] জমিদারদের সব প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সুপারভাইজারগণ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকে এবং জমিদার ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীদের অনাদায়ী খাজনা আদায়ে শিথিলতার কোন সুযোগ দেয়া হয় নি। সুপারভাইজারদের নিয়োগের ফলে জমিদারদের স্বায়ত্তশাসিত অবস্থার ক্ষতি হতে থাকে। ১৭৭৪ সালের ১৪ মে জারিকৃত নির্দেশবলে জমিদারদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আরও খর্ব করা হয়। এ সময় থেকে সুপারভাইজারগণ দীউয়ানের পাশাপাশি বোর্ড অব রেভিনিউ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কালেক্টরের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং রাজস্ব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে সম্পূর্ণভাবে চলে আসে।[৯৭] এরপরই আবওয়াব আদায় নিষিদ্ধ করা হয়। খাজনার কিস্তি ফসল কাটার সময়ে নির্ধারণ করা হলে সঠিক সময়ে খাজনা দেবার জন্য তাদের আর ঋণ করার প্রয়োজন থাকলো না। সকল জমিদারি *চৌকি* বিলোপ করা হলো। কালেক্টরদের নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন প্রতি পরগনার প্রতিটি খামারের প্রকৃত খাজনার হার প্রস্তুত করে সর্বোচ্চ জমার হিসাব নির্ণয়পূর্বক আয় হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করে। সে সাথে সকল জমিদারি চৌকি উচ্ছেদ করা হয়।[৯৮]

জমিদার শ্রেণী ও পুলিশব্যবস্থা

সুবার সার্বিক ফৌজদারি ও পুলিশ প্রশাসন ফৌজদারের হাতে ন্যস্ত থাকলেও তারা গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে জমিদার শ্রেণীর উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জমিদারদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি মুগল আমলেই সূচিত হয় নি, অতীতে গ্রামপ্রধান সমাজপতি হিসেবে পুলিশকার্যক্রম সংগঠন করতেন। সময়ের বিবর্তনে গ্রামপ্রধানের এই দায়িত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত হয়।[৯৯] একই সাথে আর্থিক ও প্রশাসনিক

---

৯৫. C. P. C., II, 1476; R. Wilmot to R. Becher, October 22, 1770, *P. C. C. R. M.*, October 29, 1770, I, 132; W. Harwood to Controlling Council of Revenue at Murshidabad, P C. C. R. M., October 28, 1770; October 6, 1770, I, 170.

৯৬. J. Rennell to Controlling Council, *P C. C. R. M.*, December 9, 1770, December 20, 1770, II, 98-99.

৯৭. *P. C. C. R. M.*, May 14, 1772, R 67/54.

৯৮. ঐ

৯৯. B B. Misra, *The Judicial Administration of the East India Company in Bengal*, (Delhi 1961), 66; I. Habib, *Agrarian System*, 132-134.

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারগণ তাদের বিপুল আঞ্চলিক ক্ষমতার বলে সমগ্র এলাকার প্রকৃত অভিভাবকে পরিণত হয়ে পড়েন। বাদশাহী সনদে পুলিশ প্রশাসনের বিষয়টিও সংযোজিত হয়। বাংলায় আলিবর্দী পদ্ধতির কথা আলোচনাকালে রেজা খান উল্লেখ করেছেন, জমিদারগণ প্রকৃত পুলিশব্যবস্থা চালু রাখতেন এবং এর সর্বপ্রকার দায়িত্বের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।[১০০] এই কার্যক্রম ক্ষুদ্র জমিদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।[১০১] তৎকালীন পুলিশ-প্রশাসন সম্পর্কে পর্যালোচনাকালে একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে গ্রামীণ বাংলার পুলিশ প্রশাসনের সাথে এ যুগের পুলিশব্যবস্থার কোন মিল পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আদায়কারী কিছু কর্মচারীর উপর এই পুলিশী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। যেমন, *গ্রাম-সরঞ্জামী পাইক* জমিদারের খাজনা আদায়, জমির ফসল পাহারা দেয়া, রাহাজানি বন্ধ করা এবং হাট-বাজার ও মেলাস্থলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকতো।[১০২] বর্ধমান, রাজশাহী, নদীয়া এবং দিনাজপুরের মতো বড় জমিদারিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একদল কর্মচারী নিয়োজিত থাকলেও ক্ষুদ্র জমিদারিতে সঙ্গত কারণে একই কর্মচারী খাজনা আদায়ের পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টিও দেখাশুনা করতো। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, কিছু কিছু প্রধান কর্তৃক প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য এবং সুবার কোন কোন এলাকার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল ভিন্নতর। বাংলার পশ্চিম সীমান্তের কিছু লুণ্ঠনজীবী জমিদারের লাঠিয়ালবাহিনী শান্তি ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতো।[১০৩] বীরভূম জেলায় দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতিকারীদের উপদ্রব হতে নদীর ঘাট ও গিরিপথ প্রতিরক্ষার কাজে অনেক দুর্গ স্থাপন করা হয়। সামরিক ছাউনির মতো *থানা* স্থাপন করে থানাদার ও তার অধীনস্ত *চৌকিদার, ঘাটওয়াল* পুলিশী কার্যক্রম ও রাজস্ব আদায় সম্পাদন করতো।[১০৪] ১৭২৫ সাল থেকে বর্ধমান জমিদারির রাজস্ব আদায় ও ফৌজদারি কার্যক্রম প্রতিপালনে রাজা সরাসরি নবাবের নিকট জবাবদিহি করতেন, কেবল ডাকাতি জাতীয় গুরুতর ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব কাটোয়ার ফৌজদারকে প্রদান করা হতো।[১০৫]

---

১০০. Reza Khan's Note, February, 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 35.

১০১. চাকলা যশোহরের হোগলা পরগনার জমিদার ও চৌধুরী প্রাণকিষেণ সিংকে প্রদত্ত সনদ, B. M Add MSS., 19505, 10a, এবং রেজা খান কর্তৃক মালদহের জমিদার ও চৌধুরীদের কাছে জারিকৃত সমন, P C. C R. M , March 7, 1771, IV, 61, ঘটনার বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে।

১০২. W. W, Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol IV. (London 1875), 84.

১০৩. D. J. McNeil, *Report on the Village Watch of the Lower Provinces of Bengal* (Calcutta 1866), 63; N Majumdar *Justice and Police in Bengal* (Calcutta, 1960), 51-52.

১০৪. C. Keating to Cornwallis, October 16, 1789, *West Bengal District Records*, Birbhum, 18; W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London 1897), 326-327.

১০৫. Burdwan Diwan's Representation, April 28, 1775, B. R. C., May 29, 1775, R49/53.

বড় বড় জমিদারিতে দুর্গাকার সেনাছাউনির মতো থানা গড়ে তুলে নিয়মিত পুলিশব্যবস্থা চালু রাখা হয়।[১০৬] এ কার্যক্রমে থানাই ছিল সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এর অধীনে চৌকি বা ফাঁড়ি নামে উপকেন্দ্রের কর্মচারীদের নাম ছিল *চৌকিদার, পাইক* ও পিয়ন। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানে ১০০টি থানা এবং ৪২২টি চৌকি ছিল। এতে ৪৪৬ জন চৌকিদার, ১০৭৪ জন *পাইক* ও ৭৫ জন পিয়ন কর্মরত ছিল।[১০৭] এই সকল চৌকির মুখ্য দায়িত্ব ছিল অপরাধীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা, জনপথ ও নৌপথ নির্বিঘ্ন রাখা এবং ঘটমান অপরাধের খবর নিকটবর্তী থানায় প্রেরণ করা।[১০৮] শহর বা লোকালয়ে প্রবেশকারী আগন্তুকদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তালিকাভুক্ত করা চৌকিদারদের দায়িত্ব ছিল। অন্যদিকে চৌকিদাররা উদ্ধারকৃত মালামাল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতো।[১০৯] মুর্শিদকুলী খান যখন নতুন থানা সংস্থাপন করেন, পুলিশ প্রশাসনের এই কাঠামো তখন আরও শক্তিশালী হয়।[১১০]

মুগল আমলে জমিদারি এলাকায় স্থাপিত থানা সহ পুলিশ প্রশাসনে ফৌজদারের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। নবাবি বাংলায় বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধের পর থানাগুলি জমিদারদের অধীন হয়ে পড়ে। ১৭৭৬ সালে রেজা খান লিপিবদ্ধ করেন—'বর্তমানে ফৌজদারগণ জমিদার বা তালুকদারদের নিকট হতে আদৌ কোন সহায়তা পান না'।[১১১] প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি আমলে প্রবর্তিত অস্থায়ী রাজস্ব ইজারাদারি ব্যবস্থা চালুর পর প্রচলিত পুলিশব্যবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস্ প্রবর্তিত পাঁচশালা ইজারাদারি ব্যবস্থায় পুলিশী দায়িত্ব পালন থেকে ইজারাদারদের অব্যাহতি দেয়ার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। এ যাবৎকাল জমিদারগণ যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছিলেন, ১৭৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর জারিকৃত পুলিশ রেগুলেশনবলে তা একেবারে রহিত করা হয়।

---

১০৬. J. N Sarkar, *Bengal Nawabs* (Calcutta 1952). 4; T. Raychaudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir*, (Delhi 1969). 12.

১০৭. B. R. C., July 8, 1784, R50/52; L. Mercer to B. R., December 6, 1790; Board of Revenue and Judicial Consultations, March 18, 1971, R127/72.

১০৮. ভারতচন্দ্র রায়, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, (কলিকাতা ১৯৮৯), ৬৭

যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসা করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও
কি জাতি কি নাম ধর কোন ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও।

১০৯. J. Z. Holwell, *Interesting Historical Events*, I., (London london 1766), 199.

১১০. F. Gladwin (tr.), *Ain*, II, 108.

১১১. C. P. C., V. 422

ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও বিচারব্যবস্থা

এলাকার নির্বাহী প্রধান হওয়ায় মুখ্য জমিদারগণ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১১২] ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিপীড়িত প্রজাগণ সরাসরি সম্রাটের নিকট অভিযোগ করতে পারতো। একবার আওরঙ্গজেবের নিকট দায়েরকৃত এক মুসলিম প্রজার অভিযোগ আঞ্চলিক হিন্দু রাজার (সুসং) নিকট অবিলম্বে বিচার করার জন্য পাঠানো হয়।[১১৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৯৮ সালে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি দেয়ার সময় তারা সেখানকার জমিদারদের বিচারকের ভূমিকায় দেখতে পায়।[১১৪] প্রকৃতপক্ষে নিজ এলাকায় আধিপত্য রক্ষার স্বার্থেই জমিদারদের বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি নিহিত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মকাণ্ড জমিদারদেরকে তাদের প্রজা ও কর্মচারীদের উপর তদারকি করার এক মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। জমিদারদেরকে এ ব্যবস্থাপনার বাইরে রাখা হলে কৃষক ও অধীনস্তদের উপর তাদের ক্ষমতা খর্বিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রজাদের উপর বিচারক্ষমতা প্রয়োগের কল্যাণকর দিকও ছিল। এর ফলে জমিদারিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতো না। জমিদারগণ তাদের এলাকায় জজ-মেজিস্ট্রেসি ব্যবস্থা চালু রাখায় আর্থিকভাবে লাভবান হতো এবং লাভের কারণে আদালত স্থাপনে উৎসাহিত ছিল। আদালতে জারি করা জরিমানা জমিদার হিসেবে তাদেরই প্রাপ্য বলে ধরে নেয়া হতো।[১১৫] মামলাগুলো ফৌজদার বা থানাদারের হাতে গেলে জমিদারের আর্থিক ক্ষতি হতো। জমিদারি এলাকায় চুরি বা ডাকাতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে জমিদার বাধ্য ছিলেন।[১১৬] তবে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদারগণ সাধারণত তাদের কাছারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ডেকে সান্তনামূলক কথাবার্তা বলে ক্ষতিপূরণ প্রদান বিলম্বিত করতেন অথবা ক্ষতিগ্রস্তকে চুপ করিয়ে দিতেন। এমনকি মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমে জমিদারগণ কাজীর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করতেন।[১১৭] প্রশাসনিক বা ফৌজদারি প্রশাসনে বড় জমিদারদের অংশগ্রহণের কারণে বিচার ব্যবস্থাপনার ভাগ ক্ষুদ্র জমিদারগণও পেত। *চৌধুরীরা* (পরগনা প্রধান), যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জমিদার[১১৮], তাদের এলাকার বর্ণ সংক্রান্ত জটিলতা,

---

১১২. N. Manucci, *Storia Do Mogar* III, W. Irvine (tr.) (London 1908), 48.

১১৩. T. Raychaudhuri, *Akbar and Jahangir*, 22-23.

১১৪. J S. Stavorinus, *Voyages to East Indies*, (London, 1798), 459; W. Bolts, *Consideratins on India Affairs*, I. (London 1772), 80-82.

১১৫. The Seventh Report ... *Reports, House of Common*, IV, 324; Home Miscellaneous Series, (পরবর্তীতে H. M. S.), 325. 9.

১১৬. রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, I.

১১৭ *P. C. C. R. M.*, January 20, 1772, IX, 61; C. P. C., II. 312

১১৮. I. Habib, Agrarian System, 29; B. R., Grover, "Nature of Land Rights in Mughal India", *Indian Economic and Social History Review*, 1963, I., 14.

চুরি বা ক্ষুদ্র ঝগড়াঝাটির বিচার করে জরিমানা ধার্য করতেন।[১১৯] কোন সুনির্দিষ্ট আদালত না থাকায় ক্ষুদ্র জমিরারগণ জেল বা মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মত অপরাধের মামলা নিকটস্থ থানাদার বা কাজীর কাছে প্রেরণ করতেন। জমিদারদের কাছারিতে বর্ণভিত্তিক বিবাদের বিচার করা হতো। উচ্চ বর্ণের জমিদারগণ এই সকল বর্ণভিত্তিক বিবাদ মিটাবার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।[১২০] কিন্তু মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহালের আধা-স্বাধীন সদগোপ রাজা নিম্নবর্ণের হওয়া সত্ত্বেও জরুরি কারণে নিজেরাই বর্ণ সংক্রান্ত বিবাদের জটিলতা নিরসনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।[১২১] সাধারণত এই সকল বর্ণ সংক্রান্ত জটিলতা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি করা হতো। কিন্তু পঞ্চায়েত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলে বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হলে জমিদারের কাছে আপীল করা যেত। এ অধিষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়াও অনেক জমিদার নিয়ম ভঙ্গ করে জরিমানাকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার লোভে নিজেরাই এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতেন।[১২২]

একই ব্যাক্তর হাতে নির্বাহী ও বিচারক্ষমতা প্রত্যর্পণ করায় অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল। যদিও জমিদারি বিচার ছিল সহজলভ্য, দ্রুত এবং সুলভ, কিন্তু এর সাথে জমিদার বা তার আমলার ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকলে জমিদার নির্দ্বিধায় বিচারের পাল্লা তার নিজের বা নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে একটি শক্তিশালী প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর প্রশাসন দৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। সলিম আল্লাহ লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খানের সময় কোন জমিদার বা আমলা অত্যাচার করলে শাস্তি পেতে হতো।[১২৩] আলিবর্দী খানের কঠোর শাসনামলে জমিদারগণ দ্রুততার সাথে অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন।[১২৪] কিন্তু সম্রাটের ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এবং পরবর্তী নবাবদের দুর্বলতা ও অনীহার ফলে রায়তরা তাদের আঞ্চলিক ভূস্বামীর কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে। এমনকি তালুকদার, তরফদার বা তপ্পাদাররা জমি হারাবার ভয়ে শক্তিশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস পেত না।

ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও সামরিক দায়দায়িত্ব

মুগল আমলে জমিদারদের, বিশেষ করে বৃহৎ জমিদারদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সামরিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হতো। সামরিক গভর্ণর হিসেবে ফৌজদার অল্প কিছু সৈন্য সহ সুবার প্রাথমিক সুব্যবস্থার দায়িত্বে থাকতেন। কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বহিঃশক্তির

---

১১৯. George Vansittart Papers, Dep. B. 69, 121; N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 11, 15.

১২০. L. S. S. O'Malley, *Indian Caste Customs* (Cambridge 1932); 72; ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী, ১২

১২১. B. D. G., Midnapur, 57, 60.

১২২. L. S. S. O'Malley, Op. Cil.

১২৩. F. Gladwin (gr.), *Twarikh.*, 115-116.

১২৪. Reza Khan's Note, February, 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 345.

আক্রমণের সময় ফৌজদারদের সহায়তা করা অত্যাবশ্যক ছিল।[১২৫] মুগলরা আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের ক্ষমতা খর্ব করে জমিদার শ্রেণীভুক্ত করলেও তাদের পূর্বের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পূর্ণ খর্ব করে নি। সম্রাটের প্রত্যাশা এবং আঞ্চলিক প্রধানের স্বার্থের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ ছিল উভয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন।[১২৬]

এ নীতির অনুসরণে জমিদারগণ সম্রাটের কার্যক্রমে মনসবদার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতেন এবং মনসবের গুরুত্ব অনুযায়ী জায়গীর প্রদান করা হতো। *আলমগীরনামায়* উল্লেখিত আছে যে চট্টগ্রামের এক জমিদার মুনওয়ারকে ১৫০০ *সওয়ার* (ঘোড়সওয়ার) মনসব দেয়া হয়েছিল।[১২৭] চট্টগ্রামের কিছু জমিদারের হাজারী উপাধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এরাও মনসবদার ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মনসবদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২৮] সম্রাট শাহ্ আলম ১১৭২ হিজরীতে (১৭৫৮-১৭৫৯ খৃস্টাব্দ) মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্র রায়কে পাঁচ হাজারী ঘোড়াসওয়ারের মনসবদারি দান করেন।[১২৯]

বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে মুগল শাসকগণ তাঁদের সামরিক শক্তির জন্য জমিদারদের উপর নির্ভর করতেন। অন্যদিকে মুগলরা নৌযুদ্ধ বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞ ছিল না, অথচ বাংলার নদীবিধৌত অঞ্চলের বিদ্রোহ-বিপ্লব দমনে এবং সুবায় পরিব্যাপ্ত মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচার প্রতিরোধে নৌশক্তির প্রয়োজন ছিল।[১৩০] মুগলরা বাংলার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে উপনীত হয়ে দেখতে পেল, কেবল শুষ্ক মৌসুম ছাড়া তাদের ঘোড়সওয়ার বা গোলন্দাজ বাহিনী একেবারে অকার্যকর। পরবর্তী শাসকগণ আঞ্চলিক পদাতিক ও *নৌয়ারা* (যুদ্ধের নৌকা)-এর উপর নির্ভর করতেন।

এ ছাড়াও মুখ্য জমিদারদের অর্ধ-স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় তাদের সামরিক শক্তির মধ্যে। নিজ নিজ রাজ্যের প্রধান হিসেবে রাজাদের দাবি প্রভু হিসেবে তাঁদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্রাটের রাজস্ব আদায়কারীর ক্ষমতা বা অধিকারের সংমিশ্রণকে অনিবার্য করে তোলে। তাছাড়া সে সময়ে খাজনা আদায়, খাজনা বহনের দায়িত্ব পালন এবং প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল।

জমিদারগণ তাদের সামর্থ্য, শক্তি ও নিজ এলাকার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের জন্য সংগ্রহ করে রাখতেন। আইনের ভাষ্য অনুযায়ী

---

১২৫. J. Shore's Minute, April 2, 1788 and June 18, 1789, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, 81; N. A. Siddiqi, 35.

১২৬. S. N. Hasan, "Zamindars under the Mughals", in Frykenberg (ed.), *Land Control*, 17, 21.

১২৭. Munshi Muhammad Qazim, *Alamgirnamah*, 956; see also M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, (London 1966), 79.

১২৮. ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী, ৭।

১২৯. "The Territorial Aristocracy of Bengal -The Burdwan Raj", *The Calcutta Review*, LIV, 174.

১৩০. S. Manrique, Traveles . ... II, Luard and Hosten (tr.), Oxford 1927), 278.

সুবা বাংলার জমিদারদের কাছে ২৩,৩৩০ পদাতিক, ৪,০১,১৫০ গোলন্দাজ, ১৭০ হাতি, ৪,২৬০ বন্দুক ও ৪,৪০০টি নৌকা মওজুদ ছিল।[১৩১] *খুলাসাতুত্তাওয়ারিখ* (১৬৯৫)-এর বর্ণানানুসারে সুবাকে ৪২০০ বন্দুক ও ৪৪০০ নৌকাসহ চুক্তি মোতাবেক খাজনা প্রদান করতে হতো।[১৩২] যুদ্ধজয়ের পর সম্রাটের ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীর নিয়মিত চাহিদা স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তবুও জমিদারগণ পদাতিক বাহিনী ও নৌবাহিনীর পাশাপাশি গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী মোতায়েন রাখতেন নিজেদের এবং আঠারো শতকে নবাবের প্রয়োজনে। ফলে ঢাকার নিম্নাঞ্চলের এবং দুর্গসহ সমুদ্র ও উপকূলবর্তী ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম), রাঙ্গামাটি ও সিলেটের জমিদারদের নিয়মিতভাবে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী সরবরাহ করতে হতো।[১৩৩] একইভাবে সুবা বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জমিদারদের নৌ-জাহাজ সরবরাহ করতে হতো। শুধু জমির *হিসসাজাত* (ব্যক্তিগত অংশ) উপভোগের বিনিময়ে চন্দ্রদ্বীপ[১৩৪]-এর রাজাকে প্রতি'টিতে ৩২ জন মাল্লাসহ ৪২টি *কোশা* নৌকা সরবরাহ করতে হতো।[১৩৫] সরাইলের জমিদারকে নবাবের নৌবহরে ৪০টি যুদ্ধনৌকা সরবরাহ করতে হতো।[১৩৬] বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পাচেত-এর জমিদার বাংলার পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে এরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঘোড়সওয়ার সহ বড় সামরিক বাহিনী প্রতিপালন করতেন। *ধর্মমঙ্গল*প্রণেতা ও বীরভূমের রাজার উকিল নরসিংহ বসু লিখেছেন, রাজা সকল সময় উন্নতমানের ২০০০ ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবং ১২০০ ঢালী প্রতিপালন করতেন।[১৩৭] এই সংখ্যা হয়ত অতিরঞ্জিত নয়, কারণ বীরভূমের বাজা আসাদুজ্জামান নবাব মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ২০,০০০ পদাতিক ও ৫০০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।[১৩৮] বিষ্ণুপুরের রাজার ঘাটওয়াল-এর অধীনে ৫,৪৭৬ জন সশস্ত্র যোদ্ধা গিরিপথগুলি রক্ষা করতো।[১৩৯] ১৭৬৭ সালে মানভূম হতে প্রেরিত এক পত্রে জানা যায় যে, পরগনা পাহারা দেবার জন্য যেকোন জমিদারেরই ২০০০ জনের কম পেশাদারি যোদ্ধা ছিল না।[১৪০] জঙ্গলমহল জমিদারদের সামরিক শক্তি তাদের প্রজাদের উপর নির্ভর করতো, যাদেরকে তারা মুখ্যত প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

---

১৩১. H. S Jarrett (tr), Ain , 129.

১৩২. Khuasatu-t-Tawarikh, J N Sarkar (tr.), *The India of Aurangzib*, 46

১৩৩ J. Grant, Historical and Comparative Analysis, W K Firminger (ed), *Fifth Report*, II, 203

১৩৪. চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা সরকার বাকলার একটি পরগণা ছিল। পরবর্তীতে তা বাখরগঞ্জ বেশীর ভাগে পরিণত হয়।

১৩৫. W. Douglas to B R., April 6, 1790, B R P., April 29, 1790, R 71/24

১৩৬. Eastern Bengal District Gazetteers, Tippera, 114

১৩৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খন্ড, (কলিকাতা ১৯১৪), ৪৫৬।

১৩৮. Haji Mustafa (tr), Seir, 395

১৩৯. B M Add. MSS., 29, 088, 16.

১৪০. *Bengal District Records, Midnapur*, I, 109.

করতেন।[১৪১] সুবার অন্যান্য স্থানে বৃহৎ জমিদারগণ তাদের নিজেদের প্রয়োজন ও মর্যাদা অনুযায়ী নিয়মিত বাহিনী প্রতিপালন করতেন। এছাড়াও তারা জরুরি প্রয়োজনে চাষীদের নিয়ে অনিয়মিত বাহিনীও গঠন করতেন। ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ মূলত অনিয়মিত পদাতিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতেন বলে প্রতীয়মান হয়।[১৪২]

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে জমিদার শ্রেণী সামরিক শক্তি রক্ষাণাবেক্ষণে যথেষ্ট যত্নশীল থাকলেও সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সাথে জমিদারদের উপর নবাবের কর্তৃত্ব কমে যেতে থাকে, ফলে জমিদারগণ প্রয়োজনের সময় সৈন্য সংগ্রহ ও সরবরাহে অনীহা প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন নি।

আঠারো শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধনৌকা হ্রাসের কারণে ব্যক্তিগত জায়গীর ও *চাকরান* জমি পুনর্গ্রহণ করা হয়। এর ফলে অবশ্য জমিদার শ্রেণীর এলাকা সঙ্কুচিত হতো না, কারণ জমির মালিকানা জমিদারদেরই থাকতো, বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে তারা খাজনা দিতেন। কিন্তু জমিদারদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়ায় কিছু কিছু এলাকায় প্রজাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে তাদের নিজেদের জমিদারিও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, কারণ বহু নিয়মিত সৈনিক কর্মচ্যুত হয়ে চুরি-ডাকাতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১৪৩]

জমিদার শ্রেণী ও সমসাময়িক সমাজ

প্রাক-বৃটিশ যুগে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে ক্ষয়প্রাপ্ত মুগল শাসনের শূন্যস্থান পূরণে এই জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সীমান্তবর্তী জমিদারগণ, যারা সদাসর্বদাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন, তারা ছাড়াও সুবার অভ্যন্তরে রাজস্ব আদায়কারী ভূম্যধিকারীগণ শক্তিশালী হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা নিজেরাই এক নিজস্ব জমিদারি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে এবং রাজসভা ও ব্যক্তিগত জীবনধারা তৈরি করে তাদের আড়ম্বর ও বৈভব নিয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত থাকতেন। জমিদারগণ তাদের এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকার প্রজাদের উপর সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন, যার কিছু আইনানুগ হলেও বাকীগুলো প্রচলিত বিধানবলে মেনে নেয়া হতো। মধ্যযুগের সমস্ত প্রবণতা জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত বিবরণের সত্যতা প্রতিভাত হয় যখন দেখা যায় যে, প্রজারা জমিদারদেরকে রাজা বা মহারাজা উপাধিতে আখ্যায়িত করতো। প্রচলিত বিধান

---

১৪১ E. Baber to B R , February 6, 1883, *Bengal District Records, Midnapur IV*, 107

১৪২ J Rennell to R, Becher, December 9, 1770, P. C. C R. M , December 20, 1770, II, 98.

১৪৩. Hasting' s Minute, B. R C , 19, 1774, R 49/54.

অনুযায়ী জমিদারের সাথে দেখা করতে গেলে প্রজাকে নজরানা নিয়ে যেতে হতো। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্য সমাজের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

উন্নয়ন কার্যক্রম বা শিক্ষাবিস্তার সংক্রান্ত সমাজকল্যাণমূলক কাজ তদারকি করার জন্য কোন বিশেষ বিভাগ না থাকায় মুগল শাসকগণ গ্রামাঞ্চলে এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার বা এজন্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জমিদারদের উপর নির্ভর করতেন। চলাচলকারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সম্রাটের মতো উৎকণ্ঠা জমিদারদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।[১৪৪] সম্রাটের মনোবাঞ্ছা পূরণ, ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অথবা নিজেদের নাম কীর্তিত করতে জমিদারগণ সড়ক, সেতু ও সরাই নির্মাণ করতেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সরকারের নির্দেশের পাশাপাশি রায়তদের প্রয়োজনে এবং সেই সাথে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে জমিদারগণ পুকুর, দীঘি ও খাল খনন করাতেন, কৃষির উন্নয়নে বাঁধ তৈরি করাতেন। অনেক জমিদার শিক্ষার উন্নয়ন সাধনে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পাঠশালা, টোল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম ও রওশনাবাদের জমিদারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৪৫] তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটে। সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতেরও যেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আবার তাদের ব্যক্তিগত বদান্যতারও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাক-বৃটিশ যুগের জমিদারগণ তাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন না। কানুনগো বা চৌধুরী পদে নিযুক্তরাও তাদের নিজেদের এলাকার জমিদার থাকতেন। নাগরিক জীবনের মোহনীয় রূপ বাংলার জমিদারদের অনুপ্রাণিত করতো না এবং জমিদারদের প্রকাশ্য কার্যক্রম সাধারণত তার 'ক্ষুদ্র রাজত্বের' অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিছু মাত্রায় তাদের বৈভব ও রীতিনীতি ছিল নবাব ও সম্রাটের দরবারের সংস্পর্শে পরিস্ফুটিত। বড় জমিদারদের দরবার নবাবের দরবারের অনুকরণে সাজানো হতো এবং পোষাক, খাদ্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে বিদ্যমান ছিল মুগল প্রভাব।[১৪৬] এভাবেই মুগল সংস্কৃতির সাথে দেশীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হতে থাকে।

বেশ কিছু জমিদারের বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের কারণে স্থানীয় হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ঘটে। সকল জমিদার ও উচ্চপদস্থদের চাহিদার কারণে সূক্ষ্ম সুতী ও রেশম বস্ত্রশিল্প, অলঙ্কারশিল্প ও অলঙ্কৃত অস্ত্রশিল্পের প্রসার হতে দেখা যায়। নদীয়ার বুররান ও শান্তিপুর অঞ্চলের সূক্ষ্ম তুলা ও রেশম বস্ত্রশিল্প নদীয়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি এ অঞ্চলের কুশলী বয়নকারীদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ঘোড়াঘাট,

---

১৪৪. W. Irvine (tr.), Storia, 116; Naib Diwan's Note, *P C. C R. M.*, April 11, 1771, V. 54.

১৪৫. Ghulam Hussain Salim, *Riad-al-Salatin*, Abduz Salam (tr.), (Calcutta 1904), ২৫৭; দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য, ২, ১৮৫৪।

১৪৬. D. C. Sen, *Glimpses of Bengal Life*, (Calcutta 1925), 39-40, 45-46.

সন্তোষ ও দিনাজপুরের জমিদারদের বুদ্দল এলাকার *মলমল, সাননো* আর *তাজীব* উল্লেখের দাবি রাখে।[১৪৭] 'হিন্দুস্থানের কোমল বিলাসবহুল রপ্তানীকৃত রেশমের তিন-চতুর্থাংশ উৎপন্ন হতো রাজশাহী জমিদারিতে'।[১৪৮]

অন্যদিকে মুখ্য জমিদারদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের কারণে সমাজে অর্থের চলাচল গতিশীলতা পায়। জমিদারদের পারিবারিক জীবন কোন অংশেই 'জাঁকজমকপূর্ণ দরবার'-এর কম ছিল না। নানা অনুষ্ঠানের জাঁকজমক তাদের উচ্চতর অবস্থানের পরিচায়ক ছিল। তারা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যয় করতেন এবং সে কারণে অবধারিতভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।

জমিদারদের বিভিন্ন ভবন, দুর্গ, মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ উপলক্ষে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। জমিদারগণ পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজ নিজ শহরকে চমকপ্রদ করে সাজাতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের 'শিবনিবাস' ও রাজা রাধাবল্লভের 'রাজানগর' কেবল নিপুণ শিল্পীর স্থাপত্যশিল্পই প্রদর্শন করে না, জমিদার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা এ ধরনের কাজে জমিদারের পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করার মতো মানসিকতাও প্রকাশ করে।[১৪৯] বিলাসদ্রব্য ব্যবহার এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভবননির্মাণ কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরস্টার বলেন :

> ব্যক্তিগত সম্পদ সাধারণত স্থানীয়ভাবে আহরিত ও ব্যয়িত হতো। কঠোরতা ও অত্যাচারের মাধ্যমে সংগৃহীত হলেও তা তাদের অনেক বিলাসিতার খাতে ব্যয়িত হতো, ফলে মুদ্রাসঙ্কট ছাড়াই দেশের উন্নতি ও অলঙ্করণ হতো।[১৫০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিভিত্তিক শ্রেণীর জীবন ও কর্মকাণ্ড গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কোম্পানি সরকার কর্তৃক জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা লোপ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাদি হ্রাস সমাজের উপর, বিশেষ করে ভূমিভিত্তিক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী এবং তাদের অনুগৃহীতদের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত নিরীক্ষা থেকে বহু ধাপবিশিষ্ট পিরামিডের আকারবিশিষ্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চিত্রটি প্রতিভাত হয়। সর্বোচ্চ ধাপে ছিলেন সম্রাট, যাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন

---

১৪৭. কে, রায়, ক্ষীতিশবংশাবলীচরিত (কলিকাতা ১৮৭৫), ৩৫।

১৪৮. J. Grant, *Historical and Comparative Analysis*, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, 194.

১৪৯. D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta 1911), 679-680.

১৫০. G. Foster, *A Journey from Bengal to England*, I (London 1808), 6.

সুবাদার বা নবাব। পরবর্তী ধাপে ছিলেন জমিদার এবং স্বাধীন তালুকদার আর তৃতীয় ধাপে ছিলেন সরকার বা জমিদার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্মকর্তা। চতুর্থ ধাপে ছিলেন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা বিভিন্ন প্রাধিকার প্রাপ্ত। পঞ্চমত ছিলেন গ্রামপ্রধান ও বিত্তশালী রায়ত (*মণ্ডল, পরামানিক, বাসুনিয়া, শাহরায়ত*)। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সাধারণ কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমজীবী (*কিশান, মজুর*)। এই সকল পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপাদান প্রাক-আধুনিক কৃষিভিত্তিক চূড়ান্ত আর্থ-রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসকে রূপায়িত করে। আঠারো শতকের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক শ্রেণীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুগল শাসনামলে বাংলার রাজস্ব আদায়ে মধ্যশক্তির নিয়োগ এবং পরগনা নামে প্রশাসনিক ও রাজস্ব অঞ্চল গঠনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের একক হিসেবে গ্রাম ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জমিদারগণ কর্তৃক গ্রামপ্রধানের অধিকার খর্ব হওয়ায় ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আঠারো শতকের প্রারম্ভে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চ‌ের মত শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাব সুবা বাংলায় ছিল না। সুবা বাংলা অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কেবল জমিদার শ্রেণীর কারণেই নয়, অনুক্রমিক নবাবদের বিচক্ষণ শাসনের কারণেও তা সম্ভব হয়েছিল। উৎপাদিত পণ্যের অংশ নিয়ে রাজকীয় সরকার ও জমিদারদের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই দুই দলই অর্থনৈতিক শোষণের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ভূমিমালিকদের মধ্যে শোষণপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল গণস্বার্থবিরোধী কার্যক্রমে কৃষক শ্রেণী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নত প্রশাসনিক ক্ষমতার উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারী শ্রেণীকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সার্বিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণীর ভূম্যধিকারীকে অধিকতর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক শাসকগণ প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে দিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারে সমর্থ হয়। কিন্তু অন্যদিকে নবাবদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং শক্তিশালী জমিদারগণ তাদের অবস্থা সুসংহত করতে ব্যাপৃত থাকে।

মুগল কর্তৃত্বের ক্ষয় ও উপর্যুপরি মারাঠা অভিযানের ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম নবাবি শাসনের কারণে ভূম্যধিকারী শ্রেণী তাদের নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকে। মারাঠা অভিযানের এক পর্যায়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারগণ এত বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের উকিলদের মাধ্যমে মারাঠাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতে সচেষ্ট হন।[১৫১] পরবর্তীতে কোম্পানির সাথে নবাবদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে নবাবের সাথে ঊর্ধতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সম্পর্কেও ফাটল ধরে। ফলে দেখা যায়, কিছু মুখ্য জমিদার পলাশীর যুদ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেদেরকে জড়িত করে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ক্লাইভের সাথে বীরভূম, বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের যোগাযোগ প্রমাণ করে যে তারা তাদের আনুগত্য নবাবের পরিবর্তে

---

১৫১. F Gladwin (tr), *Tawarikh* , 196

ইংরেজদের প্রতি প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে।[১৫২] কিন্তু জমিদারদের স্বার্থ আর ইংরেজদের স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। নবাব বা ইংরেজদেব সাথে তাদের সখ্যতা ততদিনই স্থায়ী ছিল যতদিন তাদের পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। নবাব বা ইংরেজদের সাথে তাদের সখ্যতা ততদিনই স্থায়ী ছিল যতদিন তাদের পরস্পরের স্বার্থ বিঘ্নিত না হতো। যে পত্রে রাজা আসাদুজ্জামান ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন :

> কিন্তু আপনাকে ইহা জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি যে, আমি জমিদার, যদি নবাব আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করেন, আমার সাথে আপনাদের বন্ধুত্ব হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। কথা দিন যে, সেক্ষেত্রে আপনারা আমার স্বার্থ রক্ষা করবেন। এ ব্যাপারে আমাকে লিখে জানাবেন।[১৫৩]

পলাশীর যুদ্ধের কারণে আকস্মিক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কোম্পানিকে দীউয়ানী প্রদানের ফলে জমিদারদের ভাগ্য নবাবদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, কারণ কোম্পানি অন্তত বেশ কিছুকাল প্রচলিত পদ্ধতি ব্যহত না করার নীতি গ্রহণ করে। বাংলার এই অস্থিতিশীল অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের জমিদারগণ তাদের নিজেদের আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা ও প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাহজাদা আলী গওহর (শাহআলম-২)-এর নেতৃত্বে দলবদ্ধ হতে থাকে, এবং বাংলা ও বিহারে তার সামরিক শক্তি প্রয়োগকে তারা স্বাগত জানায়।[১৫৪] বিদ্যমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অসন্তুষ্টি ইংরেজ ও নবাব উভয়েরই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার, অর্পিত জেলাগুলোর জমিদারগণ তাদের অবস্থানকে ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায় এবং এ লক্ষ্যে প্রায়শই কোম্পানির সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মেদিনীপুর জেলা রেকর্ডে এ ধরণের অনেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজদের আধিপত্যবাদ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য বর্ধমানের জমিদার আলী গওহর মারাঠা, এমনকি ফকিরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগসাজশ করেন[১৫৫], যা কিনা পূর্ববর্তী বছরগুলোতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধে নবাবের সাথে একাত্মতা ঘোষণার মতো ঘটনার সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থান। এমতাবস্থায়, কোম্পানি অনুগত জমিদার সৃষ্টির প্রয়াসে বিশেষ অবস্থা মোকাবেলার জন্য সৈন্য সংরক্ষণের খরচ বাবদ এক লক্ষ রুপীর বিনিময়ে পাচেতের বরখাস্তকৃত রাজাকে পুনর্বহাল করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।[১৫৬] অতএব এই সময়ে (১৭৬৩)

---

১৫২ W Tookes' Account, Orme MSS, O V 19, B. M Add MSS, 29, 209, 4, Burdwan Raja's letter Rec , June 27, 1757, Home Miscellaneous Series, 193, 170-171

১৫৩ Rec , June 26, 1757, H M S 193, 196

১৫৪ . Golam Ali Khan, *Shah Alamnamah*, I, (Calcutta 1912), 115, 145, Haji Mustafa (tr), Seir, 332

১৫৫ Captain A. White to Select Committee, December 29, 1760; S S. C., January 5, 1761, R/A, 3

১৫৬ Select Committee Consultations, October 8, 176', J Long, *Selections*, 569

মীর কাশিম বীরভূম, বর্ধমান এবং নরহাট সমাই[১৫৭]-এর রাজাদের ঔদ্ধত্য সহ্য না করে তাদেরকে আক্রমণপূর্বক পরাজিত করেন।[১৫৮]

এভাবেই নবাবি আমলে ভূম্যধিকারী সমাজে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময়কালে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদারগোষ্ঠীর লক্ষণীয় উত্থানে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। আসলে অন্তবর্তী'কাল বলে এ সময়টা ছিল একদিকে নবাব এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরপক্ষে নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সংঘাতের পর্যায়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে এতদঞ্চলে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকায় তারা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে ভিন্নতর আচরণ করতো। একারণেই বিশেষত আঠারো শতকের ৫০ এবং ৬০-এর দশকে স্বার্থের সংঘাত স্পষ্টতর হয় এবং প্রধান জমিদারগণ তাদের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নতুন প্রভুদের চাপে অতিষ্ট হয়ে পড়ে। দীউয়ানির পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর কোম্পানি সরকার ভূস্বামীগোষ্ঠী এবং রায়তদের সাথে প্রথামাফিক স্থানিক ক্ষমতা ভাগাভাগির অবসান ঘটায়। সামরিক ও পুলিশী দায়িত্ব হারিয়ে বড় জমিদারদের ক্ষমতা নেহাতই রাজস্ব আদায় ও জমা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিশেষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) রাজস্ব ও ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে তা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

১৫৭. বিহারে অবস্থিত।

১৫৮ Haji Mustafa (tr.), *Sier*, 395-396.

মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

জগদীশ নারায়ণ সরকার*

আকবরের আমলে মুগলদের বাংলা বিজয় ছিল অসম্পূর্ণ। বিজয়ের পূর্ণ কার্যকারিতা অনুভূত হয় জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে। বাংলায় মুগল শাসন কিছু নতুন শক্তির বিকাশ সূচিত করেছিল, যা বাংলার জীবনযাত্রা বহুলাংশে পরিবর্তন করে দেয় এবং যার প্রভাব এখন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে বিদ্যমান। বাংলায় মুগল শাসনের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের বিলোপ ঘটে এবং কেন্দ্রীয় শাসনমুখী প্রবণতা প্রকাশ পায়। আঞ্চলিক মানসিকতার পরিবর্তে রাজনৈতিক সংহতির মনোভাব গড়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় ও বিদগ্ধ শাসন বাংলার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়। এর ফলে বাংলা একই রকম শাসনব্যবস্থা, আইন, সরকারি ভাষা, কর্মচারী ও মুদ্রা নিয়ে সর্বভারতীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। এই কালপর্বের প্রতিভাবান শাসকগণ বাংলায় তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাজনৈতিক সংহতির কারণে মুগল আমলে দীর্ঘকাল শান্তি বজায় ছিল, যার ফলে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এটাই বাংলায় মুগল শাসনের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুগলদের বাংলা জয়ের অব্যবহিত পরে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয়, যা মানুষের জীবনযাত্রাকে বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও পরিশ্রমী তুর্কী, মুগল, ইরানী এবং অন্যান্য জাতির অনুপ্রবেশের ফলে বাংলায় এক নতুন শক্তি ও সামর্থ্যের জাগরণ ঘটে। ইসলাম নতুনভাবে জন্মলাভ করে। ভ্রাম্যমাণ সাধু ও ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষিত শাসক,

* অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৯১ সনের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি এ অধ্যায়টি রচনা সম্পন্ন করেন।

আরবি ভাষায় পারদর্শী মুসলমান পণ্ডিত, উলেমা, কবি, ডাক্তার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ চাকুরির আশায় এই প্রদেশে আগমন করেন এবং এখানে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির প্রসার ঘটান। বাঙালি মুসলমান সমাজ এই সমস্ত উৎস থেকে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করেছিল। সতেরো শতকে বাংলার সাথে পশ্চিমের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারলাভ করে এবং বাংলা ও পারস্যের মধ্যে সমুদ্রপথে যাতায়াত স্থলপথের তুলনায় খুবই সহজ ও লাভজনক হয়ে উঠে। পারস্য থেকে শিক্ষিত শিয়া পণ্ডিত, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কারিগরেরা বাংলায় আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পারস্য দেশে সাফাভীদের পতন, অসহনীয় সরকারি উৎপীড়ন এবং শাসনের অব্যবস্থার ফলে বহু পারস্যদেশীয় শিয়া তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। বাংলায় শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শাসক মুর্শিদকুলী খানের সময়ে এই অনুপ্রবেশ চরম আকার ধারণ করে। এর ফলে বাংলার সমাজে ও সংস্কৃতিতে নতুন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বাংলার সঙ্কীর্ণ একাকীত্ব ঘুচে যায়।"[১]

এতেই শেষ নয়। উত্তর ভারতের বহু পর্যটক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী ও সৈনিক এবং অন্যান্য পর্যায়ের মানুষও বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারাও এখানে এসে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমানের জমিদার পরিবার, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের মাড়োয়ারি ব্যাঙ্কার পরিবার, কলকাতায় আমিরচাঁদের (উমিচাঁদ) পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী পরিবার এবং পাটনার মহারাজা সিতাব রায়ের (যিনি কোম্পানিশাসনের প্রথমদিকে নায়েব-নাজিম পদে উন্নীত হয়েছিলেন) উল্লেখ করা যায়। পূর্বে জলবায়ুর কারণে বাংলাকে বলা হতো দোজখ-ই-পুর আজনিমাত (উত্তমদের জন্য দোজখ)। কিন্তু মুগল শাসনামলে এই দুর্নাম ধীরে ধীরে ঘুচে যায়। পরবর্তীকালে বাংলা জান্নাত নামে অভিহিত হয়, যার ফলে দলে দলে বিদেশের লোক বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংমিশ্রণের ফলে বাংলায় অনিবার্যভাবে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঐক্যপ্রক্রিয়া সুলতানদের আমলে আরম্ভ হয়েছিল[২], কিন্তু মুগলদের সময়ে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অতএব একে মুগল ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রথমদিকে বাংলার মুসলমান বিজেতাগণ একই ধর্ম, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে অটল প্রাচীরের মতো বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের শাসনামলে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের রাজবংশের পর্যায়ক্রমিক

---

১. J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. II, (Dhaka 1948), 224-25.

২. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা ১৯৮২), ১৩-১৪।

পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁরা ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজ ও খাজনাসংগ্রহ প্রথা অক্ষুণ্ন রাখেন। ফলে সামাজিক একীভবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সামাজিক একীভবন বলতে সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ একত্ব বোঝায় না; বিভিন্ন জীবনধারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাশাপাশি সক্রিয় থাকে, যার বহু নিদর্শন সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

মুসলিম প্রভাব হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষ ও সাধু সম্প্রদায় ব্যতীত উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক আচারব্যবহারে প্রতিফলিত হয় এবং মুসলমানরাও সমভাবে ভারতীয় খাদ্য, পোশাক ও অন্যান্য অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুগল আমলে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও হস্তশিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাদের কেউ অভ্যাস ও প্রয়োজনের তাগিদে নিরামিষভোজী আবার কেউ আমিষভোজী ছিল, যা এখনও বর্তমান। সাধারণত কোন এলাকায় উৎপন্ন প্রধান শস্য উক্ত এলাকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল। ম্যানরিকের ভাষায়, বাংলায় সব সম্প্রদায়ই প্রতিদিন ভাত, রাতভর পানিতে ভেজানো ভাত (পান্তাভাত), লবণ, সব্জি (শাক) সহযোগে আহার করতো। সে রীতি এখনও প্রচলিত আছে। অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তিরা ঘি, মাখন, দুধ, বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাদ্য ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করতো। সতেরো শতকের শেষভাগে বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। মুকুন্দরাম উচ্চবংশীয় হিন্দুদের সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। মুসলমানরা সাধারণত ভাজা রুটি এবং মুরগি বা গোমাংস সহযোগে আহার করতো। কিন্তু উচ্চবংশীয় ও ধনবান মুসলমানরা চাউলজাত খাদ্য ও প্রায় পঞ্চাশ রকমের খাদ্য গ্রহণ করতো, যার মধ্যে থাকতো বিরিয়ানি, কিমা, পোলাও, দমপোক্ত মুরগি, কাবাব, সামুসা, বাকরখানি, বরফ বা মাখনসহ তাজা ফলমূল এবং ভাতের পুডিং।

মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার পর ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত ধনী হিন্দুদের খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় আমিষ জাতীয় খাদ্য, যেমন পোলাও, বিরিয়ানি, কাবাব ও কোপ্তা স্থান পেয়েছিল এবং জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়িতে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ধনবানদের অনুকরণে ভোজসভার আয়োজন করা হতো। রোম, চীন ও মিসরের সাথে দীর্ঘকালব্যাপী সংস্পর্শের কারণে পারস্য সমাজের ভোজনরীতি ভারতে প্রচলিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা হিন্দুদের রন্ধনপ্রণালী ও ভোজনরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এ পর্যায়ের খাদ্যের মধ্যে ছিল পান, রন্ধনকৃত খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মসলা ও লঙ্কা।

সাধারণভাবে রন্ধনশালায় হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক বাসন-কোসন ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত আছে। হিন্দুরা পিতল ও তামার এবং মুসলমানরা পিতলের দ্রব্যাদি ব্যবহার করতো। উচ্চবংশীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সোনা ও রূপার বাসন ব্যবহারের যে ঐতিহ্য ছিল তা হ্রাস পেয়েছে এবং চিনামাটি ও কাচের তৈরি বাসন-কোসনের

ব্যবহারপদ্ধতি চালু হয়েছে। শালগাছের পাতা বা কলাপাতা থালা হিসেবে ব্যবহারের রীতি এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। মুসলমান পরিবারে ঘরের মেঝেতে প্রসারিত দস্তরখানায় একসঙ্গে আহার করার প্রথা বর্তমানে চালু থাকলেও হিন্দু পরিবারে স্বামীর আহারের পর স্ত্রীর আহার গ্রহণের ঐতিহ্যগত প্রথা এখন বিরল।[৩] বিত্তবানদের মধ্যে পানীয় ও মিষ্টি পানীয় (শরবত) ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। এখন ঠাণ্ডা করার মাধ্যম হিসেবে যবক্ষারের পরিবর্তে বরফ ব্যবহার করা হয়। ঐশ্বর্যশালীরা মাদকদ্রব্যের মধ্যে সুরা পান করতো; দেশীয় বিভিন্ন সুরা, যেমন আরক, নীরু, মহুয়া, খেরা, বাদওয়ার, জাগরে (কাল চিনি) ও টোডি (তাড়ি) ব্যবহার করতো। উৎকৃষ্ট বিদেশী সুরা পারস্য ও পর্তুগাল থেকে আমদানি করা হতো। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানরা সুরাপান থেকে বিরত থাকতো। কারণ সুরাপানকে তারা পাপাচার বলে মনে করতো এবং এ সম্পর্কে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।[৪] কিন্তু এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল এবং অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসদাচরণের জন্য শাস্তিও দেয়া হতো। মাদক হিসেবে এখনকার মতো আফিং, ভাঙ ও তামাকও ব্যবহৃত হতো। বিনোদনের সস্তা মাধ্যম হিসেবে তামাক জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি পান, চা এবং আরব থেকে আমদানিকৃত কফি মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বাংলায় রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ কদাচিৎ নির্মাণ করা হতো। এমনকি মুগল সুবাদারগণ প্রায়ই তাঁবুতে অবস্থান করতেন। শায়েস্তা খান কাঠের তৈরি প্রাসাদে বাস করতেন। ধনিক শ্রেণী বাঁশ ও কাঠ দ্বারা বাড়ি নির্মাণ করতেন। তাঁরা ইমারত কমই নির্মাণ করতেন। গ্রামে ধনী জমিদারদের বাড়ি কতকগুলো চালাঘর নিয়ে গঠিত হতো। দরিদ্রদের কুঁড়েঘর ছিল জীর্ণ, জানালাবিহীন। এর মেঝে গোবর দ্বারা নিকানো থাকতো। ঘুমানোর জন্য পাটি এবং রান্নার জন্য একটি বা দু'টি পাত্র থাকতো। গ্রামীণ দরিদ্রদের গৃহায়নের এই ধারা কিছু কিছু আধুনিক নগর উন্নয়নের ছোঁয়া ব্যতীত আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

ঐশ্বর্যশালীদের ঘর পারস্য, তুরস্ক, কাশ্মীর ও লাহোর থেকে আনীত কারুকার্যখচিত বিলাসবহুল কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত থাকতো। কার্পেটের উপর জাজিম, শতরঞ্জি ও বালুচি বিছানো থাকতো। গুজরাট ও বেনারস থেকে আনীত বড় বড় নলাকার তাকিয়া, জাঁকজমকপূর্ণ পর্দা এবং সিন্ধু প্রদেশ থেকে আনীত সূচিকার্যখচিত চামড়ার দ্রব্যাদি বৈঠকখানায় (দেয়ানখানা) শোভিত থাকতো। আসবাবপত্র এখনকার তুলনায় কম বৈচিত্র্যময় ছিল। টেবিল, চেয়ার ও গদিমোড়া চেয়ার সাধারণত ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু কার্পেট, চাদর, আয়না ও রন্ধনদ্রব্যাদির ব্যবহার ছিল প্রচুর। তাঁবুতে মখমল, ব্রোকেড ও

---

৩. Jagadish Narayan Sarkar, *Hindu- Muslim Relations in Medieval Bengal*, (Calcutta 1985), Chapter II

৪. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম খণ্ড, ৫৮-৫৯।

রেশমের বাঁধুনি দেয়া থাকতো। সমসাময়িক সাহিত্যে বাঁশ ও বেতের তৈরি মুণ্ডা (মোড়া) এবং কাঠের আসনের (পিঁড়ি) উল্লেখ পাওয়া যায়। টেবিল ব্যবহার করা হতো না। বিছানা, পাটি অথবা মাদুর দ্বারা কাজ চালানো হতো।

ধনী মুসলমানদের সরকারি পোশাক ছিল রেশম অথবা সুতীর তৈরি পায়জামা, চাপকান, মখমল ও ব্রোকেডের চুড়িদার পায়জামা, সুন্দর অসিসহ সাদা কোমরবন্দ এবং টুপি ও পাগড়ি। মুসলমানরা কিছু কিছু মূল্যবান ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন পাগড়ি, চিরা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। সুলতানগণ এবং মুগলরা নানাবিধ সরঞ্জামসহ হিন্দুদের ছত্র (ছাতা) ব্যবহার করতো। সাধারণত মুসলমানরা ঘরে নানা বর্ণের লুঙ্গি এবং হিন্দুরা ধুতি ব্যবহার করতো এবং হিন্দুরা খালি মাথায় ও খালি পায়ে অথবা কাষ্ঠপাদুকা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতো। হিন্দু জমিদারগণ পোশাক-পরিচ্ছদে ধনী মুসলমানদের অনুকরণ করতেন। উচ্চবংশের মুসলমান মহিলারা সালওয়ার-কামিজ, ঘাঘরা, উলের তৈরি কাবা, কাশ্মীরী শাল, সুতী বা রেশমের তৈরি দোপাট্টা ব্যবহার করতেন এবং মাথায় ঘোমটা দিতেন। তাঁরা সাধারণত ঘরের বাইরে বোরখা ব্যবহার করতেন। ধনী হিন্দু মহিলারা আঁকিয়া বা চোলি সহ মূল্যবান শাড়ি অথবা ছোট জ্যাকেট, দোপাট্টা এবং কখনও কখনও চাদর বা আচ্ছাদনও ব্যবহার করতেন। সাধারণত হিন্দু মহিলারা সুতীর শাড়ি দ্বারা সারা দেহ আবৃত করে রাখতেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দরিদ্রদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। কৃষক বা শ্রমিকরা লেংটি ব্যবহার করতো। চুলে কলপ দেয়া, চুল কাটা এবং টাকের যত্নের জন্য সুপরিচিত নিয়ম মেনে চলা হতো। সাবান, পাউডার বা ক্রিমের বিকল্প ছিল। সুগন্ধিও ব্যবহার করা হতো। হিন্দু মহিলারা মাথার সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে কাজল এবং দাঁতে মিসি ব্যবহার করতো। বর্তমানকালে প্রসাধনসামগ্রীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও দরিদ্ররা এখনও পুরাতন ও সস্তা জিনিস ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ধনী মুসলমানরা শিকার, তরবারি খেলা প্রভৃতি পছন্দ করতেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কাবাডি, নৌকাবাইচ, ঘুড়ি উড়ানো, নকল যুদ্ধ, কানামাছি, গাছে চড়া, বাঘচাল এবং আরও কিছু খেলা জনপ্রিয় ছিল।[৫] এছাড়া প্রচলিত ছিল যাদুখেলা, শারীরিক কসরত, নাটক, রামলীলা বা রামায়ণের নাট্যরূপ, যা মুসলমানরাও উপভোগ করতো। মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করতো। মেলা ও তীর্থস্থান দর্শন ছিল গ্রামের উভয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রিয়। পুরুষ ও মহিলারা আগ্রহের সাথে এজন্য অপেক্ষা করতো।[৬] গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাধুলার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানরা কবিতা পাঠের আসর, গল্প বলা, গান-বাজনা এবং নৃত্য উপভোগ করতো। মুসলমান কবিরা স্বরচিত ফার্সি কবিতা এবং বিখ্যাত ইরানী কবির কবিতা পাঠ করতেন ও দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন।[৭]

---

৫. J. N. Dasgupta, *Bengal in the 16th Century*, (Calcutta 1914), 186.

৬. "Chaitanya Bhagavata" in *Indian Culture*, X, (1943), 121.

৭. *Baharistan-i-Ghaibi*, Vol. I, tr. M. I. Borah, (Assam 1936), 138.

কে. এম. আশরাফের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের উৎসব ছিল একান্তভাবে ধর্মীয়। কট্টরপন্থী মুসলমানদের জীবনযাত্রায় সামাজিক উৎসবের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের উৎসবসমূহ একান্তভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও ঋতু-ভিত্তিক ছিল। উভয় সম্প্রদায়ই তাদের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় উৎসবসমূহ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করতো। এই ধারা স্থানীয়ভাবে কিছু পরিবর্তনসহ আজও প্রচলিত আছে। মুসলমানদের উৎসবে সাজসজ্জার অনুপ্রবেশ হিন্দুদের প্রভাবের ফলে ঘটেছিল। এই সময়ে দুই সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিত এবং নিজেদের ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ ভাগ করে নিত। মুসলমানদের উৎসব হিন্দুদের উৎসবের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হতো। হিন্দুরা খাজা-খিজিরের উৎসবে এবং মুসলমানদের ভোজসভায় যোগ দিত। তারা কোরানের বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনতো। মুসলমানরা হিন্দুদের উৎসবে, যেমন বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দিওয়ালি উৎসবে যোগ দিত। মহররমের গভীর তাৎপর্য মুসলমানদের মনে যে আবেগময় অনুভূতির জন্ম দিত তার পরিচয় পাওয়া যায় পুঁথিসাহিত্য, জারীগান এবং লৌকিকতার সাথে পালিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। হিন্দুরাও এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে, তাজিয়া মিছিলে যেসব 'পাঞ্জে' ও 'আলেম' ব্যবহার করা হতো, তাতে হিন্দুদের প্রভাব ছিল। বিহার ও বাংলার গ্রামে, যেখানে শিয়া মুসলমানদের আধিক্য ছিল, সেখানে জাঁকজমকের সাথে ভাবগম্ভীর পরিবেশে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাজিয়া মিছিলের আয়োজন করা হতো। আঠারো শতকের মুসলমান সংস্কারকদের মতে, এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রতিমাপূজার দ্বারা প্রভাবিত বিধর্মী কার্যকলাপরূপে (যেমন দুর্গাপূজার বিসর্জন ও রথযাত্রা অনুষ্ঠান) গণ্য করা হতো। ইমামবাড়ায় যে মূকাভিনয় করা হয় তার সাথে হিন্দুদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য আছে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বুকানন দেখতে পান যে, পাটনা ও বিহার থেকে যে চৌদ্দশ' তাজিয়া বের করা হয় তার মধ্যে ছয়শ' ছিল হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। তিনি আরও দেখতে পান যে, ভাগলপুরের হিন্দুরা মুসলমানদের মতোই উৎসবে অংশগ্রহণ করতো (২ ফেব্রুয়ারি ১৮১১)। নীচ বংশোদ্ভূত হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐসব মিছিলে অংশগ্রহণ করতো। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান, যিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন, তিনি নিয়মিত হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। আলিবর্দীর পরিবারের শাহামত জঙ্গ, শওকত জঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলা ও অন্যান্য সদস্য এবং মীর জাফর এই উৎসব উপভোগ করতেন। হোলি উপলক্ষে গান-বাজনা সহযোগে ভোজন, রং ছিটানো এবং আবির মাখানো আজও আনন্দোৎসব হিসেবে পালিত হয়।

তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক আচার-আচরণ ও উৎসবের বৃত্তান্ত সমসাময়িক সাহিত্য ও ভ্রমণবৃত্তান্তে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। ঐসব উৎসবের সাথে বর্তমানে প্রচলিত উৎসবের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক দম্পতি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে

বসবাস করতে পারতো না। হিন্দুদের দুই বর্ণের মধ্যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল। শত শত বছর ধরে এই দুই সম্প্রদায় তাদের বিবাহপ্রথা ও অনুষ্ঠান একইভাবে পালন করে যাচ্ছে। যৌতুকপ্রথাও প্রচলিত ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুত্রসন্তান লাভের জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল। হিন্দুরা তাদের প্রধান দশটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে ছয়টি পালন করতো। যেমন জন্মোৎসব (জলকর্ম), চুলকাটার অনুষ্ঠান (মুণ্ডন), মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন) ও নাম রাখা (নামকরণ), প্রথম বিদ্যালয়ে গমন (বিদ্যারম্ভ), পবিত্র সুতা ধারণ অনুষ্ঠান (উপনয়ন) এবং বিবাহ।[৮]

মুসলমান শিশুদের জন্মলগ্নে ও বাল্যকালে যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হতো সেসব অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দুদের অনুষ্ঠানের কিছু কিছু সাদৃশ্য ছিল। যেমন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত 'সালগিরা' (জন্মদিনের গিঁঠ) অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দুদের 'জন্মগাঁউথ' অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য ছিল। এই সময়ে নবজাত শিশুর মুখে মধু দেয়া হতো, শিশুর কানে আজানধ্বনি দেয়া হতো, সপ্তম দিবসে 'আকিকা' দেয়া হতো, যদিও আকিকা পালনের নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শিশুর চার বছর চার মাস চার দিন বয়সের সময় স্কুলে (মক্তব) পাঠিয়ে পড়ালেখা (বিসমিল্লাহ উৎসব) শুরু করা হতো। 'সুন্নত' (খৎনা) অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো। মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেয়ের বাগদান (মাঙ্গনি) অনুষ্ঠান এবং বিবাহের সময় সাজসজ্জা (হল্‌ফ ও নূহ),যা হিন্দু কনের 'সোলাহ শৃঙ্গার' অনুষ্ঠানের অনুরূপ এবং কনে ও বরের গায়ে বিশেষ সুগন্ধিচূর্ণ লাগানো এবং বিয়ের গান (সুহাগ) প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু মহিলাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান আগে বেশ অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং গান-বাজনা, নৃত্যগীত ও মদ্যপানের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজে যৌতুকপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে, যা ইসলাম ধর্মে নিন্দনীয় ছিল। যৌতুক হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা মাঝে মাঝে দাবি করা হতো। ইসলাম ধর্মে আইনসম্মত বিধবাবিবাহ হিন্দু প্রভাবের ফলে মুসলমানরা পছন্দ করতো না। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকে মুজাহিদ আন্দোলনের সময় এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছিল। বেগম হাসনা আলি তাঁর বারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, কোন মুসলমান বিধবা মহিলার পুনর্বিবাহ তার নজরে আসে নি, এমনকি মুসলমান মহিলারা তাঁদের বাগদত্ত পুরুষের মৃত্যুর পরও অবিবাহিত থাকতেন।[৯]

---

৮. R. C Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol I, (Dhaka 1943), 600 . Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam*, 46-70, M. W Mirza in V D Mahajan, *Delhi Sultanate*, 712-1526 A D , (New Delhi 1978), 611.

৯. Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam*, 46-70, M W Mirza in V D. Mahajan, Delhi Sultanate, 712-1526 A D (New Delhi 1978), 611

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান গুরুত্ব সহকারে পালন করা হতো। আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন যে, বাংলায় (হিন্দু) মৃত্যুপথযাত্রীকে নদীর তীরে নিয়ে তার দেহের নিম্নাংশ পানিতে নিমজ্জিত রাখা হতো, যাকে 'অন্তর্জলি' বলা হতো। শবদাহের পরে 'উদকর্ম,' 'অশৌচ', 'অস্থিসঞ্চয়ন', 'শান্তিকর্ম' এবং 'সপিন্দাকর্ম' অনুষ্ঠান পালন করা হতো। শিশু ও সাধু ব্যক্তিদের পানিতে সমাধিস্থ বা বিসর্জন দেয়া হতো। শোক পালনের সময় কিছু কিছু অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে পালন করা হতো। যেমন নখ কাটা, চুল-দাড়ি মুণ্ডন, ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ এবং জমকালো পোশাক পরিধান। কিছু কিছু রীতির ব্যতিক্রমসহ (যথা মাটিতে শয়ন করা, দিনে একবার আহার করা) এই ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হতো। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শোক পালনের ত্রয়োদশ বা ত্রিশতম দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এই সময় কাঙালিভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো ও দান করা হতো। শ্রাদ্ধবার্ষিকীও পালন করা হতো। বিশেষত গঙ্গায় মৃতদেহের হাড় ও ছাই বিসর্জন দেয়া হতো।

মুসলমানরা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখ পশ্চিমমুখী (মক্কার দিকে) করে রাখতো। শয্যাপার্শ্বে কোরান রাখা হতো এবং উচ্চৈঃস্বরে সূরা ইয়াসিন ও কলেমা পড়া হতো। মক্কা থেকে আনীত জমজমের পানি পাওয়া গেলে মুখে দেয়া হতো। মৃতদেহ কাপড় দিয়ে আবৃত করে সমাধিস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। কিছু কিছু মুসলমান তাদের পূর্বপুরুষদের অভিজাত হিন্দু বর্ণশ্রেণীতে জন্মের কারণে বা হিন্দু রীতিনীতির প্রভাবে ভারতীয় প্রথা, যথা সতী জওহর (মহিলাদের সম্মানরক্ষার্থে স্বেচ্ছায় সহমরণ) অনুসরণ করতেন। এসব প্রথা বাংলায় মুগল সৈন্য ও সেনাপতিদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সদ্য বিধবা মুসলমান মহিলা হিন্দু বিধবার মতো হাতের কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলতেন এবং সোনার অলঙ্কার ও জমকালো পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকতেন। চল্লিশ দিন পর কবর জিয়ারত করা হতো এবং দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্রাদি ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা হতো।

মুসলমানদের নম্র স্বভাব-চরিত্র, যেমন ধীরে, মধুর ও নরম সুরে সামাজিক অনুষ্ঠানে কথা বলা, নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে পান-সুপারি বিতরণ করা এবং বিদায়ের সময় নম্রভাবে সঙ্গ দেয়া তাদের আভিজাত্য ও ভদ্র স্বভাব এবং উচ্চশিক্ষার পরিচয় বহন করতো।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি,বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্ভাষণের রীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এসব রীতির কিছু এখনও প্রচলিত আছে এবং কিছু বিলুপ্ত হয়েছে। উত্তর ভারতে হিন্দুরা সমবয়স্কদের রাম-রাম ও বাংলায় নমস্কার বলে সম্ভাষণ করতো। বয়স্কদের সম্ভাষণ করার জন্য হাত জোড় করে মাথার উপরে উঠানো হতো। সামাজিক অনুষ্ঠানে ছোটরা মাথা নীচু করে পা স্পর্শ করতো। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলে শিক্ষক ও রাজার সম্মুখে নতজানু হয়ে সম্মান দেখাতো। ব্রাহ্মণরা হাত জোড় করে সম্মান দেখাতো।

মুসলমানরা সবাই একে অপরকে সালাম দিত। একজন আস্‌সালামু-আলাইকুম বললে আরেক জন তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম বলতো। পরস্পরে কোলাকুলি ও করমর্দন প্রচলিত ছিল। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্ভাষণের ক্ষেত্রে কপালে হাত ঠেকিয়ে দেহকে একটু বাঁকানো হতো। মুগল শাসক ও জমিদারগণ তাঁদের দরবারে কুর্নিশ ও তসলিম দেয়ার রীতির প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এই রীতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। কদমবুচি-রীতি এখনও প্রচলিত আছে, যা বোধ হয় রাজকীয় দরবারে প্রচলিত রীতির অনুসরণে করা হয়।

ইসলামে বর্ণপ্রথার সম্প্রসারণ খুবই জটিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য রূপ ধারণ করেছিল। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সমতা শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভারতে মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণপ্রথা এবং রাজপুতদের রক্ষণশীলতা অনুসরণ করতো। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ বলেছেন, "আমরা হিন্দুদের কাছ থেকে সামাজিক বর্ণপ্রথা শিখেছি বা পেয়েছি। বিজেতার উপর বিজিত জাতির এটি এক প্রকার নীরব প্রতিশোধ।" ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫৩) ঘোষণা সম্বলিত *ইনশাহ-ই-মাহরু* মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যের সর্বপ্রথম সাহিত্যিক প্রমাণ। ইসলামী আইন যদিও বৈষম্য অনুমোদন করে না, তবুও কার্যক্ষেত্রে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথা শুরু হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছিল। ভারতে ইসলামের প্রসারের উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল জনগণের নিপীড়নমূলক বর্ণপ্রথা থেকে মুক্তিলাভ এবং মুসলমান সমাজে উচ্চ পদমর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাদের সামাজিক বৈষম্য দূর হয় নি। এর ফলে অভিন্ন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথার সূত্রপাত হয় সরকারের উঁচু পদে এবং সেনাদলে আসীন বিদেশী বহিরাগত মুসলমান, বিশেষত তুর্কী, আরব এবং ইরানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবির মানসিকতা থেকে। এমনকি শহুরে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাদের পূর্বেকার সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মানসিকতার কারণে তাদের সঙ্গে গ্রামীণ নিম্নবংশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব রাতারাতি দূরীভূত হয় নি। পরোক্ষভাবে ধর্মান্তরিতকরণ বলতে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক জীবনধারাকে পরিবর্তন বোঝায় না। হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্ণাশ্রমপ্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) প্রচলিত ছিল,যা কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন উচ্চবংশীয় অর্থাৎ আশরাফ পর্যায়ের সৈয়দ, শেখ, মুগল ও পাঠান প্রত্যেক গোত্রই পরিবার ও উপজাতি হিসেবে বিভক্ত ছিল। নিম্নবংশীয় মুসলমানদের (আতরাফ) মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাত-নাম প্রচলিত ছিল, যেমন জেলে, তেলী, যোগী ইত্যাদি। এই ধরনের শ্রেণীর বেশিরভাগই হিন্দুদের পূর্বেকার গোত্রীয় বা সামাজিক নাম থেকে এসেছে। তাদের পুরাতন বহু গোত্রীয় অভ্যাস (যেমন পানাহার, বিবাহ) এখনও প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও শ্রেণীসচেতনতা এবং বিবাহসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ছিল। যদিও

নীতিগতভাবে অসবর্ণ বিবাহ এবং নিম্নজাতের সঙ্গে উচ্চজাতের খাওয়াদাওয়ায় কোন বাধা ছিল না, তথাপি বাস্তবে তা প্রচলিত ছিল না। অসবর্ণ বিবাহ কেবল আশরাফ শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণীর মধ্যে অপ্রচলিত ছিল তা নয়, তা একই শ্রেণীর মধ্যেও কদাচিৎ ঘটতো।

সামাজিক বিভিন্নতা ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতো ব্যবসাভিত্তিক শ্রেণীবিভেদও দেখা দেয়। বুকানন বিহার ও পাটনায় আটত্রিশ প্রকার নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যেমন তাঁতী, দর্জি, জরিকর্মী পর্যায়ের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা উঁচুগোত্রের সাথে সংস্রব রাখতো না। বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গোত্রভেদ গভীর শিকড়বিস্তার করেছিল এবং কিছু কিছু পেশা গোত্রপ্রথার বাইরে ছিল। বার্নিয়ার বলেছেন, "সূচিকর্মকার তাঁর ছেলেকে ঐ পেশায় নিয়োজিত রাখতেন, স্বর্ণকার তাঁর ছেলেকে স্বর্ণকার হিসেবে গড়ে তুলতেন এবং ডাক্তার তাঁর ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতেন। একই পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রীতি কঠোরভাবে পালিত হতো।"[১০]

নীতিগতভাবে ইসলাম হলো এক ঈশ্বর, এক নবী, এক ধর্মগ্রন্থ, এক আইন ও এক ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম। এটি একটি অবতীর্ণ ধর্ম এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে এটি প্রধানত হিন্দুধর্মের বিপরীত। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ বিভিন্ন দেব-দেবী ও অসংখ্য অবতারের (অসীম শক্তির বিভিন্ন রূপ) সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ গড়ে উঠেছে এবং গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা চালু হয়েছে।[১১] মৌলিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও ভারতে বসবাসরত বিদেশী মুসলমানরা কালক্রমে ভারতীয় হয়ে যায়। বহিরাগত মুসলমানরা ভারতীয় আবহাওয়ায় শত শত বছর যাবৎ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সাথে বসবাস করে এবং হিন্দু মহিলাদের বিবাহ করে তাদের রক্তের শুদ্ধতা, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈদেশিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং কোন কোন দিক দিয়ে হিন্দুদের সাথে একীভূত হয়ে অকৃত্রিম ভারতীয় বলে গণ্য হয়। এমনকি মসজিদ, দরগাহ ও বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ ও রাজনীতিতে হিন্দুদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং হিন্দু নামসমূহ বহাল থাকে। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা তাদের পূর্বের বংশগৌরব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বভাব-চরিত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনুসরণ করতো। গোবরডাঙ্গার পীর ঠাকুরবাড়ির আশ্রম প্রতিপাদন করে যে তৎকালীন সমাজের কট্টর মুসলমানরা একজন মুসলমান পীরের হিন্দু নাম রাখার মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পান নি।[১২]

---

১০. Bernier, *Travels*, 258.

১১. হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্য দেখুন, M. Tutus, *Indian Islam*, (London 1930) 176; F. W. Thomas, *Mutual Influence of Muhammadans and Hindus in India*, 12.

১২. Titus, *Islam in India and Pakistan*, 44.

হিন্দুধর্ম তার বিপুল আত্তীকরণক্ষমতা নিয়ে মুসলমান বিজেতাদেরকে পূর্ববর্তী বিজেতাদের মতো হিন্দুদের সঙ্গে একীভূত করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ ধর্মীয় মেরুকরণ ও সামাজিক বৈষম্য। কিন্তু ভারতে, বিশেষকরে বাংলা ও বিহারে শত শত বছর হিন্দু-মুসলমানের সহ-অবস্থান এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে একটি জনপ্রিয় ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা ও বিহারে মুসলমানরা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক সংখ্যায় বাস করতো এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা যৌথভাবে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক ছিল। এই দুই প্রদেশে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হিন্দুদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকের জীবনে পারস্পরিকভাবে কিছু লোকগাথা, আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যেগুলোতে হিন্দুধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলো পবিত্র কোরানের শিক্ষার বিরোধী ছিল। জাতিগতভাবে সম্পূর্ণ মিশ্রিত না হলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল। উচ্চস্তরের মানুষের জীবনে না হলেও সাধারণ স্তরের মানুষের জীবনে ধর্মীয় মিশ্রণের ব্যাপ্তি এতই বেশি ছিল যে, উনিশ শতকের শুরুতে মুজাহিদীন আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রচিত *হিদায়াত-উল-মুমিনিন* গ্রন্থে দুঃখের সাথে মন্তব্য করা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে ভারতে ইসলাম ও কুফরকে অধিক পরিমাণে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্য কোন মুসলিম দেশে এমনটি দেখা যায় নি।[১৩]

ভারতে ইসলামের এমন রূপান্তর হওয়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। শুধু আবহাওয়ার কারণে এমন হয় নি। বহু বহির্ভারতীয়, এমনকি বিশ্বজনীন জনপ্রিয় উপাদান এর জন্য দায়ী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কিছু উপাদান এসেছিল বিশ্বজনীন, সর্বপ্রাণবাদী, কুসংস্কারমূলক লোকবিশ্বাস থেকে, যার শেকড় নিহিত ছিল বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিকাশপ্রাপ্ত ধর্মসমূহে। এসব ধর্মের কিছু ছিল ইসলামপূর্ব কালে অথবা মুসলমান কর্তৃক আফ্রো-এশীয় দেশসমূহ বিজয়কালে অর্জিত। অন্যগুলো উদ্ভূত হয়েছে জনপ্রিয় হিন্দু অধ্যাত্মবাদ থেকে, যেগুলি বিশেষভাবে নিম্নবংশীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ ও হিন্দু উপপত্নী গ্রহণের ফলে গড়ে উঠেছিল।[১৪] নতুন ধর্মান্তরিতরা, যারা প্রতিমাপূজা ও পালা-পার্বণ উদ্‌যাপনে অভ্যস্ত ছিল, তারা সহজে দেব-দেবী ও পৌরাণিক কল্পকথাশূন্য একেশ্বরবাদী ইসলামের সরল ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে নি। বাংলায় মুসলমানরা ইসলামের জন্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতো। কিন্তু বিজেতাগণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সংখ্যার

১৩. "Notices of the peculiar tenets held by the followers of Syed Ahmed", taken chiefly from *Sirat-ul-Mustaqim*, written by Maulvi Mohammad Ismail in *Journal of The Asiatic Society of Bengal*, I (1832), 489; J. N. Sarkar, *Islam in Bengal*, (Calcutta 1972), 72

১৪. Mrs M. Hasan Ali."Observations on the Mussalmans of India,"(London 1917), 206

দিক দিয়ে ক্ষুদ্র এই শক্তির পক্ষে অন্য দেশ থেকে অভিবাসীদের আগমন সত্ত্বেও অগণিত বৈরী জনসাধারণের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় বিশ্বাস ও প্রথাকে অক্ষুণ্ন রেখে ধর্মান্তরিত করাই সহজ পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এ ধর্মান্তরগ্রহণ অসম্পূর্ণই থেকে যেতো, কারণ সদ্য ধর্মান্তরিতরা নতুন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতো এবং নতুন ধর্মীয় নিয়মকানুনগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতো না। সদ্য ধর্মান্তরিতরা শুধু নামেই মুসলমান ছিল, বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ছিল ক্ষীণ। সেখানে তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে হিন্দু নিয়ম-কানুনই মেনে চলতো। এদের উপর বিদ্বজ্জনদের প্রভাব ছিল অতি সামান্য। গ্রামে নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু কারিগরদের মধ্যে পুরাতন ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন থেকে গিয়েছিল।

এভাবে বাংলায় নতুন ধর্মান্তরিতরা ইসলাম ধর্মে তাদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং উপাসনার রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ওহাবী-ফরায়জীদের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গ্রামবাসীরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের সাথে দুর্গাপূজা ব্যতীত কৃষ্ণ ও শীতলার (বসন্ত রোগের দেবী) উপাসনা করতো এবং বিবাহের দিন ধার্য করার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ গ্রহণ করতো। বিশ শতকের প্রথমভাগে রাজশাহী এলাকার মুসলমানরা মনসাবিসর্জন উপলক্ষে গান (মনসা ভাসানোর গান) রচনা করতো। অন্য অঞ্চলে মুসলমানরা শিব-পার্বতীর সম্মানে স্তোত্র লিখতো এবং লক্ষ্মী (ধনের দেবী) স্মরণে ধর্মসঙ্গীত রচনা করতো।[15]

এমন অবস্থা উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ১৯১১ সালের জরিপ-প্রতিবেদনে এমন কিছু সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। যেমন (ক) কর্তাভজা গোত্রের জনক আউল চাঁদ বাংলার নদীয়া জেলায় শিষ্যদের মধ্যে 'সত্যধর্ম' প্রচার করতেন। তাঁর শিষ্যরা ধর্মে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। (খ) পাঁচু ফকিরগণ মুসলমানদের দীক্ষা দিতেন, যাঁরা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। (গ) রামবল্লভীরা হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতো। (ঘ) আহেবধানীরা মুসলমানদের সাথে আহার করতো। (ঙ) গোঁসাইজামিরা বৈষ্ণব ছিল। তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল, যারা পাঁচ বার প্রার্থনা করতো এবং ধনীদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে দরিদ্র ও পঙ্গুদের মধ্যে বিতরণ করতো। (চ) বৈরাগীরা বৈষ্ণব ছিল, যারা বেদ বা কোরানে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু সতেরো শতকে তাঁদের মধ্যে উচ্চবংশীয়

১৫. *Imperial Gazetteer*, II, 289 ff.; D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature*, (Calcutta 1917), 793, 796-98, 368.

মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। (ছ) শক্তির উপাসক সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের অধীনে কাজ করতো। (জ) বাংলার এক মুসলমান গ্রামের মুকাদ্দাম একজন ধর্মপ্রচারককে (১৮৫০) জানিয়েছিলেন যে, নবীজী এক বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং (ঝ) *যোগীরা নবীজীকে গোরখনাথের শিষ্য বলে মনে করতো।* অন্য যোগীরা মুসলমানদের মতো প্রার্থনা করতো ও গোমাংস ভক্ষণ করতো।[১৬]

মধ্যযুগীয় ভারতে জনপ্রিয় ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিকভাবে সংমিশ্রিত হতে সাহায্য করেছিল। এজন্য পীর ও সুফিদের অবদান ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, মধ্যযুগীয় ভারতে পীরদের প্রার্থনাপ্রথা হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রে প্রার্থনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর মতে, বাংলায় ইসলামী ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় অবদান হিসেবে এই বৈশিষ্ট্য ভারতের প্রতিটি শহর ও গ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত হতো। পীর শব্দের অর্থ প্রধান। পীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং শাহ, শেখ, মুর্শিদ বা ওস্তাদ, সুফি বা ওয়ালী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হতেন। তাঁরা অনুসারীদের (মুরিদ) আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করতেন। যদিও সব পীরই সুফি ছিলেন, কিন্তু সব সুফিই পীর ছিলেন না। গার্সিন ডি. ট্যাসির (১৮৩১) মতে, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে পীরগণ হিন্দুদের বহুসংখ্যক দেবতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। মুসলমানরা যেমন কিছু সংখ্যক ভারতীয় সাধুকে শ্রদ্ধা করতো, তেমনি সাধারণ হিন্দু, এমনকি কিছু কিছু কট্টরপন্থী হিন্দুও মুসলমান পীরদের শ্রদ্ধা করতো। মুঙ্গেরের শাহ লোহাউমি ও পশ্চিম পাটনার পশতু সাধু শাহ আরজানির সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দর্শন করতে যেতো। হিন্দু ও মুসলমানদের এমন সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে বাংলায় অসংখ্য পীরের আরাধনা শুরু হয়, যেমন সত্যপীর, মানিকপীর, কালুগাজী, বড় খাঁ গাজী এবং অন্যান্য। লোককবির ভাষায় : "হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর/দুই কুলে লয়ে সেবা হইল জাহির।" অর্থাৎ হিন্দু দেবতারা মুসলমানদের কাছে পীর বলে পরিচিতি লাভ করেছে, যার ফলে তারা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। সেকালের গুরু-চেলা সম্বন্ধ বর্তমান পীর-মুরিদ সম্পর্কের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।[১৭]

প্রাচীনকালে নিহত মুসলমান যোদ্ধাদের গাজী বা পীর হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো। প্রাচীন পীরদের আস্তানা হিন্দুদের কাছে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হতো। হিন্দুদের জনপ্রিয় ধর্মীয় সাহিত্য *মঙ্গলকাব্য* এবং অন্যান্য কবিতায় বাংলার পীরদের ও তাঁদের আশ্রমের

---

১৬. *Census Report*, 1911, I; *Encyclopaedia of Islam*, II, 491; D. C. Sen, *Chaitanya and His Age*, (Calcutta 1922), 350.

১৭. ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা; কাব্যমালঞ্চ*, (সম্পাদিত) আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম, ১৯৪৫, ৩০; *Asiatic Journal*, IV (1831), 75-76.

উল্লেখ আছে এবং দিগ্বন্দনা রয়েছে। সতেরো শতকের শেষভাগে সীতারাম দাস তাঁর বর্ণনায় এ পর্যায়ের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন গড় মান্দারনের পীর ইসমাইল, পাণ্ডুয়ার সুফি খান (সুভি খান ?), বড় পাণ্ডুয়ার নূর কুতুব আলম, পীর বদর, ত্রিবেনীর জাফর খান গাজী, হিজলির পীর মাচাণ্ডালি শরিফ (তাজ খান), বর্ধমানের বাহরাম সাক্কা (বৈরাম শাক্কারা) এবং অন্যান্য। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একাত্মতাবোধ গড়ে উঠেছিল তার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব দূর হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ আইনী তত্ত্বের ভিত্তিতে এই দুই সম্প্রদায়ের যে অব্যাহত ও অবিরাম হানাহানি ও অসহিষ্ণুতার বিবরণ দিয়েছেন তা অনেকাংশে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[১৮]

সুফিরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, যা পরে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনা করেছিল। অনেকে ধর্মীয় নির্দেশ-আদেশ শিক্ষা দিতেন, যা পরে শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। জনসাধারণ সুফিদের অতুলনীয় চরিত্র, সহিষ্ণুতা, নিষ্পাপ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখে মুগ্ধ হতো এবং তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হতো। জনসাধারণ আরও বিশ্বাস করতো যে, পীরগণ অতিমানবীয় গুণাবলীর অধিকারী, যেমন রোগমুক্ত করা, দরিদ্র ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দুঃখ-বেদনা দূর করা, বন্ধ্যা রমণীদের বন্ধ্যাত্ব দূর করা, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, সুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু আনয়ন করা অথবা কোন স্থানে অতিবৃষ্টি সৃষ্টি করার ক্ষমতা। জনগণ সুফিদের কাছ থেকে বিপদমুক্তির জন্য মাদুলি, আংটি এবং এই ধরনের জিনিস নিত। সুন্দরবনে যেখানে বাঘের উৎপাত ছিল, সেখানে বসবাসরত হিন্দু ও মুসলমানরা পীরদের অনুগ্রহ লাভের জন্য জীবিত পীরদের উদ্দেশে অথবা মৃত পীরদের আত্মার উদ্দেশে মানত প্রদান করতো।

জনসেবা সুফিদের প্রধান কার্যাবলীর অন্যতম ছিল, যেমন দারিদ্র, অসুস্থ, অসহায়, ভিক্ষুক ও ভ্রমণকারীদের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের আশ্রম, খানকাহ্‌ ও মেহমানখানা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকতো। স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের জীবিত পীরদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হিন্দুদের গুরু বা গোসাঁইদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অনুরূপ ছিল। হিন্দুরা যেমন গুরুদের সামনে নত হতো, তেমনি মুরিদরা পীরের সামনে সেজদা করতো। কট্টর মুসলমানদের কাছে এ কাজ খুবই নিন্দনীয় ছিল।[১৯] মসজিদে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পীরের উপাসনা করতে মুসলমানরা বেশি পছন্দ করতো। জীবিত অবস্থায়

---

১৮. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮১); J. N. Sarkar, *Hindu-Muslim Relations,* 117, f. n.

১৯. Aziz Ahmad, Intellectual History of Islam in India, (Edinburgh 1969), 46; J. N. Sarkar, Islam in Bengal, 32-33.

পীরগণ জনসাধারণের সেবা লাভ করতো এবং মৃত অবস্থায় তাঁদের দরগাহ্ উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের তীর্থস্থানে পরিণত হতো, যেমন গোরখপুরের মনসুরগঞ্জে আবদুল কাদেরের দরগাহ্। হিন্দুদের মধ্যে যেমন পুরি, বৃন্দাবন ও বেনারসের মতো তীর্থস্থানগুলিতে যাওয়ার প্রবল ঝোঁক ছিল, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও পবিত্র দরগাহে যাওয়ার তীব্র আগ্রহ ছিল। নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এসব পবিত্র স্থানে গমন করতো, যেমন মনস্কামনা পূরণ, জাগতিক মোক্ষলাভ, উচ্চপদ বা ধনলাভ, রোগমুক্তি ইত্যাদি। মুসলমান সাধুরা জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের দরগাহ্সমূহের অধিকাংশ পূর্বেকার স্থানীয় তান্ত্রিক গুরুদের নির্মিত টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অতিবিশ্বাসী জনসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল সুগভীর। মুসলমান সাধুদের এসব স্থান আগের দিনের মতোই জনগণকে আকর্ষণ করতো। নামমাত্র ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করতো না। বাংলার প্রাচীন ভাষা, আচার-আচরণ ও জীবনধারা আগের মতোই ইসলামের সাথে মিশে যেতে থাকে।[২০]

হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে কট্টর সুফিদের অবদান থাকলেও তাঁরা বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী ও বেশরিয়তি অধর্মীয় প্রথা (মালামি) প্রবর্তন করেছিলেন। তন্মধ্যে সোহ্রাওয়ার্দীয়া গোত্রের শাখা জালালী, কাদেরীয়া গোত্রের শাখা নওশাহী ও বিনাওয়া, কলন্দর (ইরানী ও ভারতীয়), মাজজুবি (সম্পৃক্ত), হায়দরী এবং বহুল প্রচারিত মাদারী অন্যতম। কিছু বেশরিয়তি সুফি বাংলায় হজরতী, গোবরাই ও পাগলনাথী অনুসারীর সূত্রপাত করেছিলেন, যাদের উপর শক্তি উপাসনার প্রভাব ছিল এবং যাদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু। উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন ঐসব সুফির সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতো। ভিন্নপন্থী সুফিদের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু প্রথা কট্টর সুফিদের মধ্যেও দেখা যেতো, যেগুলি ভারতের বাইরে ইসলামী প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এমন একটি প্রথা ছিল গলায় বা হাতে তাবিজ ব্যবহার করা, যা দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগ ধরনের অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হতো। এই প্রথা ভারত ও মুসলিম জগতের অন্যত্র চালু ছিল। তাবিজের মধ্যে কোরানের বাণী বা ধর্মীয় বাক্য লিপিবদ্ধ থাকতো। শিয়ারা 'ইমাম দেমিন' ব্যবহার করতো, যা বাজুবন্ধে একটি বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে একটি বা অধিক মুদ্রার আকারে স্থাপন করা হতো।

ভারতীয় মুসলমানদের অনেকে হিন্দু যোগীদের মতো নানা মত ও পথের অনুসারী ফকিরদের নিয়ে বহুসংখ্যক দল গঠন করেছিলেন। উনিশ শতক নাগাদ এই ধরনের চারটি প্রধান দলের আর্বিভাব হয়, যেমন জালালী, মাদারী, বিনাওয়াজ ও অর্জুনশাহী। অর্জুনশাহী আবার বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সহজিয়া ফকিররা মেয়েদের মতো পোশাক

---

২০. J. N. Sarkar. *"Islam in Bengal"*, 76-78

পরিধান করতো এবং মুর্শিদদের সম্মুখে নৃত্য করতো ও গান গাইতো। অধিকাংশ ফকির ইসলামী নীতিমালার বিরোধী কাজ করতো।

মরমী প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন অংশে, এমনকি বাংলায় বিভিন্ন অপরিচিত পীর বা পৌরাণিক ব্যক্তির সাথে জড়িত সংশ্লেষণবাদী সম্প্রদায় বা মতবাদ প্রাচীন লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এগুলি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু এগুলিকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হতো। এগুলির মধ্যে কিছু সর্বপ্রাণবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার গভীর প্রভাব সারা বিশ্বে ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে বিদ্যমান এবং সম্ভবত এর মূলে রয়েছে হিন্দুধর্মের প্রাচীন মতবাদ।

উপমহাদেশে মুসলিম প্রভাবের প্রথম সূচনা হয় সিন্ধুতে। এই সময়ে সংশ্লেষণবাদী বিশ্বাসের লক্ষণীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা লালু দরিয়াপন্থীদের দ্বারা অবতার হিসেবে পূজিত আনদারুলালকে সিন্ধু নদীর প্রতীক হিসেবে পূজা করতো। তাঁকে মুসলমানরা খিজির বলে এবং পাতিয়ালার জাঠরা জেন্দা পীর বলে গণ্য করতো। মুসলমানরা খাজা খিজিরকে ভক্তি করতো, কারণ তাঁকে সমুদ্র, নদী এবং পানির সাথে জড়িত এবং নূহ্ নবীর আত্মীয় বলে মনে করা হতো। তাঁকে 'জীবনের জলের উৎসের আবিষ্কর্তা', জাহাজডুবি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নাবিকদের উদ্ধারকর্তা বলে মনে করা হতো। তিনি মাছের উপর চড়তেন বলে মনে করা হতো এবং বন্যা ও খরার সময় তাঁর উপাসনা করা হতো। তেরো শতকেও হামিদ কলন্দর ও অন্য মুসলমানরা হানজ-ই-সামসী (ইলতুৎমিশ কর্তৃক নির্মিত পুকুর)-কে ভক্তি করতেন, যা পানির পীরের সাথে জড়িত বলে মনে করা হতো।

ভারতের বিভিন্ন অংশে খিজিরকে হিন্দুদের নিম্নতর স্থানীয় দেবতার সমতুল্য গণ্য করা হতো। মধ্যযুগে দু'জন পানির পীরের বর্ণনা পাওয়া যায়—সিন্ধুতে দরিয়া পীর এবং বাংলায় পীর বদর। বাংলায় পানির পীরের অনুষ্ঠান (খোয়াজ, ভেরা বা বেরা, ফ্লীট) মুসলমান এবং হিন্দু জেলে ও মাঝিরা ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) পালন করতো। ঐ সময়ে নৌকা পানিতে ভাসিয়ে ফল, ফুল ও দীপ জ্বালিয়ে ঐ অনুষ্ঠান পালন করা হতো। সিরাজউদ্দৌলা এই উৎসব পালন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উইলিয়ম হজেস তা ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদে প্রত্যক্ষ করেছিলেন (১৭৮০-৮৩)। ১৮২১ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব এই উৎসব দেখেছিলেন। বাংলায় প্রত্যেক নাবিক ও জেলে ভ্রমণ অথবা ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় পীর বদরের নাম নিত। চট্টগ্রামে ২৯ রমজান তাঁর দরগাতে লোকসমাগম হয়। তিনি জীবৎকালে নিভৃতে প্রার্থনা করতেন (চিল্লা)। তাঁকে চট্টগ্রামের বদরউদ্দিন বদর-ই-আলম

এবং আঠারো শতকের প্রারম্ভে আগত পর্তুগীজ বেস গোয়েল পিয়ারিস বোথিলো বলে চিহ্নিত করা হয়, যিনি একটি ভাসমান শিলার উপর চড়ে এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হতো।

সিরীয় ইহুদী, শাহ বা শেখ মাদারের অনুসারী মাদারী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল পারস্য দেশে এবং সৈয়দ বদিউদ্দিন (মাদার) নামে একজন সুফি মাদারী মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন মাকেরানপুরের পীর। এই সম্প্রদায় হিন্দু যোগী, খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম থেকে তাদের মতবাদ গ্রহণ করেছিল। তাদের মরমী ডাক ছিল দ্ব্যর্থবোধক 'দম মাদার'। এর দু'টি অর্থ—'মাদারই জীবন' এবং 'শ্বাস নিও না'। বাংলায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা সমভাবে মাদার জের্দা উৎসব পালন করতো। পূর্ণিয়া ও রংপুরে বুকানন অসংখ্য মাদারী ফকিরের সন্ধান পান। তাদের অনেকে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো শরীরে ছাই লেপন করতো, উলঙ্গ থাকতো ও আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করতো। তাদের একটি উপশাখা তালি দেয়া কাপড় (খিড়কা) পরিধান করতো। তাদের 'খিড়কাধারী মাদারী' বলা হতো।[২১]

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষকরে মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে 'পাঁচ পীরের' প্রার্থনা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কৃষকরা বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁদের উপাসনা করতো। এসব সম্প্রদায়ের উৎপত্তির বর্ণনা বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাঁচ সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংখ্যা দ্বারা হাতের পাঁচ আঙ্গুলকে বোঝানো হতো, যার প্রতিলিপি হিন্দুদের বাড়ির দরজার উপর মন্ত্রস্বরূপ লিখে রাখা হতো। শিয়া মুসলমানদের কাছে মহরমের পাঞ্জা ছিল 'পাঞ্জাতনের' পাঁচটি উর্ধ্বমুখী প্রতীক (নবী, আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসেন)। সম্ভবত এই সংখ্যাটি পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীকে বোঝাতো এবং এই ধারণা পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বাংলার নাবিকেরা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এদের উপাসনা করতো। মুসলমানরা আল্লাহ্, নবী, পাঁচ পীর, বদর এবং অন্যদের নাম উচ্চারণ করতো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ পীরের পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানা ছিল না। এই পাঁচ পীরের মধ্যে ছিলেন দুই জন হিন্দু—ভাইরুন ও সতী (মুসলমানদের কাছে আমিনা নামে পরিচিত) এবং তিন জন মুসলমান আজাব সালার, হাতিল পীর এবং রাজিব সালার। বাংলায় ছিলেন মানিক পীর (বদর পীর ?), গুরু পীর, কুম্ভীরা পীর ও মাদারী পীর। কিন্তু তাঁদের স্মরণে কোন অনুষ্ঠান হতো না। জেম্স ওয়াইজ সোনারগাঁয়ে পাঁচ পীরের দরগাহের পাঁচটি অসম্পূর্ণ সমাধির সন্ধান পান, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রার্থনা করতো। একে ইসলাম ও সর্বপ্রাণবাদের একীভবন বলে মনে করা হতো। অন্য কথায় এ ছিল পীরদের কাহিনী সম্বলিত

---

২১. *Encyclopaedia of Religion and Ethics,* IX, 600 ff.; Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam, 272-73;* Hodges, *Travels,* 35; J. N. Sarkar, *Islam in Bengal,* 9.

সর্বপ্রাণবাদ। এই ধর্মীয় মতবাদ মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব বা পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। পশ্চিম বাংলার কিছু অঞ্চলে, যেমন মেদিনীপুর ও বর্ধমানে এখনও পাঁচ পীরের উপাসনা করা হয়।

পাঁচ পীরের মতবাদের সাথে গাজী মিয়ার মতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। গাজী মিয়া ভারাইচের সালার মাসুদ নামে পরিচিত ছিলেন এবং ১৩০৪ সালে হিন্দুদের সাথে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। মুহুরা গাজীর (মোবরা বা পীর গাজী মুবারক আলি সাহেব) দরগাহ্ শিয়ালদহের ঘুটিয়ারী শরিফে অবস্থিত।[২২]

পানির পীরের মতো বাংলায় কিছু জঙ্গলের পীরও ছিলেন, যেমন পীর ঝরিয়াঁ (বনের পীর) ও গুগা পীর (সর্পরাজ জহির পীর নামে পরিচিত)। তাঁরা সম্ভবত সিন্ধুর জঙ্গলের দেবতাদের অনুরূপ ছিলেন। বাংলার সুন্দরবনের জঙ্গল ও নদী বাঘ, কুমির ও সর্পে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু-মুসলমান কাঠুরিয়ারা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব পৌরাণিক পীরের পূজা করতো। যেমন ২৪-পরগনার মহুরা (মবরা বা মুবারক) গাজী, বদ্বীপের পূর্বপার্শ্বের হাকিয়া নদীর তীরবর্তী জিন্দা গাজী, হিন্দুদের কালু রায় ও দক্ষিণা রায় (যিনি বাঘে চড়তেন)। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে ও পানিতে নামার প্রাক্কালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় এসব ধর্মীয় স্থানে (কিছু মাটি স্তূপ করে রাখা স্থান) উপাসনা করতো। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের প্রার্থনার আচার-আচরণ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট কিছু মুসলমান সম্প্রদায় ছিল, যারা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে হিন্দুদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যেতো। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ একই রকম ছিল। কিশোরগঞ্জ উপজেলার (বর্তমানে জেলা) মুসলমানদের মধ্যে 'খুদা কা ঘর' (আল্লাহর ঘর) এবং 'বিষহরি মাই কা ঘর' (মা বিষহরি বা সর্পদেবীর ঘর) উভয়ই ছিল। প্রত্যেক গ্রামে কালীস্থান (কালীমন্দির) ছিল। প্রত্যেক মুসলমান গৃহে আল্লাহর ঘর (খুদা-ই-ঘর) ছিল। জনগণ উভয় স্থানেই প্রার্থনা করতো। এমনকি মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অংশ ভগবতী দেবীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো। উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করতো। উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল দেবতা মহারাজ, যার

---

২২. *Census Report*, 1951; *West Bengal District Hand-book*, 24 Parganas, XLIV-V, 359.

২৩. *District Gazetteer : Purnea*, 58; J. N. Sarkar, *Thoughts and Trends of Cultural Contacts in Medieval India*, 44-51.

২৪. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trade of Eastern Bengal*, (London 1884), 35; *Asiatic Journal*, IV, 75-76.

প্রতীক ছিল বাঁশ ও কুলা, ধনুক, পুরাতন মাছ ধরার জাল এবং বড়শি। ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু বৈষ্ণব মুসলমান অন্যান্য মুসলমানের সাথে একসাথে আহার করতো না। তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতো।[২৩]

উনিশ শতকে বাংলায় মরমীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যারা আচার-আচরণে পবিত্র আইন মেনে চলতো, তাদের বলা হতো 'বাশর' বা 'সালিক'। তাদেরকে অন্যান্য বেশর ও মাজজুবদের (যাদের আচার-আচরণ ভিন্ন ছিল) চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করা হতো।[২৪]

মোল্লাতন্ত্র

যদিও ইসলামে যাজকত্বের কোন স্থান নেই, তথাপি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান যাজকদের অর্থাৎ মোল্লাদের প্রভাবের বর্ণনা আছে। গ্রামের মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণে পারদর্শী মোল্লাদের পরামর্শ গ্রহণ করতো। নুসরাত শাহের আমলের এক শিলালিপির বর্ণনায় সমাজে মসজিদের ভারপ্রাপ্ত মোল্লার প্রভাব সম্বন্ধে জানা যায়। সমাজে তাঁর স্থান ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা পুরোহিতের অনুরূপ।[২৫]

জনপ্রিয় মতবাদ : সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের উপাসনা

হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শত শত বছরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তাদের উপাস্য একই রকম হয়ে দাঁড়ায়। এক সম্প্রদায় দুঃখ-দুর্দশা বা অসুস্থতার সময় দেব-দেবী বা পীরের উপাসনায় সুফল না পেলে অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যের শরণাপন্ন হতো। বুকানন লক্ষ্য করেছেন যে, রংপুরে ব্রাহ্মণ, মোল্লা ও ফকিরদের মধ্যে এই রকম প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী গোরখপুরে উচ্চবংশীয় বিদেশী মুসলমানরাও হিন্দু রমণীদের মাধ্যমে হিন্দুদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতো। অনুরূপভাবে বাংলায় কোন ধরনের মূর্তির মাধ্যম ছাড়াই মুসলমান ও হিন্দুরা যথাক্রমে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের উপাসনা করতো। উপাস্যকে অত্যন্ত সৎস্বভাববিশিষ্ট এবং যেকোন তুচ্ছ বিষয়ও সম্পাদনে সদাপ্রস্তুত বলে মনে করা হতো। পাহাড়পুরে বৌদ্ধ মঠের সত্যভিটা খননের সময় মুসলমানদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল।[২৬]

নবীর পদচিহ্ন

ঢাকার পূর্বদিকে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী কদম রসুল এবং গৌড়ের কদম রসুল ভবন ও বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো কদম রসুল ভবনসমূহকে গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের

---

২৫. Mukundaram, *Kavikankan Chandi*, 343-44; *Padma Puran*, (ed) B. K. Bhattacharya, 54, J. N. Sarkar, *Hindu-Muslim Relations*, 75-76

২৬. Martin, *Eastern India*, II, 145, 445-46, J N. Sarkar. *Hindu-Muslim Relation*, 75-76.

সাথে এবং কদম রসুলের মুতাওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়কদের গয়ওয়াল ব্রাহ্মণদের সাথে তুলনা করা যায়। এই ঐতিহ্য বর্ধমানের ধর্মপাদুকায়, মোয়াজ্জেমপুরে শাহ লঙ্গরের দরগাহে (এখানে নবীর পদচিহ্ন আছে) এবং উত্তর বাংলায় পীরগঞ্জে ইসমাইল গাজীর পবিত্র স্থানের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে বর্তমান।

এযাবৎ বিদ্যমান স্থানীয় প্রথা এবং লোকগাথা

মুগল যুগে ও বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় প্রথা ও কুসংস্কারপূর্ণ লোকগাথার সংশ্লেষণমুখী প্রভাব হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। এর কিছু কিছু এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। বিদেশী মুসলমানরা যে এ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল তা নয়, তবে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এগুলিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দুদের মতো বিদেশী ও দেশী মুসলমানদের হস্তরেখাবিশারদ (নাজুমি বা নাযুমি)-এর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এমনকি মুগল শাসকরা যুদ্ধযাত্রার শুভ সময় জানার জন্য তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাংলার সুবাদার ও নবাবরা কোন সামরিক অভিযানের জন্য বা অন্য কারণে বহির্গমনের উদ্দেশ্যে হস্তরেখাবিশারদদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। মির্জা নাথনের *বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে* এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। এছাড়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনীবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের প্রতি আকর্ষণ ছিল। জাদুবিদ্যার প্রতিও বিশ্বাস ছিল। ভারতীয় মুসলমানরাও অশুভ শক্তিকে ভয় করতো। মুসলমানদের শুফলি-আমল হিন্দুদের শত্রু বা দুষ্ট দেবতা দমনের জন্য ময়লা-আর্বজনা ভক্ষণ বা তা ব্যবহারের রীতির অনুরূপ ছিল।

হিন্দু মহিলাদের মতো মুসলমান মহিলারা গর্ভে পুত্রসন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে নানা রীতিনীতি অনুসরণ করতো এবং মন্ত্রপূত পানীয় ও ঔষধ পান করতো। কিন্তু অনেক সময় তা গর্ভবতীর জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতো। অজ্ঞ মুসলমানরা মনস্কামনা পূরণের জন্য মৃত হিন্দুদের চিতাভস্ম ব্যবহার করতো। মানুষের উপর চন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করা হতো। হিন্দু ও মুসলমানরা গর্ভবতী মহিলাদের উপর সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের কুপ্রভাব সম্বন্ধে ভীত ছিল এবং ঐ সময়ে শান্তভাবে শয়ন করতে ও অভুক্ত থাকতে বলা হতো। সপ্তাহের বিশেষ দিন, যেমন বুধ বা বৃহস্পতিবার শিশুর জন্মের জন্য অশুভ বলে মনে করা হতো। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী ষষ্ঠ দিন (ছঠি) মাতার রক্ত দূষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দিন বলে গণ্য হতো। মুসলমান মহিলাদের চাঁদের আলোতে রাখা পানি পান করানো হতো। হৃদরোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য হিন্দুদের সোমরস পান করার প্রথা থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ই ভূত-প্রেত, যেমন মতি বা উম্মা-ই-শিবইয়ানকে (শিশুদের মা) ১৮ মাস বয়সী সন্তানের খিঁচুনি রোগের কারণ বলে মনে করতো। আঞ্চলিক রীতির প্রভাবে বাংলার মুসলমান সমাজে শিশু যে ঘরে জন্মগ্রহণ করতো (সুতিকাগার বা

অশুচিঘর) সেই ঘরে কিছু আচার সম্পন্ন করা হতো এবং খৎনা ও বিবাহ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।[২৭]

বিকলাঙ্গ বা দরিদ্র ব্যক্তির বদনজরের ভয় ছিল একটি সাধারণ কুসংস্কার এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এই কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। কিছুটা বিদেশ থেকে এবং কিছুটা দেশীয় সংস্কার থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। প্যান-এশিয়ান মুসলমানদের 'নিথার' উৎসব ছিল অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করার বা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান, যা হিন্দুদের উতরা বা আরতি উৎসবের অনুরূপ। বদনজরের মোকাবেলা করবার জন্য নাম গোপন রাখা হতো বা নামের সংখ্যা বাড়ানো হতো। এমনকি মুগল শাসকরাও এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য নাম ধারণ করতেন। হিন্দুরা লেবুকে এর প্রতিষেধক মনে করতো। কোন ব্যক্তিকে ভূত-প্রেতের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য পাখা বা গাছের শাখা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেয়া হতো। একে হিন্দুদের রীতি (পশু বা মুরগি হত্যা করা বা মুক্ত করা) অথবা অন্য মুসলিম দেশ হতে আমদানিকৃত রীতি বলে মনে করা হতো। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোরানের আয়াত বা অন্য পবিত্র বাণী পাঠ করা হতো।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে বাংলায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা বসন্ত রোগের দেবী শীতলার উপাসনা করতো। হিন্দুরা কলেরা রোগের দেবী ওলাদেবীর এবং মুসলমানরা ওলাবিবির উপাসনা করতো। অবসাদ, বিষাদ ও মূর্ছারোগগ্রস্ত মহিলারা অমঙ্গলকারী সাধু মহিউদ্দিন ওরফে শেখ সাদ্দুর তুষ্টি সাধন করতো। এই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম সাধু অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতেন। তেরো শতকে আমরোহাতে অবস্থিত একটি মসজিদে তাঁর আশ্রম ছিল।

উদার ও কট্টরপন্থীদের মধ্যে বিরোধ

অতীতকালে সকল দেশের সমাজ কট্টর ও উদার মতাবলম্বী পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল। মুগল যুগেও এই রকম অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আকবরের উদারনৈতিক মতবাদ কট্টর ও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী শেখ আহমেদ সিরহিন্দীর নকশবন্দি মতবাদের সৃষ্টি করেছিল, যা আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০২-৬৩) শিক্ষায় উজ্জীবিত মুজাহিদীন আন্দোলনের মধ্যে এই মতবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যাকে ভুল করে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ওয়ালিউল্লাহর ছেলে আবদুল আজিজের একজন অনুসারী সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী শুরু করেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতে গ্রামভিত্তিক প্রথম ইসলামী জনপ্রিয়

---

২৭. Hughes, *Dictionary of Islam,* 114-15, 221-22; *Baharistan-i-Ghaibi,* tr. M. I. Borah, II, 671-72; Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam,* 2-6, 31-35, 84, 338.

গণআন্দোলন। বাংলায় মৌলিক ফরায়জী আন্দোলন শুরু করেন হানাফী মতবাদের শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর সন্তান দুদু মিয়া। পরে এই আন্দোলন তীতুমীরের সময় (১৮৩১) জঙ্গি রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে আপোষবিমুখ (গায়ের মুকাল্লিদ) আহল-ই-হাদিসের অগভীর ও বাস্তবতাবিমুখ মৌলবাদী মতবাদ (যা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে) বহুঈশ্বরবাদী (শির্ক) ও অন্যান্য নতুন মতবাদের (বিদা) প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য

কেবল সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত ব্যতীত সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একীকরণ এবং এই অঞ্চলে অর্জিত অর্থনৈতিক উন্নতি বাংলাসহ সমগ্র ভারতে মুগল শাসনের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে। শিক্ষা, সাহিত্য ও ললিতকলায় এর প্রতিফলন ঘটে।

শিক্ষা

বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি হচ্ছে জ্ঞানপ্রসারের পূর্বশর্ত। সুলতানি যুগের তুলনায় মুগল আমলে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল বেশি। উভয় ক্ষেত্রেই মুগল শাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা অন্য সামাজিক কার্যকলাপের মতোই প্রাক-আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। তুর্কীদের বিজয়ের কয়েক শতক পরেও হিন্দুরা তিমুরীদের নেতৃত্বে শিক্ষার আলোকবর্তিকা তাদের নিজেদের পাণ্ডিত্যের আলোকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করেছিল। সুলতানদের আমলে মুসলমানদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা একই ধারায় প্রসারলাভ করেছিল। অন্যান্য স্থানের মতো দারুল ইসলামেও এর প্রতিফলন ঘটেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামে ও শহরে পাঠশালা ও মক্তবের মাধ্যমে বিস্তারলাভ করেছিল, যেখানে পণ্ডিত ও মৌলবিরা (মুকাদ্দাম বা মুকুন্দরামের মখদুম) শিক্ষাদান করতেন। মুদ্রিত বই না থাকায় এখানে ছাত্রদের হস্তলিপি পড়ানো হতো এবং অর্থ না বুঝেই মুখস্থ করার জন্য ছাত্রদের বাধ্য করা হতো। চার পর্যায়ে চারটি মাধ্যমে লেখা অভ্যাস করতে হতো—তালপাতা, কদলীপাতা, কাগজ, মাটি ও বালু। শ্লেট, পেন্সিল বা ব্ল্যাকবোর্ডের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাথমিক গণনা শুভঙ্কর ও নামতা (পহর) পদ্ধতিতে শেখানো হতো। হিন্দু বালক-বালিকারা সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করতো। মুগল যুগে মুসলমান বালক-বালিকাদের এখনকার মতো প্রাথমিক ব্যাকরণ (আমাদনামা), চিঠি-পত্র লেখা, শেখ সাদি (গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ) ও ফেরদৌসির কাব্য, কোরান মুখস্তকরণ ও আরবি হস্তলিপিবিদ্যা বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হতো। হিন্দু শিক্ষকগণ ধনীদের কাছ থেকে ভাতা পেতেন। মুসলমান শিক্ষকগণ

বেতন, বৃত্তি ও ভাতা পেতেন। উচ্চ ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শহরে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা ও কলেজ ছিল, যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রের ভুমিকা পালন করতো। হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার স্থানগুলি টোল ও চতুষ্পাঠী নামে পরিচিত ছিল। তাছাড়া কিছু কিছু উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। বাংলায় প্রাক-মুগল আমলের কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও বিকাশলাভ করেছিল। এগুলো অবস্থিত ছিল পাভুয়া, সোনার গাঁ, সাতগাঁও, ঘোড়াঘাট, নাগৌর (বীরভূম), বাঘা (রাজশাহী) ও চালগামে। মুগল আমলেও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যেমন ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা ও লালবাগ এবং মুর্শিদাবাদের কাটরা মাদ্রাসা। পাটনা, আজিমাবাদ ও পূর্ণিয়াতেও এধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন*-এর প্রণেতা গোলাম হোসেইন আলিবর্দীর শাহী দরবারের ফার্সি ভাষায় পারদর্শী বিদ্বান ও বিখ্যাত অধ্যাপকদের চারশ' ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আজিমাবাদে জয়নুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করতো। ইতিহাসবিদগণ বিহারের কাজি গোলাম মুজাফ্ফরের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি আলিবর্দীর পরিচিত ছিলেন এবং যাঁকে মুর্শিদাবাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও তখন বহু ইরানীয় অভিবাসী পণ্ডিত বিহার ও পাটনায় বসবাস করতেন। গোলাম ইয়াহিয়া মুফতি, জিয়াউল্লাহ মীর ওয়াহিদ, মৌলবি লাল মোহাম্মদ, শেখ হেদায়েতউল্লাহ আবদুল হাদী ও গোলাম হোসেইন পূর্ণিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা পূর্ণিয়ার উপ-প্রশাসক সৈয়দ আহমদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[২৮]

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বাংলায় তিন রকম প্রতিষ্ঠান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল : (১) ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য (কবিতা ও নাটক), অলঙ্কারশাস্ত্র ও পুরাণ; (২) আইন—'দায়ভাগ', 'মিতাক্ষরা' ও 'প্রাচীন স্মৃতি', যা বাংলার যশোরের এক ব্রাহ্মণ শূলপাণি রচনা করেন এবং 'শ্রদ্ধা চিন্তামণি,' যা মিথিলার বাচস্পতি মিশ্র রচনা করেন; নদীয়ার রঘুনন্দন রচিত গ্রন্থ আইন শিক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল; (৩) ন্যায়শাস্ত্র (যুক্তিবিদ্যা)। ন্যায়শাস্ত্র পর্যায়ের অধিবিদ্যার জন্য বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং তা বাংলার পণ্ডিতদের গর্বের বিষয় ছিল। ভারতে অন্য কোথাও এই শাস্ত্র এত গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হতো না। চিকিৎসাবিদ্যা. দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও 'তন্ত্র' কেবল ব্রাহ্মণরাই নয়, বৈদ্য ও কায়স্থরাও অধ্যয়ন করতো। উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং এই শাস্ত্রের অনুরাগীদের জ্ঞানের গভীরতার সাথে সাথে তাদের নম্রতা ও সরলতার উল্লেখ করেছেন।[২৯] নদীয়া ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। নদীয়া, শান্তিপুর ও গোপালপাড়ায় তার শাখা ছিল। নদীয়া ছিল ন্যায়শাস্ত্রের দু'টি শাখার জন্মস্থান, যার একটি বাসুদেব সর্বভৌম এবং অপরটি তাঁর ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিষ্ঠা

---

২৮. "Siyar-ul-Mutakherin," II, 135, 175-76

২৯. Adam's *Reports* 113, 169-70; Martin, *Eastern India*, II, 715-17.

করেছিলেন এবং তা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিখ্যাত কেন্দ্র মিথিলাকে পর্যন্ত নিষ্প্রভ করে দেয়। সুষ্ঠু সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা না থাকার কারণে বড় বড় জমিদার, যথা নাটোরের রানী ভবানী, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বারভাঙ্গার রাজা ও আরো অনেকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

মুগল শাসনের এক অনন্য অবদান ছিল ফার্সি ভাষায় পারদর্শী হিন্দু শাসকশ্রেণী। বাংলায় নবাবি শাসনের আমলে সংস্কৃতিবান হিন্দুরা ফার্সি ভাষাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন বলে গণ্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ ফার্সি ভাষায় পারদর্শী কতিপয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, যিনি *ধর্মমঙ্গলের* কবি রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষালাভ করেন; আলিবর্দীর বিভিন্ন হিন্দু কর্মচারী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আলিবর্দীর দীউয়ান রাজা কিরাতচাঁদ (রায়রায়ান আলমচাঁদের পুত্র), যিনি হিন্দুদের মধ্যে ফার্সি ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং রাজা রামনারায়ণ (রঙ্গলালের পুত্র), যিনি পরবর্তীকালে বিহারের উপশাসক হয়েছিলেন এবং যাঁর আরবি ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শিতা ছিল, ফার্সি ও উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি মহারাজা কল্যাণ সিংহ (রাজা সিতাব রায়ের পুত্র) এবং রাজা নবকৃষ্ণ, যিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের শিক্ষক ছিলেন। এ্যাডামের মতে, বাংলার যে পাঁচটি জেলায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অধিক ছিল।[৩০]

বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসাব্যবস্থা মুগল শাসনামলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হয়, যা পরবর্তীকালেও বলবৎ ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অনেক ফার্সি স্কুলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলায় ফার্সি স্কুলের অনুসরণে বৃটিশ প্রশাসকরা ইঙ্গ-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। আধুনিক প্রাচ্যভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে বাংলার মুসলমানদের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজি মুহম্মদ মহসিন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদান করেন।

শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মুগল শাসনের এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। প্রাথমিক স্তরে মহিলাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হতো। মুগল দরবারের বহু রাজকন্যা ও হেরেমের মহিলারা বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রোকেয়া বেগম, যাঁর স্বামী

৩০. Adam's *Reports*, 293.

ছিলেন সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ, শায়েস্তা খানের দুই কন্যা ইরান দুখত (পরী বিবি) এবং তুরান দুখত (বিবন বিবি), মুর্শিদকুলীর কন্যা এবং শুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের স্ত্রী জিন্নাত-উন-নেসা এবং তাঁর কন্যাদ্বয় নফিসা বেগম ও দুর্দানা বেগম, আলিবর্দীর স্ত্রী শরফুন্নেসা, তাঁর কন্যা মেহের-উন-নেসা (ঘসেটি বেগম), মায়মুনা বেগম এবং আমিনা বেগম, আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও আতাউল্লাহ খানের স্ত্রী রাবেয়া বেগম। এ্যাডামের বর্ণনায় জানা যায়, সমসাময়িক সাহিত্যে তৎকালীন শিক্ষিত মহিলাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত মহিলা ছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের নায়িকা রাজকন্যা বিদ্যা তাঁর হবু স্বামীকে দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মের তর্কে পরাজিত করেছিলেন।

মুগল আমলে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সাথে পাঠাগার উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বহু পূর্বে মুসলমানরা কাগজের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার (মুগল আমলের শেষপ্রান্তে যার প্রচলন শুরু হয়েছিল) অভাবে ভাল হস্তলিপিকার ও নকলনবিশদের দ্বারা পুস্তক লিখিয়ে প্রকাশ করা হতো। তাঁরা মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিটি বড় শহরে ভিড় করতেন। কোন ব্যক্তির নিজস্ব পাঠাগারকে আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করা হতো। মুগল রাজধানীগুলিতে বহু পাঠাগার ছিল। বাংলায় ইসলাম খান চিশ্তীর পাঠাগারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পাঠাগারের জন্য বই লিপিবদ্ধ করার কাজে লিপিকার নিয়োজিত করেছিলেন। মির্জা নাথনের বর্ণনায় রয়েছে, লিপিকার মির্জা মোহাম্মদকে ইসলাম খান চিশ্তীর[৩১] পাঠাগারের জন্য তিনি বই নকল করতে দেখেছেন। মুর্শিদকুলী খানের একটি মনোরম পাঠাগার ছিল এবং তিনি নিজেই কোরান নকল করতেন। এ্যাডামের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বাংলার মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্ররা তাদের নিজস্ব বই নকল করতো। স্যার যদুনাথ সরকার স্বীকার করেছেন এবং আমাদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে, পাণ্ডুলিপি নকল ও পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে মুসলমানরা (বিশেষকরে মুগলরা) জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। অথচ হিন্দু লেখকেরা সাধারণত তাঁদের রচনাবলী গোপন রাখতেন।[৩২]

মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকেই মুসলমানরা আরবি ও ফার্সি ভাষায় বই লিখতে শুরু করে।[৩৩] কিন্তু মুগল বাংলায় ফার্সি ভাষা প্রশাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার ফলে বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসিত কিছু কিছু সীমান্তরাষ্ট্রে, যেমন রোসাং (আরাকান এবং ত্রিপুরা) রাজ্যে বিকশিত হয় বলে যে ধারণা করা হয় তা অর্ধসত্য বলে প্রতীয়মান হয়। একথা সত্য যে, তুর্কীদের বাংলাবিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা স্তিমিত ছিল। সমাজ ও সংস্কৃতির চালিকাশক্তি হিসেবে সংস্কৃত ভাষা এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে

---

৩১. *Baharistan-i-Ghaibi,* Vol. I, 155.

৩২. J. N. Sarkar, India Through the Ages, (Calcutta 1928), 52.

৩৩. Aziz Ahmad, *Intellectual History,* 113 ff.

পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে চৌদ্দ শতকে ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরে এক নতুন উজ্জীবনের সৃষ্টি হয়। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদ বিকশিত হওয়ার ফলে বাংলার পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব পদাবলী, কড়চা সাহিত্য এবং সাধুদের জীবনবৃত্তান্ত রচনা শুরু করেন। এছাড়াও ব্রতগীত পাঁচালী (দেব-দেবীর সম্মানে রচিত ধর্মীয় পদাবলী), যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাকথা রচিত হয়েছিল।

মুগল আমলে বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। যদিও তখন সুলতানি আমলের মতো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না, তথাপি দেশের অবারিত শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে ফার্সি ও আরবি সাহিত্য এবং ইসলামী ঐতিহ্যের মূল্যবান অবদান এবং উচ্চবংশীয়দের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা ভাষার উন্নয়নের পথে সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি এবং পারস্যের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার সংস্পর্শে আসে। অসংখ্য ইরানী ও তুর্কী কর্মচারী, সুফি, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী বাংলায় আসতে থাকে। ফলে চিন্তাধারার উন্নতি সাধিত হয়, যা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত করে। মুসলমানদের পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে বহু আরবি ও ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা বাংলা ভাষার শব্দকোষকে সমৃদ্ধ করে।

ষোল শতকের শেষভাগ হতে বহু মুসলমান কবি ও লেখক বাংলা ভাষায় লেখার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এদের নেতা ছিলেন সৈয়দ সুলতান (১৫৩০-১৬৪৮)। তিনি চট্টগ্রামের এক পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর *ওফাত-ই-রসুল* গ্রন্থে তিনি আরবি ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন যেন তারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং হিন্দু কাব্যগাথা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের ব্যাপারে শেখ আহমদের (মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-সানি) প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কেবল *নবীবংশ* (নবীপরিবারের ইতিহাস) রচনা করেন নি, দু'টি মরমী গাথাও রচনা করেন, যেমন *জ্ঞান চৌতিশা* ও *জ্ঞান প্রদীপ*। এসব রচনায় সুফিবাদ ও যোগবাদের সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল। এই দলের আরও দুই জন সদস্য হলেন *নূরনামা* (নবীর জন্মবৃত্তান্ত) ও *নসিহতনামা* (ইসলামী আদর্শ ও প্রথা) রচয়িতা শেখ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫) এবং নসরুল্লাহ, যাঁদের দু'জনই চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেখ পরাণের মতো হাজি মোহাম্মদ নুরজামাল ইসলামী মৌলিক নীতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক আদর্শের বর্ণনা আছে। বিখ্যাত রাস্তি খান পরিবারের মোহাম্মদ খান তাঁর শিক্ষক সৈয়দ সুলতানের মতো ধর্মীয় ও মরমী সাহিত্য

রচনা করেন। তাঁর রচিত *মুকতুল হোসেন* মহরমের সময় বাংলাদেশে পাঠ করা হতো। সন্দ্বীপের আবদুল হাকিম একজন মেধাবি কবি ছিলেন। তিনি প্রেম-উপাখ্যান বিষয়ক সাতটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর *নূরনামায়* বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করেন। তিনি বাংলায় বসবাসরত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা ভাষায় অজ্ঞতাকে ঘৃণা করতেন। এমনকি তিনি তাদের জারজ বলে অভিহিত করেছিলেন। মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহশালায় মুসলমানদের লেখা এই জাতীয় প্রচুর পুস্তক পাওয়া যায়।

বাঙালি মুসলমানদের ফার্সি ও হিন্দি ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে রোমান্টিক কবিতার উৎপত্তি হয়। হিন্দু কবিদের রচনার প্রধান বিষয় ছিল দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা। অন্যদিকে মুসলমান কবিরা রোমান্টিক বর্ণনামূলক কাব্য ও প্রেমসঙ্গীত রচনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রেমউপাখ্যান *বিদ্যাসুন্দর* ছিল প্রথম প্রেমগীতি, যা হিন্দুরা রচনা করেছিলেন। সতেরো শতকের একমাত্র মুসলমান কবি ছিলেন শাবারিদ খান। সতেরো শতকে ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় রচিত প্রেমউপাখ্যানমূলক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত দু'টি প্রেমজ ও রূপক কাব্য উত্তর ভারতীয় সুফি কবি কুতবন (১৫০০ খৃ.) রচিত *মৃগাবত* এবং মালিক মোহাম্মদ জায়সী (১৪৯৩-১৫৪২) রচিত *পদুমাবত* রোসাং (আরাকান) রাজদরবারের দুই জন কবি বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁদের একজন ছিলেন চট্টগ্রামের দৌলত কাজি (১৬০০-১৬৩৮), যিনি আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি *সতীময়নার* রচয়িতা ছিলেন, যার ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্মীয় মৈনসাত এবং বারমাস্যার গীতিকার লোর চন্দ্রানী। অন্যজন ছিলেন আলাওল। তিনি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাঙালি কবিদের মধ্যে উচ্চসম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল জায়সীর হিন্দি রূপক কাব্য *পদুমাবতের* বাংলা অনুবাদ *পদ্মাবতী* এবং দৌলত কাজির *সতীময়না*। তাঁর রচিত কাব্য *সয়ফুল-মুলক বদিউজ্জামাল* আরব্য রজনী উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তাঁর দু'টি বর্ণনামূলক কাব্য *সপ্ত পয়কর* এবং *সিকান্দারনামা* নিজামী গজনভীর আদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। আলাওল কেবল তাঁর উপমা, বর্ণনাদক্ষতা এবং রচনাপদ্ধতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, মানবজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্যও খ্যাত ছিলেন। তাঁর কবিতায় জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছিল, যার প্রভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছিল।

রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে ইজ্জতুল্লাহ বাঙালির ফার্সি রচনার অনুকরণে নওয়াজিশ খান *গুলে বকাওলী* রচনা করেছিলেন। খলিফা ওসমানের বংশধর বলে দাবিদার চট্টগ্রামের মোঃ ওয়াজির আলি *শাহনামা* (নাসল-ই-ইসলামাবাদ নামেও পরিচিত) রচনা

করেছিলেন। গ্রন্থটি সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং আরবি অপভ্রংশ দ্বারা পরিপূর্ণ। কুমিল্লার শেখ সাদি রচনা করেছিলেন *গদা মল্লিকা* নামের বিখ্যাত প্রেম-উপাখ্যান। এর বিষয়বস্তু ছিল রাজকন্যা মল্লিকা ও আবদুল্লাহ গদার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্ক। আবদুল্লাহ্ গদাকে রাজকন্যার ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে হাজারটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

সতেরো শতকে ত্রিপুরার বহু কবি প্রেম-উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর ফার্সির অনুকরণে *জেবল মুলক শামারুখ* রচনা করেছিলেন। শুকুর মোহাম্মদ রাজা গোপীচন্দ্র ও রানী ময়নামতীর প্রাচীন গাথার উপর ভিত্তি করে *ময়নামতীর গান* রচনা করেছিলেন। মোহাম্মদ রফিউদ্দিন *জেবল মুলক শামারুখ* এবং মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক *সয়ফুল মুলক লালবেনু* রচনা করেছিলেন।

ষোল শতকের শেষভাগে ও সতেরো শতকের প্রথমভাগে বাংলায় আমদানিকৃত আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে মুসলমান বীর, নবী ও খলিফাদের গৌরবগাথা রচিত হয়। এগুলিকে হিন্দু পুরাণ পাঁচালীর অনুকরণে মুসলিম 'পুরাণ পাঁচালী' বলা হতো। এগুলি দুই ধরনের ছিল––নবী বিষয়ক এবং খলিফা বিষয়ক। নবী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে *নবীবংশ, রসুলবিজয়, রসুলনামা* ও *মোহম্মদ বিজয়*। এগুলি ষোল শতকে বিভিন্ন কবি, বিশেষত মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ খান, চট্টগ্রামের মনসুর, উত্তর বাংলার হায়াত মামুদ, পশ্চিম বাংলার গরিবুল্লাহ এবং আঠারো শতকে বীরভূমের (?) হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপ কর্তৃক রচিত হয়েছিল। সৈয়দ সুলতান *নবীবংশ* ও *জঙ্গনামা* (খলিফাদের যুদ্ধ ও বিজয় এবং অন্তর্কলহের বিবরণ) রচনা করেছিলেন।

পনেরো শতকে ত্রিপুরায় অসাম্প্রদায়িক রচনার মধ্যে আমরা পাই দুই ভ্রাতা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর (১৪০৭-৯৩) রচিত *রাজমালা,* যাতে রাজপরিবারের বর্ণনা আছে। এই রচনায় বাংলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি নওয়াজিশ খান পাঠান প্রশংসা পর্যায়ে দু'টি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি চট্টগ্রামের গভর্নর হোসেন খানের পরিবার প্রসঙ্গে এবং অপরটি জরওয়ার সিংহ কীর্তির জমিদারি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে।

মুগল যুগে হিন্দু ও মুসলমান লেখক ও কবিদের রচনায় প্রাক-মুগল যুগের উদার মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায় এবং এতে দুই সম্প্রদায়ের মরমী ভক্তিবাদের সমন্বয় ঘটে। সাহিত্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ষোল শতকে সহজ সাধনা সুফি মতবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছিল। হিন্দু কবিরা তাঁদের দেব-দেবীদের রহস্য সম্পর্কে কাব্য রচনা করলেও মুসলমান কবিরা অপভ্রংশ যুগের রোমান্টিক কাব্য রচনা চালিয়ে যান।

সুফি যোগী ভক্ত কবি সৈয়দ সুলতান এক তান্ত্রিক নিবন্ধে যোগ (*জ্ঞানপ্রদীপ* অথবা *জ্ঞানচৌতিশা*) সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি তাঁর রচনার নাম সংস্কৃত *হরিবংশের* অনুকরণে

নবীবংশ রেখেছিলেন, যার মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তথ্য ছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনায় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল। এতে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তি ও ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে। বিশেষকরে, সতেরো শতকের শেষভাগে পীর ও সুফিদের বিজয়ী, লুণ্ঠনকারী, শাসক অথবা গুণী সাধু হিসেবে বর্ণনা করে যেসব সাহিত্য রচিত হয় সেগুলি 'পীরপাঁচালি' ও 'পীরগাথা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শ্রীচৈতন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব দূর করেন এবং মুসলমান পীর ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবার উদ্দেশ্যে ধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণভক্তি' ও 'নামনিষ্ঠা' প্রচার করেন যাতে একজন হিন্দু একজন মুসলমান সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করতে পারে। পীরগাথাগুলিতে বৌদ্ধদের 'ধর্মঠাকুর', মুসলমানদের 'পীর' ও হিন্দুদের 'নারায়ণের' সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিকাশমান মুগল যুগের শেষ পর্যায়ে 'সত্যপীরের' গল্প ও 'পুঁথি'র মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মকে একীভূত করার প্রথম প্রয়াস নেয়া হয়। এ পর্যায়ে দুই সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। বাংলা থেকে আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে এসব গাথার লিপিকার ছিলেন হিন্দু এবং গায়ক ছিলেন মুসলমান। সকল পাঁচালীর মধ্যে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের পাচনা গ্রামের ফয়জুল্লাহ রচিত পাঁচালী ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুই সম্প্রদায়ের উপাস্যের অর্থাৎ আল্লাহ, মোহাম্মদ, পাঞ্জাতন পীর এবং অন্যান্য 'পীর' ও 'পীরানি'র গুণকীর্তন করে তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে একই নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করেন। সবচেয়ে বড়ো ও সাবলীল পাঁচালী রচনা করেন বাউল দরবেশ সম্প্রদায়ের মুসলমান গুরু তাহের মাহমুদের হিন্দু শিষ্য কৃষ্ণহরি সরকার (দাস)। এখানে একজন অবিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার সন্তান সত্যপীর একেশ্বরবাদের উল্লেখ করে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও ইসলামের বৈপরীত্য খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

> এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
> সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই
>
> ... ...
>
> সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
> বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

(অর্থাৎ ব্রহ্ম এক। দু'জন ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই। নিরঞ্জন গোঁসাই একমাত্র প্রভু। নিরঞ্জনের অন্য নাম বিসমিল্লাহ। বিষ্ণু ও বিসমিল্লাহ ভিন্ন নয়।)

সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, বিষ্ণু, বিসমিল্লাহ, আল্লাহ, নিরঞ্জন সবই এক নামে বিলীন হয়েছে। অতএব আচার্য আর. সি. মজুমদারের মতে, সত্যপীর মুসলমানদের দেব এবং সত্যনারায়ণ হিন্দুদের দেব ছিলেন—এই কথা সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না অন্তত যখন এরকম উপাসনার সূত্রপাত হয়, তখন।

সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা ব-দ্বীপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুরু হয়। সেই সময়ে সর্প, ব্যাঘ্র এবং কুমিরে পরিপূর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল, ২৪-পরগনা, যশোর, খুলনা ও

নোয়াখালীর উভয় সম্প্রদায়ের লোক স্থানীয় দেব-দেবীর উপাসনা করতো। এর ফলে নতুন জনপ্রিয় পুরাণের সঙ্গে অসম্পর্কিত স্থানীয় দেব-দেবীর গুণকীর্তনমূলক কাব্য অথবা গাথা (মঙ্গলকাব্য বা কথা) রচিত হয়। এগুলিকে 'আঠারো ভিটার পাঁচালী' বলা হতো।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছিল। গোড়ার দিকে আপোস ও পুনর্মিলন দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে ফেলা হতো। বড় খাঁ গাজী নামের পীর ও তাঁর মিত্র কালু শাহ দক্ষিণ রায় ও তাঁর মিত্র কালু রায়কে দক্ষিণ বাংলার এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরিশেষে তাঁদের মধ্যে পুনর্মিলন হয়। হিন্দুদের ত্রাণকর্তা দেব-দেবীদের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যে এবং ধর্ম ও কবিতার প্রতি জনসাধারণের গভীর অনুরাগ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা মুসলিম পীর ও তাঁদের স্ত্রীদের (পীরানি) নিয়ে অনুরূপ গাথা রচনা করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সর্পদেবীকে মনসা নামে উপাসনা করতো। ব্যাঘ্রদেবকে দক্ষিণ রায় এবং কুমিরদেবকে কালু রায় ভজন করতো। কালু রায়ের মিত্র (কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত *রায়মঙ্গল*, ১৬০৮ শকাব্দ/১৬৮৬-৮৭ খৃ.) মুসলমানদের বড় খান গাজী ও মাগার পীর কালু শাহ নামে পরিচিতি লাভ করেন। বনের দেবী বনদুর্গা বা বনদেবী (মঙ্গলচণ্ডীকথায় বর্ণিত) হিন্দু শিকারী, কাঠুরে, মেষপালক ও মধু সংগ্রহকারীদের শুভসাধক দেবী ছিলেন। তাঁকে মুসলমানদের 'পাঁচালী'তে (জহুরানামা) একইভাবে বনবিবি এবং বনবিবির তলা (স্থান) নামে এখনও পশ্চিম বাংলায় পূজা করা হয়। অনাথ ফকির মানিক পীরকে শীবের প্রতিরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। পীর মাচনদালি (পূর্ব বাংলার মাচরাপীর) নাথগুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং যুদ্ধরত পীর মসনদ-ই-আলীর মিশ্র রূপ বলে বর্ণিত হয়েছে। গোরাচাঁদ নামে একজন হিন্দু ঠাকুর ধর্মান্তরিত হওয়ার পর বর্ধমান ও ২৪-পরগনার পীর গোরাচাঁদ নামে তাঁর হিন্দু নাম বহাল রাখেন।

সতেরো শতকে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট (সিলেট), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের বাণী বৈষ্ণব ভাবধারায় পরিপুষ্ট মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ প্রচার করেছিলেন। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী ১৬২ জন শ্লোকরচয়িতা ৯০০ শ্লোক রচনা করেছিলেন। তাঁদের সাহিত্যিক মান যদিও উচ্চ ছিল না, তথাপি শ্লোকগুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল সুগভীর। এগুলি থেকে তাঁদের মানসিক ক্রমবিকাশ চিহ্নিত করা যায়, যা বাংলার সকল মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভের পরেও ধর্মান্তরিতদের পুরনো প্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় নি এবং সেগুলি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল। বৈষ্ণব মতবাদের রাধাকৃষ্ণের মিলনের সাথে সুফি মতবাদের পরমেশ্বর ও আত্মার মিলনকে তুলনা করা হতো। এ প্রসঙ্গে আমরা সতেরো শতকের আলাওল, সৈয়দ মুর্তজা ও নওয়াজিশ খান এবং আঠারো শতকের আলি রেজা (যিনি কানু ফকির নামে বেশি পরিচিত), লাল মোহাম্মদ (ময়মনসিংহ জেলা) এবং অন্যদের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা সকলে হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে সারবস্তু খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উর্ধ্বে সকল ধর্ম যে এক তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

কিছু সংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণব কবি শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপর ভিত্তি করেই গান রচনা করেন নি কিংবা বারমাস্যা লিখেন নি, তাঁরা হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিজেদের দেব-দেবী বলে মনে করতেন এবং কালী ও নাথ সাহিত্যও (শুকুর মাহমুদ) রচনা করেছিলেন। বহু মুসলমান ভক্ত 'যোগশাস্ত্র' অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর আদর্শ ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছিলেন। এমনকি আলি রেজার যোগশাস্ত্রের উপর রচিত *জ্ঞানসাগর* গ্রন্থে 'সাতচক্র'কে স্বীকার করে নেয়ায় জনপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমান মতবাদের এক অনন্য মিশ্রণ ঘটেছে।

স্থাপত্য

হিন্দু ও মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের মধ্যে মৌলিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মুগল যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মতো স্থাপত্যশিল্পেও উভয়ের এক আশ্চর্যজনক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে স্থাপত্যশিল্প পূর্ণতালাভ করে এবং গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে, সুলতানি যুগে যার কোন তুলনা মিলে না। মুগল যুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে এখানকার ভৌগোলিক ও পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো এবং স্থানীয় আদর্শ ও আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল। বৃষ্টি ও বন্যা ছাদের নির্মাণকাজ ব্যাহত করতো এবং পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বৃহৎ ও শক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু পলিমাটিনির্মিত ইষ্টকের প্রাচুর্যের ফলে প্রচুর সংখ্যক ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের জনসাধারণ প্রচুর বাঁশের তৈরি হালকা কাঠামোর সাথে বাঁকানো ও ঢালু চাল পছন্দ করতো। এছাড়া পলিমাটির সাথে বালু মিশ্রিত করে (কঠিন ও পোক্ত হওয়ার জন্য) দেব-দেবী, জন্তু, উদ্ভিদ ও গাছপালার বিশেষ টেরাকোটাশিল্প নির্মাণ করা হতো।

মুগল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে বাংলার অট্টালিকার আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়, যেমন প্রশস্ত প্রবেশদ্বার, টেরাকোটাসজ্জিত দেয়ালের পরিবর্তে চুন ও বালির প্লাস্টারকৃত দেয়াল, কারুকার্যমণ্ডিত খিলান, বিশেষত চৌকোণাকৃতি সূঁচালো খিলান, একটি বা তিনটি বা ততোধিক গম্বুজ। এসব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বেসামরিক ও সামরিক ধর্মীয় ও লোকায়ত অট্টালিকা এবং সমাধিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। এগুলি মুগলরা দিল্লীর মুগল স্থাপত্যরীতির অংশ হিসেবে বাংলায় প্রবর্তন করেছিল। পরবর্তীকালে এর দ্বারা স্থানীয় স্থাপত্যরীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে কতিপয় মসজিদের নাম করা যায়, যেগুলি ইষ্টক ও প্লাস্টার দ্বারা দিল্লীর রীতি অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। ঢাকার জাহাঙ্গীরনগরে শাহ সুজার (১৬৪৯-১৭০৬) আমলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলি ছিল চার প্রকারের—বাংলো আকৃতির, এক গম্বুজওয়ালা, তিন গম্বুজওয়ালা এবং উচ্চস্থানে নির্মিত। ঢাকার বহু প্রাচীন সমাধি মুগল স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহন করে। সাধারণ বেসামরিক অট্টালিকাগুলিও খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কারণ এগুলি বাংলার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের পরিচয় বহন করতো। এগুলির মধ্যে ছিল কিছু ফতেহপুর সিক্রির অট্টালিকার অনুরূপ দ্বিতল ভবন, সরাই এবং

ব্যবসায়ীদের বাসস্থান (কাটরা দালান)। মুগলদের কাটরা দালানের ধ্বংসাবশেষ শেরপুরে (বগুড়া জেলা) পাওয়া গেছে। ঢাকার বড় কাটরা সুজার বাসস্থান হিসেবে মুগল স্থাপত্যের অনুকরণে মরুসরাইয়ের আকারে নির্মিত হয়েছিল (১৬৪৪), যেখানে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত অঙ্গন ঘিরে অসংখ্য কক্ষ ছিল। এর গম্বুজ ও খিলানগুলিতে সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল। শায়েস্তা খানও (১৬৬৫) একই পরিকল্পনায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেছিলেন।

মুগল স্থাপত্যের প্রভাব শিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও তার চতুষ্পার্শ্বে লক্ষ্য করা যেতো। মুর্শিদকুলী খান একে বহু রাজপ্রাসাদ দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল 'চেহেল সাতুন' ও 'কাটরা মসজিদ'। তিনি ও সিরাজউদ্দৌলা ইমামবাড়াও নির্মাণ করেছিলেন। সামরিক স্থাপত্যেও বাংলায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুলতানি যুগে নদীর সঙ্গমস্থলে জলবেষ্টিত মাটির দুর্গ তৈরি হতো, যেমন গৌড়ের দুর্গ। মুগল যুগেও এমন দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে সোনাকান্দা, খিজিরপুর এবং মুন্সীগঞ্জে ইসলাম খান নির্মিত দুর্গ এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। শাহজাদা আজম যে দুর্গের নির্মাণকাজ আরম্ভ করেছিলেন তাও অসমাপ্ত থেকে যায়।[৩৪]

৩৪. স্থাপত্যের জন্য দেখুন, A. H.Dani,"Muslim Architecture in Bengal," (Dhaka 1963).

রাষ্ট্র ও শিক্ষা

জাহেদা আহমদ*

বাংলায় পাশ্চাত্যশিক্ষা : যাত্রাশুরু

মেকলের বিজয়

আঠারো শতকের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রক্রিয়ায় সার্বিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল গোটা বাংলায়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতবদলের অভিঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল এদেশে বিদ্যমান পুরনো ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো। ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল জীবনের নানা ক্ষেত্রে। ফলে জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাব। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা সমাজের উচ্চবিত্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের ইউরোপীয় স্বশ্রেণীভুক্তদের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন মনোবৃত্তির ছিলেন। সেজন্য দেখা যায় যে, শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য ভারতীয় উচ্চবর্গীয়রা ব্যক্তিগতভাবে বেসরকারি উদ্যোগকে জমিজমা ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সহায়তা করতেন। সে যুগে এভাবেই উচ্চবিত্তরা এদেশে ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষার একটা অতিশয় প্রাথমিক কাঠামো চালু রাখার দায়িত্ব পালনের প্রয়াস পেতেন। মনে রাখতে হবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা সে যুগে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দেশেই ছিল না যদিও তৎকালীন পাশ্চাত্যে সংগঠিত চার্চ এ দায়িত্ব বেশ কিছুটা পালন করতো।

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্রমশ ফিরে আসতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসকরা এতকাল যাবৎ এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিশেষ করে তাদের শাসনামলের প্রথম দিকে এ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। একে তো এদেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ছিলই, তদুপরি নবলব্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা সংহতকরণের কাজই অগ্রাধিকার পেয়েছিল তাদের কাছে। অথচ এদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন ধারার আবাহন জরুরি ছিল খুবই। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বন্ধ্যাত্বের কারণে জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল তাতে মৌলিক সৃজনশীলতার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় আবদ্ধ ছিল নিজ নিজ সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার গতানুগতিক গণ্ডিতে। মক্তব-মাদ্রাসা ও টোল-চতুষ্পাঠীসমূহে শিক্ষা ছিল প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক, যেখানে কূপমণ্ডুকতা ও মুখস্থবিদ্যার অপ্রতিহত প্রাধান্যের দরুন শিল্প, সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে পারে নি।

শাস্ত্রশাসিত সমাজের সার্বিক এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে উঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ। পাশ্চাত্যের উদীয়মান নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরুর প্রস্তুতি নিলেন তারা। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি ও তাদের ইউরোপীয় সহযোগীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরি, জন মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অবদান স্মরণীয়। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরোপের পার্থিব সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে তার জ্ঞানভাণ্ডার। কাজেই এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় আন্দোলনের সূচনা হয় অবিভক্ত বাংলাদেশেই,রামমোহন রায় ছিলেন যার পুরোধা।

কোম্পানির সরকার প্রথমদিকে এতে তেমন কোন উৎসাহ দেখায় নি। বরঞ্চ তাদের ঝোঁক ছিল সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি। তাই দেখি, কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে, ১৭৯২ সালে জোনাথন ডানকান প্রতিষ্ঠা করেন কাশী সংস্কৃত কলেজ। পরবর্তীকালে 'প্রাচ্যবাদী' নামে পরিচিত এই সনাতনপন্থীরা ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের অধীনে প্রদত্ত বার্ষিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষা অনুদান তাঁদের পছন্দসই সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যার্থে ব্যয় করতে থাকেন। কিন্তু ১৮৩০–এর দশকের শুরু থেকে এই সব প্রাচ্যবাদী পিছু হটতে থাকেন পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির মুখে। এই বিতর্কের অবসান ঘটে ১৮৩৫ সালে, যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের বিখ্যাত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে এদেশে ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-

বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারকে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন। সরকারি নীতির এই পরিবর্তনের ফলে ক্রমে বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক সরকার-পরিচালিত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে উঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আসতো প্রধানত বাংলার উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো থেকে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের আরো দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। এর একটি হচ্ছে ১৮৩৭ সালে সরকারি অফিস-আদালতসমূহে ফার্সির বদলে ইংরেজি ভাষা চালু এবং ১৮৪৫ সালে সরকারি চাকুরিতে ইংরেজিশিক্ষিতদের অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি প্রবর্তন।[১] এই দুই রাষ্ট্রীয় নীতির সম্মিলিত প্রায়োগিক যোগফল দাঁড়ালো এই যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বর্ণপ্রসবিনী হয়ে উঠলো এই শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য। কিংবদন্তির রাজা মিডাসের সোনালী স্পর্শের যাদু যেন সঞ্চারিত হলো আধুনিক শিক্ষার মধ্যে। যাবতীয় পার্থিব সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠিতে পরিণত হলো এই শিক্ষা।

'ইংরেজি মানে টাকা'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই কয়েক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের মাটিতে বেশ বিকাশলাভ করলেও এর পুরোটাই অনেকখানি এলোমেলো ও খামখেয়ালিভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালার এবং একে নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও পরিচালনা করার মতো দক্ষ সুবিন্যস্ত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের। তাই ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন নবায়নের আগে বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে। এরই ভিত্তিতে বোর্ড অব কন্ট্রোলের তৎকালীন সভাপতি স্যার চার্লস উড তাঁর বিখ্যাত ১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন। এতে প্রথমবারের মতো এদেশে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে এতে বেন্টিঙ্ক-এর লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়, "এদেশের সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে উন্নততর ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের তথা ইউরোপীয় জ্ঞানের প্রসার।" এতে বলা হয় যে, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও মাতৃভাষার ব্যবহার চলবে। প্রতিটি প্রদেশে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য বিদ্যমান অপেশাদার কমিটির স্থলে জনশিক্ষা

---

১. ১৮২৮ সালে রাজশাহীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আট বছর পর সরকার এটি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এটি রূপান্তরিত হয় রাজশাহী সরকারি কলেজে। অনুরূপভাবে ১৮৩৬ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরে যার নতুন নামকরণ হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ঢাকা সরকারি কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৬ সালে। নিকি পগোজ নামে ঢাকাবাসী একজন আর্মেনীয় জমিদার ঢাকার পগোজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরিচালকের অধীনে অধিকতর অর্থবরাদ্দসহ একটি জনশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা হবে। ঐ সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উক্ত প্রস্তাবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। ভারতবর্ষে বিরাজমান পরিস্থিতিতে লন্ডন মডেলই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। কারণ কম খরচে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু সম্ভব ছিল না। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার আরো সম্প্রসারণের জন্য হাইস্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং স্কুল-কলেজে মেধাবি ছাত্রদের বৃত্তি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। চার্লস উড আশা করেছিলেন যে, এভাবেই এখানে তথাকথিত 'নিম্নমুখী পরিস্রবণ তত্ত্বের' ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করা সম্ভব হবে। ততোদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এযাবৎ অনুসৃত এই তত্ত্বের প্রভাবে "সরকারি নীতি মূলত সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য অতি উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছিল।"

কিন্তু শিক্ষাসম্প্রসারণের যেকোন কর্মসূচি পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দের নিশ্চয়তা ছাড়া অর্থবহ হতে পারে না। কিন্তু এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ডেসপ্যাচ "শিক্ষাব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা আছে"—এধরনের অস্পষ্ট উক্তি করে পাশ কাটানোর প্রয়াস পায়। সরকার যেহেতু পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করতে পারবে না, কাজেই ডেসপ্যাচের প্রণেতারা প্রস্তাবিত সরকারি অনুদান বা গ্রান্ট-ইন-এইড-এর মাধ্যমে কিছু শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার প্রস্তাব রাখেন। ডেসপ্যাচের মুখবন্ধে তাঁরা ভারতবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বকে সরকারের 'পবিত্র কর্তব্য' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু উপসংহারে তাঁরা সেই কর্তব্যের সীমানাটুকু টানেন এভাবে—"আমরা সেই সময়ের প্রত্যাশায় আছি যখন প্রস্তাবিত সরকারি অনুদানপ্রথার ক্রমবিস্তৃতির ফলে সম্পূর্ণরূপে সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি সম্ভব হবে। তদুপরি এমন দিনও আসতে পারে, যখন বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানের, বিশেষকরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই কোন ক্ষতি পরিহার করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্থানীয় সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।" এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারি কোষাগারের দৈন্য কাটিয়ে উঠার জন্য বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলো, ছাত্রবেতন এবং দানশীল দেশবাসীকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই উৎসগুলো অনেকখানি সহায়ক হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

তা সত্ত্বেও ডেসপ্যাচের প্রস্তাবের অনেকগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বাংলায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান জেলাশহরগুলোতে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য অনুকরণীয় মডেল হিসেবে সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাকে

উৎসাহিত করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন তুলনামূলকভাবে কম এবং ভর্তির নিয়মকানুন অধিকতর শিথিল ছিল। সরকারের লক্ষ্য ছিল খরচ না বাড়িয়ে শিক্ষাকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে অনেকখানি সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ বেশিদিন সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। কাজেই সাধারণ্যে হান্টার কমিশন নামে খ্যাত ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষাকমিশন বাধ্য হয় কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করতে, যাতে করে ব্যক্তিউদ্যোগকে যুগপৎ উৎসাহদান এবং কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাখাতে ব্যক্তিউদ্যোগের বৃহত্তর ভূমিকার কথা বলে হান্টার কমিশন খুব নতুন কিছু করেন নি, বরং যা করেছে তা হলো বাস্তবে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি।

পরবর্তী দুই দশকে কলেজিয়েট ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এই প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হয় যদিও এটা ঘটেছিল মূলত বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ ততোদিনে প্রবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ব্যতিরেকেই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছিল সর্বাধিক। সর্বোচ্চ সংখ্যক কলেজ, স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল এই প্রদেশেই। যেমন ১৯০২ সালে সারা ভারতবর্ষের কলেজছাত্রের প্রায় অর্ধেকই অধ্যয়নরত ছিল এই বাংলা প্রদেশে। ভারতবর্ষের ৩,০৯৭টি স্কুলের মধ্যে ১,৪৮১টি অবস্থিত ছিল বাংলায়।[২] প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের গড় সংখ্যা বাংলায় যেখানে ছিল ৩০টি, সেখানে মাদ্রাজে ছিল ২০টি, বোম্বেতে ১৭টি এবং যুক্তপ্রদেশে ৪টি।[৩]

বাংলার কলেজসমূহের অনেকগুলোই কালের বিবর্তনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাই স্কুল থেকে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলায় উচ্চশিক্ষাবিস্তার প্রক্রিয়ার এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে। একেবারে শুরুতেই দেখতে পাই, হিন্দু কলেজের যাত্রা শুরু (১৮১৭) হিন্দু বিদ্যালয় থেকে। একই পথপরিক্রমায় আসে হুগলী কলেজ (১৮৩৬), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৫), বহরমপুর কলেজ (১৮৫৩), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪), নড়াইল কলেজ (১৮৮৬), ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), মুরারীচাঁদ কলেজ (১৮৯১), এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৯৮) এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯)। বাংলায় কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া জেলাশহরগুলোতেও কলেজ গড়ে উঠেছিল, যা বোম্বে বা মাদ্রাজের বেলায় ঘটে নি। বহু কলেজের জন্য স্থানীয় জমিদারগণ জমিজমা, ভবন এবং কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

২. *ভারতের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৯০২-০৭, ২য় খণ্ড, সারণি নং ৭৫।

৩. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৮৯৭-১৯০২, ১ম খণ্ড, ৯৬।

কিন্তু ব্যয়ের সিংহভাগই এসেছে ছাত্রবেতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৎসামান্য সরকারি অনুদান থেকে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন শিক্ষকদের কাজ করতে হয়েছে স্বল্পবেতনে এবং পাঠ্যক্রমে ব্যয়বহুল বিজ্ঞানশিক্ষার স্থলে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলো। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যদিও সংখ্যার হিসেবে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

১৮৮২ সালে বাংলায় ৩০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল সরকারি কলেজে। কিন্তু ১৯০২ সালে মোট ৮০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রের এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল সরকারি কলেজে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারি কলেজগুলোতে ছাত্রসংখ্যা মোটামুটি স্থির ছিল, কিন্তু প্রাইভেট কলেজগুলোতে ছাত্রসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে।[৪] অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশগুলোর তুলনায় বাংলায় উচ্চশিক্ষা ছিল মোটামুটি সস্তা। কলেজছাত্রপ্রতি গড় বার্ষিক ব্যয় এবং ছাত্রপ্রতি বেতনও সর্বাপেক্ষা কম ছিল বাংলায়।[৫] কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রও সবচেয়ে বেশি ছিল এখানে। মানবিক বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রিধারীদের এবং অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছিল বেশি।[৬] মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলার অবস্থা ছিল ভারতীয় সব প্রদেশের শীর্ষে। ১৯০১-০২ সালে ৩০৯৭টি ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেকই ছিল বাংলায়।[৭] এখানে প্রতি ১০৪ বর্গমাইলে একটি করে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। এই হার ছিল পূর্ববঙ্গে প্রতি ১১৫ বর্গমাইলে, মাদ্রাজে প্রতি ৩৮০ বর্গমাইলে, বোম্বেতে প্রতি ৩৯৩ বর্গমাইলে এবং যুক্তপ্রদেশে প্রতি ৫৬৭ বর্গমাইলে একটি করে। কলেজগুলোর মতো এসব স্কুলেরও অধিকাংশই ছিল বেসরকারি। অনেকগুলো চলতো কোন সরকারি অনুদান ছাড়াই। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই এসব স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।[৮] এসব স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যাও এখানে ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এদেরই সংখ্যা বেড়ে চলছিল তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিশেষকরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকেন্দ্রিক উচ্চতর পাশ্চাত্য এ বাংলার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের একান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাঙালি সমাজে এই যে পরিবর্তন এসেছিল তা পাশ্চাত্যের দ্রুত অগ্রসরমান দেশসমূহে চলমান আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন থেকে তেমন ভিন্নধর্মী কিছু ছিল না। কিন্তু বাস্তবে ঔপনিবেশিক বাংলার সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলির তফাৎ ছিল আকাশ-পাতাল। পাশ্চাত্যের দেশে

---

৪. *ভারতের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ২য় খণ্ড, ৬২,সারণি ৪০।
৫. *ভারতের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৯১২-১৭, ২য় খণ্ড, ১৩০, সারণি ৪৬।
৬. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৮৯৭-১৯০২, ২য় খণ্ড, ৫৯, সারণি ৩৩।
৭. *ভারতের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ২য় খণ্ড, ২৩১, সারণি ৬১
৮. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৮৯৭-১৯০২ , ১ম খণ্ড, ৯৬।

দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। আর সেই অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে তাদের ক্রমসম্প্রসারমান কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবদান ছিল মুখ্য। এই উন্নয়নই প্রকারান্তরে গোটা অর্থনীতিতে বিপুল ও বর্ধমান হারে কর্মসংস্থানের দ্বার খুলে দিয়েছিল। ফলে উচ্চশিক্ষার ফসল উদ্যমী তরুণরা উপকৃত হয়েছিল বিশেষভাবে। বৃটিশশাসিত বাংলায় তা সম্ভব ছিল না, কারণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা বাংলার অর্থনীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছিল। কাজেই বাংলার জনসমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে তার বেড়ে উঠার কোনো সুযোগ ছিল না। এমনকি বাংলার কৃষিপ্রধান অর্থনীতিও তার রুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে শিক্ষার সম্পসারণে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি। তার মানে এই নয় যে ছোট-বড় মিলিয়ে বাংলার জমিদারদের এদেশে শিক্ষার প্রসারে কোনো অবদান ছিল না। বরং উল্টোটাই ঘটেছিল বলা যায়। বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগ যে অতি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল সেই কর্মকাণ্ডে বাংলার অনেক জমিদার সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন।

এ ছিল উচ্চবর্গীয়দের তৎপরতা। সমাজের নীচতলায় অধিষ্ঠান ছিল যাদের, সেই চাষী-তাঁতী-কামার-কুমোর-জেলেসহ অন্যান্য নিম্ন পেশাজীবীদের অবস্থান কী ছিল? তারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলেও অক্ষরজ্ঞান কিংবা তার চেয়ে অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাদের অবস্থান এই বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল নেহাতই অকিঞ্চিৎকর । বাংলায় বিগত শতবর্ষব্যাপী শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ তাদের স্পর্শও করে নি। বিশ শতকে এসে দেখা গেল, চিত্রটা কিছুটা হলেও পাল্টাচ্ছে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে পাটের বাজারে যে তেজীভাব দেখা দিয়েছিল তার প্রভাবে বাংলার এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার স্বল্পআয়সম্পন্ন পাটচাষীর কিছু বাড়তি অর্থসমাগম ঘটেছিল। নবলব্ধ সেই আর্থিক সঙ্গতি ওই পরিবারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের পুত্রসন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে। এরপর থেকে সমাজের ওই স্তরে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তাদের সংখ্যা ধীরলয়ে হলেও বাড়তে থাকে।

অতএব বাংলায় আধুনিক শিক্ষার জন্য যে প্রবল চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল তার পেছনে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি, এক কথায় অর্থনীতির প্রয়োজন চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে নি। বরং এক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা হলো বাঙালি বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ), যারা সচরাচর 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত, তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করেই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা তার তৎকালীন আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করেছে। বাংলার সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরূপে এদের চিরকালীন পরিচয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় শিক্ষা-দীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য বহন করে এসেছে এরা। পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং আয়তনে ও গুরুত্বে এদের সমতুল্য একটি

জনগোষ্ঠীর তুলনা মেলা ভার হবে। আবহমান কাল থেকেই বাংলার শাসককুল—দেশী-বিদেশী কিংবা হিন্দু-মুসলিম-ইংরেজ নির্বিশেষে—এই বর্ণহিন্দু গোষ্ঠী থেকেই তাদের অধস্তন কর্মচারী তো বটেই, এমনকি অধিকাংশ পদস্থ কর্মকর্তাও নিয়োগ করে এসেছিলেন। এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীর পক্ষে এতকালের পরিচিত কিন্তু বিদেশী ভাষা ফার্সি থেকে নবাগত বিদেশী ভাষা ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বরণ করে নেয়া খুব সহজ ছিল বৈকি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, একই নতুন ভাষা শেখাটা তাদের শ্রেণীস্বার্থে বড় প্রয়োজনও ছিল। কারণ সরকারি চাকরি বা উচ্চতর পেশার জন্য ইংরেজি ভাষা ততদিনে একমাত্র চাচিকাঠিতে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশ্চাৎপদতার কারণে মধ্যবিত্তের চাকরির সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত। সে কারণে এই উপমহাদেশে এদের জন্য রাষ্ট্রই হয়ে দাঁড়ায় চাকরির সবচেয়ে বড় উৎস। উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকরির বেলা তো বটেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্তের এত আগ্রহের কারণ নিহিত ছিল ওখানেই। একথা মনে রেখেই ১৮৩৫ সালে মেকলে তাঁর সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "বাজারই এই শিক্ষার ভবিষ্যৎ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে"। অনরূপ মন্তব্য করেছিলেন প্রায় দু'দশক পর লর্ড এলেনবরো। বৃটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, ভারতে "ইংরেজি ভাষা মানেই হচ্ছে টাকা"। মধ্যবিত্তের চাকরির এই চাহিদা অবশ্য বৃত্তবন্দি হয়ে পড়েছিল সুপরিচিত সংকীর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে। উচ্চতর শিক্ষার পরিক্রমণপথ এভাবেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে উত্তরণ ইংরেজ আমলে সম্ভব হয় নি। মধ্যবিত্তের এই আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনউদ্যোগের আকর্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়েছিল, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল লক্ষণীয়ভাবে। এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার এলিট চরিত্র বোঝার জন্য তথ্য-উপাত্ত-পরিসংখ্যানের চেয়ে এই ব্যাপারটিই যথেষ্ট।

তবে, সংখ্যায় বাড়তে থাকলেও তদনুপাতে এখানে লেখাপড়ার গুণগত মানের তেমন উন্নতি হচ্ছিল না। জনাকীর্ণ শ্রেণীকক্ষ, অপর্যাপ্ত ভবন ও সাজ-সরঞ্জাম, স্বল্পবেতনভুক অযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিম্নমানের পাঠ্যক্রম, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও অঞ্চলভেদে শিক্ষার অসম বিস্তার, মানববিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক—এসব বিভিন্ন কারণে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছিল। লর্ড কার্জন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইনের মাধ্যমে এই গলদগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর পশ্চাতে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সরকার কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত সস্তা নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা বিক্ষুব্ধ বৃটিশবিরোধী নাগরিকই তৈরি করছে, কাজেই এর রাশ টেনে ধরতে হবে। কিন্তু এর প্রতিবিধানকল্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা তিনি নিলেন তাতে তাঁর অভীষ্ট পুরোপুরি সিদ্ধ হয় নি। এতে মানের উন্নতি তেমন সাধিত হয় নি, শিক্ষার

সম্প্রসারণ শ্লথ হয় নি এবং শিক্ষাকাঠামোর ভারতীয়করণ আরো ত্বরান্বিত হয়। ফলে উচ্চস্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আগের মতোই নাগালের বাইরে থেকে যায়।

সংস্কার ও পুনর্গঠন

এভাবে কার্জনীয় সংস্কারের পটভূমিতেই সূচিত হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ভূমিকা ও চরিত্র পরিবর্তনের পালা। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলির কাজ ছিল সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান, কলেজগুলি অধিভুক্তকরণ এবং বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতিদান করা। শিক্ষাদানের আসল দায়িত্ব অর্পিত ছিল কলেজের উপর। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম নিজস্ব পরিচালনায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালু করে।

কাজ এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে, যার ফলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালের মধ্যেই পুরো স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কার্যক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার কেন্দ্র হিসেবেও এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

কার্জনের উল্লিখিত পদক্ষেপের চেয়েও অধিকতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিতর্কিত ছিল তাঁর আর একটি ব্যবস্থা, বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ এই অঞ্চলের, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষাসংস্কার ও পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে জোরদার করে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে গুটিকয়েক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এই লক্ষ্যগুলি ছিল মূলত বঙ্গভঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ। স্বভাবতই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও চাকুরিনীতিতে এই লক্ষ্যগুলির প্রভাব পড়েছিল। এই সরকার চেয়েছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বর্ণহিন্দুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটির ভিত্তিটাকে দুর্বল করে কালক্রমে তা উৎখাতের পথ প্রশস্ত করতে এবং সেই শূন্যস্থানে একটি মুসলমান প্রতিপক্ষ শ্রেণীও গড়ে তুলতে। এই বর্ণহিন্দুরা ভূমিমালিকানা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য বাংলার, বিশেষকরে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, প্রশাসনে এবং বিভিন্ন পেশায় প্রায় নিশ্ছিদ্র একাধিপত্য কায়েম করতে পেরেছিল। সমাজের সর্বস্তরে এবং বিশেষকরে শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অনগ্রসরতার আবেগময় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা উইলিয়ম হান্টার উপস্থাপন করেছিলেন ১৮৭১ সালে। তারপর থেকেই মুসলিম পশ্চাৎপদতার বিষয় নিয়ে আমাদের ইংরেজ শাসকরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

নিঃসন্দেহে, বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় বাঙালি মুসলমানরা অন্যান্য অনেক কিছুর মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল বহু পশ্চাদ্‌বর্তী'। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯০১ সালে একমাত্র কলকাতাতেই শিক্ষার জন্য যা ব্যয় হতো তা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় মোট শিক্ষাব্যয়ের চেয়েও বেশি। অবিভক্ত বাংলায় ১৯০৩-১৯০৪ সালে সাধারণ কলেজগুলোতে মোট ৮০০৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬৩ জন, বি. এ. শ্রেণীর ২৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩ জন এবং এম.এ. শ্রেণীর ৭৯ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান।[৯] বঙ্গভঙ্গের ফলে সরকার এবং তার মুসলমান মিত্রদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে দুর্বল কিন্তু সংখ্যায় শক্তিশালী বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে নতুন এই রাজনৈতিক মানচিত্র বদলের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেশি দেরি হয় নি। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি বঙ্গবিভাগের উল্লেখযোগ্য স্থায়ী সুফলের একটি হিসেবে অবশ্যই গণ্য হতে পারে।

তাই দেখা যায়, নতুন প্রাদেশিক সরকার এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই অঞ্চলে শিক্ষা পুনর্গঠনের এক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তাঁর স্বল্পস্থায়ী কার্যকালে শিক্ষার উন্নয়নে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর সূচিত সমুদয় নীতিমালা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহেরও গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম জনশিক্ষা পরিচালক হিসেবে ফুলার বেছে নিয়েছিলেন আই. ই. এস. (Indian Educational Service)-এর হেনরি শার্পকে। সুদক্ষ, দৃঢ়চিত্ত এবং অত্যুৎসাহী হেনরি শার্প শীঘ্রই বাঙালি সমাজে পরিচিত হয়ে উঠেন তাঁর মুসলমানঘেঁষা নীতি ও পূর্ববঙ্গপ্রীতির কারণে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে হেনরি শার্প এই প্রদেশের স্কুল-কলেজগুলির গুণগত মান বেশ কিছুটা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান। তদুপরি মুসলমানদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি তাদের জন্য বিশেষ সহায়তাদানের কর্মসূচি চালু করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর ও পেশাভিত্তিক শিক্ষাস্তরে (professional education) অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থাসহ সরকারি ও অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে ৮ শতাংশ আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করেন। তিনি বৃহৎ মাদ্রাসাগুলির জন্য আরো বেশিকরে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করেন, গোটা দুই মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান করেন এবং বেশিকরে হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করেন।[১০]

সরকারি শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া হিন্দু নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো। শর্তসাপেক্ষ অনুদানের মাধ্যমে সরকার প্রায় সবগুলি

---

৯. Z.H. Zaidi, *The Partition of Bengal and its Annulment, 1902-11*, 348-49.

১০. *পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট*, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, ১ম খণ্ড, ৮১।

বেসরকারি কলেজের উপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারকে তার শিক্ষাউন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও ঢেলে সাজানো বেসরকারি কলেজগুলির যৌথ উদ্যোগের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। আর তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবাসিক সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সরকার যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাতে ১৯১২ সাল নাগাদ প্রায় প্রতিটি সরকারি হাইস্কুলে একটি করে মুসলিম হোস্টেল গড়ে উঠে। মুসলিম শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে—ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, জনশিক্ষা ও পরিদর্শন (Inspectorate) দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন, মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে সেক্যুলার বিষয় অন্তর্ভুক্তিকল্পে মাদ্রাসা কারিকুলামের সংস্কার।[১১] নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও মাত্র সাত বছর সময়ের মধ্যে সরকারের কৃতিত্ব বেশ চোখে পড়ার মতো। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা ও সরকারি নীতির সম্মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সরকারি ও অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি কলেজগুলোর আয়তন, ভৌত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষকদের গুণগত মানের বাঞ্ছনীয় উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। এর ফলে ১৯১১ সালের শেষ নাগাদ প্রদেশের পাঁচটি বিভাগের সব ক'টিতে সরকারি কলেজ দেখা যায় এবং একটি ছাড়া সবগুলিরই বি. এ. পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি ছিল। সে যাই হোক, মূলত অর্থের অভাবেই মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে গৃহীত সরকারি উদ্যোগকে সরকারি সেক্টরেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তবে, স্বল্পস্থায়ী এই সরকারের শিক্ষানীতির উজ্জ্বলতম অর্জন ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘোষণা। এই ঘোষণাকে আমরা স্বচ্ছন্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল বলে ধরে নিতে পারি।

এই সময়ের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যানও সেই কথাই বলে। প্রদেশের মোট শিক্ষাব্যয় ১৯০৬-০৭ সালে ১৩,২৮,১২৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সালে দাঁড়ায় ২৫,৩৩,৫৬৯ টাকা। এই টাকার সিংহভাগই খরচ হয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য[১২] এবং এর ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল। তার প্রমাণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৩,৬৪,৮০৩ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সালে হয়েছিল ৫,৩৩,৩৩৩ জন। এই বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় ছিল এক থেকে দেড় গুণ বেশি।[১৩]

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল এই পাঁচ বছর সময়ে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোট

---

১১. ঐ, ১-২, ২৬-৩৪।

১২. ঐ, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ২৭, ১৫ ।

১৩. ঐ, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ২৮, ১৬।

ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৩১,৯০০ (১৯০১-১৯০২) থেকে ৪,২৫,০০০ জন (১৯০৬-১৯০৯) এবং ৫,৭৫,৭০০ জন (১৯১১-১২) হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রতি ঝোঁকটাও ছিল লক্ষণীয়। ১৯০৬-০৭ সাল থেকে ১৯১১-১২ সালের সময়সীমায় প্রাথমিক স্তরে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫৮ ভাগ এবং কলেজস্তরে শতকরা ৪০৭ ভাগ হারে।[১৪] এই বিদ্যার্থীদের সিংহভাগই পাঠরত ছিল সবকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কারণ সর্বতোভাবে হিন্দুপ্রভাবিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তারা পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। ১৯০৬-০৭ সালে সারা পূর্ববঙ্গ ও আসামে এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে ১২ জন (শতকরা ৪.৩ ভাগ) এবং স্নাতকদের মধ্যে মাত্র ১ জন (শতকরা ২.৪ জন) ছিল মুসলমান। ১৯১১-১২ সালে মুসলমান স্নাতকদের হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ (কলা) ও শতকরা ৯.৬ ভাগ (বিজ্ঞান)।[১৫]

পূর্ববঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের এই সরকারি নীতি বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর যুক্তবাংলার সরকারও শেষ অবধি বজায় রেখেছিল। সরকারি উৎসাহদানের নীতি ছাড়া আরো একটি কারণেও পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বেড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে কিছুটা কাঁচা টাকা এসেছিল। বিশেষ করে পাটের কল্যাণে এই সময়ে পাটচাষীদের ঘরে যে কিছুটা উদ্বৃত্ত অর্থাগম হয়েছিল তার একাংশ তারা তাদের ছেলেদের উচ্চতর শিক্ষায় বিনিয়োগ করেছিল। শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর বর্ণহিন্দুরা এতে প্রমাদ গুণেছিল। এতকাল লোভনীয় সরকারি চাকরিক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত। এখন সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের আবির্ভাব তাদেরকে তাদের অগ্রগামী অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য স্বভাবতই আরো সঙ্কল্পবদ্ধ করে তোলে। এই সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসারে।

ঢাকার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় : একটি নতুন মডেল

দুই বাংলার পুনরেকত্রীকরণকে বঙ্গীয় মুসলমানদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ঢাকায় অদূর ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি মুসলমান প্রতিনিধিদলের কাছে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। মুসলমান সমাজের ক্ষোভ ও আশঙ্কাকে প্রশমিত করা ছিল এই ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আরো উদ্দেশ্য ছিল।

---

১৪. ঐ, সারণি ২১৬ ও ২২৪, ২য় খণ্ড, *British Policy and Administration in Bengal, 1905-1912.*

১৫. *পূর্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২* ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ১৫৮।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষরূপে ভারত সরকার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মডেল হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জনসমক্ষে স্থাপন করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে এককেন্দ্রিক (unitary),আবাসিক এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সরাসরি শিক্ষাদানকারী (teaching) উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে এর কোনটাই ছিল না। যদিও এই ঘোষণার প্রায় এক যুগ পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, তথাপি এই ঘোষণার পর ভারতে যতোগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সবগুলিই ছিল ঢাকার অনুকরণে স্থাপিত।

কলকাতার ঘটনাপ্রবাহ

ঢাকায় উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিয়ে যখন এইসব চিন্তাভাবনা-পরিকল্পনা চলছিল, তখন কলকাতার ঘটনাপ্রবাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে থাকে নি। সেই ১৯০৬ সাল থেকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে সেখানে ব্যাপক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ছত্রছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিচালনা-কারী প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাদান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কাজটি শুরু হয় তাঁরই নেতৃত্বে।[১৬] প্রথমদিকে অতি সতর্ক ও সীমিত মাত্রায় শুরু হলেও ঢাকা ঘোষণা এই প্রক্রিয়াকে অতি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঢাকা ঘোষণার ফলে সাধারণভাবে বাঙালি হিন্দুদের মনে যে তীব্র বিদ্বেষ, ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯১২ সালের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণকাজ চলে অত্যধিক দ্রুত গতিতে। এভাবেই আশুতোষ বাংলার প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সরকারি রাজস্বের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[১৭] সময় ও অর্থ দুটোই ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই কলকাতা

---

১৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন মিন্টো। তিনি অর্থনীতি বিভাগে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিয়োগলাভ করেন। অর্থনীতির এই অধ্যাপক পদ ১৯০৯ সালে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে সৃষ্টি করা হয়।

১৭. ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর স্যাডলার কমিশনের কাছে দেয়া গোপন প্রতিবেদনে আশুতোষ জোর দিয়ে বলেন, "ঢাকাকে অবশ্যই সীমিত পরিসরে ও যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হবে। অবশ্য যদি তাকে একটি রাষ্ট্রপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে কৃত্রিমভাবে কলকাতার চেয়ে উচ্চ আসনে বসানোর চেষ্টা করা হয় তবে ভিন্ন কথা।" অতঃপর তিনি একটি 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্ন উত্থাপন করেন—'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহলে কি কলকাতা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হবে? যদি না হয়, তাহলে কে অগ্রাধিকার পাবে? ... ঢাকার জন্য আমরা যাই করি না কেন, বাংলায় কলকাতার স্থান সর্বাগ্রে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। কাজেই এধরনের একটি উন্নত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ হবে।' ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা, আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনটি রক্ষিত আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সরকারি সমর্থন বা পদক্ষেপ ছাড়াই যথাসম্ভব দ্রুত যতো এগুনো যায় ততোটাই অগ্রসর হওয়া একান্ত জরুরি ছিল। শিক্ষক পদে প্রথম নিয়োগের পরে আরো বেশ কিছু শিক্ষকপদ সৃষ্টি করা হয়। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, ১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ যখন বাংলায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম পুরোপুরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২০২ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন।[১৮] উক্ত সময়ে অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ১৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭২ জন-এ দাঁড়ায়।[১৯] অর্থসংগ্রহের জন্য আশুতোষ ধনাঢ্য নাগরিকগণ ও সরকার উভয়ের শরণাপন্ন হন। সরকার প্রথমদিকে কিছুটা অনুকূল মনোভাব দেখালেও ক্রমে আশুতোষের কার্যপদ্ধতির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। আশুতোষ তাঁর আচরণ সংশোধন না করলে নতুন কোন অনুদান আর দেয়া হবে না—সরকার একথা তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। কিন্তু বেসরকারি বদান্যতা আকর্ষণের ক্ষেত্রে আশুতোষ এর চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এই ছ'বছরে তিনি বিত্তশালী বাঙালি হিন্দুদের কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।[২০] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ভারত সরকার সবকিছু পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কিন্তু বাংলা সরকার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার শঙ্করন নায়ারের প্রবল চাপের মুখে সরকার আশুতোষকেই সেই কমিটির প্রধান নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত এই কমিটির রিপোর্টে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের কার্যাবলীকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করে কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং অধিকতর সরকারি অনুদানের সুপারিশ করা হয়।

এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাসংস্কার কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সীমিত— এতকাল যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলোমেলোভাবে গড়ে উঠা স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কার্যক্রমকে কিছুটা সুশৃঙ্খল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে নিয়ে আসা। একই সঙ্গে সরকার এই আশাও পোষণ করেছিলেন যে, এর ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে। কিন্তু দেখা গেল, কমিটির রিপোর্ট সরকারের আশানুরূপ হয় নি। শেষ ভরসাস্থল হিসেবে ছিল প্রস্তাবিত বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, যা কিনা এই সব অনভিপ্রেত পরিস্থিতির অবসানকল্পে রিপোর্ট প্রণয়ন করবে। এই কারণে সরকার এই কমিশনকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও রিপোর্টের

---

১৮. *স্যাডলার রিপোর্ট*, ১৩শ খণ্ড, ১১২-১৩।

১৯. ঐ, ২য় খণ্ড, ৪৪।

২০. আশুতোষ সংগ্রহ।

ব্যাপক দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। এভাবেই সৃষ্টি হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯১৭-১৯), যা এর চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাডলারের নামানুসারে স্যাডলার কমিশন নামেও পরিচিত। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিযুক্ত এই কমিশন ১৯১৯ সালের শেষদিকে এর রিপোর্ট পেশ করে।

এই কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাডলার ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অন্যান্য সদস্য ছিলেন : র‍্যামজে মুইর, অধ্যাপক, আধুনিক ইতিহাস, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়; জে. ডব্লিউ. গ্রেগরি, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়; পি. জে. হার্টগ, একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। এছাড়াও ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; জিয়াউদ্দিন আহমদ, অঙ্কের অধ্যাপক, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়; ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেল, বাংলার ডি. পি. আই. এবং জর্জ এন্ডারসন, সহকারী সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার।

স্যাডলার রিপোর্ট : স্বপ্ন বনাম দেউলিয়াত্ব

দু'বছরের ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর কমিশন এর রিপোর্ট পেশ করে। সারা বৃটিশ আমলে এরকম বিস্তারিত রিপোর্ট আর একটিও পাওয়া যাবে না। এই সুবৃহৎ রিপোর্টে কমিশন বাংলার সমাজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যাপক আকাঙ্ক্ষার বিবরণ প্রদান করে।[২১] কিন্তু গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে বলে তাঁরা সুদূরপ্রসারী ও ব্যয়বহুল সংস্কারের সুপারিশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বাংলা ও যুক্তরাজ্যের একটা তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরেন, কারণ জনসংখ্যার বিচারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা ছিল। সাড়ে চার কোটি লোক অধ্যুষিত এই দুই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যাও ছিল সমান—মোটামুটি ছাব্বিশ হাজারের মতো। কিন্তু দুটো বড় রকমের তফাত ছিল দু'য়ের মধ্যে। প্রথমত, বাংলায় আনুমানিকভাবে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্র মানবিক বিদ্যায় ডিগ্রিলাভ করছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলায় যেখানে একটিমাত্র বেশ বড় আকারের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে যুক্তরাজ্যে ছিল আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়।[২২]

ছাত্রসংখ্যার এই বিপুল আয়তন কমিশনকে অভিভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু কমিশন এর চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছিল আর একটি কারণে। তা এই যে, পাশ্চাত্যের মতো এখানে শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহের

---

২১. রিপোর্টের মূল প্রতিবেদনটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। পরিশিষ্ট আছে আরো আটটি খণ্ডে।
২২. *স্যাডলার রিপোর্ট*, ১ম খণ্ড, ২০-২১ ।

সৃষ্টি হয় নি; বরঞ্চ প্রধানত 'সামাজিক আচরণবিধি, প্রথা ও ঐতিহ্যের' প্রভাবে এখানে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে।[২৩] কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন উচ্চশিক্ষার এই ক্রমবর্ধমান প্রসার 'এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রলেতারিয়েত'-এর জন্ম দেবে, যারা পরিণামে দেশের 'বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যকে আরো প্রকট করে তুলবে।'[২৪]

বিদ্যমান উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণের পর কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এখানকার "কলেজগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ফলপ্রসূ সম্মিলন ঘটে নি", যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুষ্ঠু সাংগঠনিক ভিত্তিও এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[২৫] স্পষ্টতই এক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্গঠনের একটা ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের কোন দিকই কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারকর্মসূচির বাইরে থাকে নি। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক সংস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষাদানব্যবস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই কমিশন এর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছে। কমিশন বিদ্যমান সিনেটকে কোর্ট নামে অভিহিত করে এবং সুপারিশ করে যে, সিনেটের পরিসর আরো বড় করে সেখানে গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যপদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা পূরণ করতে হবে, আর সিন্ডিকেটকে আরো ছোট করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দিতে হবে। সিন্ডিকেটের অবশ্যই উপযুক্ত আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে বিশুদ্ধ একাডেমিক বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে সিন্ডিকেট সাধারণত মাথা ঘামাবে না। এই ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষক ও অধিভুক্ত (constituent) কলেজগুলির প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের উপর।[২৬] অনুরূপভাবে কমিশন হাইকোর্টের একজন বিচারপতির সমান বেতন, ভাতা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন সার্বক্ষণিক বেতনভোগী উপাচার্যের পদ সৃষ্টিরও সুপারিশ করে।[২৭]

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এ বিষয়টি কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে। নানা ঐতিহাসিক কারণে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বিপুল—একথা স্বীকার করে নিয়ে কমিশন মন্তব্য করে যে, "সরকারি নিয়ন্ত্রণ যেখানে এত বিস্তৃত ও ব্যাপক, সেখানে সর্বোত্তম ফল আশা করা যায়

---

২৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ২৪।
২৪. ঐ, ১ম খণ্ড, ২২-২৩।
২৫. ঐ, ১ম খণ্ড, ৭৭।
২৬. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৭।
২৭. ঐ ৪র্থ খণ্ড, ৩৮২-৩৮৩।

না।"[২৮] কাজেই কমিশনের প্রস্তাব ছিল একাডেমিক ও দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর স্বাধীনতা দেয়ার, চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার যদিও সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ভারত সরকার যা প্রত্যাশা করেছিল কমিশন সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগটি বিলোপ অথবা কাটছাঁট করার সুপারিশ করে নি। কমিশন বাংলার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন ও জটিল ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির মধ্যে সম্পর্ক সুবিন্যস্ত হবে এবং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্থান খুঁজে পাবে। কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিমটিও পরীক্ষা করে দেখেছিল। এখানেও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে কমিশন ১৯১২ সালের নাথান কমিটির সুপারিশ বাতিল করে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রস্তাব রেখেছিল। উল্লেখ্য, নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মতো একটি পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছিল। এর বদলে কমিশন ঢাকাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব দেয় যাতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব পাবে।[২৯]

উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি প্রধান সংস্থায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কমিশন কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কমিশন বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও তীব্র মুসলিম ক্ষোভ ও চাপের প্রভাবে তাঁরা এই পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করতে বাধ্য হয়। তবে কমিশন 'গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক পদগুলিতে' জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করে।

মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জী-বনের লক্ষ্যে কমিশন এর সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেছিল। বিদ্যমান অবস্থাদৃষ্টে কমিশন বিচলিত বোধ করেছিল, তাই বাংলার তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যতের ছবি রিপোর্টে তুলে ধরেছিল। কমিশনের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে এই অতি কঠোর বাস্তব সত্যটি কমিশনের রিপোর্টে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। অতিশয়োক্তি হবে জেনেও কমিশন সেকথা উল্লেখ করেছে অসংখ্যবার। সত্য

২৮. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ২৬০। সরকারি কলেজের সংখ্যা ছিল সাত। বারোটি ছিল অনুদানপ্রাপ্ত এবং চৌদ্দটি ছিল সম্পূর্ণ অনুদানহীন।

২৯. বাংলা সরকারকে লিখিত ই. ই. বিস-এর লিখিত ৯ জুলাই ১৯১৯ ভারত সরকার, শিক্ষা, ই, ১৬, এ ২৬, অক্টোবর ১৯১৯.

বটে, সরকার এর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে নি। এই ব্যর্থতা বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক অসারত্বকেই প্রমাণিত করে।

দ্বৈত শাসনাধীন বাংলায় শিক্ষা : দায়িত্ব প্রচুর সম্পদ কম

বস্তুত পরবর্তী তিন দশক ছিল বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির অঙ্গনে উত্তাল ঘটনাপ্রবাহের যুগ। কিছুটা সেই কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বলা যায় এক ধরনের বন্ধ্যাত্বই বিরাজ করছিল। প্রথমত, সরকার এবং জনগণ উভয়েই রাজনৈতিক ইস্যু ও আন্দোলন নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার দরুন শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাবার অবকাশ তাদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, নানা কারণে বাংলার জন্য এই বছরগুলি ছিল নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটেরও কাল। ফলে সরকারি রাজস্বের সামান্য অংশই শিক্ষাক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করা যেতো। স্বভাবতই উভয়বিধ কারণে সরকার অথবা জনগণ কারো পক্ষেই শিক্ষা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করার আগ্রহ ছিল না।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে ভারতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। একই সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থায়ও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। শাসন সংস্কারের ফলে দশ লক্ষ লোক নতুন করে ভোটাধিকার লাভ করে। এদের অনেকেই ছিল মুসলমান। এই ভোটাররা সুবৃহৎ আইন পরিষদে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত করতো। এভাবে যেসব মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতেন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নতুন সংবিধানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের ভিত্তি তৈরি করা। ফল দাঁড়ালো এই যে, অগ্রসর হিন্দুরাও নিজেদের এতকালের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য একটা পালটা জঙ্গি উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ইঙ্গ-মুসলিম আঁতাতের মুখে তাদের সেই প্রতিরোধ টিকতে পারে নি। এক অনিবার্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে আরো দূরে ঠেলে দিল। সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও হানাহানি এবং প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও সমর্থিত আইন অমান্য আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে এই বছরগুলো ছিল ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে এক দুঃখজনক উন্মাদনার যুগ।

এর ফলে বাংলার অর্থনীতি ও প্রশাসন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সারাক্ষণ নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত কোণঠাসা সরকারের পক্ষে একেবারে সম্ভব ছিল না কোন রকম জরুরি সংস্কার অথবা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছাড়াও এই সময়ের মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটও সরকারকে বাধ্য করেছিল ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করতে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটে নি। স্বাভাবিকভাবেই সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ভারত সরকার স্যাডলার কমিশনের শুধুমাত্র সেসব সুপারিশ নিয়েই আইন প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছিল যেগুলো বাস্তবায়নে কোন অর্থব্যয়ের দরকার হবে না। কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারের আর্থিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য ভারত সরকার উল্লিখিত আইন পাশের পর পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। এদিকে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারও সংস্কার কর্মসূচির জন্য বাড়তি অর্থব্যয়ে অপারগতা প্রকাশ করে।[৩০] ভারত সচিব মন্টেগু ভারত সরকারের আর্থিক দায়িত্ব এড়ানোর অপপ্রয়াসের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কারণ কমিশনের সংস্কার কর্মসূচির জন্য অর্থসংস্থানের প্রশ্নটিকে তিনি যথার্থই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরকেই দায়িত্ব এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রাদেশিক সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধনের গুটিকয়েক দায়সারা উদ্যোগ নিয়েছিল মাত্র। কিন্তু আশুতোষের আমল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেঁকে বসা বাঙালি হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সরকার হটে আসতে বাধ্য হয়। এর বদলে এখানে ওখানে ছোটখাটো সংশোধনের দ্বারা যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু কাজই সরকার করেছিল। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত একটি সংস্থা সিনেটে সরকার মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ১৯৩০ সালে হাসান সোহরাওয়ার্দীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করে সরকার মুসলিম ক্ষোভ প্রশমনের আরো একটি প্রয়াস পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সরকারকে সঙ্গত কারণেই কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিল। একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতবাসীর সামনে সরাসরি শিক্ষা ও গবেষণাকাজে নিয়োজিত একটি আব'সিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলরূপে থাকবে, অন্যদিকে এর কাজ হবে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। সুবৃহৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা

---

৩০. ১৯২১-২২ সালে বাংলা সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্বআয় ছিল ৮৩২.৪৪ লক্ষ টাকা। স্যাডলার কমিশন প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল ব্যয় এবং বছরে ৮০ লক্ষ টাকা পৌনঃপুনিক ব্যয়। *ভারতের ৮ম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*—১৯১৭-১৮/১৯২১-২২, ১৪। *ঐ বছর* বাংলা সরকারের মোট বার্ষিক শিক্ষাবাজেট ছিল ১,৩৫,৪৫,০৪৫ টাকা। *বাংলা সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট*, ১৯১৭-২২, সাধারণ সারণি ৪।

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ক্ষুদ্রায়তন। কিন্তু এটা ছিল পরিচ্ছন্ন, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রশান্ত পরিবেশে নীরবে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকাজ চলছিল। জাতীয় অথবা প্রাদেশিক রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক জীবনধারাকে খুব একটা বিঘ্নিত করতে পারে নি।

কিন্তু এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য খুঁজতে হবে অন্যত্র। যে লক্ষ্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করেছিল, সন্দেহাতীতভাবে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে হিন্দুদের অধিকাংশই সুনজরে দেখে নি। প্রথমত, এই প্রস্তাবকে তারা সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের একটা অপচেষ্টা বলে মনে করেছিল। তদুপরি ঢাকায় স্থাপিত আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় অবধারিতভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে সঙ্কুচিত করবে এবং তার প্রত্যাশিত অর্থের উপর ভাগ বসাবে বলে তারা মনে করতো। তাদের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে যাচ্ছে, কারণ মুসলমানদের দাবির মুখে স্যাডলার কমিশন এবং ভারত ও বাংলা সরকার এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে বিশেষ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রেখেছে।[৩১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অভাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ দীর্ঘদিন থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিল। ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মুসলমানদের এই ক্ষোভ দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টে (১৯২১-২৪) মোট ১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন মুসলমান। তবে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন অধ্যাপক ও রিডারের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন মুসলমান, সেহেতু এই ৪০ জন মুসলমানের বেশিরভাগই ছিলেন চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য। এই ৪০ জনের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন 'খান বাহাদুর' এবং 'খান সাহেব' খেতাব- প্রাপ্ত। প্রথম নির্বাহী কাউন্সিলের মোট ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন এবং প্রথম একাডেমিক কাউন্সিলের মোট ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুসলমান।[৩২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর তফাতটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় এবং মুসলিম হলে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। তদুপরি মুসলমান ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়ে যা করা সম্ভব ছিল না তা হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষায়,

---

৩১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। G B. Gen-Edn. 14-1. A75-84, April 1920.

৩২. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার*, ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫।

বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে মুসলিম অনগ্রসরতা ছিল প্রধান অন্তরায়। ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়,তখন মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জন ছিলেন মুসলমান। আবার এই ৮ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন আরবি ও ফার্সির শিক্ষক।[৩৩] পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১২৪ জনের মধ্যে ২৪ জনে। এতে উন্নতি হয়েছে অবশ্যই। তবে তা আহামরি কিছু নয়।[৩৪] কারণ সংখ্যাবৃদ্ধি যেটুকু ঘটেছিল তা মূলত ছিল ওই গতানুগতিক ধারায়—শিক্ষকদের ১৪ জন ছিলেন আরবি, ফার্সি ও উর্দু বিষয়ের এবং ৪ জন ছিলেন আইন ও শিক্ষা বিষয়ের। এর পাশাপাশি ৪৫ জন বিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিদ্যার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। অনুরূপ ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছিল ছাত্রদের মধ্যেও। ১৯২১ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল মুসলমান ছাত্রদের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। ১৯৩৭ সালে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল মোট ১৭৫৪ ছাত্রের মধ্যে ৩৯৫ জন। অর্থাৎ তখনো হিন্দুরা সংখ্যায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি ছিল।[৩৫]

আলোচ্য সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা বি.এ. ও এম. এ. ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়—১৯২২ সালে ৫৩ জন, ১৯৩২ সালে ১৬৪ জন এবং ১৯৩৮ সালে ২১০ জন।[৩৬] কিন্তু উদীয়মান বাঙালি মুসলিম সত্তার বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কেবলমাত্র সংখ্যার নিরিখে বিচার করা ঠিক হবে না।[৩৭] কারণ দেখা যাচ্ছে যে, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম হলকে কেন্দ্র করে হলের আবাসিক এবং অনাবাসিক ছাত্রদের সংগঠিত ও যৌথ কার্যক্রমের একটি পরিমণ্ডল কালক্রমে গড়ে উঠেছিল। মুসলিম হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষ এ. এফ. রহমান তাঁর দু'জন কনিষ্ঠ সহকর্মী ফখরুদ্দীন আহমদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় সচেতনভাবে এই হলকে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট ও ইসলামী ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি আবাসিক হল হিসেবে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। আবাসিক ছাত্রদের জন্য নামাজ ছিল অবশ্য পালনীয়। প্রতি শুক্রবার ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নিয়মিত আলোচনাসভা বসতো এবং রবিবারের অপরাহ্ন নির্দিষ্ট ছিল

---

৩৩. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১*। দুজন মুসলমান শিক্ষক হচ্ছেন এ. এফ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অক্সফোর্ড স্নাতক এ. এফ. রহমান। এ. এফ. রহমান প্রথমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের রিডার ছিলেন। তিনি পরে ঢাকায় যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য হন। মুহম্মদ শহীদুলাহ্ ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক।

৩৪ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৩৫-৩৬।*

৩৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট,* ১৯২১ এবং ১৯৩৭-৩৮।

৩৬. ঐ।

৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে মওলানা আকরম খাঁ মন্তব্য করেন, "হিন্দুরা যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করেছে তথাপি এটাকে 'ঢাকেশ্বরী বিদ্যাপীঠ' বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ যদিও এখানে মুসলমানদের 'প্রবেশ নিষেধ', এই ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা কলকাতাস্থ হিন্দুদের সেই প্রাইভেট জমিদারি 'কাশী বিদ্যাপীঠে'র মতো অতো কড়াকড়িভাবে মানা হয় না, তথাপি অবস্থা এখানেও খুব একটা সুবিধাজনক নয়।" *মাসিক মোহাম্মদী,* মাঘ ১৩৪৩, ২৮৩-২৮৪।

কোরান ক্লাসের জন্য।[৩৮] ছাত্ররা সুপরিচিত মুসলমানী পোশাক, যেমন শেরওয়ানি, চুড়িদার ও টুপি পরবে এটাও প্রায় অলিখিত একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[৩৯] হলের ছাত্রসংসদ নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, যেমন সাপ্তাহিক বিতর্ক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, নাট্যানুষ্ঠান, হলবার্ষিকী প্রকাশনা এবং বার্ষিক প্রীতিভোজ ইত্যাদির আয়োজন করতো। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি তদানীন্তন ঢাকার সামাজিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।[৪০]

মুসলিম হলে ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২১-২২ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৭৮ জন (৭৫ জন আবাসিক) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৯-৩০ সালে ৪১৮ (২৪২ জন আবাসিক) জনে দাঁড়ায়, যদিও ১৯৩১ সালের আগে এই হলের কোন স্থায়ী ভবন ছিল না। এই বছর ৩০০ আসনবিশিষ্ট বর্তমান ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। এই হলে এসেম্বলি ও প্রার্থনাগৃহ, ছাত্রমিলনায়তন, পাঠকক্ষ, ডাইনিং হল, টিউটোরিয়াল কক্ষ এবং প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়।[৪১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে মুসলমান ছাত্ররা যে বিচ্ছিন্নতা ও হীনমন্যতার শিকার হতো এখানকার পরিবেশ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হলের আবাসিক জীবনের মূল সুরটি ছিল সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির। অবারিতদ্বার শিক্ষকবৃন্দ ও সহানুভূতিশীল প্রশাসনও সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরো একটি বিষয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল ৪০। এছাড়াও ছিল হলের নিজস্ব স্টাইপেন্ড এবং নওয়াব নবাব আলি ট্রাস্টফান্ডের স্টাইপেন্ড। বাংলা তথা ভারতের মুসলমান ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে বেশি দান-অনুদানের সমাবেশ ঘটেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়েই।[৪২]

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই ধরনের আয়োজন নিশ্চিতরূপে শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে ঈর্ষান্বিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতি বছর হিন্দু প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অর্থবরাদ্দ কমানোর চেষ্টা করতেন।[৪৩] সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই তীব্রতা দেখে সরকার ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি বার্ষিক বরাদ্দকে স্ট্যাটিউটরি গ্রান্টে পরিবর্তিত করে নেয়। এই উপলক্ষে আনীত বিলের উপর সদস্যরা যেভাবে ভোট দিয়েছিলেন তাতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষণগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা

---

৩৮. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২২-২৩, ৪ এবং ২৩।

৩৯. সৈয়দ মুস্তাফা আলী, *আত্মকথা* , ৯২ এবং আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* , ১৩৪।

৪০. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২২-২৩, ২৩।

৪১. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*।

৪২. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২৩-২৪।

৪৩. *বঙ্গীয় আইন পরিষদ প্রসিডিংস*, ১৭ মার্চ ১৯২১, বাজেট আলোচনা, ২১৮-১৯, ২৩৭-২৩৯

পড়েছিল। এত তিক্ততা সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, পুরো বৃটিশ আমলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রই ছিল হিন্দু, আর শিক্ষকদের বেলায় তো কোন কথাই নেই।[৪৪] তা সত্ত্বেও একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে বাঙালি মুসলমানের চোখে মুসলিম হল সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সারা বাংলায় একমাত্র উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে অন্তত সংখ্যার দিক থেকে তাদের উপস্থিতি নগণ্য ছিল না এবং যার ফলে এখানে হিন্দু সমাজের অবজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নাসিকতা থেকে মুক্ত থেকে তারা সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নিজেদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তার পরিচয় রাখতে।

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম হলের ছাত্রদের প্রভাব সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার বিশেষ অবকাশ নেই। এই হলের ছাত্ররাই পরবর্তীকালে সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় মধ্যস্তরের পদগুলো পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন আর এদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলার উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের পেশাগত বিকাশের চিত্রটা এদিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচ বছরে ৪৫ জন মুসলমান ছাত্র পাশ করে বেরিয়ে আসেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে তাঁরা কি অবস্থানে পৌছেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে তা বিধৃত আছে। এঁদের মধ্যে একজন যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় ফরেস্ট সার্ভিসে; একজন মনোনয়ন পেয়েছিলেন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে; তিনজন ডেপুটি কালেক্টর, দু'জন ইনকামট্যাক্স অফিসার, তিনজন সহকারী ইনকামট্যাক্স অফিসার, ন'জন সাব-ডেপুটি কালেক্টর, এগারোজন কলেজপ্রভাষক, দু'জন গ্রন্থা-গারিক, একজন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর, একজন সুপারিনটেনডেন্ট, একজন মাদ্রাসা-প্রিন্সিপাল, পাঁচজন সহকারী স্কুলশিক্ষক, একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, একজন কুমিল্লা সমবায় সমিতির অডিটর, দু'জন এক্সাইজ সাব-ইন্সপেক্টর এবং দু'জন কেরানির পদ লাভ করেছিলেন।[৪৫]

এই প্রথম প্রজন্মের অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পাঁচজন পাকিস্তানের মন্ত্রীপদে আসীন হয়েছিলেন, তিনজন পূর্ব বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন; একজন হাইকোর্টের বিচারপতি, তিনজন উপাচার্য, একজন মুসলিম লীগের চীফ হুইপ, একজন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার এবং আর একজন (আলতাফ হোসেন) কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী মুখপত্র *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রায় অর্ধেকই এসেছিলেন গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী, জোতদার, তালুকদার এবং সম্পন্ন কৃষক পরিবার থেকে। অন্যরা ছিলেন শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এঁদের প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার থেকে কিছু না কিছু আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। এঁরা যথাসময়ে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট হিসেবে এঁরাই

---

৪৪. যেমন, ১৯৩৬-৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৩৫৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৯৪৬ জন ছিল হিন্দু।

৪৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯৩০, ১৯৩১ এবং ১৯৩২।

সমাজকে কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেন। এদেশের ইংরেজ শাসকরা এই অঞ্চলে আধিপত্যকারী হিন্দুদের প্রতিপক্ষ হিসেবে যে মুসলিম নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন, সেই ভূমিকা পালনেও ঢাকার শিক্ষিতদের আমরা দেখতে পাই। অতএব একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে এভাবেই সরকারি শিক্ষানীতির অনেকগুলো লক্ষ্যের সম্মিলিত প্রতিফলন ঘটেছিল মুসলিম হলের মধ্যে।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী একজন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। এতে প্রথমদিকে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থিক সঙ্কট মিলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত একান্ত জরুরি সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজগুলোও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নতির বদলে অধোগতি এসেছিল। ফলে ভারতের শিক্ষাজগতে বাংলা তার এতকালের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

এই নৈরাশ্যের অন্ধকারেও দু'একটি আশার আলো যে ছিল না তা নয়। যদিও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বা ব্যতিক্রমধর্মী উন্নতি কিছুই ঘটে নি, তথাপি সার্বিক রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশকে মোটেই ছোট করে দেখা যাবে না। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। এখানে পুনর্গঠনের কথা বহুবার বলা হলেও কিছুই করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা। এই প্রদেশের অধিবাসীরা শিক্ষা অর্জনের উদগ্র আগ্রহে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেরাই এগিয়ে এসেছিল। সরকার অনুদানের মাধ্যমে কিছুটা সাহায্য করেছে বটে, তবে অনেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল প্রধান সহায়কশক্তি। সন্দেহ নেই, এই পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান তেমন উঁচু ছিল না; পেশাগত, বৃত্তিমূলক এবং নারীশিক্ষাও পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এ দিকগুলো বাদ দিলে শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা

বিশের দশকের শুরুতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের অধীনে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী একজন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রথমদিকে সচেতন জনসমাজে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল বটে, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। নতুন প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের আওতায় ভোটাধিকারের সীমানা বেশ খানিকটা বাড়ানো হয়েছিল। এতে করে সরকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র আরো উন্নত হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তো সত্য যে তৎকালীন বাংলায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের গণরাজনীতির (mass politics) অভ্যুদয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বসংঘাত

বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। মানুষের জীবনে শিক্ষা উন্নতি-অগ্রগতির হাতিয়ার, পছন্দসই কর্মসংস্থানেরও সদর রাস্তা ওটা। কাজেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা খাতের জন্য নির্ধারিত সীমিত সহায়সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়ে উঠে অনিবার্যভাবেই (সারণি ১ দ্র.)

সারণি ১ : ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় শিক্ষাখাতে ব্যয়কৃত অর্থের একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শতকরা হার)

ব্যয়ের খাত	টাকা	সরকারি	স্থানীয় সংস্থা	ফিস	অন্যান্য উৎস
নির্দেশনা ও পরিদর্শন	১৫,৫৭, ৪৪৭	৯৩.৫%	৬.৪%	-	.১
বিশ্ববিদ্যালয়	২৯,৭৭,২২৩	৩০.৯%	-	৫৪.৬	১৪.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা	৩৪,৩৬৬	-	-	১০০.০০	-
বিবিধ	৫৫,০৪,১৫৬	৩৩.৩%	৫.৮%	২১.৩	৩৯.৬
	১,০০,৭৩,১৯২	৪১.৮	৪.২	২৮.১	২৫.৯
পুরুষ					
১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	৩৭,৩৩,৫৪৯	৩৩.৫	.১	৫৮.৭	৭.৭
২. পেশাশিক্ষা মহাবিদ্যালয়	১৭,২২,৪৬৪	৬৪.৪	-	৩৩.৪	২.২
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১,১৭,৮০,৪০৭	১৫.৫	.২	৭২.১	১২.২
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩০,১৮,৫০২	৭.৭	১২.৯	৬৩.৫	১৫.৯
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৭,৪৭,৬২৫	৩২.৮	২৫.২	৩০.৮	১১.২
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	৪৩,২২,৮৫৩	৪৪.২	৯.৫	২৬.৩	২০.০
	৩,১৩,২৫,৪০০	২৭.৩	৮.১	৫২.৩	১২.৩
মহিলা					
১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	১, ৫৮,৮০৫	৪৬.৮	-	৪৫.০	৮.২
২. পেশাশিক্ষা মহাবিদ্যালয়	২৭,৬২০	১০০.০০	-	-	-
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১৬,৩৮,২৯০	৩৫.৫	৪.৩	৪৭.৪	১২.৮
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩,৮০,১৩১	৩০.২	৮.৯	২৬.৮	৩৪.১
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬,২১,৫৬৫	২৭.৮	৩৯.৩	১২.১	২০.৮
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	২.৮৩,৪৩৬	৪০.২	১০.৯	১৫.৭	৩৩.২
	৪১,০৯,৮৪৭	৩৩.২	১৮.৮	২৮.৯	১৯.১
সর্বমোট	৪,৫৫,০৮,৪৩৯	৩১.০	৮.২	৪৪.৯	১৫.৯

উৎস : *Quenquennial Report on the Progress of Education in Bengal, 1932-1937*, part 1, 180. *Bengal Administration Report 1925-26.*

ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন আরো অস্থিতিশীল এবং উত্তপ্ত হতে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র আর্থিক সঙ্কট। আর এ দুয়ের সম্মিলনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত ও পরিকল্পিত একান্ত জরুরি সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়ে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অগ্রযাত্রার বদলে অধোগতি এসেছিল। ফলে ভারতের শিক্ষাজগতে বাংলা তার এতকালের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়ে।

স্বভাবতই এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে বাংলার শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বড় ধরনের অগ্রগতি কিছু হওয়ার কথা নয়। তবু সার্বিক এই হতাশার কালো মেঘের মধ্যেও আশার দু'একটি রজতরেখাও দেখা দিয়েছিল। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল এসবের পেছনে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন এবং সরকারি-বেসরকারি আর্থিক সহায়তা থাকার কারণে। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে দু'টি ক্ষেত্র, যেখানে রাষ্ট্র তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ, স্বাধীন দেশগুলিতে হাওয়া বইছিল ঠিক বিপরীত দিকেই। সেসব দেশে দেখি, যতই দিন যাচ্ছিল ততই মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে পুরনো ধ্যান-ধারণা পথ করে দিচ্ছিল নতুনের। শিক্ষার এ দুই স্তর যতটা পারা যায় বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এ ধরনের ধারণা দ্রুত পিছু হটছিল। তার বদলে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে এবং রাষ্ট্রীয় অনুদানে সেসব দেশে মাধ্যমিক ও কারিগরি বিদ্যালয়ের একটি সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তার বিপরীত চিত্র দেখতে পাই পরাধীন, ঔপনিবেশিক বাংলায়। এখানে শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃটিশ ভারতে বাংলা ছিল এমন একটি প্রদেশ যেখানে নাগরিক সমাজ নিজেদের জন্য শিক্ষার খানিকটা সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে নিজেরাই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, যদিও সরকার অনুদানের মাধ্যমে কিছুটা সাহায্য করেছে বৈকি। এতে করে এই স্তরে শিক্ষার গুণগত মান তেমন উঁচু হতে পারে নি, বিঘ্নিত হয়েছে পেশাগত, বৃত্তিমূলক এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতি। এসব দিক বাদ দিলে শুধুমাত্র সংখ্যার নিরিখে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

দেশবিভাগ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশবিভাগ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা (১৯৫৬ সালে নামবদল করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়) পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু এতকালের অবহেলিত, কলকাতার

পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে শোষিত পূর্ব বাংলা দেশবিভাগের ফলে প্রশাসনিক সদর দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, উত্তম বন্দর, যোগাযোগ-নেটওয়ার্ক সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কলকাতাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পরিবর্তনের ঢেউ এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। নিজের স্বল্প পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে পূর্ব বাংলাকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। পুঞ্জীভূত সমস্যার চাপ সরকারের জন্যও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

গোড়ারদিকে নতুন কোন কিছু শুরু করার চেয়ে প্রদেশের বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করাটাই ছিল অধিকতর জরুরি। অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করতেই সরকারের সবটুকু শক্তি ও সময় ব্যয়িত হয়। বিপুল সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী ও শিক্ষকের দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ, নতুন কর্মচারী নিয়োগ, আসাম প্রদেশ থেকে সিলেট জেলার পাকিস্তানভুক্তির ফলে পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন এবং নিত্যনতুন গজিয়ে উঠা বিবিধ সমস্যার মোকাবেলা—এতোসব কাজ নিয়ে নতুন সরকারকে স্বাভাবিকভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। মোটকথা, দেশবিভাগের ফলে বিধ্বস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখাই ছিল সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ।

দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ঢাকা শহর ছাড়া সারা বাংলায় মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলার স্কুল-কলেজের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এখতিয়ার আর থাকলো না। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র আবাসিক শিক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় বিধায় অধিভুক্তকরণের কোন ক্ষমতা তার ছিল না। এই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৪৭' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা স্তরের উর্ধ্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তকরণের ক্ষমতা লাভ করে। একই অধ্যাদেশের দ্বারা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি শিক্ষা বোর্ডের স্থলে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই অধ্যাদেশ জারির ফলে অর্ধশতেরও বেশি প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ এবং আরো বহু সংখ্যক টেকনিক্যাল ও পেশাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ১,৩০০ স্কুলও পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় চলে আসে। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের পরিসর অনেক বেড়ে যায়, নতুন দায়িত্বও যোগ হয়। তাছাড়াও এই অধ্যাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, নির্বাহী কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিভিন্ন অনুষদ পুনর্গঠন করে। সকল প্রথম গ্রেড কলেজের অধ্যক্ষদের এসব সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদে ১৭টি বিভাগ ছিল।[৪৬] এখন সারা প্রদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ে। হিন্দুদের বিপুল হারে দেশত্যাগের ফলে শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। এছাড়াও উপযুক্ত ভবনের অভাব এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান ছাত্রদের আগমন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ৯৯৬ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৪৮ জনে দাঁড়ায়। ফলে বাসস্থানের অভাব আরো তীব্র হয়।[৪৭] সকল ধরনের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকগুলো নতুন বিভাগ ও কোর্স চালু করা হয়। আহসানউল্লাহ প্রকৌশল বিদ্যালয়কে প্রকৌশল কলেজে (বর্তমান বুয়েট) রূপান্তরিত করে নতুন একটি প্রকৌশল অনুষদের গোড়াপত্তন করা হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে। ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও আরো কয়েকটি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়, ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট এবং কুমিল্লায় একটি পশুচিকিৎসা কলেজ (সবগুলোই সরকারপরিচালিত) প্রতিষ্ঠা করা হয় উচ্চতর টেকনিক্যাল ও পেশাজীবী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।[৪৮]

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় ৫৫টি কলেজ ছিল (দুটো মেয়েদের) এবং এদের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৪,২৯১ জন। এই ৫৫টি কলেজের মধ্যে মাত্র ৮টি ছিল সরকারপরিচালিত। এগুলোর জন্য সরকারের বছরে ব্যয় হতো ৫৫৪,০৫১ টাকা। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে বছরে খরচ হতো সরকারি কলেজে ৩৯০ টাকা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩২ টাকা।[৪৯]

আগের মতোই মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল মধ্য-ইংরেজি, মধ্য-বাংলা এবং উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। এই মধ্য স্কুলগুলো—ইংরেজি ও বাংলা উভয়ই পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দুটো শ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল। তফাতের মধ্যে প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক আর দ্বিতীয়টিতে ঐচ্ছিক ছিল। তুলনামূলকভাবে এগুলো গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের কাছাকাছি ছিল এবং এগুলোতে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের চেয়ে খরচও কম হতো। এদিক থেকে এদের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল বৈকি। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে ২,১২৫টি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। প্রায় দুই লাখ ছাত্র-ছাত্রী এগুলোতে অধ্যয়নরত ছিল। এখানে মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি। ছাত্র-ছাত্রী ছিল ছয় হাজারের কিছু কম। অতএব এগুলো ছিল দ্রুত বিলীয়মান প্রতিষ্ঠান—এদের অর্ধেকই ছিল সরকারি, যেখানে মধ্য-

---

৪৬. M. A. Rahim. *History of the University of Dhaka*, ১৯৮১, ৮৪.

৪৭. *পূর্ব বাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-৪৮*।

৪৮. ঐ. ২২।

৪৯. ঐ।

ইংরেজি বিদ্যালয়ের মাত্র ১৩টি ছিল সরকারপরিচালিত। ১৯৪৭-৪৮ সালে মধ্য-ইংরেজি বালক বিদ্যালয়গুলোতে মোট বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪,৭৬,৪৮৬ টাকা। এ অর্থের এক-তৃতীয়াংশেরও কম এসেছিল সরকারি কোষাগার থেকে, বাকিটা আসতো ছাত্রবেতন ও অন্যান্য বেসরকারি উৎস থেকে।[৫০]

মাধ্যমিক স্তরের শেষ চারটি শ্রেণী নিয়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় গঠিত ছিল। এর সমাপ্তিপর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কারিগরি কিংবা পেশাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ছাড়পত্র মিলতো। মধ্যস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো শিক্ষাবিভাগ এবং পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৩০৬টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৩,৩১,০৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। এই স্কুলগুলির মধ্যে মাত্র ৩৩টি ছিল সরকারি, ৭১৩টি অনুদানপ্রাপ্ত এবং অবশিষ্টগুলো ছিল সম্পূর্ণ অনুদানবহির্ভূত।

সারণি ২ : উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়খাতে ব্যয়, ১৯৪৭-৪৮ (উৎস অনুসারে)

	বালক	বালিকা
সরকারি	২৪,৩৬,৪৩৯	৪,১৮,৯৫৩
জেলাবোর্ড	৩২,৮৯২	৪,৪৪৭
মিউনিসিপ্যালিটি	২৫৫	১১,৭৪৫
ছাত্রবেতন	৯৬,৩০,৩৫২	৩,৮৪,৮৬১
অন্যান্য	১৪,২৩,৮১৯	১,০৭,১৪৩
মোট	১,৩৫,২৩,৭৫৭	৯২,৭৩,১৪৯

উৎস : *পূর্ব বাংলায় জনশিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-৪৮*, ১৮।

উপরে উদ্ধৃত পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে একথাই প্রমাণ করে যে, দেশবিভাগের প্রাক্কালে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব বাংলার উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে উপরের স্তর বাদে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই দেখা যায়, মোট ব্যয়ের সিংহভাগই এসেছে ছাত্রবেতন এবং অন্যান্য উৎস থেকে এবং সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য।

শিক্ষানীতি

পাকিস্তানের শুরু থেকে তার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা বা রিপোর্ট প্রণয়ন কম হয় নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য

৫০. প্রাগুক্ত, ১৪-১৫।

বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করে। অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালের শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৫২ সালের বঙ্গীয় শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি এবং ১৯৫৭ সালের পূর্ববঙ্গের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের তরফ থেকে নানাবিধ সুপারিশ ও পরামর্শ পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও, শিক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে ষষ্ঠ বার্ষিক জাতীয় পরিকল্পনা (১৯৫২) এবং তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন সুপারিশ রাখা হয়। আরো ছিল শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সুপারিশমালা। আইয়ুব আমলে দু'টি অতি বিতর্কিত শিক্ষা কমিশনের সাক্ষাৎ মেলে। এদের একটি ছিল ১৯৫৯ সালের শরিফ কমিশন, যার দায়িত্ব ছিল একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়টি ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রদের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণবিধান সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার জন্য গঠিত হয়েছিল। সর্বশেষ উদ্যোগটি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আইয়ুবের পতনের অল্প পরে গৃহীত হয়েছিল। বিদ্যমান শিক্ষানীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে ত্রুটি চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায়নির্দেশ এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল। এইসব আলোচনা, পর্যালোচনা, তথ্য-পরিসংখ্যান, রিপোর্ট, জরিপ ও সমীক্ষার মিলিত ফসল হিসেবে পাকিস্তানের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচীতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নতুন রাষ্ট্রের আদর্শ ও চাহিদার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। পাঁচদিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সব দিক পর্যালোচনার পর বেশ কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান সরকারকে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে উপদেশ ও সহায়তা দানের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীগণ, উপাচার্যবর্গ, জনশিক্ষা পরিচালকবৃন্দ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমবায়ে একটি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজকর্ম সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন করার জন্যও সম্মেলনে প্রস্তাব রাখা হয়। তবে আমাদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল দু'টি। একটিতে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, অতএব এই রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শ ও নীতির আলোকে গড়ে উঠবে। বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠা চাই। নবগঠিত উপদেষ্টা বোর্ড প্রদেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্য একটি সার্কুলার প্রণয়ন করে। এই সার্কুলারটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে নিজেই তৈরি করেছিল। তবে এর চেয়ে অনেক বেশি বিতর্কিত ও উত্তেজনাকর ছিল ভাষা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তটি। এই সম্মেলন উর্দুকে

পাকিস্তানের সরকারি ভাষা বলে স্বীকার করে নেয় এবং যেসকল এলাকায় উর্দু শিক্ষার মাধ্যম নয় সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে উর্দুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৫১] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বাঙালিদের কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। এ অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক উর্দুশিক্ষার প্রস্তাবটিও তেমন কোন গুরুত্ব পায় নি।

সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন—এই ছিল কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারি শিক্ষানীতির দু'টি প্রধান লক্ষ্য। এটা অবশ্য নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না। কারণ একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ এবং বিশেষকরে পূর্ব বাংলার মতো একটি জনবহুল অঞ্চলের পক্ষে কেবলমাত্র টিকে থাকার জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং এর গুণগত উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। দেশভাগের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০) ছিল সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল, যাতে সরকারি শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এতে বলা হয় :

> মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের ইতিহাস ও আদর্শ প্রচারের শক্তিশালী বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; ব্যক্তির চরিত্র ও আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টিতে এই শিক্ষার নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে; শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে মানববিদ্যা ও গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে এবং বিদ্যার্থীদের জন্য কৃষি, শিক্ষকতা, সমাজকল্যাণ, ব্যবসা ও শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা ... কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অকালে সঙ্কীর্ণ বিশেষ শিক্ষার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা না করে বরং তাদের জন্য উত্তম সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।[৫২]

পূর্ববঙ্গের জন্য ৫০০ উচ্চ বিদ্যালয়কে মান উন্নয়নের জন্য অনুদান দেয়া, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা, পাঠ্যসূচিকে বহুমুখী করা, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার নির্মাণ, উন্নয়ন করা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ভবন নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখা হয়। কুড়িটি উচ্চবিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কৃষিকোর্স চালু করা এবং আরো ১৬টি উচ্চবিদ্যালয়ে কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আরো প্রস্তাব করা হয় যে, কিছু সংখ্যক উন্নততর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উন্নীত করে এবং দুর্বল উচ্চবিদ্যালয়কে অবনমিত করে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হবে; তদুপরি বিদ্যমান স্কুলগুলোর কতকগুলোকে উন্নত করে আশিটিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার কথাও বলা হয়।[৫৩]

---

৫১. ১৯৪৮ সালে ৭-৯ জুন করাচীতে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম সভায় এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছিল। তখন রাজকুমার চক্রবর্তী প্রস্তাবের ভাষাসংক্রান্ত অংশের বিরোধিতা করেন। রাজকুমার চক্রবর্তী এই বোর্ডে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়ে গিয়েছিলেন। চক্রবর্তী তাঁর নোটে পাকিস্তানী ছাত্রদের উর্দু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে উর্দুকে কয়েকটি বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় ভাষার একটি করার পক্ষপাতী ছিলেন।

৫২. পাকিস্তান সরকার, *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা* (১৯৫৫-৬০), ৫২।

৫৩. প্রাগুক্ত।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার (১৯৫৬ সালে এই নতুন নামকরণ হয়) ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে। তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের সদস্যরা হলেন মাহমুদ হাসান, পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি; কুদরত-ই-খুদা, পরিচালক, আঞ্চলিক গবেষণাগার, ঢাকা; আখতার হামিদ খান, অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টোরিরা কলেজ; আবুল লেইস, অবসরপ্রাপ্ত ডি. পি. আই. আসাম; জি. সি. দেব, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ডি. পি. আই. আবদুল হাকিম, সদস্য-সচিব।

একই বছর কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। শিক্ষার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েও কমিশন জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করে। এতে বলা হয় যে, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের বিষচক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। আমাদের দারিদ্র্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁজিবিনিয়োগের বড় অন্তরায়। দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে কমিশন আমাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, শিল্পে অনুন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত দুর্বলতাকে দায়ী করে। অতএব ব্যাপক গণসাক্ষরতা এবং উপরের স্তরে বহুমুখীকরণসহ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারি শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে কমিশন মতপ্রকাশ করে।[৫৪]

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নিম্নলিখিত চারটির যেকোন একটি আকারে সংগঠিত করার পরামর্শ দেয় : (ক) ১১টি শ্রেণীসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; (খ) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্রেণীর হাইস্কুল, (গ) প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৮টি শ্রেণী নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জুনিয়র হাইস্কুল; (ঘ) নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি শ্রেণী নিয়ে একটি সিনিয়র হাইস্কুল। বলা হয় যে, এসব বিদ্যালয়ে সকলের জন্য অত্যাবশ্যক একটি মূল পাঠ্যসূচি থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি বিদ্যার্থীর বয়স, স্থানীয় পরিবেশ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা, মানসিক গড়ন ও অভিরুচি অনুযায়ী বহুমুখী কোর্সের উদার ব্যবস্থাও থাকবে। এসব বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমাদের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্যকরূপে অনুধাবন ও মোকাবেলা করার বুদ্ধিমত্তা ও দেশপ্রেম গড়ে উঠবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে। দেশে বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে মূলত স্থানীয় উদ্যোগে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছিল। কাজেই কমিশন মনে করে, অদূর ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংস্কারকৃত এবং প্রাচীনপন্থী মাদ্রাসাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে একটা সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

---

৫৪. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *শিক্ষা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট*, ১৯৫৭, ১৮-১৯।

এ ধরনের একটি ব্যবস্থার জন্য ভাল বেতন, কাজের পরিবেশ ও উন্নতির সম্ভাবনাসহ উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সমাজের সর্বস্তর ও দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগের দরকার হবে। কিন্তু এটা এমনি একটা প্রয়োজন, যা পর্যায়ক্রমে মেটাতে হবে। আরো দু'টি সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে কমিশন জোর দেয়। তা হলো বাধ্যতামূলক ভাষাশিক্ষা ও নারীশিক্ষা। প্রথমটির ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাই (শিক্ষার মাধ্যম) বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় ভাষা হওয়া উচিত। জুনিয়র হাইস্কুল পর্যায়ে একজন বিদ্যার্থী দু'টি ভাষা শিক্ষা করবে। দ্বিতীয়ত, একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।[৫৫]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ, কারিগরি ও পেশাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে মূলত উন্নততর শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত হোস্টেল, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হয়। নতুন নতুন ভবন নির্মাণের চেয়ে উল্লিখিত প্রয়োজন মেটানোর উপর পরিকল্পনায় অধিকতর জোর দেয়া হয়। একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা নেহাত জরুরি—প্রথম পরিকল্পনার এই ঘোষণার কথা মনে রেখে প্রাদেশিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রদেশের উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা নির্ধারণ করেছিল।[৫৬]

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। দু'টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে ৭১টি কলেজ ছিল। তন্মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একেবারেই নতুন--বলা যায় নামমাত্র। অনুরূপ জনসংখ্যা অধ্যুষিত যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কুড়িটি এবং বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কলেজও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে চারগুণ বেশি জনসংখ্যার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১,৮৫৫টি। আর সমসংখ্যক জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ৩০০টি (৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ)। পূর্ব পাকিস্তানের চেয়েও কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত ছিল। যুক্তরাজ্যে এ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৮৪,০০০ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭,২০,০০০ জন। যুক্তরাজ্য উচ্চশিক্ষায় যা ব্যয় করতো তার শতকরা একভাগ ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে। আর যুক্তরাষ্ট্রের দু'হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। ১৯৫৩-৫৪ সালে সকল প্রকার শিক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল ৭,২৭,৩৩,৭৬৬ টাকা। টাকার পরিমাণে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে এই তুলনা যতোই মর্মান্তিক মনে হোক, শিক্ষার গুণগত মান ও বিষয়বস্তুর তুলনামূলক চিত্র যে আরো অনেক বেশি হতাশাব্যঞ্জক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৫৫. প্রাগুক্ত, ২০-২১।
৫৬. ঐ, ৩৮-৩৯।

অর্থকৃচ্ছ্রতার এই প্রেক্ষাপটে কমিশন অসমন্বিত শিক্ষাপ্রসারের চেয়ে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মান উন্নয়নের উপরই বেশি জোর দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব কমিশনের কাছে খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতো কমিশনও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জনের সুপারিশ করে।

সরকারি শিক্ষানীতির এই ছিল মূল রূপরেখা—শিক্ষাকাঠামোতে গুণগত মানের দারিদ্র্য দূর করা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে অর্জন একেবারে তুচ্ছ না হলেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছিল। কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া সত্ত্বেও দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে রয়ে যায়। অন্যদিকে মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার গুণগত মানেও তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি।

তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে 'জাতিগঠনে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ' এই তত্ত্বকে খুবই প্রাধান্য দেয়া হয়। ততোদিনে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্যতা দেশে-বিদেশে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে এর রিপোর্ট পেশ করে।[৫৭] দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই ৬০ ও ৭০-এর দশকের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন, দিকনির্দেশনা দান ও বাস্তবায়নকৌশল নিরূপণে উক্ত কমিশনের সুপারিশকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

কমিশন শিক্ষাকে উৎপাদনশীল কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের সুপারিশ প্রণয়ন করে। শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে গুণগতমান উন্নয়ন, যাতে করে এই ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা অন্যান্য উন্নত দেশের শিক্ষিতদের তুলনায় সন্তোষজনকভাবে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে উত্তরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতির প্রয়োজন একটি পুনর্গঠিত ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা। বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, পাকিস্তানের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও এর পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি ছিল কমিশনের লক্ষ্য।

---

৫৭. পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব এস. এম. শরিফ ছিলেন এই কমিশনের প্রধান। অন্যরা হলেন পেশোয়ার, করাচী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ; আণবিক শক্তি কমিশনের একজন সদস্য; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক; সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড; অধ্যক্ষ, পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একজন কলেজ-অধ্যক্ষ। এগারো সদস্যের এই কমিশনে মাত্র চারজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং তিনজন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কমিশন সুপারিশ করে : (ক) আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে হবে, (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে গুটিকয়েক বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় রাখতে হবে, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে, (ঘ) সম্মান ও পাস ডিগ্রি কোর্সের স্থায়িত্ব তিন বছর করতে হবে, (ঙ) মেধাবি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের পর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে এবং (চ) নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।[৫৮]

শিক্ষাব্যয়

এই প্রশ্নটি শিক্ষা কমিশনকে যথেষ্ট ভাবিত করেছিল যে শিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি, এযাবৎকাল শিক্ষা সম্প্রসারণের পিছনে ব্যক্তিগত উদ্যোগই সবচেয়ে সক্রিয় ছিল, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল ন্যূনতম। যেহেতু সরকারি ব্যয়ের সিংহভাগই ব্যয়িত হয়েছে বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পিছনে, সেহেতু বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অধিকাংশ এবং কলেজের অনেকগুলিই বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এদের বেশিরভাগই কোনমতে টিকে থাকার সংগ্রামে নিরত থাকতো। কিন্তু যেহেতু কমিশন শিক্ষাকে "একটি ব্যয়বহুল সমাজসেবামূলক উদ্যোগ" হিসেবে না দেখে বরঞ্চ বিনিয়োগ ও সম্পদসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে দেখেছিল, সেজন্য এটি সরকার এবং জনগণ উভয়কেই আরো বেশিকরে এই ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। কমিশন স্বীকার করেছিল যে, সরকার কখনো নিরঙ্কুশভাবে অথবা অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করে নি। "যেহেতু আমরা দরিদ্র, সেজন্য আমাদেরকে এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বাড়তি ত্যাগস্বীকার করতে হবে যাতে আমাদের দারিদ্র্য লাঘব হতে পারে।"[৫৯] কাজেই কমিশনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার ও জনগণের সমানভাবে বহন করা উচিত, আর মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের তিন-পঞ্চমাংশ ছাত্রবেতন থেকে মেটানো হোক এবং উচ্চতর শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের যতোটুকু জনসাধারণ বর্তমানে বহন করে থাকে তার চেয়ে আরো অধিক হারে জনসাধারণের বহন করা বাঞ্ছনীয়। এই মতেরই প্রতিধ্বনি করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়, "যদি শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন উত্তমরূপে মেটাতে হয়, তাহলে সরকারি সম্পদের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগের উপর আরো অধিকভাবে নির্ভর করতে হবে।"[৬০] উন্নততর শিক্ষার জন্য বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সবগুলো উৎসই, যেমন কর, ছাত্রবেতন, নাগরিক বদান্যতা, সরকারি ঋণ ও বিদেশী দাতার দান ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, এই প্রথমবারের মতো একটি সরকারি দলিলে

৫৮. কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়।
৫৯. *শরিফ কমিশন রিপোর্ট*, ৩৪৭।
৬০. *দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*, ৩৪১।

সরকারের পরিবর্তে বেসরকারি উদ্যোগকে আরো ব্যাপকভাবে শিক্ষাউন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।[৬১]

কিন্তু কমিশন যাই সুপারিশ করুক, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগ বরাবরই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। নিচের সারণিগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সারণি ৩ : পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাব্যয়, ১৯৬১-৬২ (উৎস অনুসারে)

মোট ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার		
খাত	টাকা	সরকার	স্থানীয় সরকার	বেতন	অন্যান্য
১. বিশ্ববিদ্যালয়	৬৮,৯১,৮৫৪	৭৮.৪	-	২০.৮	০.৪
পুরুষ					
২. সাধারণ কলেজ	৯৫,৬৬,৩৮৪	৩৭.৪	-	৫৫.২	৭.৪
৩. পেশাশিক্ষার কলেজ	৪৫,৮৬,৯০৫	৭৯.৪	০.২	১৮.১	২.৩
৪. উচ্চবিদ্যালয়	৩,২১, ৪৮,৬৩৫	২৪.৩	০.১	৫৫.৭	১৯.৯
৫. জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়	৩৭,৫৩,১৫৪	২১.৬	২.২	৪৬.৬	২৮.৬
৬. মধ্য স্কুল	১০,২২,৪০৩	২৫.০	৭.৫	৩৯.২	২৮.৩
মহিলা					
১. সাধারণ কলেজ	৯,৬৮,৪৮৯	৫৫.৯	১.৬	২২.৬	১৯.৯
২. পেশাশিক্ষার কলেজ	১. ০,৬৪৯	১০০.০	-		
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫.৻ ৩,৯৪৭	৩৭.৭	১.১	৩৭.৯	২৩.৩
৪. জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	৬,৩৬,৬০০	৩১.৮	৩.৬	৩২.৪	৩২.২
৫. মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়	৮,১৩৪	৩৩.৩	৪৭.৫	-	১৯.২
পুরুষ		**১৯৬৪-৬৫**			
১. বিশ্ববিদ্যালয়	১,৪২,৯৮,৮৬৪	৬৫.৯	-	১৭.৪	১৬.৭
২. সাধারণ কলেজ	১,৭৯,৩৩,৭৮৪	৩৩.৯	.০৯	৫৩.৯	১১.৩
৩. পেশাশিক্ষার কলেজ	৫৪,৭১,১০৭	৯৪.০	১.০	৪.৯	০.১
৪. উচ্চ বিদ্যালয়	৫,০৭,১১২	২৬.৭	০.৬	৫৬.৫	১৬.২
৫. জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও মধ্য স্কুল	৮৫,৩৪,৮৪১	২৭.১	৩.৪	৪৫.৯	২৩.৬

উৎস : পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তান জনশিক্ষা বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৬১-৬২, ৬৪-৬৫* এবং পূর্ব পাকিস্তান জনশিক্ষা, *পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৬০-৬১, ১৯৬৪-৬৫,* ২৬-২৭।

৬১. এই মতের সঙ্গে পূর্বেকার সরকারি মতের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন ১৯৪৯ সালে ১৪-১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের তৃতীয় সভায় রাজকুমার চক্রবর্তী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির প্রস্তাব করেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অসুস্থতার লক্ষণ বলে। বোর্ড একবাক্যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। পূর্ববঙ্গেও সরকারি কোন রিপোর্টেই রাষ্ট্রের ভূমিকা কমানোর পক্ষে ওকালতি করা হয় নি।

এই সারণিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে সরকারের মোট ব্যয় কেবল পেশাভিত্তিক শিক্ষা বাদে বেসরকারি খাত থেকে খরচের চেয়ে কম ছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ক্ষেত্রে সরকারি খরচের শতকরা হার আরো নেমে যায় এবং তা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র।

বিস্তৃতি ও বৈষম্য

সে যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তান তার প্রায় সিকি শতাব্দী জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের উন্নতির মুখ দেখেছিল বৈকি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছিল, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছিল, সকল উৎস থেকে ব্যয়ের মাত্রাও বেড়েছিল। সারণি ৪-এ তা লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। ১৯৬১ সালে পাঁচ কোটি লোকের (১৯৬১ সালের লোকগণনা) বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানে হাইস্কুল ছিল দু'হাজারেরও কম আর ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৪,৭৫,১৩৭ জন।[৬২] দু'টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,২৭৯ জন এবং আরো ১,৪০০ জন দু'টি উচ্চ পেশাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছিল।[৬৩] গ্রামাঞ্চলে কোন সাধারণ শিক্ষার কলেজ ছিল না এবং ১,৫৬১টি উচ্চ বিদ্যালয়ে (দু'টি ছিল সরকারি) ৩,৪৭,২৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করছিল।[৬৪] খরচের কথা বিবেচনা করলে দেখতে পাই, ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মোট শিক্ষাবাজেট ছিল ১৩ কোটি টাকার কিছু কম।[৬৫]

স্বভাবতই অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষকরে সচেতন জনসাধারণের মধ্যে। অসন্তোষের মাত্রা আরো তীব্র হতে শুরু করলো যখন মানুষ বুঝতে পারলো যে, পূর্ব পাকিস্তান জনসংখ্যার দিক থেকে বড় অংশ হয়েও ন্যায্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল তো দূরের কথা, এমনকি সমান ভাগও পাচ্ছিল না। পাকিস্তানের বাঙালিবিদ্বেষী শাসকচক্রের হাতে বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনা ছিল তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা, বিশেষকরে শিক্ষাক্ষেত্রে, শুরু হয়েছিল একেবারে গোড়ার দিকেই।

শিক্ষার মাধ্যম ছিল এমনি একটি বিষয়, যা শিক্ষাজীবনের সার্বিক উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। যতোই দিন যাচ্ছিল ততোই বোঝা যাচ্ছিল যে, বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিক দাসত্বে আবদ্ধ করার একটা হীন চক্রান্ত হিসেবেই উর্দুকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে সেদিন বাঙালি জাতি সাফল্যের সঙ্গে সেই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করেছিল।

---

৬২. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা পরিসংখ্যান, সারণি ৪।

৬৩. ঐ, সারণি ৭।

৬৪. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *বার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট* ১৯৬১- ৬২, ১২২।

৬৫. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা ১৯৮৭), ১৮৯।

সারণি ৪ : এক নজরে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, ১৯৪৭-৬৮

	বিশ্ববিদ্যালয়				ডিগ্রি কলেজ			
বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়
১৯৪৭/৪৮	১	১,৬৯৩	১২,৮৭,০৫৮	৯,২২,৭০০	৩১	পাওয়া যায় নি	২০,৯৪,৫৬৯	৭,৯৩০,৩৯
১৯৫৭/৫৮	২	৩,১৫০	৩৭,০৪,৮৯৯	২৬,৭৫,০৯৫	৪২	৩০,৭৪৩	৫,৫১,৯৬৩	২৬,১০,৭৫৫
১৯৬৭/৬৮	৩	৩৮,৫২৪	১,৩৩,৬৯,৯৫০	৮২,৮৮,৮০০	১০৭	১,৪৯,৬০৭	৩,১০,০৫,৭৮৫	১,০৩,৫১,০৬৮
	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ				হাই স্কুল			
১৯৪৭/৪৮	২০	পাওয়া যায় নি	৬,৩৩,২০৭	২,৯৯,৫৭৪	১,৩০৬	৩,৩১,০৭৪	১,৪৪,৫০,৯০৬	২৮,৫৫,৩৯২
১৯৫৭/৫৮	৩৭	৬,৭১৯	১৩,২৬,৯৬৬	৬,৫০,৮৩৪	১,৬৩৮	৩,৯২,৯৩৯	২,৩৪,৯৯,২৪২	৭০,২৯,৩৮৩
১৯৬৭/৬৮	১০৮	৩১,৩৪৫	৫৮,০৭,২৯২	১৮,২৮,০৪৪	৩,১০৮	১০,২২,৪৬৫	৯,৯৮,১৯,১৯৭	৩,২০,১৩,৯৬৪

উৎস : East Pakistan Government, *Stetistical Information on Education in East Pakistan 1970*, Tables IV, V, VI, VII.

বাংলা ভাষা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিল ঠিকই, তবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল বিরতিহীন, নিরবচ্ছিন্ন। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ- বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমবায়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। উদ্দেশ্য ছিল দেশভাগের পর অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগকে প্রতিহত করা। যুক্তফ্রন্ট 'ছয় বছরের স্বৈরাচার' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল যাতে নানা ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্যের একটা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।[৬৬] এটি ছিল বেসরকারি সূত্রে সন্নিবেশিত তথ্য-প্রমাণ। সরকারি সূত্রগুলো অতো উচ্চকণ্ঠ না হলেও কোন অংশেই কম পীড়াদায়ক ছিল না। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল:

সারণি ৫ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—বিদ্যার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যয় সারসংক্ষেপ (১৯৪৭-৫৪)

সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	মোট সরকারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
		পূর্ব পাকিস্তান		
১৯৪৭-৪৮	৩৫,৪৮৪	২৭,১৯,৫৩৩	৯৯,০০৯	১২.৪
১৯৫২-৫৩	৩১,৫৮২	৩৩,২৪,১৫৬	৮৯,০০৯	৪৩.৬
১৯৫৬-৫৭	৩২,১৫৪	৩৪,৮৮,২৩০	৯৪,৬৯৮	৪৩.২
		পশ্চিম পাকিস্তান		
১৯৪৭-৪৮	১১,১৯৩	১০,৭৬,২৪৮	৩৬,৬৬৮	২২.৩
১৯৫২-৫৩	১৫,২৯৩	১৮,৩১,৪৮০	৫০,৬৬৩	৬০.৭
১৯৫৬-৫৭	২০,৩০৮	২৩,৫৫,৬৫০	৬৮,৯২২	৯৭.১

উৎস : পাকিস্তান সরকার, *পাকিস্তানে শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৫৭*, সারণি ২ ও ৩।

সারণি ৬ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়

	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মোট সরকারী ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মোট সরকারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	৫,২৬,০২০	২.৪	২,৫৯৮	৫০৮,০৩৯	৫.১
১৯৫২-৫৩	৩,১৪৩	৪,৫৩,৪৪১	৮.৬	২,০১৮	৬২১,৫৭৮	১২.৬
১৯৫৬-৫৭	৩,০৮৪	৪,৯৭,৫৯৯	৬.৪	২,৬৭২	৮২৮,৭১৫	২৪.৪
১৯৬৫-৬৬	৪,১০৮	৯,৫৬,২০৬	৫৩.২৬	৪,৪৪৩	১,৪৪৯,৪১৭	৬৭.৩৫

উৎস : শিক্ষা পরিসংখ্যান, পাকিস্তান॥১৯৪৭-৫৭, সারণি ৮,৯ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক ১৯৬৮*, সারণি ১৭৩,১৭৪,১৯৫,১৯৬।

---

৬৬. *পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা পরিসংখ্যান*. সারণি ১৮।

সারণি ৭ : পরিসংখ্যান : সাধারণ কলেজ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী
১৯৪৭-৪৮	৫০	১৮,৫৫৬	৪০	১৩,৫৫৫
১৯৫২-৫৩	৭১	২১,৪৮৮	৫৮	৩০,১১৬
১৯৫৬-৫৭	৬৭	২৯,১৫৮	৮৫	৪৫,৮৭৮
১৯৬৫	১৬১	১,২৫,৫৯৭	২২৮	১,৩৪,৩১৯
		পেশা শিক্ষার কলেজ		
১৯৪৭-৪৮	৫	৭৭৮	২১	৪,৩৬৮
১৯৫২-৫৩	৬	১,৯০৭	২৪	৬,৪৪৯
১৯৫৬-৫৭	১১	২,৮৮৭	৩২	৯, ৫১৯
১৯৬৫	২১	৬,১৭৩	৩৩	১১,৭৩৫

উৎস : পাকিস্তান সরকার॥ *শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৪৭-৫৭*, সারণি ১৭ ও ১৮ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮*, সারণি ১৮৪-১৮৫।

সারণি ৮ : বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান

	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	মোট সর-কারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	মোট সর কারি ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১	১,৬২০	১.০	২	৬৪৪	১.৯
১৯৫২-৫৩	১	২,৩০৪	৪.৭	৪	১,৬৮৬	৮.৫
১৯৫৬-৫৭	২	৩,১২৫	৫.৫	৪	৩,১০৬	১৪.৯
১৯৬৫	২	৬,৭২৯	১০.৮৫ (১৯৬৪-৬৫ সময়ে)	৪	১০,০৬৮	৫৬.২ (১৯৬৪-৬৫ সময়ে)

উৎস : *পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৪৭-৫৭*, সারণি ১৯ এবং ২৪ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক*, সারণি ১৮৮, ১৮৯, ১৯২।

সারণি ৯ : মোট সরকারি শিক্ষাব্যয়

(মিলিয়ন টাকা)

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	১২.৪	২২.৩
১৯৫২-৫৩	৪৩.৬	৬০.৭
১৯৫৬-৫৭	৪৩.২	৯৬.১
১৯৬৭-৬৮	৩৪৮.৬	৩৬৫:৩

উৎস : *পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৪৮* এবং ১৯৬৭-৬৮ এর জন্য *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮*, সারণি ১৯৮ ও ১৯৯।

শিক্ষা ও রাজনীতি

উল্লিখিত সারণিগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দেশবিভাগের প্রাক্কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ব্যাপকতর শিক্ষাভিত্তি নিয়ে। প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যার (পেশাশিক্ষার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে) বিচারে এটা সত্য ছিল, যদিও ব্যয়ের দিক থেকে একথা বলা যায় না। কিন্তু ৫০ ও ৬০-এর দশকে অধিকতর শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। দুর্লভ অর্থ-সম্পদ ভাগাভাগির প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল।[৬৭]

যে উচ্চাশা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিল, বিভাগোত্তর পাকিস্তানে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে তা ক্রমে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের জন্মের পর এক দশকের মধ্যেই বাঙালিরা, বিশেষকরে তাদের মধ্যে যারা সচেতন তারা বুঝে নিয়েছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে শুধু প্রভুর বদল হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। এর ফলে বাঙালিদের মনে জন্ম নিয়েছে হতাশা, হতাশা থেকে ক্রোধ এবং এ ক্রোধ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়েছে তাদের মরণপণ স্বাধিকার সংগ্রাম।

আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পূর্ব পাকিস্তান প্রথমে চেয়েছে ফেডারেল সংবিধানের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে। সেই আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সেই দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এদেশেরই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এসব সচেতন, জাগ্রত নারী-পুরুষের চোখেই পাকিস্তানী শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি ধরা পড়েছিল সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে প্রকটভাবে। পাকিস্তানী শোষণ এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের গতিকে যেভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিল তার প্রবল চাপ এরা অনুভব করতে পেরেছিল তীব্রভাবে। দেশপ্রেমের কথা বাদ দিলেও এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ হিসেবে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানী শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে। কারণ সামনে এগোবার আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না।

নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেদিন ছাত্ররাই ছিল বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত এবং সক্রিয় কর্মী। রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নবতর মাত্রা ও তীব্রতা লাভ করে ষাটের দশকে

---

৬৭. পাকিস্তান সরকার, *ছাত্রসমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ কমিশন রিপোর্ট*, ১৪৭।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে। এক দশকব্যাপী আইয়ুবী স্বৈরাচার আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যকে দুঃসহ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় সকল বাঙালি বাধ্য হয়েছিল ছয় দফা আন্দোলনের ছত্রছায়ায় স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের এক মোহনায় এসে মিলিত হতে।

আইয়ুবশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রঅসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে সামরিক শাসনের প্রথম থেকেই। গোলযোগের সূত্রপাত হয় যখন সরকার শরিফ কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলো। সরকারি নির্দেশে শরিফ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছিল। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে আইয়ুব সরকার ১৯৬১ সালে জারিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণা-ধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কালো আইন নামে অভিহিত এই অর্ডিন্যান্সগুলো সরকারের হাতে অভূতপূর্ব ও নিরঙ্কুশ নতুন ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো যেন পরিণত হয়েছিল সরকারের একেকটি বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট ও নির্বাহী কাউন্সিলের (বর্তমান সিনেট ও সিন্ডিকেটের সমতুল্য) সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছিল। নির্বাচনপ্রথা উঠিয়ে দেয়া হয়। চ্যান্সেলরের সম্মতি সাপেক্ষে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন সংস্থা কর্তৃক পাশকৃত যেকোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত করতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাশকৃত কোন আইন বা অর্ডারকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার হরণ করা হয়। চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন যদি তিনি মনে করতেন যে পরিস্থিতির আলোকে এর প্রয়োজন আছে। এতসব ক্ষমতাদানের পরও চ্যান্সেলরকে যেকোন অর্ডার জারি করার বিধিবহির্ভূত ক্ষমতা দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

এসব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণরূপে এবং কলেজগুলো থেকে কিছু কম পরিমাণে সরকার-বিরোধী তৎপরতার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। সেই ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই চিন্তা ও কর্ম উভয়বিধ ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন সেসব চিন্তাবিদ, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা ও মূল্যবোধকে শাণিত করেছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি দান করেছিলেন। দলে দলে আরো বেরিয়ে এসেছিলেন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা এবং বেসর-কারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিল্প-উদ্যোক্তারা। এঁরাই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্ফীত করেছিলেন, যাঁরা ৬০-এর দশকে এসে প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানী শাসক মহল কেমন করে তাদের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

কিন্তু আইয়ুবচক্রের কাছে আরো বেশি প্রত্যক্ষ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, যারা ছিল ক্রমবর্ধমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক।[৬৮] ১৯৬২ সালের পর থেকেই ছাত্রদের সরকারবিরোধী বিক্ষোভের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এই তীব্রতর ছাত্রবিক্ষোভের কারণগুলো যেমন ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত তেমনি রাজনৈতিকও। তাদের দাবিগুলোই তার প্রমাণ। তারা চেয়েছিল সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, স্বৈরতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৬১ বাতিল ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানসহ অন্যান্য প্রদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র, সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, ছাত্রসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার।[৬৯] তখন শিক্ষাসংক্রান্ত অভিযোগাগুলো রাজনৈতিক অভিযোগ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতো। কাজেই ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত দাবিগুলো বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল।

ছাত্রবিক্ষোভের মোকাবেলায় সরকার বেছে নিয়েছিল নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের পথ। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা, ব্যাপক ধরপাকড়, জেল-জুলুম, বহিষ্কার, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা প্রত্যাহার, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ) নামধারী সরকারসমর্থিত তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের গুণ্ডা কর্তৃক ছাত্রদের উপর দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার এসব আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে।[৭০] সরকার ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করে। হামুদুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যদিও এটি ছাত্রসমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ কমিশন নামে অভিহিত হয়েছিল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এটি কোন শিক্ষা কমিশন ছিল না।[৭১] এর প্রধান কাজ ছিল ছাত্র-অসন্তোষের কারণ খুঁজে বের করে প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদান করা। ১৯৬৫ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে কমিশন "উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির অভিযোগ"-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উপসংহারে বলে যে, "(১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের অধীনে) যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল তাতে বিরাজমান অবস্থায় আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয়

---

৬৮. 'শহীদ দিবস' ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩, ছাত্রদের প্রকাশিত পুস্তিকা; 'শিক্ষা দিবস' ১৭ সেপ্টেম্বর এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, সরকারের বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ। সবগুলো তথ্য এসেছে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, ২০৮, ২১৪, ৩৭২।

৬৯. ঐ, এগারো দফা- ১৫৪।

৭০. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ও ২৬ মার্চ, ২৮ এপ্রিল ও ৫ মে ১৯৬৪।

৭১. কমিশনের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন—এস. এ. মাহমুদ, বিচারপতি, পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোর্ট; মমতাজউদ্দীন আহমদ, উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাসির আহমদ, সভাপতি, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

নি, বরং হিতে বিপরীতই হয়েছে।"[৭২] তাঁদের প্রস্তাব ছিল উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ সিনেট ও সিন্ডিকেটকে পুনর্বহালকরণ যাতে করে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিবর্গ অনুপ্রবেশ করতে না পারে অথবা পারলেও কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে। অতি সীমিত মাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় নির্বাচনপ্রথার সুপারিশ করা হয়। এর বেশি কিছু করতে কমিশন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কমিশন স্বীকার করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে একজন রাজনৈতিক গভর্নরের নিযুক্তিকে অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি ইস্যুতে পরিণত করেছে। কিন্তু তাঁরা এতে কোন দোষ দেখতে পান নি।[৭৩] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র সিনেট ও সিন্ডিকেট ইস্যু ছাড়া কমিশন বিরাজমান শিক্ষাকাঠামোতে আর কোন মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করে নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসংগঠনগুলো সম্বন্ধে কমিশনের বিরূপ মনোভাব বাঙালি ছাত্রদের কাছে এর প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাই তুলে ধরেছিল। কাজেই শরিফ কমিশনের মতো এই কমিশনকেও ছাত্ররা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।

পাকিস্তানের উভয় অংশে তীব্র ছাত্রবিক্ষোভ[৭৪] ও গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে আইয়ুবশাসনের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আইয়ুবের উত্তরসূরিদের সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার নৈতিক শক্তি ও সাহস মোটেই ছিল না। ফলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কালক্রমে এসে মিশে যায় একাত্তরে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে।

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ঘটলো সেই ঘটনা, যা প্রথম ঘটেছিল ৪০-এর দশকে পাকিস্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে। সেবারের মতো এবারও বাংলার উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফসল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান অসহনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু এককভাবে এটা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না যদি না তারা নিজেদের শ্রেণীগত বিভাজনের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসে ব্যাপক গণমানুষের কাতারে যেয়ে দাঁড়াতো। শিক্ষিত শ্রেণী এবং জনতার এই ঐক্য ও মৈত্রীতেই নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তি।

---

৭২. ঐ, *কমিশন রিপোর্ট*-১৯৬৫, ৫।

৭৩. ঐ, ১৪৯।

৭৪. আইয়ুব খানের পতনের পরে ইয়াহিয়া খান ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আর একটি কমিশন গঠন করেছিলেন এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে। পাকিস্তান শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূর খান কমিশনের রিপোর্ট 'নতুন শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' নামে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ করেছিল। এই প্রস্তাবগুলো উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের ছিল এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্পষ্টতই এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যসমূহ দূর করা। কিন্তু ততোক্ষণে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে এগুলো চিরতরের জন্য ইতিহাসের পাদটীকায় স্থান লাভ করে।

নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী

শরীফ উদ্দিন আহমেদ*

বাংলার নগরজীবনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য ধরেই বলা যায়, উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের বিনিময়কে কেন্দ্র করেই মূলত কৃষিভিত্তিক এই ভূখণ্ডে নগর গড়ে উঠে। এ ধরনের বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি সুবিধাজনক স্থান, যেখানে বিক্রেতা-ক্রেতার উপস্থিতিসহ জনসাধারণ নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। ফলে নদীর তীর, রাজপথ ও অবস্থানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকাগুলোকে ঘিরে কৃষিজাত পণ্যবিনিময়কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল। এই বিনিময়কেন্দ্রগুলোই কালক্রমে নগরকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ এবং কর প্রদান করার জন্য উৎপাদিত উদ্বৃত্তপণ্য বিক্রির প্রযোজন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী শ্রেণীর সাহায্য-সহযোগিতা ছিল তাৎপর্যবহ। তারা দোকান ও ঘরবাড়ি তৈরি শুরু করে এবং ক্রমে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় শিল্পী ও কারিগরশ্রেণী। এভাবে জনবসতি বাড়তে থাকায় এক সময় এই 'নিউক্লিয়াস'কে (nucleus) কেন্দ্র করেই শহুরে কাঠামো গড়ে উঠে। শতাব্দীকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

বাণিজ্যিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও শিল্পায়নপ্রসূত অন্যান্য অনেক কারণে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। এই সমস্ত কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় অনেক নগর এবং শহর গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে অনেকগুলোই ক্ষমতা, উৎপাদন, কর্তৃত্ব ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শহরগুলোর মধ্যে হিন্দুযুগের তাম্রলিপ্তি, কর্ণ-সুবর্ণ, বর্ধমান, বিক্রমপুর, রামাবতী, লখনৌতি, পুন্ড্রনগর ও কোটিবর্ষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুপরবর্তী মুসলমান যুগের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হলো গৌড়, একডালা, সাতগাঁও, হুগলী, চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম), সোনারগাঁও, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ।[১] কিন্তু নদীমাতৃক এই বাংলার আবহাওয়া শহরগুলোর টিকে থাকার অন্তরায় হওয়ায় এগুলোর স্থায়িত্ব ছিল খুবই স্বল্পকালীন। তা সত্ত্বেও সতেরো শতকে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, রাজমহল, হুগলী, বালাসোর ও কাশিমবাজার উল্লেখযোগ্য।[২]

বাংলায় নগরায়ণের সনাতন প্রক্রিয়া আঠারো শতকেও অব্যাহত ছিল। দেখা যায়, নবাবি শাসনামলে এ দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোকে ঘিরে বেশ কিছু নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো ছাড়াও জমিদারদের বা প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহকদের আবাসস্থলকে ঘিরেও বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। চলিষ্ণু সময়ের ভাঁজে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এই সমস্ত আবাসস্থলকে ঘিরে গড়ে উঠা শহরগুলোই বিবর্তিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক শহরে রূপান্তরিত হয়। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে জমিদারবাড়িকেন্দ্রিক শহরগুলো ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন বর্ধমানের রাজার আবাসস্থলকে ঘিরে বর্ধমান শহর, রাজশাহীর রানী ভবানীর নাটোর এবং নদীয়ার রাজার কৃষ্ণনগর। কিছুটা অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট থাকা সত্ত্বেও সমকালীন ভক্তকবি রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য থেকে সে সময়ের শহরগুলোর অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। মনে করা হয় যে, দীর্ঘ এই কাব্যটি নবাব মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর (৩০ জুন ১৭২৭) অল্প কয়েক বছর পরে রচিত হয়। ভক্তকবি রামপ্রসাদ বর্ধমান শহরের নিম্নরূপ বর্ণনা দেন :

প্রভাতে উদয়াদিত্য সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীর সিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ ।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রদিবা
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ ॥
পরস্পর সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।

---

১. Barrie M. Morrison, *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*, (Delhi 1980), 12.

২. K. M. Karim, The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, (Dhaka 1947), 170-71.

... ...

কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশ জনেক।
চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়া চায়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই অতিথির সীমা নাই
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ ভূত-ভবিষ্যত প্রাজ্ঞ
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥[৩]

১৭৬৩ সালের বর্ণনায়ও নদীয়ার রাজার কৃষ্ণনগর সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা- সমৃদ্ধ একটি প্রাণবন্ত শহর হিসেবে বিধৃত হয়েছে।[৪] উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকে বাংলার নতুন শহরগুলোর বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল বণিকদের শহর হিসেবে। সমকালীন নগরায়ণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই সময়ের বহু শহরই ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমার ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসাকেন্দ্র ও কারখানা স্থাপন করেছিল, যে স্থানগুলো পরবর্তীকালে শহরে রূপান্তরিত হয়। কলকাতা ছাড়া এ ধরনের জাঁকালো শহরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, মালদহ, লক্ষ্মীপুর, জগদিয়া ও কুমারখালী। এসব শহরের অনেকগুলোতেই নগরায়ণের ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে, যেমন—কারখানাশ্রমিকদের ভিন্ন বাসস্থান, উপাসনালয় ইত্যাদি।

আজকে যা পশ্চিমবঙ্গ, আঠারো শতকে সেখানকার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহরই ছিল হুগলী ও ভাগীরথী নদীর তীর ধরে, যার উত্তর দিকে শেষপ্রান্তে ছিল দেশের প্রধান শহর নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদ, আর দক্ষিণপ্রান্তে ইংরেজদের কলকাতা। মুর্শিদাবাদ আসলে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক একটি মিশ্র শহর। কিন্তু হুগলীর তীরে অবস্থিত অন্য সব শহরই ছিল মূলত বণিক আর কারিগরদের। এগুলোকে বরং বাজারশহরই বলা যেতে পারে, যেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বড় বাজারের উপস্থিতি আর তাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু ছোট ছোট বাজার বা গঞ্জ।

---

৩. ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, *বিদ্যাসুন্দর*, প্রকাশনা : টবর চক্রবর্তী, (দ্বিতীয় সংস্করণ), (কলকাতা ১৩১৩), ১৪-১৫।

৪. *Account by Warren Hastings*, quoted in P.J. Marshall, *The New Cambridge History of India, Bengal: The British Bridgehead*, (Hyderabad 1987), 16.

আঠারো শতকের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ শহরে উন্নীত হয় এবং এ দু'টি শহরেরই ছিল বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি এবং উভয়েরই এক লক্ষ করে অধিবাসী ছিল বলে ধরা হয়। তবে মুর্শিদাবাদের লোকসংখ্যা যে আরো বেশি ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। যেহেতু জনসংখ্যার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই, তাই অনুমান করা হয় যে, ১৭৫০ সালের দিকে মুর্শিদাবাদে অন্ততপক্ষে ৬ থেকে ৭ লক্ষ লোক বাস করতো।[৫] দেশের রাজধানীশহর হিসেবে মুর্শিদাবাদ এই অঞ্চলের মুখ্য নগরীতে পরিণত হয় এবং সম্ভবত ১৭০৪ সালের শুরু থেকেই এই শহর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল হয়ে উঠে। এটি ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্র, সামরিক শক্তির প্রধান ঘাঁটি, রেশমবস্ত্র বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, ভোগবিলাসের প্রধান স্থল এবং প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

মনে করা হয়, মুর্শিদাবাদ যখন তার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির শিখরে, তখন এর বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘ্যে দশ মাইল আর প্রস্থে তিন মাইল।[৬] এই সময়কার নগরায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য, যা প্রায় সব শহরেই বিদ্যমান ছিল, তা হচ্ছে বসতি স্থাপনের কয়েকটি বিশেষ ধারা। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ উভয় শহরেই বণিক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তাদের নিজস্ব মন্দির, মসজিদ ও গীর্জাকে ঘিরে আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল। এমনকি, ভিন্ন ভিন্ন কারিগরেরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় যেসব স্থানে বাস করতো সেগুলোকেও সাধারণভাবে তলা, তৌলা, পাড়া বা মহল্লা বলা হতো। মুর্শিদাবাদে বসতিএলাকাগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল পেশার ভিত্তিতে—জহরতুলী (অলঙ্কার তৈরিকারকদের আবাস), কুমারপুর (কুমারদের এলাকা), গৌখানা (গোয়ালদের বাসস্থান), কাঠগোলা (কাঠব্যবসায়ীদের আবাস) এবং চিনিতলা (চিনিবিক্রেতাদের বাসস্থান)। আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যে কলকাতাতেও তেমনিভাবে তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, কামার, দর্জি ও কাঁসারিদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল।[৭]

প্রাক-বৃটিশ মুর্শিদাবাদের নাগরিক জীবন ও সমাজবিন্যাসের আরো পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। ষোল শতকের শেষভাগে মাকসুম খান নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ খুব শীঘ্রই রেশম ও রেশমবস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে উন্নীত হয় এবং পরবর্তী শতকের প্রথমদিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয়। বাণিজ্যনগর থেকে রাজধানীতে উত্তরণ স্বাভাবিকভাবেই মুর্শিদাবাদের অবস্থানগত মান অতি উচ্চপর্যায়ে

৫. K.M. Mohsin, 'Murshidabad in the Eighteenth Century' in K. Ballhatchet and J. Harrison (eds). *The City in South Asia: Pre-Modern and Modern*, (London 1980), 77

৬. ঐ, 76.

৭. Marshall, *Bengal*, 17.

নিয়ে যায়। কিন্তু এধরনের উত্তরণের ফলে মুর্শিদাবাদ তার ব্যবসায়িক গুরুত্ব হারায় নি। এর ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা এবং সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি এ গুরুত্ব সুনিশ্চিতভাবে বজায় রাখে। উপরন্তু রাজধানী নির্বাচিত হওয়ার ফলে এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাত্রা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃহৎ আকারের ব্যবসা, উৎপাদন এবং গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানিকেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় মুর্শিদাবাদের ক্রমাগত নাগরিক উন্নয়ন, যা শিল্প, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জনের মধ্যে বিকাশলাভ করে, তা নগরবিন্যাসের উপর সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। নগরের সার্বিক বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় বাজার-এলাকা, যা 'চক' নামে পরিচিত ছিল। এখান থেকেই শহরের প্রধান সড়কটি উত্তর-দক্ষিণে বেরিয়ে যায় এবং অন্য রাস্তাগুলো এই সড়কে লম্বালম্বিভাবে এসে মিশে যায়। এই সমস্ত ছোট ছোট রাস্তার উপরেই ছোট ও বড় ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান স্থাপন করে আর এগুলো থেকেই নানা গলি বেরিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, কারিগরি ও শিল্পপাড়ায় শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে পড়ে। এইসব পাড়া এক এক ধরনের ব্যবসা বা শিল্পের নামানুসারে গড়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় যে এলাকায় থাকতো সেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল মহাজনতলা এবং মুগলটোলা নামে।

নগরের এই মূল প্রাণকেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত ছিল আরো অনেক নতুন বাসভূমি। বিশেষকরে মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার প্রধান নগর ও একই সাথে ধনীদের শহরে রূপান্তরিত হয়, তখন এই বৈশিষ্ট্যটি আরো বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠে। শহরটির বিকাশের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করা না হলেও প্রশাসনিক অট্টালিকা, বাজার আর কর্মস্থান কোথায় কোথায় গড়ে তোলা হবে তার একটি মোটামুটি নকশা ছিল। নবাবগণ তাঁদের প্রাসাদ আর কার্যালয় স্বাভাবিকভাবেই গড়ে তুলেছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সুবিধাজনক স্থানে। শহরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং অভিজাত শ্রেণীর পরিবারগুলোও নবাবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের ইমারত তৈরি করে 'শহরের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী স্থানে অথবা নদীর তীরে'। সম্ভবত এই কারণেই নদীর তীর ধরে শহরটির প্রসার বেশি ঘটে; ফলে শহরটি প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যেই অধিক বিস্তার লাভ করে ।[৮]

শহরবৃদ্ধির সাথে সাথে অধিবাসীদের সুবিধার্থে নতুন নতুন গঞ্জ, বাজার আর ঘাট স্থাপিত হয়। যদিও মুর্শিদাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ভাগীরথী নদী থেকেই সরবরাহ করা হতো, তথাপি শহরবাসীর আরো সুবিধার জন্য বড় বড় পুকুর খনন এবং ঝিলগুলো সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাগীরথীর উভয় তীরেই গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ শহরটি।

---

৮. K. M. Mohsin,'Murshidabad in the Eighteenth Century' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 80.

নবাবপরিবার, অভিজাত শ্রেণী, উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, ব্যাঙ্কার, এশীয় ও ইউরোপীয় বণিক, ব্যবসায়ী, আড়তদার, মুৎসুদ্দি, দালাল, কারিগর, শিল্পী, চাকুরিজীবী, দাস, চিত্তবিনোদনকারী, বাদক, পণ্ডিত ব্যক্তি, শিক্ষক, স্থপতি, গৃহনির্মাণকারী এবং শ্রমিকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল শহরটির নাগরিক মানবগোষ্ঠী।

নয়নাভিরাম প্রাসাদ, বাগান, মসজিদ, বিশালকায় ইমারত, বৃহৎ পুকুর ও ঝিল শহরটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। সেই সাথে প্রচুর বাজার আর কেনাবেচার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ধনী-দরিদ্র সবারই চাহিদা মেটাতে পারতো। রেশমবস্ত্র, হাতির দাঁতের সামগ্রী, পিতলের জিনিসপত্র, সোনা ও রূপার তৈরি অলঙ্কার প্রভৃতির বিকিকিনিতে শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠতো। নবাবি দরবার, সামরিক বাহিনী, বণিক-ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরদের উপস্থিতি শহরের সম্পদবৃদ্ধি অনিবার্য করে তোলে এবং একই সাথে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য মূলধন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেরও প্রসার ঘটায়।

শহরের বিস্তার এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ধনী পরিবারগুলোর অনেকগুলোই শহরের মধ্যস্থল থেকে সরে গিয়ে শহরতলীতে বসবাস শুরু করে। এসব এলাকায় জায়গারও অভাব ছিল না। ফলে তারা বিরাট এলাকা নিয়ে তাদের সুবিশাল ইমারত, বাগান, মসজিদ, মন্দির তৈরি করেন, যার সাথে সংযুক্ত হয় বড় বড় ঝিল।

শহরের মধ্যভাগটি উত্তরে মহিমপুর থেকে দক্ষিণে লালবাগ পর্যন্ত লম্বায় প্রায় পাঁচ মাইল আর চওড়ায় আড়াই মাইল বিস্তৃত ছিল। এই মহিমপুরেই ধনকুবের জগৎশেঠদের বাসভবন ছিল। কালে ভাগীরথীর উভয় তীরের এই এলাকাটি জনাকীর্ণ হয়ে উঠে বিভিন্ন অফিস, দোকান, বাজার এবং কারিগর ও শিল্পীদের বাসস্থান গড়ে উঠার ফলে। এই মধ্যস্থলটি আবার হরেক রকম ছোট ছোট গলি ও চোরাগলি দ্বারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এখান থেকে এসব পথ বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে মিশে যায়। জনাকীর্ণ শহরকেন্দ্রের দক্ষিণে চার মাইল দূরে কাশিমবাজার ও বহরমপুরে ইউরোপীয়রা তাদের কুঠিবাড়ি ও বসতি গড়ে তোলে। যদিও শহরের দক্ষিণাঞ্চলটি, বিশেষকরে ইউরোপীয়দের এলাকাটি প্রথমদিকে বেশ ফাঁকা ছিল, কিন্তু অচিরেই এই সম্পূর্ণ এলাকাটির চেহারাই পালটে যায়। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে কাশিমবাজার ও বহরমপুরও জনাকীর্ণ এলাকায় রূপান্তরিত হয়। বহু সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা নিয়ে গড়ে উঠা বৃহৎ, জনবহুল এবং অত্যন্ত সম্পদশালী মুর্শিদাবাদ শহর বিদেশী পর্যটকদের মানসপটে অনুরূপ আর একটি শহরের ছবি ফুটিয়ে তোলে। এমনি এক পর্যটকের মন্তব্য, "মুর্শিদাবাদ শহরটি ঠিক লন্ডনের মতোই বৃহৎ, জনবহুল এবং সমৃদ্ধ। দু'টি শহরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শহরটিতে এমন অনেক লোক আছেন যাদের বিষয়-সম্পত্তি নিঃসন্দেহে পরের শহরটির সবচেয়ে ধনীর চেয়েও অনেক বেশি।"[৯]

৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, 76.

মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে হুগলীতীরের অপর শহরগুলোর তেমন কোন শহুরে বৈশিষ্ট্য ছিল না । চন্দননগর, চুঁচুড়া বা হুগলীকে যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা হয়, তাহলে বলতে হয়, এদের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা যতোই থাকুক না কেন, পর্যটকদের কাছে এগুলো যে কেবল বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলেই প্রতীয়মান হতো তাই নয়, বরঞ্চ এগুলি নিতান্তই কতগুলো গ্রামের অগোছালো সমাবেশ বলে মনে হতো।[১০] এ রকম ধারণা মোটেই ভ্রান্ত নয়, কেননা আঠারো শতকের এই জাতীয় শহরগুলোর সাথে গ্রামের তেমন কোন তফাৎ ছিল না। বস্তুত সেসময় গ্রামেরই ছিল প্রাধান্য। তবে এই প্রাধান্য গেঁয়ো অনগ্রসরতার প্রাধান্য নয়, বরঞ্চ তা ছিল একটি উৎপাদনমুখী গ্রামীণ কর্মধারারই প্রাধান্য। বিশেষকরে হুগলী অববাহিকার গ্রামগুলো সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য, যেখানে কৃষিজাত পণ্যের বেশিরভাগই বাজারজাত করা হতো। এই গ্রামগুলোতে কুটিরশিল্পে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হতো।[১১]

গঙ্গার পূর্বাঞ্চল, যা সাধারণভাবে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, আঠারো শতকে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সেখানেও নগরায়ণের ধারা ঐতিহ্যগতভাবেই সক্রিয় ছিল। অবশ্য এই সময়ে এই অঞ্চলে বড় ধরনের শহর-নগর ছিল খুবই বিরল এবং এ অঞ্চলটিতেও ছিল গ্রামের আধিপত্য। আর এখানেও এই প্রাধান্য দাঁড়িয়ে ছিল দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর। এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে উৎপাদিত হতো বিপুল পরিমাণে নানাবিধ কৃষিপণ্য। এখানকার অনেক গ্রামেই কুটিরশিল্পে উৎপন্ন হতো অত্যন্ত উন্নতমানের সামগ্রী এবং সেসব পণ্যসামগ্রী নিয়মিত দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের জন্য বাজারজাত করা হতো। এখানকার গ্রামাঞ্চলেই প্রস্তুত হতো বিখ্যাত মসলিন, যা ভারতের অন্যান্য স্থানসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।[১২]

আঠারো শতকে এই অঞ্চলের প্রধান নগর ছিল ঢাকা। যদিও ১৭০৪ সালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় এর গুরুত্ব ও গৌরব অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়, তথাপি সমগ্র আঠারো শতক ধরে এটিই পূর্ব বাংলার প্রধান শহর হিসেবে পরিগণিত ছিল।[১৩] এছাড়াও ঢাকা ছিল মুগল আমলে পূর্ব বাংলায় নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনের এক আদর্শ রূপ। বৃটিশপূর্ব যুগে তাই এই অঞ্চলের নাগরিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে সতেরো ও আঠারো শতকে ঢাকার প্রসার ও প্রসিদ্ধি পর্যালোচনা করতে হয়।

---

১০. Marshall, *Bengal*, 17

১১. প্রাগুক্ত, 17

১২. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, (ঢাকা ১৯৬৫), ৯-১৬।

১৩. দেখুন, Abdul Karim *Dacca the Mughal Capital*, (Dacca 1964); also Sharif Uddin Ahmed, *Dacca--A Study in Urban History and Development*, (London 1986)

অখ্যাত একটি ক্ষুদ্র স্থান থেকে রাতারাতি ঢাকা রাজধানীশহরে রূপান্তরিত হওয়ার নেপথ্যে ছিল এ অঞ্চলকে ঘিরে মুগলদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। নগরায়ণের অন্যতম উপাদান রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল মূলত শহর হিসেবে ঢাকার উত্থানের প্রধান কারণ। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আগে ঢাকা সীমিত সামরিক ক্ষমতা এবং ব্যবসা ও প্রশাসনের ক্ষুদ্র কেন্দ্র বৈ আর কিছু ছিল না।[১৪] কাজেই এর নগরগুরুত্ব ছিল সামান্যই।

সতেরো শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত নদীবহুল পূর্ববঙ্গ ছিল মুগল সাম্রাজ্যবহির্ভূত। মুগল সাম্রাজ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সীমান্তের শেষ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং এই অঞ্চলের স্বাধীন পাঠান গোষ্ঠীপতিদের দমন করতে এবং কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী জমিদার বা ক্ষুদে শাসকদের বশে আনতে প্রদেশের মুগল সুবাদার নবাব ইসলাম খান চিশতি ঢাকাকে তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করেন; কেননা এর অবস্থানের কারণে কৌশলগত সুবিধা ছিল ব্যাপক। ১৬১০ সালের জুলাই মাসে তিনি এক বিরাট পদাতিক ও নৌবাহিনী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ঢাকায় এসে পৌঁছান। ছোট্ট থানা বা সামরিক ফাঁড়ি ঢাকা রাতারাতি একটি জনবহুল এলাকায় রূপান্তরিত হলো এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করলো। যদিও প্রথমদিকে ঢাকাকে একটি সৈন্যছাউনির মতো দেখাচ্ছিল, তবুও সবকিছু যাচাই করলে মনে হয়, ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে স্থায়িত্ব দেবার বিষয়ে ইসলাম খানের কোন দ্বিধা ছিল না।

ঢাকা শহরের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার মধ্যযুগে নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী- বিন্যাসের এক আকর্ষণীয় চিত্র প্রকাশ করে। এখানকার পুরনো সামরিক দুর্গটি, যেখানে এসে ইসলাম খান প্রথম তাঁর ছাউনি ফেলেন, তা নতুন রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয় এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য বসতিএলাকা গড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গটি সুবাদারের দপ্তর ও বাসস্থানের জন্য খুবই ক্ষুদ্রাকার ছিল। এ কারণে নতুন অট্টালিকানির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অট্টালিকানির্মাণ ছিল দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম খানের তৈরি সুবাদারের প্রাসাদ, মসজিদ, বাদশাহী বাজার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য নির্মিত বাড়িঘর নিয়ে যে এলাকা গড়ে উঠে, তা মুগল ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সুবাদারের বাসস্থানই ছিল মুগল ঢাকার বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। যদিও ঢাকার সম্প্রসারণে কোন সুচিন্তিত নকশা অনুসরণ করা হয় নি, তবুও এর নতুন সামাজিক

১৪. Habiba Khatun, 'Pre-Mughal Dhaka', in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, (Dhaka 1991), 634.

বিন্যাস ও বসতি সে যুগের ভাবনা এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠে। দুর্গের পশ্চিমদিকে সুবাদারের বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে নানা সরকারি প্রশাসনিক ভবন এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসস্থান—দেওয়ানবাজার, বখশীবাজার, মুগলটুলী, কায়েতটুলী (হিন্দু কেরানিদের এলাকা) এবং এমনি ধরনের অনেক বসতি। দুর্গের পূর্বদিকে যা ছিল পুরনো বসতি, সেখানে নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠলো আর গড়ে উঠলো বিভিন্ন কুটিরশিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ এলাকা—যেমন বাংলাবাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারীবাজার এবং তাঁতীবাজার।

উত্তরদিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু সমতল ভূমিগুলো স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অভিজাত পরিবার ও বড় ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। সেখানে তারা তাদের নিজস্ব এলাকা গড়ে তোলেন, প্রাসাদোপম বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি করেন। এটাই ছিল মুগল ঢাকার শহরতলী। আরো উত্তরে তেজগাঁও এলাকায় এবং পরে অন্যত্র ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাদের কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে।[১৫] এখানেই তৈরি হতো ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানির জন্য বিশেষ নকশার রকমারি বস্ত্রসামগ্রীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বের বিরাট এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি ঘটে আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা। মুগল আমলে ঢাকা যখন তার সমৃদ্ধির তুঙ্গে উঠে, বলা হয়ে থাকে তখন এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ। আর এ নগরটি বুড়ীগঙ্গার তীর ধরে প্রায় দশ মাইল আর ভিতরদিকে প্রায় আড়াই মাইল পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।[১৬] এই পরিসংখ্যান যদি সম্পূর্ণ সত্য নাও হয়, তবুও সমসাময়িককালের পর্যটকদের বিবরণ এবং অন্যান্য উপাদান-উপকরণের সূত্র ধরে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সতেরো শতকের শেষদিকে ঢাকা বাংলার অন্যতম বৃহৎ এবং জনবহুল নগর হিসেবে গড়ে উঠে। কবির ভাষায় এটি ছিল 'প্রাচ্যের শহরগুলোর রানী'।

যেহেতু রাজনৈতিক তাগিদে ঢাকার গোড়াপত্তন হয় এবং ঢাকা প্রথমদিকে উৎপাদনের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন, সেহেতু গোড়ারদিকে এর অস্তিত্ব ছিল নেহাতই পরনির্ভরশীল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরটি এর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতো, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই দিতে পারতো না। প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সারা দেশের রাজস্ব দিয়ে ঢাকার প্রয়োজন মেটানো হতো। একই সাথে দেশের সার্বিক

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন, Karim, *Dacca*, Chapter III.

১৬. দেখুন, Ahmed. *Dacca*, 13.

সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ঢাকার চেহারায় মৌলিক পরিবর্তন আসে, যখন ঢাকা তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই শহরটির সত্যিকারের নগরায়ণ ঘটে। ঢাকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। মূলত এই উত্তরণ সম্ভব হয় ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। এর অবস্থান ছিল এক উর্বর প্রশস্ত নিম্নভূমি এলাকার শেষ উচ্চস্থলে, যা একই সাথে শহরটির সাথে এক সম্পদশালী পশ্চাদ্‌ভূমির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ ঘটায় এবং সমগ্র দেশের সাথে নদীপথে যোগাযোগের চমৎকার সুবিধা করে দেয়।

ঢাকার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুগল শাসকগোষ্ঠী, তাঁদের সহযোগীবৃন্দ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কারিগর ও শিল্পীগণ। শাসকগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, বণিক, ব্যাঙ্কার এবং কারিগরদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকার নিজস্ব একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠে। এভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠার সাথে সাথে ঢাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী ও নগরবাসীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে শহরকে গড়ে তুলতে এবং একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে অর্থবিনিয়োগের মাধ্যমে। কোন নগরপরিকল্পনা অনুসরণ করা না হলেও ঢাকা মধ্যযুগের একটি সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে উঠে। প্রাসাদ-অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দির, ঘাট, রাস্তা আর বাজারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মধ্যযুগের এই শহরটি। শহরটির যোগাযোগব্যবস্থা, হাট-বাজার সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার এবং সেই সঙ্গে শহরের পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার গুরুদায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের উপর, যিনি একই সাথে ছিলেন শহরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ঢাকার মতো বড় একটা শহরের স্বাভাবিক পৌর সমস্যা এবং এর সাথে সংযুক্ত নানা ধরনের জটিলতাগুলোকে কিভাবে পৌরকর্তারা নিয়ন্ত্রণ করতেন বা এক্ষেত্রে কিরকম সফলতা তারা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বিস্তারিত কিছুই বলা সম্ভব নয়।

অবশ্য মুগল যুগে ঢাকার সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ঢাকার সমাজ মূলত মুগল শাসকগোষ্ঠী, বণিক-ব্যবসায়ী, জমিদার ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত ছিল। সেবামূলক কাজে বেতন এবং মজুরিভোগী শ্রেণীর উপস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সমাজের উচ্চাসনে ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি সুবাদার, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান দীউয়ান, বকশী (সৈন্য, শ্রমিক প্রভৃতিকে বেতনাদি প্রদানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং অন্যান্য উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দুইই ছিল। এঁদের পরেই ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ, যাঁদের অনেকেরই ঢাকা শহরের আশেপাশে বা দূরবর্তী এলাকায় বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত উচ্চস্তরের মানুষই ঢাকার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এর সাংস্কৃতিক জীবনকেও

পরিচালিত করতেন। শহরের সাধারণ মানুষেরা এদের জীবনধারার অনেক কিছুই অনুসরণ করতো। কিন্তু ঢাকার নাগরিক জীবনে পেশা কিংবা ব্যবসা ও শিল্পকে কেন্দ্র করে কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে নি।

ঢাকায় বিপুল সংখ্যক কারিগর, শিল্পী ও শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি ঢাকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতির ইঙ্গিত বহন করে। এই জনসংখ্যার বেশিরভাগই আবার জড়িত ছিল বস্ত্রশিল্পের সাথে।

মুগল যুগে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, এমনকি এপর্যায়ে সারা বাংলার জনজীবনে ঢাকার অবদান ছিল প্রশ্নাতীত। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং শহরের অনেক মানুষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকানির্বাহ করতো, যাদের আর্থ-সামাজিক জীবন ঢাকার সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। যে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হতো, আসলে এর বেশিরভাগই আসতো ঢাকার পশ্চাদ্‌ভূমি, যেমন সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতবাধী, জঙ্গলবাড়ী এবং বাজিতপুর থেকে।[১৭] ঢাকা থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, কেননা ঢাকার অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল এই অঞ্চলের প্রধান শুল্কদপ্তর শাহবন্দর।[১৮] ঢাকা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছুই এর পশ্চাদ্‌ভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অনুসৃত হতো।

নবাবি আমলে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল চট্টগ্রাম। বস্তুত চট্টগ্রাম একটি অতি প্রাচীন শহর এবং এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি একটি বন্দরশহর হিসেবে বেড়ে উঠে। সতেরো শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কিন্তু এর পরে আরাকানী মগদের ঘন ঘন আক্রমণ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলার কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয়।[১৯] তাই আঠারো শতকে একটি ক্ষুদ্র বন্দর এবং সামান্য ব্যবসাকেন্দ্রের উর্ধ্বে শহরটির উত্তরণ ঘটে নি, যদিও মাঝেমধ্যে আরব, পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকেরা এই বন্দরে ভিড়তেন। দুর্ভাগ্যবশত মুগল যুগে চট্টগ্রামের সমাজ ও নগরবিন্যাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

---

১৭. করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ১২।

১৮. K.M. Mohsin, 'Commercial and Industrial Aspects of Dhaka in the Eighteenth Century' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 69.

১৯. Abdul Karim, Murshid Quli Khan and his Times, (LOPPO), 1963), 214.

নবাবি আমলের শেষপর্যায়ে এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে এই অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল বাকেরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর এবং সিলেট। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আঠারো শতকে প্রাক-বৃটিশ যুগের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরগুলোর মধ্যে ৯টি ছিল এই অঞ্চলে, যেগুলো এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হচ্ছে দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর, কুমারখালি, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।
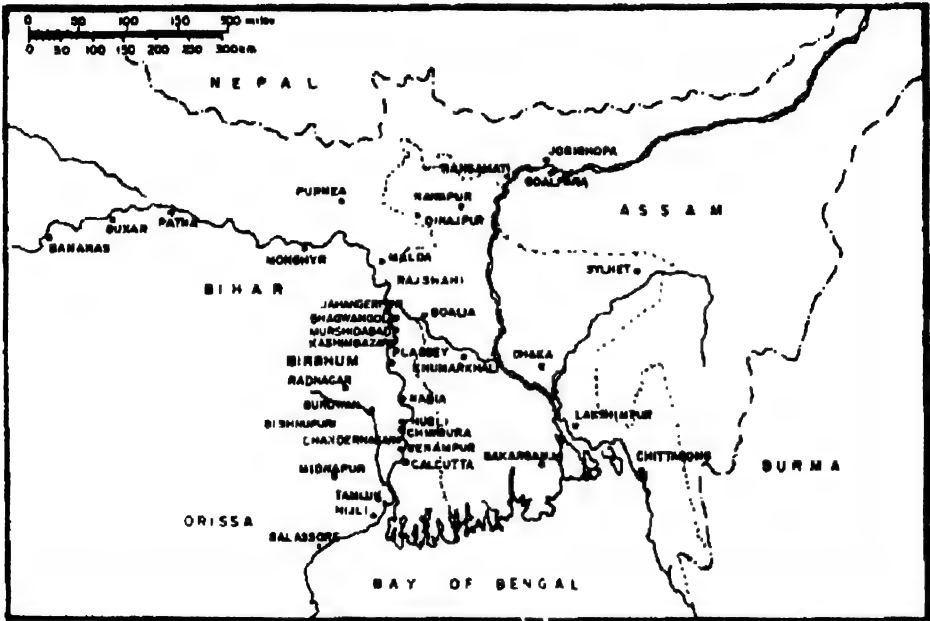
মানচিত্র ১ : আঠারো শতকের নগরকেন্দ্রসমূহ

বৃটিশ শাসনামলে নগরায়ণ

১৭৬০-এর দশকে বাংলার নতুন শাসক হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান বাংলায় নগরায়ণের ঐতিহ্যগত ধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। অতীতে রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলে মূলত ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই নগরায়ণপ্রক্রিয়া চালু ছিল। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে বাংলায় বড় ধরনের নগর বা শহর খুব বেশি ছিল না, তথাপি ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা ও প্রশাসনের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে অনেক ছোটখাটো শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার মতো রাজধানী ও উপরাজধানী শহরগুলোর অবনতি ঘটায়, তেমনি কোম্পানির

প্রশাসনিক,ব্যবসায়িক ও রাজস্বনীতি এদেশের সার্বিক নগরায়ণপ্রক্রিয়ায় এক গভীর পরিবর্তন সাধন করে। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যনীতি অভ্যন্তরীণ দেশীয় ব্যবসাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এবং এই সাথে অন্যান্য বিদেশী বণিকদের ব্যবসা ও বসতিসমূহ ধ্বংস করে তাদেরকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। ক্ষতিকর শুল্কব্যবস্থা, রাজস্বনীতি এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত সুতীবস্ত্র ও সুতার আধিক্য এদেশীয় বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক নগরগুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।[২০]

একই সময়ে কোম্পানিপ্রণীত ভূমিরাজস্বব্যবস্থা এদেশীয় অনেক ধনাঢ্য জমিদারের সর্বনাশ ডেকে আনলে তাঁদের শাসনকেন্দ্রগুলো, যেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহর, সেগুলোরও অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ভাগ্যপরিবর্তনের সাথে সাথে ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুরুতে তাই কোম্পানির শাসন বাংলায় নগরবিলুপ্তিপ্রক্রিয়ার পথ প্রশস্ত করে।[২১] এ প্রসঙ্গে রজনী পামে দত্তের ক্লাসিক উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : "পুরাতন জনবহুল নগরীগুলো, যেমন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ (যে শহরটিকে ১৭৫৯ সালে ক্লাইভ বর্ণনা করেছিলেন ঠিক লন্ডনের মতোই বিস্তৃত, জনবহুল এবং প্রাচুর্যপূর্ণ), সুরাট (গুজরাট) এবং এমনি আরো শহর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির ফলে এমনই জনশূন্য হলো যে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বা বহিঃশক্তির বিজয়ও এগুলোকে তেমনভাবে বিধ্বস্ত করতে পারতোনা।"[২২]

যাহোক, এ অঞ্চলে বৃটিশদের আবির্ভাবকে শুধু এক অন্ধকার যুগের সূচনা বলে মনে করা উচিত হবেনা, তাদের শাসনামলে অনেক ভাল কিছুও হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি নগরায়ণের কথাই ধরি, তাহলে বলতে হবে যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। তবে এসময়ে নগরায়ণের রূপ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। নতুন ধাঁচের নগরায়ণ হয় খুব ধীর গতিতে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, এসময়ের নগরায়ণের উপর স্পষ্টভাবেই ঔপনিবেশিক ছায়া প্রতিফলিত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্বের নগরায়ণকে একজন বিশেষজ্ঞ তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এসময়ের এই প্রক্রিয়া

---

২০. আরো দেখুন, N K. Sinha, *The Economic History of Bengal from Plassey to Permanent Settlement*, 2 Vols. (Calcutta 1956-68); also *The Economic History of Bengal, 1793-1848*, Vol. 3, (Calcutta 1970).

২১. Mohammad A. Mohit, 'History of Urban Growth and Concentration in Dhaka. An Analysis of Spatial Organisation of Power and Authority' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 618, also S. Bhattacharya, 'Regional Economy of Eastern India' in Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India* , (Cambridge 1983), 270-331.

২২. R. Palme Dutt, *India Today* ,(Bombay 1947), 102.

ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি।[২৩] একই ভঙ্গিতে লিখতে গিয়ে মুনিস রাজা ও অন্যেরা মন্তব্য করেছেন :

> স্থান সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া, যা নাকি ওতপ্রোতভাবে জায়গাব্যবহারনীতির সাথে সম্পর্কিত, তা নগরায়ণকে গুণগত এবং সংখ্যাগত উভয়ভাবেই প্রভাবিত করেছিল। আধিপত্য ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক (বৃটেন এখানে কর্তৃত্বপূর্ণ শাসক এবং ভারতবর্ষ নির্ভরশীল উপনিবেশ) শহরগুলির দেশীয় উৎপাদনকর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং অতীতে তারা যে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিতে এক ধরনের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে এক রকমের নগরঅনীহা ও বিনগরায়ণপ্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া নতুন দু'টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এক হচ্ছে উপগ্রহগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শহরের (satellite primate) আবির্ভাব, আরেকটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শহুরে ব্যবস্থার দুর্বলতা। ফলে বেশিরভাগ শহরকেন্দ্রগুলোতেই অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দেখা দিল এবং এদের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত। ঔপনিবেশিক শহর-নগরগুলোর অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব প্রতিফলিত হয় তাদের সঙ্কুচিত শিল্পবুনিয়াদে, যা কেবল ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভীষণভাবে বেড়ে যায় তৃতীয় পর্যায়ক্রমের কর্মকাণ্ড, যা ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুৎপাদনমুখী।[২৪]

এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার উদ্ভব ঘটে উপগ্রহগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে। আর একই সময়ে বাংলার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপেও এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত সমগ্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কলকাতার পশ্চাদভূমিতে পরিণত হয়। আর এই বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে সব ধরনের কাঁচামাল, এমনকি শিল্পজাত দ্রব্যও এখানে প্রেরণ করা হতো বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার জন্য।

আরেকটি কারণেও কলকাতার অভ্যুদয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে এক নতুন ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এর অভ্যুদয়। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার, নতুন ধরনের সাধারণ ও পেশাদারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা, ছাপাখানার উদ্ভব এবং খবরের কাগজের আবির্ভাব সব কিছু মিলে কলকাতায় এক নতুন ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির জন্ম হয় এবং এই সংস্কৃতি বিশেষ এক ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে, যা ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয় নি। দেশীয় মানুষ, যারা কলকাতার আদিবাসী ছিল অথবা যারা এখানে এসে বসবাস শুরু করে, তারা এই নব্য মানসিক চেতনা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই এই নতুন শিক্ষা ও উদার চিন্তাজগতের সঙ্গে সোৎসাহে সংযুক্ত হন, যারা পরবর্তীকালে উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেন। রাজা রামমোহন রায় এমনই এক পরিবেশের প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার মিলনের অগ্রদূত। তাঁর

---

২৩. Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 618.
২৪. উদ্ধৃত, Mohit, ঐ, 618-19.

ব্যক্তিগত চেতনা, নানাবিধ সংস্কারআন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড তাঁকে পরিশেষে ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। এই আধুনিকতা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক নগরায়ণের অতিরিক্ত উপাঙ্গ অবশেষে দেশের ঐতিহ্যগত জীবনধারায় গভীরভাবে রেখাপাত করে।

যে বিশেষ ধারায় কলকাতা বাংলার সর্বপ্রধান শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়, তা দেশের সামগ্রিক নগরায়ণপ্রক্রিয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অন্যান্য শহর-নগরগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য শহর-নগরগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পকর্মকে ক্ষুণ্ন করেই কলকাতা সমৃদ্ধ হতে থাকে।[২৫]

নগরায়ণের বিস্তার না হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির প্রশাসনিক পদক্ষেপ দেশে এক নতুন ধরনের কেন্দ্র (nucleus) প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো হলো দেশের অভ্যন্তরে জেলা প্রশাসনের কেন্দ্র, যা অচিরেই শহররূপে বিকশিত হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে আরো নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে, যেগুলোর সূত্রপাত হয় ব্যবসা ও শিল্পকে কেন্দ্র করে অথবা বিশেষ ধরনের সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে উপলক্ষ করে। তবে একথা সত্য যে, ইংরেজ আমলে নগরায়ণপ্রক্রিয়া ছিল খুবই মন্থর। কেবল কলকাতা-হাওড়াবলয় বাদ দিলে শিল্পকার্য "শহর-নগর সৃষ্টি বা অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেনি ... নতুন শহর গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত অবস্থানেই, যেমন রেললাইনের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থলে, নদীপথের কোন প্রধান এলাকায় বা জনসমষ্টির কেন্দ্রীয় স্থানে, যেগুলোকে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নির্বাচন করেছিলেন প্রশাসনিক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য।"[২৬]

কলকাতা ও তার শহরতলীর বাইরের শহরগুলোকে বৃটিশ আমলে সাধারণভাবে এগুলোর বর্গীয় নামেই বর্ণনা করা হতো আর তা হচ্ছে মফস্বল বা আঞ্চলিক শহর। এভাবে যখন এগুলোকে বর্ণনা করা হয়, তখন তা মহানগরীর সাথে এগুলোর এক ধরনের অভাবী-আত্মীয়সুলভ সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এই শহরগুলো ধীরে ধীরে অনেক নাগরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং এর ফলে এগুলো আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে চমকপ্রদভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। তবুও বলাবাহুল্য যে, এ শহরগুলো কলকাতার মতো উন্নত হতে পারে নি বলে এগুলো মহানগরীর সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

২৫. Serajul Arephin, 'The Urban Pattern of Rajshahi, in S A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi—Its Past and Present*, (Dhaka 1983), 162.

২৬. A.H.N.A Chowdhury and A.C. Das,"The Role of Settlement Planning in National Development" উদ্ধৃত Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 620.

নিঃসন্দেহে কলকাতা হচ্ছে বাংলায় বৃটিশ আমলের নগরায়ণের চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। যদিও বেশ কিছু কাল পর্যন্ত এটি ঠিক শহরের রূপ নেয় নি, তবুও এটি সবসময়েই একটি বৃহৎ জনসমাগমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই অকৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে আর ক্রমশই এই শহরের অধিবাসীদের বসবাসের এবং তাদের সামাজিক শ্রেণীবিভাগের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। শহরটির এই বিকাশ বহুকাল ধরেই বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, যারা এমনকি তাদের বাসস্থানের জন্য শহরের একাংশ নির্ধারিত করে নেয়, যা অচিরেই তথাকথিত শ্বেতাঙ্গশহর নামে পরিচিতি পায়। দেশীয়দের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষ প্রায় প্রথম থেকেই কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ১৬৯০ সালে এই শহরের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, যখন এটি ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টিমাত্র এবং এর অধিবাসীদের প্রায় সবাই ছিল তাঁতী ও জেলে, তখনই কলকাতা বণিক, ব্যবসায়ী, কেরানি, কারিগর, ভূমিমালিক প্রভৃতি সব ধরনের মানুষেরই বসবাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়। আর অচিরেই এটি যখন বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে উন্নীত হয়. তখন এখানে এসে বাস করতে শুরু করেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার ও অন্যান্য পেশার লোকজন। আসলে কলকাতা ১৭৫৭ সালের আগেই একটি, প্রধান নগরী হিসেবে বেড়ে উঠে।[২৭] ১৭৫০ সালে এই শহরে প্রায় ১,২০,০০০ লোক বাস করতো বলে অনুমান করা হয়।[২৮] এসময় থেকেই কলকাতা আরো অভিবাসীকে আকর্ষণ করতে থাকে, বিশেষকরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় অনেকেই এখানে ভিড় জমায়। কোম্পানির বর্ধিত ব্যবসা শুধু সেই সমস্ত দেশীয় লোককেই কলকাতায় আসতে সুযোগ করে দেয় নি, যারা কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল, তারা ছাড়া অন্যান্য বহু দেশীয় বণিক ও তাদের কর্মচারীদেরও কলকাতায় আসতে প্রলুব্ধ করে।

১৭৫০-এর দশক থেকে কলকাতার সম্প্রসারণ ও অগ্রযাত্রা একেবারে বিস্ময়কর। ২৩ জুন ১৭৫৭ সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ রাতারাতি কলকাতার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। সামরিক দিক থেকে কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হলো। এ সময় থেকেই একটা বড় সৈন্যবাহিনী সবসময়ই কলকাতায় অবস্থান করতো। ১৭৭২ সালে কোম্পানি যখন সরাসরি দেশশাসন করার দায়িত্ব নেয়, তখন থেকেই কলকাতা এ অঞ্চলের প্রশাসনিক রাজধানীতে উন্নীত হয়। এসময়েই পুরনো

---

২৭. Marshall, *Bengal*, 159.

২৮. A K. Roy, ' A Short History of Calcutta' in the *Census of India 1901, Bengal*, Part VII, 59-62.

রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে প্রধান প্রধান কার্যালয়গুলো কলকাতার চৌহদ্দিতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে আরো লোক কলকাতায় আসতে উদ্‌গ্রীব হন, যাঁরা সরকারি কাজ করতে চান অথবা সরকারের সাথে যাঁদের নানা ধরনের লেনদেন রয়েছে, যেমন জমিদারদের প্রতিনিধি (মুৎসুদ্দি), যাঁরা এখানে বসবাস করতে উৎসাহিত হলেন। এমনকি পরবর্তীকালে জমিদারদের অনেকেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। ভৃত্য, দারোয়ান আর সাধারণ শ্রমিক এবং এমনি জাতীয় গরিব মানুষেরাও কলকাতায় আসতে শুরু করে। এদের অনেকেই 'কোথাও কোথাও কুঁড়েঘর তুলতো, আবার কেউ কেউ আকাশের নিচেই নিদ্রা যেতো'। এক দশকের মধ্যেই অর্থাৎ ১৭৮০-এর দশকে কলকাতার আসল রূপই পাল্টে গেল। এসময় কলকাতাকে দেখলে মনে হতো, "ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও তালগোল পাকানো, বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো বাড়ি, কুঁড়েঘর, ছাউনি, অলি-গলি ও বাঁকানো রাস্তা, নর্দমা, ডোবা, পুকুর সবকিছু মিলে এমন এক দূষিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা মানবিক বোধশক্তি বা স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।"[২৯] ১৮২২ সালে কলকাতার লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষে। একই সময়ে কলকাতায় প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ লোক আশেপাশের অঞ্চল থেকে কাজ করতে আসতো। কলকাতার শহরতলীর বিস্তার কলকাতার মতোই চমকপ্রদ। ১৮৩৪ সালে চার্লস ট্রাভেলিয়ন লিখেন যে, "হুগলীর ডান ধারে কলকাতার কাছ থেকেই গ্রামের পর গ্রাম একটা মালার মতো প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ছিল।"[৩০]

উনিশ শতকের কলকাতার সমাজচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেন :

> বিলাস আর বড়াইপূর্ণ অমিতব্যয়ী জমিদার, সে যুগের মনস্তাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, দেশী কেরানি বা কুইলড্রাইভার, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে আর্মেনীয়, ইস্ট ইন্ডিয়ান আর পর্তুগীজ টুপিওয়ালাদের হটিয়ে দিয়ে সরকারি ও ব্যবসাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজ করছেন; সফল উকিলবাবু, যিনি মামলা-মোকদ্দমায় ভরা পরিবেশে, যেখানে কোন কোন মামলা বংশপরম্পরায় চলে আসছে, জাঁকালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন; ডাক্তার, যাঁরা বদ্যিদের (দেশীয় চিকিৎসক) হটিয়ে দিয়েছেন—এঁরাই ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি।[৩১]

কিন্তু এ সময় পর্যন্ত কলকাতায় কোন বাঙালি বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোগীকে দেখা যায়নি।

---

২৯. A. Mitra, 'Calcutta City' in the *Census of India*, 1951, Vol. VI, Part III, (Calcutta 1954), 8.

৩০. Marshall, *Bengal*, 160.

৩১. Sinha, *The Economic History of Bengal, 1793-1848*, Vol. 3, 132.

উনিশ শতকের শেষদিকে কলকাতার বিশালতা, তার নাগরিক জীবনের জটিলতা, বিপুল জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরনের জীবিকা, বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন একেবারে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছিল, তেমনি ভূসংস্থান ও পরিবেশকে উপেক্ষা করে শহরটির অপরিকল্পিত অস্বাভাবিক প্রসারও ছিল দিনের মত স্পষ্ট। এই অস্থির অবস্থা কবি রুডইয়ার্ড কিপলিংকে যোগায় এক ধরনের অনুপ্রেরণা, যেখান থেকে উৎসারিত হয় নিচের কবিতাটি :

Thus the midday halt more's
the pity of Charnock—
Grew a city.
As the fungus sprouts chaotic
from its bed
So it spread
Chance-directed, chance-erected,
laid and built
On the silt—
Palace, byre, hovel, poverty and
pride
Side by side,
And, above the packed and
pestilential town
Death looked down. [৩২]

মহানগরীর বাইরের মফস্বল শহরগুলো বা নতুন শিল্প ও বাণিজ্যশহরগুলোর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। বৃটিশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ১৪৪ বছর পরে সম্পন্ন ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয় : "বাংলার সাধারণ শহরগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নামেমাত্র শহর। মফস্বলের অনেক পৌরস্থান (যেগুলোকে সরকারিভাবে শহর বলে স্বীকৃতি

৩২. P. Chowdhury and A. Mukhopadhyay, *Calcutta . People and Empire— Gleanings from old Journals*, (Calcutta 1976), VI.

দেয়া হয়েছে) হয় অধিক বেড়ে উঠা গ্রাম, নয়তো এদের উপান্ত এলাকাগুলো একেবারেই গ্রামীণ।"[৩৩]

উনিশ শতকে কলকাতার বাইরে বাংলার নাগরিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, "মফস্বল শহরগুলো হচ্ছে বিশাল গ্রামীণ সমুদ্রের মধ্যে কতগুলো ক্ষুদ্র দ্বীপ"।[৩৪] ১৮৭২, ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় যে, বিশাল গ্রামীণ সমুদ্রের মধ্যে গড়ে উঠা এই ক্ষুদ্র দ্বীপাকৃতি শহরগুলো সংখ্যায় যেমন বৃদ্ধি পায় নি, তেমনি এগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কোন দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিও গড়ে উঠে নি। নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে এ বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়[৩৫] :

জনসংখ্যা অনুপাতে শহর	বিভিন্ন আদমশুমারিতে প্রাপ্ত সংখ্যা		
	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১
৫,০০০-১০,০০০	১৭৯	১৪৬	১২১
১০,০০০-১৫,০০০	৪২	৪৯	৩৮
১৫,০০-২০,০০০	৮	১৪	১৮
২০,০০০-৫০,০০০	২৩	২২	২৮
৫০,০০০-তদূর্ধ্ব	১১	১১	১০

যদিও এই মফস্বল শহরগুলোর সাথে বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত পুরনো বা নতুন শহরগুলোর, যেমন ঢাকা ও কলকাতার অথবা সদ্য গড়ে উঠা শিল্পনগর, যেমন হাওড়ার অনেক পার্থক্য ছিল, তবুও এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির শহরের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল না তাও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এই মফস্বল শহরগুলোর অধিকাংশেরই উদ্ভব হয়েছিল মূলত প্রধান প্রশাসনকেন্দ্র বা তাদের সহায়ক উপপ্রধানকেন্দ্র হিসেবে। স্থানগুলোকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচনের পিছনে ছিল মুখ্যত এদের নিজস্ব অবস্থানগত গুরুত্ব এবং সম্পূরক সুবিধা। কালক্রমে এই ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে ও নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় আর একই সাথে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। কিন্তু

---

৩৩. *Census of India, 1901, Bengal*, Part III, *Report*, 480-81

৩৪. M.S. Islam, 'Life in the Mufassal Towns of Nineteenth Century Bengal' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 225-26.

৩৫. *Census of India, 1901, Bengal, Report*, 138.

সর্বোপরি এই স্থানগুলো বাংলার আবহমানকালের ঐতিহ্যবাহী জীবনে বয়ে আনে এক নতুন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমে শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারের আগ্রহ বাড়ার ফলে এই শহরগুলো এক নতুন ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষিতেই এগুলোর গুরুত্ব ও বিস্তৃতি উভয়ই ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, যদিও এর গতি ছিল খুব শ্লথ। শুরুতে কাছারি বলে খ্যাত সরকারের প্রশাসনিক কার্যালয়গুলোই ছিল এই সমস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্র।[৩৬] মূলত সরকারি অফিসের ইউরোপীয় ও দেশীয় কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরাই ছিল এই শহরগুলোর আদি বাসিন্দা এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, বণিক, কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণীর আগমন শহরের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। তথাপি কোম্পানিশাসনের শেষ পর্যন্ত এই মফস্বল শহরগুলোর অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল সরকারি প্রয়োজনীয়তা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের উপর। আর যেহেতু এই প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত, তাই সত্যিকার অর্থে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই নগণ্য। 'সংক্ষেপে বলতে হয়, বৃটিশ শাসকদের জেলাপ্রশাসনের কাঠামোকে ঘিরে গড়ে উঠা বেশিরভাগ মফস্বল শহরই ছিল মূলত সেবামুখী।'[৩৭]

পরবর্তীকালে ১৮৫৮ সালে বৃটিশরাজ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ এবং জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের বিপুল বিস্তার, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুবিধা উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে, বিশেষকরে স্টিমার চলাচল এবং বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এর ফলে কেবল সেবামুখী শহরগুলো সেবা ও উৎপাদনমুখী উভয় বৈশিষ্ট্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠে। তা সত্ত্বেও এই নগরায়ণের ভিত্তি এতই সঙ্কীর্ণ উপাদানের উপর নির্ভরশীল ছিল যে দীর্ঘকাল ধরে এই শহরগুলো প্রধানত পরগাছারূপেই বেঁচে ছিল।

বৃটিশ আমলে নগরায়ণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মফস্বল শহরগুলোর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা। এমনকি এগুলো স্থাপনের সময় সরকার চিন্তাও করে নি যে

---

৩৬. Islam, 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 236.

৩৭. ঐ, 231.

এগুলোই একদিন স্থায়ী শহররূপে টিকে থাকবে। এই মফস্বল শহরগুলোর পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন :

> মফস্বল শহরগুলোর বিস্তার ও স্বরূপ কোন নির্দিষ্ট শহরপরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠে নি। এগুলো গড়ে উঠেছে মূলত স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জমির মালিকানা এবং সামাজিক গঠনপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং নগর তার আপন গতিতেই গড়ে উঠে; বিশেষকরে যেখানে ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল সেই জায়গাকে ঘিরেই গড়ে উঠে, এককথায় শহর গড়ে উঠে মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং প্রধান বাজারকে ঘিরে। কোম্পানিআমলের প্রায় পুরো সময়টাতেই কোর্ট-কাছারিগুলোকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ মফস্বল শহরের বিকাশ ঘটেছিল। এগুলোই ছিল শহরের কেন্দ্রীয় স্থান বা প্রাণকেন্দ্র। ১৮৫৯ সালের ঠাকবস্ত জরিপকারীরা এই মর্মে লিপিবদ্ধ করেন যে প্রশাসন বা কাছারিপাড়াই হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থল, আর ব্যবসা ও বাসস্থানের জায়গাগুলো মিশ্রিতভাবে গড়ে উঠেছে উপকণ্ঠ এলাকা হিসেবে। উনিশ শতকের শেষদিকে মফস্বল শহরগুলোর ভারকেন্দ্র কাছারিচত্বর থেকে বাণিজ্যিক এলাকায় সরে যায় এবং এই পরিবর্তন ঘটে মূলত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, যাতায়াতব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য ও অপ্রধান শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগমনের ফলে।[৩৮]

বিশ শতকের একেবারে গোড়ারদিকে এই সমস্ত মফস্বল শহরকে পরি-কল্পিতভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদিও এই শহরগুলোর অপরিকল্পিত বিকাশ পরবর্তী সময়ে পৌর এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার সৃষ্টি করে, যেগুলো সময়ের অগ্রগতিতে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তবুও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, বিশ শতকের প্রারম্ভে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এই শহরগুলোর অধিকাংশই নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "এই ছোট্ট শহরগুলোর সাথে তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খুব কমই মিল রয়েছে। এগুলোকে গ্রামাঞ্চলের আবাসভূমি থেকে ভিন্ন ধরনের বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হচ্ছে প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং অল্পবিস্তর সবগুলোই হচ্ছে ব্যবসাকেন্দ্র এবং এই শহরগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত"।[৩৯]

নিম্নের জনসংখ্যা বিষয়ক ছক থেকে এই শতাব্দীর শুরুতে বাংলার নগরকেন্দ্রগুলোর জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি চিত্র পাওয়া যায় :

---

৩৮. প্রাগুক্ত, 232.

৩৯. *Census of India, 1921, Bengal,* Vol. V, Part I, *Report,* para 77.

নগরায়ণের ক্রমসম্প্রসারণ

	১৯২১		১৯১১		১৯০১		১৮৯১		মোট জনসংখ্যার শতকরা হার			
	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লে.কসংখ্যা	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
বাংলার সর্বমোট জনসংখ্যা	-	৪৭৫৯২৪৬২	-	৪৬৩০৫১৭০	-	৪২৮৮১৩৫৯	-	৩৯৮০৫৫২৭	-	-	-	-
নগর এলাকা	১৩৫	৩২১১৩০৪	১২৪	২৯৬৮২৪৭	১২২	২৫৯৯১৫৮	১০৬	২২২৩৩৭৮	৬.৭	৬.৪	৬.১	৫.৬
১. ৫০০০০ বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার শহর	৩	১২২৪৬০২	৩	১১৮৩৬২৪	২	১০০৫৩৯০	২	৭৯৮৯১১	২.৬	২.৬	২.৩	২.০
২. ৫০০০০-১০০০০০ জনসংখ্যার শহর	৪	২৪১৬০৬	২	১০৪১৮১	১	৮৯৭৩৩	১	৮১৫৮৫	০.৫	০.২	০.২	০.২
৩. ২০০০০-৫০০০০ জনসংখ্যার শহর	৩৩	৮৮৬৭৭৪	২৮	৭৯৬৯৯৮	১৮	৫০৪৫৮৪	১৬	৪৬০৬২৬	১.৯	১.৭	১.২	১.২
৪. ১০০০০-২০০০০ জনসংখ্যার শহর	৩৭	৫১৭৬৮৬	৪০	৫৮০৮৯৩	৪৭	৬৮২১৬৬	৪১	৫৭৪৮৭৫	১.১	১.৩	১.৬	১.৪
৫. ৫০০০-১০০০০ জনসংখ্যার শহর	৪০	২৮৪৯৭৫	৩৪	২৫১১১৫	৩৭	২৭০৯২০	৩৪	২৬৫১৮৬	০.৬	০.৫	০.৬	০.৭
৬. ৫০০০ এর কম জনসংখ্যার শহর	১৮	৫৭৩৬১	১৭	৫১১৩৬	১৭	৪৬৩৬৫	১২	৪২১৯৫	০.১	০.১	০.১	০.১
পল্লী এলাকা		৪৪৩৮১১৫৮		৪৩৩৩৬৯২৩		৪০২৮২২০১		৩৭৫৮২১৪৯	৯৩.৩	৯৩.৬	৯৩.৯	৯৪.৪

উৎস : *Census of India*, 1921

১৯২০ সালের মধ্যেই বাংলার নগর ও শহরের সংখ্যা এবং তাদের লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে নগরের লোকসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.৭ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ ১০ ভাগের চেয়েও কম। জনসংখ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সুবিধাদির বিচারে ১৯২১ সালে বাংলার ১৩৫টি শহরের মধ্যে মাত্র দু'টিকে প্রকৃত অর্থে নগররূপে আখ্যায়িত করা যায়। এ দু'টি হলো কলকাতা ও ঢাকা। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে ১৩,২৭,৫৪৭ জন নাগরিক অধ্যুষিত কলকাতা সন্দেহাতীতভাবে বাংলার বৃহত্তম নগরকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। এই সময়ের মধ্যে এই শহরের পরিধি অনেক বিস্তারলাভ করে এবং এর শহরতলী কাশীপুর-চিৎপুর, মানিকটোলা, টালিগঞ্জ, সাউথ সাবার্ব, গার্ডেন রীচ ও হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইতিমধ্যে ঢাকাও পূর্ব বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে আবির্ভূত হয়। ঢাকা এমন একটি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, যেখানে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ফলে ঢাকার ক্রমবিকাশ ছিল সন্দেহাতীত। ১৯২১ সালে এর জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনায় ৭৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং এসময় ৩৭৬২ একর আয়তনের ভূখণ্ডে ১,১৯,৪৫০ জন লোক বসবাস করতো। এই বৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই প্রতিফলিত করে। এখানে বলা দরকার যে, পূর্ব বাংলায় ঢাকাই ছিল প্রধান শহর, কলকাতা নয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী থাকায় এর জনসংখ্যা আরো ২১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মাত্র সাত বছর প্রাদেশিক রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকার পর বঙ্গভঙ্গ রদ ও ১৯১২ সালে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারানো ঢাকার জন্য ছিল একটি বড় ধরনের বিপর্যয়।

এই বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাংলার সবচেয়ে উর্বর কৃষিএলাকায় অবস্থানের কারণে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ঢাকার উন্নতি ছিল অব্যাহত। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা দশ ভাগ এবং এই সংখ্যা ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার অন্যান্য মফস্বল শহরের লোকসংখ্যা এবং নগরকেন্দ্রের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ১৯২০-এর দশকে ভারতের নগরগুলোর মধ্যে ঢাকার স্থান ছিল আটাশতম।[৪০]

বিশের দশকে বাংলার অন্যান্য শহরগুলো চরিত্রগতভাবে ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এগুলোকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীকে বলা যায় 'নিদ্রালু মফস্বল শহর' (sleepy country town), যেগুলোর কোন সুসংবদ্ধ শিল্প-কারখানা ছিল না, কেবল

৪০. *Census of India, 1921, Bengal, Report*, para 78.

স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সামান্য গুরুত্ব ছিল। কেননা এই শহরগুলো আশেপাশের গ্রামের জনগণের মধ্যে যারা হাতের কাছে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন লবণ. কাপড়, কেরোসিন তেল পেতো না, তাদেরকে সেগুলো সরবরাহ করতো। এই শ্রেণীভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলত জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তর এবং পুরনো ঐতিহাসিক শহর, যেমন মুর্শিদাবাদ, পুরাতন মালদহ, নদীয়া ও অন্যান্য অগুরুত্বপূর্ণ শহর। অন্য শ্রেণীভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে ছিল হুগলী নদীর তীর ধরে গড়ে উঠা বিভিন্ন শিল্পনগরী, রেলপথনগরী এবং পাটক্রয়ের বৃহৎ কেন্দ্রশহরগুলো, যেমন কাশিপুর-চিৎপুর, মানিকটোলা, হাওড়া, তিতাগড়, নৈহাটি, কুমারহাটি, ঝালকাঠি, খড়গপুর, সৈয়দপুর, আসানসোল, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রামের মতো শহর, যেগুলো শিল্প ও বাণিজ্য, পাট কেনা-বেচা এবং রেলওয়ে জংশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।[৪১] ১৮৭১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই দু'ধরনের শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিচের ছক থেকে জানতে পারা যাবে :

জনসংখ্যা	জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার				
সাল	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-০১	১৮৮১-৯১	১৮৭২-৮১	
মফস্বল শহর	১৩৮৬০	১৩৫৮৭	১৩০৩৪	১৩০২৯	১২৭৯৮	১৩৫২৩
	+২.০	+৪.২	০	১.৮	-৫.৩	
শিল্প ও বাণিজ্য	৩০৮৬৪	২৮৮৮৮	২২১৯৯	২০০০৯	১৭২৩৩	১৮৭৪২
শহর	+৬.৮	+৩০.১	+১০.৯	+১৬.১	-৮.১	

সূত্র : *Census of India*. Vol. V. *Bengal Report*. para 82.

উপরের ছক থেকে বোঝা যায় যে, অর্ধশতাব্দী ধরেও এই মফস্বল শহরগুলোর জনসংখ্যার তেমন বৃদ্ধি বা বিস্তৃতি ঘটে নি এবং এগুলো এই সময়কার ইউরোপীয় শহরগুলোর চেয়ে ছিল অনেক ছোট এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্বও ছিল বিস্তর।[৪২] তবে প্রতিনিধিত্বশীল নব্য শিল্প ও বাণিজ্যশহরগুলোর আয়তন সাধারণ মফস্বল শহরগুলোর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর এগুলো ১৮৮১ সালের পর থেকে খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। তা সত্ত্বেও এই সমস্ত অপ্রধান, বিশেষত তথাকথিত 'নিদ্রালু' মফস্বল শহর ধারাবাহিকভাবে ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিল। উনিশ শতকের গোড়ারদিকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়েউঠা এই শহরগুলো শতাব্দীর মধ্যভাগেই

৪১. প্রাগুক্ত, para ৪0.

৪২. ঐ, para ৪2

ইউরোপীয় এবং এদেশীয় অভিজাতদের আগমনের ফলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্ররূপে আর এক ধাপ অগ্রগতি লাভ করে। শতাব্দীর শেষভাগে আইনজীবীদের উত্থান এই সমস্ত এলাকায় স্বাধীন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং একই সাথে এই আইনজীবীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে এই শহরগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমসম্প্রসারণের ফলে স্কুল, কলেজ, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাপাখানার ক্রমবৃদ্ধিও এই শহরগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। প্রশাসনিক বিবর্তন ও শিক্ষার উন্নতির ফলে বিরাজমান কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটলো তা জন্ম দিল এক নতুন মূল্যবোধের, যা পূর্বের কৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও এলো অনেক নতুন রীতি এবং ধারা, যা দেশের আপামর জনসাধারণের অনুসরণের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। এই সমস্ত মফস্বল শহর এবং মহানগরী থেকে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তারা খুব শীঘ্রই চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের জগতে আধুনিকতার পতাকা বহন করতে শুরু করে। এই শহর ও নগরকেন্দ্রগুলো তাই বাংলার নবজাগরণের প্রাণবন্ত কেন্দ্র হয়ে উঠলো। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশে এক নতুন নাগরিক সভ্যতারও সূচনা করে। বাংলার এই নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন নগর ও শহর যে অবদান রেখেছিল তা লক্ষণীয়।

বৃটিশ শাসনের প্রায় পুরো সময় জুড়েই কলকাতা বাংলার নব্য নাগরিক সংস্কৃতিতে তার আধিপত্য বজায় বাখে আর নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বর্ণবৈষম্যে পীড়িত হিন্দু সমাজের সংস্কার করার সক্রিয় প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারার জন্ম, এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনও কলকাতাতেই প্রথম আরম্ভ হয়। আর এই সমস্ত আন্দোলনের ঢেউ ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকেই স্পর্শ করে। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় এই কলকাতা থেকেই। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একক শক্তি, যা বাংলার সমাজজীবনের স্বরূপ পরিবর্তন করে দেয়, সেই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রও ছিল এই কলকাতা।

যদিও কলকাতার নেতৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত, তবুও অন্যান্য নগরকেন্দ্রগুলোও বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা 'পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উৎস' হিসেবে তার অবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ হয়, এমনকি তার হারানো মর্যাদার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি কেন্দ্র এবং নতুন কৃষ্টির উৎস হিসেবে যার প্রকাশ ঘটে ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভা আন্দোলনের ক্রমবৃদ্ধিতে।[৪৩] একইভাবে অন্যান্য 'ছোট ছোট শহর ও নগরগুলো যেমন একাধারে ছিল

---

৪৩. Ranu Basu, "A note on Urbanism in Nineteenth Century India The Urban Areas in Bengal, 1850-1872", *Bengal Past and Present*, Part I, Serial No. 188, (Calcutta Januray—June 1980), Vol. XCIX, 14.

কলকাতা থেকে নতুন নতুন দিকনির্দেশনা ও চিন্তার গ্রাহক, তেমনি অন্যদিকে তাদের আশেপাশের এলাকায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে নব্যশক্তির কেন্দ্রও'[৪৪] ছিল প্রধান নগরকেন্দ্রগুলো. যেমন ঢাকা, মেদিনীপুর ও বর্ধমান ছিল ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই সমস্ত শহর তাদের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর জীবন ও সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

অভিজাত মুসলমানদের আবাস মুর্শিদাবাদও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। 'এমনকি ছোট ছোট শহরগুলোও, যেমন যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর এদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতো এবং গ্রামাঞ্চলের সাথে বড় বড় কেন্দ্রগুলোর সংযোগ স্থাপন করতো।'[৪৫]

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময়ের শহর ও নগরের অধিবাসীদের সবাইকে সম্পূর্ণভাবে শহুরে বলা যাবে না এ ইঙ্গিত আমরা আগেই দিয়েছি। কেননা এদের সবাই যে অকৃষিজীবীর পেশায় নিয়োজিত ছিল তা নয়, এদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকাজ ও গোশালার ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করতো। এমনকি খোদ কলকাতাতেও বহু সংখ্যক কর্মজীবী পুরুষ কৃষিকাজ এবং পশুপালন করতো।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিকাংশ অধিবাসীই জীবিকানির্বাহ করতো চিরাচরিত শহুরে কাজকর্ম করেই, যেমন চাকুরি, ব্যবসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কলকারখানা ও বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে কাজ। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিল্পকর্ম এসময়ে মূলত ঐতিহ্যগত ও বিশেষ নৈপুণ্যপূর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সমস্ত শহুরে জীবনে আবার এমন কতকগুলো উপাদান বিরাজমান ছিল, যা সাধারণভাবে 'প্রাক-শিল্প' যুগের নগরায়ণের স্বাক্ষর বহন করে। "যেমন বাস্তুসংস্থানবিন্যাসে (ecological organisation) পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন শ্রেণীর বা ভিন্ন পেশাদারদের অবস্থান এবং অধিবাসীদের গাদাগাদি করে থাকা; ক্ষুদ্র একটি বাছাই করা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হাতে সমাজনিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ; বাছাই করা শ্রেণী বা এলিটদের সাথে সাধারণ অধিবাসীদের সংযোগহীনতা এবং কেবল বাছাই করা শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাদান সীমাবদ্ধকরণ। প্রাক-শিল্প যুগের এই সমস্ত মৌলিক বিষয় শহরে বিদ্যমান থাকায় শহুরে এবং গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিকট-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ অব্যাহত থাকে। . . .তবে সাধারণভাবে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, বাংলার শহুরে

৪৪. ঐ, 14.

৪৫. প্রাগুক্ত, 15.

এলাকাগুলো 'আধুনিক' জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে এবং সমাজপরিবর্তনের ধারাকে সহায়তা করে, এমনকি অপর সভ্যতা থেকে প্রথাদি গ্রহণপ্রণালীরও বিকাশ ঘটায়।"[৪৬]

যদিও বৃটিশ আমলে নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল শ্লথ, তবুও নগরকেন্দ্রগুলোর পৌর জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কার্যব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছিল। এটা ছিল ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার তথা ভারতীয় নগরজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জনগণের অংশগ্রহণনীতি, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে বিবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রূপ লাভ করে। গত দুই শতকে বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিবর্তন আলোচনার প্রসঙ্গ যদিও এটা নয়, তবুও বলা প্রয়োজন, প্রাথমিক পর্যায়ে নগর ও শহর উন্নয়ন কমিটি এবং পরবর্তীকালে পৌরসভা ও কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশস্ত রাস্তা ও সরকারি ভবনাদি নির্মাণ, পানিসরবরাহব্যবস্থা, রাস্তার বাতি, আবর্জনা দূরীকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা স্থাপন এবং স্বাস্থ্যপরিচর্যার সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনের ফলে নগর ও শহরগুলোতে আধুনিক জীবনযাত্রার উদ্ভব হয়।[৪৭]

এসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সব জায়গায় এক সাথে আসে নি। যদিও কলকাতায় এগুলো বেশ আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু মফস্বল শহরগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে এসবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পৌর সুযোগ-সুবিধার অভাব শুধু যে নগর-কেন্দ্রগুলোকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর করেই রেখেছিল তাই নয়, বরং এর অনুপস্থিতিতে কিছু কাল পর্যন্ত আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে এগুলোকে আলাদা করা যায় নি। এমনকি ১৮৮০-এর দশকেও অধিকাংশ মফস্বল শহরই ছিল 'নোংরা, রোগ-ব্যাধিতে পরিপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পৌর সুযোগ-সুবিধা বিবর্জিত।'[৪৮] যাই হোক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও স্যানিটারি পরিদর্শকদের সমালোচনা ও অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে অধিকাংশ শহর ও নগরই বিভিন্ন পৌর সুবিধা পেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেখানকার আবাসিক অবস্থারও উন্নতি হয়। কিন্তু এই উন্নতি প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে

৪৬. ঐ, 15-16.

৪৭. For a history of the development of these institutions and civic facilities in, for example, Calcutta and Dhaka দেখুন, S W Goode, *Municipal Calcutta Its Institutions and their Origin and Growth*, (Edinburgh 1916), Sharif Uddin Ahmed, *Dacca—A Study in Urban History and Development*

৪৮. Islam, 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 249

পারে নি মূলত আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে।[৪৯] একথা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, শহুরে জীবনের মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালিরা শহরে বাস করার জন্য তেমন আকর্ষণ বোধ করতো না। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "তারা শহরে থাকাকে বেশ অপছন্দ করতো এবং এই অপছন্দের ব্যাপারটিকে এরা যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। উকিল, কেরানি, স্কুলশিক্ষক, এমনকি দোকানদার পর্যন্ত যাদের কাজই শহরে, এদের প্রত্যেকেরই গ্রামে হয় নিজের না হয় পারিবারিক বাড়ি রয়েছে। সেখানে তাদের পরিবার শহরের চেয়ে খুব অল্পব্যয়েই বসবাস করতে পারে। ফলে দু'জায়গায় দু'টি পৃথক গৃহস্থালি রাখার প্রচলন বৃদ্ধিই পাচ্ছে।"[৫০] এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্য ধীরে ধীরে আসে।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলো প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন নাগরিকদের সমাজজীবনে নিয়ে আসে এক অভিনব উপাদানবৈশিষ্ট্য। শুরুতে এই নতুন পৌরসভাগুলোকে কেন্দ্র করেই শহরের নানা শ্রেণী ও দলের মধ্যে সমাজসেবার এক ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে। পৌরসভাগুলো নগরের জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার এক যুগান্তকারী সেতুবন্ধ হয়ে উঠলো এবং শহুরে সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে দাঁড়ালো। অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে নগরজীবনের মান উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পরিবেশ অর্জনের সম্ভাবনা দেখলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুব শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের রঙ্গমঞ্চে (arena) পরিণত হলো এবং এ লড়াই গোটা জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে ফেললো। ১৮৮০-এর দশকে যখন বড়লাট লর্ড রিপন স্থানীয় সরকারকাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে এসে এগুলোকে স্থানীয় লোকদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার অঙ্গনে পরিণত করলেন, তখন এগুলো হয়ে উঠলো রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের উপযুক্ত স্থান আর তাকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শুরু হলো পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক আর দলাদলি।[৫১] তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, এই পৌরসভাগুলোই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের লালনক্ষেত্ররূপে কাজ করেছিল। আর একারণেই বাংলার নগর-শহরগুলোর এক নতুন ভাবমূর্তি তৈরি হলো।

যদিও ইংরেজ আমলে নগরায়ণের গতি ছিল খুবই মন্থর, তবু বাংলার শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা গ্রামের মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্রুত লয়ে বেড়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা

---

৪৯. *Bengal Municipal Administration Report, 1921-22*, para 23, 8-9.

৫০. *Census of India, 1921, Bengal, Report*, para 86.

৫১. দেখুন, R. Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism—Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, (New Delhi 1979).

যেতে পারে, ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত এক দশকের মধ্যে শহরে জনসংখ্যা বেড়েছিল ১৬ শতাংশ আর তুলনামূলকভাবে একই সময়ে গ্রামে মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল মাত্র ৬.৭ শতাংশ।[৫২]

শহর ও নগরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় দিক হলো এসব কেন্দ্রে হিন্দু জনসংখ্যার আধিক্য। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলার শহরে অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশই ছিল হিন্দু, যদিও তারা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, সমগ্র বাংলায় প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন মুসলমান শহরে বাস করতো, আর হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১২ জন।[৫৩] এই বছর বাংলার শহরে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৪,৩৩০ জন। এর মধ্যে হিন্দু ছিল ২৫,৪১,০৬২ জন আর মুসলমান ১০,২৯,৩৭৪ জন।[৫৪] বাংলার শহরে জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের আধিক্য ১৯২১ সালের আদমশুমারির নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায় :

শহুরে জনসংখ্যার প্রতি হাজারে সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুপাত

অঞ্চল	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী
সমগ্র বাংলা	৬৯৪	২৭৪	৩২
পশ্চিম বাংলা	৮০৮	১৭৪	১৮
মধ্য বাংলা	৬৯৬	২৫৬	৪৮
উত্তর বাংলা	৫৭৯	৩৬৭	৩৪
পূর্ব বাংলা ঢাকা বিভাগ	৫৬২	৪২৭	১১
পূর্ব বাংলা চট্টগ্রাম বিভাগ	৫০২	৪৫৯	৩৯

সূত্র : *Census of India, 1921*, Vol. V, Part I, para 89.

১৯২১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয়, সেসময় কলকাতা ও এর শহরতলীতে প্রতি এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৭০৯ জন, মুসলমানদের সংখ্যা ২৪৫ জন এবং খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। উনিশ শতকে

৫২. *Census of India, 1931, Bengal*, Vo. I, 76-77.

৫৩. ঐ, 82.

৫৪. ঐ, Vol. II, 16, Imperial Table V.

কলকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগতই কমতে থাকে। ১৯২১ সালে এমনকি ঢাকাতেও হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, যা ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের একটি শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং যা ছিল মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলে অবস্থিত—প্রতি হাজারে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪১৩ জন। বিশ বছর আগে এই অনুপাত ছিল প্রতি হাজারে হিন্দু জনসংখ্যা ৫৩৫ জন আর মুসলমান জনসংখ্যা ৪৫৭ জন। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "বাংলায় এমন শহর খুব কমই আছে যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। এ ধরনের কিছু শহর হচ্ছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, মালদহের নবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান।"[৫৫]

নিচের সারণিতে ১৯২১ সালে কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য শহরএলাকায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অবস্থান এবং একই সাথে সারা বাংলায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক চিত্র দেখানো হয়েছে :

বাংলায় এবং বাংলার বিভিন্ন শহরে প্রতি হাজার জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুপাত

অঞ্চল	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী
কলকাতা শহর	৭০৮	২৩০	৪৩	১৯
সাধারণ শিল্প বা বাণিজ্যিক শহর	৭১১	২৭২	১৪	৩
সাধারণ মফস্বল শহর	৬৯১	২৯১	৭	৬
সারা বাংলা	৪৩৭	৫৩৫	২	২৬

জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক এই চিত্র[৫৬] প্রদেশটির সামাজিক বিবর্তনই নির্দেশ করে। এ অঞ্চলের হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই বৃটিশ শাসকবর্গের খুব নিকট-সংস্পর্শে আসে এবং নতুন শাসন প্রবর্তনের ফলপ্রসূত নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করে। মুসলমানরা, যারা ছিল প্রদেশের অপর প্রধান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, তারা ইংরেজদের নৈকট্য থেকে অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। নবোদ্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি কলকাতায় হিন্দুরা আঠারো শতকের প্রথমদিক থেকেই বিপুল সংখ্যায় এসে বসতি শুরু করে এবং এই

৫৫. *Census of India, 1921, Bengal,* para 89.

৫৬. প্রাগুক্ত, para 89.

প্রক্রিয়া বৃটিশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে আরো জোরদার হয়। আঠারো শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত কলকাতা হয়ে উঠলো ভাগ্যান্বেষী এবং আমোদ-প্রমোদকামী হিন্দুদের বাসভূমি। এই অভিবাসন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বিহারের দরিদ্র হিন্দু কুলি থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার ভূমিনির্ভর নব্য অভিজাতদের অনেকেই এসে কলকাতায় বাসা বাঁধে। নতুন শাসকদের সুবাদে উদ্ভূত শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সুবিধাগুলোও পেশাদার হিন্দু সম্প্রদায় খুব তাড়াতাড়িই গ্রহণ করে; আর এরাই সরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর নিচু ও মধ্যস্তরের আসনগুলো দখল করে। এই প্রক্রিয়া কলকাতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মফস্বল শহরগুলোতেও ঘটে। এমনকি, সেই সমস্ত নতুন শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর, যেগুলো সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠে, সেখানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে ১৯৩০-এর দশক থেকে হিন্দুদের মধ্যে শহুরে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "হিন্দুরা এখন খুব দ্রুতগতিতেই শহুরে জীবনকে গ্রহণ করছে এবং সেই সমস্ত পেশা গ্রহণ করছে যেগুলো বিশেষকরে শহরেই পাওয়া সম্ভব।" জনসংখ্যা বিষয়ক এই বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব, যারা সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি এবং স্বাধীন পেশাও অবলম্বন করে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের কারণ মূলত বৃটিশদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। কর্নওয়ালিসের আইনব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে এদের অগ্রগতির সূচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে হিন্দুদের মধ্যে 'বিশেষ আইনপেশাদারি শ্রেণীর' বিকাশের কথা। বস্তুত এই পেশায় হিন্দুরাই পুরো বৃটিশ যুগে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। এই হিন্দু আইনজীবীরা অচিরেই তাদের নিজেদের প্রভাববিস্তারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং মহানগরী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র মফস্বল শহরগুলোতেও নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হন। তাদের এই পেশাগত কর্তৃত্বের বদৌলতে তারা "নতুন বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।"[৫৭] শহুরে হিন্দুরা আইন ছাড়াও শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ও ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন।

এই শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি প্রথম থেকেই দেশের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাদের এই দৃষ্টি ও কৌতূহল অচিরেই নানাবিধ সংস্কারআন্দোলনের জন্ম দেয়।[৫৮] তাদের এই আন্দোলন ও দেশের আধুনিকীকরণপ্রয়াস একটি নতুন সংস্কৃতিরও জন্ম দেয়, যার ফলে শহরগুলোর সামাজিক প্রভাব ও গুরুত্ব

৫৭. Islam. 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 240.

৫৮. P. Sinha, *Nineteenth Century Bengal—Aspects of Social History*, (Calcutta 1965).

উভয়ই বৃদ্ধি পায়। সন্দেহাতীতভাবে এই বিষয়ে নেতৃত্বদান করে কলকাতা শহর। তবে চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের এই নতুন ঢেউ ধীরে ধীরে সব শহরেই এসে পৌঁছায় প্রধানত মহানগরী থেকে প্রচার ও প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে।[৫৯]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নগরভিত্তিক এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনীতিতেও খুব আগেভাগেই তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অবশেষে তাদের আবির্ভাব এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। একইভাবে বিলম্বে হলেও উনিশ শতকের শেষদিকে এক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এদেরও উত্থান ঘটে শহর-নগরকে ভিত্তি করেই। আর এদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এবং স্বাধীন পেশাদারি ব্যবসায়ে, যেমন আইন ও চিকিৎসায় তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রেখেছিল।[৬০] তাই এপর্যন্ত রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের উপস্থিতি প্রধানত নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করা এবং তা আরো বৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত ছিল। ঠিক এই সময়ে রাজনীতিসচেতন অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের, বিশেষকরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক কৌশলের ধারা পরিবর্তন করলো এবং তারা রাজনৈতিক দাবাখেলার গুটি চালতে শুরু করলো মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য। বৃহৎ পরিসরে অথবা খুব দ্রুতগতিতে দেশের শিল্পায়ন এবং সার্থক নগরায়ণের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথা সমগ্র দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই ধরনের উন্নয়নের অভাবে সীমিত কর্মক্ষেত্র ও সুযোগকে কেন্দ্র করেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সামাজিক সংগঠনের অস্থিতিস্থাপকতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা এই প্রতিযোগিতাকে যে অচিরেই সংঘাতের মুখে ঠেলে দেবে তা ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এই প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ রাজনীতিই শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হলো। শহুরে মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনীতিতে যোগদান তাই হয়ে উঠলো অপরিহার্য। পরিশেষে রাজনৈতিক খেলা যেভাবে পরিচালিত হয় তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম দেয়। স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতি—যাও ছিল শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা প্রভাবিত—যথাসময়ে সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং এরই পরিণতি ঘটলো সাম্প্রদায়িকতার

৫৯. দেখুন শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (কলকাতা ১৯০৭, ১৯৭৭ সংস্করণ), ২৩১-৩২।

৬০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন, Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal, 1927-36,* (Dhaka, 1987), 45-46, *et passim* আরো দেখুন, Sharif Uddin Ahmed, *Dacca,* 83-84.

ভিত্তিতে দেশবিভাগের মাধ্যমে। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র।

পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) আবির্ভাব ঘটলো। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রদেশ অভিজাত, উচ্চশ্রেণীর এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত দ্বারা শাসিত হতে লাগলো। বিদেশী শাসনের অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে একটি নতুন মুসলমান রাষ্ট্র গড়ে তোলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা অর্থনৈতিক অগ্রসরতা এবং সামাজিক পরিবর্তন অর্জনের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করলো। তাই পাকিস্তানের স্বল্পস্থায়ী প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের ক্ষেত্রেও এক প্রচণ্ড গতিবেগ লক্ষ্য করা গেল। দেশবিভাগের সাথে সাথে ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের অভিবাসনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন শহরে রাতারাতি জনসংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেলো, বিশেষভাবে ঢাকা শহরে।[৬১] একই সাথে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার উদ্ভব, চট্টগ্রাম শহরকে দেশের বৃহত্তম বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাঠামোগত শক্তিবৃদ্ধি ও নানা সুবিধাদি প্রদান, সরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি উদ্যমকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করা, মফস্বল শহরগুলোতে শিল্পএলাকা গড়ে তোলা এবং অনেক নতুন নতুন প্রশাসনিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সবকিছু মিলে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের প্রক্রিয়া জোরদার করে তোলে।

অবশ্য প্রথমদিকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তার অল্পই অর্জিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো সঠিক নীতিমালা উদ্ভাবন এবং তা কার্যে পরিণত করা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানে সব গুরুত্বপূর্ণ নীতি, সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে শুরু হলো, কেননা ইতিমধ্যেই তারা সমগ্র দেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ অচিরেই এমন সব নীতি অবলম্বন করতে শুরু করলেন যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শুধু যে উপেক্ষাই প্রদর্শন করা হলো তাই নয়, এমনকি যে যৎসামান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এখানে শুরু হলো সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হলো। তারা পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ এবং এই প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার পদক্ষেপগুলোকে উৎসাহ প্রদান করতে শুরু করলেন। পাকিস্তানের সার্বিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও অন্যায়ভাবে

---

৬১. দেখুন, Papiya Ghosh, "The 1946 Riot and the Exodus of Bihari Muslims to Dhaka" in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 275-83

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করলো এবং এর সবই পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপন করা হলো, যার ফলে সেখানে নগরায়ণকে আরো উৎসাহিত এবং ত্বরান্বিত করা হলো। শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ খুবই কম হওয়ার দরুন এখানে শিল্পের উন্নয়ন শ্লথ হয়ে গেল এবং পরিণামে এই প্রদেশটি ক্রমাগত কৃষিনির্ভর হয়ে পড়লো এবং এখানকার অর্থনীতি কেবল প্রাণধারণের অর্থনীতিতে পরিণত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্পখাতে উন্নয়ন তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়লো। আর এগুলো সবই পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণপ্রক্রিয়াকে মন্থর করে দিল।

তা সত্ত্বেও শহরে জনসংখ্যার অনুপাত কিন্তু পরিমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ কালপর্বে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রতিবছর গড়ে ৩.৮ শতাংশ, যখন সারা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ, যদিও এই বৃদ্ধি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে শহরে জনসংখ্যা ছিল প্রদেশের সমগ্র জনসংখ্যার ১৭.৮ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে একই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে জনসংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ৪.৪ শতাংশ।[৬২] নিচের সারণি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি চিত্র পাওয়া যায় :

১৯৫১-৬১ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে নগরজনসংখ্যা ও সামগ্রিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমানুপাতিক হার

আদমশুমারিকাল	নগর জনগোষ্ঠীর শতকরা হার	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	
		নগর	সারাদেশ
১৯৫১	৪.৩৪	৩.০	০.৫
১৯৬১	৫.১৯	৩.৮	১.৯
১৯৭৪	৮.৭৮	৬.৯	২.৬
১৯৮১	১৫.১৮	৭.৬	২.৯

সূত্র : *Statistical Yearbook of Bangladesh, 1980, 54.*

পাকিস্তান আমলে নগরায়ণপ্রক্রিয়া নতুন নতুন শহরও সৃষ্টি করেছিল। '১৯৫১ সালে মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৬২ আর তা ১৯৬১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৭-এ ...।'[৬৩]

৬২. Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 624

৬৩. ঐ, 624.

এই বৃদ্ধি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রসারতা উভয় কারণেই ঘটে। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, ক্ষুদ্র শহরগুলো বৃটিশ আমলের ধারা অনুযায়ী অবনতির দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু মাঝারি আর বড় শহরগুলোর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।[৬৪] এই ধারা গড়ে উঠার কারণ ছিল দেশে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মতো পরিকল্পনার অভাব এবং দেশে বিদ্যমান সাধারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এই পরিস্থিতির জন্য সরকারি নীতিও খানিকটা দায়ী, কেননা সরকার কেবল কিছু সংখ্যক শহর-নগরের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনের বিশেষ কিছু দিকের উন্নতি সাধনের জন্যই একান্তভাবে মনোযোগ দেয়, আর অবহেলা করে একটি সুপরিকল্পিত ও ভারসাম্যময় সার্বিক অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধিকে। তাই লক্ষ্য করা গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের এক বিশেষ রূপ। 'যদিও শহরে জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে ... তবে এর বিভাজন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কেবল বড় বড় শহরে, যেমন ঢাকা ও চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।' শহর-নগরকেন্দ্রগুলোর সামাজিক গঠন কিন্তু বৃটিশ আমল থেকে ভিন্ন রূপ নেয়। প্রায় সব শহরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর এই জনসংখ্যার মধ্যে দেখা দেয় বৈচিত্র্য। শহরগুলোতে পুরনো বিশিষ্ট হিন্দুদের, এমনকি সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর হিন্দুদেরও অবস্থান তেমন লক্ষ্য করা যায় না, কেননা এদের বেশিরভাগই এইসব স্থান ছেড়ে ভারতে চলে যায়। তাদের শূন্যস্থান ধীরে ধীরে এবং কোন কোন স্থানে খুব দ্রুতগতিতেই অবাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তুরা এবং গ্রাম থেকে আসা মুসলমান বাঙালিরা পূরণ করে ফেলে। হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে শহরগুলোতে আসতে থাকে, বিশেষকরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়, যেখানে কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে ঢাকার এই পরিবর্তিত অবস্থার এক প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানী তার *ঢাকা* গ্রন্থে। তিনি মন্তব্য করেন, "মানুষের সে কি এক বিচিত্র সমাবেশ; বাঙালি, বিহারী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান সবাই ক্লান্তপদবিক্ষেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে তাদের বিভিন্ন রঙের কাপড় পরে আর নানা ভাষায় কথা বলতে বলতে।"[৬৫]

যখন ঢাকায় নতুন নতুন কার্যালয়ে কাজ এবং নতুন নতুন ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়, তখন বাঙালি মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভাবে উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বগুলো উত্তর ভারত থেকে আগত বয়োজ্যেষ্ঠ সরকারি আমলাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। শুধু বড় বড় ব্যবসাই নয়, এমনকি বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যবস্থাপনাতেও দিল্লী, গুজরাট, কাথিয়াওয়াড় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বণিকশ্রেণীর মুসলমানেরা এগিয়ে আসে, কেননা

৬৪. ঐ, 624

৬৫. Ahmed Hasan Dani *Dacca - A Record of Its Changing Fortunes*, (Dacca 1962), 155.

মুসলমান বাঙালিরা এসব ক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগ দেখাতে পারে নি।' অধ্যাপক দানী অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালিরা, বিশেষকরে বাঙালি যুবকশ্রেণী অতি সত্বরই উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রাদেশিক রাজধানী নানা রকমের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে আর সেগুলো তারা তড়িঘড়ি গ্রহণ করতে থাকে। তারা এগিয়ে এসেছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে', সেই সমস্ত সরকারি-বেসরকারি পদ পূরণ করতে, যেগুলো তখন শূন্য ছিল আর 'তখন পূরণ করা হচ্ছিল' এবং সার্বিকভাবে দেশের ব্যবসা, শিল্প ও সরকার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে। হিন্দু মাড়োয়ারি শ্রেণী, যারা এ পর্যন্ত সারা পূর্ব বাংলায় ব্যবসা ও বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তারা এখন প্রথমবারের মতো এই নতুন শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলো। ১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন শহরে স্থাপিত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবগুলোই ছিল অবাঙালি মুসলমানদের হাতে। আগা খানী, বোহরা, দিল্লীওয়ালা এবং চিনোতিরা (পাঞ্জাবের চিনোতি থেকে আগত বণিকগণ) শিল্প ও উচ্চপর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অতি দ্রুত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে, আর স্থানীয় মুসলমানদের হাতে থেকে যায় ছোটখাটো দোকান আর ক্ষুদ্র ব্যবসা। তাহলেও বাঙালি মুসলমান যুবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে বহু বাঙালি যুবক উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা বহুসংখ্যক উচ্চ সরকারি চাকুরিতে আসীন হয় এবং অন্যান্য পেশাতেও ক্রমে উন্নতিলাভ করতে থাকে। তবু একথা বলতেই হয়, বাঙালি মুসলমানরা শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারে নি। ঢাকার তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে দানী বলেন, "এটি বিভাগপূর্ব ঢাকার সামাজিক জীবনের ঠিক উল্টো একটি অবস্থা। সেই যুগের অভিজাতবর্গের এখন আর তেমন কেউ নেই। এখনকার প্রধান ব্যবসায়ী শ্রেণী হচ্ছে একদল নতুন আগন্তুক, যাদের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করার মতো সম্পদ ও উদ্ভাবনী শক্তি দুইই রয়েছে, আর এ দু'টি দিয়েই তারা ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করবে, তবে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তিপূর্ণ অবস্থা এবং দৃঢ় প্রশাসন। তরুণ মুসলমান বাঙালিরা হচ্ছে একটি উঠতি প্রজন্ম, যারা ১৯৬২ সালের মধ্যেই সরকারি অফিস-আদালতে নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। একথা অবশ্য বলতেই হয় যে, ঢাকায় অধিক হারে মানুষের আগমন এখনও থেমে যায় নি। এছাড়া দেশে এখনও বহু সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান হওয়া দরকার।"[৬৬]

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দেশের দু'টি অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক এবং স্থানীয় বাঙালি ও ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে আগত নতুন অভিবাসনকারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। সমান সুযোগ ও জাতীয় সম্পদের ভাগবাটোয়ারা

৬৬. প্রাগুক্ত, 156.

সংক্রান্ত প্রশ্নেই এই সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি একটি নব্য পেশাদারি ও চাকুরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয়, যে শ্রেণীটি দেশের উভয় অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে এবং স্পষ্টভাবে দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে অবাঙালি রাজনীতিবিদ ও আমলাদের প্রাধান্যকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে। এই উভয় ব্যাপারই তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক ঐক্যবোধ তার ভিত্তি হারিয়ে ফেললো, যখন বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুভূতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ উপেক্ষা করলো। ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জোরালো ঘোষণা 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' সুপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আঘাত হানে, যা অচিরেই একটি দুর্বার গণআন্দোলনের রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদী শক্তি আরো দৃঢ় ও গতিবান হয়ে উঠলো যখন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

জাতীয়তাবাদের উত্তাল ঝড়ের ইঙ্গিত প্রদান করলো নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের উদ্ভব ঘটেছিল দেশের শহর-নগরগুলোতে এবং যারা রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সোচ্চার আর সক্রিয় হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য হাজার হাজার বাঙালি যুবক গ্রামাঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন শহর ও নগরে আসে। তারাও ক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। মুক্তির দাবি তাই আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

এই নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্রসমাজ পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্যমূলক উন্নয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার চিত্র সারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে। এরা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে একটি ঔপনিবেশিক ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরাই ১৯৫২ সালে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শুরু করে এবং পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যে একটি পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের এই আন্দোলন ক্রমে আরো তীব্রতা লাভ করে বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপ নেয় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ফলে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে, মুক্ত করেছে এ ভূখণ্ডকে অবহেলিত শোষিত অবস্থা থেকে। দেশে নগরায়ণের ক্ষেত্রে আবার এসেছে জীবনের জোয়ার, কেননা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল বিস্তার ঘটেছে নানা উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের এবং বৃহত্তর জনজীবনে এসেছে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য আর এরই ছোঁয়া লেগেছে শহরগুলোর শ্রীবৃদ্ধিতে। কিন্তু একটি বড় রকমের সমস্যা বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলোর উন্নয়নে বার বার বাধা সৃষ্টি

করছে। তা হচ্ছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ গ্রামে তাদের কোন কর্মসংস্থান না থাকার কারণে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে শহরের দিকে। গ্রাম থেকে শহরে অতিরিক্ত মানুষের আগমনে এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলোতে নানা কঠিন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার সাথে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তাই অতিরিক্ত মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে শহর-নগরগুলোতে বেকার লোকের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব, অপ্রতুল গৃহসংস্থান, সীমিত পানিসরবরাহ, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎব্যবস্থা, অপ্রতুল যাতায়াত ও যানবাহনের সমস্যা শহর-নগরগুলোকে সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করছে, যেখানে লক্ষ্য করা যায় কেবল বস্তিবৃদ্ধি আর ভবঘুরেদের বসতির বিস্তার। এমনিভাবেই কি শহর-নগরগুলো ক্ষমতা, উৎপাদন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার আগেই জনসংখ্যার চাপে দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যে ভেসে যাবে? এই প্রশ্নই এখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষের মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন

মঈনুদ্দীন আহমেদ খান*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ও সমাজচিন্তা মূলত ব্যাপ্ত ছিল সনাতন বিশ্বাস ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান-ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে। আভিজাত্যভিত্তিক শাসনকে বহাল রাখার জন্য মুগল সরকার অপরিবর্তনের ধারাকে সমুন্নত রেখেছে। কিন্তু অপরিবর্তনের ঐতিহ্য দারুণভাবে প্রভাবিত হলো বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর অত্যল্পকালের মধ্যে পতনশীল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অবক্ষয়। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের উপর আভিজাত্যের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় একই সময়ে একটি নব্য সংস্কারমনা শ্রেণী গড়ে উঠে। পাশ্চাত্যপুষ্ট এই নব্য শ্রেণীর একটি লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন। মুসলিম সমাজেও একই সময়ে কতিপয় সংস্কারমনা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এই পরিবর্তনধারার প্রথম পর্ব সূচিত হয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে হাজি শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক। মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় প্রায় একই সময়ে। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে প্রধানত ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে।

বাংলায় ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পুরুষ হাজি শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ধর্মচিন্তায় আলোকপ্রাপ্ত হন প্রধানত তিনজন ইসলামী চিন্তাবিদের প্রভাবে। তাঁরা হলেন আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)। কিন্তু শরীয়তউল্লাহ একটি বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারে ব্রতী হন। ঐ প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে একদিকে ইংরেজদের বিজয়, অন্যদিকে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বাংলার নবাব মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা বিধ্বস্ত হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। আর তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে। ১৭৬৫ সালে মুগল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীউয়ানিলাভ বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ছয়-সাত দশকে বাংলার মুসলিম সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা অভাবনীয়।

১৮৪২ সালে ডেমপিয়র নামক একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা সেযুগের কোম্পানিশাসনকে অতিস্বৈরতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন এবং বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে একটি কদর্য বিপ্লব তথা 'লোথসাম রেভুলিউশন' নামে আখ্যায়িত করেন।[১] প্রখ্যাত প্রশাসক ও লেখক উইলিয়াম হান্টার বলেন : "কোম্পানি আমলের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল, আর পঁচাত্তর বছরব্যাপী ইংরেজশাসনের পর তাদের মধ্যে সচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।"[২] সমসাময়িক অন্য একজন ডাক্তার ও প্রশাসক জেমস ওয়াইজ শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে বিস্মিত হন। তিনি বলেন : "ইংরেজ আমলে পঁচাত্তর বছর অতিবাহিত হতে না হতেই এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষপালের মতো হয়ে পড়েছিল।"[৩]

প্রখ্যাত ধর্মসংস্কারক হাজি শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘকাল আরব দেশে অবস্থান করে ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা দেখে হতবাক হন এবং বলেন যে, বাংলায় ইসলামের বৃক্ষকে তিনি ঈমানের পানির অভাবে মৃতপ্রায় দেখতে পান। জৌনপুরের প্রখ্যাত আলেম মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরী ১৮৩৬ সালে বাংলায় আগমন করেন। এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখে তিনি বলেন যে, ইংরেজ আমলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মতো এত করুণ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করে নি।[৪] তাই হাজি শরীয়তউল্লাহ ও মওলানা জৌনপুরী বাংলায় ইসলামপ্রচার অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন।

---

১. *Calcutta Review*, 1944. দেখুন, 'Police Report'.

২. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, (Calcutta 1936).

৩. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, (London 1884), 21.

৪. মৌলবী কেরামত আলি, *কওল-আল-ছাবিত* (উর্দু), ৩, দেখুন, Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement*, (Karachi 1965), 150.

ইসলামে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এগুলির যেকোন এক স্তরের অবক্ষয় অন্যগুলিকেও জরাগ্রস্ত করে তোলে। যতোদিন বাংলায় ইসলামী সমাজব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততোদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী ধর্মসম্প্রদায়সমূহের অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ তেমন নজরে পড়ে নি। কিন্তু পলাশীউত্তর যুগে যখন বাংলায় ইসলামের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়লো, তখন তারা এ দুরবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে নিজেদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলো এবং এ সমাজে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করলো ।

ইসলামী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আরো লক্ষণীয় যে, আঠারো শতক থেকে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে মুসলিম দুনিয়ায় কমপক্ষে তিন ধরনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম (১) রাষ্ট্র ও সমাজের অবক্ষয় রোধের জন্য আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। অতঃপর (২) উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসলীলা থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার তাগিদে মুসলিম আধুনিকতাবাদ বা মুসলিম আধুনিক সংস্কার আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে (৩) বিশ শতকের শেষ নাগাদ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজে গভীর আবেগতাড়িত 'পুনর্জাগরণের' যে ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে তা এর প্রবক্তাদের মুখে ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইসলামী বিপ্লববাদ' নামে উচ্চারিত হচ্ছে।

বিগত ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, প্রথমত, দিল্লীর মুগল সম্রাটদের আমলেই সুলতানি বাংলার পূর্ববর্তী তুর্কী ও পাঠান আমির-ওমরাহদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয় আর সমান্তরালভাবে এদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে দিল্লী থেকে প্রেরিত মুগল মনসবদারদের হাতে চলে যায়। এতে বাঙালি মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে মুর্শিদকুলী খানের যথাক্রমে সুবা বাংলার দীউয়ানি, সুবাদারি ও নবাবিতে প্রতিষ্ঠালাভ এদেশে একটি নতুন প্রশাসনিক ধারা ও রাজনৈতিক তৎপরতার জন্ম দেয়। এই নতুন প্রশাসনিক ধারা নিম্নস্তরে জেলা ও মহকুমা (তথা সরকার ও পরগনা) প্রশাসনে হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাধান্য এবং উচ্চস্তরের প্রশাসনে মুর্শিদকুলী খানের সদ্যাগত ইরানী বন্ধু-বান্ধব ও নিকট-আত্মীয়দের (যারা ক্রমান্বয়ে মুর্শিদকুলী খানের সুপারিশক্রমে দিল্লীর বাদশা কর্তৃক বিভিন্ন স্তরের মনসবদারি লাভ করে) কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়।[৫]

ধর্মান্তরিত মুসলিম হিসেবে মুর্শিদকুলী ধর্মীয় দিক থেকে গোঁড়া ছিলেন এবং হিন্দু জমিদারদের প্রতি কঠোর ছিলেন, বিশেষত জমির রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব হলে তাদের কঠিন

---

৫. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan And His Times*, (Dhaka 1963), 15.

শাস্তি দিতেন। শিয়া মুসলমান হিসেবে তিনি সুন্নি ওলামার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। তাই নবাবি আমলে সুন্নিদের প্রতিপত্তি সরকারি মহলে হ্রাস পায়। তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাঁরা সুবা বাংলার নতুন শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হন, তারা সবাই ছিলেন বহিরাগত শিয়া। অন্যদিকে বাংলার মুসলিম অধিবাসীরা তুর্কী ও পাঠানদের প্রভাবে সবাই ছিল সুন্নি। কাজেই বহিরাগত শিয়াদের প্রাধান্যবিশিষ্ট প্রশাসন এবং সুন্নি জনসমাজের ধর্মীয় রীতিনীতি তথা ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণার বৈসাদৃশ্যের কারণে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব, অসামঞ্জস্য ও পরস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি হয়। শিয়া প্রশাসকগণ সুন্নি মুসলমানদের প্রতি রাজনৈতিক ভয় পোষণ করায় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের এক প্রকার জঘন্য হঠকারী প্রশাসনিক নীতি সংযুক্ত হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে যতোদূর সম্ভব তারা প্রশাসনের নিম্নস্তরে হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে অভ্যস্ত হয় এবং উপরের স্তরে একদিকে হিন্দুদেরকে জমিদারি প্রদান করে কঠোর নিয়ন্ত্রণভিত্তিক ভূমিব্যবস্থা কায়েম করে, অন্যদিকে বহিরাগত শিয়া ও অবাঙালি, বিশেষত মাড়োয়ারি বণিকগোষ্ঠীর হিন্দুদের সাহায্যে সরকার পরিচালনা করে। তারা ঐতিহ্যবাহী প্রতিপত্তিশালী সুন্নি মুসলমানদের পাশ কাটিয়ে যায়। ফলে, বাঙালি মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা হারিয়ে ফেলে। অতএব, পলাশীপূর্ব এবং পলাশীউত্তর যুগে বাংলার অবক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অক্ষম ছিল। তাই মুসলিম উচ্চশিক্ষিত স্তর থেকে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এ শূন্যতা পূরণ করে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে ১৮১৮ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্য থেকে ফরায়জী আন্দোলন শুরু করেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ এবং ফরায়জী আন্দোলনের সূচনা

হাজি শরীয়তউল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজের অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল বিদেশভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে জনসাধারণের দুঃখমোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪০ সাল।

হাজি শরীয়তউল্লাহর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হন ও চাচা আযিমুদ্দিনের সংসারে লালিতপালিত হন। তিনি বাল্যকালে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তেরো বছর বয়সে কোন অজ্ঞাত কারণে গৃহত্যাগ করে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি ধর্মপ্রাণ মওলানা বশরত আলির সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করেন। এই স্নেহপ্রবণ মওলানার কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং আরবি-ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায় গমন করেন। তিনি ফুরফুরায় কিছুকাল আরবি-ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের পর মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত

তাঁর অন্য এক চাচা আশিক মুহাম্মদের কাছে যান। আশিক মুহাম্মদ মুর্শিদাবাদ কোর্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বালক শরীয়তউল্লাহ চাচা-চাচীর কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হন এবং চাচার তত্ত্বাবধানে আরবি-ফার্সি শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। কিছুকাল পর তাঁর চাচা আশিক মুহাম্মদ জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে সপরিবারে ফরিদপুরের দিকে রওনা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে নৌকাডুবির ফলে তাঁর চাচা-চাচী উভয়েই মারা যান। তিনি নিজে প্রাণে রক্ষা পান। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যুবক শরীয়তউল্লাহ বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল কলকাতার মওলানা বশরত আলির কাছে ফিরে যান। মওলানা বশরত আলি একজন স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। বাংলায় তখন বিদেশী ও বিজাতীয় অর্থগৃধ্নু ইংরেজ বণিকদের শোষণমূলক ও হঠকারী প্রশাসনে জনগণের জীবনযাত্রা ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর সঙ্কটে পতিত হওয়ায় তিনি এদেশকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বসবাসের অযোগ্য বিবেচনা করেন এবং অন্যত্র হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। যুবক শরীয়তউল্লাহ সানন্দে তাঁর সফরসঙ্গী হন এবং ১৭৯৯ সালে উভয়ে একত্রে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন শরীয়তউল্লাহর বয়স ছিল বিশ বছর।

পবিত্র মক্কা নগরীতে শরীয়তউল্লাহ জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং আরবি সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফিকাহশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য তিনি তাহের ছোম্বল নামে একজন খ্যাতনামা আলেমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহের ছোম্বল হানাফী মযহাবের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। হানাফী ফিকাহ্তে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি 'ক্ষুদে আবু হানিফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শরীয়তউল্লাহ তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করে ফিকাহ্ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অধিকন্তু তিনি তাহের ছোম্বলের কাছে কাদেরিয়া তরিকায় বায়েত হন এবং সুফিতত্ত্বের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর দীর্ঘ আঠারো বছর মক্কায় অবস্থান করার পর আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[৬]

বর্ণিত আছে যে, ফরিদপুরে উপস্থিত হয়ে দিনের শেষভাগে যখন হাজি শরীয়তউল্লাহ পিতৃগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চাচা আযিমুদ্দিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে একজন হাজির আগমনের কথা প্রচারিত হলে হাজিদর্শনের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। সবাই তাঁকে অভিবাদন করে ও তাঁর দোয়াপ্রার্থী হয়। মাগরিবের সময় উপস্থিত হলে পরিস্থিতি বুঝে তিনি নিজেই আজান দেন। কিন্তু আজানশেষে তাঁর চতুর্দিকে কাউকেও উপস্থিত না পেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে তিনি নিজে একাকী মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি যেদিকেই যান মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও আর্থিক দুরবস্থা দেখতে পান। জনসমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও স্পর্শকাতরতার বিপুল বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে ব্যথিত করে।

৬. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *Titu Mir and His Followers*, (Dhaka 1980), 7.

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে প্রশাসনের নামে কোম্পানির ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার শিখণ্ডী হিসেবে নিয়োজিত গোমস্তাদের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার গণমানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা হাজি শরীয়তউল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির দাপটে এবং বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের লেজুড় এদেশীয় অনুসারী, ইংরেজ নীলকর, নব প্রতিষ্ঠিত ব্যারনজাতীয় জমিদার এবং জোতদার শ্রেণীর অত্যাচারের যাঁতাকলে আইনের নামে ও প্রশাসনিক শক্তিবলে নিষ্পেষিত অসহায়, দারিদ্র্যপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত বাঙালি কৃষকদের অবস্থা হাজি শরীয়তউল্লাহ ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ দেশের সমাজকে এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জাগতিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আদেশ-উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধের কোন সুফল তিনি পেলেন না। তাই তিনি তাঁর ওস্তাদের নির্দেশলাভের জন্য পুনরায় পবিত্র মক্কা নগরীতে ফিরে যান। এরপর ওস্তাদ তাহের ছোম্বলের আশিস শিরোধার্য করে ১৮২০ সাল অর্থাৎ ১২২৭ বাংলা সনে তিনি দ্বিতীয়বার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'ফরায়জী আন্দোলন' আরম্ভ করেন। একারণে তাঁর প্রাথমিক শিষ্যদের 'সাতাশ সনি ফরায়জী' বলা হয়।[৭]

ফরায়জী আন্দোলনের স্বরূপ

ফরায়জী আন্দোলন প্রকারান্তরে আরবের ওহাবী আন্দোলনের[৮] কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমধর্মী একটি শাখা ছিল। আরবের এই আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের নানা দেশে অনুরূপ অনেকগুলি সংস্কার আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। সেগুলির মধ্যে উত্তর আফ্রিকার সনুসী আন্দোলন, মিশর ও সিরিয়ার সলফী আন্দোলন, সুদান থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ফুলানী আন্দোলন, বাংলার ফরায়জী আন্দোলন, উত্তর ভারতের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া ও আহলে হাদীস আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার পাদুরী ও মুহাম্মদীয়া আন্দোলন অন্যতম।[৯]

একজন আধুনিক আরব ঐতিহাসিক আহমদ মোস্তফা আবু হাকীমা বলেন :

> সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের একত্ববাদের ভিত্তি ছিল অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় আল্লাহর একত্বের ধারণা। শেখ মুহাম্মদের এ ধর্মনীতিতে কোন নতুনত্ব ছিল না অথবা তিনি এধরনের কিছু করতেও চান নি। একজন সংস্কারক হিসেবে শেখ মুহাম্মদ তাঁর সহচরদের

৭. প্রাগুক্ত।
৮. ঐ।
৯. ঐ, 16-17.

> পাপপঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যখন তারা আল-কুরআনের প্রদর্শিত পথ থেকে সরে গিয়ে মুসলিমদের ধর্মনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআনের নির্দেশের প্রতি ফিরিয়ে আনতে এবং রসুলুল্লাহ ও তাঁর পুণ্যবান সহচরদের নির্দেশ কার্যকরী করার দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। [১০]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের এই ছিল মর্মবাণী।

অতি সরল কথায়, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ব্যক্তিজীবনে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলনীতি প্রতিষ্ঠা করা, যার মূলকথা হচ্ছে :

ক আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই ;

খ. আল-কুরআনের নির্দেশ ও রসুলের সুন্নত বা জীবনপন্থাই একমাত্র অনুসরণীয় ;

গ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে না ;

ঘ. ধর্মানুষ্ঠানে যেকোন প্রকার বেদাত বা নতুন আচার-আচরণ সংযোজন করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে এবং মূল অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে এবং পরস্পর সহযোগিতা ও বিরামহীন জেহাদের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবো।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। হাম্বলী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর অনুসারী পরবর্তী ইমামগণ সবাই উপরোক্ত নীতিসমূহের কঠোর অনুসারী ছিলেন, যেমন ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম জাউযিয়া, যাঁরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের পূর্বসূরি ছিলেন।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে ফরায়জী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরীয়তউল্লাহ হানাফী মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং প্রথম যুগের হানাফী ইমামদের তথা ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ শায়বানীর মতামতের যথার্থতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি হানাফী ফিকাহ্‌র উপর সমধিক জোর দেন। আরবের ওহাবীদের বক্তব্য ছিল : "রসুলুল্লাহকে যে কাজ যেভাবে করতে দেখা গেছে, হাদীসের প্রমাণ শিরোধার্য করে সেভাবে সে কাজ সম্পন্ন করো—এটাই ইসলাম।" অন্যদিকে ফরায়জীদের কথা হলো : "রসুলুল্লাহর কর্মধারার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে হানাফী ইমামগণ যেভাবে ইসলামের সরল সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন, তদনুযায়ী আমল করো।" তদুপরি ওহাবীরা সুফিবাদকে ইসলামের আদিযুগবহির্ভূত ঐতিহ্যরূপে বিবেচনা করে থাকে এবং একে নব আবিষ্কৃত ধর্মনীতি তথা বেদাতরূপে গণ্য করে তা বর্জন করার উপদেশ প্রদান করে। পক্ষান্তরে,

১০. দেখুন, Ahmad Mustafa Abu Hakima, *History of Eastern Arabia, 1750-1800 : The Rise and Development of Bahrain and Kuwait*, (Beirut 1965), 125.

ফরায়জীরা সুফিবাদের সমর্থক এবং আল্লাহর সান্নিধ্যলাভে সুফিবাদের কার্যকারিতায় বিশ্বাসী ও কাদেরীয়া তরিকার অনুসারী।

তা সত্ত্বেও ওহাবীদের মতোই ফরায়জীরা মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের বিশুদ্ধ ধারণার প্রতিফলন কামনা করে, রসুলের সুন্নতের অনুসরণে মানবজীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ঘোষণা করে, ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন ন্যায়পরায়ণতা ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প ব্যক্ত করে। তারা বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনব্যবস্থার কর্মময় অঙ্গনে মানুষের জীবনযাপনপদ্ধতি থেকে শেরেক, বেদাত, সংস্কার ও দুর্নীতি দূর করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে সুসংহত, আনন্দদায়ক ও সুখময় করে তোলার আদর্শে নিবেদিত ছিল। এককথায়, ফরায়জী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে 'প্রথম কাজ প্রথমে করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামের মৌলিক নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

হাজি শরীয়তউল্লাহ্ ধর্মীয় অবশ্যকরণীয় তথা ফরজ কাজগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উপর জোর দেন যাতে অতিরিক্ত কর্তব্যের তথা নফল কাজের কারণে অবশ্যকরণীয় কর্মকাণ্ড ব্যাহত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাতেহা, ওয়াজ ও মিলাদ, যেগুলি নফল বা অতিরিক্ত কাজের পর্যায়ে পড়ে, সেগুলি যেন সালাত, যাকাত, সওম ইত্যাদি ফরজ কাজগুলির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে না পড়ে। তাঁর উপদেশ হলো, প্রথমে ফরজ পরে নফল। অনুরূপভাবে তিনি অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক সামাজিক আচার-ব্যবহার বা ধর্মীয় রীতিনীতির নামে ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে জঘন্য পাপ বলে গণ্য করেন। তিনি সবাইকে ফরজ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এ আন্দোলন 'ফরায়জী' আন্দোলন নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

স্মর্তব্য যে, স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলায় স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচারকাজ পরিচালিত হতো। সে যুগের পুঁথিসাহিত্যিকরা এ রীতির প্রচলন করেন। কিন্তু মুগল আমলের শেষদিকে, বিশেষত সুবাদার ইব্রাহিম খানের সময় থেকে এদেশে ফার্সি ভাষার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়। ফার্সির সাথে উর্দু ভাষার প্রচলনও বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে আরবি-ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত আলেমগণ বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করার রীতির বহুল প্রচলন করেন।[১১]

হাজি শরীয়তউল্লাহ এ রীতি ভঙ্গ করে বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সরল বাংলা ভাষায় তওবা, কলেমা, অঙ্গীকার ইত্যাদি পাঠের বয়েত গ্রহণ করেন। পীর-মুরিদির ক্ষেত্রে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য তিনি 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ বর্জন

---

১১. আবদুল হালী ইসলামাবাদী, *ছাইফাতুল আমল ওয়া মিরাআতুল আহওয়াল* (ফার্সি), (কলকাতা ১৮৮৭), ৪০।

করেন। যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাদেরকে তিনি গ্রাম-গঞ্জের প্রচলিত ভাষায় শাগরেদ উপাধি প্রদান করেন এবং নিজেকে ওস্তাদ বলে পরিচয় দেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাদেরীয়া তরিকায় বয়েত করান এবং জিকির অনুশীলনের তালিম দেন। তিনি মানুষের স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেন।

তিনি মানুষের চিন্তা-ভাবনায় ধর্মকে সহজবোধ্য করার প্রয়াস পান এবং দরিদ্রদের লক্ষ্য করে বলেন, তাদের ধর্মীয় ফরজ মাত্র তিনটি—কলেমা, নামাজ ও রোজা। তবে তিনি একথাও বলেন যে, বিত্তশালীদের বেলায় যাকাত আদায় করা ও হজ্ব সমাপন বা কুরবানি করাও ফরজ। তিনি প্রচার করেন যে, এই পাঁচটি ফরজ ইসলামের মৌলভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয়।[১২] তিনি বলেন যে ফরজ শুধু ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়; ধর্মীয় কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করা যেমন ফরজ, তেমনি পার্থিব কর্তব্যগুলিও অবশ্য পালনীয়।

তৎকালে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় সদ্যপ্রসূত সন্তানের নাড়ি কাটা একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়। ধাত্রীর কাজ ও নাড়ি কাটার কাজ 'দাই' বা 'ধাই' নামে পরিচিত পেশাজীবী নারীদের একচেটিয়া ছিল। তখন 'নাড়ি কাটা' একটি হীন কাজরূপে গণ্য হতো। সময় মতো দাই পাওয়া না গেলে অপবাদের ভয়ে কেউ একাজ করতো না। এমনকি সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নাড়ি না কাটা-অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হতো। হাজি শরীয়তউল্লাহ নাড়ি কাটা সন্তানের পিতার কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। তাই বিরুদ্ধবাদী মুসলমানরা ফরায়জীদেরকে 'নাড়ি-কাটা' বলে বিদ্রূপ করতো।[১৩]

হাজি শরীয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের অন্তর্গত আচার 'চাট্টি' তথা প্রসূতির গৃহে মাসাধিককাল ধরে অবিরত বাতি জ্বালিয়ে রাখার প্রথা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাট্টি বা পুট্টি ও চিল্লার প্রথা, মহররম উপলক্ষে মূর্তিপূজার সমতুল্য নানা প্রকার কুপ্রথা এবং মৃতের সৎকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ফাতেহা ও ওরসের নানা প্রকার রেওয়াজ, মিলাদ উদযাপন ইত্যাদি শেরেক ও বেদাত বলে গণ্য করেন এবং এসব আচার-অনুষ্ঠান ফরায়জী সমাজ থেকে রহিত করেন।[১৪]

তদুপরি হিন্দু জমিদারদের অধীনে মুসলিম প্রজারা দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতিপূজা উপলক্ষে চাঁদা প্রদান করতে বাধ্য ছিল। হাজি শরীয়তউল্লাহ হিন্দুদের পূজায় চাঁদা দেওয়া, পূজা-উৎসবে যোগদান করা ও পূজার প্রসাদ খাওয়া শেরেকের সামিল বলে গণ্য করেন এবং এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। খৎনা, কানফোড়ানি ও বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ও সাধারণভাবে উদযাপন করার জন্য তিনি সবাইকে

---

১২. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement,* 222.

১৩. ঐ, 250.

১৪. ঐ, 243.

উপদেশ দেন এবং এগুলি উপলক্ষে জাঁকজমক, শরিয়তবিরোধী নাচ-গান, বাদ্যবাদন ও অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এগুলি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[১৫]

উপরোক্ত কারণে হিন্দু জমিদার ও জোতদার শ্রেণী তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়, বিশেষত তাঁর ডাকে মুসলিম প্রজা ও চাষীদের ক্রমবর্ধমান একতা তাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে। অন্যদিকে বেদাত ও শেরেক থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য হাজি শরীয়তুল্লাহর আপোসহীন সংগ্রাম কিছু সংখ্যক প্রাচীনপন্থী তথা রক্ষণশীল মুসলমানকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তখন বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় কাজের সাথে ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, মহররমের তাজিয়া মিছিল, জারী গানের আসর ইত্যাদি একাকার হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বর্জনের ফরায়জী প্রবণতা রক্ষণশীলদেরকে কোথাও কোথাও মারমুখী করে তোলে এবং তারা হিন্দু জমিদারদের কাছে ফরায়জীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে।

আসলে শত শত বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে হিন্দু-বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু-বৌদ্ধ মেয়েদের ধর্মান্তরিতকরণ এবং প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে বাঙালি মুসলিম সমাজে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ন্যায় কিছুটা ভেদনীতির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলি লক্ষ্য করা যেতো। তেলি বা কলু, পাল্কিবাহক বা কাহার, জোলা বা তাঁতী, কসাই, জেলে ইত্যাদি পেশাজীবীদের অন্যরা ঘৃণার চোখে দেখতো এবং নীচ জাত মনে করতো। হাজি শরীয়তউল্লাহ এসব ইসলামবিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বারবাব জোর দেন এবং সর্বপ্রকার ভেদনীতি দূর করতে প্রয়াসী হন। অধিকন্তু তিনি শ্রমলব্ধ উপার্জন তথা হালাল রুজিকে মুসলমানদের জীবনধারার মৌলভিত্তি বলে প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, 'হালাল রুজি ইবাদতের পূর্বশর্ত, যারা জুলুম-অত্যাচার করে জীবিকানির্বাহ করে, আল্লাহ তাদের ইবাদত কবুল করেন না।' তিনি বিভিন্ন পেশা ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত লোকদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাদেরকে 'কারিগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি এমনকি জোলা, কলু, কামার প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্মীদেরকেও কারিগর উপাধি ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ এভাবে সমাজ থেকে ভেদনীতি, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শ্রমের মর্যাদাভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে ফরায়জীদের মধ্যে সুদৃঢ় একতা গড়ে তোলেন। তিনি প্রচার করেন যে, মানুষ মূলত একই আদমের সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই; যেকোন ভাইয়ের বিপদে-আপদে সাহায্য করা অন্য ভাইদের কর্তব্য। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকেই জমির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করেন। তিনি কোরানের এই বাণী উদ্ধৃত

---

১৫. প্রাগুক্ত।

করেন : "প্রচেষ্টার (অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও শ্রমের) ফলাফল ছাড়া মানুষের কিছুই প্রাপ্য নাই" এবং দাবি করেন যে, কোরানের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জমির আবাদকারী অর্থাৎ চাষীই জমির প্রকৃত মালিক এবং জমির ফসল চাষীরই প্রাপ্য এবং তাতে জমিদারের কোন অধিকার নেই। তিনি জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকরের অতিরিক্ত অবৈধ আবওয়াব প্রদান করতে চাষীদেরকে নিষেধ করেন। জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের বলে ভূমিকরের অতিরিক্ত নানা প্রকার আবওয়াব প্রজাদের উপর আরোপ করেছিল। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর পত্তনিদারেরও উদ্ভব হয়েছিল। জমিদারগণ পত্তনিদারদের জমির মধ্যস্বত্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে কলকাতায় বসবাস করতো, আবার পত্তনিদাররা দরপত্তনিদারদের এ ক্ষমতা প্রদান করতো। এক ইংরেজ সমালোচকের মতে, এভাবে মালিকানাস্বত্ব এক স্তর থেকে নীচে অন্য স্তরে যেতে যেতে স্তরবিন্যাসের পঞ্চম স্তর অর্থাৎ সর্বনিম্নের স্তর চাষীর উপর গিয়ে ঠেকতো। এমনিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যাঁতাকল তৈরি হয়েছিল বাঙালি প্রজা-চাষীদের শোষণের জন্য। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাজি শরীয়তউল্লাহর ব্যাপক প্রচারণা ও সক্রিয় সংগ্রাম এমনকি হিন্দু প্রজা ও চাষীদেরকেও ফরায়জীদের দলভুক্ত করেছিল।

ফরায়জী মতবাদ সকল মুসলমান গ্রহণ করে নি। এ মতবাদের বিরোধী মুসলমানদের সহযোগিতায় ক্ষুব্ধ জমিদারগণ অনেক সময় ফরায়জীদের উপর নির্যাতন চালায়। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার রামনগর নামক গ্রামে ফরায়জীদের সাথে প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের এক বিবাদ বাধে এবং তা শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার রূপ নেয়। প্রাচীনপন্থীরা হিন্দু জমিদারদের কাছে ফরায়জীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। জমিদারগণ তৎক্ষণাৎ সে সুযোগ গ্রহণ করে হাজি শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মন্দির আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করে এবং সরকারের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে রামনগরের পার্শ্ববর্তী তাদের প্রধান প্রচারকেন্দ্র নয়াবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে।

এ ঘটনার পর হাজি শরীয়তউল্লাহ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি নয়াবাড়ি থেকে তাঁর প্রচারকেন্দ্র মাদারীপুরের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন, যেখানে তাঁর বংশীয় লোকরা তখনও বসবাস করছিলেন। সেখান থেকে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ফরায়জী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এর পরে তাঁর জীবদ্দশায় ফরায়জীদেরকে আর কোন প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হতে দেখা যায় নি।

বাহাদুরপুর থেকে তিনি নৌকাযোগে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও কুমিল্লার নদীবন্দরগুলির আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে অনবরত যাতায়াত করে মুসলিম জনসাধারণকে ফরায়জী আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশায় এসব

এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ফরায়জী আন্দোলনের সপক্ষে বিপুল সাড়া জাগে এবং বহুসংখ্যক মুসলমান সক্রিয়ভাবে ফরায়জী আন্দোলনে যোগদান করে।

ইংরেজ সরকার বা যেকোন অমুসলিম সরকারের অধীনে মুসলমানদের ঈদ ও জুম্মার নামাজ পড়া অত্যাবশ্যকীয় নয় বলে শরীয়তউল্লাহ মনে করেন। তাঁর মতে, এই নামাজ আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি শর্তের প্রধান দু'টি শর্ত ইসলামী শাসন এবং মুসলিম শাসকের অথবা তাঁর প্রতিনিধির শাসন কোথাও বিদ্যমান নেই। অতএব তিনি জনগণকে জুম্মার বদলে জোহরের নামাজ আদায় করার উপদেশ দেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করে দেশকে মুক্ত না করা পর্যন্ত এদেশের মুসলমানরা শরীয়ত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনযাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। আবার অন্যদিকে রসুলুল্লাহর মদীনানীতি অনুসরণ করে সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি বাংলার মুসলিম সমাজে পুরনো পঞ্চায়েতি সমাজব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান।

১৮৪০ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহম্মদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তখন দুদু মিয়া সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন সম্ভবত তিনি ওহাবীদের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁদের কাছ থেকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের ভাবধারা এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অদম্য প্রেরণা লাভ করেন।

দুদু মিয়া ফরায়জী নেতৃত্ব গ্রহণ করেই পিতার মধ্যম পন্থা পরিহার করেন। তখন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, যার মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বলে নিরীহ জনগণের উপর দেশীয় জমিদার ও নীলকরদের যথেচ্ছ নিপীড়ন চোখ বুজে সহ্য করতে তিনি রাজি ছিলেন না। সব কিছু চিন্তা করে তিনি দৃঢ়তার সাথে এদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমত তিনি ফরায়জীদের 'হকের লড়াই' তথা ন্যায়ের সংগ্রামের জন্য তাঁর নেতৃত্বে গ্রাম-গঞ্জের সর্বস্তরের জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস পান। দ্বিতীয়ত তিনি পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ফরায়জী সমাজব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। তিনি গ্রাম-গঞ্জের ফরায়জীদের প্রাথমিকভাবে ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকায় 'ফরায়জী গাঁও' প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন এবং প্রতি গ্রামে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন করে 'গাঁওখলিফা' নিযুক্ত করেন। থানা ও সার্কেল পর্যায়ে তিনি 'গির্দ' (অর্থাৎ সার্কেল) এলাকা গঠন করেন এবং গাঁওখলিফাদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাতে একজন করে 'গির্দখলিফা' নিযুক্ত করেন। সর্বোপরি গির্দখলিফাদের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ও উচ্চ পর্যায়ে তিনি কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় খলিফা নিযুক্ত করেন, যাঁরা বাহাদুরপুরে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনমতো নানা দিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরিত হতেন।

গাঁওখলিফা গ্রাম পর্যায়ে ফরায়জীদের মধ্যে সর্বপ্রকার ঝগড়া-বিবাদ, নালিশ ও আবেদন নেতৃস্থানীয় লোকজনের পরামর্শে আদেশ, উপদেশ এবং প্রয়োজনবোধে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতেন। গাঁওখলিফা কোন সমস্যা সমাধান করতে অপারগ হলে অথবা উচ্চ পর্যায়ের সমস্যা দেখা দিলে তা আঞ্চলিক খলিফার কাছে পাঠাতেন এবং আঞ্চলিক খলিফা তাঁর অধস্তন গাঁওখলিফাদের পরামর্শে বা সহায়তায় সালিশের মাধ্যমে তা সমাধান করে দিতেন। আরো জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য একজন উর্ধ্বতন খলিফার কাছে প্রেরিত হতো। তিনি প্রয়োজনমতো কেন্দ্রীয় খলিফা ও গাঁওখলিফাদের সহায়তা ও পরামর্শে ঐ সমস্যা সমাধান করতেন অথবা তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বাহাদুরপুরে আহ্বান করা হতো এবং উর্ধ্বতন খলিফাদের পরামর্শে স্বয়ং দুদু মিয়া তার নিষ্পত্তি করে দিতেন।

এভাবে দুদু মিয়া ফরায়জী খিলাফতব্যবস্থার পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে একতাবদ্ধ করার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজসংগঠন পঞ্চায়েতব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সুসংহত খিলাফতব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমিক পদবিন্যস্ত খলিফাদের নেতৃত্বে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতহীনভাবে সম্পূর্ণরূপে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান নির্বিশেষ সকল স্তরের জনগণের ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। কোর্ট-কর্মচারীদের দুর্নীতি, মিথ্যা সাক্ষী, ঘুষ ইত্যাদির মোকাবেলায় তাঁর সালিশী ব্যবস্থা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকা থেকে কোর্ট-কাছারিতে মোকদ্দমা দায়ের করা এক রকম বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি খিলাফত ও পঞ্চায়েতব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে চালু করেন যে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্র নয়া মিয়ার আমলে একজন মহকুমা প্রশাসক নবীন সেন এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ফরায়জী খিলাফত ও পঞ্চায়েতব্যবস্থা 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র' ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল এবং নয়া মিয়ার সাথে তাঁর সহযোগিতার চুক্তি তাঁর সফল প্রশাসনের চাবিকাঠি ছিল।

দ্বিতীয়ত, অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের লাঠিয়ালবাহিনীর মোকাবেলায় তিনি পাল্টা একটি স্বেচ্ছাসেবক ফরায়জী লাঠিয়ালবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বেশ কয়েকটি দাঙ্গা এবং যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে এমনভাবে দমন করেন যে, ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকায় চাষীদের উপর জমিদার শ্রেণীর নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্রাম-গঞ্জে শান্তি বিরাজ করে।

তৃতীয়ত, তিনি একটি ফরায়জী ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করেন এবং এতে একটি সাধারণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক ফরায়জী ভাইকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা অন্য ভাইদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কোন ফরায়জী বা সাধারণ চাষী যেকোন ধরনের বিপদে পড়লে ভ্রাতৃতহবিল থেকে তাকে সাহায্য প্রদান করা হতো। এমনকি কোর্ট-কাছারিতে

জমিদার-জোতদারদের দায়েরকৃত নানাবিধ মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ হিসেবে মামলা পরিচালনা করার জন্যও এ তহবিল থেকে তারা সাহায্য লাভ করতো। একটি লোকসঙ্গীতের ভাষায় :

দুদু মিয়া তাম দিয়া রাজ্য ভালা করে,
ফরায়জীর হাতে লাঠি ফাল পারিয়া ফিরে,
ওস্তাদ দুদু মিয়া।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে বৃটিশ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দি করে কলকাতার আলিপুর জেলহাজতে আবদ্ধ করে রাখে। ১৮৬২ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকা শহরের বংশাল সড়কে বসবাস শুরু করেন এবং একই সালে পরলোকগমন করেন।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নয়া মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়জী আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু নয়া মিয়ার উত্তরসূরি সয়ীদউদ্দিন ওহাবীবিরোধী দমননীতির কোপানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন এবং খান বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। তাঁর পুত্র বাদশা মিয়ার সময় বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আবির্ভূত হলে গ্রামীণ গণআন্দোলন হিসেবে ফরায়জী আন্দোলন ক্রমশ সীমিত ও স্তিমিত হয়ে আসে।

তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের সূচনা

বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন হচ্ছে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমদ শহীদ মক্কা নগরীতে অবস্থানকালে বাংলাদেশের মীর নিসার আলী তিতুমীর তাঁর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সম্ভবত সৈয়দ আহমদের সাথে তিতুমীর সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন। ১৮২৭ সালের দিকে তিতুমীর বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন ও 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া'র প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় চমকপ্রদভাবে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বাংলায় ওহাবী আন্দোলন বলতে উপমহাদেশের 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনকেই বিশেষভাবে বোঝানো হয়। উনিশ শতকের বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের তিনটি পর্যায় বা স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত ১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এর উত্তাল তরঙ্গ বাংলার আনাচেকানাচে বিপুল সাড়া জাগায়। বাঙালি মুসলমানরা মনেপ্রাণে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে শেষ যুগের

'ইমাম মেহেদি' বলে বিবেচনা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে নদীর স্রোতের মতো কলকাতার দিকে ছুটে আসে। এভাবে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার চুনতি গ্রামের 'বড় মৌলবী' নামে পরিচিত মওলানা আবদুল হাকিম, মীরসরাইনিবাসী সুফি নূর মুহাম্মদ এবং নোয়াখালী জেলার মওলানা ইমামুদ্দিন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে এঁরা সৈয়দ সাহেবের খিলাফত লাভ করেন। পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বিঘোষিত জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য এঁদের প্রভাবে ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে হাজার হাজার বাঙালি মুসলিম যুবক সাড়ে তিন হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে সীমান্ত প্রদেশের ইউসুফ জাঈ ও সিতান্নায় উপস্থিত হয়। পরবর্তী তিন দশকে (১৮৩১-১৮৬৩) বাংলাদেশ থেকে জেহাদের উদ্দেশ্যে 'টাকা ও মানুষের স্রোত' সীমান্ত প্রদেশে বৃটিশ সরকারের অগোচরে সংগোপনে অবিরাম বয়ে গেছে বলে হান্টার মন্তব্য করেন।

দ্বিতীয় দফায় ১৮২৭ সালে বাংলার স্বনামধন্য প্রথম স্বাধীনতাযোদ্ধা তিতুমীর সৈয়দ আহমদের আদেশে সীমান্ত প্রদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় প্রবাহের সূচনা করেন, যা ১৮৩১ সালে বৃটিশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের রূপ নেয়। এ পর্বটির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তিতুমীরের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীর

তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলি। তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদ্রাসায় তিনি আরবি-ফার্সি অধ্যয়ন করেন এবং একই সাথে স্থানীয় এক আখড়ায় শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ নেন। তিনি কুস্তিখেলায় সুনাম অর্জন করেন এবং কুস্তিখেলার কৌশল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালের দিকে কলকাতা গমন করেন। সেখানে তিনি মির্জা গোলাম আম্বিয়া নামে দিল্লীর বাদশাহী পরিবারের একজন সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, যিনি মির্জাপুর এলাকার জমিদার ছিলেন।

ইংরেজ সরকারের দলিলপত্রে তিতুমীরকে ১৮১৫ খৃস্টাব্দ নাগাদ কোন এক হিন্দু জমিদারের কর্মচারীরূপে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত এক অপরাধী হিসেবে দেখানো হয় এবং একারণে তিনি একবার গ্রেফতার হন বলে উল্লেখ করা হয়। হান্টার মন্তব্য করেন, বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৮২২-১৮২৩ সালে তিনি কলকাতায় মির্জা গোলাম আম্বিয়ার সান্নিধ্যে আসেন। অতঃপর মির্জা আম্বিয়ার সাহচর্যে তিনি হজ্ব করতে পবিত্র মক্কা নগরী গমন করেন। সেখানে তিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই আদেশে ১৮২৭ সালে বাংলায় ফিরে এসে চব্বিশ পরগনা জেলার নারকেলবাড়িয়ার হায়দরপুর গ্রামে নিবাস স্থাপন করেন। অবশেষে সৈয়দ আহমদের বিশুদ্ধপন্থী ধর্মসংস্কারের

মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার আদর্শে তিনি প্রচারকাজে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে যে, মির্জা আম্বিয়া তাঁকে এজন্য একটি বৃত্তিও প্রদান করেন।

ইংরেজ সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮২৮ সালে তিতুমীর নতুন বেশভূষায় সজ্জিত তিন-চারশ' শিষ্যের একটি আলাদা সংস্কারপন্থী দল গঠন করে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁর এ দলটি যমুনা ও ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রায় ১৮/২০ মাইল দীর্ঘ ও ১২/১৪ মাইল প্রস্থ এক বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে, যা নদীয়া জেলা থেকে চব্বিশ পরগনা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার চাষীদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন।

তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের বেশভূষায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করার কারণ হলো, তদানীন্তন বাংলার সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মতো ধুতি পরতে অভ্যস্ত ছিল; কিন্তু কাছা বা গোছ দিয়ে ধুতি পরে নামাজ আদায়ে অসুবিধা হতো; তাই তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের কাছা বা গোছ খুলে তহবন্দের মতো ধুতি পরতে নির্দেশ দেন। হাজি শরীয়তউল্লাহও ফরায়জীদের কাছাখোলা কাপড় পরতে আদেশ দেন। তাই তাঁর অনুসারীদের "কাছাখোলা, জোলার পোলা, খাঁটি মুসলমান" বলে বর্ণনা করা হতো। অধিকন্তু ইসলামের সুন্নত মোতাবেক তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের কাটছাট করে ছিমছাম দাড়ি রাখার নিদের্শ দেন।

তিতুমীরের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মুসলমানদের যেসব নিয়ম-নীতি মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন তন্মধ্যে প্রধান হলো : (ক) একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মান্য করা এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করা; (খ) কোন পীর, দরবেশ, ওস্তাদ, ফকির, শাগরেদ, দরগাহ, মাজার, কবর বা অন্য কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক না করা, কিম্বা তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা ও মানত না করা, তাদেরকে উপহারসামগ্রী প্রদান না করা, এমনকি আল্লাহর কাছে সুপারিশের মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করা, কেননা এগুলি শেরেকের অন্তর্ভুক্ত; (গ) স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি, প্রথা, অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করা, এমনকি কোরান ও হাদিসের ভিত্তিহীন উপায়ে ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, কিয়াম, মহররম উদযাপন ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকা, কেননা এগুলি তিনি বেদাত অর্থাৎ নব-উদ্ভূত ধর্মানুষ্ঠানের নামে কুসংস্কার বলে মনে করেন।

তিতুমীরের এ আন্দোলন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন এবং আরবে প্রবর্তিত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মুয়াহহিদুন আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সনাতন আচার-অনুষ্ঠানের পরিপন্থী হওয়ায় এগুলির প্রচারণা এবং এগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ ও তৎপরতা ক্রমান্বয়ে তিতুমীরের অনুসারীদের সাথে ফরায়জীদের মতোই প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

জমিদার শ্রেণী তিতুমীরের সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রজাদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান একাত্মতা প্রথম থেকেই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আসছিল। এখন মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে রক্ষণশীলদের সাথে সংস্কারপন্থীদের এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে তারা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদেরকে সহায়তার নামে তথাকথিত অশান্তি ও কোন্দল সৃষ্টিকারী তিতুমীরের অনুসারীদের দমন করতে সংস্কারপন্থীদের উপর 'দাড়ি ট্যাক্স' নামে এক রকম কর আরোপ করে এবং জমিদারি আইনের অপব্যবহার করে তাদেরকে নানাভাবে নাজেহাল করতে থাকে।

এভাবে তিতুমীরের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রাণাঘাট এলাকায় সাতজন বৃহৎ হিন্দু জমিদার একজোট হয় এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, শান্তিভঙ্গ, মুসলিম রাজত্ব তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, হিন্দু ধর্মের ক্ষতিসাধন এবং হিন্দু ধর্মস্থানের পবিত্রতাহানি, তদুপরি হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর বিদ্বেষমূলক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের অজুহাতে কলকাতার হিন্দু পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করে। অন্যদিকে ইংরেজ নীলকররাও তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তিতুমীরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দলকে ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তথা 'রিলিজিয়াস ব্যান্ডিত' নামে আখ্যায়িত করে।

পত্র-পত্রিকার সমর্থন, নীলকরদের সহযোগিতা এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষপাতমূলক আচরণের সুযোগ নিয়ে হিন্দু জমিদারগণ কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারি এলাকা পুঁরায় তিতুমীরের শিষ্যদের কাছ থেকে 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায় করতে তৎপর হয়। এ ট্যাক্সের হার ছিল অত্যন্ত চড়া—জনপ্রতি আড়াই টাকা, যা দিয়ে তখনকার দিনে সাত/আট মন ধান অথবা একটি গরু ক্রয় করা যেতো। কিন্তু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারি এলাকা সফদরপুরে, যেখানে তিতুমীরের শিষ্যরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করতো, সেখানে জমিদারের আমলারা 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায় করতে গিয়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

সফদরপুরে তিতুমীরের শিষ্যরা একটি ভগ্নপ্রায় পুরনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ মেরামত করে তাতে তাদের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এখানে তারা জমিদারদের অন্যায় তৎপরতা প্রতিরোধ করার জন্য একতাবদ্ধ হয় ও প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। অন্যদিকে 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। জমিদারের আমলাদের ভূমিকর আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, তাদের উপর সহিংস আক্রমণ এবং তাদেরকে মারধর ও বন্দি করে রাখার অভিযোগ তুলে কৃষ্ণদেব রায় সদলবলে তিতুমীরের উপর চড়াও হয়। ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল শুক্রবার। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সফদরপুর মসজিদে সেদিন মহা সমারোহে আম-জিয়াফতের ব্যবস্থা ছিল। জুমার নামাজের সময় মসজিদে প্রচুর মুসল্লি ছিল এবং মসজিদে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এ

অবস্থায় কৃষ্ণদেব উক্ত মসজিদে চড়াও হয়ে দু'জন মুসল্লিকে হত্যা করে, কয়েকজনকে আহত করে এবং মসজিদঘরটি অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। তদুপরি কৃষ্ণদেব আশেপাশের কয়েকটি বাড়িঘর লুণ্ঠন করিয়ে তাঁর কর্মচারীদের জোরপূর্বক আটক করে রাখা হয়েছে বলে নিকটবর্তী কলিংগা পুলিশ ফাঁড়িতে এজাহার প্রদান করেন। সাথে সাথে তিতুমীরের শিষ্যরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে এ মর্মে পাল্টা এজাহার দায়ের করে যে, তিনি তাদের মসজিদ আক্রমণ করেছেন, মসজিদঘরে অগ্নিসংযোগ করেছেন, মসজিদটি পুড়িয়ে দিয়েছেন, নরহত্যা করেছেন, ঘরবাড়ি লুট করেছেন এবং জনগণকে মারধর করেছেন।

কলিংগা পুলিশ ফাঁড়ির জমাদার এমন গুরুতর বিষয়ে তদন্ত করা তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত বিবেচনা করে পার্শ্ববর্তী বশিরহাট থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে তদন্তে নিযুক্ত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। বশিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী অভিযোগ দু'টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ আঠারো দিন পরে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় গ্রামবাসীদের এজাহারের বিরুদ্ধে আরো একটি পাল্টা এজাহার দায়ের করেন, যাতে তিনি অভিযোগ করেন যে, সফদরপুর গ্রামের অধিবাসীরা তাঁর তিন জন কর্মচারীকে আক্রমণ করে মারধর করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা সাজানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের মসজিদটি নিজেরাই পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত এজাহারে যেসব লোককে সাক্ষীরূপে দেখানো হয়েছিল তাদের সবাইকে এবং অন্যান্য বহু লোককে অভিযুক্ত করেন। সন্দেহর্জা হলেও শেষোক্ত এজাহারটি পাওয়া মাত্র দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ এর তদন্তে হাত দেন এবং জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদানকারী ও অন্যান্য অনেককে বন্দি করে হাজতে পাঠিয়ে দেন। ফলে তিতুমীরের পক্ষে অন্যান্য যারা সাক্ষী ছিল তাদেরকেও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। তখন দারোগা এজাহার তিনটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেন এবং ঘটনার উৎস সম্বন্ধে নিশ্চুপ থেকে জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির কোন সাক্ষী-প্রমাণ না থাকার অজুহাতে জমিদারের অনুকূলে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

দারোগার প্রতিবেদন পাঠ করে বারাসত মহকুমার যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি কিছুসংখ্যক নতুন সাক্ষী তলব করেন। তাদের সাক্ষ্যে দারোগার প্রতিবেদনের বিপরীত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এজাহার সম্পর্কে তদন্তের সময় তিতুমীরপক্ষীয় সাক্ষীদের অনুপস্থিতি এবং দারোগা কর্তৃক তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করা প্রভৃতি কারণে কলভিন রিপোর্টের ভাষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট 'অনন্যোপায় হয়ে' ১৮৩১ সালের ২ সেপ্টেম্বর সফদরপুর গ্রামের অধিবাসীদের মামলাটি খারিজ করে দেন।

১৭৯৯ সালের ৭নং রেগুলেশনবলে ভূমিকর অনাদায়ের জন্য প্রজাদের সরাসরি বন্দি করার ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে জমিদারগণ প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা মোকদ্দমা চব্বিশ পরগনার জেলা সদরে দায়ের করে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে

বাধ্য করে। কলভিনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এদের এসব ঘৃণ্য অপকৌশলই তিতুমীরের শিষ্যদেরকে শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

আদালতের রায়ের কপি বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকোর্ট থেকে গ্রহণ করে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। কলভিন মন্তব্য করেন যে, তবুও তারা আইনের প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার লাভের জন্য আরো একবার চেষ্টা করে। ১৮৩১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আপিল করার জন্য উক্ত মোকদ্দমার নথি ও রায়ের কপি নিয়ে গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে তাদের একদল কর্মী কলকাতায় গমন করে। কিন্তু তারা কমিশনারের কোর্টে আপিল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ব্যর্থতার কারণ আপাতত কমিশনার সার্কিটে সফররত থাকায় কলকাতায় তাঁর অনুপস্থিতি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আলাপ-আলোচনার ফলে তাদের ধারণা হয় যে, একজন উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তা অন্য একজন ইংরেজ কর্মকর্তার রায় নাকচ করবে না। বিশেষত ইংরেজ প্রশাসকদের সাথে জমিদারদের ঘনিষ্ঠতা প্রজাদের ন্যায়বিচার লাভ করার পথে প্রতিবন্ধক হয় । তাদের এই ব্যর্থতা এবং জমিদারদের উস্কানি ও শাস্তিমূলক তৎপরতা তাদেরকে হাঙ্গামার পথে পা বাড়াতে বাধ্য করে।

সফদরপুরের ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও মর্মান্তিক ছিল এবং এর পরিণতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক জিয়াফত উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ও সমবেত বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপর জুমার নামাজরত অবস্থায় হিন্দু জমিদারের নেতৃত্বে ভাড়াটিয়া হিন্দু লাঠিয়ালরা প্রকাশ্য দিবালোকে মারাত্মক আক্রমণ চালায়। থানা-পুলিশের কর্মকর্তার সহায়তায় ও ইংরেজ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এমনকি মুসলমানদের দাড়ির উপর ট্যাক্স বসিয়ে মুসলমানদের পর্যুদস্ত করার এই হীন প্রচেষ্টা স্বাধীনতার মাহাত্ম্য ও অধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে তিতুমীরের অনুসারীদেরকে সচেতন করে তোলে। আদালতে আইনের প্রহসন ও ন্যায়বিচারের অবসান তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল।

তা সত্ত্বেও তিতুমীরের শিষ্যরা এই সংঘাতকে অন্য চোখে দেখে। এই সংঘাতে প্রতিবেশী হিন্দু জনসাধারণ নিরপেক্ষ ছিল অর্থাৎ তারা অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের পক্ষে ছিল না, আবার তিতুমীরের বিরুদ্ধেও ছিল না। জমিদারগণ ভাড়াটিয়া ও বেতনভোগী লাঠিয়ালের মাধ্যমে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। অতএব, তিতুমীরের শিষ্যরা এ দাঙ্গাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে গ্রহণ করে নি। তাই তারা কৃষ্ণদেবের হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণদেব রায়ের গ্রাম আক্রমণের সংকল্প গ্রহণ করে। অধিকন্তু চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রাণাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার জোটবদ্ধ হিন্দু জমিদারদের চক্রান্ত, দাড়িট্যাক্স, কোর্টে মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি, লাঠিয়ালদের আক্রমণ এবং ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের কারণে কোণঠাসা হয়ে অবশেষে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয় ।

নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরের একজন ধনাঢ্য শিষ্য মুয়ীজুদ্দিন বিশ্বাসের একটি ষাট একর প্রশস্ত কৃষিখামার ছিল। এখানেই তিতুমীরের শীষ্যরা অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাঁশের খুঁটি দিয়ে এটাকে ঘিরে নেয়। উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের লাঠিয়ালবাহিনীর আক্রমণ থেকে জায়গাটিকে সংরক্ষিত করা। পরে এটা তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে এ বাঁশের কেল্লায় তিতুমীরের শিষ্যরা জমায়েত হতে থাকে। এদের দমন করার জন্য প্রথম থেকেই তারাগোনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ নাগ, নগরপুরের জমিদার গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুঁরার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, সরফরাজপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, কুরগাছির জমিদার প্রমুখ একজোট ছিল। নদীয়া ও রাণাঘাটের হিন্দু জমিদারও তাদের সঙ্গে হাত মিলায়। লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তারা তিতুমীরের শিষ্যদের বাধা প্রদান করার প্রস্তুতি নেয়। এমনকি কালিপ্রসন্নের অনুরোধে কলকাতার জনৈক লাটু বাবু দুইশ' 'হাবশী লাঠিয়াল' গোবরাদাঙ্গায় প্রেরণ করে।

তিতুমীরের শিষ্যরা ৬ নভেম্বর বাঁশের কেল্লা থেকে বের হয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের গ্রামে হানা দেয় এবং পুঁরার বাজারে উপস্থিত হয়ে মসজিদ পোড়ানোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি গরু জবাই করে বাজারের কালীমন্দিরের দেয়ালে গরুর রক্ত ছিটিয়ে দেয় এবং গরুর চার পা মন্দিরের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে নারকেলবাড়িয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। এতে বাধা প্রদান করতে গেলে কয়েকজন লোককে প্রহার করা ছাড়া তাদের দ্বারা সঙ্ঘটিত কোন দুষ্কর্ম বা প্রাণহানিকর ঘটনার তথ্য এ অভিযানের বেলায় পাওয়া যায় না।

পবদিন ৭ নভেম্বর তারা পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলার লাউঘাটির দিকে যাত্রা করে। ঐ গ্রামে তিতুমীরের বহু শিষ্য ছিল। সেখানে খাওয়ার জন্য গরু জবাই করতে গেলে দু'জন ব্রাহ্মণ তাদের বাধা দেয়। ফলে ভীষণ হাঙ্গামা বেঁধে যায়। আসলে কৃষ্ণদেব রায়ের ভাই গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ও সরফরাজপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন বিপুল সংখ্যক লাঠিয়াল নিয়ে তিতুমীরের শিষ্যদের মোকাবেলা করতে সেদিকে অগ্রসর হয়। অধিকন্তু হিন্দু জমিদারদের সাথে ইংরেজ নীলকররাও জোটবদ্ধ হয়েছিল। মোল্লাহাটি নীল কারখানার ম্যানেজার ডেভিস একদল লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে এখানে জমিদারদের পক্ষে যোগদান করে। তদুপরি কলকাতা থেকে প্রেরিত দুইশ' 'হাবশী লাঠিয়াল'ও এখানে মোতায়েন ছিল।

ফলে লাউঘাটিতে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় এবং দেশী কায়দায় বহুক্ষণ ধরে দাঙ্গাযুদ্ধ চলার পর তিতুমীরের শিষ্যদের সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রগতির মুখে জমিদার ও নীলকরদের লাঠিয়ালবাহিনী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। যুদ্ধে দেবনাথ রায় নিহত

হয় ও অন্যরা দিকবিদিক পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। ডেভিস তার বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের শিষ্যদের পৃথকভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কলভিন বলেন, উক্ত লাউঘাটির দাঙ্গার পর জমিদার ও নীলকরদের শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিতুমীরের শিষ্যদের প্রভুত্ব কায়েম হয়। সুজন মাঝির গানের সুরে তিতুমীরের বিজয়গাথা জনমনে স্বাধীনতার নতুন উদ্দীপনা জাগায়।[১৬]

আলেকজান্ডারের পুলিশী অভিযান

লাউঘাটিতে ডেভিসের পরাজয় নীলকর পিরন স্টরমকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা একযোগে সরকারের কাছে তাদের নিরাপত্তাবিধানের জন্য এবং পুলিশী সাহায্য প্রদানের জন্য আবেদন করে। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার বহু সংখ্যক সিপাহি, বরকন্দাজ ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ১৫ নভেম্বর নারকেলবাড়িয়ায় উপনীত হন।

পরদিন ১৬ নভেম্বর এ বাহিনী তিতুমীরের শিষ্যদের মোকাবেলা করতে অগ্রসর হলে গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে পাঁচ/ছয়শ' লোক সাধারণ লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, যেমন ঢাল, তলোয়ার, দা, কিরিচ, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিপাহি ও বরকন্দাজদের বন্দুকের গুলি তাদের ক্ষিপ্রগতির মুখে অকেজো প্রতিপন্ন হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের ভয় দেখাবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার প্রথমে তাদের প্রতি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করার হুকুম দেন। কিন্তু সিপাহি-বরকন্দাজরা ফাঁকা আওয়াজ করার পর দ্বিতীয়বার বন্দুক ভর্তি করার সময় পায় নি। এত ক্ষিপ্রগতিতে তিতুমীরের শিষ্যরা এদের মোকাবেলা করে যে, এরা নিরুপায় হয়ে দিকবিদিক পালাতে আরম্ভ করে।

শুধু তাই নয়, এ যুদ্ধে সরকারি বাহিনীর ১০ জন সিপাহি, ৩ জন বরকন্দাজ ও ১ জন জমাদার নিহত হয় এবং ১ জন হাবিলদার মারাত্মকভাবে আহত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার পালিয়ে রক্ষা পান। এসময়ে বশিরহাট থানার দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী তিতুমীরের শিষ্যদের নাগালে পড়ে; তাকে তারা কেল্লার মধ্যে নিয়ে যায় ও সম্ভবত পরে হত্যা করে।

নারকেলবাড়িয়ার বিজয় তিতুমীরের শিষ্যদেরকে উল্লসিত করে। এতে জমিদারদের উচিত সাজা হয়েছে মনে করে তারা নীলকরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বরগুনায় অবস্থিত উইলিয়ম স্টরমের নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক পিরন জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করেছিল এবং তাদের যোগসাজশে যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। পিরন পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু নীলকুঠিটি তারা ধ্বংস করে দেয়। নিকটবর্তী

---

১৬. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *Titu Mir*, 18-21.

হুগলীতে স্টরমের দ্বিতীয় নীলকুঠিটিও তারা ধ্বংস করে এবং এর তত্ত্বাবধায়ক হেনরি ব্রন্ডকে সপরিবারে বন্দি করে নারকেলবাড়িয়ায় নিয়ে আসে এবং আনুগত্যের শপথ নিয়ে ছেড়ে দেয়।

স্মিথের পুলিশী অভিযান

অন্যদিকে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ ৭ নভেম্বর লাউঘাটার দাঙ্গাযুদ্ধ সম্বন্ধে কলকাতায় কোম্পানি সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি থমসনকে ১৪ নভেম্বর একটি বার্তা প্রেরণ করে অবহিত করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর ইছামতি নদীর যে প্রান্তে তিতুমীরের শিষ্যরা একত্রিত হয়েছিল, তিনি রুদ্রপুর অঞ্চল দিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। স্মিথের সঙ্গে দুইশ' থেকে তিনশ' সিপাহি, বরকন্দাজ, পুলিশ ও অন্যান্য লোক ছিল। তাদের বহন করার জন্য হাতি, ঘোড়া, পানসি, বজরা, জালিবোট, ডিঙ্গি, পাল্কি, এমনকি বাবুর্চিবোটও মজুত ছিল। তাদের কাছে বারো থেকে চৌদ্দটি দোনলা মাস্কেট বন্দুক ছিল এবং অন্যরা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আর তাদের মোকাবেলায় তিতুমীরের শিষ্যদের সংখ্যা ছিল ছয় থেকে আটশ'। কিন্তু একস্থানে তিতুমীরের শিষ্যরা এমন অতর্কিতে তাদের একটি বোট টেনে হিচড়ে কূলে তুলে ফেলে যে, হতচকিত হয়ে সরকারি বাহিনীর লোকরা যে যেদিক পারে পালাতে আরম্ভ করে। স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজরা বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে নদীর অপর পারে গিয়ে এক মাইল পথ দৌড়ে অতিক্রম করে হাতিতে চড়ে পালিয়ে যায়।

দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত দু'টি জেলা থেকে দু'টি পৃথক পুলিশী অভিযানের ব্যর্থতায় উক্ত বিস্তীর্ণ এলাকার প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বার্তা প্রেরণ করেন যে, এ ঘটনাবলীর পরে কোন দারোগা এই এলাকার থানাসমূহে অবস্থান করতে আর সাহস পাবে না। অতএব, সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বিদ্রোহীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত এই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সামরিক অভিযান

বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ নভেম্বর মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনী এবং ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য, এক ব্যাচ গোলন্দাজ সৈন্য ও দু'টি ভারী কামান সম্বলিত একটি সৈন্যবাহিনী কলকাতা থেকে নারকেলবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে ঘন ঘন কামান দেগে সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তিতুমীরের ছিল না। তবুও তারা আত্মসমর্পণ না করে শাহাদতবরণ করেন। বাঁশবাড়িয়া পরিণত হয় রক্ত, লাশ আর পোড়ামাটির এক বিধ্বস্ত জনপদে।

এই যুদ্ধে তিতুমীরসহ প্রায় ৫০ জন যোদ্ধা প্রাণ হারান, প্রায় ৩০ জন আহত হন ও ২৫০ জন বন্দি হন। এরপর আশেপাশের গ্রাম থেকে আরো অনেককে গ্রেফতার করা হয় এবং সর্বমোট ৩৫০ জনকে আলিপুর জেল হাজতে চালান দেয়া হয়।

একই বছর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তিতুমীরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এবং তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের উপর চরম আঘাত নেমে আসে। হান্টারের মতে, পাটনায় সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য মওলানা বেলায়েত আলি ও মওলানা এনায়েত আলি আবার নতুন করে এ আন্দোলন শুরু করেন।[১৭] মওলানা বেলায়েত আলি সৈয়দ আহমদের প্রধান খলিফা ছিলেন। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকেই তাদের নেতা নির্বাচন করে এবং তিনি সৈয়দ আহমদের খলিফাদের বেছে বেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। এ প্রক্রিয়ায় মওলানা এনায়েত আলি ১৮৩২ সালের দিকে বাংলায় আগমন করেন। তিনি দীর্ঘ সময় বাংলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াজ, নসিহত ও জেহাদের মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৮৪০ সালের দিকে তিনি যশোর জেলার হাকিমপুর গ্রামে তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা ফরায়জী কেন্দ্রস্থল ফরিদপুর জেলার পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় দু'টি সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে মওলানা এনায়েত আলি বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জেহাদ পরিচালনার জন্য সীমান্ত প্রদেশে গমন করে পাটনার মওলানা ইয়াহিয়া আলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। মওলানা ইয়াহিয়া আলি ফরায়জীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দুদু মিয়া জনশক্তি ও টাকাপয়সা দিয়ে জেহাদপ্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।

মওলানা এনায়েত আলি ও ইয়াহিয়া আলির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিরামহীন প্রচারের ফলে বাংলার উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলি, যেমন দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, চব্বিশ পরগনা ও কলকাতায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে পাটনায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার খলিফাদের নেতৃত্বাধীন সঙ্ঘটি 'আহলে হাদিস' নামে অভিহিত হলে উক্ত এলাকার বিপুল সংখ্যক সৈয়দপন্থীরা আহলে হাদিস বা হাদিসপন্থী বলে পরিচিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলার পূর্বাঞ্চল, যেমন যশোরের পূর্বাংশ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট ও আসাম প্রদেশে ফরায়জী প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে।

১৮৫০-এর দশকে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের শিখ রাজত্ব বৃটিশের কুক্ষিগত হলে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার শিখবিরোধী সংগ্রাম বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মওলানা এনায়েত আলি ও সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যান্য খলিফাদের দ্বারা পরিচালিত সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে এবং বৃটিশ ভারতের অভ্যন্তরে গ্রেফতারকৃত

১৭. Hunter, *The Indian Musaln*

সন্দেহভাজন লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাঙালি মুসলমানের অবস্থিতি লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার বিস্মিত হয়। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে সরকার বিপুল পরিমাণ বৃটিশবিরোধী গোপন তৎপরতার তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। এগুলির ভিত্তিতে পাঁচটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার অনুষ্ঠিত হয়— আম্বালার বিচার (১৮৬৪), পাটনার বিচার (১৮৬৫), মালদহের বিচার (১৮৭০), রাজমহলের বিচার (১৮৭০) এবং বৃহৎ ওহাবী বিচার (১৮৭০-৭১)। এসব বিচার বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রমাণ করে।

বাংলায় ফরায়জী ও তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া বা তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং মুসলিম সমাজে সুদূরপ্রসারী নবচেতনার সৃষ্টি করে।

ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় রোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের তৎপরতা প্রতিভাত হয়। এই ধর্মীয়-সামাজিক সংগ্রাম উত্তর ভারতের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া এবং অন্যান্য স্থানে সংঘটিত ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনগুলির সাথে একাত্মতা সূচিত করে।

কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বাংলার মুসলিম সমাজ উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজের এক শতাব্দীকাল আগেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে বসেছিল এবং উনিশ শতকে তা পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হয়। পক্ষান্তরে, উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আশা তখনো প্রবল ছিল। অধিকন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন ছিল নগর ও শহরকেন্দ্রিক আর বাংলায় এর প্রকৃতি ছিল গ্রামভিত্তিক ও প্রধানত গ্রাম-গঞ্জে প্রসারিত।

অতএব, উত্তর ভারতে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এরপর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও জেহাদে পর্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলার গ্রাম-গঞ্জের আর্থ-সামাজিক সঙ্কট নিরসনের উদ্দেশ্যে ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া সংগ্রাম গণমানুষের নীতিগত অধিকার সংরক্ষণ বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ নেয় এবং বিশুদ্ধ ইসলামের সামাজিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকদের নবপ্রতিষ্ঠিত ডিউক ও ব্যারন ধরনের নীলকর-জমিদারদের সামন্তবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

শাহ্ ইসমাইল শহীদের একদল অনুসারী সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রধান খলিফা মওলানা বেলায়েত আলির 'আমল বিল-হাদীস' বা 'হাদিসের ভিত্তিতে কর্মসাধন' মতবাদের আলোকে কঠোর বিশুদ্ধবাদী 'আহলে হাদীস' আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। ১৮৫০-এর দশকে মওলানা নযীর হোসাইন দিল্লীতে এর কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। ধীরে ধীরে 'আহলে হাদীস' একটি বিশুদ্ধবাদী ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

আহলে হাদিস আন্দোলনের বক্তব্য হলো : ইসলাম ধর্মের মৌল ভিত্তি কোরান ও হাদিসের বাইরে কোন কাজ করা ইসলামবিরোধী।

আহলে হাদিস দলভুক্ত মুসলমানরা কোন মযহাবের রীতি অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। তাদের অভিমত হলো, ইমামদের অনুসরণ করা ঐ পর্যন্ত বৈধ যে পর্যন্ত একমাত্র রসুলের অনুসরণ করার জন্য তাঁদেরকে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির বা দলের অন্ধ অনুকরণ তথা 'তকলীদে জামেদ' ইসলামে বৈধ নয়। একারণে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদেরকে 'মযহাববিহীন' তথা 'লা মযহাবী' বলে অপবাদ দেয়।

উত্তরোত্তর এরকম বহু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব মুসলমানদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্কে লিপ্ত করে। অন্যদিকে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। বর্তমানে বিশেষত তথাকথিত ওহাবী-সুন্নি দ্বন্দ্ব এরই একটি নেতিবাচক ফল।

অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলায় মুসলমানদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সজাগ ও সচেতন করে তোলে।

৭

উনিশ শতকে হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন

প্রীতি কুমার মিত্র*

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন, যা ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। এসব পরিবর্তনকেই রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ দখল এবং তারপর চিরায়ত ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তা থেকেই উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব। আধুনিক ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি হিন্দুরা দেখতে পেলো যে, পাশ্চাত্য আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে তারা অপ্রস্তুত। সুতরাং তখনকার হিন্দু সমাজকাঠামো ও ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিসীমায় যতোটা সম্ভব পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের সপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

এক. ধর্মীয় সংস্কার

উনিশ শতকের বাংলায় হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান দু'টি পর্যায় ছিল : ১. ব্রাহ্ম আন্দোলন, যা শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ কালব্যাপী বিকশিত হয় এবং ২. নব্যহিন্দু আন্দোলন, যা তার পরে প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন হিন্দু বহুদেববাদের একটি একেশ্বরবাদী বিকল্প হাজির করে এবং ধর্মে অযৌক্তিকতা দূর করার প্রয়াস পায়। নব্যহিন্দু আন্দোলন ধর্মীয় বহুত্বের সমস্যাকে মোকাবেলা করে এক ব্যাপক সর্বেশ্বরবাদ দিয়ে, যা নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও অন্তহীন বিতণ্ডার পরিবর্তে ঐক্য ও পুনরুজ্জীবনের ডাক দেয়।

---

* অধ্যাপক (ইতিহাস), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ : ব্রাহ্ম আন্দোলন (আনু. ১৮১৫-৯০)

উদ্ভব : ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)-এর মুখ্য প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু ধর্মকে সেমিটিক আদলের একটি একেশ্বরবাদী ধর্মে রূপান্তরিত করা। আরবি-ফার্সি শিক্ষার মাধ্যমে অল্প বয়সে ইসলামের সঙ্গে পরিচিতিই সম্ভবত একেশ্বরবাদের প্রতি রামমোহনের আনুগত্যের মূল কারণ। একই সাথে সংস্কৃতশাস্ত্রে শিক্ষালাভের ফলে তিনি হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে নিহিত একেশ্বরবাদী উপাদানটিকে অন্য সবকিছু থেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেলা কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে চাকুরি (১৮০৫-১৪) ও তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সুবাদে রামমোহন ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন তথা খৃস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় লাভ করেন। ফলে তাঁর একেশ্বরবাদী প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়।

রামমোহন ১৮০৩-০৪ সালে সর্বপ্রথম *তুহফাৎ-উল-মুওআহ্‌হিদীন* [এক ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য উপহার] নামে আরবি (ভূমিকা মাত্র) ও ফার্সি (মূল পাঠ) ভাষায় লেখা একখানি পুস্তিকায় বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক একেশ্ববাদের পক্ষে তাঁর যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন। এক দশক নীরব[১] থাকার পর ১৮১৪ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় থেকে তিনি পুনরায় ধর্মবিষয়ে ব্যাপকভাবে লিখতে শুরু করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে তিনি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বেদান্ত বিষয়ক আটখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[২] ফলে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের একটা সাহসী পুনর্ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, যাতে ঐ অদ্বৈতবাদকে সেমিটিক ধাঁচের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে পরিণত করার চেষ্টা ছিল।[৩] এসব লেখার মধ্য দিয়ে রামমোহন হিন্দু বহুদেববাদের বিরুদ্ধে এক হুমকি হয়ে দেখা দেন। তাছাড়া পবিত্র বেদ দেশী ভাষায় অনুবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে চিরাচরিত নিষেধাজ্ঞা ছিল, এই অনুশীলন তার প্রতি রামমোহনের অবজ্ঞা সূচিত করে।

---

১. আমরা জানি না রামমোহন *তুহফাৎ*-এর মুখবন্ধে প্রতিশ্রুত *মনাজরাৎ-উল-আদিয়ান* [বিভিন্ন ধর্মসংক্রান্ত বিতর্ক] শীর্ষক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বইটি আদৌ রচনা করেছিলেন কিনা।

২. *এসব গ্রন্থের মধ্যে ছিল বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার;* এই দুই বই-এর হিন্দি অনুবাদ; *কেনোপনিষৎ ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ*—এই চার উপনিষদের ইংরেজি তরজমা; এবং *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।*

৩. রামমোহন যে অদ্বৈত বেদান্ত পছন্দ করতেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল আমহার্স্টকে লেখা তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত চিঠিতে, যেখানে তিনি বলেন : "দৃশ্যমান বস্তুসমূহের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই এই কথা বিশ্বাস করতে শেখায় যে বেদান্ত, সেই দর্শন পড়ে তরুণেরা সমাজের যোগ্যতর সদস্য হতে পারবে না ...।" অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা.), *রামমোহন রচনাবলী*, (কলকাতা ১৯৭৩), ৪৩৫ [অতঃপর *রামমোহন রচনাবলী* রূপে উল্লেখিত]। এই অসম্পূর্ণতা নিরসনের জন্যই তিনি সচেতনভাবে বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে তাঁর প্রথম জীবনে শেখা ইসলামী ভগবৎতত্ত্বের আলোকে একটি দৃঢ় একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন।

রামমোহনের এসব ধর্মবিষয়ক লেখার মূলকথাটি ছিল এই যে, বেদান্ত একটি শুদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রণালী শিক্ষা দেয় এবং এটিই হিন্দু শাস্ত্রসমূহের একমাত্র অভ্রান্ত অংশ; অনুরূপভাবে পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের কর্তৃত্ব এবং সমকালীন হিন্দুধর্মে ব্যবহৃত আচারবিচার তথা পৌত্তলিক উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের বিপরীতে ধর্মনিষ্ঠদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক ও প্রচণ্ড। রামমোহনের নব্যমত উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও উপাসনাপদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একের পর এক লেখনী হাতে এগিয়ে আসেন সাতজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ। তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রামমোহন প্রত্যেকের জন্য একখানি প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন। এভাবে এক দশকব্যাপী (১৮১৬-২৬) এই বিতণ্ডায় উভয়পক্ষে চারটি ভাষায় (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি) বিশখানার বেশি বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[৪] এই তর্কযুদ্ধে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (আ. ১৭৮৮-১৮৫১) নামে দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিত, যাঁরা সরকারি চাকুরি করতেন। আর ছিলেন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় বৈদিক বিদ্বান। উপরে যে প্রকাশনাগুলির কথা বলা হলো তা ছাড়াও দুখানা সাময়িকীকে অবলম্বন করে জমে উঠেছিল রামমোহন ও গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যকার বিতর্ক—একদিকে ছিল রামমোহনের নিজের *সম্বাদ কৌমুদী* এবং অপরদিকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রক্ষণশীল পত্রিকা *সমাচারচন্দ্রিকা*।

হিন্দুদের সাথে পরিচালিত বৃহত্তর দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আবার রামমোহনকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে আর একটি ছোট দ্বন্দ্বে—ঐশী সত্তার প্রকৃতি সংক্রান্ত ঐ একই প্রশ্ন নিয়ে। অদ্বৈতবাদী ও বহুদেববাদী ব্রাহ্মণদের মতোই ত্রি-ঈশ্বরবাদী খৃস্টানদের কাছেও রামমোহনের একেশ্বরবাদ সমান বিসদৃশ লেগেছিল। ১৮২০ সালে *প্রিসেপ্টস অব যীজস্ : দি গাইড টু পীস এ্যান্ড হ্যাপিনেস* [যীশুর অনুশাসনসমূহ : শান্তি ও সুখের পথনির্দেশক] শীর্ষক এক পুস্তিকায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি নৈতিক অনুশাসনগুলিকে "মুক্ত চিন্তার অনুশীলনকারীদের আপত্তি ও সন্দেহের অবকাশবিশিষ্ট" "অন্যান্য অনুচ্ছেদ"[৫] থেকে বাছাই করে আলাদাভাবে দেখান। এতে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে অবস্থানরত ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা প্রচণ্ড আঘাত পান এবং ঐ 'বুদ্ধিমান হীদেন'—এর আক্রমণ থেকে নিজেদের বদ্ধবিশ্বাস (ডগ্‌ম্যা)-কে রক্ষা করার

৪. উদাহরণস্বরূপ, রামমোহনের লেখা *উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার* (১৮১৬-১৭), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), কবিতাকারের সহিত বিচার* (১৮২০), *চারি প্রশ্নের উত্তর* (১৮২২); এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের লেখা *বেদান্তচন্দ্রিকা, চারি প্রশ্ন* (১৮২২), *পাষণ্ডপীড়ন* (১৮২৩) ইত্যাদি।

৫. *দি ইংলিশ ওয়ার্কস অব রাজা রামমোহন রায়* [রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি রচনাবলী], (এলাহাবাদ ১৯০৬), ৪৮৪।

জন্য এগিয়ে আসেন। ফলে যে বিতণ্ডা শুরু হয় তা চার বছর (১৮২০-২৩) চালু থাকে এবং সেসময়ে *প্রিসেপ্ট*-এর বিরুদ্ধে মিশনারিদের প্রতিক্রিয়ার জবাবে রামমোহন প্রায় ছয়শ' পৃষ্ঠাব্যাপী তিনখানি *অ্যাপীল্স টু ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক* [খৃষ্টীয় জনগণের প্রতি আবেদন] রচনা করেন। ১৮২১ সালে মিশনারিদের অন্যতম উইলিয়ম এ্যাডামকে রামমোহন একত্ববাদী (ইউনিটারিয়ান) খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। 'দ্বিতীয় পতিতআদম'-এর ঘটনা ঐ উত্তপ্ত বিতর্কে নতুন জ্বালানি নিক্ষেপ করে এবং তখন তা চলতে থাকে শ্রীরামপুর মিশনারিদের *সমাচারদর্পণ* এবং রামমোহনের *ব্রাহ্মণ সেবধি : মিশনারি ও ব্রাহ্মণ* নামে দু'টি সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। এর পরে ১৮২৩ সালের মে মাসে রামমোহন ত্রি-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে *পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ* নামে একখানি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। সবশেষে ১৮২৩-এর মে-জুনে তিনি দু'টি সাময়িকীতে জনৈক ডক্টর আর. টাইটলারের সাথে ঐ একই প্রশ্নে এক চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। রামমোহনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার প্রশংসা করে ১৮২৪ সালের মে মাসে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে "ধর্মবিদ্যার ক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড যোদ্ধা, যিনি এখনো কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মখোমুখি হন নি"[৬] বলে বর্ণনা করেন।

দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে বছরের পর বছর ধরে উত্তপ্ত বিতর্কে সাফল্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া রামমোহন আরো একটি কাজ করেন। তা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যা উত্তরকালে তাঁর ধর্মীয় ভাবনাগুলি প্রচার করে এবং সেগুলিকে সংস্কারপন্থী হিন্দুদের জন্য একটি সংগঠিত ধর্মমতের রূপ দান করে। ১৮১৫ সালে রামমোহন স্থাপন করেছিলেন 'আত্মীয়সভা' নামে এক আলোচনাগোষ্ঠী। এর পর ১৮২১ সালে স্থাপন করলেন 'ইউনিটারিয়ান কমিটি', যা ভারতে একেশ্বরবাদের বিকাশে অবদান রেখেছিল। উভয় সংগঠনই জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয় এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়। অবশেষে ১৮২৮ সালে তিনি স্থাপন করলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ', যা সাধারণ্যে 'ব্রহ্মসভা' নামে পরিচিত ছিল এবং সকল ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদীদের মিলনকেন্দ্র ও অসাম্প্রদায়িক উপাসনার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয় ১৮৩০ সালের জানুয়ারিতে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)-এর উদ্যোগে। পরবর্তী নভেম্বরে রামমোহন বৃটেনের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং তিন বছর পর সেদেশের ব্রিস্টল নগরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে দেশে সমর্থন ও নেতৃত্বের অভাবে ব্রাহ্ম সমাজের অবনতি হতে থাকে এবং ১৮৪০-এর দশকে এটি যখন নামমাত্র সংগঠনে পর্যবসিত তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) একে পুনরুজ্জীবিত করেন।

বিকাশ : রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)-এর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের ফলে সন্দেহ ও অতৃপ্তিতে ভুগতে থাকেন, যা পরিণামে রামমোহন

---

৬. উদ্ধৃত, মদনমোহন গরাই, *রামমোহন ঃ সময় জীবন সাধনা* (কলকাতা ১৯৬৬), ১১৭।

সম্পাদিত *ঈশোপনিষদ-এর* 'একটি উড়ন্ত ছেঁড়া পাতা'[৭] পাঠে দূর হয়। অচিরে তিনি একজন মরমী একেশ্বরবাদী এবং বেদ ও বৈদিক জ্ঞানের বিশিষ্ট সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নিজের স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করতে থাকেন। অবশেষে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তিনি বিশ জন সঙ্গীসহ রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নতুন নেতা হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে ঐ আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের রূপ দান করেন, যে ধর্মের একটি পৃথক নাম (ব্রাহ্মধর্ম), একগুচ্ছ মূল বিশ্বাস (ব্রাহ্মধর্ম বীজ), একটি উপাসনাপদ্ধতি, একখানি ধর্মগ্রন্থ (ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ), নিজস্ব উৎসব ও অনুসারীদের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। ১৮৫০-এর মধ্যেই এসব কিছু সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু তার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বেদের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে এক দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

১৮৪৪-৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ খৃস্টান মিশনারিদের আক্রমণ থেকে বেদকে রক্ষা করার কাজে হাত দিলেন। এই বিতর্কের এক পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথের সহচর ও *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) বেদের অভ্রান্ততায় দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেন। ব্যাপক গবেষণা ও গভীর চিন্তাভাবনার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদ ও পরে উপনিষদসমূহকে ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে মেনে নেয়া থেকে বিরত হন। পরিবর্তে তিনি শরণ নিলেন প্রধান প্রধান উপনিষদ থেকে বাছাই করা উদ্ধৃতিসমূহের একটি সঙ্কলনের, যাকে একখানা নতুন (ব্রাহ্মী) উপনিষদ বলা যেতে পারে এবং যার নাম তিনি দিলেন *ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ*।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ সেখানেই থেমে থাকে নি। তিনি চাইলেন ব্রাহ্মধর্মকে একটি ঈশবাদী (deist) বিশ্বাসে পরিণত করতে[৮], যার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানে আস্থা স্থাপন ও তার শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভব হবে এবং প্রার্থনা প্রভৃতির মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে যোগাযোগ রাখার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাঁর সাথে যোগসাজশে পত্রিকা কমিটির (এই কমিটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দাখিলকৃত লেখাগুলি পরীক্ষা করে নির্বাচন করতো) অন্যতম সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর জাগতিক মানবতাবাদ ও সমাজসংস্কার কর্মসূচি প্রচারে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাকে ব্যবহার করতে লাগলেন।[৯] কিন্তু ১৮৫৯ সাল নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে এই ঈশবাদী ও মানবতাবাদী আক্রমণ

---

৭. *বেঙ্গল হরকরা* (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭), উদ্ধৃত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (১৯১৬), ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৭১), ৫১।

৮. *তদেব*, ১৯৪।

৯. উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু বিধবাবিবাহ সম্পর্কে লেখা বিদ্যাসাগরের প্রথম সন্দর্ভ *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা* সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল এবং মার্চে তার সমর্থনে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল।

প্রতিহত করে আরো বেশি রক্ষণশীলতা ও কর্তৃত্বপরায়ণতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ১৮৫৫ সালে পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে অক্ষয়কুমারকে অপসারণ করা হয়। জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় হওয়ার কারণে তত্ত্ববোধিনী সভাকে দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়ে দেন। সভার সাথে সাথে তাঁর সম্পাদক বিদ্যাসাগরও বিদায় নিলেন এবং বিলুপ্ত হলো পেপার কমিটি। আসলে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে প্রসার-লাভ করেছিল। কাজকর্ম চালানোর জন্য তাঁর আর অব্রাহ্মদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর সহচর রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, দেবেন্দ্রনাথ হিসাব করে দেখলেন, তখন যেসব 'কর্মতৎপর উন্নত' ব্রাহ্মদের পাওয়া যাচ্ছিল তাদের নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন এবং এভাবে মতামতের দ্বন্দ্বও পরিহার করতে পারবেন।[১০]

এসব 'কর্মতৎপর উন্নত' ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪), যিনি ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে অতি দ্রুত দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হয়ে উঠেন। তিনি রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্ম আন্দোলনের তৃতীয় ঐতিহাসিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য যেন নির্দিষ্ট হয়েই ছিলেন। পরপর ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটি নির্বাহী পদে থেকে কেশবচন্দ্র সমাজে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি পান। অসাধারণ বাগ্মী এবং প্রাণবন্ত তারুণ্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেশব বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের জনগণকে সমভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমনকি বৃটিশ শাসকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য তিনি কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, দু'টি সাময়িকী সম্পাদনা করেন এবং নিজ ধর্ম সংরক্ষণে খৃস্টান মিশনারিদের সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) প্রমুখ শিক্ষিত হিন্দু তরুণেরা দলে দলে কেশবের আন্দোলনে যোগ দেন। এসব উদ্যমী অনুচরকে নিয়ে কেশব উত্তরোত্তর সাফল্যের শিখরে আরোহণ করতে থাকেন।

সংগঠন ও প্রচারের কাজ কেশবের উপর ন্যস্ত করে দেবেন্দ্রনাথ পুনরুদ্দীপ্ত ব্রাহ্ম সমাজের নামমাত্র প্রধান থেকে আরো বই লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর *ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস* (১৮৫৯-৬০) এবং *ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান* (১৮৬০-৬১) গ্রন্থ ব্রাহ্মদের ধর্মতত্ত্বের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করে। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে অবদান রাখার আর কোন অবকাশ না থাকায় কেশব ও তাঁর অনুসারীরা সমাজসংস্কার ও ব্যাপক ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন অভাবনীয় বিস্তার

---

১০. রাজনারায়ণ বসুর প্রতিবেদন, উদ্ধৃত যোগেশচন্দ্র বাগল, *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা* নং ৪৫.৩য় সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৫৭), ৩৪।

লাভ করে সারা বৃটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্রের অভ্যুত্থানের বছরগুলোতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর ও ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বাড়তে থাকে। ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে তিনি দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ ও প্রচার করেন এবং বিভিন্ন শহর ও নগরে নতুন নতুন সমাজ স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৮৪৯ সালে ৫০০ থেকে ১৮৬৪ সালে ২০০০-এ উন্নীত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ১৮৫৮ সালে ১১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭৮ সালে ১২৪টিতে দাঁড়ায়। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ব্রাহ্মদের একুশটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।[১১] কেশবের গতিশীল নেতৃত্বের ফলেই এ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৮৬৭ সাল থেকে 'মহর্ষি' উপাধিধারী দেবেন্দ্রনাথ বস্তুত নিষ্ক্রিয় এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন রয়ে গেলেন।[১২]

এসব কৃতিত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও ব্রাহ্ম আন্দোলন একটি মস্ত বড় ধাক্কা খেলো যখন সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজের গণতন্ত্রায়নের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। কেশবচন্দ্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসনকে শাস্ত্রের উপরে স্থান দিতে চাইলেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথ তখনো শাস্ত্রকেই কর্তৃত্বের উৎস বলে মনে করতেন। প্রধানত যুক্তির ভিত্তিতে কেশব ও তাঁর অনুবর্তীরা জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথা বিলোপ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সংস্কার চালু করতে চাইলেন। তাঁরা আরো চাইলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের অবসান হোক এবং 'সমাজে' গণতান্ত্রিক প্রশাসন চালু হোক।[১৩] দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের কাছে এগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই এই সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো সমাজের বিভক্তি। ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। এই বিভক্তির পর দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন পুরনো সমাজ, যা এখন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত, তা একটি উপাসকগোষ্ঠীতে পর্যবসিত হলো এবং তাদের কোনো সামাজিক, শিক্ষা সংক্রান্ত ও ধর্মপ্রচার বিষয়ক কার্যক্রম থাকলো না।[১৪]

সমাজের এই বিভক্তি মহর্ষির প্রভাব থেকে কেশবকে মুক্ত করলো। দক্ষিণ এশিয়ার নানা অঞ্চলে আন্দোলনের প্রসার ঘটানো ছাড়াও কেশবের কাজকর্মের একটি আন্তর্জাতিক দিক ছিল। তিনি পাশ্চাত্যের একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং নিজের বিতর্ক ও বক্তৃতায় যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্মের প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ প্রকাশ করতেন। ১৮৭০ সালে তাঁর লন্ডনভ্রমণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। রানী ভিক্টোরিয়া (রা. ১৮৩৭-১৯০১)

---

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার. *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৭৫), ১৭২।

১২. চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* ৩৭১-৭৫।

১৩. মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১৭৩-৭৪; দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিতে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্তির বিস্তৃত বিবরণের জন্য পড়ুন, শিবনাথ শাস্ত্রী, *হিস্ট্রি অব দ্য ব্রাহ্মসমাজ* [ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস], (১৯১১-১২), ২য় সং, (কলকাতা ১৯৭৪), ৯৬-১১৫।

১৪. চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* ৩৭২-৭৬।

ও জন স্টুয়ার্ট মিল সহ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং বিলেতে তিনি একজন অতি জনপ্রিয় ও সম্মানিত আগন্তুক হিসেবে বিবেচিত হন। ঐ বছরই দেশে ফিরে তিনি একটি বিস্তারিত সমাজসেবা কর্মসূচি হাতে নেন, যার লক্ষ্য ছিল নারী ও শ্রমিক।

ভাঙন : প্রজ্বলিত স্বদেশপ্রেম ও বিকাশমান জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডলে বৃটেন, বৃটিশ শাসন ও খৃস্টধর্মের প্রতি কেশবের অনুরাগ স্পষ্টতই অনভিপ্রেত ছিল এবং তাঁর জনপ্রিয়তা কমে আসতে লাগলো। ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আত্মপরিচয়ের মূল প্রশ্নটি সামনে এলো, তখন কেশব ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদেরকে অহিন্দু বলে ঘোষণা করলেন। এভাবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূলধারা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। তাছাড়া অবতার, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি কতিপয় বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস ও আচরণ গ্রহণ করে কেশব ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদ থেকেও যথেষ্ট দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর তরুণ অনুসারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এ প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৮৭৮ সালে সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কুচবিহার বিবাহের সময়। নিজের ধর্মের অনুশাসন এবং ১৮৭২-এর সিভিল ম্যারেজ আইন (যে আইন পাশ করানোর জন্য কেশব সংগ্রাম করেছিলেন) দুই-ই লঙ্ঘন করে কেশব তাঁর নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিলেন কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার সাথে হিন্দু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে,যা ছিল ব্রাহ্ম বিবেচনায় পৌত্তলিকতার নামান্তর। তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই যে, কেশব ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন বলে দাবি করে তাঁর আদর্শচ্যুতিকে বৈধ করার প্রয়াস পেলেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে তাঁর সম্প্রদায় আবারো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিদ্রোহীরা ১৮৭৮ সালের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। এই ঘটনার পর কেশব তাঁর ধর্মকে ঢেলে সাজিয়ে 'নব বিধান' নামে এক সমন্বয়ী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করলেন, যার মধ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম থেকে নেয়া উপাদানসমূহের সাথে সক্রেটিস, কার্লাইল, এমার্সন প্রমুখ মহৎ চিন্তাবিদের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। এই নতুন ধর্মমতকে যতোই বিশ্বজনীন ও নানা সূত্রজাত মনে হোক না কেন, এখানেও কেশবের রাজনৈতিক আনুগত্যের নীতি এবং খৃস্টীয় বিশ্বজনীনতার নামে ভারতে বৃটিশ শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টার প্রতিফলন ছিল। তাঁর সাময়িকী *নববিধান*-এ লেখা হয়েছিল :

> বৃটিশ ভারত শাসন করছেন যীশুখৃস্ট বৃটিশ সরকার নয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য জয় করা ও ধরে রাখার জন্য ইংল্যান্ড ঐ শক্তিমান মহাপুরুষের জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক দুর্জয় নৈতিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। ভারতবর্ষরূপ এই উজ্জ্বল মহামূল্যবান মুকুটের যোগ্য ছিলেন একমাত্র যীশুই এবং এটি তাঁরই থাকবে।[১৫]

---

১৫. *নিউ ডিসপেনসেশন*, উদ্ধৃত, এফ. ম্যাক্সম্যুলার, *রামমোহন টু রামকৃষ্ণ* [রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ], (১৮৮৪-৯৯), (কলকাতা ১৯৫২), ৬২।

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আবেগ যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই সময়ে এরকম একটি ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই বেশি অনুসারী সংগ্রহ করতে পারে নি।[১৬] ১৮৮৪ সালে কেশবের অকালমৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ধর্ম ও অনুসারী দলটি অচিরে ক্ষীয়মান হয়ে আসতে লাগলো।

বস্তুত কেশবচন্দ্র সেন উনিশ শতকে বাংলায় হিন্দু জাগরণের ইতিহাসে এক কালবিরুদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কারণ তিনি সত্তর ও আশির দশকে এমন সব সমস্যা ও ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে বিশ ও তিরিশের দশকের বিষয় ছিল। ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু কেশবচন্দ্রের মতো যুগের চেতনা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় নি। গোষ্ঠী হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল 'সমাজে' যৌথ নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের চর্চা এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করে যাওয়া। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খাপ খাইয়ে নেয়ার এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও ব্রাহ্মরা আর যুগের নেতা রইলেন না। সময়ের প্রবণতায় দেশ ও জাতির সেবার এক সাধারণ প্রতিযোগিতায় তাঁরাও সামিল হলেন মাত্র। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁদের আর দেয়ার কিছু ছিল না। কেশবচন্দ্রের *নববিধান* এ বিষয়ে শেষকথা বলে দিয়েছিল। বস্তুত, সংগঠন হিসেবে সাধারণ বাহ্মসমাজ প্রধানত সেক্যুলার ছিল এবং তাতে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার অভাব ছিল। আবার ধর্মীয় দিক থেকে একেশ্বরবাদে বদ্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রতিমাদির প্রতি পরিপূর্ণ বিরাগ এমন এক কানাগলির সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও (১৮৪১-৯৯) পরিত্যাগ করে তাঁর পূর্বতন বৈষ্ণব ধর্মে ফিরে যান ১৮৮৮ সালে। এই ঘটনা ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার অবসান এবং ব্রাহ্ম একরূপতার উপরে হিন্দু বহুত্ববাদের বিজয় সূচিত করে। ১৮৮০-এর দশকের শেষে ধর্ম হিসেবে ব্রাহ্মধর্ম শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদের সংখ্যাও কমে যেতে থাকে।

সর্বেশ্বরবাদ : ধর্মসঙ্কটের নব্যহিন্দু সমাধান

পটভূমি : আদি ব্রাহ্ম সূত্রপাত

ব্রাহ্মধর্ম ছিল চিরায়ত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ এবং এই চ্যালেঞ্জ তথা খৃস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এই ঘটনা 'নব্যহিন্দু আন্দোলন' নামে পরিচিত। এটি কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং কিছু গুরত্বপূর্ণ সংস্কারও এর অন্তর্গত ছিল। এই আন্দোলন খাঁটি সমালোচনার আলোকে এবং দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মে এক সংস্কার আনয়ন করে। সাধারণ হিন্দু ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মরা এবং এমনকি 'হিন্দু ক্যাথলিক' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও নব্যহিন্দু আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। আসলে আদি ব্রাহ্মরাই ষাটের দশকের শেষাংশে ও

সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্দোলনটির সূচনা করেন। পরে হিন্দু সংস্কারক গোষ্ঠীগুলির অভ্যুদয় হয়।

এই আপাত অসঙ্গতির পশ্চাতে যে কারণ বিদ্যমান ছিল তা হচ্ছে এই যে, ঐতিহাসিকভাবে নব্যহিন্দু আন্দোলন ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সঙ্গে অবিভাজ্য ছিল এবং ঐ দু'টি জিনিসই চার দশক ধরে সমান্তরালভাবে বিকশিত হওয়ার পর বিশ শতকের প্রথম দশকে এসে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিশে যায়। সিপাহী ও নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে ১৮৬০-এর দশকে এক ভারতীয় জাতির ধারণা কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্মদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং একটা সত্যিকারের 'জাতীয়' চেতনা নগরীকে পেয়ে বসে। দেবেন্দ্রনাথের দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪১-৯৪) সহ বেশ কয়েক জন আদি ব্রাহ্ম এই পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৮৬৫ ও ১৮৬৭-এর মধ্যে নবগোপাল *ন্যাশনাল পেপার* [জাতীয় পত্রিকা], ন্যাশনাল সোসাইটি [জাতীয় সমিতি] এবং ন্যাশনাল ফেয়ার [জাতীয় মেলা]-এর জন্ম দেন। জাতীয় মেলা ১৮৬৭ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর বেশ বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং তা নবলব্ধ জাতীয়তাবাদের অনুভূতিকে বিপুলভাবে উজ্জীবিত করে। এই আবহাওয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সমালোচনাজর্জর হিন্দুধর্মের জন্য সুবর্ণসুযোগ এনে দেয় নিজেকে জাতীয় ধর্ম বা সংস্কৃতি হিসেবে সগৌরবে পরিচয় দেয়ার। 'হিন্দু' এখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের নাম না হয়ে সমগ্র ভারতীয় জাতির নাম হয়ে দাঁড়ালো। বস্তুত 'জাতীয় মেলা' জনসাধারণের কাছে 'হিন্দু মেলা' নামে পরিচিত হয় এবং সেভাবেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

জাতীয় আত্মপরিচয়ের এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মরা সাথে সাথে নিজেদের হিন্দু বলে ঘোষণা করলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই নব্যহিন্দু আন্দোলনে প্রথম মঞ্চ তথা পথপ্রদর্শক চিন্তাবিদ সরবরাহ করেন; বস্তুত বলা চলে, রাজনারায়ণ বসু নিজেই আন্দোলনের উদ্বোধন করেন, যখন ১৮৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ দেবেন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত নবগোপালের ন্যাশনাল সোসাইটির অধিবেশনে তিনি "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" শীর্ষক এক নিবন্ধ পাঠ করলেন। এ প্রবন্ধ রচনার পটভূমিতে ছিল কেশবচন্দ্র সেনের চমক সৃষ্টিকারী ঘোষণা যে তাঁর দলের ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ নিজেদের হিন্দু পরিচয় পুনর্ব্যক্ত করে হিন্দুত্বকে ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি বলে বর্ণনা করেন এবং ঘোষণা দেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের পরিমার্জিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনারায়ণের বক্তৃতা ভারতে ও ইংল্যান্ডে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং তাঁকে হিন্দুধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে সনাক্ত করা হয়। সাধারণ হিন্দুরা তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান, কারণ তাঁরা তাঁর বক্তৃতা থেকে খুবই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং খৃস্টধর্মের সাথে সাংস্কৃতিক বিরোধে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। এভাবে রাজনারায়ণ,

দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল এই তিন আদি ব্রাহ্মনেতা অনেকটা আত্মপরিচয়ের সঙ্কটজাত রাজনৈতিক তাগিদেই নব্যহিন্দু আন্দোলনের উদ্বোধন ঘটালেন। একবার শুরু হওয়ার পর আন্দোলন যথারীতি তার স্বকীয় গতি লাভ করলো এবং অচিরেই তা চলে গেল সাধারণ হিন্দুদের হাতে, যারা এখন নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য বুদ্ধিজীবী সরবরাহে সক্ষম ছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক হিন্দুধর্ম : ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রধান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), যিনি তাঁর মাসিক *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র অনুকূলে সমালোচনা প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ ভারতে শক্তিশালী ও নতুন তেজে উদ্দীপ্ত এক হিন্দু 'জাতি'র যে কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিম তার বিশেষ প্রশংসা করেন। হিন্দুধর্মের রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কিত রাজনারায়ণের অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে *বঙ্গদর্শন-এর* পাতায় যুক্তিবাদী ভঙ্গিতে ভারতের অতীত পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেই ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সম্পাদক ও প্রধান লেখক হিসেবে ১৮৭৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ধারাবাহিক নিবন্ধমালায় বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগীরা যেসব হিন্দু রাজা মুসলিম আক্রমণকারীদের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁদের কাপুরুষত্বের কলঙ্ক মোচন করতে সচেষ্ট হন এবং প্রাচীনকালের হিন্দুদের গুণাবলী তথা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের মহিমাকীর্তন করেন। তবে পুনরুত্থানবাদী চরিত্রের উৎকট অন্ধ স্বাদেশিকতার পরিবর্তে তাঁরা সমালোচনাত্মক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাই তাঁরা প্রাচীন ভারতীয়দের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথাও যথারীতি আলোচনা করেন, যেমন জাতীয় ঐক্যচেতনার অভাব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি, বাগ্মিতার পরিবর্তে নির্জনতা ও চিন্তাশীলতাকে পছন্দ করা, নারীস্বাধীনতার অনুপস্থিতি, পরবর্তী ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব, নিম্নবর্গের মানুষদের বঞ্চনা, এবং জাতিভেদপ্রথার মাধ্যমে বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।[১৭]

এসব কিছুর ভিতরেই একটা জাতীয়তাবাদী সুর বিদ্যমান ছিল এবং ১৮৭০-এর দশকে সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের যে ঐকতান চলছিল তার সাথে তাল রেখে বঙ্কিমের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা একটি স্বদেশপ্রেমের ধারা ধরে এগোতে থাকে। *বঙ্গদর্শন-এ* প্রকাশিত 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বাঙালি হিন্দুর রণরঙ্গিনী মাতৃদেবী দুর্গার মাটির প্রতিমায় বঙ্কিম মাতৃভূমি বাংলাকে তার সুবর্ণময় চিরকালীনতায় অবলোকন করেন। এই কল্পনার আরো জোরালো প্রকাশ ঘটে ১৮৭৫

---

১৭. এসব মতামত *বঙ্গদর্শন-এর* যেসমস্ত নিবন্ধে ব্যক্ত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল 'ভারত-কলঙ্ক' (এপ্রিল-মে ১৮৭২), 'মানুষ জাতির মহত্ত্ব কিসে হয় ?', (মে-জুন ১৮৭২), 'বঙ্গদেশের কৃষক' (আগস্ট ১৮৭২, মার্চ ১৮৭৩) এবং 'সাম্য' (১৮৭৪-৭৫), 'ভারত-মহিলা' (জানুয়ারি-এপ্রিল ১৮৭৬)।

সালে রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত বাংলা গান 'বন্দে মাতরম্' [মাতাকে বন্দনা করি]-এর মাধ্যমে, যে গানের মোহনীয় সুরে বাংলা মাকে সর্বশক্তিশালিনী দুর্গাদেবী হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' পরে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত রাজনৈতিক উপন্যাস *আনন্দমঠ*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ উপন্যাসে 'সন্তান'রা তাদের দেশকে সেবা করেছে মাতৃদেবী হিসেবে, যিনি সকল আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি।

ইতিমধ্যে উক্ত ধারণাটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪)-এর হাতে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ভূদেব ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও কবি মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত হিন্দুধর্মে অবিচল থাকেন। পুরাণ ইতিহাসের এক উচ্চতর রূপ, যা অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিকতর নির্ভুলভাবে ভারতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটায়—এই মত ব্যক্ত করে ভূদেব ১৮৭৬ সালে 'ধর্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা করতে উদ্যত'[১৮] হয়ে এবং 'হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন'[১৯] -এর উদ্দেশ্যে *পুষ্পাঞ্জলি* নামে এক নবপুরাণ প্রকাশ করেন। এতে লেখকের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বর্ণনা করা হয় এক অনন্য দেবী রূপে, যিনি সতত তাঁর অসংখ্য সন্তানকে মাতৃভাবে অন্নদান করে চলেছেন।[২০] গোটা বইটিতে ভূদেব *বেদ-এর* উল্লেখ খুব কম করেছেন এবং কখনো *বেদ*-এর অপৌরুষেয়ত্বের কথা বলেননি। পরিবর্তে তিনি প্রকৃতিকেই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ বলে ঘোষণা করে বলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রসমূহের অর্থ অনুধাবন করতে হলে ঐ গ্রন্থখানিকে আগে বুঝে নিতে হবে।[২১]

পুরাণে দেবদেবীবাহুল্যের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ভূদেব বলেন যে, বিভিন্ন ভাব ও বস্তুর প্রতীকী উপস্থাপনার এটি একটি রূপকাশ্রিত কৌশলমাত্র। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আচরিত ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে যে দেশে তার উদ্ভব ঘটেছে সে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে। জীবদেহের পরিবর্তন এবং ভূগোল ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মের বিবর্তন ঘটে। ভূদেবের মতে, ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ হওয়ায় এই দেশ সকল ধর্মের প্রকৃত সমন্বয় সাধনে সক্ষম। মানুষের ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতি-গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ ভৌগোলিক পার্থক্য; এবং মানব জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করা কঠিন নয়। স্বদেশবাসী মানুষের প্রতি তথা সকল সৃষ্টবস্তুর প্রতি ভালবাসা এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভূদেব পুরাণে কথিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্মের চক্রসমূহের অন্তহীন পরম্পরার পুনরুল্লেখ করেন। এক ধরনের আধ্যাত্মিক

---

১৮. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *পুষ্পাঞ্জলি*, *ভূদেব রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ৩য় পরিবর্ধিত সং, (কলকাতা ১৯৬৮), ৩৭৬।

১৯. উদ্ধৃত, শিপ্রা লাহিড়ী, *ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৭৬), ১৯৯।

২০. *ভূদেব রচনাসম্ভার*, ৩৮১।

২১. *তদেব*, ৩৭৯।

ডারউইনবাদের অবতারণা করে তিনি আরো বলেন, পশুত্ব থেকে বিবর্তিত হয়ে যেমন মানবতা এসেছে, তেমনি তা উদ্বর্তিত হচ্ছে দেবত্বের দিকে। অবশেষে ভূদেব তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনার উপসংহার টানেন এই অজ্ঞেয়বাদী মন্তব্য দিয়ে যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাসহ কেউই সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সত্তার রহস্য অবগত নন।[২২]

এভাবে ভূদেব পুরাণের গুরুত্ব, সকল সৃষ্টির একত্ব, মানুষের দেবত্ব এবং বিশ্বে পরিবর্তনের বৃত্তাকার বিন্যাসের প্রতি জোর দিয়ে নব্যহিন্দু ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপন করলেন। পরে এই ধারণাগুলি সুসংহত করে তিনি তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) গ্রন্থের শক্তিশালী নিবন্ধমালায় আরো সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি উপনীত হন এক বিশাল সর্বেশ্বরবাদে, যা ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ মানব জাতির জন্য ধর্মসমন্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।[২৩] *পুষ্পাঞ্জলি* নিশ্চিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের উপর ছাপ ফেলেছিল এবং তিনি ১৮৮২ সালে মন্তব্য করেন যে, হিন্দুদের যেসব কাহিনীকে ইউরোপীয়রা উপহাস করে থাকেন, *পুষ্পাঞ্জলি* প্রণেতার "সহৃদয় আলোচনা"র ফলে সেগুলি থেকে "এমন সব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে, যা মহত্ত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন কিছুর চেয়েই হীন নয়।"[২৪]

বাংলাকে মাতৃভূমিরূপে বন্দনাকারী 'বন্দে মাতরম্' গানটির অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* (১৮৮২) সত্যিকার অর্থে বাংলার শাক্ত ঐতিহ্য থেকে প্রশস্ত ভারতীয় হিন্দুধর্মের মহাকাব্যিক ঐতিহ্যে সরে যাওয়ার সঙ্কেত দেয়। *আনন্দমঠ ভগবদ্গীতা* প্রচারিত 'নিষ্কাম কর্ম'-এর আদর্শভিত্তিক জঙ্গি হিন্দু স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার প্রয়াস পায়। বঙ্কিম তাঁর অত্যন্ত অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপূর্ণ উপন্যাস *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪)-তে নিষ্কাম কর্মের ধারণাটিকে আরো বিস্তৃত করেন। ঐ উপন্যাসের উপসংহার টানা হয়েছে গীতায় কৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ঘোষণা দিয়ে, যেখানে তিনি বলেন যে, দুর্জনের বিনাশ, সজ্জনের ত্রাণ ও পৃথিবীতে সদ্ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫] কৃষ্ণ ও গীতার উল্লেখের ফলে বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম আর মাতৃদেবীসেবক বঙ্গভূমিতে আবদ্ধ রইলো না, বরং এক প্রশস্ত সর্বভারতীয় মাত্রা গ্রহণ করলো।[২৬]

---

২২. *তদেব*, ৩৭৮-৭৯, ৪০৪, ৪০৭-১৩, ৪২৮-৩৩, ৪৪০-৪১।

২৩. *তদেব*, ১৫৪, ১৫৮, ২৬৩।

২৪. দেখুন, *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বঙ্কিমের চিঠি, (২৮ অক্টোবর ১৮৮২), পুনর্মুদ্রিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (*কালেকশন অব ইংলিশ ওয়ার্কস্* [ইংরেজি রচনার সংকলন]), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৬৯), ২১২।

২৫. *ভগবদ্গীতা*, ৪.৮; দেখুন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ২ খণ্ড, (কলকাতা ১৯৫৬, ১০ম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮), ১ : ৮৭২।

২৬. এক নতুন হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হিসেবে বাংলা থেকে সর্বভারতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরণের ধারণা উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী, *দি এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ : ইন্ডিয়া বিটুইন ১৮৯০ এ্যান্ড ১৯১০* [চরমপন্থী চ্যালেঞ্জ : ১৮৯০ ও ১৯১০-এর মধ্যবর্তীকালে ভারতবর্ষ], (নতুন দিল্লী ১৯৬৭), ৪।

জাতিগোষ্ঠীগত ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় শত্রুভাব। ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে রেভারেন্ড ডব্লিউ. ডব্লিউ. হেস্টির সাথে ধর্ম হিসেবে হিন্দুত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে এক বিতর্ক লড়তে হয়।[২৭] হিন্দু উপাসনায় প্রতিমার ব্যবহার এবং ব্রাহ্মণদের বেদান্তদর্শনের উপর হেস্টির আক্রমণের জবাবে বঙ্কিম তাঁর কথিত 'র‍্যাশনাল হিন্দুইজম' বা যুক্তিসিদ্ধ হিন্দুধর্মের এক রূপরেখা উপস্থাপন করেন। এই ধর্ম *বেদ* ও *বেদান্তের* উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং প্রতিমাপূজা ও জাতিভেদপ্রথা ছিল এর 'আবরণ' মাত্র। *ভগবদগীতা, পুরাণ* ও ভক্তিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্কিম ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈততা এবং প্রেমের মাধ্যমে তাদের মিলনের তত্ত্বই হিন্দুধর্মের সারবস্তু। আলোচনায় বিশ্ব-আত্মার প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণেরও উল্লেখ থাকে। বিতর্কে বঙ্কিম অবশ্য জাগতিক বিষয়ের অনুসন্ধানে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব সানন্দে মেনে নেন।[২৮] এখানে স্মরণীয়, ১৮৭০-এর দশকে ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম ইউরোপের ভৌত ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগপৎ বিচরণ করেছিলেন।[২৯]

হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক সত্যিই বঙ্কিমের নতুন হিন্দুধর্মের একটা রূপরেখা প্রস্তুত করে দেয়। পরে *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬-৯২) ও *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮) নামে দুই বৃহদাকার গ্রন্থে বঙ্কিম ঐ রূপরেখার পুষ্টি ঘটান। এই নতুন ধর্ম ছিল একটি সমন্বয়ী মত, যার আধ্যাত্মিক মূল প্রাচীন ভারতে প্রোথিত থাকলেও আধুনিক ইউরোপ থেকে নেয়া ধ্যান-ধারণা দ্বারা এর সর্বাঙ্গ পুনর্গঠিত। *কৃষ্ণচরিত্রতে* বঙ্কিম চেষ্টা করেন কৃষ্ণকে তুলে ধরতে এক ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে, যিনি ইতিহাসের ঊষালগ্নে ভারতে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের সূত্রপাত করেছিলেন। বঙ্কিম *মহাভারতে* সন্নিবিষ্ট লোককাহিনী, পুরাণকথা ও পরবর্তী প্রক্ষেপের আবর্জনা সরিয়ে কৃষ্ণের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ঘটান এবং তাঁকে 'হিন্দুদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও মহত্তম' বলে সনাক্ত করেন।[৩০] কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে বঙ্কিম তাঁকে বুদ্ধ বা যীশুর মতো অত্যুচ্চ ঐতিহাসিক প্রফেটের

২৭. প্রেসবাইটারিয়ান মিশনারি এবং জেনারেল এ্যাসেম্বলি'জ ইন্সটিটিউশনের অধ্যক্ষ হেস্টি কলকাতার একটা বড় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক রীতি প্রত্যক্ষ করে ভীষণ বিরক্ত হন। ১৮৮২ সালের ২৩,২৬,২৯ *সেপ্টেম্বর* তারিখে *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি চিঠিতে তিনি হিন্দুধর্মের উপর তাঁর আক্রমণ শুরু করেন। এই চিঠিগুলির যে জবাব বঙ্কিম দিয়েছিলেন তা এবং হেস্টির প্রত্যুত্তর ঐ একই কাগজে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

২৮. *বঙ্কিম রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড, ২০৯-১৮।

২৯. *বঙ্গদর্শন-এ* বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলি *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫) নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়; আর বেন্থাম, মিল ও কোঁতের প্রভাবে লিখিত মানুষ ও সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী পরে *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭-৯২) নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৩০. বুদ্ধ সম্পর্কে রিস ডেভিড্‌সের উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণের জন্য গ্রহণ করেন, *'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী* ২: ৫৮৩।

হিন্দু প্রতিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কৃষ্ণকে 'একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট ও রামচন্দ্র' বলে অভিহিত করেন।[৩১]

এই পুনর্গঠিত কৃষ্ণ ছিলেন *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বঙ্কিম 'অনুশীলন ধর্ম' নামে হিন্দু- ধর্মের যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তারই দৃষ্টান্তস্থল। 'অনুশীলন' ছিল ইউরোপীয় দৃষ্টবাদ ও উপযোগবাদ দ্বারা পরিমার্জিত হিন্দুধর্ম থেকে নির্মিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই নতুন ধর্মমতের নির্দিষ্ট রূপ দান করতে গিয়ে বঙ্কিম সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে উপাদান নেয়ার সময় খুব সতর্কভাবে সেগুলি যাচাই করেন এবং হিন্দুধর্মের আধুনিক সমালোচনাসমূহের কথা বিশেষভাবে মনে রাখেন। এভাবে অনুশীলনধর্মে বঙ্কিম বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করেন; মনুস্মৃতিকে বিপথ প্রদর্শনকারী ক্ষতিকর বস্তু, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালি স্মৃতিকার রঘুনন্দনকে জনহিতবিহীন বাজে জিনিস বলে প্রত্যাখ্যান করেন; স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; এবং তাঁর নিজ সময়ে হিন্দু সমাজে যে অসংখ্য লৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করেন।[৩২] বস্তুত বঙ্কিম সুস্পষ্টভাবে শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮)-র পুনরুত্থানবাদী হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেন।[৩৩] উল্লেখ্য, তর্ক-চূড়ামণি চাইতেন মধ্যযুগের শেষভাগে প্রচলিত হিন্দুধর্মের রূপটির আক্ষরিক পুনঃস্থাপন। তাই বলা হয়, নব্য হিন্দুবাদের প্রফেট বঙ্কিম ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার চেয়ে মোটেই কম বিদ্রোহী ছিলেন না।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ধর্ম ছিল এমন একটা জিনিস, "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়...।"[৩৪] এই ধর্মের ভিত্তিমূলে ছিল না কোন দৈববাণী : "আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করি না।" আবার তিনি স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) বা ঈশবাদে (Deism) বিশ্বাসী ছিলেন না এবং মরণোত্তর অস্তিত্বের আনুমানিক ধারণাকে তাঁর ধর্মের ভিত্তি করতে চান নি। তিনি বলেন, "ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি।"[৩৫] এই নৈসর্গিক ভিত্তি আর কিছুই নয়, বরং মানুষ যে সতত সুখের পিছনে ধাবিত হয় সেই জাগতিক ব্যাপারটি। মানুষের সর্বোচ্চ সুখ বলতে বুঝতে হবে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও নান্দনিক বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু সেজন্য দরকার একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান যাতে ঐ বৃত্তিগুলির মধ্যে কোন সংঘর্ষ না ঘটে এবং একটি সুসমঞ্জস ও সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত হয়। এই ভারসাম্য

---

৩১. *ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী* ২, ৫৯৪।

৩২. এসব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, কৃষ্ণচরিত্র* এবং *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে পাওয়া যায়। *বঙ্কিম রচনাবলী* ২ : ৫০৭, ৬০৫, ৭৭৬-৭৭৭, ৭৭৯।

৩৩. *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী* ২ : ৭৭৬।

৩৪. *তদেব,* ৭৭৮।

৩৫. *তদেব,* ৭৯২।

লাভের উপায় হচ্ছে অন্য সকল বৃত্তিকে 'ভক্তি' নামক প্রবৃত্তির অধীনে স্থাপন করা। আর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন এমন এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসাই ভক্তি। এমন সর্বেশ্বরবাদমূলক ঈশ্বরের প্রতি এরূপ ভক্তি গোটা মানব জাতির প্রতিই শুধু নয়, ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা অপরিহার্য করে তোলে। অপরপক্ষে একেশ্বরবাদী ঈশ্বর, যিনি মানুষের জগৎ থেকে অনেক দূরে বিশ্বকে অতিক্রম করে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে একটি বহিঃস্থিত কর্ম, যার সঙ্গে মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি স্বভাবজাত স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। সর্বেশ্বরবাদ ভক্তিকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি সাধারণ ও যুগপৎ প্রেমে পরিণত করলো। "অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে"[৩৬] —খৃস্টান ও ব্রাহ্ম প্রতিদ্বন্দ্বীদের একেশ্বরবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েই যেন বঙ্কিম এ কথাটি বলেন। মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়াই উত্তম ঈশ্বর-আরাধনা। আর বহুল প্রচলিত যেসব উপাসনা তা একেশ্বরবাদী কিংবা বহুদেববাদী হোক, পৌত্তলিক হোক কিংবা না হোক, 'সেসব উপাসনা হচ্ছে একটি গৌণ বিষয়, যা কেবল উপাসকের চিত্তশুদ্ধির সীমিত প্রয়োজনই মাত্র সিদ্ধ করে।'[৩৭]

মহাভারতভিত্তিক ধর্মের তাগিদেই বঙ্কিমকে ভগবদগীতার একটি নতুন ভাষ্য রচনার দায়িত্ব নিতে হলো, যাতে 'তিনি দেখাতে পারেন যে তাঁর নিজের ধর্মীয় ধারণাসমূহের শিকড় যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণের উপদেশবাণীর মধ্যেই নিহিত ছিল। নিঃস্বার্থ মানবসেবাতেই যে ঈশ্বরভক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর এই ধারণাটিকে গীতার 'নিষ্কাম কর্ম' মতবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দরকার ছিল। গীতার সনাতনী ভাষ্যকারেরা 'কর্ম' শব্দের অর্থ করেছিলেন বৈদিক যাগযজ্ঞ। বঙ্কিম স্বীয় ভাষ্যে তাঁদের থেকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। 'কর্ম' শব্দের উক্ত অর্থ যে কেবল সেকেলে ছিল তা-ই নয়, গীতায় শব্দটির সামগ্রিক প্রয়োগের আলোকে তা অন্যায্যও ছিল বটে। আর গীতা এমন একটি ধর্মগ্রন্থ, যা বেদের সমালোচনায় সোচ্চার। বঙ্কিম 'কর্ম' শব্দের জাগতিক ও আভিধানিক অর্থ 'কাজ' হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং বুঝলেন যে, এটি একটি জীবনবিধান থেকে কম কিছু নয়। 'কর্ম' এখন খুব ভালভাবেই নিঃস্বার্থ মানবসেবাকেও বোঝাতে পারলো। এই নতুন ব্যাখ্যার ফলে হিন্দুধর্মের আদর্শের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। যে ধর্ম এতদিন ব্যক্তিগত মুক্তির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত ছিল, তা এখন সমাজের কাজ হাতে নিতে সক্ষম বলে দেখানো হলো। যে মানবিক সেবার আদর্শ অনেক শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল, এভাবে বঙ্কিম তা পুনরুদ্ধার করলেন। ভারতের অবনতির ব্যাখ্যাতেও তিনি এই

---

৩৬. *ধর্মতত্ত্ব*, বঙ্কিম রচনাবলী ২ : ৬৪৯।

৩৭. বঙ্কিমের ধর্মের এই সংক্ষিপ্তসার প্রধানত তাঁর *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থভিত্তিক এবং রাখালচন্দ্র নাথ, *দ্য নিউ হিন্দু মুভমেন্ট ১৮৮৬-১৯১১* [নব হিন্দু আন্দোলন ১৮৮৬-১৯১১] (কলম্বিয়া, মিসৌরি ১৯৮২), ৮৫-৯০ থেকে শব্দান্তরিত।

বিস্মৃতিকে যুক্ত করতে চাইলেন : এদেশের ধর্মপরায়ণ মানুষেরা চিরদিন কর্মহীন মানুষ হিসেবে থেকে দুঃখজনকভাবে নিজেদেরকে 'জ্ঞানমার্গের' অনুসারী বলে দাবি করে এসেছেন।[৩৮]

সমকালীন রাজনীতিসঞ্চারিত নব্যহিন্দুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন চলছিল তা আরো জোরদার হয় গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের বঙ্কিমকৃত পুনর্ব্যাখ্যার ফলে। এই নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯), যিনি ১৮৬৭ সালের পরে কেশবচন্দ্র সেনের আমূল সংস্কারবাদী ব্রাহ্মধর্মে প্রবর্ধিত বৈষ্ণব প্রভাবের জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর পূর্বেকার চৈতন্য-বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের সাম্য ও আবেগের চেতনার সঙ্গে নবগৃহীত ধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কারবাদের সংযুক্তি ঘটিয়ে গোস্বামী ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে ও ১৮৭০-এর দশকে পূর্ববাংলার নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর হিন্দু যুবকদের মধ্যে কেশবের ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গোস্বামীর বৈষ্ণব ভাব বেশি প্রকট হয়ে পড়লে তিনি ১৮৮৬ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদ থেকে বিতাড়িত হন। তারপর নব্য বৈষ্ণববাদের একজন গতিশীল গুরু হিসেবে গোস্বামী অনেক অনুসারী সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যৎ স্বদেশী আন্দোলনের চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮), এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯)।[৩৯] এঁদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) উনিশ শতকের শেষদিকে নব্যবৈষ্ণববাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নিজেকে যুগপৎ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বলে ঘোষণা করে পূর্ববাংলার বরিশালনিবাসী এই তাপসপ্রকৃতির সামাজিক সক্রিয়তাবাদী ১৮৮৭ সালে *ভক্তিযোগ* নামে ব্যবহারিক ধর্মচর্চার এক বিধিপুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ নব্যহিন্দুভাবাপন্ন দেশপ্রেমিক গৃহস্থদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রচারমূলক হিন্দুধর্ম : রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

অশ্বিনীকুমারের তিন গুরুর মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে নব্যহিন্দুবাদের সর্বপ্রধান গুরু হিসেবে আবির্ভূত হন। যে সময়ে

---

৩৮. এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিবরণ বঙ্কিমের *শ্রীমদভগবদ্‌গীতা* (আংশিক ভাষ্য), *ধর্মতত্ত্ব* ও *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থভিত্তিক এবং নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ৯০-৯৩ থেকে আহৃত। দেশের শিক্ষিত সমাজের উপর বঙ্কিমের *গীতার* বিরাট প্রভাব পড়েছিল। মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের কাছে যথাক্রমে কোরান ও বাইবেলের যে মর্যাদা, *গীতা* শীঘ্রই অনুরূপ মর্যাদার স্থান গ্রহণ করলো। বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো আধুনিক ভাষ্যকারদের কৃত *গীতার* ভাষ্যগুলির প্রত্যেকটিই কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের অনুসরণ করে। *তদেব*, ৯২-৯৪।

৩৯. সুমিত সরকার, *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮* [বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৩-১৯০৮], (নতুন দিল্লী ১৯৭৩), ২৮।

ভূদেব ও বঙ্কিম তাঁদের ভাবনাগুলিকে স্পষ্ট রূপদান করতে ব্যস্ত ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন মারাত্মক আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন কলকাতার আধ্যাত্মিক জীবনে অন্য অনেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করছিলেন রামকৃষ্ণ। কলকাতার উত্তরে নবপ্রতিষ্ঠিত (১৮৫৫) দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রায়-নিরক্ষর পুরোহিত রামকৃষ্ণ উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারকবর্গের সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম ছিলেন। হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্য নেতাদের মতো তাঁর ইংরেজি বা সংস্কৃত শিক্ষা ছিল না, ইউরোপীয় ভাবধারার সাথে আদৌ কোন পরিচয় ছিল না, ছিল না কোন নাগরিক কৃত্রিমতা। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় অবস্থিত তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় তিনি কথা বলতেন। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি বহু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত তাঁর ধ্যান-ধারণার ছাপ ফেলেছিলেন; কারণ সেগুলি ছিল যেমন অনন্য, তেমনি অপরাপর মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্য। কলকাতার অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন আদিম সরলতায় মণ্ডিত এক সাধু পুরুষকে, যিনি পুরাগত ও আধুনিক কালের সকল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। এসব জিজ্ঞাসুদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, যিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করতে গিয়ে রামকৃষ্ণের মধ্যে খুঁজে পান মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো একজন সত্যিকার আধ্যাত্মিক মানুষকে। ১৮৭৫ সালের দিকে কেশবচন্দ্র তাঁর *ইন্ডিয়ান মিরর* ও *সুলভ সমাচার* সাময়িকী দু'টিতে দক্ষিণেশ্বরের ঐ সাধক সম্পর্কে বিশেষ প্রচারণা দেন। রামকৃষ্ণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর কাছে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃস্টান, সুফি, সাধু, পণ্ডিত, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবী ও সব রকম সাধারণ আগন্তুকের ভিড় বাড়তে থাকে। এঁরা বছরের পর বছর তাঁর ধর্মালোচনা শুনতে থাকেন। তিনি নিজেও অনেক ব্যক্তির সাথে দেখা করে এবং অনেক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে মতবিনিময় ও অন্যদের মূল্যায়ন করতেন।

এই প্রক্রিয়ায় রামকৃষ্ণ অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ প্রথম সারির ব্রাহ্মগণ। ব্রাহ্মধর্মে কেশবের আগেই বিজয়কৃষ্ণ ভক্তির প্রচলন করেছিলেন। এখন ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখার রামকৃষ্ণীয় ধারণাটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করলো। কেশবের 'নববিধান'-এ ধর্ম সম্পর্কে রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ দেখা যায়।[৪০] বিজয়কৃষ্ণ যে পুনরায় সাকার উপাসনার বিকল্প গ্রহণ করেছিলেন এই ব্যাপারে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। এমনকি শিবনাথ শাস্ত্রীকেও দেখা গেছে ঈশ্বরকে মা বলে সম্বোধন করতে।[৪১] কিন্তু যে তরুণ জিজ্ঞাসু

---

৪০. প্রফুল্ল কুমার দাস, "সমসাময়িক বাংলার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব", স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পা.), *বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ*, ২য় সং, (কলকাতা ১৯৮৮), ৩০৮।

৪১. *তদেব*, ৩০৮-০৯।

একেবারে ব্রাহ্মমহল ছেড়ে এসে রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হলেন তিনি ছিলেন প্রতিভাবান নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রের মতো আরো কিছু সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু তরুণ রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণের কিছু আগে গুরু রামকৃষ্ণ তাঁদের বারো জনকে (নরেন্দ্রনাথসহ) সন্ন্যাসজীবনে দীক্ষা দেন। এভাবে প্রতিষ্ঠাতার নিজের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীসঙ্ঘের জন্ম হলো।

রামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্ম প্রচার করেন নি, কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নি, সৃষ্টি করেন নি জটিল কোন ধর্মমত। তিনি বহুদেববাদ, প্রতিমাপূজা ও গুরুবাদসহ পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকেই সমর্থন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৌরাণিক দেবদেবী এক পরমেশ্বরের বিবিধ গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু তা থেকে 'মায়া'র ধারণাটি বাদ দেন। এভাবে তিনি পৌরাণিক বহুদেববাদ দ্বারা ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদের শুষ্কতা পরিহার করেন এবং মায়া পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর ধর্মকে শঙ্করাচার্যের উদাসীনতা থেকে রক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ একজন আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন এবং তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক জীবন ছিল একটি আনন্দময় ব্যাপার। বস্তুত 'আনন্দ' শব্দটি তাঁর ধর্মীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ।[৪২] রামকৃষ্ণ আরো শিক্ষা দেন যে, ধর্ম জিনিসটি সমাজসংস্কার বা কতগুলি ধরাবাঁধা নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্যের ব্যাপার নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে দিব্যজ্ঞান লাভের ব্যাপার। আসলে ব্যক্তিগত দিব্যজ্ঞান লাভ ঐ সময় বেশ কয়েকজন ধর্মনেতার অদমা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠে। এই জিজ্ঞাসুদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ছাড়া আরো ছিলেন কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, যেজন্য তিনি একবার হিমালয়ে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক চৈতন্য লাভের আশায়। এ ছিল রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট বিদ্যায়তনিক ও যুক্তিবাদী ধরনের ধার্মিকতা থেকে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ব্যক্তিগত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বাইরের জ্ঞান কিংবা আচার পালন অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিঃশর্ত বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সাথে মিলনের নিমিত্ত এক অকৃত্রিম আকুতি। সনাতন হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার যে তিনটি পথের নির্দেশ আছে, রামকৃষ্ণ সেগুলির মধ্যে ভক্তিকেই সাধারণ নরনারীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে তাঁর পছন্দের কথা ব্যক্ত করেন, যদিও জ্ঞান ও কর্মের যাথার্থ্যও তিনি যথারীতি স্বীকার করেছেন। বেদ বা শাস্ত্র নয়, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বিবেকের অনুশাসনই আধ্যা-ত্মিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী বলে রামকৃষ্ণ মনে করতেন। এর অর্থ ঈশ্বরলাভের জন্য সৃজনশীল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পদ্ধতি এবং উপাসনায় বহুপথ অবলম্বনের স্বীকৃতি। নিজ ধর্মজীবনে রামকৃষ্ণ চিরাচরিত নিয়ম ও প্রথা ভঙ্গ করে এক স্বনির্দেশিত পথ অনুসরণ করতেন। তিনি আরো দাবি করেন যে,

---

৪২. রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীদের সকলেরই সন্ন্যাস নামের শেষে 'আনন্দ' শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধর্মের অনুমোদিত বিবিধ পথ ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করে তিনি দেখেছেন যে, সেগুলি সবই আধ্যাত্মিক প্রগতির সঠিক পন্থা বটে। এই পদ্ধতিতে তিনি উপনীত হন তাঁর বিখ্যাত "যতো মত ততো পথ"-এর নীতিতে, অর্থাৎ যতো ধর্মমত আছে আধ্যাত্মিক রাস্তাও রয়েছে ততোগুলি। এর সরল অর্থ ছিল এই যে, পৃথিবীর ধর্মসমূহ একই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার বিবিধ পন্থা মাত্র। কিন্তু সমন্বয়ের নামে নানাধর্মের মিশ্রণ ঘটানোর কোন আহ্বান ছিল না এতে। ধর্মসমূহের বাইরের একরূপতার পরিবর্তে রামকৃষ্ণ তাদের ভেতরের একত্বের উপর জোর দিতেন। কোন জটিল নব্যমত নয়, বরং একই লক্ষ্যের অভিমুখে সহযাত্রী হিসেবে বিভিন্ন ধর্মমত এবং নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতি ও সদ্ভাব থাকতে হবে—এই ছিল "যতো মত ততো পথ"-এর নির্দেশ। রামকৃষ্ণ তাঁর বিশিষ্ট সর্বেশ্বরবাদ (অদ্বৈত বেদান্ত থেকে 'মায়া' বাদ দিলে যা থাকে) থেকে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-র আদর্শ নিষ্কাশিত করেন।

উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একজন মহান অধ্যাত্মবাদী ছিলেন, যিনি ধর্মের বাইরের দিকগুলি নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের আক্রমণ—এই উভয় থেকে ধর্মের আধ্যাত্মিক মর্মটিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে গেছেন। পৃথিবীর ধর্মসমূহের আধ্যাত্মিক অভিন্নতার উপর জোর দিয়ে তিনি সাধারণভাবে সকল ধর্মের পক্ষেই কাজ করেছিলেন, কেবল হিন্দুধর্মের পক্ষে নয়। এই স্তরে তিনি প্রকৃতপক্ষে এক বিশ্বসংহতির জন্য কাজ করেছিলেন, যা আর্নল্ড টয়েনবি লক্ষ্য করেছেন। ১৯৭০ সালে টয়েনবি উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবীর ধর্মগুলির মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষ্য দেন তার সঙ্গে সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতি মিলে এমন একটি মনোভাব ও চেতনা সৃষ্টি করে, যা গোটা মানবজাতির পক্ষে এক সাথে একটি পরিবাররূপে বেড়ে উঠা সম্ভব করে তুলতে পারে।[৪৩]

অপর একটি সঙ্কীর্ণতর স্তরে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় দর্শন পূর্বপুরুষের ধর্মে শিক্ষিত হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনে এবং তাদের দীর্ঘকাল লালিত হীনমন্যতার অবসান ঘটায়। হিন্দু তরুণেরা তাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসই শুধু ফিরে পেল না, তারা গর্ববোধ করতে লাগলো তাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ধর্মীয় উত্তরাধিকারের জন্য, যার প্রশস্ত অঙ্গনে সকল ধর্মের সত্যসমূহ নিহিত আছে বলে তাদের ধারণা জন্মালো। সহজবোধ্য রূপক ও লোককাহিনী ব্যবহার করে এবং উপস্থাপনায় সাধারণভাবে পুরাণের লৌকিক স্বাদ মিশিয়ে রামকৃষ্ণ ধর্মে প্রাণবন্ততা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আসেন, যা ব্রাহ্ম ও মিশনারি ঐতিহ্যে অজানা ছিল। মোটের উপর রামকৃষ্ণের পুনর্ব্যাখ্যা হিন্দুধর্মকে এমন একটি অবস্থানে এনে দাঁড় করালো যেখান থেকে একটি গতিশীল ধর্ম হিসেবে যাত্রা শুরু করা তার পক্ষে সম্ভব

---

৪৩. *স্বামী গহনানন্দ*, *শ্রীরামকৃষ্ণ এ্যান্ড হিজ ইউনিক ম্যাসেজ* [শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনন্য বাণী] ৩য় সং, (লন্ডন ১৯৭০), সাত (মুখবন্ধ)

হলো। আধুনিক হিন্দুধর্মের এই নতুন পর্যায়ের নায়ক ছিলেন রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। এখন আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাবো।

উনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এক নব্য বেদান্তের উদ্ভব ঘটিয়ে নব্যহিন্দুবাদের বিবর্তন সম্পূর্ণ করেন। নব্যহিন্দুবাদ মোটেই কোন একক আন্দোলন ছিল না। আদি ব্রাহ্মদের দ্বারা হিন্দুধর্মের পুনর্মূল্যায়ন থেকে শুরু হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহযোগী হিসেবে এর বিকাশ চলতে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নব্যশাক্তবাদ (দুর্গাকে দেশমাতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা) ও নব্যকৃষ্ণবাদের মধ্য দিয়ে। এই শেষোক্ত মতটি বিজয়কৃষ্ণের নব্যবৈষ্ণববাদের সহায়ক হয়। বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের নব্যভক্তিবাদ ওই ধারাকে আরো পুষ্ট করে। অবশেষে বিবেকানন্দ নব্যবেদান্তের উপসংহার দিয়ে শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই নব্যহিন্দুবাদের আবর্তন সম্পূর্ণ করলেন।

গড়ে উঠার বছরগুলোতে নরেন্দ্রনাথের (১৮৮৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিবেকানন্দের গৃহনাম) মধ্যে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজ শ্রেণীর (মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু) নানা উদ্বেগ। ১৮৭০-এর দশকে তিনি শরীরচর্চার জন্য নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল জিমনেসিয়াম বা জাতীয় ব্যায়ামাগারে যেতেন এবং সতত যাতায়াতের ফলে হিন্দুমেলাও তাঁর মনের উপর ছাপ ফেলে।[৪৪] যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং রেভারেন্ড হেস্টির জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৮৮৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। কলেজে পড়ার বছরগুলোতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে বিরাট ওলটপালট চলতে থাকে এবং তিনি "হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন।"[৪৫] এই মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের তিন উপ-সম্প্রদায়েরই দ্বারস্থ হন। কিন্তু প্রশান্তির সাক্ষাৎ পান নি কোথাও। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন :

> মিলের *থ্রী এসেজ অন রিলিজ্যন* [ধর্মবিষয়ক তিনটি নিবন্ধ] তাঁর [নরেন্দ্রনাথের] বাল্যকালীন ঈশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাওয়া সহজ আশাবাদ বিধ্বস্ত করে দেয় [আস্তিক্যের সপক্ষে]।

---

৪৪. কয়েক বছর পর ১৮৮৬ সালে নরেন্দ্রনাথ জনৈক বন্ধুর সাথে *সঙ্গীত কল্পতরু* নামে যে বৃহদায়তন গানের সঙ্কলন প্রকাশ করেন তাতে হিন্দুমেলার অনেক গান 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে স্থান পায়। প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৬৩), ৬ (মুখবন্ধ)।

৪৫. *দ্য লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ ঈস্টার্ন এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসসাইপল্‌স্* [স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের প্রণীত তাঁর জীবনী] ২ খ., ৫ম সং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, (কলকাতা ১৯৭৯-৮১), ১ ঃ ১০৩ (অতঃপর *দ্য লাইফ* রূপে উল্লেখিত)।

> কারণ ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুক্তি আঁকড়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তখন কোন বন্ধু তাঁকে হিউমের সন্দেহবাদ এবং হারবার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহিত করে এবং ক্রমে তাঁর অবিশ্বাস এক স্থায়ী দার্শনিক সন্দেহবাদের রূপ নেয়।[৪৬]

তবে পরিণামে নরেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ঐ ক্লিষ্ট সন্দেহবাদীর উপর জয়লাভ করে। বিশেষত শেলীর কবিতাবলী তাঁর ভেতরকার রোমান্টিক আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটায় :

> বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্যচেতনার উদ্দেশ্যে লেখা শেলীর স্তোত্র, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের সর্বব্যাপিত্ব এবং তাঁর সহস্রবর্ষব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল মানবতার কল্পনা নরেন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করে।... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রেম যন্ত্র মাত্র রইলো না। তার মধ্যে ঐক্যের এক আধ্যাত্মিক সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল।[৪৭]

অপরিহার্যভাবেই নরেন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিত্ত রামকৃষ্ণের সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতায় স্বস্তি খুঁজে পেল, যেহেতু রামকৃষ্ণের বৈশ্বিক চেতনা সকল বহুত্বকে দ্রবীভূত করেছিল এক চরম অদ্বৈত তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্নতায়।

রামকৃষ্ণের অদ্বৈত বেদান্ত নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সন্ধিৎসা মেটালেও ঐ সময়ে তাঁর দেশ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর যেসব প্রশ্ন ছিল সেগুলির জবাব দিতে পারে নি। এই অসম্পূর্ণতার মোকাবেলার জন্য নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য উৎসের দ্বারস্থ হন। এসব উৎসের অন্যতম ছিল গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা। এখানে তিনি দুঃখক্লিষ্ট মানবজাতির জন্য করুণার সন্ধান পান। তাই তিনি সানন্দে প্রস্তাব দেন : "তাহলে আসুন আমরা ব্রাহ্মণদের বিস্ময়কর মেধার সাথে ঐ মহান গুরুর [অর্থাৎ বুদ্ধের] হৃদয়, উন্নত আত্মা এবং বিস্ময়কর মানবিকায়নশক্তির সংযোগ সাধন করি।"[৪৮] কালে এই যৌগিক বেদান্ত ইসলাম থেকেও 'শক্তি' উপাদানটি আহরণের প্রয়াস পায় :

> ইসলামের সহায়তা ছাড়া বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, তা যতোই চমৎকার ও বিস্ময়কর হোক না কেন, বিশাল মানবসমাজের কাছে পুরোপুরি নিরর্থক। ... আমাদের নিজ মাতৃভূমির জন্য হিন্দুত্ব ও ইসলাম এই দুই মহান ব্যবস্থার সংযোগ। অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক শরীরই হচ্ছে একমাত্র আশা।[৪৯]

এভাবে দেখা যায়, বেদান্তের বিশ্বজনীনতা, বৌদ্ধধর্মের মানবতা এবং ইসলামের শক্তি (অন্য কথায় ব্রাহ্মণ্য মস্তিষ্ক, বৌদ্ধ অন্তঃকরণ এবং ইসলামিক শরীর) সংযোগেই তৈরি হয়েছিল বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ধর্ম, যা তাঁর মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করবে বলে অনুমান

---

৪৬. তদেব, ১ : ১০৭।

৪৭. শীলের প্রতিবেদন, তদেব, ১ : ১০৮।

৪৮. বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর, *বিশ্ব-বিবেক,* (কলকাতা ১৯৬৩), ৪৪৫।

৪৯. ১৮৯৮ সালে জনৈক মুসলিম গুণগ্রাহীর কাছে বিবেকানন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। *দ্য লাইফ,* ২ : ৩৩৩।

করা হয়েছিল। এছাড়া খৃস্টধর্মের দৃষ্টান্ত, বিশেষত এর চমৎকার সংগঠন, সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। বস্তুত তাঁর দেশবাসী মানুষকে সেবা দানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যন্ত্র হিসেবে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন তা ছিল খৃস্টীয় গীর্জারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনুকরণ।

এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাশ্চাত্যের বস্তুগত সাফল্যের তুলনায় ভারতের চরম দুরবস্থার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন, তা। ১৮৯০ সালে তিনি ভারতের সকল অঞ্চলে ব্যাপক ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ করেন এক বিশাল সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবং তাঁর স্বদেশবাসী জনগণের চরম দুর্দশা। এই অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তরে এক আহত জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে এবং লক্ষ লক্ষ পদদলিত মানুষের উদ্ধার সাধনের জন্য এক গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয়। তিন বছর পর শিকাগোর 'পার্লামেন্ট অব রিলিজ্যন'-এ বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক উপস্থিতি এবং আরো পরে আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের ফলে ভারতের অবিশ্বাস্য রকমের অবনত অবস্থা এবং জাতি হিসেবে দেশটির সুগভীর অধঃপতনের বিষয়টি তাঁর বিবেকের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বদেশ ও উন্নত বিশ্বে এই সব চোখ-খুলে-দেয়া ভ্রমণের পরিণতিতে ১৮৯৫ সালের মধ্যেই বিবেকানন্দ প্রণয়ন করেন ভারত তথা পৃথিবীর প্রতি তাঁর দেয় বার্তা, যাকে তিনি বলতেন 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' বা ব্যবহারিক বেদান্ত।

বিবেকানন্দের নতুন ধর্মে মানবসেবা ছাড়া অপর উপাদান ছিল শক্তি। 'শক্তি' বলতে তিনি বুঝতেন নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বিশেষত শারীরিক শক্তি। শক্তিই তাঁর মিশনের প্রধান সুর বলে মনে হয় : "আমার ধর্মের সারবস্তু হচ্ছে শক্তি। যে ধর্ম অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে না সে ধর্ম ধর্মই নয় এবং শক্তির চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"[৫০] আরো বিখ্যাত একটি উক্তি হচ্ছে : "*ভগবদ্‌গীতার* চেয়ে ফুটবলের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের বেশি কাছে পৌঁছতে পারবে।"[৫১] আর সেই *গীতাও* বুঝতে হবে একমাত্র শক্তির নিরিখেই : "*গীতা* তোমরা আরো ভাল বুঝতে পারবে তোমাদের হাতের পেশীর সাহায্যে।... আমি যা চাই তা হচ্ছে লোহার তৈরি পেশী আর ইস্পাতের তৈরি স্নায়ু... ।"[৫২] উপরেই জানানো হয়েছে, বিবেকানন্দ আসলে একটি শক্তির ধর্ম সৃষ্টির জন্যই বেদান্ত ও ইসলামের সমন্বয়ের কথা

---

৫০. অশ্বিনীকুমার দত্তের সাথে বিবেকানন্দের আলোচনা, *দ্য লাইফ,* ২, ৩৫৪।

৫১. উদ্ধৃত, বারবারা সাদার্ড, "বিবেকানন্দ : দ্য সার্চ ফর এথিক্যাল ভ্যালুজ এ্যান্ড ন্যাশনাল প্রগ্রেস আন্ডার ইন্ডিজেনাস লিডারশিপ' [বিবেকানন্দ : দেশীয় নেতৃত্বের অধীনে নৈতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় প্রগতির সন্ধান], জগদীশ প্রসাদ শর্মা (সম্পা.) *ইন্ডিভিজুয়ালস এ্যান্ড আইডিয়াজ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া : নাইন ইন্টারপ্রেটেটিভ স্টাডীজ* [আধুনিক ভারতে ব্যক্তিত্ব ও ভাবনা : নয়টি ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ], (কলকাতা ১৯৮২), ১৩৬।

৫২. উদ্ধৃত ত্রিপাঠী *এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ,* ২৩।

ভেবেছিলেন। শক্তসমর্থ দেহ, স্পন্দিত গতিভঙ্গি ও উজ্জ্বল চোখের অধিকারী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বই যেন ছিল তাঁর শক্তির বাণীর প্রতিমূর্তি; এবং সত্যি সত্যিই তিনি 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী', 'অশ্বারোহী সাধু', 'ঘূর্ণিঝড়ের মতো হিন্দু', 'পাহলোয়ান স্বামী' এই ধরনের নানা নামে বর্ণিত হয়েছেন।

রামকৃষ্ণের "যতো মত ততো পথ" সূত্র প্রয়োগ করে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বহু সংখ্যক সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে এক নতুন ঐক্য আনার প্রয়াস পান। এসব সম্প্রদায় ও মতকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার বিভিন্ন পথ হিসেবে দেখা হলো। কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে ধর্মের নামে প্রচলিত যেকোন আজেবাজে আচরণকে বিনা প্রশ্নে অনুমোদন দিতে হবে। আসলে বিবেকানন্দ তান্ত্রিক বামাচার ও রাধাকৃষ্ণভক্তের মতো সম্প্রদায়গুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন তাদের নৈতিক নৈরাজ্যের জন্য। অপরপক্ষে তিনি "যতো মত ততো পথ" ধারণাটির বিস্তার সাধন করে সকল ধর্মের ঐক্যও ঘোষণা করেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা হিসেবে সকল ধর্মই সমভাবে সত্য, যদিও বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদই মূল বিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত; এর কারণ তার দার্শনিক প্রশস্ততা তথা অন্যান্য মতের সাথে তার খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা। এই ব্যাপারটিকে একটা ধর্মসমন্বয় বলে যে প্রায়ই দাবি করা হয়ে থাকে তা আসলে ঠিক নয়। বরং এটি ছিল সহনশীলতা, সহযোগিতা এবং পরস্পর বোঝাপড়ার একটি ব্যবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্ররচিত *গীতার* ভাষ্যে (বিশেষত ৪.১১ শ্লোক) ধর্মীয় বহুলতা ও অসহনশীলতার এই বৈদান্তিক সমাধানের সমর্থন ছিল।[৫৩] বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার এই নতুন পরিকল্পনায় হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় অবস্থান, ইতিহাসে এর চিরন্তনতা, বেদান্তের প্রশস্ত সর্বেশ্বরবাদ এবং তা থেকে উৎসারিত মানবসেবার নীতি—এই সব কিছু মিলে হিন্দুধর্মের জন্য 'সকল ধর্মের মাতৃস্বরূপ' পদবিটির যাথার্থ্যের উপলব্ধি আনে।

ধর্মপ্রবক্তা হিসেবে বিবেকানন্দ বিশ্বের সামনে রামকৃষ্ণের পুনর্ব্যাখ্যাত হিন্দু ধর্মকে একটি মাতৃধর্মরূপে পেশ করেন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির আহ্বান জানান। উপরন্তু তিনি দক্ষিণ এশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দেখে এক উচ্চতর কৃষ্টির দু'টি সম্ভাবনাময় উপাদান হিসেবে অবলোকন করেন। তিনি মনে করেন, তাদের উভয়েরই সবলতা ও দুর্বলতার দিক আছে এবং পারস্পরিক সুবিধার্থে সেগুলির একটি অপরটির অভাব পূরণ করতে পারে। বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় 'জড়বাদী' পাশ্চাত্যের রয়েছে ভারতের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ নেয়ার প্রয়োজন, আর ভারতকে অবশ্যই পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখতে হবে বিজ্ঞান এবং সমাজপ্রগতির কৌশল। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সহযোগিতার এই আহ্বানে বিবেকানন্দ বিশ্বে এক নতুন সাংস্কৃতিক ঐকতানের কল্পনা করেন এবং নব্যহিন্দু আন্দোলনের শুরু থেকে ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাচর্চার যে আদর্শ অনুসৃত হয়ে আসছিল তার প্রতি সমর্থন দেন। অতএব ভারত শুধু একতরফাভাবে পাশ্চাত্য থেকে ঋণই নেবে না, বিনিময়ে কিছু দিতেও পারবে। সে

---

৫৩. দেখুন, *বঙ্কিম রচনাবলী* ২:৭৬৭-৭০।

পাশ্চাত্যের ভৌত সমৃদ্ধির সাথে নিজের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার বাণিজ্য করবে। মনে হলো, ভারত ও পাশ্চাত্যের দুই ভিন্ন ধরনের পরস্পর সম্পূরক সঙ্কটে বিবেকানন্দ উভয়ের ত্রাণকর্তা হিসেবে অবস্থান নিয়েছেন।

ভারতের পুনরুজ্জীবন ও পাশ্চাত্য জগতে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারের জন্য নিজের 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বামী ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপে তার শাখা স্থাপিত হয়। উক্ত দুই কার্যক্রমের কোনটাই আজ পর্যন্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় নি, কিন্তু মিশন দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান সেবা দিতে পেরেছে এবং পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্মের মর্যাদা ও ঐ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে বিবেকানন্দের নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম ভারতে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে এবং পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদের উত্থানকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আত্মনির্ভরশীল মিশনারি ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বিবেকানন্দ নব্যহিন্দুবাদের তাত্ত্বিক বিকাশ সম্পূর্ণ করে তাকে সামাজিক ও নৈতিক নেতৃত্ব তথা অগ্রবর্তী প্রচারবাদী ভূমিকা গ্রহণের পথে স্থাপন করেন। তাঁর নব্যহিন্দু চেতনা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে বিকাশ- লাভ করে। বাংলায় স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে তথাকথিত চরমপন্থী রাজনীতির উপর নব্যহিন্দু আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ এবং ভগিনী নিবেদিতার মতো চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ মুখ্যত বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে স্বদেশী যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন কোন অবদান রাখেন নি বললেই চলে। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে বাংলা সাহিত্যের উপর নব্যহিন্দুবাদের বিরাট প্রভাবের মূল্যায়ন এ প্রবন্ধের আওতার বাইরে। তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যম যে কিছু সময়ের জন্য নব্যহিন্দুবাদের প্রেরণাধীন ছিল, এই ঘটনা থেকেই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুমান করা যায়।[৫৪] বস্তুত যেমনটি আমরা আগেই দেখে এসেছি, নব্যহিন্দু আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্মের সাথে সাথে এবং বরাবরই তার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক চরিত্র ছিল। এটি কেবল হিন্দু বহুত্ববাদের প্রতি খৃস্টান ও ব্রাহ্মধর্মের একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জের জবাবই ছিল না, বরং ভারতের জাতীয়তা ও স্বাধীনতার প্রতি উপনি-বেশবাদী চ্যালেঞ্জেরও প্রত্যুত্তর ছিল।

৫৪. রবীন্দ্রনাথের লেখায় ক্রমবর্ধমান নব্যহিন্দু প্রভাবের জন্য দেখুন, সরকার, *স্বদেশী মুভমেন্ট*, ৫৩-৫৫; আরো দেখুন নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ২৫৬-৫৭। বাংলা সাহিত্যের উপর নব্যহিন্দু আধিপত্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* , ২য় সং. সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, (কলকাতা ১৯৮১)।

দুই. সামাজিক সংস্কার

গোটা উনিশ শতক জুড়েই ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ধরনের সংস্কারকদের কাছেই সমাজসংস্কার একটি প্রধান বিষয় ছিল। রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই সময়ের দুই সর্বপ্রধান সমাজসংস্কারক। তাঁদের দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল দল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কার কার্যক্রম ছিল। আর নব্যহিন্দু আন্দোলন সমাজসংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ধারণা প্রবর্তন করে।

নারীমুক্তি

গোটা উনিশ শতক ধরে হিন্দু সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল নারী জাতির মুক্তি। রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, সাধারণ উচ্চশিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরা-ধিকার, এবং নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরো তুলে ধরতে চেষ্টা করেন হিন্দু নারীদের সেই সব অধিকার, যা প্রাচীন আইনপ্রণেতারা তাদেরকে দিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।[৫৫] কিন্তু নারীমুক্তির সপক্ষে রামমোহন বাস্তবে যে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন তা হলো সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন।

সতী নারীর বেঁচে থাকার অধিকার

ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণার মাঝখানেই রামমোহন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন সতীদাহ সংক্রান্ত এক চলমান বিতর্কে, কারণ সতীদাহে হিন্দুধর্মের অনুমোদন আছে বলে মনে করা হতো। তাঁর অংশগ্রহণের সাথে সাথে ঐ দ্বিধাগ্রস্ত বিতর্ক এক শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিল, যার ফলে তাঁর নিজের নেতৃত্বাধীন মুষ্টিমেয় উদারপন্থী এবং বৃহত্তর নিষ্ঠাবান হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটে গেল। বীভৎস সতীদাহ প্রথা বিলোপের পক্ষ সমর্থন করে রামমোহন ১৮১৮ সালে *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* শীর্ষক চমৎকার বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করলেন এবং সেটিকে অচিরে *এ কনফারেন্স বিটুঈন এ্যান এ্যাডভোকেট ফর এ্যান্ড এ্যান অপোনেন্ট অব দ্য প্রাকটিস অব বার্নিং উইডোজ এ্যালাইভ* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এখান থেকেই শুরু হলো রামমোহন ও নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যে বারো বছর (১৮১৮-৩০) স্থায়ী এক দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্ব। বিরাট সৎসাহস, গভীর

৫৫. রামমোহনের *দ্বিতীয় সম্বাদ*, 'ব্রীফ রিমার্কস' এবং *চারি প্রশ্নের উত্তর*-এ নারীর অধিকারের সপক্ষে বক্তব্য আছে। দেখুন, *রামমোহন রচনাবলী*, ২০২, ২৫৮-৫৯, ৪৯৩-৫০১।

সহানুভূতি, দীপ্যমান বাকপটুতা, অনতিক্রান্ত পাণ্ডিত্য এবং ধর্মযোদ্ধাসুলভ উদ্দীপনা নিয়ে রামমোহন ঐ বিতর্ক লড়তে থাকেন এবং পর্যায়ক্রমে *দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯), সেটির ইংরেজি অনুবাদ (১৮২০) এবং কয়েক বছর পর সতীদাহসমর্থক ও ব্যক্তিগত আক্রমণে নিয়োজিত গোঁড়া পুস্তিকালেখকদের জবাবে আরো দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৫৬]

প্রধানত রামমোহন পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে একটি আইন (১৮২৯ সালের রেগুলেশন ১২) পাশ করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হলো, যদিও তিনি নিজে জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এ ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। সংস্কারপন্থী ও নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যকার বিরোধ কিন্তু সেখানেই থেমে গেল না, বরং তা রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' (স্থাপিত ১৮২৮) ও নিষ্ঠাবানদের 'ধর্মসভা' (স্থাপিত ১৮৩০) নামক দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতি ও তাদের মুখপত্রদ্বয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল। নৈষ্ঠিক হিন্দুরা ঐ আইনের বিরুদ্ধে দু'টি আবেদনপত্র পেশ করেন—একটি গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর কাছে এবং সেটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আর একটি (তারিখ ৭ জুলাই ১৮৩২) লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে, যেখানে এই দ্বিতীয় আবেদনও উপেক্ষিত হয়।

বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার

কলকাতার ইংরেজি মাধ্যম হিন্দু কলেজে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়াতেন হেনরি ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। তিনি একদল তরুণ হিন্দু ছাত্রকে চরম যুক্তিবাদে দীক্ষা দিলে তারা হিন্দুধর্মকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করে বসে। ১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন বৃটেনের উদ্দেশে দেশত্যাগ করলে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত এসব ডিরোজিওপন্থীর উপরই বর্তালো সংস্কারবাদের উত্তরাধিকার। ধর্মসভার সদস্যদেরকে স্বাভাবিক শত্রু হিসেবে জ্ঞান করে ১৮২৮ থেকে ১৮৪৩ সালের মধ্যে নিজেদের পরিচালিত পাঁচটি সাময়িকীতে তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ জারি রাখেন। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তাঁরা যেসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন সেসবের একটা ছিল নারী বিষয়ক সমস্যা। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে তাঁরা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। কারণ সতীদাহ বন্ধ হওয়ার পরে বিধবাদের বাড়তি সংখ্যা একটা ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের পত্রিকা *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* ১৮৪২ সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করে, যাতে বিধবাবিবাহের

---

৫৬. রামমোহনের শেষ দুটি প্রকাশনা ছিল (১) *সহমরণ বিষয়* (১৮২৯), (২) *এ্যান এ্যাবস্ট্রাক্ট অব আরগুমেন্টস রিগার্ডিং দ্য বার্নিং অব উইডোজ, কনসিডার্ড এ রিলিজিয়াস রাইট* [ধর্মীয় আচার হিসেবে বিবেচিত সতীদাহ সম্পর্কিত বিতর্কের সারসংক্ষেপ] (১৮৩০)। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রকাশনার মধ্যে ছিল পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত *বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ* (১৮২৯)।

প্রশ্নটি পুনর্নিরীক্ষণ করা হয় এবং এই সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষে আন্দোলনের জন্য একটি কর্মপদ্ধতিও নির্দেশ করা হয়।[৫৭] ১৮৪৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত আর একটি নিবন্ধেও বিধবাবিবাহ নিরোধের মতো হিন্দু সামাজিক বিধিনিষেধের সমালোচনা করা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তির ভিত্তিতেই এধরনের বিবাহের সপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়।[৫৮] এই প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণকারী নানা সামাজিক দলের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় চলতে থাকে। এই বিতর্কে ধর্মসভা ও ডিরোজিওপন্থীরা দুই চরম প্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

এই পটভূমির উপরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাঁর বিখ্যাত বিধবা-বিবাহ তথা সাধারণভাবে নারীমুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডিরোজীয়ানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে সংস্কারপন্থী মাসিক *সর্বশুভকরী পত্রিকায়* 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহকে বাংলায় বালিকাবিধবার সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ হিসেবে নির্দেশ করে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় হিন্দু বিধবাদের দুর্দশার বর্ণনা দেন। 'নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার'কে নিন্দা করে তিনি চিন্তাশীল লোকদের প্রতি ঐসব শাস্ত্রবিধি ও প্রথাকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আবেদন রাখেন। তাছাড়া তিনি বিধবাবিবাহের অনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশের সন্ধানে থাকেন এবং ১৮৫৪ সালে সফল হন। খৃস্টায় যুগের প্রথমদিকে রচিত *পরাশরসংহিতা* বিধান দেয় :

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
>
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ (৪.৩০)
>
> [স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কিংবা মারা গেলে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অথবা পুরুষত্বহীন হলে কিংবা সমাজচ্যুত হলে—এই পাঁচ প্রকার বিপত্তিতে স্ত্রীদের অন্য পতিগ্রহণ বিধিসম্মত।]

এটি ছিল সেই শাস্ত্রীয় নির্দেশ, যা একদা ডিরোজীয়ান পত্রিকা *বেঙ্গল স্পেক্টেটর-এ* উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর অবিলম্বে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* শিরোনামে এক নাতিদীর্ঘ সন্দর্ভ রচনা করেন এবং তা ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ২৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় লেখক প্রধানত শাস্ত্রবাক্য এবং কিছুটা যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য রাখেন। পুস্তিকাটি জনসাধারণ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম দুই হাজার কপি এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আরো তেরো হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা সাথে

---

৫৭. নিবন্ধ দু'টি সঙ্কলিত, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৫ খণ্ড, (কলকাতা ১৯৬২-৬৮), ৩ : ৭৭-৮০, ৯০-৯২ (অতঃপর *সমাজচিত্র* রূপে উল্লেখিত)।

৫৮. এই নিবন্ধের উদ্ধৃতি, অমর দত্ত, *ডিরোজিও ও ডিরোজীয়ানস*, (কলকাতা ১৯৭৩), ৮১।

সাথে চার-পাঁচটি পুস্তিকা লিখে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। এর ফলে উদ্ভূত বিতর্ক কলকাতার ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রগুলোকে প্রায় দখল করে নিল। প্রভাবশালী ব্রাহ্ম সাময়িকী *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) বিধবাবিবাহের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। তিনি ঐ পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণ করলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) এবং তাঁর সমর্থনে লিখলেন এক জোরালো সম্পাদকীয় (মার্চ ১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণের সম্পূরক হিসেবে নয় দফা যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য পেশ করে অক্ষয়কুমার নিবন্ধ শেষ করেছেন মানবহৃদয়ের কাছে একটি আবেগময় আবেদন রেখে।

বিতর্ক চলতে থাকে মাসের পর মাস এবং বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় বিষয়টির উপর এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। অজস্র কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রহসন, নাটক, গল্প ও নকশা রচিত হয় এই ডামাডোলে। নিষ্ঠাবানদের নেতা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কের আহ্বান জানান। সেই বিতর্কে বিদ্যাসাগর জয়লাভ করেন, কিন্তু গোঁড়াদের বিরোধিতার অবসান হয় না। ধর্মসভা ও 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ১৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় পুস্তকে সংযত ভাষায় তাঁর বহুতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল যুক্তি খণ্ডন করেন। এই বইয়ে তিনি দুঃখ ও বিস্ময়ের সাথে মন্তব্য করেন যে, ভারতে প্রথা ও কুসংস্কার শাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী। উপসংহারে তিনি অতুলনীয় ভাষায় সব দেশের নির্যাতিত নারীসমাজের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন এবং তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষকে বিচারবুদ্ধিবিহীন ও নীতিবোধবর্জিত বলে অভিযুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর জানতেন যে, আইনগত ব্যবস্থা না থাকলে শুধু বাচনিক বিজয় যথেষ্ট হবে না। তাই তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ করেন (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। এতে তাঁর নিজের সহ ৯৮৮ জনের স্বাক্ষর ছিল। অচিরেই একটি বিধবাবিবাহ বিল তৈরি হলো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আলোচনার জন্য। এ বিলের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আবেদন পড়লো। আবেদনকারীদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, বিধবাবিবাহ হিন্দু আইন, প্রথা ও ধর্মের পরিপন্থী এবং এর সমর্থনে আইন পাশ করলে তা ব্যাপক সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দেবে। কোন কোন আবেদনে গুরুতর রাজনৈতিক পরিণতির আভাসও দেয়া হয়েছিল। আবার বিলটিকে সমর্থন করেও কতিপয় আবেদন পেশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৩৭৫টি স্বাক্ষরসম্বলিত ডিরোজিওপন্থীদের একটি আবেদন। এতে সম্পূর্ণ অযাজকীয় বিবাহের ব্যবস্থাসহ আরো আমূল পরিবর্তনসূচক আইন পাশের আহ্বান জানানো হয়। অবশেষে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিলটি কোন পরিবর্তন ছাড়াই আইনে (১৮৫৬ সালের ১৫ নং আইন) পরিণত হলে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনগত বাধা দূর হয়।

এখন বিদ্যাসাগর আইনটির বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উদ্যত হলেন। এ ছিল হিন্দু সামাজিক অধিষ্ঠানের সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত। সামাজিক নির্যাতন, গুণ্ডামি ও মামলা-মোকদ্দমার ঝুঁকি নিয়ে তিনি নিজ ব্যয়ে তরুণী বিধবাদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়ে গেল। এমন আরো অনেক বিধবার বিয়ে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এভাবে এগারো বছরে (১৮৫৬-৬৭) তিনি অন্যূন ষাটটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং এতে ৮২,০০০ রূপীর অধিক অর্থ ব্যয় করে নিজেকে বিপুল পরিমাণ ঋণে নিমজ্জিত করে ফেলেন। এই অভিযানে বিদ্যাসাগর ডিরোজিওপন্থীদের পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজের একাংশের এবং অনেক সাধারণ হিন্দুর নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন।

বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন

দ্বিতীয় যে সামাজিক সংস্কারে বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন তা হলো বহুবিবাহ, বিশেষত বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত অতি অদ্ভুত ধরণের বহুবিবাহ নিবারণ।[৫৯] বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের তিন মাসেরও কম সময়ে তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশের প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে অনুরূপ আর একটি আবেদন পেশ করেন (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫)। বহুবিবাহের দোষ দেখিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* উপর তার প্রভাব খাটান। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের চেয়ে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। বিদ্যাসাগরের আবেদনের পর হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরসম্বলিত আরো ১২৮টি আবেদনে ঐ একই প্রার্থনা জানানো হয়। অপরপক্ষে রাধাকান্ত দেব হিন্দু বহুবিবাহের সমর্থনে এক আবেদন পেশ করেন। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে সরকার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া বিল তৈরি করে। এমন সময় সিপাহি অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যাওয়ায় আর কোন অগ্রগতি হয় নি। সঙ্কট কেটে গেলে সরকার সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়াকে ঐ সঙ্কটের জন্য আংশিক দায়ী করে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একদল ভারতীয়ও সংস্কারের নামে বিদেশী সরকারকে সমাজ ও ধর্মের ব্যাপারে নাক গলাতে দেয়ার ধারণার বিরোধিতা করেন। তবে সংস্কারবাদীরা সরকারি হস্তক্ষেপে কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ করার ধারণা ত্যাগ করেন নি। ষাটের দশকের মধ্যভাগে প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়। আবেদনের পর আবেদন আসতে থাকে এবং বিদ্যাসাগর আইন দ্বারা হিন্দু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার আবেদন নিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বিডনের কাছে প্রেরিত

---

৫৯. কুলীন ব্রাহ্মণেরা চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ততোধিক বিয়ে করতো, কিন্তু বাস করতো এক বা দুই স্ত্রীর সাথে। বাকিরা তাদের পিতামাতা ও ভাইদের সাথে থেকে বঞ্চনাময় জীবনযাপন করতো। আর তাদের স্বামীরা মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসতো স্রেফ টাকা-পয়সা আদায় করতে।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬) এক প্রতিনিধিদলে যোগ দেন। এ ব্যাপারে বিডনের প্রাদেশিক সরকারের সহানুভূতি থাকলেও ভারত সরকার রাজনীতির খাতিরে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। দু'জন ইংরেজ এবং বিদ্যাসাগরসহ পাঁচজন ভারতীয় সমবায়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭) যে, যদিও ঐ কুপ্রথা বিলক্ষণ বিদ্যমান, শিক্ষা ও সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঐ প্রথার বিরুদ্ধে কোন আইন পাশের সুপারিশ করা হলো না। তবে ভিন্নমত পোষণ করে বিদ্যাসাগর লিখলেন : "আমি একমত হচ্ছি না..., একটি ঘোষণামূলক আইন পাশ করা যেতে পারতো ... ।"৬০

এই প্রবীণ সংস্কারক উপলব্ধি করলেন যে, এদেশে বৃটিশের পরোপকারেচ্ছার দিন আর নেই। সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদ্যাসাগর কলম হাতে তুলে নিলেন এবং বহুবিবাহের কদাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৭১ সালে একটি সংস্কারবাদী সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য তিনি ১৮৬৬ সালে রচিত তাঁর একখানা পুস্তকের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিস্ময়কর সমাবেশ ছাড়াও বইটিতে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় বহুবিবাহের চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত উপাত্ত ছিল। ইতিমধ্যে আঠারোশ' সত্তর দশকের কঠিন সময় এসে পড়েছিল এবং বিদ্যাসাগর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হিন্দু নিষ্ঠাবানদের তরফ থেকে নতুন আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। বিদ্যাসাগরের পুরনো সমর্থক তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৫) এখন তাঁর বিপক্ষে গেলেন এবং বহুবিবাহ সমর্থন করে সংস্কৃত ভাষায় এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। আরো কয়েকজন পণ্ডিতও লিখলেন অনুরূপ বইপুস্তক, যাদের অধিকাংশেরই ভাষা ছিল গালিগালাজপূর্ণ। জবাবে বিদ্যাসাগর গোঁড়াদের সকল যুক্তি খণ্ডন করে আরো বড় একখানা বই লিখলেন (এপ্রিল ১৮৭৩)। তর্কবাচস্পতি কুৎসিত ভাষায় জবাব দিলে বিদ্যাসাগর দুখানি বেনামী পুস্তিকায় তা খণ্ডন করেন। যদিও বিদ্যাসাগরের এসব প্রচেষ্টা সাথে সাথেই কোন অনুকূল ফল প্রসব করে নি, কিন্তু দীর্ঘকালের বিচারে তা বিধবাবিবাহ আন্দোলনের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিল। শতাব্দীর শেষ নাগাদ কুলীন বহুবিবাহ আর সমাজের মারাত্মক কোন সমস্যারূপে বিদ্যমান ছিল না।

বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন

বিদ্যাসাগর মনে করতেন, বাংলায় কম বয়সী বিধবার সংখ্যাধিক্যের একটা মূল কারণ বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন। তবে নাবালক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার কাজটি হাতে নেন কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যাসাগর যখন নৈষ্ঠিক হিন্দুদের সাথে তাঁর সংস্কারবাদী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ব্রাহ্মসমাজের

---

৬০. প্রতিবেদনটি পুনর্মুদ্রিত, অরবিন্দ গুহ [ইন্দ্র মিত্র], *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, (কলকাতা ১৯৬৯), ৭৭২-৮৩। উদ্ধৃতিটি ৭৮২-৮৩ পৃষ্ঠায়।

অভ্যন্তরেও অনুরূপ এক দ্বন্দ্ব চলছিল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন প্রবীণ দল এক ধরনের সাবধানী রক্ষণশীলতা অবলম্বন করে চলছিলেন। তাঁদের মতে, উচ্চশ্রেণীদ্বারা পরিচালিত জাগতিক সংস্কার ধর্মের আধ্যাত্মিকতা তথা ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর। অপরদিকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর তরুণ অনুসারীরা সমাজসংস্কারকে ব্রাহ্ম কর্মসূচির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। এই মতভেদ এবং অন্যান্য কারণে ১৮৬৬ সালের ভাঙন ঘটে যায় এবং নবগঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্বীয় সদস্যবর্গের মধ্যে কতিপয় সংস্কার প্রবর্তন করে। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে এক সফল ভ্রমণশেষে দেশে ফিরে কেশবচন্দ্র তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের তরুণ বর-কনেদের জন্য অযাজকীয় বিয়ের আইন পাশের দাবিতে তাঁর অগ্রগামী বিদ্যাসাগরের অনুকরণে এক আন্দোলন শুরু করেন। এর পরিণতিতে ১৮৭২ সালের ৩ নং আইন পাশ হয়, যাতে বিধান দেয়া হয় যে, যেসমস্ত বর ও কনের বয়স যথাক্রমে আঠারো ও চৌদ্দ বছরের কম নয় এবং যারা নিজেদেরকে হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান নয় বলে ঘোষণা দেবে তারা আদালতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ঐ আইনে স্ত্রীদেরকেও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু 'হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃস্টান নই' এরকম ঘোষণা দেয়ার শর্ত যুক্ত হওয়ায় আইনটির বাল্যবিবাহরোধের উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয় নি।

বৈধব্যের উচ্চহার ছাড়াও শিশুবধূর আর একটা বিপদ ছিল তার প্রাপ্তবয়স্ক 'স্বামী' কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা। দশ বছরের কম বয়সী বালিকার সাথে সঙ্গম ধর্ষণ বলে ঘোষণা করে ১৮৬০ সালে যে আইন পাশ হয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। ১৮৮৪ সালে বি. এম. মালাবারী নামক পার্সি সাংবাদিক বাল্যবিবাহ ও চিরবৈধব্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগুলির উপর তাঁর 'নোটস' বা মন্তব্য প্রকাশ করলে প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়। মালাবারী বৃটিশ ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ করে ঐ সমস্যার উপর বহু বক্তৃতা দেন, এমনকি ইংল্যান্ডে গিয়ে বৃটিশ জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিন্দু সমাজে শিশুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হোক।

মালাবারীর আন্দোলন ভারতে বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং বাংলার চিন্তাশীল হিন্দুরাও ঐ প্রশ্নে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। জাতীয়তাবাদী ও নব্যহিন্দুবাদী আবহাওয়ায় সাধারণ প্রতিক্রিয়া স্বভাবত নেতিবাচক ছিল। ভাইসরয় ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) এবং ভারতে প্রধান ইংরেজ কর্মকর্তারাও চেয়েছিলেন হিন্দু জনমত আন্দোলনের অনুকূলে মোড় না নেয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সালে ফুলমণির ধর্ষণ মামলা পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক হরি মাইতি তার দশ বছর বয়সী স্ত্রী ফুলমণির উপর বলাৎকার করলে মেয়েটি মারা যায়। কিন্তু আদালত মাইতিকে বেকসুর খালাস দেয় এই যুক্তিতে যে, ঘটনার সময় ফুলমণি তার দশম জন্ম দিন অতিক্রম করেছিল বলে তার ক্ষেত্রে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য ছিল না। এই

ঘটনা মালাবারীর আন্দোলনে বাড়তি গতিসঞ্চার করে। কলকাতার হেলথ সোসাইটি [স্বাস্থ্য সমিতি] এবং পঞ্চান্ন জন মহিলা ডাক্তার বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করার অনুরোধ জানিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান। কিন্তু মালাবারীর শিষ্য দয়ারাম গিদুমল সহবাস সম্মতি আইনের খসড়ায় এমন একটি আপোস ফরমুলা উপস্থাপন করলেন, যাতে বাল্যবিবাহ সরাসরি নিষিদ্ধ করতে না চেয়ে শুধু এই বিধান রাখা হলো যে বারো বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম ফৌজদারি আইনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই বিল হিন্দুদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং হিন্দুরা ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করতে থাকে। পুনরুত্থানবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) বিলটির বিরুদ্ধে বাংলায় শোরগোল তুললেন, এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিবাহের পর যৌনসঙ্গমের নির্ধারিত বয়সসীমার পরিবর্তে "প্রথম ঋতুর সময়" এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে বিলে পরিবর্তন আনতে চাইলেন। এতে সম্ভবত হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিদ্যাসাগর যে গুরুত্বারোপ করতেন তারই প্রতিফলন ছিল। বিলটি ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের সংশোধনী ছাড়াই পাশ হয়ে যায়। নব্য হিন্দু বুদ্ধিজীবী হিসেবে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বিল সম্পর্কে বরাবর নীরবতা অবলম্বন করে থাকলেও সেটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর মালাবারীর পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন : "কিন্তু আমরা মালাবারী ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না।"[৬১] বঙ্কিম আসলে সংস্কারটির বিরোধী ছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু তিনি সংস্কারকদের অনুসৃত পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, যে পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু সমাজের চরম মর্যাদাহানিকর চিত্র অঙ্কন করা এবং একটা একক সামাজিক ব্যাধি দূর করতে আইন পাশের জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বঙ্কিম আরো অভিযোগ করেন যে, সমাজসংস্কার নয়, নিজের জন্য খ্যাতি অর্জনই ছিল মালাবারীর আসল উদ্দেশ্য।[৬২]

নারীর শিক্ষালাভের অধিকার

বাল্যবিবাহের ফলে শুধু বালবৈধব্য আর যৌন নির্যাতনের ঘটনাই ঘটতো এমন নয়, ঐ প্রথা মেয়েদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা নেয়ার পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই নারীমুক্তির কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তথাপি বৃহত্তর অর্থে সত্যিকার অর্থবহ নারীমুক্তির জন্য অপরিহার্য ছিল একটি স্ত্রীশিক্ষা কার্যক্রম। উনিশ শতকের শুরুতে সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙালি নারীসমাজ প্রায় পুরোটাই নিরক্ষর ছিল। এই সামগ্রিক অন্ধকারের কারণগুলির মধ্যে ছিল ১. বাল্যবিবাহ, ২. পর্দার নামে মহিলাদের গৃহবন্দি করে রাখা, ৩. লেখাপড়া

৬১. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৫০৩

৬২. তদেব, ৫০৬।

শিখলে মেয়েরা বিধবা হয় এমন কুসংস্কার, ৪. স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের আগ্রহের অভাব, ৫. মহিলা শিক্ষিকার অভাব এবং ৬. ঔপনিবেশিক সরকারের অনীহা। তবে উনিশ শতকেব প্রথমদিকের সংস্কারকদের কেউ নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন এমন কথা জানা যায় না, যদিও রামমোহন রায় মেয়েদের সাধারণ ও উচ্চতর শিক্ষার অনুকূলে লিখেছিলেন।

খৃস্টান মিশনারিরাই স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন এবং কতিপয় বিত্তশালী হিন্দু তাঁদের সহযোগিতা করেন। মিশনারিরা ১৮১৯ সালে ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি [কলকাতা তরুণী সমিতি] স্থাপন করে বেশ কয়েকটি স্কুলে শত শত বালিকাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। বিশের দশকে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু তখন ছাত্রীরা সবাই ছিল সমাজের নিম্নপর্যায়ভুক্ত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খৃস্টীয় ধ্যানধারণা সঞ্চারের ভয়ে এবং নিম্নবর্ণের মেয়েদের সাথে ক্লাস করার ব্যাপারে কুসংস্কারের জন্য নিজ নিজ কন্যাকে ঐসব প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক হিন্দু লেখক *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণীয় কুসংস্কারগুলির সমালোচনা করা হয়। রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কলকাতা ও অন্য কয়েকটি শহরে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

১৮৪৯ সালে যখন জে. ই. ড্রিংকওয়াটার বীটন (১৮০১-৫১) কয়েকজন ডিরোজীয়ান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং গুটি কয়েক সনাতনী হিন্দুর সহযোগিতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল [হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়] স্থাপন করলেন, তখন তা একটা বিশেষ সামাজিক তাৎপর্যময় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ডিরোজীয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৭৮) স্কুলের জন্য অনেক টাকা দান করেন এবং স্কুলের নিজস্ব বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় বাসগৃহের একাংশে স্কুল বসতে দেন। বিদ্যাসাগর অনেক বছর যাবৎ স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারি ছিলেন। প্রখ্যাত প্রগতিশীল লেখক ও শিক্ষাবিদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮) তাঁর দুই মেয়েকে ঐ স্কুলে ভর্তি করেন। এখানে পঠন, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সেলাই, বাংলা ও ইংরেজি শেখানো হতো। স্কুলে বেতন ছিল না, ছিল না খৃস্টান কিংবা কোন নিম্নবর্ণের ছাত্রী। কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলা হতো এবং যেসব ছাত্রীর নিজস্ব যান ছিল না তাদের জন্য স্কুলকর্তৃপক্ষ পর্দাদেয়া গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্কুলের গাড়ির গায়ে বিদ্যাসাগর খোদাই করিয়ে দিয়েছিলেন *মহানির্বাণতন্ত্র-এর* একটি যথার্থ শ্লোক, যার অর্থ মেয়েদেরকেও অত্যন্ত যত্নের সাথে লালনপালন করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে।[৬৩] এসব সত্ত্বেও রক্ষণশীল হিন্দুরা বীটনের স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকেন। ল্যান্ড হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন বা জমিদারসভা এর বিরোধিতা করেছিল এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-৫৯) বালিকাদের স্কুলে যাওয়াকে বিদ্রূপ করে ঝাঁঝালো ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন। পক্ষান্তরে ডিরোজিওপন্থীরা, ব্রাহ্মগণ,

৬৩. *"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত :"—মহানির্বাণতন্ত্র*, ৮.৪৭।

বিদ্যাসাগর ও উদারমনা হিন্দুরা স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তির অনুকূলে বক্তব্য রাখেন, লেখেন, কাজ করেন। রক্ষণশীলদের নেতা রাধাকান্ত দেব কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের স্কুলশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং নিজের বাড়িতেই তাদের জন্য একটি স্কুল চালাতেন। *সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ* প্রভৃতি সাময়িকী স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখে।

বীটন স্কুল ১৮৫৬ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিদ্যাসাগর তার অর্থনৈতিক সম্পাদক থেকে যান। ১৮৬২ সালে তিনি প্রতিবেদন দেন যে, স্কুলটি ভাল অগ্রগতি করছে, ছাত্রীসংখ্যা বাড়ছে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।[৬৪] এই আশাবাদের ভিত্তি খুব দৃঢ় ছিল না, কারণ ১৮৬৮ সালে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে, স্কুলটিতে মাত্র ৩০ জন ছাত্রী অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা লাভ করছে।[৬৫] তবে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের নিজস্ব কার্যক্রম ছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডের (১৮৫৬-৬২) আশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি স্পেশাল ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলস্ [বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ পরিদর্শক] হিসেবে কলকাতার নিকটবর্তী চারটি জেলায় ১৮৫৭-৫৮ সালের নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ভারত সরকার এবং ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ স্কুলগুলির ভার নিতে অস্বীকার করলে বিদ্যাসাগর বিপুল ঋণের ভারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অনেক হয়রানির পর সরকার অবশেষে ঋণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়, কিন্তু স্কুলগুলি চালু রাখার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে স্বদেশপ্রেমিক বিদ্যাসাগর ঐ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বিপন্ন বিদ্যালয়গুলির জন্য কলকাতার বিত্তবান নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে একটি তহবিল খোলেন। এভাবে স্কুলগুলি রক্ষা পেলো এবং নতুন নতুন স্কুলও বসলো।

১৮৬৬-৬৭ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঐ বছর বালিকাদের জন্য ২৮১টি স্কুল ছিল এবং সেগুলিতে ৫৬৩১ জন ছাত্রী লেখাপড়া করতো।[৬৬] ইতিমধ্যে বৃটিশ জনসেবাব্রতী মেরি কার্পেন্টার (১৮০৭-৭৭) ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসেন। সরকারি সাহায্য ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি ১৮৬৯ সালে একটি ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল [শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়] স্থাপন করেন। সামাজিক প্রস্তুতির অভাবের কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। তিন বছর পর নর্ম্যাল স্কুল উঠে গেলে তাঁর কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের পরে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীরা সত্তরের দশকে স্ত্রীশিক্ষার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। তবে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রধানত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রক্ষণশীল উচ্চবর্ণমহলে পর্দাপ্রথা স্ত্রীশিক্ষার প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি

---

৬৪. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, ৩য় খণ্ড একত্রে, (কলকাতা ১৯৭৩), ৪৫২-৫৩।

৬৫. ঐ, ২২৮।

৬৬. ঘোষ, *সমাজচিত্র*, ৪ : ৫১৯।

করেছিল। এজন্য খৃস্টীয় মিশনারিরা ষাটের দশকে 'জেনানা শিক্ষা'র এক কার্যক্রম শুরু করেন। বেতনভোগী শিক্ষিকারা রক্ষণশীল বাড়িগুলোতে গিয়ে ছাত্রীদের শিক্ষাদান করতেন। বেতনের উচ্চহার এবং ছাত্রীদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় এই ব্যবস্থাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বিস্তৃত হতে দেয় নি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা বাড়িতে তাঁদের স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৬২ সালে আত্মীয়-স্বজনের দৈহিক বাধার মুখে কেশবচন্দ্র তাঁর তরুণী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে এক ব্রাহ্ম উপাসক সমাবেশে নিয়ে গিয়ে পর্দাপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা 'ব্রাহ্ম বন্ধুসভা' স্থাপন করে এক বিস্তারিত সমাজসংস্কার কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হন। ১৮৬৬-এর বিভক্তির পর ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশ কেশবচন্দ্রকে অনুসরণ করে এবং রক্ষণশীল অংশ দেবেন্দ্রনাথের সাথে থেকে যায়। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন এবং তার দু'বছর পর একটি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের ছাত্রীরা পরে গড়ে তোলেন একটি নারীমঙ্গল সমিতি, যা মেয়েদের সমস্যা ও প্রগতি নিয়ে আলোচনার ফোরাম হিসেবে কাজ করতে থাকে। এরকম একটা সমিতি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল এবং তাঁরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহীর মতো দূরবর্তী জেলাগুলোতে বসবাসকারী ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণভাবে নারীজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে কেশব সেনের স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী 'আর্য নারীসমাজ' স্থাপন করেন (১৮৭৭)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহিলারা 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' গঠন করেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বর্ণকুমারী দেবী স্থাপন করেন 'সখী সমিতি' (১৮৮৬)। জেলাগুলোতেও একই ধরনের বেশ কিছু সংগঠন কাজ করতে থাকে। ব্রাহ্ম সংস্কারবাদীরা মাসিক *বামাবোধিনী পত্রিকা*, সাপ্তাহিক *অবলাবান্ধব* (১৮৬৯), মাসিক *পরিচারিকা* (১৮৭৮) প্রভৃতি মহিলা সাময়িকী প্রকাশ করেন।

কেশবপন্থী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের ঐকান্তিক সংস্কারনীতির বিপরীতে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির সামাজিক বিমুক্তির প্রশ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতা অবলম্বন করেন। ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরপর আরো তরুণী পাশ করেন। এতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে নৈষ্ঠিক আদি ব্রাহ্মরা দ্রুত তত্ত্ব দাঁড় করালেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলি মেয়েদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বেশি কঠিন এবং সেগুলি নিয়ে লেখাপড়া করতে গেলে তাদের নারীসুলভ গুণাবলীর মারাত্মক ক্ষতি হবে।[৬৭] কিন্তু এসব জ্ঞানবিস্তারবিমুখ লোকদের একেবারে হতাশ করে কাদম্বিনী ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু

৬৭. 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, মার্চ ১৮৮১। পুনর্মুদ্রিত, ঘোষ, *সমাজচিত্র*, ২ : ৩৬২-৬৬।

করলেন। ঐ বছরে বি.এ. ডিগ্রি অর্জনকারী দ্বিতীয় মহিলা ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, যিনি ১৮৮৪ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ এম. এ. পাশ করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক আবেগময় কবিতায় ঐ দুই কৃতী নারীকে অভিনন্দন জানান।[৬৮] আর প্রবীণ বিদ্যাসাগর ক্যাসেল সম্পাদিত এক খণ্ড *ইলাস্ট্রেটেড শেক্সপিয়র* উপহার দিয়ে মেধাবি চন্দ্রমুখীকে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ সাল থেকে মহিলারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বসার অধিকার পেলেন এবং তাঁদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি হতে লাগলো। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হলে শিক্ষিত ভারতীয় মহিলারা একটি স্মারক কমিটি গঠন করেন এবং তহবিল সংগ্রহ করে তাঁদের সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে হৃদয়বান বান্ধব বিদ্যাসাগরের নামে বীটন স্কুলে একটি ছাত্রীবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চশিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙালি মহিলারা উনিশ শতকের শেষপাদে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, সমাজসেবা তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো নানাক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেন। তবে এই অগ্রগতির বিস্তার ছিল খুবই সীমিত এবং তার প্রায় পুরোটাই ব্রাহ্মসম্প্রদায় ও উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের একাংশের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থেকে যায়। মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের দেশে বৃটিশ উপনিবেশবাদ যে ধরনের আর্থ-সামাজিক জঙ্গমতার জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত ছিল ঐ সীমাবদ্ধতার কারণ।

তিন. সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্র

জাতিভেদবিরোধী আলোচনা

উনিশ শতকে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত আন্দোলন হয় নি, যদিও ঐ প্রথা ও তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দসহ কয়েকজন সংস্কারক প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিলেন। রামমোহন তাঁর লেখার অনেক জায়গায় জাতিভেদের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং *বজ্রসূচি* নামক যে মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থে জাতিভেদকে কঠোর ভর্ৎসনাময় ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে সেটিরও আংশিক তরজমা করেছিলেন। ডিরোজিওপন্থীরাও হিন্দুধর্মের অন্য সকল প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস ও আচরণের মতো জাতিভেদেরও কঠোর সমালোচনা করেন। ডিরোজীয়ান রামতনু লাহিড়ী ও ব্রাহ্ম রাখালদাস হালদার তাঁদের ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষদের শেষ চিহ্নরূপে বিদ্যমান উপবীতসূত্র পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণদের সাথে কায়স্থ জাতীয় ছাত্রদেরও বেদের পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেন। অব্রাহ্মণ বংশীয় কেশবচন্দ্র সেনকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদ দিয়েছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুচর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপবীত ত্যাগ, ব্রাহ্মদের মধ্যে জাতিভেদ বিলোপ, অসবর্ণ বিবাহ এবং জাতির প্রসঙ্গ উহ্য রেখে পৌরোহিত্য করার অধিকারসহ

---

৬৮. 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে' শীর্ষক কবিতা, *হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৭১), ৪১৮-১৯।

আরো মৌলিক সংস্কার দাবি করেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে আর একজন উদ্যমী সক্রিয়তাবাদী ছিলেন কেশবানুসারী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫)। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তিনি নিজে 'অস্পৃশ্য' লোকদের সাথে আহার করে এবং তাদেরকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' শীর্ষক লেখা দু'টিতে জাতিভেদকে আক্রমণ করেন এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিকে নিকৃষ্ট সমাজতত্ত্ব বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মনে করতেন, জাতিভেদ কেবল বিদেশী দখলদারির আমলেই জরুরি। তাছাড়া তিনি একটি নমনীয় জাতিপ্রথার কল্পনা করেছিলেন, যেখানে একটি বিশেষ আচরণবিধি অনুসরণ করে ব্যক্তি সামা-জিক সোপান ধরে উপরে উঠতে পারতো।[৬৯] জাতিপ্রথার এসব সমালোচনা প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করে দেয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা, বৈধতা ও ঐতিহাসিক ফলাফল সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু সংস্কারকদের অর্ধোদ্যম, ব্রাহ্ম আন্দোলনের ব্যর্থতা, পুনরুত্থানবাদীদের বিরোধিতা ও নব্যহিন্দুদের ঔদাসীন্যের ফলে সামগ্রিকভাবে জাতিপ্রথায় কোন বড় পরিবর্তন সাধিত হয় নি।

মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন

১৮৫০-এর দশক নাগাদ কলকাতার যুবসমাজে, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠীটিতে পানাসক্তি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্য ঔপনিবেশিক ইঙ্গবঙ্গ কৃষ্টির এই দোষাবহ দিকটির অজস্র সাক্ষ্য বহন করে।[৭০] ১৮৬০ সাল নাগাদ একাধিক সাহিত্যকর্মে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে শুরু করে। এসব লেখার মধ্যে ছিল মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন *চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা* (১৮৫৮), প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) উপন্যাস *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) ও নক্‌শা *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* (১৮৫৯), মাইকেল মধুসুদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০), এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০) *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* (১৮৬২-৬৪)। ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে 'ভারত সংস্কারক সভা' *মদ না গরল* নামে একখানি পত্রিকা বের করলে আন্দোলনটি সংগঠিত আকার লাভ করে। সভা পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার এক হাজার কপি বিনা মূল্যে বিতরণ করতো।[৭১] ব্রাহ্ম নেতা রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরে একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে বিরোধিতা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।[৭২]

---

৬৯. মুখোপাধ্যায়, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সামাজিক প্রবন্ধ*। দেখুন, *ভূদেব রচনাসম্ভার*, ৮৯-৯১, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৪।

৭০. পাশ্চাত্য শিক্ষা কিভাবে কলকাতার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে মদ্যপানের ভয়ংকর বিস্তার ঘটিয়েছিল তার একটি সুষ্ঠু বিবরণের জন্য দেখুন, নীলিমা ইব্রাহিম, *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক* (ঢাকা, ১৯৬৪), ৮৪-৯৮।

৭১. জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* (কলকাতা, ১৯৭৪), ১০৬।

৭২. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, ৩য় সং., (কলকাতা, ১৯৫২), ৮২।

এরপর বিখ্যাত 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' (বঙ্গীয় মদ্যপান নিবারণী সভা) স্থাপিত হয় ১৮৬৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ সরকার (১৮৩২-৭৫) হিন্দু কলেজে শিক্ষিত প্রগতিমনা সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কার কর্মসূচির সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। সোসাইটি *ওয়েল-উইশার* (মঙ্গলকামী) নামে একখানি ইংরেজি ও *হিতসাধক* নামে একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। সোসাইটির কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) শীর্ষক প্রহসন লিখে স্বয়ং কবি মধুসুদনকেই ইংরেজিশিক্ষিত, মিলটন্-আওড়ানো, মাতাল নিমচাঁদ দত্ত রূপে চিত্রিত করলেন। অন্যান্য লেখকদের রচিত অনুরূপ আরো নাট্যরচনা দ্রুতগতিতে প্রকাশিত হতে লাগলো। এগুলোর মধ্যে ছিল নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বারুণী-বিলাস* (১৮৬৭), জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের *সুধা না গরল* (১৮৭০) এবং মদনমোহন মিত্রের *মনোরমা* (১৮৭২)। ১৮৭০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেনের *সুলভ সমাচার* পত্রিকা পানদোষের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ চালাতে থাকে। ক্রমে আন্দোলনের কিছু ফল ফলতে শুরু করলো এবং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দু নীতিবোধ ধীরে ধীরে ইঙ্গবঙ্গ কৃষ্টির উপরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তবে পানদোষ সহজে নির্মূল হতে চায় নি। ১৮৮৯ সালেও স্বয়ং পানদোষে দুষ্ট নাট্যকার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা *প্রফুল্ল* নাটকে (যাতে তিনি নিজেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) এক কঠোর আত্মসমালোচনার অবতারণা করেন। অর্থাৎ একজন মদ্যপ নিজেই পানাসক্তি নিবারণ আন্দোলনে সামিল হলেন। ১৮৯০-এর দশকেও 'কালনা চরিত্র সংশোধনী সভা'র মত অনেক সংস্থা বাঙালি তরুণদের মধ্য থেকে পানাসক্তি উচ্ছেদ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল।[৭৩]

শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা মোচনের আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ দিকের সংস্কারবাদীদের কয়েকজন শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থাকে নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৮৪০-এর দশকের প্রথম দিকে ডিরোজিয়ানদের মুখপত্র *বেঙ্গল স্পেকটেটর* (বঙ্গদর্শক)-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারি শোষণে বাংলার কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে লেখা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনাকালে (১৮৪৩-৫৫) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* কৃষকদের, বিশেষত নীলচাষীদের করুণ অবস্থার উপর নিবন্ধ প্রকাশ করতো। ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সময় শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১ ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) বিদ্রোহী রাইয়তদের অনুকূলে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* (হিন্দু দেশব্রতী) ও *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় অনেক লিখেছিলেন। ওই বিদ্রোহ শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার প্রতি শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের দুঃখবিমোচনের জন্য শিক্ষিত শ্রেণীর

৭৩. গোস্বামী, *বাংলা প্রহসন,* ১১০-১১। কালনা পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা শহর।

উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় অনেক লেখা ও কাজের মধ্যে। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) রচিত বিখ্যাত নাটক *নীলদর্পণ* (১৮৬০)-এ নীলচাষীদের দুর্দশা ও নীলকর সাহেবদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র আঁকা হয়। *নীলদর্পণের* অনুকরণে রচিত মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-এর *জমিদার দর্পণ* (১৮৭৩) কৃষকদের উপর জমিদারি অত্যাচারের জ্বলন্ত আলেখ্য। অনুরূপভাবে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রচিত *চা-কর দর্পণ* (১৮৭৫) আসামে চা-বাগানের শ্রমিকদের করুণ দশার প্রতি শিক্ষিত জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৮৭০-এর দশকে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের যুগেও যাঁরা সংস্কারবাদ ও বৃটিশ আনুগত্য সোৎসাহে ধরে ছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীরা সমাজ-সংস্কারকেই তাঁদের ধর্মবহির্ভূত কাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। ১৮৭০ সালে বিলাত থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র সমাজসংস্কারের এক বর্ধিত কর্মসূচি হাতে নেন, যার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণও ছিল। *সুলভ সমাচার* নামে তিনি একটি পত্রিকা বের করেন, যার প্রতি কপির দাম ছিল মাত্র এক পয়সা : দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই পত্রিকা অনেক বছর ধরে নিম্নবর্গের মানুষদের পক্ষে লিখেছিল। কেশবের অনুসারী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) শ্রমিকদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় ও 'শ্রমজীবী সমিতি' (১৮৭০) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশ করেন *ভারত শ্রমজীবী* পত্রিকা [৭৪], এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কেশবের অপর শিষ্য শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) 'শ্রমজীবী' শীর্ষক কবিতায় সকল শ্রমিককে জেগে উঠার এবং অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।[৭৫] আরো দুই কেশবপন্থী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) ও রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬-১৯০১) শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক হিসেবে দ্বারকানাথ অন্যদের সাথে মিলে কৃষকদেরকে 'রাইয়ত সভা'য় সংগঠিত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য দ্বারকানাথের কাজ আরো উল্লেখযোগ্য। তিনি ও রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামে গিয়ে চা-বাগানের কুলিদের (অর্থাৎ শ্রমিকদের) সাথে বাস করে বাগানের বাস্তব পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা বাগানমালিকদের নির্মম শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন আকারে *সঞ্জীবন* ও *বেঙ্গলি* পত্রিকায় সত্তরের দশকের শেষ দিকে ও আশির দশকে প্রকাশিত হয়। আসামের কুলিদের জীবন নিয়ে লেখা দ্বারকানাথের "স্লেভরি ইন ইন্ডিয়া" শীর্ষক ধারাবাহিক *বেঙ্গলি* পত্রিকায় ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়, এবং ১৮৮৭ সালে রামকুমার বের করেন তাঁর *কুলিকাহিনী* গ্রন্থ। ১৮৮৭ সালেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রমিকদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার আদায় করতে

---

৭৪. বসু, *চরিতাভিধান*, ৫০৮।

৭৫. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *পিটিশন টু এজিটেশন : বেঙ্গল , ১৮৫৭-১৮৮৫*, আবেদন থেকে আন্দোলন : বাংলা ১৮৫৭-১৮৫৮, কোলকাতা ও নয়া দিল্লী, ১৯৮৫), ১৯৭।

সক্ষম হন দ্বারকানাথ। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কুলি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এসব আন্দোলনের ফলে চা-বাগানের শ্রমিক সংক্রান্ত আইন ১৮৮৯, ১৮৯৩ ও ১৯০১ সালে সংশোধিত হয়ে কুলিদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি ঘটায়।[৭৬]

শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশামুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন উনিশ শতকে কোনো প্রশংসনীয় সফলতা পায় নি। এ বিষয়ে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের কাজই ছিল সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের সক্রিয়তাবাদের শেষ পর্যায়, এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিসেবে তাদের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও এখানেই মেলে। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার প্রতি আগ্রহ কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের দোটানার অনুপ্রবেশ ঘটায়। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার জন্য হিন্দুধর্ম নয়, বরং বৃটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই দায়ী ছিল, তাই ঐ শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন বৃটিশ শাসকদের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাতে পারতো। ফলে ঐ আন্দোলন কেশবের রাজানুগত্যের নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই শ্রমিকসমস্যা নিয়েই কেশব, দ্বারকানাথ ও রামকুমারকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হতে হয়। এই বৈপরীত্য বিশ শতকে ব্রাহ্মদেরকে কঠিন সংকটে ফেলে দেয়। তাঁদেরকে হয় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে হয়, নতুবা ধর্মবিশ্বাস ও বৃটিশ আনুগত্যে অবিচল থেকে জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব ও গুরুত্ব হারাতে হয়।

সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বিরোধী আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাল্যবিবাহ ছাড়া অপর যে নির্দিষ্ট সংস্কার প্রশ্ন নিয়ে কথঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা হচ্ছে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, যা ছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় কর্তৃত্বের আরোপিত বিবিধ বিধিনিষেধের একটি। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ও কেশবচন্দ্র সেনের ইংল্যান্ড ভ্রমণ সত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দুরা সমুদ্রপথে বিদেশ গমনের ঘোরতর বিরোধী থেকে যায়, এবং ঐ নিষেধাজ্ঞা লঙ ঘনকারীরা সামাজিক শাস্তিস্বরূপ সমাজচ্যুতি ও আনুষঙ্গিক নানা অক্ষমতার শিকার হতেন। কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক বিনয়কৃষ্ণ দেব (১৮৬৬-১৯১২) ১৮৯০-এর দশকের প্রথমে নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল করার জন্য এক আন্দোলন শুরু করেন। সমুদ্রযাত্রার সপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থন চেয়ে বিনয়কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিনয়কৃষ্ণের চিঠির উত্তরে (জুলাই ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়ে বলেন যে, শাস্ত্র অবলম্বনে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা নিরর্থক। কারণ

> সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত।... ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা

৭৬. এই অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহ নেয়া হয়েছে, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *পিটিশন টু এজিটেশন*, পৃ. ২০৪-০৯ থেকে।

> গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। ... দেশাচার পরিবর্তনের জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ নীতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করেন এই যুক্তির ভিত্তিতে যে কাজটি ধর্মশাস্ত্রবিরোধী হলেও সমাজের জন্য হিতকর এবং হিন্দুদের 'সনাতন ধর্ম' বা শাশ্বত নীতিমালার পরিপন্থী নয়।[৭৭]

এখানে আমরা উনিশ শতকীয় সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি নব্যহিন্দু মনোভাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এই নিবন্ধের পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বিষয়টি আলোচনা করতে যাচ্ছি। তবে বিনয়কৃষ্ণ দেবের তৎপরতা আসলে ছিল একটা অপ্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে, কেননা জনগণের মন থেকে ঐ সংস্কারের প্রভাব দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। ১৮৯৩ সালে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকা গেলেন পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বক্তব্য উপস্থাপন করতে।

চার. নব্যহিন্দু বিকল্প

উনিশ শতকী সংস্কারবাদের নব্যহিন্দু সমালোচনা

সমাজসংস্কার সম্পর্কে নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্রাহ্মদের তথা বিদ্যাসাগরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নব্যহিন্দু চেতনায় যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল তা কখনো ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে সংস্কার গ্রহণের ধারণা গলাধঃকরণ করতে পারে নি। সংস্কারকরা সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনা করায় সমগ্র হিন্দু সভ্যতার উপর যে নিন্দা আরোপিত হয়েছিল তাও নব্যহিন্দুদের চরম বিরক্তির কারণ ছিল। তাছাড়া সংস্কারকদের অনুসৃত বিক্ষিপ্ত ও সীমিত সংস্কারকার্যক্রমের ব্যর্থতা ১৮৮০-এর দশক নাগাদ সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করলেন যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল—১. জাগতিকতা ও বিদেশী রীতির অনুকরণপ্রবণতা; ২. সংস্কারকের ব্যক্তিগত বাহাদুরি প্রদর্শন; ৩. ঐতিহ্যবাহী পুরাগত পাণ্ডিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; ৪. দেশের ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতা লাভের জন্য সংস্কারকদের স্থূল আগ্রহাতিশয্য। তাই ভূদেব অভিযোগ করেন যে, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা ঐসব সংস্কারকের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল না।[৭৮] এই পটভূমিতে সমাজের সমস্যার প্রতি নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একদিকে জাতীয়তাবাদী এবং অপরদিকে সামগ্রিকতাবাদী। হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ ও অন্তর্কলহ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপের সাথে তাঁরা সহযোগিতা করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা সংস্কারের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন পুনরুজ্জীবন ও প্রবৃদ্ধির কার্যক্রম অর্থাৎ নির্বাচিত ব্যাধির পৃথক পৃথক প্রতিবিধানের পরিবর্তে সাধারণভাবে জনগণের চেতনার উদ্বোধন।

---

৭৭. বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা বঙ্কিমের চিঠি (২৩ জুলাই ১৮৯২). *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৯২৬-২৭।

৭৮. মুখোপাধ্যায়, *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), *ভূদেব রচনাসম্ভার*, ২৫৭।

সংরক্ষণের মাধ্যমে সংস্কার

ভূদেব মুখোপাধ্যায় আরো উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবর্তমানে সমাজসংস্কার সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর অর্থ এই নয় যে সমাজেরও মৃত্যু ঘটেছে; আর যথাসময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় সমাজকে যেকোন মূল্যে রক্ষা করতেই হবে।।[৭৯] এরকম আত্মশাসন তেমন কোন সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে জাতিভেদের কড়াকড়ি সমাজ সংরক্ষণের জন্য জরুরি। স্বাধীন অবস্থায় জাতিপ্রথায় স্বতঃস্ফূর্ত শিথিলতা আসবে এবং আদিবাসী ও নিম্নজাতীয় মানুষেরা সোপান বেয়ে জাতিপ্রথার সর্বোচ্চ শিখরেও আরোহণ করতে সক্ষম হবে।[৮০] এ ছিল ১৮৭৫ সালে ভূদেবের অবস্থান। কিন্তু ১৮৯২ সাল নাগাদ তিনি এ অবস্থান থেকে সবে যান এবং জাতিপ্রথার কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস হয় যে, ভারতের অপ্রতিবিধেয় জাতিগোষ্ঠীগত অনেকত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঐ প্রথার নৈসর্গিক মূল। তবে তিনি অসবর্ণবিবাহ রোধের মাধ্যমে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষাতেই মাত্র আগ্রহী ছিলেন। জাতিগত পেশা অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করায় তাঁর আপত্তি ছিল না।[৮১] নারী জাতির অবরোধপ্রথার ব্যাপারে ভূদেব তত্ত্ব দিলেন যে, এটি বিদেশী দখলদারি ও তজ্জনিত সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সরাসরি ফল। বিদেশী শাসন ও স্বৈরাচারী সরকারের অবসান ঘটলে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই অবরোধপ্রথা বিলুপ্ত হবে এবং বহুবিবাহ বহুলাংশে কমে যাবে। অবরোধ বিদায় নিলে বহির্গামী মহিলাদের পোশাক-আশাকেও কিছু পরিবর্তন আসবে।[৮২]

ভূদেব সমাজসংস্কার সম্পর্কে তাঁর ধারণাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) গ্রন্থে। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞান সীমিত ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় তার নীতিসমূহ ভূদেবের মতে ভারতীয় সমাজে প্রযোজ্য নয়। পাশ্চাত্যের সাম্যের ধারণা ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক অসাম্যের উপরেই হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সমাজের সংস্কার ঐ মুহূর্তের প্রয়োজন ছিল না, বরং প্রয়োজন ছিল ঐ সমাজ সংরক্ষণ, ঐ সমাজে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করা। সমাজসংস্কারের কাজে তড়িঘড়ি করার কোন দরকার ছিল না ভূদেবের মতে। আর সমাজসংস্কারের যেকোন প্রচেষ্টার আগে সমাজকে অবশ্যই ধৈর্যসহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। যেসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা সমাজের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল, কেবল তাঁরাই সামাজিক নিয়ম সংস্কারের কাজ হাতে নিতে পারেন।

---

৭৯. তদেব, ৪৯।

৮০. *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, তদেব, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৪।

৮১. *সামাজিক প্রবন্ধ*, তদেব, ৯০, ১৯২-৯৩, ১৯৯।

৮২. *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, তদেব, ৩৬৮, ৩৭২।

অন্যদের সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টার ফলে বিশৃঙ্খলা এবং দেশের সামাজিক নিয়ম ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি মহাত্মারাও হয়তো সকল বিষয়ে একমত হবেন না এবং আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে কোন 'নেতৃ মহাপুরুষ'-এর আগমনের। মসিহ ধরনের এই মহানায়ক হবেন একজন সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা থাকবে যে, তিনি সকল মতের এক মহাসমন্বয় ঘটিয়ে পরিবর্তন, সংস্কার ও প্রগতির জন্য সর্বতোভাবে সঠিক পন্থাটি উদ্ভাবন করতে পারবেন।[৮৩]

সাধারণভাবে ভূদেব সমাজসংস্কারের এই নীতিমালাগুলো নির্ধারণ করেন : ১. সংস্কার অবশ্যই জাগতিক ভোগের পথ পরিহার করে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করবে; ২. এর লক্ষ্য হতে হবে হিন্দু সমাজ সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা; ৩. এতে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার পরিবর্তে সাধারণভাবে সমাজের নেতৃবর্গের সমর্থন থাকতে হবে; এবং ৪. ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাথে পরামর্শ করে তবে হিন্দু সমাজের জন্য সংস্কারনীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং রচিত সংস্কারপরিকল্পনায় তাঁদের সমর্থন থাকতে হবে। উপসংহারে ভূদেব অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসংস্কারের কৌশল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন :

> স্বদেশীয় বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচার, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, যৌথ কারবার বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প রক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তার; সালিসি প্রণালীর সম্বর্ধন, সদাচার পালন— এইরূপ বিষয়গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজসাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা-সাধন হয়।[৮৪]

পুনরুজ্জীবনের দর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ মানব কৃষ্ণ সমাজসংস্কারের ধার ধারেন না, বরং তাঁর লক্ষ্য :"দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনরজ্জীবন, ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন...। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনিই ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না।"[৮৫] সমাজপরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে 'ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি'র এই ধারণা বঙ্কিম পুনর্ব্যক্ত করেন ১৮৯২ সালে বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত একটি চিঠিতে।[৮৬]

জাতিপ্রথা ও নারী জাতির সমস্যা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উদার মত পোষণ করতেন, কিন্তু তিনি উপর তলা থেকে ঐসব কুপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কোন শোরগোল তোলা থেকে বিরত

৮৩. *সামাজিক প্রবন্ধ*, তদেব, ২৯,৪৫-৪৮, ৯৯-১০১, ১১৯-২১, ১৮১, ১৯৬, ২১৯-২০, ২২২, ২২৭-২৯।

৮৪. তদেব, ২৫৭।

৮৫. "কৃষ্ণচরিত্র", *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৫০৬।

৮৬. তদেব , ৯২৬।

থাকেন। শিক্ষার মাধ্যমে প্রশস্ততর চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তিনি সেগুলির উচ্ছেদ কামনা করতেন। জাতিপ্রথা ও নারীত্বের ধারণার নতুন ব্যাখ্যাও বঙ্কিম দিয়েছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি জাতিপ্রথাকে আক্রমণ করেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ভারতের অধঃপতন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক অবনতির একটা পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়া, যা প্রথমে বৈশ্য-শূদ্র জনতার অবনমন ঘটায় এবং তারপর উল্টো অবক্ষয়িত উচ্চবর্ণের উপর আঘাত হানে।[৮৭] ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *সাম্য* পুস্তিকায় বঙ্কিম এই ধারণা পুনর্ব্যক্ত করেন।

অতএব বঙ্কিম গণশিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের সাধারণ উন্নয়ন ঘটানোর প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে, এমনকি "সঙ্কর জাতির বাহুল্য...আধুনিক সমাজের উপকারী।"[৮৮] ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বহুবিবাহবিরোধী পুস্তিকার সমালোচনা (*বঙ্গদর্শন*, জুন ১৮৭৩) করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন যে, সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহের উপর বিদ্যাসাগরের নির্ভরশীলতা নীতিগতভাবে ভ্রান্ত, কারণ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কোন ঐক্যবদ্ধ বিধিমালা ধারণ করে না এবং ওগুলি বিপরীত উদ্দেশ্যেও সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি ভারতের অবনতির জন্যও ধর্মশাস্ত্রগুলির সংখ্যাধিক্য ও পরস্পরবিরোধিতাকে দায়ী করেন।[৮৯] 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ তিনি ধর্মশাস্ত্রগুলিকে নিম্নবর্ণের মানুষদের আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণদের তৈরি ফাঁদ বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং *সাম্যতে* ঐ অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। পরবর্তী অনেক লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মশাস্ত্রগুলিকে ক্ষতিকর প্রবৃদ্ধি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৯০] সংস্কারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রভিত্তিক প্রচেষ্টাকে এভাবে বাতিল করে দিয়ে বঙ্কিম 'নারী প্রশ্নে' তাঁর নিজস্ব সমাধান পেশ করার অবকাশ পান। *সাম্য*-তে তিনি শিক্ষায় নারীর অধিকার, বিধবার পুনর্বিবাহ, অবরোধপ্রথার অবসান, বহুবিবাহ নিরসন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং পেশা অবলম্বনপূর্বক তাদের অর্থ উপার্জনের অধিকারের সপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সমুদয় দোষের একমাত্র প্রতিকার হিসেবে বঙ্কিম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেন : "শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।'[৯১] তারপর স্বীয় উপন্যাসগুলিতে বীরাঙ্গনা নারীকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে তিনি নারীত্বের ধারণাই পাল্টে দেয়ার প্রয়াস পান।

---

৮৭. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৩০২-০৪।

৮৮. *গীতার* ৩.২৪ শ্লোকের বঙ্কিমকৃত ভাষ্য, তদেব, ৭৫৯।

৮৯. তদেব, ৩১৫-১৭।

৯০. *কৃষ্ণচরিত্র, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম*, এবং বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত পত্র (২৩ জুলাই ১৮৯২); তদেব, ৫৬৭, ৭৭৭, ৯২৭।

৯১. তদেব, ৩৩৯-৪০৬। উদ্ধৃতি ৪০৬ পৃষ্ঠায়।

দ্রৌপদীকে নিয়ে লেখা দুই অংশে বিভক্ত একটি নিবন্ধে বঙ্কিম গর্বিতা ও নিজ অধিকার সম্পর্কে মুখরা ঐ পাণ্ডবমহিষীকে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রথম সারির মহিলাদের মধ্যে (সীতাসহ একত্র) সর্বোচ্চ স্থান দেন।[৯২]

সামাজিক উন্নতির ধারণা

স্বামী বিবেকানন্দও সমাজসংস্কারের প্রতি অনুরূপ অবিশ্বাস ব্যক্ত করে সামাজিক প্রশ্নের মোকাবেলা করার জন্য এক বিকল্প পথের প্রস্তাব দেন। রামমোহন রায়ের মতো তিনি জাতিভেদের কুসংস্কার ও নারী জাতির অবনমনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। তিনি বলেন: "ভারতে দু'টি অমঙ্গল বিদ্যমান—নারীকে পদদলিত করা আর জাতিভেদের বিধিনিষেধের যাঁতাকলে দরিদ্র শ্রেণীকে নিষ্পেষণ করা।"[৯৩] কিন্তু এসব দোষের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদীদের পদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেন নি। জাতীয়তাবাদী ভঙ্গিতে তিনি সামাজিক ব্যাপারে সংস্কারবাদীদের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ঐ হস্তক্ষেপের ফলে পরস্পরবিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল এবং গালিগালাজপূর্ণ ভাষায় লেখা বিপুলায়তন এক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যা 'জাতিগোষ্ঠীর', 'দেশের' ও 'জাতির' জন্য লজ্জাজনক। বিবেকানন্দ আরো উপলব্ধি করেন, "গত এক শতাব্দী যাবৎ যেসব সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা হয়েছে তার বেশির ভাগই ছিল আলঙ্কারিক।"[৯৪] সংস্কারবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তিনি মন্তব্য করেন :

> বিধবাবিবাহের প্রশ্ন ভারতীয় মহিলাদের শতকরা সত্তর জনকে স্পর্শ করে নি এবং এরকম সকল প্রশ্নই জনগণকে বাদ দিয়ে কেবল যারা শিক্ষিত সেই উচ্চবর্ণের লোকদের কাছেই পৌছায়।[৯৫]

এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে বিবেকানন্দ সামাজিক উন্নতির এক সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপরেখা দেন ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে দেয়া 'মাই প্ল্যান অব ক্যাম্পেইন' শীর্ষক

---

৯২. দ্রৌপদী', তদেব, ১৯৮-২০০।

৯৩. স্বামী বিবেকানন্দ, *আওয়ার উইমেন* [আমাদের নারী], ৪৮; উদ্ধৃত, রমা চৌধুরী, "সোশিও-লজিক্যাল ভিউজ অব স্বামী বিবেকানন্দ এ্যান্ড হিজ আইডিয়াজ অব সোশ্যাল রিফর্ম, আপলিফট অব উইমেন এ্যান্ড ম্যাসেস" [স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক মতামত এবং তাঁর সমাজসংস্কার সম্পর্কিত ধারণা—নারী ও জনগণের উন্নয়ন]; আর. সি. মজুমদার (সম্পা.), *স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টেনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম* [স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ], (কলকাতা ১৯৬৩), ৪০০। ভাষান্তরিত।

৯৪. স্বামী বিবেকানন্দ, 'মাই প্ল্যান অব ক্যাম্পেইন' [আমার অভিযান পরিকল্পনা], *কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ* [স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনা], ৮ খণ্ড, মায়াবতী মেমোরিযাল সং., ১২ শ পুনর্মু., (কলকাতা ১৯৭৯), ৩ : ২১৫-১৬। ভাষান্তরিত।

৯৫. তদেব, ২১৬।

বিখ্যাত ভাষণে। সেখানে তিনি মনশ্চক্ষে দেখেন দেশের এক সার্বিক আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন, যা আসবে জনগণের মধ্যে উপনিষদের এই বাণী প্রচারের মাধ্যমে যে তারা পরমাত্মা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। এই সর্বেশ্বরবাদ থেকেই তিনি নির্মাণ করেন এক ব্যাপক সমাজসেবা কর্মসূচি, যার মধ্যে ছিল : ১. গণশিক্ষা, ২. দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা এবং ৩. প্রতীচ্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক লেনদেন অর্থাৎ হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিনিময়ে বিজ্ঞান তথা সামাজিক ও বৈষয়িক প্রগতির কলাকৌশল আমদানি।[৯৬] এই কর্মসূচিতে নারীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। স্বীয় অনুসারীদের তাগিদ দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন : "কখনো ভুলো না আসল কথা হচ্ছে : নারীসমাজ ও জনগণ।"[৯৭] এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের যন্ত্র হিসেবে তিনি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। নারীত্বের একটা নতুন ধারণা প্রণয়নের জন্য বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ বাংলার শক্তি-তান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করেন নি। নারীর বীর প্রকৃতি ছাড়াও তাদের মধ্যেকার মাতৃত্বকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই সমুদয় ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আলোচ্য তিনজন নব্যহিন্দু নেতার কেউই উনিশ শতকের সংস্কারকদের শ্রেণীতে পড়েন না। সংস্কারকদের বিরোধী তো তাঁরা ছিলেনই, তাছাড়া নিজস্ব কোন আন্দোলন গড়ে তোলার অবকাশও তাঁরা পান নি বললেই চলে। ভূদেব ও বঙ্কিমের প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক, আর বিবেকানন্দ স্বীয় ভাবধারায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পপুলিস্ট বা জনপ্রিয়তাবাদী ভঙ্গিতে ভ্রমণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর আদর্শ মোতাবেক গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। ইতিহাসে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রকৃত অবদান ছিল অনুপ্রেরণামূলক, ততোটা বাস্তব নয়। ঐতিহাসিক কারণে ঐ প্রেরণা যতোটা না সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল, তার চেয়ে বেশি ফলিয়েছিল রাজনৈতিক ফল।

পাঁচ. বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার

বাঙালি হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক রূপান্তরের কাহিনী এতো বিরাট যে তার যথাযোগ্য আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক উপাদান ছিল হিন্দুদের চিন্তাধারায় কতিপয় ইউরোপীয় দার্শনিক ধারণার আমদানি। রামমোহন রায় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন শুরু করেন এক জোরালো যুক্তিবাদ অবলম্বন করে। এই যুক্তিবাদ এবং পরে উপযোগবাদ ছিল বহুদেববাদ ও

---

৯৬. নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ১৫৩।

৯৭. সিস্টার নিবেদিতা, *দ্য মাস্টার এ্যাজ আই স হিম* [গুরুজীকে আমি যেমন দেখেছি], ৩য় সং, ৩৫৭; উদ্ধৃত, রমা চৌধুরী, 'সোশিওলজিক্যাল ভিউজ অব স্বামী বিবেকানন্দ', আর. সি. মজুমদার, *সেন্টেনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম*, ৪০০।

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই-এ তাঁর প্রধান অস্ত্র। যুক্তিবাদই নিয়ন্ত্রণ করতো ডিরোজীয়ানদের চিন্তাধারা এবং বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার রূপদানেও যুক্তিবাদের ভূমিকা ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে যুক্তিবাদ বিজ্ঞানবাদের রূপ নেয় এবং শতাব্দীর শেষাংশে বিজ্ঞান বাঙালি হিন্দুর একটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহজাগতিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছিল অক্ষয়কুমার তথা বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন দত্ত এই দুই মুখ্য মানববাদীর মধ্যে। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি হিন্দুর চিন্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে জাতীয়তাবাদ। এই ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের রচনায় তথা শতাব্দীর শেষ তিন দশককালের বিশাল নব্যহিন্দু সাহিত্যে। ঐ একই সময়ে জাতীয়তাবাদী আবেগকে শক্তি যোগাতে ইতিহাসচর্চার একটি বলবান ধারাও গড়ে ওঠে। অগুস্ত কোঁতের দৃষ্টবাদ, চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ, এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের সমাজবাদ উনিশ শতকের শেষাংশে বাঙালি হিন্দুর চিন্তাধারায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল।

উপসংহার

উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন বাংলায় হিন্দু সমাজ ও চিন্তাধারায় ব্যাপক রূপান্তর আনে। হিন্দু বহুদেববাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুরু হয়েছিল যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন, তা পরিণতি পেল হিন্দুধর্মের এক সর্বেশ্বরবাদী পুনরুপস্থাপনে, যার লক্ষ্য ছিল সকল ধর্মের মাঝে বিদ্যমান মৌলিক ঐক্য (একরূপতা নয়) [unity, not uniformity] তথা তাদের সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার মর্মবাণী প্রচার করে ধর্মীয় সংঘর্ষের অবসান ঘটানো। সমাজসংস্কার আন্দোলন কতিপয় হিন্দু ও ঔপনিবেশিক অনাচার দূর করতে সমর্থ হয়েছিল এবং নারীমুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। কিন্তু এই আন্দোলন যেমন ছিল বিক্ষিপ্ত তেমনই নির্ভর করতো ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের নীতি ও খামখেয়ালির উপর, এবং শেষ পর্যন্ত শতাব্দীর অন্তিম পাদে জাতীয়তাবাদের যুগে তা নেহাৎ কালাতিক্রান্ত ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয়। তখন সংস্কারের স্থান দখল করলো এর নব্যহিন্দু বিকল্প অর্থাৎ পুনরুজ্জীবন ও সমাজসেবা।

কিন্তু পুনরুজ্জীবন ও সেবার কর্মসূচিও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। তার কারণ ছিল দেশটি বিদেশীদের ঔপনিবেশিক দখলে থাকার ফলে যে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তজ্জনিত জরুরি পরিস্থিতি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্য সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে দেখা দিল। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী, মুসলমান এবং সন্ত্রাসবাদী, গান্ধীবাদী ও কমিউনিস্ট—সবাই মিলে বিশ শতককে সংঘাত ও সংঘর্ষময় এক কঠিন সময়ে পরিণত করলো। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বালিকাবধূ ও নিরক্ষরতা রয়ে গেল কম গুরুত্বপূর্ণ সব অবহেলিত এলাকায়। সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন দুই-ই অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ছিল পুরোপুরি হিন্দু এবং এই সীমাবদ্ধতা তাদেরকে কখনো কখনো অহিন্দুদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে নব্যহিন্দুদের পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি হিন্দু

জাতীয়তাবাদের সাথে মিলে হিন্দু স্বাদেশিকতার আধিপত্যের সম্ভাবনাকে বড় করে তুললো। এর ফলে সৃষ্টি হলো মুসলিম প্রতিক্রিয়া এবং এভাবেই বিশ শতকের বিশাল হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা ত্বরান্বিত হলো।

তবে উনিশ শতকে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের যে আন্দোলন হয়েছিল তার ফলই ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু চিন্তাধারায় যুক্তিবাদ ও মানববাদ ফিরে আসে। বিজ্ঞান তথা সহনশক্তি এবং চিন্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এই দুই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নতুন সাহিত্য, নতুন বিজ্ঞান, নতুন শিল্পকলা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের ধারণা শতাব্দীশেষে হিন্দুমনের উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়নের সুস্পষ্ট নিদর্শন। স্থানাভাবের কারণে এই অসাধারণ ঘটনার একটি স্পষ্ট রূপরেখা এখানে দেয়া গেল না। তবে নিশ্চিন্তে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলায় উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারআন্দোলন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের এক অবিরত প্রক্রিয়ার সূচনা করে, যা ঐ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রসারিত হয়।

আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য

ওয়াকিল আহমদ*

আঠারো শতককে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ বলা হয়। অবক্ষয় সমাজে ছিল, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। সমাজে অবক্ষয় কখন, কিভাবে আসে ? বিশেষজ্ঞের মতে—"শাসকশ্রেণীর ইতিবাচক ভূমিকা যখন নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন আসে তার অবক্ষয়ের অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে তার ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের রচনায়ও নেমে আসে ঘন কালো ও বীভৎস ছায়া।"[১] শাসকশ্রেণী তথা প্রভুশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেলে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা অবনমিত হয়। নেতৃত্বহীন সমাজে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, নীতিহীনতা, স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এমন সামাজিক অবস্থায় কোন মহৎ সাহিত্য রচিত হয় না, বরং পূর্বের ধারা রস-রুচি-আদর্শের দিক দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্প্রভ হয়।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতে মুগলশক্তির পতন শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাভূত ও ক্লাইভ জয়ী হন। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রক্ষমতা সামন্তপ্রভু থেকে বণিক-প্রতিনিধির করতলগত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লাইভ কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন। ক্লাইভের সাথে যোগ দেন দেশীয় বণিক জগৎশেঠ। বিদেশী ও দেশী বণিকশক্তির ঐক্য জোরদার হয়ে উঠে, যা দমন করার ক্ষমতা স্বৈরাচারী সামন্তপ্রভুর ছিল না। পলাশীর

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, *মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* (কলিকাতা ১৯৮৭), ১০

প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পতন ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ক্লাইভ-জগৎশেঠের জয় ছিল উঠতি ধনতন্ত্রের জয়। আঠারো শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরকে এই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের জয়-পরাজয়ের প্রস্তুতিপর্ব এবং পরের পঞ্চাশ বছরকে চূড়ান্ত পরিণতিপর্ব বলে আখ্যায়িত করা যায়। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ও পরিবর্তনশীল অবস্থার সমান্তরালে দেখা যায়। যেহেতু সামন্তপ্রভুর পতনের যুগ তার ভাবাদর্শগত ইতিবাচক দিকগুলি ধরে রাখতে পারে নি, সেহেতু এ-সময়ের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মতো সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও অবক্ষয় নেমে আসে। উদীয়মান বণিকশক্তির প্রতিষ্ঠার পর্বেও সমাজ কালান্তরের মধ্য দিয়ে যায়; এই নব্যশ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তখনও গড়ে উঠে নি। ফলে কালান্তর যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নি, বরং ভাব-ভাষা-রীতি-রুচির দিক দিয়ে আরও অবনতি ঘটে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগের ও সমাজের সম্পর্ক ও ভূমিকার কথা মনে রেখে আমরা আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করবো। আলোচনার সুবিধার জন্য এ সাহিত্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—বিষয় ও চিন্তা, আঙ্গিক ও রীতি এবং ভাষা।

বিষয় ও চিন্তা (Theme and Thoughts)

আঠারো শতকে কোন্ কোন্ ধারার কাব্য রচিত হয়? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায়, পূর্ববর্তী শতকে যেসব শাখার কাব্য রচিত হয়, সেসব শাখার কাব্য এ শতকেও রচিত হয়। উপরন্তু তিনটি নতুন কাব্যধারা সংযুক্ত হয়—দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ ও কবিওয়ালা গান। এ-ধারার রচনা কাব্যগুণবিবর্জিত. কিন্তু বেশ জনপ্রিয় ছিল। আঠারো শতকে চিঠিপত্র. দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্রে গদ্যের ব্যবহার ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য ছিল না। গদ্যে সাহিত্য রচনার আর্ট ও আদর্শ লেখকগণ আঠারো শতকে আয়ত্ত করতে পারেন নি, উনিশ শতকে তা আয়ত্ত করেন।

মধ্যযুগের শতকভিত্তিক পরিসংখ্যান নিলে লক্ষ্য করা যায় যে এ শতকে তুলনামূলকভাবে কবি ও কাব্যের সংখ্যা অধিক; তবে দু'চার জন ছাড়া প্রতিভাবান কবি ছিলেন না। অর্থাৎ কাব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর মান নিম্নগামী ছিল। এর কারণ একটিই—দেশ ও জাতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক-নৈতিক অবক্ষয়।

আঠারো শতকে অধিক সংখ্যায় কাব্য রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষার দিগন্ত প্রসারিত হয়। সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষাবিদ্বেষী এক শ্রেণীর পাঠকের প্রতি

কটূক্তি করেন।[২] অনুমিত হয়, রাজভাষা ফার্সির প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল। আঠারো শতকের ফার্সি-উর্দু-হিন্দি ভাষার প্রভাবেই দোভাষী পুঁথির ভাষা ও কাব্যরীতির উদ্ভব হয়। "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে" বলে ভারতচন্দ্র এক তত্ত্ব দিয়ে বসেন এবং নিজেও আরবি-ফার্সি মিশ্রভাষার অংশত অনুশীলন করেন।[৩] তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যাপক ও অবাধ চর্চা এ শতকে জাতির ইতিহাসে একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশিত করে। আমরা জানি, বাংলা ভাষা বাঙালির জাতিসত্তার প্রতীক। রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্বীয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে আঠারো শতকের ব্যতিক্রমধর্মী এ অবদানের গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়। দোভাষী পুঁথির কাব্যরীতি ও ভারতচন্দ্রের কাব্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত টিকে নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০), রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-৮১), ঘনরাম চক্রবর্তী ও হেয়াত মাহমুদ (১৬৯৫-১৭৬৫) এযুগের গৌরবময় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।

বিষয়বস্তুর বিচারে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, অনুবাদকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, পীরপাঁচালী, দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ ও কবিওয়ালা গান এ যুগের প্রধান ধারা। বিবিধের মধ্যে পড়ে ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীত-জ্যোতিষ, জ্ঞানশাস্ত্র ইত্যাদি। এ সময়ের প্রধান প্রধান কবি ও কাব্যের নাম-ধাম-কাল সম্বলিত একটি তালিকা এভাবে তৈরি করা যায়[৪] :

---

২. "যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি ॥ দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াএ। নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়।"- *নূরনামা*, রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদিত), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, (ঢাকা ১৯৮৯), ৪২৭।

৩. অনুদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে দিল্লীতে মানসিংহ-ভবানন্দের মধ্যকার কথোপকথনে আরবি-ফার্সি-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার আছে। এধরনের ভাষা ব্যবহারের পূর্বে ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে এই তত্ত্ব দেন—"উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥ পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥ প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে ॥ " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, (কলিকাতা ১৯৬৩, ৩য় সংস্করণ), ৩০৩।

৪. তালিকাটি প্রণয়নে নিচের পুস্তকগুলির সাহায্য নিয়েছি :
   ক. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, (কলিকাতা ১৯৬৫, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৪)
   খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৩৭৪)।
   গ. অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৬)।
   ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৫৫)।
   ঙ. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৩, ৩য় সংস্করণ)।

মঙ্গলকাব্য

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
চণ্ডীমঙ্গল	মুক্তারাম সেন	দেয়াঙ্গ (চট্টগ্রাম)	সারদামঙ্গল	১৭৪৭
	জয়নারায়ণ রায়	জপসা (ঢাকা)	চণ্ডীমঙ্গল	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
	রামানন্দ যতি	-	অভয়ামঙ্গল	১৭৬৬
	ভবানীশঙ্কর দাস	চক্রশালা (চট্টগ্রাম)	গৌরীমঙ্গল	১৭৮০
			পঞ্চালিকা	-
	শিবচন্দ্র সেন	-	গৌরীমঙ্গল	-
	হরিশচন্দ্র বসু	কালিয়াগ্রাম (রংপুর)	চণ্ডীবিজয়	১৭৩০
	রামশঙ্কর দেব	ধর্মদা গ্রাম (হুগলী)	অভয়ামঙ্গল	-
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট (হাওড়া)	অন্নদামঙ্গল	১৭৫২
	রামপ্রসাদ সেন	কুমারহট্ট (হুগলী)	কালিকামঙ্গল	-
	দ্বিজ রাধাকান্ত	কলিকাতা	শ্যামামঙ্গল	১৭৬৭
	মধুসূদন চক্রবর্তী	দক্ষিণ রাঢ়	কালিকামঙ্গল	-
	নিধিরাম আচার্য	চট্টগ্রাম	কালিকামঙ্গল	১৭৫৬
মনসামঙ্গল	জীবনকৃষ্ণ মৈত্র	লাহিড়ীপাড়া (বগুড়া)	পদ্মাপুরাণ	১৭৪৪
	রামজীবন বিদ্যাভূষণ	বাঁশখালি (চট্টগ্রাম)	মনসামঙ্গল	১৭০৪
	দ্বিজ বাণেশ্বর	রাইপুর	মনসামঙ্গল	১৭১৯
	রাজা রাজসিংহ	সুসঙ্গ (উত্তরবঙ্গ)	মনসামঙ্গল	আঠারো শতকের শেষভাগ
	ষষ্ঠীবর দত্ত	শ্রীহট্ট	পদ্মাপুরাণ	ঐ
ধর্মমঙ্গল	ঘনরাম চক্রবর্তী	কৃষ্ণপুর (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	১৭১১
	নরসিংহ বসু	শাঁখারী (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	আঠারো শতকের প্রথমার্ধ
	মাণিকরাম গাঙ্গুলি	বেলডিহার (হুগলী)	ধর্মমঙ্গল	১৭৮১
	রামকান্ত রায়	সেহারা (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	১৭৮৩
	রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে	চামোট (বিষ্ণুপুর)	ধর্মপুরাণ	১৭৩৩

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
	সহদেব চক্রবর্তী	রাধানগর (হুগলী)	অনিলপুরাণ	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
অন্যান্য মঙ্গল	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	যদুপুর (মেদিনীপুর)	শিব-সঙ্কীর্তন	১৭১২
	কৃষ্ণরাম দাস	-	রায়মঙ্গল	-
	রামজীবন বিদ্যাভূষণ	বাঁশখালি	সূর্যমঙ্গল	১৭১০
	গঙ্গাধর দাস	বিনাইপুর (মুর্শিদাবাদ)	কিরীটীমঙ্গল	১৭৬৫
	দুর্গাদাস মুখুজ্জে	উলাগ্রাম	গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী	-
		বৈষ্ণবকাব্য		
কৃষ্ণমঙ্গল	অভিরাম দাস	মল্লভূমি	গোবিন্দবিজয়	-
	বলরাম দাস	-	কৃষ্ণলীলামৃত	১৭০৩
	শঙ্কর চক্রবর্তী	পানুয়া (বিষ্ণুপুর)	গোবিন্দমঙ্গল	১৭০২-১২
	ঘনশ্যাম দাস	-	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	-
	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	যদুপুর	গোবিন্দমঙ্গল	-
	প্রভুরাম	-	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	-
	রমানাথ	-	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	-
চৈতন্য ও মহান্ত জীবনী	প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র)	কুলনগর (বর্ধমান)	চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী	১৭১২-১৩
	রামরত্ন	সিলেট	চৈতন্যসংহিতা	-
	জগজ্জীবন মিশ্র	সিলেট	শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী	-
	নরহরি চক্রবর্তী	সৈয়দাবাদ (মুর্শিদাবাদ)	ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
বৈষ্ণবপদ-সংকলন	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	দেবগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি	১৭০৪
	নরহরি চক্রবর্তী	সৈয়দাবাদ	গীতচন্দ্রোদয় ও গৌরচরিত্র চিন্তামণি	-
	রাধামোহন ঠাকুর	মালহাটি (মুর্শিদাবাদ)	পদামৃতসমুদ্র	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
	নটবর দাস	-	রসকলিকা	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃষ্টাব্দ)
	বৈষ্ণবদাস	টেঞা-বৈদ্যপুর (মুর্শিদাবাদ)	পদকল্পতরু	ঐ
	গৌরসুন্দর দাস	-	কীর্তনানন্দ	ঐ
	রাধামুকুন্দ দাস	–	মুকুন্দানন্দ	ঐ
	দীনবন্ধু দাস	শ্রীখণ্ড	সঙ্কীর্তনামৃত	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
অন্যান্য বৈষ্ণবকাব্য	ভগীরথ বন্ধু	-	বংশীশিক্ষা (বৈষ্ণবতত্ত্ব)	১৭১৬–১৭
	জয়নারায়ণ সেন	-	হরিলীলা	১৭৭২

অনুবাদকাব্য

পুরাণ	শঙ্কর চক্রবর্তী	পানুয়া	বাল্মীকিপুরাণ	–
	শিবচন্দ্র সেন	সেনহাটি	সারদামঙ্গল	-
	গঙ্গারাম দত্ত	নড়াইল (যশোর)	উষাহরণ	১৭৭০
	ফকির রাম (কবিভূষণ)	বাঁকুড়া	অঙ্গদ রায়বার	১৭০৩
	জগৎরাম রায়	ভুলুই গ্রাম (বর্ধমান)	অদ্ভুত রামায়ণ	১৭৭১
	রামানন্দ ঘোষ	–	রামায়ণ	১৭৮০
	কৃষ্ণদাস পণ্ডিত	উত্তরবঙ্গ	শ্রীরাম পাঁচালী	—
ইসলামী শাস্ত্র—	মুহম্মদ মুকীম	নোয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)	ফায়েদুল মুকতদী	১৭৭৩
কাহিনী-পুরাণ	শেখ মনসুর	-	সিরনামা	১৭০৩
	হেয়াত মাহমুদ	ঝাড়বিশিলা (রংপুর)	জঙ্গনামা	১৭২৩
			হিতজ্ঞানবাণী	১৭৫৩
			আম্বিয়াবাণী	১৭৫৭
	মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক	বেদরাবাদ (নোয়াখালী)	ফক্করনামা	-
	আলী রজা	ওশখাইন (চট্টগ্রাম)	সিরাজকুলুব	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
	মুহম্মদ আলী	ইদিলপুর (চট্টগ্রাম)	হয়রতুল ফিকাহ	ঐ
	মুহম্মদ কাসিম	যুগীদিয়া	সিরাজুল কুলুব	১৭৯০

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃষ্টাব্দ)
		(নোয়াখালী)	হিতোপদেশ	—
	সৈয়দ নুরুদ্দীন	চট্টগ্রাম	দকায়িকুল হক্কায়িক	১৭৯০
			রাহাতুল কুলুব	১৭৯৬
		প্রণয়োপাখ্যান		
	শাহ গরীবুল্লাহ	বালিয়াহাফেজপুর (হুগলী)	ইউসুফ-জোলেখা	১৭৬৫
	মুহম্মদ রজা	বখৎপুর (চট্টগ্রাম)	তমীম গোলাল	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
	মুহম্মদ মুকীম	নোয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)	গুলে বকাওলী	১৭৬০
	মুহম্মদ উজীর আলী	চারিয়া (চট্টগ্রাম)	শাহনামা	১৭১১-১৮
	শেখ সাদী	ত্রিপুরা	গদামল্লিকা	১৭১৫
	শেরবাজ	ঐ	মল্লিকার হাজার সওয়াল	১৭৩১
	মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক	বেদরাবাদ (নোয়াখালী)	সয়ফুলমুলক-লালবানু	১৭৭০
	মুহম্মদ আলী	ইদিলপুর (চট্টগ্রাম)	শাহপরী-মল্লিকজাদা	–
	সৈয়দ হামজা	অদুনা (হাওড়া)	মধুমালতী	১৭৯০
	করিমুল্লাহ আঠারো	মুরাদপুর (চট্টগ্রাম)	শতকের মধ্যভাগ	মৃগাবতী
		সুফিপদ		
	আলী রজা	ওশখাইন (চট্টগ্রাম)		
	সিরতাজ		–	-
	নূর মোহাম্মদ		–	-
		পীর–পাঁচালী		
	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা	১৭৩৭

কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
ফকীররাম দাস	বাঁকুড়া	সখীসোনা	১৭২০
রামেশ্বর ভট্টাচার্য		সত্যপীরের কথা	আঠারো শতকের প্রথমভাগ
শ্রীবল্লভ	-	মদনসুন্দরের পালা	-
আরিফ	তাজপুর (দক্ষিণ রাঢ়)	লালমোনের কেচ্ছা	–
ফৈজুল্লা	পাচনা (হাওড়া)	সত্যপীরের পাঁচালী	আঠারো শতকের শেষভাগ
ফক্কির মহাম্মদ	আজিমাবাদ	মানিকপীরের গীত	ঐ
শঙ্কর আচার্য	-	সত্যপীরের পাঁচালী	ঐ
দোভাষী পুঁথি			
শাহ গরীবুল্লাহ	বালিয়া হাফেজপুর	আমীর হামজা (১ম অংশ)	১৭৬৬
		সোনাভান	১৭২০
		সত্যপীরের পুঁথি	–
সৈয়দ হামজা	অদুনা (হুগলী)	আমীর হামজা (২য় অংশ)	১৭৯৪
		জৈগুনের পুঁথি	১৭৯৭
শাক্তপদ			
রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)	কুমারহট্ট (বর্ধমান)		—
দ্বিজ রামপ্রসাদ -	মহেশ্বরদি (ঢাকা)		—
কমলাকান্ত (১৭৭২-১৮২১)	অম্বিকা-কালনা		—
কবিওয়ালা গান			
রাসু (১৭৩৪–১৮০৫)	গোন্দলপাড়া (হাওড়া)		
নৃসিংহ (১৭৩৮ –১৮০২)	ঐ (উভয়ে সহোদর ছিলেন)		
হরুঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২)	শিমুলিয়া (কলকাতা)		
নিতাই বৈরাগী (১৭৪৭–১৮২১)	চন্দননগর (হুগলী)		
নিধু গুপ্ত (১৭৫৫-১৮৫২)	চাপতা (হুগলী)		
কালি মির্জা (১৭৫০-১৮২৫)	পাটমহলপল্লী (হুগলী)		

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
			বিবিধ	
	বিজয়রাম সেন	-	তীর্থমঙ্গল	১৭৭০
	গঙ্গারাম	ধরীশ্বর (কিশোরগঞ্জ)	মহারাষ্ট্রপুরাণ	১৭৫১
	জগৎরাম রায়	ভুলুই গ্রাম (বর্ধমান)	আত্মবোধ	১৭৭৮
	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট (বর্ধমান)	রসমঞ্জরী	–
	রাধাকান্ত মিশ্র	কলকাতা	শ্যামাসঙ্গীত	১৭৬৭

উপরের তালিকাটি কতক বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে, যথা—১. বাংলা সাহিত্যরচনার ধারাবাহিকতা ছিল, রাষ্ট্রবিপ্লব, বর্গীর লুণ্ঠন, কোম্পানির শোষণ, যুদ্ধ, মন্বন্তর সাহিত্যরচনায় কোন প্রভাব ফেলে নি, শূন্যতাও সৃষ্টি করে নি। ২. বাংলার সব প্রধান অঞ্চলেই কবিগণ আবির্ভূত হন; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বঙ্গের ভেদ ছিল না। তবে কতক শাখা অঞ্চলবিশেষে জনপ্রিয় ছিল। ৩. হিন্দু ও মুসলমান কবিগণ স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা করেন—মিলন হয় নি, সংঘর্ষও বাধে নি; দু-একটি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সুর আছে। ৪. চৈতন্যদেব সাহিত্যকে দরবার থেকে বৈষ্ণব-আখড়ায় নিয়ে যান; আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য দরবার, দরগাহ, আখড়া, গণআসর প্রভৃতি নানা স্থানে প্রসারলাভ করে। কোন কোন বিষয়ের পাঠক-শ্রোতাও পাল্টে যায়। ৫. পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি বেশি, নতুন ধারার উদ্ভাবন সামান্য, অর্থাৎ বাংলার কবিগণ সৃজনশীল হয়ে উঠেন নি, অনুকরণ-অনুসরণ দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ ছিলেন। ৬. কাব্যের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র, কাব্য ও ঐতিহ্য থেকে; কবিগণ স্থানীয়, ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানীয় ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ৭. ভাষাতে কিঞ্চিৎ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, তা জনপ্রিয়ও হয়; কিন্তু কৃত্রিম বলে শেষ পর্যন্ত টিকে নি। ৮. পদ ও গানের তুলনায় আখ্যানকাব্যের সংখ্যা বেশি; কোন কোন আখ্যান বিরাটাকার। উদ্যমহীন, গতিহীন, অনুকরণপ্রবণ মানসিকতা থেকে এরকম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মঙ্গলকাব্য

লৌকিক, পৌরাণিক, অর্ধ-পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক নানা কাব্য পূর্বে রচিত হয়েছে, আঠারো শতকেও রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের প্রধান চারটি ধারা মনসা, চণ্ডী, কালিকা ও ধর্মঠাকুরের পূজাভিত্তিক কাব্য। এছাড়াও শিব, শীতলা, ষষ্ঠী, সরস্বতী, সূর্য, গঙ্গা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তিভিত্তিক মঙ্গলকাব্যও রচিত হয়। এসব দেবশক্তির

মাহাত্ম্যকীর্তন ও পূজার অর্থ হলো প্রতিদানে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ। মনসা সর্পের দেবী, মনসাপূজা করলে সর্পের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চাঁদ, বেহুলা ও সনকা মনসার পূজা করে সর্পদংশনে মৃত সন্তান ও হৃত সম্পদ ফিরে পায়। চণ্ডীর পূজা করে ব্যাধসন্তান কালকেতু ও বণিকপুত্র শ্রীমন্ত বিপদ থেকে মুক্তি পায় ও ধনসম্পদ লাভ করে, এমনকি রাজ্যেরও অধিকারী হয়। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন, তিনি ভক্তকে সন্তানের বরদানও করেন। ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী তাঁর পূজা করে বীরপুত্র লাউসেনকে লাভ করে। অন্নদামঙ্গলের নায়ক সুন্দর অন্নদাদেবীর পূজা ও স্তব করে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পায়, রাজকুমারী বিদ্যাকে লাভ করে, শ্বশুরের রাজ্যও পায়; অপর চরিত্র ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপায় দৈবধনের অধিকারী হয় এবং কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পায়। শিব কৃষির দেবতা, শীতলা বসন্তের দেবী, ষষ্ঠী সন্তানের দেবী; সূর্য কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন, সরস্বতী বিদ্যা দান করেন। অনগ্রসর সমাজের মানুষ এসব দেবদেবীর পরিকল্পনা করে—সমাজবিজ্ঞান এমনই ব্যাখ্যা দেয়। আত্মবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞান ও শ্রমশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে দৈব ও অলৌকিকভাবে তারা সবকিছু আয়ত্ত করতে চায়। তুর্কীবিজয়োত্তর যুগে উচ্চবর্গের শিক্ষিত কবিগণ এসব দেবদেবীর মাহাত্ম্যভিত্তিক কাব্য রচনা করে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। গোপাল হালদার বলেন, "প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য।"[৫] সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই উক্তির সত্যতা মেনে নিয়েও বলা যায়, বাংলার কবিগণ বিজিত, শাসিত, শোষিত অনগ্রসর শ্রেণীকে জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আলিবাবার ধনপ্রাপ্তি অথবা আলাউদ্দিনের যাদুর প্রদীপপ্রাপ্তি ব্যক্তির অর্জন নয়, দৈব বা অলৌকিক দান—তা সমাজকে স্বপ্ন দেখায়; সমাজকে কর্মক্ষম, উদ্যোগী ও সংগ্রামী করে না। পীর-পাঁচালীতে পীরকে দেবতার স্থানে বসিয়ে সন্তানের বর দান, ধন দান, ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি চিত্র অঙ্কন দ্বারা বৈষয়িক ইচ্ছা ও মনস্কামনা পূরণ করা হয়েছে। এ কাজটি হিন্দু কবির মতো মুসলমান কবিও করেছেন। আসলে সামন্ত সমাজের ফলই এমন। সামন্তবাদী চেতনা প্রভুভক্ত হতে শেখায়, প্রভুদ্রোহী হতে শেখায় না। যেখানে ব্যক্তি-অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, সেখানে দৈবনির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ, অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশে আঠারো শতক পর্যন্ত সামন্ত শাসন ও সমাজব্যবস্থা অটুট ছিল। এ যুগের সাহিত্যেও তার প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল।

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ, বাংলার জাতীয় কাব্য। কাব্যের বিষয়, চরিত্র, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, আচার, বিশ্বাস, পোশাক, খাদ্য, আবেগ, প্রেম, কলহ, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছু মিলিয়ে এগুলিতে বাংলার ও

৫. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৩), ৩য় সংস্করণ), ৪৬-৪৭

বাঙালির খাঁটি চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ, মনসামঙ্গলে বণিক, অন্নদামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে সামন্ত, শিবমঙ্গলে কৃষকপরিবারের কথা আছে। প্রধান চরিত্রের চারপাশে অজস্র নরনারী ভিড় করে আছে। কালকেতু, বেহুলা, শ্রীমন্ত, সুন্দর, ভবানন্দ, লাউসেনের সহায় তাদের ইষ্টদেবতা, কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল, হীরা মালিনী, ঈশ্বরী পাটনী, ইছাই ঘোষ, হরিহর বাইতি ইত্যাদি মানবচরিত্র দেবতার বরপুত্র নয়, রক্তমাংসের মানুষ—নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি অথবা শান্তি পায়। মানুষের এসব চিত্র ও চরিত্র কবিরা পরিচিত সমাজ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ধর্মের খোলসটুকু বাদ দিলে মানুষ ও পরিবারের যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, তাতে এগুলিকে সেকালের উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায়।

অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র রায়, মনসামঙ্গলের জগজ্জীবন ঘোষাল, ধর্মমঙ্গলের ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক গাঙ্গুলী, শিবমঙ্গলের রামেশ্বর ভট্টাচার্য এ যুগের এ ধারার প্রধান কবি। তবে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উর্ধ্বে। তাঁকে মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে ৪০টাকা বেতনের রাজকবি ছিলেন। তিনি বাংলা ব্যতীত সংস্কৃত ও ফার্সি জানতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে জমিদারপুত্র ছিলেন। বর্ধমান মহারাজার কোপে পড়ে একসময় কারারুদ্ধ হন। ভারতচন্দ্রের বংশ, বিত্ত, শিক্ষা, জীবিকা, অভিজ্ঞতা কবিকে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অধিকারী করেছে। এদিক থেকে কেবল আলাওলের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয়।

ভারতচন্দ্র পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন, আর এর তিন বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সিরাজউদ্দৌলার অপসারণের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন। বর্গীর দস্যুবৃত্তির কথা তাঁর জানা আছে। অপরদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারের বৈভব-বিলাসিতার কথাও তাঁর জানা আছে। *অন্নদামঙ্গলের* মূল অংশ বিদ্যাসুন্দর আখ্যানকাব্য, এব বহিরাবরণে মানসিংহভবানন্দ উপাখ্যান আছে—এটি ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত। কাব্যের শুরুতে দেবখণ্ড আছে। পুরাণ, ইতিহাস, লৌকিক আখ্যান—এই তিনের সমন্বয়ে ভারতচন্দ্র 'নতুন মঙ্গল গান' রচনা করেন। *অন্নদামঙ্গলে* ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বন্ধন বেশ শিথিল। তাঁর কাব্যে মানবজীবনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। এই জীবনকথাতে এসেছে তাঁর যুগের রস ও রুচি, যাকে অশ্লীল বলে সরাসরি অভিযোগ করা হয়। রাজার ও সভাসদদের আনন্দবিধানের জন্য রচিত এই কাব্যে ভোগ-বিলাস, অশ্লীলতা যেমন, তেমনি নাগরিক বৈদগ্ধ্য, লিপিচাতুর্য এসেছে। তিনি অশ্লীলতাকে নাগরিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ও লিপিচাতুর্যের আবরণ দিয়েছেন, আর এখানেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। "বাণিজ্যে

লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ।"—কবির এই উক্তিতে যুগের প্রতিধ্বনি আছে; কৃষি-অর্থনীতি অপেক্ষা ব্যবসায়-অর্থনীতির গৌরবকীর্তন আছে। উদীয়মান বণিকশক্তির ইঙ্গিতবহ তা। তবু সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্র যুগের সৃষ্টি, যুগের স্রষ্টা নন।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পর ঘনরাম চক্রবর্তীর স্থান। তিনি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা পান, তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' (১৭১১) রচিত হয় গুরুর নির্দেশে। ধর্মঠাকুর নিম্ন জাতির পূজ্য। কাব্যের নায়ক লাউসেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বীর চরিত্র। কালকেতু বলবান, কিন্তু বীর চরিত্র নয়, চাঁদ সদাগর দৃঢ়চেতা ও আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, তবু বীর চরিত্রের ভাবমূর্তি তার নেই। সামন্তপুত্র লাউসেন কুলেশীলে, বিদ্যায় ব্যবহারে প্রকৃত বীরের ভূমিকা পালন করে। মাতুল মহামদ উৎপীড়কের ভূমিকা নিলে লাউসেন তাকে মল্লযুদ্ধে পরাভূত ও বশীভূত করে। এছাড়া একাধিক সামন্ত রাজার ও জীবজন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করে লাউসেন জয়ী হয়েছে। এতে বীররস আছে, আদিরসও আছে। 'আখড়া পালা'য় ছদ্মবেশিনী দেবী, 'জামতি পালা'য় রঙ্গিনী নটী এবং 'গোলাহাট পালা'য় গণিকা সুরিক্ষা লাউসেনকে প্রলোভিত ও বশীভূত করার জন্য যেরূপ আচরণ করে তা রুচি ও নীতিকে ছাড়িয়ে যায়। এখানেও যুগ কবিকে গ্রাস করেছে। সুকুমার সেন বলেছেন, "ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা।"[৬] এটি কবির ভাষার গুণ, বিষয়ের গুণ নয়। তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও পরিবেশ থেকে তিনি রচনার এই প্রসন্নতাগুণ অর্জন করেন। ঘনরামের একটি পঙ্‌ক্তি এমন: "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ / দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান।" রাজার মঙ্গল ও দেশের কল্যাণচিন্তা ঘনরামের ছিল; এজন্য কাব্যে বাহুবল ও নৈতিকবলের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামেশ্বর, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিন জন মঙ্গলকাব্যের কবি এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"[৭] রামেশ্বর ভট্টাচার্য *শিব সঙ্কীর্তন* (১৭১২) রচনা করেন। পৌরাণিক দেবতা শিব-পার্বতীর পারিবারিক কাহিনী নিয়ে এটি রচিত। শিবের জীবিকা কৃষি ও ভিক্ষাবৃত্তি। শিব নামে দেবতা কিন্তু কাব্যে তিনি একজন দরিদ্র কৃষক। শিবপরিবারের আড়ালে দরিদ্র কৃষকপরিবারের গার্হস্থ্যজীবন চিত্রিত করে রামেশ্বর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি মেদিনীপুরের যদুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহ ও তৎপুত্র যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজসভায় 'পুরাণ

৬. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, (কলিকাতা ১৯৬৫), ১৮১।

৭. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৬), ৯২০।

পাঠ' করে শোনানো তাঁর কাজ ছিল। রাজার নির্দেশে তিনি কাব্য রচনা করেন।[৮] রামেশ্বরের *সত্যপীরের ব্রতকথায়* হিন্দি-উর্দু-ফার্সির ব্যবহার আছে। রামেশ্বর সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর কাব্য মালিন্যমুক্ত ও রুচিপূর্ণ ছিল। "পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল", "দারিদ্র্য দোষের পর দোষ আর নাই", "অনর্থের বীজ অর্থ মত্ততার ঘর" ইত্যাদি প্রাজ্ঞোক্তির মধ্যে কবির চিন্তাশক্তি ও বাকচাতুর্য প্রকাশিত হয়। বাণিজ্যের মূল পুঁজি ও প্রবঞ্চনা—এ সত্য সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা সর্ববঙ্গীয়, এমনকি আসাম-উড়িষ্যা ও বিহারেও এ-কাব্য রচিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে জলমগ্নতার কারণে সর্পের উপদ্রব বেশি, এ কাব্যের চর্চাও বেশি। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন বিদ্যাভূষণ প্রমুখের কাব্যে পূর্বসূরিদের অনুসরণ আছে, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, বংশীদাস, নারায়ণদেব, কেতকাদাস প্রমুখের চেয়ে তাঁদের প্রতিভা উচ্চ ছিল না। মনসামঙ্গলের কাহিনীর দু'টি অংশ—দেবখণ্ড ও মানবখণ্ড। মানবখণ্ডে চাঁদসদাগর-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। শিবভক্ত চাঁদবেনে মনসার পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দেবীর কোপে তাঁর সর্বনাশ হয়। তিনি সপ্তপুত্র, সপ্তডিঙ্গা হারান এবং নিজেও জীবনান্ত দুর্ভোগে পড়েন। শেষে পূজা দিয়ে তিনি সবকিছু ফিরে পান। দেবশক্তির সাথে মানবশক্তির এই সংগ্রামে সেকালের প্রভুশক্তির সাথে প্রজাপুঞ্জের লড়াইয়ের ছবি আছে। বণিকশক্তি মাথা তুলেছে, কিন্তু সামন্তপ্রভুর কাছে নতিস্বীকার করেছে।

বৈষ্ণবকাব্য

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রেম-ভক্তিবাদের ধর্ম। যেকোন মানুষ দীক্ষা নিয়ে পরম বৈষ্ণব হতে পারে। শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজে এ আদর্শ বিপ্লব নিয়ে আসে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুসারীগণ বাংলায় বৈষ্ণবপদ, চৈতন্য ও মোহান্তজীবনী, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করে বৈষ্ণব আন্দোলনে জোয়ার সঞ্চার করেন। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-একত্ববাদের আদর্শের আলোকে বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে চৈতন্যদেব প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ও বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী মানুষকে আধ্যাত্মিক আশ্রয় দেন। ষোল ও সতেরো শতক বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির যুগ। আঠারো শতকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বৈষ্ণব সাহিত্যের মান ও পরিমাণ হ্রাস পায়, বৃত্তাবদ্ধ ভাবস্রোতের ন্যায় তা গতি ও দ্যুতি হারিয়ে ফেলে। কৃষ্ণমঙ্গলে কৃষ্ণলীলা,

---

৮. "পূর্ব বাস যদুপুরে/হেমেৎসিংহ ভাঙ্গে যারে/রাজা রামসিংহ কৈল প্রীতি। স্থাপিয়া কৌশিকী তটে/বসিয়া পুরাণ পাঠে/রচাইল মধুর সঙ্গীত ॥" *শিবসঙ্কীর্তন*, ঐ, ৮৯১।

চৈতন্যজীবনীতে চৈতন্যলীলা এবং পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমলীলা আছে। এ যুগের কোন জীবনীকার ও কবি পূর্ববর্তী জীবনীকার ও কবির সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। পূর্বসূরিদের ধারা টিকিয়ে রেখেছেন এটাই তাঁদের কৃতিত্ব। কৃষ্ণমঙ্গলের প্রধান উৎস ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদি। তাঁরা কৃষ্ণকে ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো 'আদর্শ পুরুষ' করে মূল্যায়ন করেন নি। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের মধ্যে *ভক্তিরত্নাকর* নরহরি চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গোপাল হালদার একে 'বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিশ্বকোষতুল্য' গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] পদসঙ্কলকগণ স্বয়ং পদকর্তাও ছিলেন। তাঁরা বড় বড় গ্রন্থের সঙ্কলন করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। *ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি*তে তিনশ'র অধিক, *পদামৃতসমুদ্রে* ৭৪৬টি, *পদকল্পতরু*তে তিন হাজারের অধিক, *কীর্তনানন্দে* ৬৫১টি, *মুকুন্দানন্দে* ৬৫৯টি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনগুলি বিস্মৃতি ও ধ্বংস থেকে বৈষ্ণবপদকে রক্ষা করেছে। কৃষ্ণমঙ্গল, জীবনীগ্রন্থ ও শাস্ত্রকাব্যে যে তত্ত্ব আছে বৈষ্ণবপদে তাকে কাব্যস্ফূর্তি দেওয়া হয়েছে—ভক্তি ও বিশ্বাস সে-তত্ত্বে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করে। আঠারো শতকে কবির আবেগ ও আন্তরিকতা কমে আসায় সারবস্তুহীন ভাষা ও ছন্দ কর্মে পরিণত হয়। কোন অবৈষ্ণব পদকর্তা বা জীবনীকার নেই; বৈষ্ণবতত্ত্বে অবিশ্বাসীর পক্ষে পদরচনা সম্ভব নয়। মুসলিম পদকর্তা রাধাকৃষ্ণের রূপকে সুফিপদ রচনা করেন। বৈষ্ণবকাব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য, কিন্তু রচনাগুণে তা সকল শ্রেণীর মানুষের আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

অনুবাদকাব্য

অনুবাদ ভাষান্তর শিল্প। সমাজে চাহিদা সৃষ্টি হলে অনুবাদ হয়। মধ্যযুগে সংস্কৃত *রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত* গ্রন্থের কাব্যানুবাদ এই চাহিদার ফসল। অনুরূপভাবে আরবি-ফার্সি গ্রন্থেরও কাব্যানুবাদ হয়। অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানীয় ঐতিহ্য বাংলায় প্রবেশ করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'matter of Sanskrit' (সংস্কৃতের উপাদান) ও 'matter of Arabic-Persian' (আরবি-ফার্সির উপাদান) বলেছেন। সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি—তিনটি ধ্রুপদী ভাষা (classic language)। ঐসব ভাষার মহাকাব্য, রোমান্স, ধর্ম ও জ্ঞানশাস্ত্রের অনুবাদ হয়। আঠারো শতকে রামায়ণের অনুবাদক-কবির সংখ্যা ২০ জন। এঁদের মধ্যে ফকির রাম কবিভূষণ *অঙ্গদের রায়বার* (১৭০৩), শঙ্কর চক্রবর্তী *বাল্মীকি পুরাণ* (১৭০২), জগৎরাম রায় *অদ্ভুত রামায়ণ* (১৭৭১), রামানন্দ ঘোষ *রামায়ণ* (১৭৮০), রামানন্দ যতি *অদ্ভুত রামায়ণ* (১৭৬২) রচনা করেন। মহাভারতের অনুসরণে রচিত হয় দ্বৈপায়ন দাসের *অশ্বমেধ পর্ব*, নন্দরামের *দ্রোণপর্ব*, কৃষ্ণানন্দ বসুর *শান্তিপর্ব*, দ্বিজ কৃষ্ণরামের *অশ্বমেধ পর্ব*, দ্বিজ গোবর্ধনের *গঙ্গাপর্ব*, রামলোচনের *নারীপর্ব*, রাজারাম দত্তের *দণ্ডীপর্ব*, কবিচন্দ্রের *দাতাকর্ণ পর্ব* ইত্যাদি। গঙ্গাদাস সেন সমগ্র *মহাভারত*

---

৯. *প্রাগুক্ত*, ১৮৭।

অনুবাদ করেন। কৃষ্ণমঙ্গল *ভাগবতের* অনুসরণে রচিত। *রামায়ণ-মহাভারতের* আংশিক অনুবাদই বেশি, পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কম। এগুলির কোনটি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের অনুবাদের সমকক্ষতা লাভ করে নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল ও ব্যর্থ অনুকরণ হয়েছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* অধিকাংশ অনুবাদক পশ্চিমবঙ্গের, দু-একজন উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। কৃষ্ণমঙ্গল শ্রীহট্টেও রচিত হয়েছে। রাম-সীতা নৈতিক আদর্শের, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমাদর্শের প্রতীক। এদেশে একজন মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন নি, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য রামভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তির আধিক্য বেশি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কবিওয়ালাদেরও গানের বিষয় হয়েছে। "কানু ছাড়া গীত নেই, রাধা ছাড়া সাধা নেই" ইত্যাদি প্রবাদ এই আধিক্য থেকে এসেছে।

আরবি-ফার্সি ভাষা জানে না এমন পাঠকের কাছে ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য ঐসব ভাষার উৎস থেকে বাংলা কাব্য রচনা করেন বলে মধ্যযুগের অধিকাংশ মুসলমান কবি আত্মকথায় উল্লেখ করেন। *কিফায়িতুল-মুসল্লীন* (১৬৩৮) গ্রন্থে শেখ মুত্তালিবের একটি বক্তব্য এমন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
এই পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥

দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬৩) কোরানের ফার্সি অনুবাদ করলে মৌলবাদীরা তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান।[১০] পাপভয় ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ইসলামী ধর্মকথার ভাষান্তরণের এই প্রয়াসের পিছনে আছে সমাজের অজ্ঞ মানুষকে জ্ঞানদান করা। বাংলার কবিগণ ভাষান্তরকর্মের মাধ্যমে আরব-ইরানের উপাদান এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা এবং ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তালিকায় যেসব গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, সেগুলির অধিকাংশ ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থ। কিছু ইতিহাস ও রোমান্সেরও অনুবাদ হয়েছে।

কবিগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও রংপুরের অধিবাসী ছিলেন। হেয়াত মাহমুদ ছাড়া সবাই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। কাব্যগুলির মধ্যে *আম্বিয়াবাণী* (১৭৫৭), *সিরাজুল কুলুব* (১৭৯০), *দকায়িকুল হকায়িক* (১৭৯০) ও *রাহাতুল কুলুব* (১৭৯৬) আকারে বিরাট গ্রন্থ।

১০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৩৭৪, পরিমার্জিত সংস্করণ),২৬৫।

পয়ার ও ত্রিপদী মিলিয়ে প্রথম গ্রন্থের চরণসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার।[১১] শেষ গ্রন্থ *রাহাতুল কুলুবে* উনিশটি অধ্যায় আছে, যথা—কিয়ামতের কথা, কিয়ামতের ভয়, পিতামাতার হক, দোজখের কথা, বিহিশ্তের কথা, রেবাখোরের কথা, রোজা-নামাজের কথা, সুরাপানের কথা, নামাজের পুণ্য, কোরানপাঠের পুণ্য, স্ত্রীপুরুষের দায়, মিথ্যা বলার পাপ, পরচর্চার দোষ, হাসদের (ঈর্ষার) কথা, নেকীর কথা, ক্ষমার কথা, অছিয়তের বয়ান ও বিবিধ প্রস্তাব।[১২] ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের জন্যই যে গ্রন্থখানি প্রণীত তা এই সূচিমালা থেকে বোঝা যায়। বলাবাহুল্য, এ কাব্য শিল্পসৃষ্টির জন্য রচিত হয় নি।

অনুবাদের এ-ধারায় হেয়াত মাহমুদ ও সৈয়দ নুরুদ্দীন শ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ে চারখানি করে কাব্য রচনা করেন।[১৩] তাঁরা উভয়ে আরবি ও ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ উঁচু দরের আলেমও ছিলেন। হেয়াত মাহমুদ কাজি পদে বৃত ছিলেন। তিনি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এবং সৈয়দ নুরুদ্দীন দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা করেন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁদের কাব্যজীবনকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। বরং নিস্পৃহতাই লক্ষীভূত হয়। এর কারণ এমন হতে পারে যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজপুরুষ দিবেন, প্রজা হিসেবে তাঁদের করণীয় কিছু ছিল না। তাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার হাল ধরেন এবং সেখানেই সফলতা অর্জন করেন। বিষয়গুণে তাঁরা শ্লীলতা ও সুরুচির পরিচয় দেন। হেয়াত মাহমুদের রচনায় অনেক কাব্যোক্তি আছে, যেগুলি তাঁর প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির ধারক। যেমন—"পরদেশে বিদ্যা বন্ধু করে নানা হিত।", "বিনা শ্রমে ধন বিদ্যা তপস্যা না হয়।", "তিক্ত গুড়ে সুধা দিলে মিষ্ট নাহি হয়।", "জলের উদ্দেশে জল হেট মুখে ধায়।", "মূর্খ মিত্র হৈতে ভাল জ্ঞানী শত্রু যেই।", "কৃপণের ধন যেন বৃদ্ধের যুবতি।" এসব কাব্যোক্তির অধিকাংশই কবির স্বরচিত ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ভাষা শিষ্ট ও শুদ্ধ।

প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমান কবির সৃজনশীল ধারা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা কাহিনীকাব্য। এগুলিকে রোমান্স বলেও আখ্যায়িত করা হয়। *ইউসুফ-জোলেখা* প্রণেতা শাহ মুহম্মদ সগীর, *লায়লী-মজনু* প্রণেতা দৌলত উজির বাহরাম খান, *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী* প্রণেতা কাজী

১১. মযহারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *কবি হেয়াত মামুদ,*(রাজশাহী, ১৯৬১) গ্রন্থ থেকে এ সংখ্যা নিয়েছি।

১২. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা ১৯৫৫), ২৮৯।

১৩. হেয়াত মাহমুদ, *জঙ্গনামা* (১৭২৩), *সর্বভেদবাণী, হিতজ্ঞানবাণী* (১৭৫৩),ও *আম্বিয়াবাণী* (১৭৫৭); সৈয়দ নুরুদ্দীন, *দাকায়িকুল হক্কায়িক* (১৭৯০), *মুসার সওয়াল, রাহাতুল কুলুব* (১৭৯৬) ও *হিতোপদেশ* (১৭৯৬)।

দৌলত ও *পদ্মাবতী* প্রণেতা আলাওল যেমন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, আঠারো শতকের কোন কবি তা পারেন নি। তাঁরা পূর্বধারার উজ্জ্বলতাকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করেছেন। মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* এবং গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা* (১৭৫৩), মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* এবং আমীর হামজার *মধুমালতী* (১৭৯০), নওয়াজিশ খানের *গুলে বকাওলী* এবং মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী* (১৭৬০) ইত্যাদি কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় এ দুর্বলতা ও অপকর্ষের চিত্র ধরা পড়ে। গরীবুল্লাহ ও আমীর হামজা হুগলীর অধিবাসী, অন্য কবিগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় আবির্ভূত হন। এ-অঞ্চলে ইসলামী শাস্ত্রকাব্য ও কাহিনীকাব্য বেশি রচিত হয়েছে।

প্রণয়োপাখ্যানের বিষয়বস্তু প্রেম। ভারত ও আরব-ইরান এসব আখ্যানের উৎসভূমি। ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় রচিত মূল কাব্যে সুফিমতের আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপক আছে। বাংলায় তা লৌকিক প্রেমের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে বাংলার কবিগণ সাধক নন, পাঠকেরও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নেই। প্রেমকাহিনীতেই পাঠক আকৃষ্ট। *গুলে বকাওলী* (১৭৬০), *মধুমালতী* (১৭৯০), *শাহপরী মল্লিকজাদা* (১৭১৫), *মৃগাবতী* ইত্যাদি কাব্যের নায়ক মানবপুত্র, নায়িকা পরীকন্যা। কাব্যগুলি নায়ক-নায়িকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, রূপতৃষ্ণা, দেহসম্ভোগের পাশাপাশি রাক্ষস, দৈত্য, যাদু, দুর্গম অভিযাত্রা ইত্যাদির অলৌকিক গালগল্পে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মশাসিত কিন্তু এই একটি শাখায় ধর্মকথা নেই।

প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি; প্রেমকে সফল করে তোলার জন্য নায়কগণ সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। রোমান্টিক প্রেমকাব্য মিলনাত্মক, বিয়োগান্তক নয়। কবিদের জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমনটি হয়েছে। উল্লেখ্য যে ভারতীয় ঐতিহ্যে কিন্তু ট্রাজেডি নেই, প্রয়োজনে এমনকি স্বর্গেও মিলন দেখানো হয়।

শাস্ত্রকাব্য ও প্রণয়কাব্যের বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে একটি সত্য ধরা পড়ে যে কবিগণ ভারত ও আরব-ইরানের ইসলামিক ও অনৈসলামিক উপাদান ব্যবহার করে বাংলা কাব্যের দিগন্ত প্রসারিত করেন। হিন্দু কবিগণ হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির চর্চা করেন, মুসলমান কবিগণ মুসলিম সমাজ ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করেন। কেউ কারও সীমানা ছাড়িয়ে যান নি, এজন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধও নেই। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। ভাষার রাজ্যেও হিন্দু-মুসলমান ভেদরেখা টানা যায় না। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম সমাজ দেশমৃত্তিকার গভীরে শিকড় বিস্তার

করেছে। মুসলিম পদকর্তাদের 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি' বলা হয়; ভাবে সাদৃশ্য ও ভাষায় একাত্মতা থেকেই তাদের এমন নামকরণ হয়েছে।

পীর-পাঁচালী

মুসলমান পীরের উপর হিন্দুর দেবতার মাহাত্ম্য আরোপ করে সত্যপীর, মানিকপীর, বনবিবি ইত্যাদি লৌকিক পীরের উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক লোককাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়ে 'সত্যপীরের পাঁচালী', 'মানিকপীরের গীত', 'বনবিবির জহুরনামা' রচিত হয়। ভারতচন্দ্রও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন। এতেই এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সত্যপীর ভক্তকে রোগ-শোক-দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারেন। মানিক পীর গরু ও বনবিবি বনের কাঠ-মাছ-মধু-পাতা সংগ্রহকারীকে রক্ষা করেন। পাঁচালীর কাহিনী স্থানিক ও মৌলিক। পীর-পাঁচালীর শিল্পমূল্য তুচ্ছ, তবে তা সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথেছে—এখানেই এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিহিত।

দোভাষী পুঁথি

দোভাষী পুঁথিতে বিষয়বস্তু পূর্বের ধারার সাথে অভিন্ন, কিন্তু ভাষাভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু আরবি-ফার্সি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণ নয়, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠনেও ঐসব ভাষারীতির প্রভাব পড়েছে। এমনকি, উর্দু-ফার্সির নিয়মে গ্রন্থের শুরু হয় ডান দিক থেকে। ভাষাবৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে জেমস লঙ একে 'মুসলমানী বাংলা', সুকুমার সেন 'ইসলামি বাংলা', আনিসুজ্জামান 'মিশ্র ভাষা' বলে অভিহিত করেন। সাহিত্যের অঙ্গনে 'দোভাষী পুঁথি' অভিধাটিই গূঢ়ার্থ (connotation) লাভ করেছে। পুঁথির ভাষা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, আঠারো শতকে এর উদ্ভব। এ শতকে দু'জন প্রধান কবি শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা কাব্য রচনা করে খ্যাত হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। হুগলী-হাওড়ার মুসলিম পরিবারে দোভাষী কাব্যের উদ্ভব হয়, পরে সারা বাংলাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ-বিশ শতক পর্যন্ত বহু সংখ্যক পুঁথি রচিত ও মুদ্রিত হয়। পুঁথি পাঠেরও স্বতন্ত্র রীতি আছে; আসরে বসে সুর করে পাঠ করা একটি সাধারণ রীতি। এভাবে পুঁথি পাঠের ও শ্রবণের মধ্যে মাদকতা আছে। নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মুসলমানের কাছে দোভাষী পুঁথি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ক্রমশ এ-ধারার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বর্তমানে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার একত্রে সমাপ্ত *আমীর হামজা* বৃহৎ কাব্য। ইরানের শাহ নওশেরওয়ানের সাথে খলিফা ওসমানের যুদ্ধ এতে বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে অজস্র উপকাহিনী আছে, অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনা আছে; এটি মূলত বীররসের কাব্য।

কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত *জঙ্গনামা* করুণ রসের কাব্য। এই উভয় ধারার রচনা মুসলিম সমাজে আদৃত হয়েছিল। মুসলিম সমাজ রাষ্ট্রের বিজয়কে বীররস এবং পরাজয়কে করুণরস দিয়ে অনুভব করেছে। গরীবুল্লাহর *সোনাভানের পুঁথি* (১৭২০) এবং সৈয়দ হামজার *জৈগুনের পুঁথি* (১৭৯৭) যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম। যুদ্ধ করে রাজ্যজয়ের সাথে সম্পদ ও রমণীলাভের সরলরৈখিক কাহিনী দ্বারা দোভাষী পুঁথির বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠে। এগুলির অতীত ঐতিহ্যে ডুবে থেকে এক প্রকার আত্মপ্রসাদলাভের প্রবণতা কাজ করেছে। এগুলিতে উচ্চ ভাব, জাতীয় আদর্শ, জীবনদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি বা নিগূঢ় শিল্পচেতনার অভাব আছে। দোভাষী পুঁথির ধনাত্মক দিকটি এই যে, বাংলা সাহিত্য দরবার ও শিক্ষিত শ্রেণীর সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে জনসাধারণের উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে। "দেশেতে রোজগার নাই / এ খাতের হেতা ভাই / আসিয়াছি রোজগার খাতিরে।" (*আমীর হামজা*)—গরীবুল্লাহর এই উক্তিতে সমকালের ছায়াপাত আছে। মানুষ চাকুরির সন্ধানে 'দেশ' বা বাস্তুভূমি ত্যাগ করছে। সমাজে পরিবর্তন এসেছে।

শাক্তপদাবলী

শাক্তপদ বা শ্যামাসঙ্গীতে কালীদেবীর পূজা-আরাধনা ও চরণাশ্রয়ের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী-বক্ষারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী, খড়গধারিণী এই দেবী শক্তির প্রতীক। তাঁর কাছে ভক্তি নিবেদন ও তাঁর কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ার ফল। "মা আর ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।"—রামপ্রসাদের এই উক্তির মধ্যে গভীর বেদনা আছে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামাজিক নির্যাতন, রাজনৈতিক সঙ্কটের মিশ্রণে এই বেদনার উৎপত্তি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন দুর্বিপাক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভক্তহৃদয় আদ্যাশক্তির কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করিয়া বাস্তব দুঃখ নৈরাশ্যের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। এই জন্য দেখা যাইতেছে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খামখেয়ালে সর্বস্বান্ত হইতেছিল, যে সমস্ত ধনাঢ্য ভূস্বামী নবাবী লীলার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে শ্যামা মায়ের নিকট অন্তরের আকুতি নিবেদন করিয়াছে। তাঁহারা সুখের কথা বলিলেও বাস্তব দুঃখকে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন নাই।[১৪]

শাক্তপদের দু'টি শাখা—এক. হর-পার্বতীর পারিবারিক জীবনাশ্রিত আগমনী ও বিজয়া গীত; দুই.কালিকা বা শ্যামার মাতৃরূপের ভজন-পূজন বিষয়ক অধ্যাত্ম গান। রামপ্রসাদ ও

---

১৪. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, ১১১৭।

কমলাকান্তের অধ্যাত্মতত্ত্বের শ্যামাসঙ্গীত ভাবে ও সুরে উৎকৃষ্ট। কোন কোন পদে অধ্যাত্মকথার আবরণ ভেদ করে ব্যক্তির আবেগ ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আত্মঃপ্রকাশ করেছে। মা ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন করে ভক্তিরসের গীতোচ্ছ্বাস ও কাব্যাস্বাদন আঠারো শতকের অভিনব অবদান। অনেক মহারাজা ও তাঁদের দেওয়ান শাক্তগান লেখেন। তাঁরা অনেকে কোম্পানির শোষণে বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। মহারাজ নন্দকুমারও (মৃত্যু ১৭৭৫) শাক্তপদ রচনা করেন।[১৫] অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণীর চর্চায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্তপদের শিল্পগুণ সমকালের অন্য শাখার তুলনায় উন্নত ও মননসম্পৃক্ত।

কবিওয়ালা গান

'কবি' শব্দের সাথে বৃত্তিবাচক 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগ করে কবিওয়ালা শব্দের উৎপত্তি। যাঁরা কবিতাকে জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁরাই কবিওয়ালা। জনতার আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সুর-ছন্দ যোগে কবিতা রচনা করে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। কবিগণ জনতাকে তুষ্ট করেন, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ পান। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ এক অভিনব কাব্যানুশীলন। অতীতে গায়েন পূজার মণ্ডপে অথবা সামাজিক উৎসবে অন্য কবির কাব্য গান করে শোনাতেন। কবিগানে কবি স্বয়ং রচনার ও গাওয়ার কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করেন। এমন পেশাজীবী কবির রচনার মান উচ্চ হতে পারে না। কবিগণ দরবার ছেড়ে সরাসরি জনতার মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এই জনতাকে আনন্দদান করা কবিগানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জনতাকে 'হঠাৎ রাজা' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায় :

> ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। . . . তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।[১৬]

জনতাই কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ও রস-আনন্দভোগী। এতে লিখিত সাহিত্যের সৃজনশীলতা ও শিল্পসুষমা থাকতে পারে না। কথার চটক আর অলঙ্কারের চাতুর্য দ্বারা গানকে মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিসুখকর করে তোলার দিকে কবিগণ জোর দেন।

কবিওয়ালা গানের মুখ্য বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলেন। কবিওয়ালারা বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁরা সমাজের

---

১৫. প্রাগুক্ত, ১১৭৬-৭৯।
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, (বিশ্বভারতী ১৯৬৪), ৭৯।

নানা স্তর থেকে আসেন। তাঁরা ধর্মীয়ভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের প্রতিভারও অভাব ছিল। উপরন্তু যুগ, পরিবেশ, শ্রোতা পাল্টে যাওয়ায় তাঁরা চাইলেও আধ্যাত্মিকতার মোড়ক দিতে পারতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ছিল অবলম্বন মাত্র—কবিরা নরনারীর বাস্তব প্রেমকেই চিত্রিত করেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ছাড়াও হরগৌরী ও রাম-সীতার লীলা কবিওয়ালা গানের বিষয়ভুক্ত হয়েছে।

আঠারো শতকে এ-ধারার প্রধান কবি ছিলেন গোজলা গুঁই, রাসু (১৭৩৪-১৮০৫), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০২), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২), নিতাই বৈরাগী (১৭৪৭-১৮২১), নিধুগুপ্ত (১৭৫৫-১৮৫২), কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২৫) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁরা পূর্বে গান বেঁধে আসরে গেয়ে শোনাতেন, কিন্তু ক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে গেয়ে শোনানোর রীতি দাঁড়িয়ে যায়। কবিগান, দাঁড়া কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেউড়, টপ্পা, তরজা ইত্যাদি ধারার কবিওয়ালা গান রচিত হয়।

হরু ঠাকুর 'কবির লড়াই'-এ অংশ গ্রহণ করতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাম বসু ও কেষ্টা মুচি। নিতাই বৈরাগীর ভাষা সহজ, প্রকাশভঙ্গি ছিল অনায়াস ও অনর্গল। নিধু গুপ্ত টপ্পাগায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। টপ্পা আদিরসাত্মক প্রণয়গীতি। তিনি খেউড় ও হাফ-আখড়াই রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।"[১৭] এর ভাব ও রস উভয়ই অশ্লীল। কবিওয়ালা গানের জন্মভূমি কলকাতা শহর, পরে তা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। কবিগণ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কলকাতায় সমবেত হন। প্রথমে হিন্দু কবির, পরে মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রধান লক্ষণ অশ্লীলতা ও নীতিহীনতা—কবিওয়ালা গানের ভাবে, রসে, ভাষায়, ভঙ্গিতে ব্যতিক্রম ছাড়া এই বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

আঙ্গিক ও রীতি (Form and Style)

মধ্যযুগে গদ্য ছিল না, পদ্য ছিল। সব কিছু ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত হতো। উনিশ শতকে গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়। পদ্য বলতে পয়ারবদ্ধ চরণরাশিকে বোঝায়। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী পয়ার কাব্যের প্রধান বাহন ছিল। আট ও ছয় মাত্রার দ্বিপার্বিক চরণ দ্বারা দ্বিপদী পয়ার গঠিত। ত্রিপদীর চরণসংখ্যা তিন, চতুষ্পদীর চরণসংখ্যা চার—ছয় ও আট মাত্রার পর্বভেদে লঘু ও গুরু ত্রিপদী-চতুষ্পদী পয়ার ছিল। দশ মাত্রার চরণ 'দিগক্ষরা', এগার মাত্রার চরণ 'একাবলী' ছন্দ নামে অভিহিত ছিল। প্রতি চরণে পূর্ণ বাক্য ও প্রতি দুই চরণের অন্তে মিল দ্বিপদী পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আঠারো শতকের

১৭. সুশীলকুমার দে, *নানা প্রবন্ধ*, (কলিকাতা ১৯৫৪), ১১৭।

পদ্যশাসিত কাব্যে ফর্মের দিক থেকে তিনটি প্রধান রূপ লক্ষ্য করা যায়—এক. আখ্যান, কাহিনী বা পাঁচালীকাব্য; দুই. গীতিকবিতা; তিন খণ্ডকবিতা। মঙ্গলকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, জীবনীকাব্য, অনুবাদকাব্য, দোভাষী পুঁথি হচ্ছে আখ্যানাশ্রিত পাঁচালীকাব্য। বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদ, কবিওয়ালা গান গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত। *রাগতালনামা, যোগকলন্দর, কুর্সিনামা* ইত্যাদিকে খণ্ডকাব্য বলা যায়।

শ্রীরাম পাঁচালী, ভারত পাঁচালী, মনসার পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী, কৃষ্ণের পাঁচালী ইত্যাদি নাম বহুল প্রচলিত। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য *পদ্মাবতী পাঞ্চালী* নামে ১৮৬৯ সালে হাবিবি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮] সংস্কৃত 'পাঞ্চালিকা' থেকে পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থ "তান লয়ে গান করিবার উপযোগী ছন্দোবদ্ধ রচনা"।[১৯] বিশেষ অর্থ "(১) গান, (২) সাজ বাজান, (৩) ছড়া কাটান, (৪) গানের লড়াই, (৫) নাচ—এই পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লড়াই"। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন পাঁচালীর এরকম অর্থ করেন।[২০] গানের সুর অর্থেও পাঁচালী শব্দের ব্যবহার আছে, পঞ্চাল বা কনৌজ থেকে এ সুর বাংলাদেশে আসে।[২১] ক্ষুদিরাম দাস বলেন, "পাঁচালী হল গান করার একটা বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি।—পদচারণার সঙ্গে এই বিশেষ ঢঙটি সংশ্লিষ্ট বলে পাদ> পাঙ+ চাল+ই বিশেষণবোধক, এরকম ব্যুৎপত্তিই যথাযথ বলে মনে হয়।"[২২] কেউ কেউ পয়ার ছন্দকেও পাঁচালী বলেছেন।[২৩]

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক, সুর-তাল-ছন্দযোগে রচিত মধ্যযুগের আখ্যায়িকা গীতি (narrative song) এখন পাঁচালী বা কাহিনীকাব্য নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনায় বাঙালির প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করেছে। গীতিকবিতায় আবেগ প্রকাশিত হয়েছে; আখ্যানকাব্যে আবেগ, জ্ঞান, দর্শন সব ধরনের অভিব্যক্তি বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। এজন্য এ ফর্মের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে। মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও পিনদ্ধতা রক্ষিত হয় নি। তা পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক

---

১৮. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৩৩০(৩য় সংস্করণ।

১৯. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষার অভিধান,* দ্বিতীয় ভাগ, (কলিকাতা ১৯৩৭, ২য় সংস্করণ), ১৩৩০-৩১।

২০. ঐ, ১৩৩০।

২১. আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বাইশ কবির মনসামঙ্গল,* (কলকাতা ১৯৬২, ২য় সংস্করণ), ২৮৬।

২২. ক্ষুদিরাম দাস, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রীতি,* (কলকাতা, সালের উল্লেখ নেই), ২০৪।

২৩. *বাইশ কবির মনসামঙ্গল* , ২৮৭ (পাদটীকা)।

চেতনাশ্রিত নর-নারীর জীবনকাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দি ও ফার্সির আধ্যাত্মিক রূপককাব্য বাংলা অনুবাদে আবেগ, কল্পনা, স্বপ্নের মিশ্রণে রোমান্সকাব্যে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবকথা ও মানবকথার মিশ্রণে সম্প্রদায়গত আখ্যানকাব্যের (communal poetry) রূপ লাভ করেছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুণে এগুলিকে জাতীয় আখ্যানকাব্য (national poetry) রূপেও আখ্যাত করা হয়।[২৪] এ শ্রেণীর কাব্যই অধিক সংখ্যায় রচিত হয়েছে। পূজার মণ্ডপে পালাকারে একাধিক দিবস ধরে পেশাদার গায়েন এগুলি গান করে শোনান।[২৫] যেগুলিকে 'দোভাষী পুঁথি' বলা হয়, সেগুলিও মূলত বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য। পুরাণ, ইতিহাস, কল্পনার মিশ্রণে আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। গদ্যময় পয়ার ছন্দের স্বচ্ছন্দতা এবং মাদকতা কবিদের এ-ধরনের রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান/কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান", অথবা "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা/গাঙ্গিনীর তীরে/পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে"। "কাশীরাম দাস অমৃত সমান মহাভারতের কথা বলেন, পুণ্যবান শুনেন" এবং "অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উত্তরিলা, পার কর বলিয়া পাটনীরে ডাকিলা"—এমন সরল বাক্য দু'টিই চরণে বিন্যস্ত হয়ে পয়ার ছন্দের দোলা ও বেগ সঞ্চার করেছে। গৃহে, উৎসবে, পূজার মণ্ডপে, দরবারে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এসব কাব্য পাঠ অথবা শ্রবণ করে বাঙালি কাব্যরসপিপাসা মিটিয়েছে ও আনন্দ উপভোগ করেছে। আঠারো শতক অবধি এ ধারা অব্যাহত ছিল। সেকালে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল, অনুলিপি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। তথাপি বড় বড় কাহিনীকাব্য রচিত ও লিপিকৃত হয়ে ধ্বংসের কবল থেকে সেগুলিকে রক্ষা করেছে। কোন কোন কাব্য পবিত্র জ্ঞানে অন্যকে স্পর্শও করতে দেয়া হয় নি। বলা হয়, সংস্কৃত অনুবাদকাব্য ও মঙ্গলকাব্য রচনা করে হিন্দু কবিগণ ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছেন; আরবি-ফার্সি কাব্যের অনুবাদ ও প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মুসলমান কবিগণ ধর্মের প্রভাব ও সমাজের বিস্তার চেয়েছেন। কিন্তু উভয়ের ভাষা ও আঙ্গিক এক। আখ্যানকাব্যকে হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছে। ভাষায় ও আঙ্গিকে ঐক্য এসেছে, বিষয়ে ও লক্ষ্যে ঐক্য আসে নি।

মঙ্গলকাব্যের গঠনগত রূপ আছে। দেববন্দনা, গুরুবন্দনা, রাজস্তুতি, আত্মপরিচয় দিয়ে মূল কাব্যের শুরু। মানবখণ্ডে জন্ম, বিবাহ, রূপসজ্জা, রন্ধন, বারমাস্যা, ছদ্মবেশে দেবতার আবির্ভাব, বরদান, ধনপ্রাপ্তি, ভাগ্যোন্নতি, সঙ্কটোত্তরণ, মিলন, মৃত্যু, স্বর্গারোহণ—এরকম

---

২৪. ঐ, ৪ (ভূমিকা)।

২৫. চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে, ধর্মমঙ্গল বার দিনে এবং মনসামঙ্গল ত্রিশ দিনে গেয়ে শেষ করা হতো। ঐ, ৩য় (ভূমিকা)।

ছকে কাহিনী বিন্যস্ত হয়। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক ও ছন্দের সঙ্গে প্রণয়কাব্যের নিকটসাদৃশ্য আছে। কাজী দৌলত তাঁর *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী* কাব্যকে 'রসের পাঁচালী' এবং পয়ারকে 'পাঞ্চালীর ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন।[২৬] হাম্‌দ, নাত, পীরস্তুতি, রাজপ্রশস্তি, আত্মপরিচয় দিয়ে মূল কাব্যের সূত্রপাত হয়। নায়ক-নায়িকার জন্ম, বাল্যশিক্ষা, রূপসজ্জা, দর্শন, রূপানুরাগ, রাজা ও রাজপ্রাসাদের বর্ণনা, নায়কের গৃহত্যাগ ও অভিযাত্রা, দুঃখবরণ, বারমাস্যা, দৈবানুগ্রহ লাভ, নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ও মিলন, বিবাহ, দেহসম্ভোগ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, রাজ্যপালন, মৃত্যু—এরকম ঘটনাবিন্যাসে কাহিনীকাঠামো রচিত।

আঠারো শতকে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কম হয়েছে, খণ্ড খণ্ড উপাখ্যানের অনুবাদ হয়েছে বেশি। সমাজের মানুষের দীর্ঘ অবসর কমে এসেছে; একটি কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে—মঙ্গলকাব্যের ও প্রণয়কাব্যের কাহিনীও তাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী হয়ে উঠেছে। দেববন্দনা, গুরুবন্দনা, রাজস্তুতি, আত্মকথা দিয়ে এসব উপাখ্যানও শুরু হয়েছে। গল্পরস সঞ্চার এ সমস্ত কাহিনীকাব্যের মৌলিক আবেদন ছিল।

বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদ, কবিওয়ালা গান একাধারে গান ও গীতিকবিতা। অর্থাৎ গান হিসেবে আস্বাদ্য, কবিতা হিসেবেও আস্বাদ্য। সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আবেগ ও চেতনার ফল বলে উক্ত নামে এগুলির পরিচয়, কবির নামে পরিচয় নেই। বিষয় নির্বাচনে কবিদের স্বাধীনতা ছিল না, কেননা তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত হন নি। তাঁরা একটি অখণ্ড ভাবকে আবেগের ভাষায় ছন্দোবন্ধনে ও ধ্বনিলালিত্যে পরিস্ফুট করেছেন। এসব কবিতার আয়তন ছোট। বৈষ্ণবপদ, সুফীপদ ও শাক্তপদের মাত্রাসংখ্যা এবং চরণসংখ্যা প্রায় সমমাপের, তবে কবিওয়ালা গানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অবয়বে ও চরণে হেরফের আছে। অক্ষরবৃত্তের দ্বিপদী-ত্রিপদী পয়ার বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদেরও বাহন। আঠারো শতকে কোন প্রতিভাধর বৈষ্ণবকবি ছিলেন না, বৈষ্ণবপদ গতানুগতিক অনুবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। যুগের চেতনা ও চাহিদা থেকে শ্যামাসঙ্গীত উদ্ভূত হয় এবং রামপ্রসাদের মতো শক্তিধর কবির চর্চায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্ষুদিরাম দাসের মতে, আঠারো শতকে বৈষ্ণবপদ "প্রতিঘাতরূপী লৌকিক ভাষায় নির্মিত শ্যামাসঙ্গীতের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।"[২৭]

শ্যামা-কালী-দুর্গা-পার্বতী নিয়ে রচিত নতুন ধারার শ্যামাসঙ্গীতে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবের সূক্ষ্মতা এবং ভাষার ধ্বনিসৌন্দর্য নেই, রামপ্রসাদী গানের ভাবে ভাষায় প্রত্যক্ষতা

---

২৬. মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পদিত), *সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী*, (ঢাকা ১৯৬৯), ৫৩ ও ৯৭।

২৭. *বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, ২৩৪।

আছে, সুরে চারুত্ব ও সর্বজনীনতা আছে। "প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ / আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।"—সাধক কবি রামপ্রসাদের গানের একটি দৃষ্টান্ত। বাংলা প্রবাদকে সার্থকভাবে গানের চরণে বিন্যস্ত করে প্রকাশভঙ্গিতে চাতুর্য ও বক্রতা আনেন তিনি। এটি তাঁর গানের বিশিষ্ট বাক্‌রীতি। বৈষ্ণবগীতির ভাবালুতার স্থলে শ্যামাসঙ্গীতে আবেগের সাথে বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটেছে। কবির ব্যক্তিহৃদয়ের উষ্ণতাও এতে বেশি। ছোটবড় চরণ দ্বারা স্তবক রচনায় তিনি নতুনত্ব এনেছেন। সুকুমার সেন বলেন, "রামপ্রসাদের কাব্যের একটি গুণ ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ।"[২৮] দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপনেও নতুনত্ব আছে। উনিশ শতকে দেবমাতা থেকে দেশমাতৃকার কল্পনা আসে।

কবিওয়ালা গান বিভিন্ন শ্রেণীর। 'দাঁড়া কবি' বা 'কবির লড়াই' একটি জনপ্রিয় শাখা। আসরে দুজন কবি 'চাপান-উতোর' ভঙ্গিতে গান গেয়ে পরস্পরকে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ করেন। "বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত ছিল কবিগানের প্রধান অঙ্গ এবং এই অর্থে ইহা পুরাতন বৈষ্ণবসাহিত্যের এক অভিনব শাখা।"[২৯] কবিওয়ালারা বৈষ্ণবকবিতার উত্তরসূরি, কিন্তু তাঁদের রচনায় তারা ভাবে-ভাষায়-রসে পূর্বের গুণ ধরে রাখতে পারে নি । বিষয় ও আঙ্গিক প্রথাগত ও যান্ত্রিক (conventional and mechanical) হয়ে পড়ে। কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তর যখন চরমে উঠে, তখন সে অংশের নাম হয় খেউড়, এটি গালাগালি ও অশ্লীলতায় পর্যবসিত হয়। এখান থেকেই 'খিস্তি-খেউড়' কথার উদ্ভব হয়েছে।

ছড়ার মাধ্যমে দুই কবির যে লড়াই হয়, তাকে 'তর্জা' বলে।। আরবি 'তর্‌জি' থেকে তরজা শব্দ এসেছে, অর্থ প্রত্যুত্তর। যে গানের প্রতিপক্ষ আছে এবং জয়-পরাজয় আছে, তাতে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন বেশি হয়। তর্জাতে শ্লীল-অশ্লীলের বালাই ছিল না।

নিধু গুপ্ত 'টপ্পা' গানের প্রবর্তক। হিন্দি টপ্পা শব্দের অর্থ 'লম্ফ', রূঢ়ার্থ 'সংক্ষিপ্ত'। খেয়াল গানের আরও সংক্ষিপ্ত রূপ টপ্পা—অস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই 'তুক' নিয়ে গঠিত। সুশীলকুমার দে বলেন, "আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। ...ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[৩০] "সাধিলে করিব মান কত মনে করি/দেখিলে

২৮. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৪৯৪।

২৯. *নানা নিবন্ধ,* ১১৭।

৩০. প্রাগুক্ত, ১১৬।

তাহার মুখ তখনি পাসরি।"—নিধুগুপ্ত। "বধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে/শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে/নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো/সুধা বরিষিলো শ্রবণে।"—নিতাই বৈরাগী। টপ্পা গানের এসব দৃষ্টান্তে রাধার প্রেম মুখ্য বিষয়। তবে রাধা উপলক্ষ্য মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এতে মানবপ্রেমের আকুতি ব্যক্ত হয়েছে।

আখড়াই, হাফ-আখড়াই কবিওয়ালা গানের আর একটি শাখা। এর পরিচয় দিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন :

> কবিগানকে পাঁচালী কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়ে নূতন করে ঢালাই করে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ উদ্ভাবন করলেন আখড়াইয়ের। তিনটি মাত্র গানে তা গঠিত : প্রথম 'মালসী' তারপর প্রণয়গীতি, শেষ 'প্রভাতী'। এই আখড়াই রীতিমত কালোয়াতি ব্যাপার, নানাবিধ যন্ত্রযোগে তা গীত হত। কাজেই তা আরও ছেঁটেকেটে সরল করে তৈরী হল লঘু পাকের হাফ-আখড়াই।[৩১]

শ্রোতার ইন্দ্রিয়-উত্তেজনাকর এসব গানের সাময়িক ও ব্যবসায়িক মূল্য ছিল, স্থায়ী শৈল্পিক মূল্য ছিল না। নগর কলকাতার সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতরজন তুষ্টকারী এসব সঙ্গীত ও কাব্যচর্চা তিরোহিত হয়।

দোভাষী পুঁথি আখ্যানকাব্য হলেও এর কাব্যরীতি (poetic diction) সম্পর্কে কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য আছে। এক কথায় এটি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। মিশ্রণ এসেছে শব্দাবলী, ব্যাকরণ ও বাক্‌রীতিতে।[৩২] বাংলা, উর্দু, হিন্দি, আরবি-ফার্সি ভাষার শব্দ, বাংলার সঙ্গে উর্দু-হিন্দির বাক্যরীতি পুঁথির ভাষার ভিত্তি রচনা করেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুসলমানী বাংলা' বাংলার মুসলিম সমাজের কোন অঞ্চলের মুখের ভাষা নয়, এটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এ ভাষার উৎস কলকাতার হাট-বাজারে ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার কথাবার্তায় নিহিত আছে। তাঁর ভাষায় :

> One of the features of 'Musalmani Bengali', which demonstrates its rather artificial character, is the frequent use of Hindustani words and forms . . .which has no existence in the Bengali as spoken by the Musalmans in the villages within the different dialectical areas. 'Musalmani Bengali' thus savours of the mixed Bengali-Hindustani-Awadhi jargon which is heard in the bazars of Calcutta among Muhamedan working classes, cabmen, petty traders and others, who speaks Calcutta Bengali and Hindustani equally badly, and unlike the Muhamedan masses in the country have no proper dialect.[৩৩]

৩১. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ২৩৮।

৩২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, (কলিকাতা ১৯৭১), ১০৮-১০।

৩৩. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* ,Vol.1, (Calcutta 1926), 211-12.

বাংলা কাব্যে এধরনের মিশ্ররীতির ভাষার আংশিক ব্যবহার ২৪-পরগনার কবি বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়* (১৪৯৫), বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* (১৫৯৮), বর্ধমানের কবি দ্বিজ গিরিধরের *সত্যপীরের পাঁচালী* (১৬৬৩), কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* (১৬৮৬), মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *সত্যপীরের পাঁচালী*, বর্ধমানের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* (১৭১১), ২৪-পরগনার কবি বল্লভের *সত্যনারায়ণের পুঁথি* (১৭১৫) ইত্যাদি রচনায় পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] হাওড়ার ভুরশুট পরগনার কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গলে* (১৭৫২) কিছু বেশি অংশ জুড়ে এ ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁর আগে হুগলীর বালিয়া-হাফেজপুরের কবি গরীবুল্লাহ *আমীর হামজা*, *সোনাভান* (১৭২০) ইত্যাদি কাব্য সম্পূর্ণ এ রীতিতে রচনা করেন। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ভাগে তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা ঐরকম কাব্য লিখেন। উনিশ শতকে কবির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলার নানা অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দু লেখকের পণ্ডিতী-বাংলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমান কবি 'মুসলমানী বাংলা' রচনা করেন—এমন মত প্রচলিত আছে।[৩৫] কিন্তু আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। গরীবুল্লাহ যখন দোভাষী পুঁথি রচনা করেন, তখন এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটেই ছিল না। ভারতচন্দ্রের উক্তি থেকে বোঝা যায়, হিন্দু সমাজে 'যাবনী মিশাল ভাষা' বোঝার পাঠক ছিল। ঐ ভাষায় কাব্যরস সৃষ্টি সম্ভব বলে তিনি দাবিও করেন। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'দোভাষী বাংলা' ভাষার মূল কাঠামোটি 'সাধু ভাষা'; তবে সাধু ভাষার শব্দের প্রাকৃত ও সংস্কৃত মূলকে উপেক্ষা করে উর্দু-হিন্দি শব্দের মূলরূপকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা দোভাষী বাংলাব ছিল।[৩৬] "হাল হকিকত পুছে হানিফা খাতের/হানিফা স্বপন কথা করিল জাহির।"—*সোনাভান*। "যখন তোমার সাথে পহেলা পিরিত/করার করিলে তুমি আমার সহিত।।—*আমীর হামজা*। এ হলো দোভাষী পুঁথিতে ব্যবহৃত সাধু ভাষারীতি ও দ্বিপদী পয়ারের দৃষ্টান্ত। অক্ষরবৃত্তের চৌদ্দ মাত্রার চরণ দ্বারা এ পয়ারছন্দ রচিত। সুতরাং আখ্যায়িকাগীতির ও দোভাষী পুঁথির ছন্দোরীতি অভিন্ন। গরীবুল্লাহ পাঁচালীকাব্যের অনুরূপ পীরবন্দনা ও আত্মপরিচয় দিয়ে কাব্যের শুরু করেন। তবে দোভাষী পুঁথি গান করার জন্য রচিত হয় নি, পাঠ করার জন্য রচিত। সুর করে এ কাব্য পাঠ করা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী চারপাশে বসে তা শোনে। এখানে পাঁচালীকাব্যের সাথে দোভাষী পুঁথির তফাৎ আছে।

৩৪. Kazi Abdul Mannan, *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal upto 1855*, (Dhaka 1974), 50-58

৩৫. ঐ, ১৪৯।

৩৬. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ৩০২।

গরীবুল্লাহর ও সৈয়দ হামজার রচিত *আমীর হামজা* কাব্যের চরণসংখ্যা ২৫ হাজার।[৩৭] বটতলার ছাপাখানার বদৌলতে বিরাটাকার এই কাব্যের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার সকল স্তরের মুসলমান *আমীর হামজা* ও অন্যান্য দোভাষী পুঁথি বছরের পর বছর আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছে ও কাব্যরসপিপাসা নিবৃত্ত করেছে।

আলী রজার *জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা, যোগকলন্দর,* মুহম্মদ কাসিমের *হিতোপদেশ,* হেয়াত মাহমুদের *সর্বভেদবাণী* ইত্যাদি সঙ্গীত, যোগতত্ত্ব, সুফিতত্ত্ব ও নীতিশিক্ষার ক্ষুদ্রকাব্যকে খণ্ডকবিতা বলে অভিহিত করা যায়।[৩৭] কাব্যের শুরুতে সংক্ষেপে পীরস্তুতি ও আত্মকথা প্রথাগতভাবে এসব রচনাতেও আছে। এতে প্রচলিত অক্ষরবৃত্তের পয়ারছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। "হৃদয়-প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার/কৃপা কর গাঁথিবারে আগম বিচার।।"—আলী রজা। "যার বিদ্যা নাই সে না জানে ভালমন্দ/শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ।"—হেয়াত মাহমুদ। পয়ারছন্দের ধারণ ও বাহনক্ষমতা ছিল অপরিমিত। সারা মধ্যযুগের বাঙালির হৃদয় ও মন, বোধ ও বুদ্ধি পয়ারের ছন্দদোলায় স্ফুরিত ও আন্দোলিত হয়েছে।

ভাষা (Language)

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কার নানা বিষয়ে ভেদ আছে, সাতচল্লিশ সালে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রে ভেদরেখা রচিত হয় নি। এই বাংলা ভাষাই আমাদের আত্মার ও অস্তিত্বের মুখ্য পরিচয়। আমাদের জাতীয়তা ও স্বাধীনতা অর্জনের মূলে আছে ভাষাচেতনা ও ভাষাপ্রীতি। প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ঠিকই বুঝেছিলেন—"রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।" তিনি "বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া" *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। আবদুল হাকিমের ভাষাপ্রীতি ছিল অসাধারণ ও আপোষহীন। আলাওল অতি উচ্চ ও উন্নত ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

আঠারো শতকের কবিগণ কাব্যোৎকর্ষ সাধন করতে পারেন নি, তবে কেউ কেউ ভাষার চারুত্ব ও পারিপাট্য সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সেবা ও দান আছে। কবির রচনায় ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। বড়ু চণ্ডীদাস ও মুকুন্দরাম বড় কবি ছিলেন, কিন্তু দক্ষ ভাষাকর্মী ছিলেন না। ভারতচন্দ্র দক্ষ লিপিকুশলী ছিলেন। আলাওলও বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁরা উভয়ে নগরচেতনার কবি ছিলেন আর ভারতচন্দ্র ছিলেন আলাওলের উত্তরসূরি।

---

৩৭. ঐ,১৪১।

সিরাজউদ্দৌলার পতনে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়—বাংলার কবিগণ বিষয়টিকে এভাবে দেখেন নি। সরকারি কাজিপদে অধিষ্ঠিত থেকেই হেয়াত মাহমুদ পরের বছর *আম্বিয়াবাণী* কাব্য লিখেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হলে রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়, গরীবুল্লাহ প্রয়াত হলে সৈয়দ হামজার আগমন ঘটে। কবিরা রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা হারালে '*হঠাৎ রাজা*'র সমর্থন পান। কাব্য রচনার পথ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু রুদ্ধ হয় না। প্রজারা রাজা বানায় নি, সুতরাং রাজার বদল হলে প্রজারা বিচলিত হয় নি। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হলে প্রজার উপর তার দায় বর্তায়। জীবন অবক্ষয়ের দিকে গেছে, কাব্যে ও ভাষায় অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। বিয়াল্লিশের বর্গী আক্রমণ, সাতান্নর পলাশীর যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর জনজীবনের দুঃখকে বাড়িয়েছে। দুঃখবাদের আর্তি জেগেছে রামপ্রসাদের গানে। আরাধ্যা দেবী খড়গধারিণী মা হিসেবে শত্রুকে দমন করতে পারেন, আবার বরাভয়দাত্রী হিসেবে আশ্রয়ও দিতে পারেন। পাঠক-শ্রোতা দোভাষী পুঁথিতে আমীর হামজা, হাতেম তাই, হানিফার মতো বীরকে খুঁজেছে। এমন বীরপুরুষই জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। অস্ত্রধারিণী কালী এবং যুদ্ধবাজ হামজা একই চেতনার দুই রূপ। অন্নদার কাজ শেষ হয়েছে, কালীর কাজ শুরু হয়েছে। এজন্যই ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রামপ্রসাদের ভাষার মধ্যে তফাৎ এসেছে। কবিওয়ালারা কবিতাকে জনতার কাছে নিয়ে গেছেন। আখড়াই-খেউড়ের গানে যেরকম খিস্তি-খেউড় হয়, তাতে মার্জিত ও শ্লীল ভাষার স্থান থাকতে পারে না। জর্জ অরওয়েল বলেন, 'If thought corrupts language, language can also corrupt thought." বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ঘটেছে।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। সবাই তাঁর বাক্‌চাতুর্য ও লিপিকুশলতার প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" ভারতচন্দ্র বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি ও হিন্দুস্থানী চারটি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর কাব্যের পাঠক নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পারিষদবর্গ; গায়েন নীলমণি ভীমসাই গান করে তাঁদের শোনাতেন।[৩৮] "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে" বলে ভারতচন্দ্র কাব্যরসের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ভাষার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। *অন্নদামঙ্গলের* দেবলীলা, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ-ভবানন্দ—এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানে নানা চরিত্র, নানা ঘটনা, নানা পরিবেশ ও অবস্থার বিবরণ আছে। ঝড়-বৃষ্টি-যুদ্ধের বর্ণনা, রূপবর্ণনা, প্রেমনিবেদন ও সম্ভোগের বর্ণনা, মালিনীর কুটনীবৃত্তি ও ঈশ্বরী পাটুনীর সরলতার

৩৮. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৪৮৫-৮৬

বর্ণনা, পতিনিন্দা, বারমাসী, রন্ধনবর্ণনা, কালীস্তুতি, দেববন্দনা, বাদশাহ সেলিম ও ভবানন্দের বিতর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষা হয়েছে বিভিন্ন ও বিচিত্র। কালীস্তুতির এক অর্থ দেবীপক্ষে, অপর অর্থ বিদ্যার পক্ষে গেছে। অন্নদার আত্মপরিচয়ও দ্ব্যর্থবোধক—"অতি বড় বিদ্যাপতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।" এ হলো নিন্দার ছলে শিবের স্তুতি। শব্দের মধ্যে অর্থ পুরে দিয়ে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করেছেন তিনি। ক্ষুদিরাম দাস বলেন, কথ্য বাংলা ভারতচন্দ্রের রচনাচাতুর্যের ভিত্তি। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অথবা "কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।" অথবা "সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি/দুয়া যদি চিনি দেন নিম হন তিনি ।" ইত্যাদি বাক্যে কথ্যভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে সংস্কৃতানুসারী অলঙ্কৃত চরণও আছে—"চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু/মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু।" তদ্ভব শব্দের ব্যবহারেও তিনি অনায়াস ছিলেন—"নিশান ফরফর/নিনাদ ধর ধর/কামান গরগর গাজে।" 'যাবনী মিশাল' ভাষার নমুনা—"অরে রে ।ইন্দুকে পুত/দেখলাও কাঁহা ভুত/নহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক/ন হোয় সুন্নত দেকে/কলেমা পড়াঁও লেকে/জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক।" দোভাষী পুঁথির ভাষার সাথে এ ভাষা একাত্ম। ভুরশুট পরগনার অধিবাসী ভারতচন্দ্র ও গরীবুল্লাহ এই ভাষা-ঐতিহ্যের অধিকারী। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন", "মন্দির পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়" ইত্যাদি প্রৌঢ়োক্তি ও প্রবাদের দ্বারা ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার বাঁধুনিকে শক্ত করে এঁটেছেন। তিনি বিভিন্ন অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহার দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য ও পারিপাট্য বৃদ্ধি করেছেন। আলাওল, ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একই পঙ্‌ক্তির—তিন যুগের তিনজন স্থপতি। মঙ্গলকাব্য ধারায় ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবি কাব্যরচনা করে প্রতিভার ঈষৎ পরিচয় দেন, এবং বাংলা ভাষার চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁদের ভাষা স্বচ্ছন্দগামী এবং ছন্দ-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। তাঁদের ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত ও জীবনসম্পৃক্ত। শিক্ষিত শ্রেণীর এই ভাষাই বাঙালির মানসম্মত (standard) ভাষা নির্মাণ করেছে। উনিশ শতকের পণ্ডিতী বাংলা টেকে নি, কেননা তা কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

পদাবলী অন্তর্মুখী ও মঙ্গলকাব্য বহির্মুখী রচনা। ভাষা তার অনুগামী হয়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতো কলাকার আঠারো শতকে জন্মগ্রহণ করেন নি, তবে তাঁদের অনুসারী আছেন। কেউ কেউ ছন্দোবৈচিত্র্য ও ধ্বনিমাধুর্য সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পদ প্রাণহীন। তত্ত্ব ও কাব্যকে একসূত্রে বাঁধার কলাকুশলতা এযুগের কবিরা হারিয়ে ফেলেন। গোপাল হালদার বলেন, "অষ্টাদশ শতকের পদাবলী অজস্র এবং অধিকাংশই অসহ্য।"[৩৯] তাঁরা পদাবলীতে

—

৩৯. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ১৮

প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নি বটে, কিন্তু দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে থেকে 'অজস্র' পদ রচনা করে ভাষার প্রতি অনুরাগ বজায় রাখেন।

মুসলমান কবিগণের মধ্যে হেয়াত মাহমুদের কবিকর্ম সর্বাধিক। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অপ্রতুল। হেয়াত মাহমুদ আরবি-ফার্সি ভাষাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর *জঙ্গনামা* কাহিনীকাব্য, অন্যগুলি অনুবাদমূলক খণ্ডকাব্য। তিনি রাজপদে আসীন থাকলেও জন্মস্থানের চৌহদ্দির বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হয় নি। স্বভাবকবি হিসেবে তিনি জ্ঞানের ও নীতির বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর অনুবাদের কৃতিত্ব আছে, কিন্তু শিল্পকর্মের লিপিচাতুর্য নেই। পাঠ করার জন্য তাঁর কাব্য রচিত। *জঙ্গনামা* সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক, এ বর্ণনা অনায়াস, কিন্তু কারুকার্যহীন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটি বর্ণনা—"মাথার উপর তুলি দিল একপাক। জঙ্গিকে ঘুরায় যেন কুমারের চাক ॥ /আছাড়িয়া মারে তবে ভূমির উপর। /চূর্ণ হয়া পড়ে জঙ্গি তিন সমশ্বর ॥" উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার আছে, তথাপি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয় নি। মযহারুল ইসলাম বলেন,"নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতিনিধি হেয়াত মামুদের কবি-ভাষা আটপৌরে এবং তুলনামূলকভাবে সাধারণ, কিন্তু তাঁহার মূল আবেগের সঙ্গে দেশজ প্রাণের যোগটি অকৃত্রিম খাঁটি।"[৪০] আলী রজার ভাষা হেয়াত মাহমুদ থেকে উন্নত ও কাব্যধর্মী। তিনি আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার খুব কম করেছেন।

প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে কোন কবিই পূর্বসুরির ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেন নি, প্রতিভার অভাবই তার প্রধান কারণ। গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা*, সৈয়দ হামজার *মধুমালতী*, মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী* ঈষৎ সফল কাব্য, এগুলিতে গল্প বলার আগ্রহ বেশি, শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস কম। এঁরা যে মাতৃভাষায় সাধারণ পাঠককে আনন্দদান করেছেন—এতেই তাঁদের তৃপ্তি।

ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীতে বাংলা ভাষায় কিছু নতুন মাত্রা যোগ করেন। গোপাল হালদার বলেন :

> সেই কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদের কাব্যে ও গীতে, ভাবে ও ভাষায় একটা অকৃত্রিমতা দেখা যায়, যা প্রায় ব্যতিক্রম। শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যসূত্রে বৈদগ্ধ্য ও রাজসভা দ্বারা আকৃষ্ট হলেও রামপ্রসাদ লোক-সমাজের থেকেই আপনার প্রাণের আশ্রয় ও সঙ্গীতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।[৪১]

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা/আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।" 'ঘরোয়া ভাবে'র কবিতায় ঘরোয়া ভাষা এসেছে। লৌকিক প্রবাদ (proverb)-এর ব্যবহার দ্বারা গানকে

৪০. *কবি হেয়াত মামুদ*, ২৯৭।

৪১. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ২২৯

অধিক অর্থবহ ও লোকগ্রাহ্য করে তুলেছেন তিনি। "ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিপদ/এ কহে নীল কমল ও কহে চাঁদ", "মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো।" রামপ্রসাদের এ ভাষা সরল ও গদ্যসদৃশ। এই কথ্যভঙ্গি কলকাতার ভদ্রশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সারা দেশে আজও বহাল আছে। আঠারো শতকের অনেক কবি এ ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করেন।

কবিওয়ালারা এই কাজটি আরও বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করেন। কবির লড়াই, তর্জা সংলাপধর্মী রচনা। তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃত্রিম, আলঙ্কারিক, জটিল বাক্যের অবকাশই থাকে না। তত্ত্বকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে বৈষ্ণব পদকর্তারা ভাষাকে শাণিত ও পোশাকী করেছেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম ব্যক্ত করতে গিয়ে কবিওয়ালারা মুক্ত ছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব নন, কবিগান ভক্তিরসের গান নয়। নিধু গুপ্ত ব্যক্তিপ্রেমের কথাই বলেছেন। "ভালবাসবে বলে ভালবাসিনে/আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।" অথবা "নহে সুখী নহে দুখী প্রেম নাহি জানে/সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে।" নিধু গুপ্ত বুঝেছিলেন স্বদেশীয় ভাষার মর্ম; তাঁর উক্তি—"নানা দেশের নানা ভাষা/বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।" আঠারো শতকের কবিদের অন্তরীণ প্রয়াস নিধু গুপ্তের এই উপলব্ধিতে সমাহৃত ও সমীভূত হয়েছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিকে কবিরা এখানে জিতিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাপ্রীতি রক্ষাকবচের মতো কাজ করেছে। কালী মির্জা উচ্চশিক্ষিত ও বহুদর্শী ছিলেন। তাঁর শাক্তপদের ভাষা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। "চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী/তরুণ যেন চরণ দুখানি ॥", "বধির অঙ্গে রণতরঙ্গে/নাচিছে শিবে যোগিনী সঙ্গে/লোলজিহ্বা শব পরে' উলঙ্গে।" তাঁর এ ভাষা সংস্কৃতানুসারী। তিনি বেনারস হয়ে দিল্লী যান এবং সেখানে উর্দু-ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন। এরই প্রভাবে তিনি আত্মভাবের কবিতায় লিখেন, "দুনিয়াদারী কি ঝকমারী বানালে বেহাল/না পুরে মনের আশা হামেশা জঞ্জাল।"[৪২] কবিওয়ালাদের গানে ভাষার ব্যবহারে স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে। 'যাবনী মিশাল' ভাযা ব্যবহার করার জন্য ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে জবাবদিহি করেন, কালী মির্জার জন্য তার প্রয়োজন হয় নি।

উপসংহার

কবি-সাহিত্যিকগণ সমাজের বিবেক। তাঁরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। যিনি চাঁদকে 'পদ্মফুল' হিসেবে দেখেন আর যিনি 'ঝলসানো রুটি' হিসেবে দেখেন, তাঁরা উভয়ে

৪২. উদ্ধৃত, নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'কালী মির্জা১৭৫০-১৮২৫), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (শ্রাবণ- আশ্বিন ১৩৯৭, কলিকাতা), ১৮৭-৮৮।

সমাজের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন—একজন আনন্দকে, অন্যজন বেদনাকে। সমাজে আনন্দ আছে, বেদনাও আছে। টি. এস. এলিয়ট বলেন, 'কবিতার জন্ম কবির 'বিশ্বাস' থেকে—"I can never see that poetry can ever be separated from something which I should call belief." মধ্যযুগের কবি সম্বন্ধেও একথা খাটে, কেবল মাত্রার তারতম্য আছে। মধ্যযুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ নয়, এজন্য বিশ্বাসের মাত্রা অল্প বা অস্পষ্ট; আধুনিক যুগ ব্যক্তিত্ববাদের যুগ, এজন্য বিশ্বাসের মাত্রা গাঢ় এবং প্রত্যক্ষ।

আমাদের দেশে আঠারো শতকের কবিরা সমাজের বিবেকরূপেই কাজ করেছেন। তাঁরা সমাজের অবক্ষয়, ধ্বংস, পঙ্গুত্ব দেখেছেন এবং কাব্যে চিত্রিত করেছেন। সমাজে ধর্মাধর্ম, ন্যায়বিচার, নীতিবোধ লোপ পেলে সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। উপরতলার ভোগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে, নীচুতলার দুঃখ রামপ্রসাদের গানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে ভারতচন্দ্র এটাও বুঝেছিলেন যে নগর পুড়লে দেবালয়কে রক্ষা করা যায় না। রামপ্রসাদ জগৎ-সংসারের তাপানলে দগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বিদ্রোহ করতে পারেন নি, তিনি দুঃখবাদের কবি, দুঃখজয়ের কবি নন; ষষ্ঠীবর ও জীবন মৈত্র চাঁদ সদাগরকে বিদ্রোহী পুরুষরূপে চিত্রিত করেও দেবীর কাছে তাঁর পরাভব ঘটিয়েছেন। পূর্বের এ ধারায় তাঁরা নতুন মহিমা আরোপ করতে পারেন নি। *ধর্মমঙ্গলের* লাউসেন বীর, দোভাষী পুঁথির আমীর হামজা, হানিফা বীর। দেশ পরাভূত, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হলে বীর চাই, যুদ্ধ চাই। পরাভূত জাতির অনেক আক্রোশ, অনেক অশ্রু *ধর্মমঙ্গল, আমীর হামজা, জঙ্গনামা* কাব্যের মধ্যে আছে।

যুগ তার আপন গতিতে এগিয়ে যায়, ইতিহাসের চাকা থামে না। কবিওয়ালা গানে পরিবর্তিত যুগের নানা লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে। ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে এই পরিবর্তনের বিবরণ আমরা পূর্বে প্রদান করেছি।

আঠারো শতকে প্রতিভা'বান কবি এক ভারতচন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় জন জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ঐ শতকে কবি ও কাব্যের সংখ্যা অন্য শতকের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাঁরা বাংলা ভাষার সেবক ও প্রেমিক। 'স্বদেশীয় ভাষা' ব্যতীত আশা পূর্ণ হয় না' নিধু গুপ্তের এই অভিব্যক্তিতে ভাষাপ্রীতির প্রমাণ আছে। বিরোধের মধ্যে না গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতির চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা উভয়ের সাধারণ সম্পদ, এখানে কোন ছেদচিহ্ন রচিত হয় নি। বৈষ্ণবপদের ও সুফিপদের কবিগণ দুই সম্প্রদায়ের, কিন্তু ভাষা এক। গরীবুল্লাহর কৃত্রিম ভাষা লোপ পায়, আলী রজা, হেয়াত মাহমুদ, সৈয়দ নুরুদ্দীনের ভাষা টিকে থাকে। এই ভাষার মধ্যেই বাংলার মুসলমানের প্রকৃত আত্মপরিচয় (identity) নিহিত আছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

হুমায়ুন আজাদ*

বাংলায় আঠারো ও উনিশ শতকের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। অন্ধকার মধ্যযুগ ও আলোকিত আধুনিক সময়ের মধ্যে যে দূরত্ব, তাই ব্যবহিত করে রেখেছে এ-দু'শতককে, যদিও কালের দিক দিয়ে এরা অব্যবহিত। আঠারো থেকে উনিশ শতকে প্রবেশ হচ্ছে নিরালোক থেকে আলোকে প্রবেশ, যে আলোর ছোঁয়া লাগে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের সব দিকে, আর তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে মধ্যবিত্ত বাঙালির বস্তু ও স্বপ্নলোক। ওই শিখায় মধ্যবিত্ত বাঙালির মনোজগতই আলোকিত হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি। এর পরিচয় বিচিত্র রঙে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। উনিশ শতক ও আগের আঠারো, সতেরো, ষোলো প্রভৃতি শতকের বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে একই বাংলা ভাষা ও বর্ণমালায়, রচনা করেছে বাঙালিরাই। তবু মনে হতে পারে এরা যেন ভিন্ন সাহিত্য, যেন একই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে দুই ভিন্ন সাহিত্য। এর আধশতক আগে বাঙালি স্বাধীনতা হারায়; কিন্তু পরাধীনতা বাঙালিকে, অন্তত তার হিন্দুগোত্রটিকে পরাভূত না করে কাজ করে অভাবিত উদ্দীপকরূপে। উনিশ শতকের আগের বাংলা সাহিত্য ছিল প্রথাগত, সঙ্কীর্ণ, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ। তাতে ধরা পড়ে নি বাঙালির জীবন ও স্বপ্নের ব্যাপকতা এবং তাতে বিকশিত হয় নি সাহিত্যের সবগুলো শাখা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ সাহিত্য ছিল না, তার পুরোপুরি বিকাশ ঘটে নি। উনিশ শতকে ব্যাপক জীবন ব্যাপকরূপে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে। যে সাহিত্য প্রায় হাজার বছর ধরে রচিত হচ্ছিল পদ্যে, যে পদ্য অধিকাংশ সময়ই ছিল গদ্য থেকেও নিরাবেগ, ছন্দহীন ও নিষ্প্রভ, উনিশ শতকে সে সাহিত্য হয়ে উঠে গদ্যপ্রাণ। যাতে শতাব্দী পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছিল অনুকরণপ্রবণ স্বভাবকবিদের শ্রান্তক্লান্ত আবেগ ও পুনরাবৃত্ত

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাখ্যান, মননশীলতা যার ছিল সম্পূর্ণ অচেনা, সে সাহিত্য থেকে লোপ পায় আবেগ, তাতে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে মস্তিষ্ক। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে মন থেকে মস্তিষ্কের সাহিত্য; আর তার কেন্দ্র কলকাতা। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতা—এটাই স্থির করে দেয় বাংলা সাহিত্যের চরিত্র। উনিশ শতকের অনেক লেখক তাঁদের গ্রন্থকে 'অভিনব' বলে দাবি করেছেন। তাঁদের এ দাবি অতিশয়োক্তি ছিল না। উনিশ শতকপূর্ব বাংলা সাহিত্য পল্লীসাহিত্য; তার রচয়িতারা আধুনিক অর্থে শিক্ষিত ছিল না, উপভোগীরা ছিল অধিকাংশই নিরক্ষর, পৃষ্ঠপোষকেরাও ছিল সাহিত্যবোধহীন সামন্তপ্রভু। উনিশ শতকের লেখকেরা অধিকাংশই সুশিক্ষিত, পাঠকেরা শিক্ষিত অন্তত সাক্ষর; আর তাঁদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না বা পাঠকেরাই ছিল পৃষ্ঠপোষক। কলকাতা মধ্যবিত্তের নগর, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মধ্যবিত্তের সাহিত্য। এ সাহিত্যের স্রষ্টারা মধ্যবিত্ত, এর বিষয় মধ্যবিত্ত, এর উপভোগীরা মধ্যবিত্ত, যে মধ্যবিত্ত আবহমান পল্লীকে ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল নগরে, আর নগরকেই মেনে নিয়েছিল নিয়তি বলে। অধীত বিদ্যা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এ শতকে, বদলে যায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। আগের সাহিত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, একান্তই বাঙালি প্রতিভার সৃষ্টি। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালি যেন হঠাৎ হারিয়ে ফেলে তার সনাতন স্বতঃস্ফূর্ততা, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ঋণ করে ইউরোপীয়, বিশেষকরে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বাঙালি উনিশ শতকে অর্জন করে এক নতুন সৃষ্টিশীলতা, যা শুধু স্বভাব থেকে পাওয়া যায় না। তা সংগ্রহ করতে হয় অন্য সাহিত্য থেকে, অন্য গ্রন্থ থেকে। এ সৃষ্টিশীলতাকে ঋণাত্মক বলতে পারি; তবে তাকে অভিনব সৃষ্টিশীলতা বলাই যথার্থ, কেননা তা ঋণকে পরিণত করতে পেরেছিল অসামান্য পুঁজিতে, যা আগে আর কখনো ঘটে নি বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে। আগের স্বাভাবিক প্রতিভায় বাঙালি লেখকেরা রচনা করেছিল পুনরাবৃত্তিপরায়ণ পদ্যোপাখ্যান ও পদাবলী। অবশ্য কেউ কেউ ছিল অসাধারণ। আর নতুন সৃষ্টিশীলতার দাক্ষিণ্যে উনিশ শতকের লেখকেরা বিকাশ ঘটান সাহিত্যের সমস্ত শাখার। একশো বছরে তাঁরা যা সৃষ্টি করেন, পরিমাণে তা আগের ন'শো বছরের সৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশি তো বটেই। তবে এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এদের কোন তুলনা হয় না। উনিশ শতকে বাঙালির রূপান্তর ঘটে বাংলা সাহিত্যে; এর আগে এমন কখনো ঘটে নি। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অভিনব বাঙালির অভিনব সাহিত্য।

পাঠ্যপুস্তক দিয়েই সূচনা হয়েছিল শতাব্দীটির, কিন্তু অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক পেছনের বস্তুতে পরিণত হয়; শুরু হয় পত্র-পত্রিকায় তর্কবিতর্ক, সামাজিক-ধর্মীয় বাদানুবাদ, ঘটে মননশীলতার উন্মেষ; দেখা দেয় নকশা, উপাখ্যান; কবিতার রূপান্তর ঘটতে থাকে, সূচনা ঘটে নাটক-উপন্যাসের এবং বাংলা সাহিত্য রূপ নেয় এক পরিপূর্ণ বিকশিত সাহিত্যের। উনিশ শতকের, অন্তত এর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য প্রধানত গদ্যসাহিত্য এবং এ গদ্যের

বিকাশ ঘটানো উনিশ শতকের লেখকদের এক বড় কীর্তি। আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন এক অভিনব বাংলা ভাষা। যে আধারে তাঁরা পরিবেশন করেছেন তাঁদের আধেয়, তাকে তাঁরা গড়ে নিয়েছিলেন নিজেদের মতো। উনিশ শতকের সূচনাকালে বাংলা ভাষার এমন কোন রূপ ছিল না, যা অবলীলায় ব্যবহার করা যেতো পাঠ্যপুস্তকে বা প্রবন্ধে বা উপাখ্যান রচনায় বা বিতর্কমূলক রচনায়। উনিশ শতকের আগে কোন সর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষাই ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে যে গদ্যকে তাঁরা পেয়েছিলেন, তার ছিল না কোন সুস্থিত রূপ; তার শব্দের ও বাক্যের রূপ ছিল অস্থির, অস্থিত। তাই তাঁদের গড়ে নিতে হয়েছিল একটি লেখ্য ভাষারূপ, যা এখন সাধুরীতি নামে বিখ্যাত। সাধুরীতি শুধু একটি গদ্যরীতি ছিল না, সেটি ছিল উনিশ শতকের অভিনব বাঙালির বাস্তব ও অবাস্তব, জীবন ও স্বপ্ন, আবেগ ও মেধা প্রকাশের অনিবার্য ভাষা। আঠারো শতকের সঙ্কীর্ণ বাংলা ভাষায় উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য রচিত হতে পারতো না, কারণ ওই ভাষার শব্দসম্ভারের ও বাক্যসংগঠনের সে শক্তি ছিল না। তাঁরা যে ভাষারীতি সৃষ্টি করেছিলেন, যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন তার অবয়ব, তা ছাড়া অন্য কোনো ভাষারীতি বা অবয়ব ছিল প্রায় অসম্ভব, আর ওই অবয়ব ছাড়া আর কোনো অবয়বে উনিশ শতকে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন হতো কিনা বলা মুশকিল। গদ্যের একটি শক্তিশালী, সুস্থিত রূপ আবিষ্কার ও তাতে জীবনকে বিচিত্ররূপে প্রকাশের যে অসামান্য কাজটি তাঁরা সম্পন্ন করেন, তাকে অভিহিত করতে পারি গদ্যবিপ্লব নামে। এ গদ্যবিপ্লব আধশতকের জন্য বাংলা সাহিত্যকে প্রায় কবিতা বা পদ্যহীন করে তুলেছিল—এ এক বড় ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

বাংলা ভাষায় যেহেতু প্রধানত রচিত হয় সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত এলাকার চর্চা আজো হয় না বাংলা ভাষায়, তাই বাংলায় লেখা সব কিছুই প্রথাগতভাবে গণ্য হয় সাহিত্যরূপে, বা সাহিত্যের আলোচনায় গৃহীত হয় এমন সব রচনা, যাকে সাহিত্য বলে গণ্য করা যায় না। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে যত্নের সাথে আলোচিত হয় অঙ্ক ও ভূগোল বই এবং আরো এমন অনেক বই, যেগুলোর সাহিত্যমূল্য থাকার কথাই উঠে না। ওগুলো সাহিত্য নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এমন অনেক বই বেরিয়েছে, যেগুলো বাঙালির মনোজগৎকে প্রসারিত করেছে, জীবনকে বদলে দিয়েছে প্রকাশ্যে বা গোপনে গোপনে, কিন্তু সেগুলোর সাহিত্যমূল্য নেই। বই লেখেন সাধারণত দুধরনের মানুষ—কর্মীরা ও স্বাপ্নিকেরা। কর্মীরা বাস্তব মানুষ ও সাধারণত সফল মানুষ। তাঁদের রচনার নানারকম মূল্য থাকে, শুধু সাহিত্যমূল্য থাকে না। আর স্বাপ্নিকেরা অবাস্তব মানুষ ও সাধারণত ব্যর্থ মানুষ। তাঁদের রচনার আর কোন মূল্য না থাকলেও চলে, না থাকলেই সম্ভবত ভাল হয়, যদি তার সাহিত্যমূল্য থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কর্মীদের কাল, দ্বিতীয়ার্ধ স্বাপ্নিকদের সময়। প্রথমার্ধ ভরে দেখা দিয়েছেন নানারকমের কর্মী, নানাধরনের মহত্ত্ব তাঁরা অর্জন করেছেন এবং তাঁরা পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সামাজিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, সমাজসংস্কার করেছেন, অর্থাৎ তাঁরা লিখেছেন—ওই লেখাও তাঁদের কর্ম, স্বপ্ন বা সৃষ্টিশীলতা বা সাহিত্য নয়। দ্বিতীয়ার্ধে দেখা

দেন স্বাপ্নিকেরা, সৃষ্টিশীলেরা—লেখা যাঁদের কাছে কর্ম ছিল না, যাঁদের লক্ষ্য ছিল স্বপ্ন বা সাহিত্যসৃষ্টি। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত লিপিবদ্ধ কর্মের ইতিহাস; ওই সময়ের কর্মীরা সৃষ্টি করেছেন স্বাপ্নিকদের জন্মের ক্ষেত্র। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কর্মের, দ্বিতীয়ার্ধ স্বপ্নের, সৃষ্টিশীলতার।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সূচনাটি ঠিক সাহিত্যিক ছিল না; তার শুরু হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক দিয়ে। ওই পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল এমন শিক্ষার্থীদের জন্য, বাংলা যাদের মাতৃভাষা ছিল না; সম্ভবত তখনো তারা বাংলা শিখেও উঠে নি। যদি এক বছর পিছিয়ে যাই, ১৮০০ অব্দকেও ধরি উনিশ শতকের মধ্যে, তাহলে দেখি, বাংলা সাহিত্যের নতুন কালের সূচনা ঘটে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল দিয়ে। পুরোহিত ও শিক্ষক একসাথে আবির্ভূত হয়েছিলেন শতাব্দীর শুরুতেই অপার্থিব ও পার্থিব জ্ঞান নিয়ে, আর এ দু'গোত্রের মানুষ সাহিত্যকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখেন। তবে সূচনাকালের বইগুলোর মূল্য সাহিত্যের জন্যে নয়, গদ্যের জন্যে। এর আগে গদ্য ছিল না এমন নয়; তবে যা ছিল তা দিয়ে বেশি কাজ চলতো না, স্বপ্ন তো চলতোই না; আর তাকে যে কাজে লাগানো যায় এটাই মনে পড়ে নি কারো, স্বপ্ন তো ছিল অনেক দূরের ব্যাপার। বাংলা গদ্য কিছুটা কাজ করতে শেখে, চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় আঠারো শতকের শেষদিকে বিদেশীদের লেখা আইনগ্রন্থে। উনিশ শতকের প্রথম বছরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষারূপে সুপরিকল্পিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ নতুন গদ্যের সূচনাকারী না হলেও এর পরিকল্পনাকারী উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)। ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বেরোয় বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই, কেরি অনুবাদিত বাইবেলের *মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত।* ১৮০০ অব্দের মে মাসে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষা-সংস্কৃতি শেখানোর জন্য কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ; কেরি যোগ দেন সেখানে এবং বাঙালি পণ্ডিতদের সহায়তায় সৃষ্টি করেন পাঠ্যপুস্তক ও সচেতন গদ্যের ধারা। কেরি তাঁর দুজন সহকারী রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে (১৭৬২-১৮১৯) করে তোলেন উনিশ শতকের প্রথম গদ্যলেখক ও গ্রন্থকার, যা তাঁদের অমরতা এনে দিয়েছে। রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন বিপরীত চরিত্রের, তাঁদের গদ্যও বিপরীত চরিত্রের। দু'টি বই বেরিয়েছিল রামরাম বসুর : *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১) ও *লিপিমালা* (১৮০২)। মৃত্যুঞ্জয়ের বই বেরিয়েছিল কয়েকটি : *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *রাজাবলি* (১৮০৮), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮১৭) ও *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮৩৩)। তাঁর বইগুলো অনুবাদমূলক। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অধিকাংশ বাংলা বইই অনুবাদমূলক। কেরি দু'টি পাঠ্যবই লিখেছিলেন বাংলায় : *কথোপকথন* (১৮০১), *ইতিহাসমালা* (১৮১২) এবং ইংরেজিতে লিখেছিলেন *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১৮০১), সঙ্কলন করেছিলেন বিস্ময়কর অভিধান *এ ডিকশনারি অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* (দু'খণ্ড, ১৮১৫, ১৮২৫)। কেরি বাংলা ভাষার একজন প্রধান পরিকল্পনাকারী, যিনি বাংলা

গদ্যের অবয়ব পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরো কয়েকজন গদ্যলেখক ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মে : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র* (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুনশি(১৭৬০-১৮০৮) হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছিলেন *তোতা ইতিহাস* (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায় সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাপতির *পুরুষ পরীক্ষা* (১৮১৫)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইগুলো পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এগুলোর নেই পাঠ্যপুস্তকের মৌলিক চরিত্র; জ্ঞানার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়ার কোন লক্ষ্যই নেই এগুলোর, এগুলোকে গণ্য করতে পারি গদ্যরচনার নিরীক্ষারূপে। প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন অন্যরা। সেগুলোর সাহিত্য বা গদ্যমূল্য নেই, তবে জ্ঞানগত অশেষ মূল্য রয়েছে। ওই পাঠ্যবইগুলো বদলে দিয়েছিল শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক ও বাঙালির চিন্তার জগৎ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠিত ১৮১৭), যার সদস্য ছিলেন রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) ও তারিণীচরণ মিত্রের (১৭৭২-১৮৩৭) মতো রক্ষণশীলেরা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু প্রথম পর্যায়ে সেগুলোও উপকথা-নীতিকথায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, জ্ঞানের জগতকে প্রসারিত করে নি। শ্রীরামপুর কলেজেই সূচনা ঘটে প্রকৃত পাঠ্যপুস্তকের, যার লক্ষ্য জ্ঞানবিতরণ। শ্রীরামপুরের শিক্ষকেরা উপকথা থেকে জ্ঞানার্থীদের নিয়ে আসেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশ্বে। তাঁরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যার বই রচনা করে বাঙালির জ্ঞানের জগতকে রূপান্তরিত করে দেন। ফেলিকস কেরি (?-১৮২২) লিখেছিলেন *বিদ্যাহারাবলি* (১৮১৯), *ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণসঞ্চয়* (১৮২০)। পাদ্রি ইয়েটস লিখেছিলেন *পদার্থবিদ্যাসার* (১৮২৫), *জ্যোতির্বিদ্যা* (১৮৩৩)। পিয়ার্স লিখেছিলেন *ভূগোলবৃত্তান্ত* (১৮২৮), জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছিলেন *পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ* (১৮৩৩); জন মাক লিখেছিলেন *কিমিয়া বিদ্যার সার* (১৮৩৪)। এমন আরো অনেক বই বেরিয়েছিল; এবং জ্ঞানমনস্ক গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বাঙালিরাও, যার মহৎ উদাহরণ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাকল্পদ্রুম* (১৩খণ্ড, ১৮৪৬-১৮৫১)। এসব পাঠ্যপুস্তকেই রচিত হয়েছিল অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ। আধুনিক বাঙালির জ্ঞানের বিশ্বটির প্রায় পুরোটাই ঋণাত্মক; আর এজগতে প্রচলিত যেসব পারিভাষিক শব্দ, তার প্রায় সবটাই অনুবাদমূলক ঋণের প্রক্রিয়ায় গঠিত। এসব পাঠ্যপুস্তকেই তার সূচনা ঘটেছিল; পরে সংশোধিত ও বিকশিত হয়েছিল বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও জ্ঞানমনস্ক লেখকের হাতে। এসব বইয়ের সাহিত্যমূল্য নেই, কিন্তু এগুলো রূপান্তরিত করেছিল বাঙালিকে এবং গড়ে তুলেছিল উনিশ শতকের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনোজগৎ।

পাঠ্যপুস্তকের পরেই যা দেখা দেয়, তাকে বলা যায় সন্দর্ভজাতীয় রচনা। বাংলায় যেসব রচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়, সেগুলোকে সন্দর্ভ বলাই ভাল; কারণ প্রবন্ধের স্বভাব ও সীমা দুইই অতিক্রম করেছে এগুলো। এগুলোতে পেশ করা হয়েছে নানা প্রতিপাদ্য, লেখকেরা তর্কবিতর্ক করেছেন, নানা বিষয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, বক্তব্য উপস্থাপন

করেছেন। রচনাগুলো মননশীল; আর এগুলোর লক্ষ্য বিদ্যার্থীরা নয়, বয়স্ক সামাজিক মানুষেরা। এ ধারার সূচনাকারী রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহন শিল্পী বা স্বাপ্নিক ছিলেন না, ছিলেন কর্মী; তাঁর রচনা তাঁর কর্মেরই লিখিতরূপ। রামমোহনের লেখা মূল্যবান কর্মের বা বিষয়ের জন্যে, গদ্যের জন্যে নয়। রামমোহনের সন্দর্ভগুলোর মধ্যে রয়েছে *বেদান্তগ্রন্থ* (১৮১৫), *বেদান্তসার* (১৮১৫)। এ দু'টি অনুবাদ। *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৭), *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *পথ্যপ্রদান* (১৮২৩), *সহমরণ বিষয়* (১৮২৮) এসব বই তখন সাড়া জাগিয়েছিল, সমাজকে ধাক্কা দিয়েছিল; তবে তাঁর যে বইটি তাঁর মৃত্যুর পর নীরবে বেরিয়েছিল, সেটিকেই বেশি মূল্যবান মনে হয়। বইটি *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩)—বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক ব্যাকরণ বই। রামমোহনের ধারার গৌণ লেখকদের মধ্যে রয়েছেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (১৭৮৮-১৮৫১), তাঁর বই *পাষণ্ডপীড়ন* (১৮২৩); গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, তাঁর বই *জ্ঞানাঞ্জন* (১৮২১); গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তাঁর বই *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* (১৮২২); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), তাঁর বই *উপদেশকথা* (১৮৪০), *ষড়দর্শন সংবাদ* (১৮৬৭)। তবে তাঁর কীর্তি হচ্ছে তেরো খণ্ডের *বিদ্যাকল্পদ্রুম* (১৮৪৬-১৮৫১)। রাসসুন্দরী দাসী (১৮১০-১৮৯৮) একটি অন্তরঙ্গ আত্মজীবনী লিখেছিলেন *আমার জীবন* (১৮৬৮) নামে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রথম গবেষক। তিনি মধ্যযুগের কবিদের যে জীবনী রচনা করেছিলেন, তা বাংলা প্রাচীন সাহিত্যগবেষণার সূচনা করে। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *যৎকিঞ্চিৎ* (১৮৬৫), *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা* (১৮৭৯)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন কবি-দার্শনিক, যদিও তিনি ধর্মচর্চা করেছেন, লিখেছেন গদ্য, কবিতা লেখেন নি কখনো। তাঁর গদ্য ছিল তাঁর সময়ের সবচেয়ে কবিত্বময়, স্নিগ্ধ, অন্তরঙ্গ গদ্য; রূপকে-চিত্রকল্পে সৌন্দর্যমণ্ডিত; অবয়বের দিক দিয়ে সুপরিকল্পিত ও পরিস্রুত। তাঁকে বলা যায় তাঁর সময়ের গদ্যের কবি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ* (১৮৫১-৫২), *আত্মতত্ত্ববিদ্যা* (১৮৫২), *ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস* (১৮৬০), *মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ* (১৮৬০-৬৭) প্রভৃতি ও অতুলনীয় *আত্মজীবনী* (১৮৯৮)। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাংলা গদ্যকে নিয়োগ করেছিলেন যুক্তি ও বিজ্ঞানমস্কতার চর্চায়। তাঁর প্রথম বই *ভূগোল* (১৮৪১)। এর পর তিনি বিদেশী বই অবলম্বনে লেখেন গুরুত্বপূর্ণ বই *বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (১৮৫২, ১৮৫৩), *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (১৮৭০, ১৮৮৩)। কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর *চারুপাঠ* (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) খুব উপকারে এসেছিল বাংলার কিশোর শিক্ষার্থীদের। এসব বই বদলে দিয়েছিল বাঙালিকে। উনিশ শতকের সূচনাকালে একজন বয়স্ক প্রাজ্ঞ বাঙালি ও পঞ্চাশের দশকের একজন বয়স্ক প্রাজ্ঞ বাঙালির জ্ঞানজগতের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের প্রধান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। এ সময়ের প্রায় সকলের গদ্যে ছাপ লেগে আছে কর্মী ও শ্রমিকের হাতের,

শিল্পীর হাতের ছোঁয়া খুবই দুর্লভ। বিদ্যাসাগর দেখা দেন প্রথম শিল্পীরূপে। তবে তিনি কর্মী ছিলেন না, চিত্রকর ছিলেন না, ছিলেন ভাস্কর। ভাস্কর যেমন বিকট পাথরের ভেতর থেকে বের করে আনেন স্থির সৌন্দর্য—যা কখনো ফেলে না অশ্রু, উপরন্তু কখনো হাসে না, বিদ্যাসাগরও তেমনি রচনা করেছিলেন বাংলা গদ্যের অচঞ্চল ধ্রুপদী সৌন্দর্য। তাঁর সময়ের প্রত্যেকের গদ্যেই কোন-না-কোন খুঁত পাওয়া যায়, শুধু নিখুঁত ছিলেন বিদ্যাসাগর। বাঙালি যে লিখিত মানভাষা সৃষ্টির সাধনা করে আসছিল আধশতক ধরে, তা পরিপূর্ণ সুস্থিতি লাভ করে বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিদ্যাসাগরের লেখায় সুস্থিতি লাভ করে সাধুরীতির শব্দরূপ, সুসংগঠিত হয়ে উঠে বাক্যের কাঠামো এবং তিনি তাঁর গদ্যকে স্পন্দিত করেন ছন্দে, সঙ্গীতময় করে তোলেন ধ্বনির সুখকর পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রধান পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক। বিদ্যাসাগরের দু'টি সত্তা ছিল—একটি কর্মী, অন্যটি শিল্পী; তবে এ দু'টি সত্তার বিরোধ ছিল না তাঁর মধ্যে—ছিল গভীর মিলন; বা তাঁর শিল্পীসত্তাটিই ছিল প্রধান, তাঁর বাস্তব কাজসমূহও ছিল শিল্পসৃষ্টি। বিদ্যাসাগর প্রধানত অনুবাদক। তবে তাঁকে অনুবাদক বলা ঠিক নয়; তাঁকে বলা যেতে পারে পুনঃস্রষ্টা; কেননা তাঁর অনুবাদে মৌলিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম ছয় দশকের অধিকাংশ গ্রন্থই এখন মৃত, সেগুলো হারিয়ে গেলে খুব ক্ষতি হয় না; জীবিত শুধু বিদ্যাসাগরের রচনারাশি, যেগুলো হারানোর অর্থ হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম ছয় দশকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অবসান। তাঁর পুনঃসৃষ্ট গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *বেতাল-পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *কথামালা* (১৮৫৬), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯) প্রভৃতি; আর মৌলিক রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩), *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭১), *বিদ্যাসাগরচরিত* (১৮৯১) ও *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)।

সন্দর্ভ শ্রেণীর ঢিলেঢালা গদ্যরচনা থেকে প্রবন্ধে উত্তরণ ঘটে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-১৮৯৪) রচনায়। যদিও সৃষ্টিশীল প্রবন্ধ রচনা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তবু তিনিই প্রথম বক্তব্য সংহত আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনার বিষয় সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি; আর এসব বিষয়ে তিনি সামাজিক তর্ক করেন নি, শিথিল ভঙ্গিতেও বক্তব্য প্রকাশ করেন নি, পেশ করেছেন সংহত বক্তব্য। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব* (১৮৫৬), *পুষ্পাঞ্জলি* (১৮৭৬), *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২), *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), *আচার প্রবন্ধ* (১৮৯৫)। তাঁর কিছু প্রবন্ধ চমৎকার সাহিত্যসমালোচনা। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপুস্তিকা লিখেছিলেন *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা* (১৮৫০) নামে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান জ্ঞানী। তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজিতে। বাংলায় তিনি যা লিখেছিলেন, তা তাঁর ঠিক পরিচয় বহন করে না। বাংলায়

তাঁর কীর্তি তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা *বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৫১) ও *রহস্যসন্দর্ভ* (১৮৬৩)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রই প্রথম *বিবিধার্থ সংগ্রহ*-এ গ্রন্থসমালোচনার সূচনা করেন। ১৮৫২ অব্দে বেরোয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ* নামক পুস্তিকা। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা। রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) প্রবন্ধে ঘটেছে মননশীলতার গভীর প্রকাশ। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *সেকাল আর একাল* (১৮৭৪), *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃত্তান্ত* (১৮৭৬), *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা* (১৮৭৮), *আত্মচরিত* (১৯০১)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)। তাঁর বইয়ের নাম *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭২,১৮৭৩)। ন্যায়রত্ন পুরনোপন্থী ছিলেন, তবে তাঁর সমালোচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যবোধের পরিচয় বহন করে। দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯১৩)। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *অধিকারতত্ত্ব* (১৮৭২), *বেদান্ত-প্রবেশ* (১৮৭৫), *পরলোকতত্ত্ব* (১৮৮৫), *প্রলয়তত্ত্ব* (১৮৮৬)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালির সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ১৮৭২ থেকে তিনি *বঙ্গদর্শন* প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন; এবং এ পত্রিকাটি বাঙালির মননজগতে কালান্তর সাধন করে। *বঙ্গদর্শন*-এই প্রকাশিত হয় তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধেই প্রথম মিলন ঘটে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার; প্রবন্ধ হয়ে উঠে সৃষ্টিশীল সাহিত্য। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং লিখেছেন ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যেগুলোকে গণ্য করতে পারি সৃষ্টিশীল প্রবন্ধরূপে। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে অতুলনীয় মননশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি, ভাষাশক্তি ও ভাষাদক্ষতা। বঙ্কিমের প্রবন্ধে কোঁৎ ও লকের প্রভাব রয়েছে, তবে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে একান্তই মৌলিক। সাহিত্য-সমালোচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময়ই অভ্রান্ত; আর বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনারও সূচনাকারী তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ—*বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *বিবিধ সমালোচনা* (১৮৭৬), *সাম্য* (১৮৭৯), *প্রবন্ধপুস্তক* (১৮৭৯), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭, ১৮৯২), *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮)। তাঁর *লোকরহস্য* (১৮৭৫) ও *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫) বেশ ভিন্ন চরিত্রের রচনাসংগ্রহ। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) তাঁর আন্তরিক রীতিতে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *যাত্রা-সমালোচনা* (১৮৭৫), *বাল্যবিবাহ* (১৮৮২)। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বাংলার অকালপ্রয়াত প্রতিভাদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একজন। কিছু চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি এবং লিখেছিলেন *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬৪) নামে একটি অনন্য বই। এটি ঠিক প্রবন্ধসংগ্রহ নয়; তবে এ বইতেই লেখা হয়েছিল উনিশ

শতকের শ্রেষ্ঠ চলতি গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) *স্বপ্ন-প্রয়াণ* (১৮৭৫) নামে একটি দার্শনিক-রূপক কাব্য লিখেছিলেন; কাব্যটি বাংলা কবিতালোকে একটি নিঃসঙ্গ গ্রন্থরূপে রয়ে গেছে এবং মননশীল প্রাবন্ধিক-দার্শনিক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথের যেটুকু প্রাপ্য ছিল তাও পান নি তিনি। দার্শনিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য; এমনকি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধও ছিল সে সময়ের জন্যে অভাবিত। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের যে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার সূচনাকারী। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *ভ্রাতৃভাব* (১৮৬৩), *তত্ত্ববিদ্যা* (চার খণ্ড, ১৮৬৬-১৮৬৯), *অদ্বৈতমতের সমালোচনা* (১৮৯৬), *উপসর্গের অর্থবিচার* (১৮৯৭)। ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪০-১৯১৬)। তাঁর বই *ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা* (১৮৮২), *কেশবচরিত* (১৮৮৪)। বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৮৯১) লিখেছিলেন *মানবতত্ত্ব* (১৮৮৩), *ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত* (১৮৯৭) প্রভৃতি বই। *বান্ধব* (১৮৭৪) পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন—*নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৬৯), *প্রভাত-চিন্তা* (১৮৭৭), *নিভৃত-চিন্তা* (১৮৮৩), *নিশীথ চিন্তা* (১৮৯৬) প্রভৃতি। সে সময় তিনি খ্যাতিও লাভ করেছিলেন; তবে তাঁর প্রবন্ধ ছিল গতানুগতিক ও আড়ম্বরপূর্ণ। প্রবল রক্ষণশীল চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) লিখেছিলেন *শকুন্তলাতত্ত্ব* (১৮৮১), *হিন্দুবিবাহ* (১৮৮৭), *হিন্দুত্ব* (১৮৯২)। রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) বাংলা ভাষায় সূচনা করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর কয়েকটি বই *ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা* (১৮৭২), *মহাকবি কালিদাস* (১৮৭২), *ঐতিহাসিক রহস্য* (১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯), *ভারতরহস্য* (১৮৮৫)। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) লিখেছিলেন *নানা প্রবন্ধ* (১৮৮৫); অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) লিখেছিলেন *সমাজ সমালোচনা* (১৮৭৪), *আলোচনা* (১৮৮২)। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজ-ঐতিহাসিক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *এই কি ব্রাহ্মবিবাহ* (১৮৭৮), *জাতিভেদ* (১৮৮৪) এবং *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৮৯৭), যে বই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পূর্ণচন্দ্র বসু (?-?) এখন বিস্মৃত। তিনি লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ : *কাব্যসুন্দরী* (১৮৮০), *সমাজচিন্তা* (১৮৮২), *সাহিত্যচিন্তা* (১৮৯৬)। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) নাম করেছিলেন *উদভ্রান্ত প্রেম* (১৮৭৬) নামক একটি গদ্য-বিলাপ লিখে। তাঁর প্রবন্ধের বই *সারস্বত কুঞ্জ* (১৮৮৫), *স্ত্রী-চরিত্র* (১৮৯০)। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর কয়েকটি বই *জয়দেব চরিত* (১৮৭৩), *পাণিনি* (১৮৭৫), *ভারত-কাহিনী* (১৮৮৩), *স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৮৯৩), *আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়* (১৮৯৪)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২-১৯৩১) মিলন ঘটিয়েছিলেন পাণ্ডিত্য ও সরসতার। তাঁর বই *ভারত-মহিলা* (১৮৮১), *বাল্মীকির জয়* (১৮৮২)। তবে তিনি অমর হয়ে আছেন *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও*

দোহার (১৯১৬) জন্যে। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) লিখেছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। তাঁর বইয়ের নাম *পৃথিবী* (১৮৮২)। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) লিখেছিলেন *হজরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি* (১৮৮৭), *ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ* (১৮৯০)। রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৮) লিখেছিলেন *সমাজ ও সংস্কারক* (১৮৮৯), *প্রবন্ধ কৌমুদী* (১৮৯১)। মোজাম্মেল হক (১৮৬০) লিখেছিলেন *মহর্ষি মনসুর* (১৮৯৬), *ফেরদৌসী-চরিত* (১৮৯৮)। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০-১৯০৩) লিখেছিলেন *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (১৮৮৮), *কবি বিদ্যাপতি* (১৮৯৫)। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) লিখেছিলেন সংস্কৃত *সাহিত্যের ইতিহাস* (১৮৮৮), *কবি বিদ্যাপতি* (১৮৯৫)। তিনি লিখেছিলেন তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে *সমরসিংহ* (১৮৮৩), *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৮), *সীতারাম রায়* (১৮৯৮)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রবন্ধের নতুন ধারার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বঙ্কিমের প্রবন্ধে মননশীলতার প্রাধান্য আর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে প্রাধান্য কল্পনাপ্রতিভার। রবীন্দ্রনাথ মননশীলতা থেকে কল্পনায় অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে; তাই তাঁর চূড়ান্ত মননশীল প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল, বাংলা সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিস্ময়কর। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, দর্শন, জীবনী, ভ্রমণ, পত্র—বিচিত্র ধরনের রচনা লিখেছেন তিনি এবং লিখেছেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সব ধরনের প্রবন্ধেই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অসামান্য কল্পনাশক্তি ও উপলব্ধির, অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির, বিশ্লেষণপ্রতিভার। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা অনন্য। পনেরো বছর বয়সেই বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ *ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী* (১৮৭৬) নামক এক গ্রন্থ-আলোচনামূলক রচনা এবং অনতিবিলম্বেই বেরোয় তাঁর প্রথম সাড়াজাগানো প্রবন্ধ *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৭৭)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *বিবিধ প্রসঙ্গ* (১৮৮৩)। এরপর উনিশ শতকে বেরোয় *রামমোহন রায়* (১৮৮৫), *আলোচনা* (১৮৮৫), *চিঠিপত্র* (১৮৮৭), *সমালোচনা* (১৮৮৮), *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি* (১৮৯১, ১৮৯৩), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৮৯৪), *পঞ্চভূত* (১৮৯৭)। এ ছাড়া এ সময়ে তিনি লিখেছিলেন প্রচুর ভাষা-সাহিত্য-সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, যা গ্রন্থাকারে বেরোয় বিশ শতকে। উনিশ শতকেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক-রাজনীতিক প্রাবন্ধিকরূপে।

বাঙালির ইতিহাসে একবারই পরাভূত হয়েছিল কবিতা—উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। গদ্যের প্রবল বিপ্লবে বাংলা সাহিত্য থেকে যেন বিদায় নিয়েছিল কবিতা, যা বাংলা সাহিত্যের প্রাণ। সেটা ছিল কর্মের কাল, কবিতার কাল নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের

দশদিগন্ত জুড়ে পড়েছিল গদ্যের চর, শুকিয়ে গিয়েছিল কবিতার দীর্ঘ নদীটি, যা বয়ে এসেছে বাংলা ভাষার সূচনাকাল থেকে। এ সময়ে কোন কবি নেই বাংলায়; এ কবিতাহীন কালের একমাত্র 'কবি' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), যিনি বাস্তবের পদ্য লিখে কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক, তাঁর কবিতাও ছিল পদ্যসাংবাদিকতা, তবু তিনিই ওই সময়ের কবিসম্রাট। নিজের সম্পাদিত *সম্বাদ প্রভাকর*-এ (১৮৩১-১৮৫৯) তিনি নিজের কবিতা প্রকাশ করেছেন, তরুণদের সাহিত্য, বিশেষকরে কবিতা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছেন এবং সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য, যা তাঁর মহান কীর্তি। তাঁর কবিতা ছিল ওই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার পদ্যরূপ। তিনি ছিলেন পুরনো ও নতুনের মিশ্রণ, তবে পুরনোরই প্রাধান্য ছিল তাঁর মধ্যে; আর এ কারণেই বাংলা কবিতার শুকনো ধারাটিকে তিনি মুক্ত করতে পারেন নি। তবু তিনিই ছিলেন কবিতাশূন্য সময়ের একমাত্র কবি। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর এক বছর আগে বেরিয়েছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) এবং পরে বেরিয়েছিল *কর্মদেবী* (১৮৬২), *শূরসুন্দরী* (১৮৬২), *কাঞ্চীকাবেরী* (১৮৭৯)। তাঁর রোমান্টিক পদ্যোপাখ্যানগুলোর কোন কোন পদ্যাংশ বিখ্যাত হয়েছিল, তবু তিনি ঠিক কবি ছিলেন না ।

১৮৫৯ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অব্দ। এ বছর তিরোভাব ঘটে পুরনো কাল ও কবিতার শেষ প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্তের এবং আবির্ভাব ঘটে আধুনিক কাল ও কবিতার প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। এ বছর বেরোয় তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব* (১৮৫৯) এবং কালান্তর ঘটে বাংলা কবিতার। এ বছরকে গণ্য করতে পারি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সূচনা-বছর হিসেবে। বোঝা যায়, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের কর্মীদের কাল শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে স্বাপ্নিকদের কাল। মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব নতুন সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রতিভা, যে প্রতিভা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনেক আগে বুঝতে পারেন যে সারা বিশ্ব পর্যটন করে কবিতার বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মানোর কোন সম্ভাবনা নেই। মধুসূদন কাব্যের বীজ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন পশ্চিম পৃথিবীতে এবং সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতাকে। শুধু কবিতা নয়, তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকেই। তিনি সূচনা করেছিলেন প্রকৃত নাটকের ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসনের; রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষার একমাত্র মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা কবিতার অভিনব ভাষা ও ছন্দ; লিখেছিলেন অভাবিত পত্রকাব্য, পদাবলী ও চতুর্দশপদী। সব ক্ষেত্রেই অশেষ তাঁর সাফল্য। মধুসূদনের *তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য* হচ্ছে মহাকাব্য রচনা ও অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত সৃষ্টির উদ্যোগ, আর *মেঘনাদবধকাব্য* হচ্ছে তার সাফল্য। বাংলা কবিতার মহত্তম পরিকল্পনার নাম *মেঘনাদবধ*। এ কাব্যের পর আর কোন মহাকাব্য লেখা যেতে পারে না, এটা বুঝেছিলেন মধুসূদন; তাই তিনি ভিন্ন ধরনের কবিতার রাজ্য জয় করেছিলেন পরে; তবে তাঁর অনুসারীরা তা বোঝেন নি বলে ছদ্মমহাকাব্যে কবিতালোক ভরে তুলেছিলেন। এর

পর বেরোয় তাঁর *ব্রজাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬১), *বীরাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬২) ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৬), যার প্রতিটিই নিরীক্ষা হিসেবে অভিনব ও কাব্য হিসেবে অতুলনীয়। মধুসূদনের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি ও অমর সংস্কার হয়ে থাকার জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত। মধুসূদনের অনুকরণে 'মহাকাব্য' লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), এবং দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্য *বৃত্রসংহার* (১৮৭৫, ১৮৭৭); নবীনচন্দ্রের কাব্য *রৈবতক* (১৮৮৭), *কুরুক্ষেত্র* (১৮৯০), *প্রভাস* (১৮৯৬)। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রচুর কাব্য ও খণ্ডকবিতা লিখেছিলেন, সাড়াও জাগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের রচনার কাব্যমূল্য বেশি নয়, ওগুলো ব্যর্থতার মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মধুসূদন বাংলা কবিতার এক কালান্তর সম্পন্ন করেছিলেন, তবে তিনি ধ্রুপদী কবি; যাকে আধুনিক সংবেদনশীলতা বলা হয়, তাঁর কবিতা ঠিক তার প্রকাশ নয়। পশ্চিমে রোমান্টিকতাকে গণ্য করা হয় আধুনিক চেতনার প্রথম প্রকাশরূপে। আঠারো শতকের শেষদিকে ইউরোপে দেখা দেয় রোমান্টিকতা, যা দেখা দেয় ইউরোপীয় চৈতন্যের সঙ্কটরূপে আর চিরকালের জন্যে ফাটল ধরিয়ে দেয় ইউরোপীয় চিন্তাধারার মেরুদণ্ডে। কবি হয়ে উঠেন নিজের সৌরলোকে সূর্যের মতো; কবিতা হয়ে উঠে তাঁর নিজেরই চেতনার প্রকাশ। কবি বাহ্যজগতের অনুসারীর বদলে হয়ে উঠেন প্রদীপশিখার মতো, তাঁর কবিতাও ওই প্রদীপেরই শিখা। এ অর্থে বাংলা কবিতার প্রথম প্রকৃত আধুনিক ও রোমান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। মধুসূদন বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার রূপ ও কাঠামো; বিহারীলাল বদলে দেন বাংলা কবিতার চৈতন্য, যা সেসময় সাড়া জাগায় নি; তবে পরিণামে জয় হয় বিহারীলালেরই। বিহারীলাল বাংলা কবিতার প্রথম অন্তরঙ্গ কবি, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের হৃদয়াবেগ ও স্বপ্নের প্রকাশ। বিহারীলাল অবশ্য কবি হিসেবে ছিলেন অসম প্রকৃতির—এক শ্লোক অবিস্মরণীয় কবিতা লেখার পরমুহূর্তেই তিনি পুরোপুরি অকবিতা লিখতে পারতেন। তাই তাঁর কবিতাবলী বহু লোকোত্তর শ্লোকগ্রস্ত হয়ে আছে বিপুল পরিমাণ পাংশু পংক্তির মধ্যে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সঙ্গীতশতক*-এই (১৮৬২) প্রকাশ পায় তাঁর রোমান্টিক প্রবণতা, তবে পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে তা রুদ্ধ হয়ে পড়ে ; কিন্তু আট বছর পরে প্রকাশিত *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০) কাব্যে রোমান্টিক আবেগের বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটে। বিহারীলাল ছিলেন চরম রোমান্টিক ও অতীন্দ্রিয় স্বাপ্নিক, সমাজ-বহিরস্থিত, যার পরিচয় রয়েছে তাঁর *সারদামঙ্গল* (১৮৭৯) ও *সাধের আসন* (১৮৮৮) কাব্যে। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্য *বন্ধুবিয়োগ* (১৮৭০), *নিসর্গসন্দর্শন* (১৮৭০), *প্রেমপ্রবাহিণী* (১৮৭০)। এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), মানকুমারী বসু

(১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) কবি হিসেবে খ্যাতি বা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা হলো সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ *মহিলা* (১৮৮০), দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ *স্বপ্নপ্রয়াণ* (১৮৭৫), গোবিন্দ দাসের কাব্যগ্রন্থ *প্রেম ও ফুল* (১৮৮৭), *কুঙ্কুম* (১৮৯১), *কস্তুরী* (১৮৯৫), দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগ্রন্থ *ফুলবালা* (১৮৮০) *অশোকগুচ্ছ* (১৯০০), গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগ্রন্থ *কবিতাহার* (১৮৭৩), *অশ্রুকণা* (১৮৮৭), কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থ *অশ্রুমালা* (১৮৯৫), অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থ *প্রদীপ* (১৮৮৬), দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থ *আর্যগাথা* (১৮৮২), মানকুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ *কণকাঞ্জলি* (১৮৯৬), কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯)। এ সময়ে মহিলা কবিদের চমৎকার বিকাশ ঘটেছিল; তাঁদের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিল নানা ধরনের নীতিকথা ও হাহাকার।

১৮৬১ এক মহাবর্ষ। এ বছর বেরোয় বাংলা ভাষার একমাত্র মহাকাব্য *মেঘনাদবধ* এবং জন্ম নেন বাংলা ভাষার মহত্তম কবি ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখিতা বিস্ময়কর; বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা তিনি তুলনাহীনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, একাই সঙ্কীর্ণ বাংলা সাহিত্যকে পরিণত করেছেন বিশ্বসাহিত্যে। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, গদ্য ও কাব্যনাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও আরো নানা শাখা তিনি ভরে দিয়েছেন অসামান্য সৃষ্টিশীলতায়। তাঁর রচনার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ দুইই বিস্ময়কর এবং বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ। একটি শব্দে তাঁর পরিচয় দিতে হলে বলতে হবে, তিনি রোমান্টিক এবং তিনি বিশ্বরোমান্টিকতার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন শুরু হয়েছিল রোমান্টিক বহিরস্থিতরূপে, তবে তিনি ক্রমশ প্রবেশ করেন বস্তুজগতে। তাঁর শেষ রচনায়ও স্বাক্ষরিত হয়ে আছে তাঁর রোমান্টিক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে নিজের গুরুরূপে স্বীকার করেছেন; তবে তাঁদের পার্থক্য এই যে বিহারীলাল ছিলেন স্বপ্নলোক থেকে নির্বাসিত, বস্তুজগতে প্রবাসী আর প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগতকেই রূপান্তরিত করেছিলেন স্বপ্নলোকে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতা স্বপ্নঘোরনিবিড় কবিতা। তাঁর এ সময়ের কাব্য ও কাব্যনাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *কবি-কাহিনী* (১৮৭৮), *বন-ফুল* (১৮৮০,) *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১), *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১), *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১), *সন্ধ্যা সঙ্গীত* (১৮৮২), *কালমৃগয়া* (১৮৮২), *প্রভাত সঙ্গীত* (১৮৮৪), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *শৈশব সঙ্গীত* (১৮৮৪), *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (১৮৮৪)। এগুলোতে বহু ধারায় উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক বিষাদ ও বস্তুবিশ্বের সাথে খাপ না খাওয়ার যন্ত্রণা। ঘোরের কবিতা থেকে আলোকোজ্জ্বল পরিপূর্ণ কবিতায় তাঁর উত্তরণ ঘটে *ছবি ও গান* (১৮৮৪),*কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬), *মানসী* (১৮৯০) কাব্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে বেরোয় *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *কথা* (১৯০০), *কাহিনী* (১৯০০), *কল্পনা* (১৯০০), *ক্ষণিকা* (১৯০০) অর্থাৎ সেসব কাব্য, যেগুলোকে রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে গণ্য করা যায়। এসব কাব্য বাঙালির সংবেদনশীলতাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

বাংলায় নাটকের সূচনা করেন গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৮) নামক এক রুশ পরিব্রাজক। তিনি ইংরেজি থেকে *ডিজগাইজ* এবং *লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর* নামে দু'টি নাটক অনুবাদ করেন। প্রথম নাটকটি ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ ও ২১ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে অভিনীত হয়। নাটকটি ছিল প্রহসন। লেবেদেফ তখনই বাঙালি নাটকউপভোগীদের রুচির দোষ লক্ষ্য করেছিলেন, আর মধুসূদন এর ষাট বছরেরও বেশি পরে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোক রাঢ়বঙ্গে/নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়' (*শর্মিষ্ঠা*, ১৮৫৯) বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যের এ শাখাটিই জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত আর এখানেই শিল্পরুচির অভাব সবচেয়ে বেশি। লেবেদেফের নাট্যাভিনয়ের সাথে সাথে মৌলিক বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয় শুরু হয় নি, হতে আধশতকেরও বেশি সময় লেগেছিল। বাংলা মৌলিক নাটকের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৫২ সালে। এবছর বেরোয় জে. সি. গুপ্তের বিয়োগান্তক নাটক *কীর্ত্তিবিলাস* ও তারাচরণ শিকদারের মিলনান্তক নাটক *ভদ্রার্জুন*। প্রথম প্রকাশিত হওয়াতেই এ দু'টির গৌরব। এরপর মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে বেরোয় *মারচেন্ট অব ভেনিস* অবলম্বনে লেখা হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-১৮৮৪) *ভানুমতী-চিত্তবিলাস* (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবাবিবাহনাটক* (১৮৫৬)। এঁদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর নাটকের শিল্পমূল্য না থাকলেও ছিল বেশ অর্থ-সম্মান এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে একটি উপাধি অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য নাট্যরূপী রচনার মধ্যে রয়েছে *বেণীসংহার* (১৮৫৩), *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *নবনাটক* (১৮৬৫)। বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণের শ্রেষ্ঠ উপহার কোন নাটক নয়, একজন নাট্যকার; কারণ তাঁর *রত্নাবলী* নাটক দেখতে গিয়েই বাংলা নাটকের শোচনীয়তা দর্শনে ক্ষুব্ধ বোধ করেন মাইকেল মধুসূদন এবং আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত ও প্রধান নাট্যকার মধুসূদনের।

বাল্যকাল থেকেই বিপুল সাহিত্যপ্রস্তুতি নিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), তবে সাহিত্যের সব শাখায়ই তাঁর আবির্ভাব ঘটে আকস্মিকভাবে—এমনকি নাটকেও। হঠাৎ অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) এবং এটিই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা নাটক। মধুসূদন নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে। পুরাণ থেকে সমকালে আসতেও দেরি হয় নি মধুসূদনের। অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর তীব্র ও আধুনিক প্রহসনযুগল *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৮৬০) ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)—কাহিনী, সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে যে দু'টি আজো অতুলনীয়। এ বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় নাটক *পদ্মাবতী* (১৮৬০)। এ নাটকে তিনি মিলন ঘটিয়েছেন ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণের মধ্যে—নাটকের প্লট নেন তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে, কিন্তু পাত্রপাত্রী নেন ভারতীয় পুরাণ থেকে। পরের বছর বেরোয় তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নাটক *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১), যে বছর বেরোয় তাঁর মহাকাব্য *মেঘনাদবধ* (১৮৬১)।

কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। মধুসূদন নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন টডের *এ্যানালস এ্যান্ড এন্টিকুইটিজ অব রাজস্থান* থেকে। এ নাটকে তিনি গ্রিক নিয়তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও ট্র্যাজিক হাহাকার ধ্বনিত করে তুলেছেন। মধুসূদনের পর গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৪)। দীনবন্ধু সমসাময়িক বিষয় গ্রহণ করেন তাঁর নাটকে; তবে তাঁর শিল্পরুচি উন্নত ছিল না। তাঁর ঝোঁক ছিল স্থূল বাস্তবতা উপস্থাপনের; তাই তাঁর পাত্রপাত্রীদের যতোটা জীবন্ত মনে হয়, ততোটা শিল্পসৃষ্টি মনে হয় না। তাঁর প্রতিভা মূলত প্রহসন রচনার প্রতিভা। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক *নীলদর্পণং নাম নাটকম* (১৮৬০) অর্থাৎ *নীলদর্পণ* ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল। তাতে নাট্যকারের নাম ছিল না; বলা হয়েছিল 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম'। নীলকরদের নৃশংস অত্যাচার এ নাটকের বিষয়। নাটকটি সে সময়ে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তা নাট্যিক ছিল না, ছিল সামাজিক-রাজনীতিক। তাই এটি এক উদ্দেশ্যসফল নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটক ও প্রহসন *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬০), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *লীলাবতী* (১৮৬৭), *জামাই বারিক* (১৮৭২), *কমলে কামিনী* (১৮৭৩)। এগুলোর মধ্যে *সধবার একাদশী* তাঁর প্রতিভার পরিচয় বিশেষভাবে বহন করে। মনোমোহন বসু(১৮৩১-১৯১২) কয়েকটি সামাজিক ও অনেকগুলো পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। তিনি নাটককে গানে পরিপূর্ণ গীতাভিনয় বা অপেরায় পরিণত করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে রয়েছে *রামাভিষেক নাটক* (১৮৬৭), *প্রণয় পরীক্ষা* (১৮৬৯), *সতীনাটক* (১৮৭৩), *হরিশ্চন্দ্র নাটক* (১৮৭৫), *পার্থপরাজয় নাটক* (১৮৮১), *আনন্দময় নাটক* (১৮৯০)। প্রথম মুসলমান নাট্যকাররূপে দেখা দেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। তাঁর নাটক-প্রহসনের নাম *বসন্তকুমারী নাটক* (১৮৭৩), *এর উপায় কি* (১৮৭৫)। তাঁর নাটক শিল্পমূল্যহীন। এ সময়ে অনেক নাটকের মতো রচনা লেখা হয়েছিল, সেগুলো অভিনীতও হয়েছিল, তবে সেগুলো সাহিত্যমূল্যহীন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা এবং তিনি নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম নাট্যরচনা *কিঞ্চিৎ জলযোগ* (১৮৭২) একটি একাঙ্ক প্রহসন, দ্বিতীয় প্রহসন হচ্ছে *এমন কর্ম আর করবো না* (১৮৭৭), পরে এর নাম হয় *অলীকবাবু*। তাঁর ইতিহাসের উপাদাননির্ভর নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *পুরুবিক্রম নাটক* (১৮৭৪), *সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক* (১৮৭৫), *অশ্রুমতি নাটক* (১৮৭৯), *স্বপ্নময়ী নাটক* (১৮৮২)। তাঁর উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী নাটকের। ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয় চেতনা জাগানো ও প্রচারের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক উপাদান প্রথম ব্যবহার করেছিলেন মধুসূদন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ উপাদান স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজে প্রথম ব্যবহার করেন, পরে যা গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে প্রবল ভাবাবেগে পরিণত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন অনেক নাটক; ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন মলিয়েরের *হঠাৎ*

নবাব (১৮৮৪), *দায়ে পড়ে দারগ্রহ* (১৯০২); সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* (১৮৯৯), *উত্তর-চরিত* (১৯০০), *মালতীমাধব* (১৯০০), *রত্নাবলী* (১৯০০)। বিশ শতকে তিনি ইংরেজি নাটক ও আরো বেশ কয়েকটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দু জাতীয়তা প্রচারের উদ্দেশ্যে *ভারতমাতা* (১৮৭৩), *ভারতে যবন* (১৮৭৪) নামে সাম্প্রদায়িক নাটক লিখেছিলেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক নাটক লিখেছিলেন হরলাল রায়। তাঁর নাটকের নাম *হেমলতা* (১৮৭৩), *বঙ্গের সুখাবসান* (১৮৭৪)। এসময়ে রোমহর্ষক মারদাঙ্গা নাটকের সূচনা করেন উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫)। তাঁর নাটক হচ্ছে *শরৎ-সরোজিনী* (১৮৭৫), *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* (১৮৭৫)। গানে ভরপুর গীতিকানাটক লিখেছিলেন হরিমোহন রায়। তাঁর নাটকের নাম *সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন* (১৮৭৪), *পারিজাত-হরণ বা দেব-দুর্গতি* (১৮৭৪)। নাচগানে ভরপুর গীতিনাট্যের সূচনা করেছিলেন রামতারণ সান্ন্যাল। তাঁর এধরনের রচনার মধ্যে রয়েছে *প্রমোদকানন* (১৮৭৮), *রাসলীলা* (১৮৮০)। মনোমোহন বসুর ধারায় গীতাভিনয় লেখেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে *অনলে বিজলী* (১৮৭৮), *তারকসংহার* (১৮৮০)।

নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপকথা হয়ে আছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরবর্তী নাট্যকার ছিলেন না, তাঁর উদ্ভব-বিকাশ ঘটে রঙ্গমঞ্চের ভেতরে। তিনি ছিলেন অভিনেতা, সাধারণ নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যমঞ্চের পরিচালক এবং নাট্যকার। বাংলার সর্বাধিক সংখ্যক নাটকের তিনি রচয়িতা। তিনি পৌরাণিক, ভক্তিমূলক,সামাজিক, ঐতিহাসিক নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন; মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভেঙে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে একটি নাট্যছন্দোরীতিরও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন; তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি প্রবর্তক ছিলেন না। তিনি সব কিছুকেই সাধারণ দর্শকদের উপযোগী করে ব্যবহার করে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পুঁজি ছিল ভাবাবেগ ও প্রাকৃত রুচি। তাঁর পৌরাণিক নাটক *রাবণ-বধ* (১৮৮১), *সীতার বনবাস* (১৮৮২). *রামের বনবাস* (১৮৮২), *জনা* (১৮৯৪); ভক্তিমূলক নাটক *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬), *বুদ্ধদেব-চরিত* (১৮৮৭), *বিল্বমঙ্গল* (১৮৮৮); সামাজিক নাটক *প্রফুল্ল* (১৮৮৯), *হারানিধি* (১৮৯০); প্রহসন *বড়দিনের বকশিশ* (১৮৯৪), *সভ্যতার পাণ্ডা* (১৮৯৪); গীতিনাট্য *স্বপ্নের ফুল* (১৮৯৪), *ফণির মণি* (১৮৯৬)। তাঁর নাটক সামাজিক ও শৈল্পিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে নি। গিরিশ ঘোষের মতো অমৃতলাল বসুও (১৮৫৩-১৯২৯) ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার, প্রধানত প্রহসনরচয়িতা। রক্ষণশীলতা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রহসন *চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪), *চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* ১৮৮৬, *বৌমা* (১৮৯৭), *গ্রাম্যবিভ্রাট* (১৮৯৮); তাঁর নাটক *তরুবালা* (১৮৯১), *বিমাতা* (১৮৯৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসন নিয়ে আবির্ভূত হন উনিশ শতকের শেষ দশকে। এ সময়ে তাঁর লেখা প্রহসন *কল্কি-অবতার* (১৮৯৫),

বিরহ (১৮৯৭), *ব্যহস্পর্শ* (১৯০০)। তাঁর প্রধান নাটকগুলো বেরোয় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) কয়েকটি নাটক বেরিয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে, বিশ শতকে বেরিয়েছিল বহু। *আলীবাবা* (১৮৯৭) তাঁর অতি জনপ্রিয় গীতিনাট্য।

বিশ্বসাহিত্যে কবিরাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারমাত্রই কবি; বাংলা সাহিত্যেও তাই। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই (১৮৬১-১৯৪১) শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলা নাটককে রবীন্দ্রনাথ অশিল্প থেকে উত্তীর্ণ করেছিলেন শিল্পলোকে। স্থূল অপরিস্রুত বাস্তবতা, পরীর দেশের ইতিহাস, প্রাকৃত চিত্তবিনোদন থেকে তিনি উদ্ধার করেন বাংলা নাটককে এবং কবিত্ব, সাংকেতিকতা ও প্রতীকতায় বাংলা নাটককে 'অলীক কুনাট্য' থেকে মুক্তি দিয়ে পরিণত করেন শিল্পকলায়। রবীন্দ্রনাটকের মূলভাষা কবিতা; তিনি প্রধানত কাব্যনাট্যকার, যদিও গদ্যনাটকেও তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই বাংলা সাহিত্যে। প্রথাগত বাংলা নাটক হচ্ছে ঘটনার ঘনঘটা ও সংলাপের নামে দীর্ঘ বক্তৃতার সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক থেকে বিদায় দেন ঘটনাকে, রাখেন শুধু সেটুকু যার অভাবে কাহিনী মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। সংলাপে তিনি সঞ্চার করেন পরিমিতি ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যার অভাব রয়েছে সমগ্র বাংলা নাটকেই। তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে— রোমান্টিকতা, প্রতীক ও সাংকেতিকতা এবং তাঁর অধিকাংশ নাটকই কোন না কোন বাণীর প্রকাশ। রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোন শাখায় বাণী বা তত্ত্বের এতোটা প্রাচুর্য পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁর প্রতিটি নাটকেই আবিষ্কার করা সম্ভব অন্তত একটি বাণী বা তত্ত্ব। নাটকের প্রধান লক্ষ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া, তবে অভিনীত ও জনপ্রিয় হওয়াই নাটকের শেষ সাফল্য নয়; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। নাটকের সাহিত্যমূল্য যাচাইয়ের একটি ভাল মানদণ্ড হচ্ছে পাঠযোগ্যতা। পড়ে যে নাটককে মূল্যবান মনে হয় সে নাটকই সাহিত্যমূল্যসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ্যনাটক লেখেন, যা অভিনীত হলে ভাল, না হলেও কোন ক্ষতি নেই, পড়েই তা উপভোগ, সম্ভবত পরমভাবে উপভোগ করা যায়। নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য নিয়ে : ১৮৮১ অব্দে বেরোয় তাঁর গীতিনাট্য *বাল্মীকিপ্রতিভা* ও কাব্যনাট্য *রুদ্রচণ্ড* এবং এরপর একের পর এক বেরোয় আরো গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য—*কালমৃগয়া* (১৮৮২), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *মায়ার খেলা* (১৮৮৮)। এ রচনাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা উদ্‌ঘাটন ও রচনা করে চলছিলেন নিজেকেই, যেমন *বাল্মীকিপ্রতিভা*'য় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ছদ্মবেশে স্থির করছেন নিজেরই চরিত্র। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর পরিপূর্ণতর কাব্যনাটক *রাজা ও রাণী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *মালিনী* (১৮৯৬)। এর মধ্যে *বিসর্জন* নাট্যিকভাবে ও *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যিকভাবে অত্যন্ত সফল। এ সময়ে তিনি রচনা করেন কিছু নাট্যকাব্য অর্থাৎ নাটকের আধারে কালোত্তর কবিতা *বিদায় অভিশাপ* (১৮৮৪), *গান্ধারীর আবেদন*

(১৮৯৭), *সতী* (১৮৯৭), *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ* (১৮৯৯) প্রভৃতি। প্রচুর প্রহসনও তিনি লিখেছেন। তাঁর উনিশ শতকে লেখা প্রহসনের মধ্যে রয়েছে *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭)। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি রূপান্তর ঘটে বিশ শতকে।

উপন্যাস বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সভ্যতার নিজস্ব সাহিত্যআঙ্গিক। বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ থেকে আঠারো শতকে পশ্চিমে আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। পুঁজির সাথেও উপন্যাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং নীতি ও নারীদের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নিবিড়। ইংরেজি সাহিত্যে কাহিনীর মোড়কে নারীদের নীতিকথা শেখানোর ও পুঁজিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপন্যাস লিখেছিলেন প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকেরা। বাংলা সাহিত্যেও ঘটে তাই—নারী, নীতি ও পুঁজি তিনটিই বিবেচনার মধ্যে ছিল বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদের। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উন্মেষ-বিকাশ ঘটে ইংরেজি উপন্যাসের প্রত্যক্ষ অনুসরণে। উনিশ শতকের বিশের দশকে দু-একটি নকশাধর্মী রচনায় বাস্তব সমাজচিত্র আঁকার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সেগুলোকে উপন্যাস বলা যায় না, উপন্যাসের সামান্য আভাসও সেগুলোতে দেখা যায় না। এ ধরনের রচনার উদাহরণ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবুবিলাস* (১৮২৫)। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে বেরোয় হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেনস-এর *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ;* কিন্তু প্রচারধর্মী এ পুস্তকটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), যিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে বিখ্যাত। তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বাংলা ভাষায় সচেতনভাবে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস। প্যারীচাঁদ যদিও তাঁর উদ্যোগে পুরোপুরি সফল হন নি, তবু পুরোপুরি ব্যর্থও নন তিনি; বাংলা কথা-সাহিত্যের চরিত্র তিনি বদলে দিয়েছিলেন। *আলালের ঘরের দুলাল*কে বলা যায় উপন্যাসের খসড়া; উপন্যাসের সমস্ত উপাদান এতে রয়েছে, কিন্তু তা শিল্পরূপায়িত হয় নি। *আলালের ঘরের দুলাল*-এর ভাষাও ছিল একধরনের বিদ্রোহ। প্যারীচাঁদই প্রথম চলতি বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তবে সফল হন নি। তাঁর ভাষা সাধু-চলতির মিশ্ররূপ। উনিশ শতকে চলতি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপ রচনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশায়* (১৮৬২, ১৮৬৪)। বইটি অবশ্য উপন্যাস নয়। প্যারীচাঁদ আরো কয়েকটি উপন্যাস ধরনের বই লিখেছিলেন। তাঁর *অভেদী* (১৮৭১) ও *আধ্যাত্মিকা* (১৮৮০)-এর কোনটিই সফল হয় নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) *ঐতিহাসিক উপন্যাস*-এ (১৮৬২-৬৩) দু'টি কাহিনী আছে : *সফল স্বপ্ন* ও *অঙ্গুরীয় বিনিময়,* তবে এতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'উপাখ্যান'। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) লিখেছিলেন *বিচিত্রবীর্য* (১৮৩২), গোপীমোহন ঘোষ লিখেছিলেন *বিজয়বল্লভ* (১৮৬৩)। তবে এগুলো উপন্যাস হয়ে উঠে নি।

বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠদের একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শৈল্পিকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এ আঙ্গিকটি। তিনিই এর বিকাশ সম্পন্ন করেন। তবে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন উপন্যাসের মূল প্রেরণা থেকে। সমকালীন

বাস্তবতা ও জীবন উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্য থেকে পশ্চিমে সৃষ্ট হয়েছিল উপন্যাস; কিন্তু বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসকে দূরে সরিয়ে নেন সমকাল, বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এবং সৃষ্টি করেন এক রোমান্সসাম্রাজ্য। শুধু নীতিটুকু তিনি রেখেছিলেন। শুরুতে তিনি ওয়াল্টার স্কটকে অনুসরণ করেছেন, যদিও স্কট থেকে অনেক অন্তর্দর্শী ও মহৎ তিনি। কিন্তু স্কটের প্ররোচনায়ই তিনি বাংলা উপন্যাসকে সরিয়ে নিয়েছিলেন বাস্তব ও সমকাল থেকে অবাস্তবে ও সুদূর কালে। তাঁর পাত্রপাত্রীরা সাধারণ মানুষ নয়, অসাধারণ তারা, তাদের জীবন পরিপূর্ণ অসাধারণ রোমাঞ্চকর ঘটনায়। চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, এর মাঝে দু'টিমাত্র—*বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* সমকালীন ও সামাজিক উপন্যাস; তবে এ দু'টির পাত্রপাত্রীরাও সাধারণ নয়, তাদের সমস্যাও অসাধারণ। বঙ্কিমের উপন্যাসে তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে অনুরাগ-ঘৃণা-কামনা-বাসনার মতো মানবিক প্রবৃত্তিরাশি এবং তার প্রকাশ ঘটেছে অসামান্য ভাষায়। প্রথম তিনি *রাজমোহনস ওয়াইফ* (১৮৬৪) নামে ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে সেটি সফল হয় নি। বাংলায় লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* সফল হয়েছিল চরমভাবে; এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম খাঁটি উপন্যাস। তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন বাইশ বছরের। এ সময়ে তিনি রচনা করেন চৌদ্দটি উপন্যাস : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮৪), *দেবীচৌধুরাণী* (১৮৮৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬) ও *সীতারাম* (১৮৮৭)। বঙ্কিম শুধু ঔপন্যাসিক থাকতে চান নি, তিনি তাঁর জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করতে চেয়েছেন। তাঁর এ ভূমিকা তাঁকে এক গোত্রের কাছে করে তুলেছে মহাপুরুষ, আরেক গোত্রের কাছে শত্রু।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪০-১৯২১) দু'খণ্ডে একটি বড়ো উপন্যাস লিখেছিলেন *বঙ্গাধিপ পরাজয়* (১৮৬৯, ১৮৮৪) নামে। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনকে উপন্যাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন : *কণ্ঠমালা* (১৮৭৭), *জাল প্রতাপচাঁদ* (১৮৮৩), *মাধবীলতা* (১৮৮৪) এবং লিখেছিলেন একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনী *পালামৌ* (১৮৮০-১৮৮২)। চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) লিখেছিলেন অনেকগুলো জীবনী-উপন্যাস, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মহারাজ নন্দকুমার* (১৮৮৫), *ঝান্সীর রাণী* (১৮৮৮)। শিক্ষামূলক তিনটি ভাল উপন্যাস লিখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) : *মেজবৌ* (১৮৭৯), *নয়নতারা* (১৮৮৯), *যুগান্তর* (১৮৯৫)। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) প্রথম মুসলমান বাঙালি ঔপন্যাসিক। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯০) রূপকথাধর্মী। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ছ'টি উপন্যাস লিখেছিলেন। এর মাঝে চারটি রোমান্স-ঐতিহাসিক উপন্যাস : *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪), *মাধবীকঙ্কন* (১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত*

(১৮৭৮), *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৮৯); আর দু'টি সামাজিক উপন্যাস : *সংসার* (১৮৮৬), *সমাজ* (১৮৯৪)। দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) বাজারের কথা ভেবে উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম *মৃন্ময়ী* (১৮৭৪)—এটি বঙ্কিমের *কপালকুণ্ডলার* নতুন উপসংহার। তিনি ইংরেজি উপন্যাসের ভাবানুবাদ করেছেন, যেমন *কমলকুমারী, শুভ্রবসনা সুন্দরী;* তাছাড়া মৌলিক মূল্যহীন উপন্যাসও লিখেছেন : *বিমলা* (১৮৭৭), *দুই ভগিনী* (১৮৮১)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁর উপন্যাস *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৯), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (১৮৮৪), *স্নেহলতা* (১৮৯২), *কাহাকে* (১৮৯৮)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) *লীলা* (১৮৯২) জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) লিখেছিলেন *শক্তিকানন* (১৮৮৭), *ফুলজান* (১৮৯৪)। এ সময় ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের একটি ধারাও সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তা কখনো উচ্চমানের শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে নি। এধারার সূচনাকারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১১)। তাঁর উপন্যাসের নাম *কল্পতরু* (১৮৭৪)। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) লিখেছিলেন কয়েকটি ব্যঙ্গ-উপন্যাস : *মডেল-ভগিনী* (১৮৮৬-১৮৮৮), *চিনিবাস-চরিতামৃত* (১৮৯০), *কালাচাঁদ* (১৮৯৯)। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৯) লিখেছিলেন *কঙ্কাবতী* (১৮৯২)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একটি অসম্পূর্ণ ও দু'টি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছিলেন উনিশ শতকে; তবে এদের একটিও রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় বহন করে না। *করুণা* নামক একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস বেরিয়েছিল *ভারতীতে* (১৮৭৭-১৮৭৮); এবং এর পাঁচ বছর পর বেরোয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস *বউঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩), যখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। এটি ঐতিহাসিক রোমান্স এবং ব্যর্থ। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *রাজর্ষি*ও (১৮৮৭) ঐতিহাসিক রোমান্স, তবে রচনা হিসেবে প্রথমটি থেকে উৎকৃষ্ট। *রাজর্ষির* প্রথমাংশকে পরে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন কাব্যনাটক *বিসর্জন*-এ (১৮৯০)। উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেন নি। প্রচুর উপন্যাস লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এগুলোর অধিকাংশই ছিল পাঠকদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে অভিনব রূপকথারূপে দেখা দিয়েছিল উপন্যাস।

বাংলায় কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় শাখা ছোটগল্পের উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে। এর আগে বাংলায় গল্প ছিল, উপকথাও ছিল; কিন্তু ছোটগল্প ছিল না। এ আঙ্গিকটিও উনিশ শতকেই ঋণ করা হয় ইউরোপ থেকে। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২)। তাঁর গল্পের নাম *মধুমতী* (১৮৭৩)। এর পরেই *দামিনী* (১৮৭৪) ও *রামেশ্বরের অদৃষ্ট* (১৮৭৪) নামে দু'টি ছোটগল্প লেখেন বঙ্কিমেরই মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)। চব্বিশ পরগনার চট্টোপাধ্যায় পরিবারটি ছিল কথাশিল্পী পরিবার। তবে বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও পরিণতিলাভ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। ১৮৭৪ সালে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম

গল্প *ভিখারিনী,* যদিও সেটি ত্রুটিহীন ছোটগল্প হয়ে উঠে নি। স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের আগেই ছোটগল্প লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্পের সঙ্কলনের নাম *নবকাহিনী* (১৮৯২)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) ছোটগল্পের বই *সংগ্রহ* বেরোয় ১৮৯২ সালে। যদিও ১৮৭৪ সালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম গল্প লিখেছিলেন, তবে তাঁর প্রকৃত ছোটগল্প লেখা শুরু হয় ১৮৯০ থেকে। এ বছরেই বেরোয় তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প : *পোস্টমাস্টার, দেনাপাওনা, ব্যবধান* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্প লেখা হয়েছিল ১৮৯০-১৯০৩ অব্দের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর কয়েকটি গল্পসংগ্রহ বেরোয় : *ছোটগল্প* (১৮৯৪), *বিচিত্রগল্প* (১৮৯৪), *কথা-চতুষ্টয়* (১৮৯৪), *গল্প দশক* (১৮৯৫)। এসব সংগ্রহের গল্প নিয়ে ১৯০০ অব্দে বেরোয় *গল্পগুচ্ছ*–এর প্রথম খণ্ড। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, কামনা-বাসনা লোকোত্তর শিল্পরূপ লাভ করে। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। তাতে বিকাশ ঘটে সাহিত্যের সমস্ত শাখার আর রূপায়িত হয় জীবনের সম্পূর্ণ রূপ—বাস্তব ও স্বপ্ন। সেটি ছিল উদ্ভাবনার শতাব্দী। এর প্রায় প্রতিটি দশকেই উদ্ভাবিত হয়েছে কোন না কোন আঙ্গিক বা রীতি, যা হয় নি বিশ শতকেও। বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের চেতনা ও সংবেদনশীলতা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের অবয়ব রয়েছে উনিশ শতকের মতোই। তাই উনিশ শতক শুধু কালের দিক দিয়েই বিশ শতকের সন্নিকটবর্তী তা নয়, রক্তের সম্পর্কেও পরমাত্মীয়।

রচনাপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৪৬)

অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা,* দ্বিতীয় মুদ্রণ,(কলকাতা ১৯৮৮)

নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা,* পঞ্চম সংস্করণ, (কলকাতা ১৩৪৮)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনকথা,* পরিবর্ধিত সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৬১)

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* চতুর্থ সংস্করণ, (কলকাতা ১৩৭৩)

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ (কলকাতা ১৩৮৬)

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* (কলকাতা ১৯৭৬)

১০

বিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য

সৈয়দ আবুল মকসুদ*

১.

এই পরিচ্ছেদে বিশ শতকের বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সৃষ্টিশীল গদ্য, যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা প্রভৃতি; তেমনি মননশীল গদ্য, যেমন প্রবন্ধ, জীবনী ও আত্মজীবনী, সমালোচনা, গবেষণামূলক সাহিত্যকর্ম প্রভৃতি। বাংলা নাটক রয়েছে এ আলোচনার বহির্ভূত। বিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিমাণ বিপুল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এখানে মোটামুটি প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি প্রধান ধারাগুলির একটি রূপরেখা দেয়া হলো।

সরকার ও শাসকশ্রেণী থেকে কখনোই বাংলা ভাষা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধন্য হয় নি। শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে সাধারণ মানুষই এই ভাষাকে যেমন তাদের মুখের ভাষারূপে বাঁচিয়ে রেখেছে, তেমনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ মানুষই কবিতা ও গান রচনা করে তাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেছে। বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই এ ভাষা বিকশিত হয়েছে। রামমোহন রায়ই (১৭৭৪-১৮৩৩) বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক গদ্যলেখক। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত তাঁর পুস্তিকাগুলি প্রথম পর্যায়ের বাংলা গদ্যের সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন। তাঁর পর পরই আবির্ভাব ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৮-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ

---

* বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বা. স. স.)।

(১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ শক্তিশালী লেখকের। মাত্র ২৩ বছর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৮৪৩) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকা মননশীল গদ্যের বিকাশে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছে। নতুন শিক্ষিত উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* অসামান্য সমাদৃত হয়। অক্ষয়কুমারের পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, "প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন"[১] তা সত্ত্বেও। মূলত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* উদ্দেশ্য হলেও এই সাময়িকীতে "বিজ্ঞান, সমাজ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের রচনাও স্থান পেত।"

বাংলা গদ্যের অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯০) সম্পাদিত মাসিক *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২)। উনিশ শতক ছিলো *তত্ত্ববোধিনী* ও *বঙ্গদর্শন*-এর যুগ। যদিও এই সময় আরো বেশ কিছু উন্নতমানের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব ঘটে বহু শক্তিশালী গদ্যলেখকের। *বঙ্গদর্শন*-এর মান—বাংলা সাধু ভাষার শৈলী ছিলো উন্নততর। সাহিত্য, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ এবং উপন্যাস *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত হতো। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যরীতি ছিলো সাধু, কিন্তু কুড়ি শতকে প্রধান লেখকদের প্রকাশমাধ্যম হলো চলিত বাংলা ভাষা। সাধু বাংলা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হলেও চলিত ভাষাই বাহন হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ লেখকদের ভাব প্রকাশের। এমনকি দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এই চলিত ভাষায় লিখিত হয়। মননশীল গদ্য দিয়েই বাংলা গদ্যসাহিত্যের যাত্রাশুরু, তারপর বাংলা গদ্য বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে সৃষ্টিশীল রচনাসম্ভারে। কুড়ি শতকের বাংলা গদ্যের যাঁরা প্রধান নির্মাতা তাঁদের অনেকেরই জন্ম উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং তাঁদের অনেকেই গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন গত শতকেই, কিন্তু কুড়ি শতকেও প্রকাশিত হয় তাঁদের অনেক প্রধান গ্রন্থ। এই নিবন্ধে লেখকদের বয়সের নয়, তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের কালকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার শুধু শ্রেষ্ঠ কবিই নন তিনি শ্রেষ্ঠ গল্পশিল্পীও। তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র* একটি ভ্রমণকাহিনী, প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু পরবর্তী ষাট বছর তিনি অবিরাম লিখেছেন অজস্র গদ্যরচনা ঃ প্রবন্ধনিবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, জার্নাল প্রভৃতি। অমূল্য চিঠিপত্রের লেখক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। আত্মীয়স্বজন, সমকালীন লেখক-বুদ্ধিজীবী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত-অপরিচিতদের কাছে লেখা তাঁর অগণিত

---

১. নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (কলকাতা ১৯৭১) পৃ. ১৫।

চিঠিপত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর মনোজগৎ : তাঁর পর্যবেক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণ। তাঁর চিঠিপত্রে পাওয়া যায় শুধু একজন অন্তরঙ্গ মানুষকে নয়, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর অকপট মতামত। তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন *ছিন্নপত্রাবলী* (১৯১২) এবং *পথে ও পথের প্রান্তে* (১৯৩৮) ছাড়াও তাঁর মৃত্যুর পর এগার খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর পত্রাবলি। তাঁর পত্রসাহিত্যের পরিমাণ বিপুল।

রবীন্দ্রনাথ কোনোরকম চরমপন্থা ও সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন না। শান্তির প্রবক্তা হিসেবে হিংসার পথ তাঁকে আকর্ষণ করে নি, তাই বঙ্গভঙ্গের সেই অস্থির সময়ে তিনি উগ্রপন্থীদের কর্মকাণ্ডে সময় দেন নি। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের শুরু তা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তিনি নিজে একজন কঠোর ভূস্বামী ছিলেন, তবে সাধারণ জমিদার ও মহাজন কর্তৃক প্রজাপীড়ন তিনি নীতিগতভাবে সমর্থন করেন নি। গ্রামের অবহেলিত শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীর প্রতি তাঁর এক ধরনের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা তাঁর চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করেছিল, যা তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। শহরের ধনী ও গ্রামীণ দরিদ্রদের ভেতরকার বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনায়। তিনি ছিলেন সংস্কারবাদী, সুতরাং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। সকল ব্যাপারে বিদেশী সরকারের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। দেশবাসীকে দেখতে চেয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> "আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতে হইবে। ··· চাষীকে আমরা রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, ··· এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।"

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁর অনেক সমসাময়িকের চেয়ে প্রশস্ত। স্থায়ী বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকতার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। যখন এই পৃথিবী জাতীয় ও জাতিগত-বর্ণগত সংঘর্ষে উত্তপ্ত ছিল তখন তিনি ইউরোপে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন : "···this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality."[২] (এই জাতীয়তাবাদ একটি নিষ্ঠুর মহামারীর মতো, যা বর্তমান যুগের মানবসমাজের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে তার নৈতিক শক্তি ক্ষয় করছে।)

যেকোনো উপায়ে ইংরেজ শাসকদের বিদায় করে দিলেই দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা আসবে তা বিশ্বাস করতেন না রবীন্দ্রনাথ। আত্মশক্তির বিকাশ না ঘটলে জাতির মুক্তি নেই। তাঁর ভাষায় :

---

২. Nationalism in the West, Nationalism, (1930) 16.

"আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয় এমন কেহ আসিবে যার মুখের ব্যাস ও পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোট না হইতে পারে,···" ।[৩]

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

"ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অগ্রসর ও উদার। 'হিন্দু-মুসলমান'-এ তিনি লিখেছেন :

১. যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?

২. নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে; সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

জীবনের শেষ চার দশক রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সৃষ্টিশীল ও কর্মময়। এই সময় তিনি অবিরাম লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে। যেমন তাঁর গ্রন্থ রয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে (*শিক্ষা* ১৯০৮, ১৩ খণ্ড *শান্তিনিকেতন* ১৯০৯-১২); ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে (*প্রাচীন শিক্ষা* ১৯০৭, *সাহিত্য* ১৯০৭, *আধুনিক সাহিত্য* ১৯০৭, *সাহিত্যের পথে* ১৯৩৬, *বাংলা ভাষা পরিচয়* ১৯৩৭ এবং *সাহিত্যের স্বরূপ* ১৯৪৩); এবং ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে (*আত্মশক্তি* ১৯০৫, *ভারতবর্ষ* ১৯০৬, *বিচিত্র প্রবন্ধ* ১৯০৭, *রাজা ও প্রজা* ১৯০৮, *সমূহ* ১৯০৮, *সমাজ* ১৯০৮, *স্বদেশ* ১৯০৮, *ধর্ম* ১৯০৯, *মানুষের ধর্ম* ১৯৩৩, *কালান্তর* ১৯৩৭ এবং *সভ্যতার সঙ্কট* ১৯৪১)।

একজন মহান ধর্মসংস্কারক বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) একজন বহুপ্রসূ গদ্যলেখক। তাঁর বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বাংলা গ্রন্থসমূহে, যেমন *পরিব্রাজক* (১৯০৩),

---

৩. পথ ও পথেয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।

ভাববার কথা (১৯০৫), *বর্তমান ভারত* (১৯০৫) এবং *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৯০৫)। তাঁর রচনাশৈলী সহজ-সরল, সাধারণের উপযোগী। তাঁর জীবনদর্শন ও চিন্তা সম্পর্কেও বিশ শতকে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বাংলা ভাষায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে রচনার পরিমাণ বেড়েছে।

মননশীল প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৪-১৯৪৬) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা *সবুজপত্র*-এর জন্যও বিখ্যাত। স্বদেশ, সমাজ, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ সকল বিষয়ে রয়েছে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *তেল-নুন-লকড়ি* সম্ভবত ১৯০৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *বীরবলের হালখাতা* (১৯১৭), *নানা-কথা* (১৯১৯) *আমাদের শিক্ষা* (১৯২০), *দু'ইয়ারকি* (১৯২১), *বীরবলের টিপ্পনী* (১৯২১), *রায়তের কথা* (১৯২৬), *নানা-চর্চা* (১৯৩২), *ঘরে-বাইরে* (১৯৩৬) এবং *প্রাচীন হিন্দুস্থান* (১৯৪০) বাংলা মননশীল সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু বিষয়কেও তিনি সহজ কিন্তু সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। *সবুজপত্র*-গোষ্ঠীর আর দু'জন শক্তিশালী প্রাবন্ধিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮৯-১৯৮৪) শিক্ষা, সমাজ, জীবন ও ধর্ম বিষয়ে লিখেছেন। অতুলচন্দ্রের *শিক্ষা ও সভ্যতা* (১৯২৮), *কাব্যজিজ্ঞাসা* (১৯২৯) প্রভৃতি চিন্তাশীল রচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৬-১৯৬০) সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও সমাজ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধসংকলন ও জার্নাল জাতীয় গ্রন্থ রয়েছে, যেমন *আমরা ও তোমরা, চিন্তয়সী, কথা ও সুর* এবং *বক্তব্য*।

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর *ভারত শিল্প* (১৯০৯) এবং *বাগেশ্বরী শিল্পকলা* (১৯৪১) বাংলাভাষায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর রচনাশৈলীও সহজ ও সাবলীল। আরেকজন শিল্পী অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪) চারুকলা বিষয়ে লিখেছেন তাঁর *অজন্তা* (১৯১৩), *বাগ্‌গুহা ও রামগড়, ভারতের কারুশিল্প* (১৯৩৯), *ইউরোপের শিল্পকলা* (১৯৪০) প্রভৃতি অসামান্য গ্রন্থে।

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) বাংলাভাষার একজন প্রধান গদ্যলেখক। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, যদিও মুসলমান সভ্যতা সম্পর্কে রয়েছে তাঁর প্রচুর লেখা। তিনি একাধারে কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার। তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতি। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ভবিষ্যতের বাঙালি* (১৯৪৩), *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ*, *জীবনের শিল্প* (১৯৪১), *আকবরের রাষ্ট্রসাধনা* (১৯৪৯), *ইসলামের পয়গাম, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান* (১৩৫৫), *ভারতবর্ষ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৩৫০) প্রভৃতি।

৩.

বিশ শতকের প্রথম সাত দশকে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের অসামান্য অগ্রগতি হয়। এই সময় বিখ্যাত ও অল্পখ্যাত অসংখ্য কথাশিল্পীর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে সেগুলোর আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই আলোচনা সীমিত থাকছে।

নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পের স্রষ্টাও বটে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস : *চোখের বালি* (১৯০১), *নৌকাডুবি* (১৯০৩) এবং *গোরা* (১৯০৯)। *চোখের বালি* ও *নৌকাডুবি* তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। *গোরা*-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, শুধু তাই নয় বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উনিশ শতকের শেষদিকের বঙ্গীয় সমাজের উজ্জ্বল চিত্র এই উপন্যাস। "যুগসমস্যার প্রশ্ন বাদ দিলেও *'গোরা'*র মধ্যে কতগুলি শাশ্বত প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"[৪] সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, হিন্দু মধ্যবিত্তের দেশাত্মবোধ প্রভৃতি এই উপন্যাসের উপজীব্য। *ঘরে বাইরে* (১৯১৬) এবং *চতুরঙ্গ* (১৯১৬)-তে তিনি সমকালীন রাজনীতির উপর আলো ফেলেছেন। পরিবার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই দুটি উপন্যাসে মনোজগতের বিশ্লেষণও উপস্থিত। উপন্যাস দুটিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষুব্ধ হন। সম্ভবত তার জবাবেই তিনি বলেন, "দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্য নয়।"[৫] *যোগাযোগ* (১৯২৯), *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *দুই বোন* (১৯৩৩), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪), *মালঞ্চ* (১৯৩৪)-তে উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু-পরিবারের অন্তঃসারশূন্যতা, পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি অসামান্য ভাষায় চিত্রিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দশকে পারিবারিক জমিদারি তদারকির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্ব বঙ্গের শিলাইদহে অবস্থান করেন। তখন তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। *গল্পগুচ্ছ* (১৯০০)-এর গল্পগুলি ১৯০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২-তে ৯৩টি গল্পের সংকলন 'গল্পগুচ্ছ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ "ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তা-ই। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং এমন সময়ে লেখেন, যখন ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটগল্প নামক বস্তুটির চল হয় নি।"[৬] 'ঘাটের কথা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'পুত্রযজ্ঞ', 'মণিহারা', 'স্ত্রীর পত্র', 'রামমণির

---

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবন-কথা,* ১৩৭৩, কলকাতা, পৃ. ৭৮।

৫. বিশ্বভারতীয় পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০, পৃ ৩১৬।

৬. বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৭।

ছেলে', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'বলাই', 'নষ্টনীড়', 'মাস্টার মশাই', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মানবজীবনের গভীরতম সুখদুঃখ অতি অল্পকথায় চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রগল্পগুচ্ছে। যখন তাঁর বহু কবিতার আবেদন থাকবে না তখনও তাঁর ছোটগল্প সংবেদনশীল পাঠককে মুগ্ধ করবে।

প্রমথ চৌধুরীও শক্তিশালী ছোটগল্পশিল্পী। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *আহুতি* (১৯১৯), *নীল লোহিত* (১৯৩৩), *নীল-লোহিতের আদিপ্রেম* (১৯৩৫), *ঘোষালের ত্রিকাল* (১৯৩৭) এবং *অনুকথা সপ্তক* (১৯৩৯)। তাঁর *গল্প-সমগ্র* রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এ। বিষয় ও রচনাশৈলী দু'দিক থেকেই তিনি নিজস্ব-চিহ্নিত। "জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ" করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, সুতরাং তাঁর গল্প বাস্তবধর্মী। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) লিখেছেন কয়েকটি অসামান্য হাস্যরাত্মক ছোটগল্প। রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ব্যঙ্গকৌতুকাশ্রিত গল্পের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে *গড্ডালিকা* (১৩৩১), *কজ্জলী* (১৩৩৫) *চমৎকারী* (১৩৪৬), *গল্প কল্প* (১৩৫৭), *নীলতারা* (১৩৬৩) প্রভৃতি অসামান্য সাহিত্যকর্ম।

বাংলা উপন্যাসের মোহন যাদুকর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর প্রথম উপন্যাস *বড় দিদি* (১৯১৩) প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হৃদয় জয় করেন। অনেক সমালোচকের মতে, এখনো তিনি বাংলা ভাষার অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস আকারে ছোট, কিন্তু শিল্প হিসেবে অসামান্য। পর পর প্রকাশিত হয় *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিত মশাই* (১৯১৪), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *চন্দ্রনাথ* (১৯১৬), *বৈকুণ্ঠের উইল* (১৯১৬), *অরক্ষণীয়া* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড* (১৯১৮), *শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড* (১৯২৭), *শ্রীকান্ত ৪র্থ খণ্ড* (১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *কাশীনাথ* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *স্বামী* (১৯১৮), *দত্তা* (১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৯২০), *বামুনের মেয়ে* (১৯২৭), *দেনাপাওনা* (১৯৩০), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১), *বিপ্রদাস* (১৯৩৫), *শুভদা* (১৯৩৮), *শেষের পরিচয়* (১৯৩৯) প্রভৃতি। গ্রামীণ সমাজের কলহবিবাদ, স্বার্থপরতা এবং নারীর প্রতি অবিচার তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সামন্তবাদী সমাজে নারীর অমর্যাদা শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করেছে। শোষিত বঞ্চিত অথচ স্নেহময়ী বাঙালি নারীর চিত্র এঁকেছেন তিনি অসামান্য দক্ষতায় ও প্রাঞ্জল ভাষায়। সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বের মূল্য ছিল তাঁর কাছে অধিক। তথাকথিত সতীত্বের ধারণায় তাঁর আস্থা ছিল না। "সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে" তাঁর এ বিশ্বাস তিনি তাঁর "নারীর মূল্য" প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংস্কারমুক্ত ও উদার। শুধু নারী নয়, সমাজের নানাশ্রেণীর অবহেলিত মানুষ উঠে এসেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। *শ্রীকান্ত* সহ তাঁর অনেক উপন্যাসেই আত্মজৈবনিক

উপাদান উপস্থিত। *লালু, নরেশ, হরিলক্ষ্মী* প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস *পথের দাবী* বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সমসাময়িক ও উত্তরকালের ঔপন্যাসিকদের উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব সামান্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে যেসকল মহিলা কথাশিল্পী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) এবং নিরূপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৭৪)। অনুরূপা দেবীর *বাক্‌দত্তা* (১৯০৮), *মা* (১৯১৪), *মহানিশা* (১৯১৩), *উল্কা* (১৯১৬), *রামগড়* (১৯১৮) সহ প্রায় পঁচিশটি উপন্যাস রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) একজন অসামান্য ছোটগল্পকার, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে *নবীন সন্ন্যাসী* (১৯১২) এবং *রত্নদ্বীপ* (১৯১৫) সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর ছোটগল্পের সংকলন *ষোড়শী* (১৮৯৫) এবং *দেশী বিদেশী* খুবই জনপ্রিয় ছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩৮) *পঙ্কতিলক* (১৯১৯) এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের *কাজরী* (১৯১৮), *আঁধি* (১৯২০) প্রভৃতি; জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৮) *দুঃখিনী* (১৯০৯), *চোখের জল* (১৯২১), *করিম সেক* (১৯২২), *তিনপুরুষ* (১৯২৭) প্রভৃতি; নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) *অগ্নিসংস্কার* (১৯২০), *পাপের ছাপ* (১৯২২) প্রভৃতি, জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *লঘুগুরু* (১৯২৮), *অসাধু সিদ্ধান্ত* (১৯২৯), *মহিষী* (১৯২৯), *রোমন্থন* (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসে বাঙালি হিন্দুসমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের ঝোঁক ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণের দিকে।

মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) *জোহরা* (১৯১৭), মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৭৮-১৯২৫) *আনোয়ারা* (১৯১৪), *গরীবের মেয়ে* (১৯২৩) প্রভৃতি, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) বঙ্কিম-অনুকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস *তারাবাই* (১৯০৮), *নূরউদ্দীন, ফিরোজা বেগম* এবং *রায় নন্দিনী* (১৯২৮) এবং কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ* (১৯৩৩) প্রভৃতিতে মুসলমান সমাজের চিত্র পাওয়া যায়,তবে তাঁদের চরিত্রচিত্রণ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নয়। মূলত কবি হলেও শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) অনেকগুলো গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এস,ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) কিছুটা প্রমথ চৌধুরী দ্বারা প্রভাবিত, তবে তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ। তাঁর *দরবেশের দোয়া, মাশুকের দরবার, বাদশাহী গল্প, ইরান-তুরাণের গল্প* (১৩৫১) প্রভৃতি প্রশংসিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষার প্রধান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। ছোটগল্পকার হিসেবেই সাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব। আদর্শ গদ্যলেখক তিনি নন, তবে তাঁর গদ্যও নিজস্বচিহ্নিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২) তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থও বটে। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন* (১৯২৪)-এ সংকলিত হয়েছে আটটি গল্প, এবং তৃতীয়

এবং শেষ গল্পগ্রন্থ *শিউলি মালায়* (১৯৩১) রয়েছে চারটি গল্প। তাঁর বিদ্রোহীসত্তা মাঝেমাঝে ঝল্‌সে উঠলেও গল্পকার হিসেবে তিনি রোম্যান্টিক শিল্পী। নজরুল ইসলামের উপন্যাস মাত্র তিনটি : *বাঁধন-হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) এবং *কুহেলিকা* (১৯৩১)। *বাঁধন-হারা* বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। কবির বিদ্রোহীসত্তার প্রকাশ ঘটেছিল এই উপন্যাসে। *মৃত্যুক্ষুধা* এবং *কুহেলিকা*-য় আংশিকভাবে হলেও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। *মৃত্যুক্ষুধা*-য় তিনি দেখিয়েছেন ক্ষুধার্ত মানুষের পরিণতি—ক্ষুধার কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস পরাজিত। *কুহেলিকার* বিষয়বস্তু উগ্রপন্থী রাজনীতি, যার প্রচলিত নাম সন্ত্রাসবাদ। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *চার অধ্যায়*-এ উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রতি যেমনটি নেতিবাচকভাবে কটাক্ষ করেছেন, নজরুল তা করেন নি। রাজনীতিতে ওই পথটির সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে *কুহিলিকা*-য়।

৪.

বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত সম্প্রসারিত করতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় কীর্তি। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) কর্তৃক চলচ্চিত্রায়নের পর এবং ইংরেজিসহ কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হবার পর বহির্বিশ্বে এটি বাংলা উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *পথের পাঁচালী*-র নায়ক অপু প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা এক অসামান্য বালক এবং "বয়স বাড়লেও অপু বালকই থেকে যায়"। এটি একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস, বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাস্তবচিত্র।

বিভূতিভূষণের ৫০টি গ্রন্থের মধ্যে ১৭টি উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে *অপরাজিতা* (১৯৩২), *আদর্শ হিন্দু হোটেল* (১৯৪১), *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৮), *আরণ্যক* (১৯৩৮), *দেবযান* (১৯৪৪) এবং *ইছামতি* (১৯৫০) বাংলা উপন্যাসের অমূল্য সম্পদ। কিছু অসামান্য ছোটগল্পও তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মেঘমল্লার* (১৯৩৮), *মৌরীফুল* (১৯৩২), *যাত্রাবদল* ১৯৩৮), *কিন্নরদল* (১৯৩৮) *জন্ম ও মৃত্যু* (১৯৩৭) এবং *মুখোস ও মুখশ্রী* (১৯৪৭)। বিভূতিভূষণের রচনার শৈলী এবং বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামবাংলার নিসর্গ বর্ণনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি একজন সমাজসজ্ঞান রোম্যান্টিক কথাশিল্পী।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৯৭) হলেন আর একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *নীলাঙ্গুরীয়* (১৯৫২), *কাঞ্চন মূল্য* (১৯৫৭) এবং *নবসন্ন্যাস* (১৯৪৯)। তাঁর *রাণুর প্রথম ভাগ* (১৯৩৮) এবং *রাণুর দ্বিতীয় ভাগ* (১৯৪০) অসামান্য জনপ্রিয় গল্পসংকলন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের বীরভূমের অধিবাসী। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বীরভূমের জীবন ও নিসর্গ। তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণী* (১৯২৮) একটি সফল 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিস্বেবে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। তবে এতে শুধু অঞ্চলের চিত্র নয়, চিরকালের মানবজীবনের কথাও বলা হয়েছে। ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *কবি* (১৯৪২), *গণদেবতা* (১৯৪২), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩) এবং *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭)। সুখপাঠ্য এ সকল উপন্যাসে ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী সমাজের প্রাঞ্জল চিত্র আঁকা হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের ও অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যা ১৩৭। তারাশঙ্কর ছিলেন একজন গান্ধীবাদী, সুতরাং সংস্কারপন্থী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বাংলার গ্রাম, প্রজা ও রায়তের সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবিকার সন্ধানে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে গমন প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শুধু বাংলাভাষী নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় এবং আধা-উপজাতীয় মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখও তাঁর লেখার উপজীব্য।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে গণমুখী এবং বহুপ্রসূ কথাশিল্পীদের অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন :

> Manik Bandyopadhyay with his first four or five volumes convinced us that he was about the most completely equipped writer in fiction we had ever had. We saw in him the froth subside, the passion of youth controlled by a marvelous maturity, the boldness of a rebel balanced by an artist's sense of proportion.[৭]

মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা মানিকের প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)-তে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *জননী*। তাঁর অমর সৃষ্টি *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *পুতুল নাচের ইতিকথা* ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। পদ্মানদীর জেলেদের কঠোর সংগ্রামী জীবন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি*-তে; তা ছাড়া এ উপন্যাসে নরনারীর আদিম প্রবৃত্তিও তুলে ধরেছেন কথাশিল্পী। *পুতুল নাচের ইতিকথার* পটভূমি একটি অখ্যাত নিভৃত গ্রাম গাওদিয়া, কিন্তু এই উপন্যাসের আবেদন বিশ্বজনীন।

১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশক ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়। জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী আন্দোলন এই সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। তিনি ছিলেন বামপন্থী বলয়ের শিল্পী এবং অবিচল মার্ক্সবাদী। অনেক বাস্তববাদী শিল্পীর মতো জীবনের ও সমাজের শুধু উপরিভাগ তিনি তুলে ধরেন না, চরিত্রগুলোর অন্তরজীবন উদঘাটন করতে চান তিনি। পাপবিদ্ধ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুঃসহ জীবন তিনি শুধু আঁকেন না,

৭. An Acre of Gveen Grass, Calcutta, 1982, 94-95.

তাদের যৌন প্রবণতাও তুলে ধরেন। *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) এবং *অমৃতস্যপুত্র* (১৯৩৮) উপন্যাসে তিনি শহরের মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রিত করেছেন। *শহরতলী*-তে (দুই খণ্ড ১৯৪০, ১৯৪১) শিল্পাঞ্চলের দরিদ্র বস্তির ক্লেদাক্ত জীবন নিয়ে এসেছেন।

মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় শোষিত-বঞ্চিত সর্বহারাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর রচনায়। এজন্যে তাঁর শেষের দিকের লেখায় শৈল্পিক নির্লিপ্ততা কম—অনেকটা যেন প্রচারধর্মী। *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। অনেকগুলো অসামান্য ছোটগল্পও রয়েছে তাঁর, যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'আপিম' প্রভৃতি।

বনফুল নামেই প্রধানত পরিচিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *তৃণখণ্ড* (১৯৩৫), *বৈতরণী তীরে* (১৯৩১), *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭), *দ্বৈরথ* (১৯৩৭), *মন্ত্রমুগ্ধ* (১৯৩৮), *নির্মোক* (১৯৪০), *রাত্রি* (১৯৪১), *সে ও আমি* (১৯৪২), *জঙ্গম* (চার খণ্ড ১৯৪৩-৪৫), *অগ্নি* (১৯৪৬) এবং *ডানা* (তিন খণ্ড ১৯৪৮-৫৫)। তাঁর ছোটগল্পের আকার খুবই ছোট এবং সংহত।

৪৭-পূর্ব খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৪-১৯৬১), শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০১-?), আশালতা দেবী (?), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৫৭), মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) প্রমুখ প্রধান।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়ার *নমিতা* (১৯১৮), *অভিশপ্ত সাধনা* (১৯২৭), *জন্ম অভিশপ্তা* (১৯২১) প্রভৃতি, আশাপূর্ণা দেবীর *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৯৪৪), *অনির্বাণ* (১৯৪৫), *বলবার মত* (১৯৪৭) প্রভৃতি এবং আশালতা দেবীর *অন্ধকারের অন্তরেতে* (১৯২৫), *বিরহের অন্তরালে* (১৯৩৪), *দীপালী* (১৯৩২) *দুরন্ত যৌবন* (১৯৩৯), *জীবনের যাত্রাপথে* (১৯৩০) প্রভৃতি এবং প্রভাবতী দেবীর *অন্ধা* (১৯২১), *স্নেহের মূল্য*, *পথের শেষে* প্রভৃতি পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী অনেক বেশি শক্তিশালী। শতাব্দীর প্রথমার্ধের মহিলা কথাশিল্পীদের মধ্যে মননশীলতা অনুপস্থিত, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার না করলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

মনোজ বসুর *ভুলি নাই* (১৯৪৩), *জলজঙ্গল* (১৯৫১) প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোটগল্প-সংকলন *বনমর্মর* (১৯৩২), প্রবোধকুমার সান্যালের *প্রিয় বান্ধবী* (১৯৩৩), *অগ্রগামী* (১৯৩৬), ভ্রমণকাহিনী *মহাপ্রস্থানের পথে* (১৯৩৩), *রাশিয়ার ডায়েরী* প্রভৃতি, প্রমথনাথ বিশীর *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার* (১৯৩৮), *কোপবতী* (১৯৪১), *পদ্মা* (১৯৫৩), *কেরী সাহেবের মুন্সী* (১৯৫৮) প্রভৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *বেদে* (১৯২৯), *কাকজ্যোৎস্না* (১৩৩৫), *বিবাহের চেয়ে বড়* (১৯৩৮), *প্রাচীর ও প্রান্তর* (১৯৩৯) প্রভৃতি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* (১৯২৬), *মিছিল* (১৯৩৩) প্রভৃতি, এবং বুদ্ধদেব বসুর *যবনিকা পতন* (১৯৩২), *যে দিন ফুটলো কমল* (১৯৩৩), *ধূসর গোধূলি* (১৯৩৩), *একদা তুমি প্রিয়ে* (১৯৩৩), *সূর্যমুখী* (১৯৩৪), *বাসরঘর* (১৯৩৫), *কালো হাওয়া* (১৯৪২) প্রভৃতি রোম্যান্টিক উপন্যাস হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে প্রেমেন্দ্রের *পাঁক* সমাজসচেতন উপাখ্যানও বটে এবং *মিছিল* রাজনৈতিক উপন্যাস।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ১৯৩০-এর দশকের রোম্যান্টিক লেখকগণ ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে 'নতুন সাহিত্য' সৃষ্টি করবেন। তাঁদের মুখপত্র ছিল 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩-২৯)। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। উনিশ শতকের শেষ প্রজন্মের ফরাসী আধুনিক লেখকদের দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হন। তাঁদের অবদানের জন্য তাঁরা ঐতিহাসিক কারণেই শুধু বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হবেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রই ছিলেন অনেকাংশে বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যসাহিত্যের দ্বারা পুষ্টি অর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে তিরিশের সাহিত্যিকগণ পশ্চিম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সহযোগীরা। আবেগতাড়িত তরুণের মতো তাঁরা একই জিনিস যেন বারবার লিখেছেন, তাঁদের উত্তরণ ঘটেছে কদাচিৎ। ভালো কিছু কবিতা ও সমালোচনা-মূলক গদ্য ছাড়া বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কথাসাহিত্যে গভীর কিছু দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

'পরিচয়' সাহিত্যগোষ্ঠীর ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫) ও *আবর্ত* (১৯৩৭) তাঁর বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেও পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি, যদিও তিনি ছিলেন একজন মননশীল লেখক ও শিল্পী। পক্ষান্তরে সতীনাথ ভাদুড়ী ও মনীশ ঘটক অনেক গভীর। ভাদুড়ীর রাজনৈতিক উপন্যাস *জাগরী* (১৯৪৬) ১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলনে'র পটভূমিতে রচিত। নায়ক বিলু একজন কংগ্রেসী সমাজবাদী কর্মী। তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসি কার্যকর হবার রাতে কারাগারে তাঁর সঙ্গে তাঁর কংগ্রেসপন্থী পিতামাতা এবং কমিউনিষ্ট ভাই দেখা করতে যান। এই চার চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এই উপন্যাসের উপজীব্য। জীবন যে রাজনৈতিক আদর্শ ও দলের চেয়ে বড় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে *জাগরী*তে। প্রাকরণিক নিরীক্ষার প্রবণতা ভাদুড়ীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর আর একটি অসামান্য কীর্তি *ঢোড়াই চরিত মানস* (দুই খণ্ড ১৯৪৯,

১৯৫১)। এটি বিহারের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার চিত্র। *গণনায়ক* (১৯৪৮) ও *চিত্রগুপ্তের* ফাইল (১৯৪৯)সহ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচ এবং ছোটগল্পসংকলন সাতটি। মার্ক্সবাদী গোপাল হালদারের উপন্যাস *একদা* (১৯৩৯), *পঞ্চশরের পথ* (১৯৪৪), *তের শ পঞ্চাশ* (১৯৪৫), *ভাঙন* (১৯৪৭), *অন্যদিন* (১৯৫০) প্রভৃতি সমাজসচেতন রাজনৈতিক শিল্পকর্ম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা বামপন্থী সংগঠনের কর্মী, যারা সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করে।

অমরেন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭-এর পর বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিম বঙ্গে চলে যান। তাঁর কুড়িটির বেশি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটোগল্পের মধ্যে *চর কাসেম* (১৯৪৯) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাস করেন। পূর্ব বাংলার নদীতীরের মানুষের জীবন তাঁর লেখায় চিত্রিত হয়েছে। তাঁর আর দুটি উপন্যাস *পদ্মদীঘির বেদেনী* (১৯৪৯) এবং *ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে* (১৯৫১)। তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের জীবন নিয়ে স্মরণীয় একটি উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *তিতাস একটি নদীর নাম*। এটি মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ১৯৪০-এর দশকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে লেখকের অকালমৃত্যুর পর। প্রগতি লেখকসংঘের সদস্য এবং মার্ক্সবাদী লেখক সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) তরুণ বয়সে ঢাকায় ফ্যাসিবাদী শক্তির হাতে নিহত হন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর উপন্যাস *বন্যা* প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ *সঙ্গীত ও অন্যান্য গল্প*। ১৯২০ এবং '৩০-এর দশকে বাঙালি মুসলমান মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছাড়া খ্যাতি অর্জন করেন নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, নাফিসা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন প্রমুখ। তাঁদের রচনা উন্নত না হলেও তাঁদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। তাঁরা মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে চেয়েছেন।

৫.

বিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে বহু পণ্ডিত আজীবন গভীর সাধনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) এ ক্ষেত্রে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অসংখ্য মূল্যবান ও মৌলিক প্রবন্ধের বাইরে এ বিষয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *হাজার বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* (১৯১৬)। অবশ্য তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি অসামান্য ইতিহাস দিনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-এর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৯১৬)। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর *সরল বাঙ্গালা সাহিত্য*, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়* (দু'খণ্ড), *বৃহদ্বঙ্গ* (দু'খন্ড ১৯৩৫) প্রভৃতি।

বিশিষ্ট পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল গদ্যলেখক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *প্রকৃতি* (১৩০৩), *জিজ্ঞাসা* (১৩১০), *কর্মকথা*

(১৯১৩), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৯১৪), *নানা কথা* (১৯২৪) এবং *বিচিত্র জগৎ* (১৯২০)। তাঁর *চরিতকথা* (১৯১৩) বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য আত্মজীবনী। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৪-১৯৪২) হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে প্রচুর লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *গীতায় ঈশ্বরবাদ* (১৩১২), *উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব* (১৩১৮), *বেদান্ত পরিচয়* (১৩৩১), *কর্মবাদ ও জন্মান্তর* (১৩৩২), *যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ* (১৩৪৩), *প্রেমধর্ম* (১৩৪৫) এবং *উপনিষদে জড় ও জীবতত্ত্ব* (১৩৫৯)।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) রবীন্দ্রনাথের দু'ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। ক্ষিতিমোহন দর্শনের দুর্বোধ্য বিষয় সহজ ভাষায় লিখেছেন। তাঁর চারখণ্ড *কবীর* (১৯১৭), *ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা* (১৯৩০), *দাদু* (১৯৩৫), *ভারতের সংস্কৃতি* (১৯৪৩), *বাংলার সাধনা* (১৯৪৫), *জাতিভেদ* (১৯৪৬), *যুগগুরু রামমোহন* (১৯৫১) প্রভৃতি মূল্যমান গ্রন্থ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও অসাম্প্রদায়িক। প্রবোধচন্দ্র একজন বিশিষ্ট ছন্দোবিশেষজ্ঞ। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৪৭), *ছন্দ পরিক্রমা* (১৯৬৭), *ছন্দ জিজ্ঞাসা* (১৯৭৪), *বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ* (১৩৮৫), *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ* (১৩৬৯) এবং *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা* (১৩৬৮)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) একজন নিবেদিত সাহিত্য-গবেষক, যিনি অবহেলিত মুসলমান পুঁথি-লেখকদের সম্পর্কে অবিস্মরণীয় কাজ করেছেন। বহু পুঁথির কবিদের সম্পর্কে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রয়েছে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ। তাঁর *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য* (মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে ১৯৩৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি অসামান্য গ্রন্থ।

ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাজের পরিমাণ অল্প হলেও তা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর *ভাষাতত্ত্ব* (১৯০৯) এবং *বাংলা ভাষা পরিচয়* (১৯৩৯) অসামান্য মৌলিকতার কারণেও। তবে বাংলা ভাষার দু'জন ভাষাবিজ্ঞানী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮০-১৯৬৯) এ বিষয়ে অবদান অনেক বিস্তৃত। চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (১৯২৯)-য় বাংলাভাষার বিস্তৃত পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতা সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯০) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

> From the day when *Origin and Development of the Bengali Language* was published (1926) Sumiti Kumar Chatterjie was recognised as the leading Indian in the subject of Indian Linguistics···[৮]

---

৮. Scholar and Virtroso, Sukumar Sen, Salitya Akademi, New Delhi 1980, 30.

শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আর একজন সমকালীন সাহিত্যের ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

> "he occupies a pre-eminent place among the philologists of Indo-Pakistan sub-continent. Particularly his contributions to the historical aspect of Bengali philology is not only monumental, but also original in many respect.[৯]

মুহাম্মদ এনামুল হকের *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (১৯৫৭), *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৫৭) এবং *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ ও তার বাইরের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী : "I feel a strong attachment to the study of cultural history of the Muslim, both in India and outside."[১০]

প্রাক-আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কেই শুধু নয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও কুড়ি শতকে ব্যাপক কাজ হয়েছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও প্রধান প্রায় সকল লেখক সম্পর্কে হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) লিখেছেন চার খন্ড *রবীন্দ্র-জীবনী,* যা বসওয়েলের' *জনসন*-এর সঙ্গে তুলনীয়। কথাশিল্পী ও সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)-এর *রবি-রশ্মি,* প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৫) *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ* (দুই খন্ড), *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* (দুই খন্ড) এবং *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প* রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

৬.

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের প্রধান কবিদের সকলেই সমালোচকও। পাশ্চাত্যসাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এই কবি-সমালোচকগণ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

---

৯. Muhammad Shahidullah Felicitation Volume-Edited by Muhammad Enamul Haq, Asiatic Society of Pakistan, 1966, Dhaka, XVI.

১০. A History of Sufism in Bengal, Muhammed Enamul Haq, Asiatic Society of Bangladesh, 1975, Preface-v.

তাঁর *কবিতার কথা* (১৯৫৬) প্রবন্ধগ্রন্থে আধুনিক কবিতার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় লিখিত ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু গ্রন্থভুক্ত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬১) রয়েছে দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ: *স্বগত* (১৯৩৮) এবং *কুলায় ও কালপুরুষ* (১৯৫৮)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিছু বিষয় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিত্রকলা তাঁর আগ্রহের এলাকা। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে সার্থক নন, কিন্তু সমালোচক হিসেবে তিনি অসামান্য। তাঁর সাহিত্যসমালোচনা ও আলোচনামূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে—*হঠাৎ আলোর ঝলকানি* (১৯৩৫), *উত্তর তিরিশ* (১৯৪৫), *কালের পুতুল* (১৯৪৬), *রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য* (১৯৫৫), *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* (১৯৫৭), *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৩), *প্রবন্ধ সংকলন* (১৯৬৬) এবং *কবি রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৬)। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১) তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য* এবং *মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে যাঁরা লিখেছেন কাজী আবদুল অদুদ তাঁদের অন্যতম। তাঁর *রবীন্দ্র কাব্য নাট্য* (১৯২৮) *সন্ধ্যা-সংগীত* থেকে *পলাতকা* পর্যন্ত সকল কবিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আর একটি গ্রন্থ *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬২)। কবির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিশীল ও স্পষ্টবাদী। *নজরুল প্রতিভা* (১৯৪৯) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক লেখকদের মধ্যে আরো যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯), অরবিন্দ পোদ্দার (১৯২০), দীপ্তি ত্রিপাঠী (?), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (?), আজহার উদ্দিন খান (১৯৩০-), অমলেন্দু বসু (১৯১২-১৯৯১) প্রমুখ। তবে সকলের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্তিমান আবু সয়ীদ আইয়ুব। তাঁর প্রধান বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৯) রবীন্দ্রকাব্যবিশ্লেষণমূলক গ্রন্থের মধ্যে অনন্যসাধারণ। আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস সম্পর্কে ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে খ্যাত অখ্যাত সমালোচকদের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা দুই বাংলায় অসংখ্য। তারমধ্যে মূল্যবান গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক।

৭.

আত্মজীবনী, জীবনী ও স্মৃতিকথা বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট জায়গা অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের মহান গদ্যশিল্পী মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)- এর আত্মজীবনী *আমার জীবন* ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। *আমার জীবন* এবং তাঁর আর একটি আত্মজৈবনিক রচনা *বিবি কুলসুম* ((১৯১০) উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ নয়, তবে তাতে লেখ সম্পর্কেই শুদু জানা যায় না, তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি চিত্রও পাওয়া যায়। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৪৭-১৯১৯) লিখেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ : *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪) এবং *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র* (১৯১০)। এ দুটি গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন তিনজন মহৎ বাঙালির জীবন, তাঁরা হলেন শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের কর্ম ও রচনায় অনেক কল্যাণ সাধন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী *আত্মচরিত* (১৯১৮) তাঁর জীবন ও সময়ের একটি উজ্জ্বল দলিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) তাঁর 'সাহিত্য সাধক রচিতমালা' সিরিজে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রণয়ন করেছেন। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য তাঁর খ্যাতি। বাংলাদেশের নাটক ও মঞ্চের ইতিবৃত্ত তাঁর *বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস* (১৯৩৪)। *বাঙ্গালা সাময়িক পত্র* (১৯৪০) তাঁর একটি অসামান্য গ্রন্থ, এতে বাংলা সাময়িকপত্র ও সাময়িকীর পরিচয় দেয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) এবং *ছেলেবেলা* (১৯৪০), প্রমথ চৌধুরীর *আত্মচরিত* (১৯৪২) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আপন কথা* (১৯৪৬) অসামান্য গ্রন্থ। তথ্যের চেয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে গ্রন্থগুলোয়। জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) গদ্য সাধুরীতির তবে তা স্বাদু। তাঁর *জীবনকথা, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* এবং *যাঁদের দেখেছি* তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা। কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)-এর *কাজী নজরুল প্রসঙ্গে* (১৯৫৯), *আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের সাথী* (১৯৬৬) এবং *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ* (১৯৬৯) তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিচারণ।

বিশ শতকে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে, তবে তার অধিকাংশই উচুঁমানের সাহিত্য হয়ে উঠে নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপরিব্রাজক। তাঁর বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি মূল্যবান ভ্রমণকাহিনীতে। তথ্যে ভারাক্রান্ত নয় তাঁর রচনা, তিনি প্রধানত ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনুভূতি। তাঁর প্রথম গ্রন্থই ভ্রমণকাহিনী *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র*, উনিশ শতকে প্রকাশিত। এই শতকে বেরিয়েছে তাঁর *জাপানযাত্রী* (১৯১৯), *যাত্রী* (১৯২৯), *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১) এবং *জাপানে ও পারস্যে* (১৯৩৬)।

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৬) লিখেছেন কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী : *প্রবাসচিত্র* (১৯০১), *হিমালয়* (১৯০২), *হিমালয় বক্ষে* (১৯০৫), *হিমাদ্রী* (১৯১৩), *মধ্যভারত* (১৯৩০) এবং *আমার ইউরোপ ভ্রমণ* (১৯১৫)। জসীম উদ্দীন লিখেছেন কয়েকটি ভ্রমণগ্রন্থ, যেমন *চলে মুসাফির* এবং *যে দেশে মানুষ বড়*। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)-র *দেশে-বিদেশে* (১৯৪০) বাংলাভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। বহু

ভাষাবিদ এই পণ্ডিত ও কথাশিল্পীর রয়েছে আরো দুটি ভ্রমণকাহিনী : *জলে ডাঙ্গায়* (১৯৫৭) এবং *ভবঘুরে ও অন্যান্য* (১৯৬২)। বুদ্ধদেব বসুর *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪১) এবং *জাপানি জার্নাল* (১৯৬২) সাহিত্যরসসমৃদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) রয়েছে কয়েকটি ভ্রমণগ্রন্থ, তারমধ্যে *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহীম খাঁর (১৮৯৪-১৯৭৮) *ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র*, ইবনে ইমামের *জলেস্থলে*, জহুরুল হকের (১৯২২-১৯৯৮) *সাত সাঁতার* (১৯৫৭), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯-এর *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী।

৮.

উনিশ শতকে শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানসম্প্রদায় উঁচু শ্রেণীর হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে। এমনকি ইংরেজিকে সরকারি ভাষা ঘোষণার আগে থেকেই হিন্দুরা শাসকদের ভাষা ইংরেজি রপ্ত করতে থাকেন। তাতে তাদের শুধু যে চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা হয় তাই নয়, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে যেতে থাকেন। বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষা বর্জনের সিদ্ধান্তে মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে অন্তত অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে পড়ে।

উনিশ শতক মুসলমানদের জন্য ছিল কঠিন সময়। তারা ওই শতকের শেষ দিকে অথবা কুড়ি শতকের প্রথম দিকে এসে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা অনুধাবন করতে থাকে। বিশেষ করে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরোজা কিছুটা উন্মুক্ত হয়। পাশ্চাত্যশিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মুসলমান লেখকরা কোনো সৃষ্টিশীল মহৎসাহিত্য সৃষ্টিতে অসামান্য অবদান রাখতে না পারলেও চিন্তামূলক প্রবন্ধসাহিত্যে কুড়ি শতকের প্রথম দিকের মুসলমান লেখকদের অবদান সামান্য নয়। বিশেষ করে আর্থসামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁরা প্রচুর লিখেছেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের অবদান স্বীকার করতেই হবে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশ কিছুসংখ্যক শক্তিমান মুসলমান লেখক, সমাজসংস্কারক ও বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মুন্‌শী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ (১৮৬২-১৯৩৩), মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯০৫), মুন্‌শী মোহাম্মদ জমির উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), সৈয়দ এমদাদ আলী ৯১৮৮০-১৯৫৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) এবং মুহম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৭৭-১৯৬৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনার মান তাঁদের হিন্দু সমসাময়িকদের মতো উঁচু নয়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের লেখায় সন্দেহাতীতভাবে

মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এবং দেশপ্রেমের চেতনায় তাঁরা উজ্জীবিত ছিলেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই রচনার প্রধান বিষয় ছিল ইসলাম,মুসলমান সমাজ এবং মুসলিম জগৎ। ইসলাম হয়ে উঠে তাঁদের একটি প্রেরণার উৎস। তাঁরা বঙ্কিম প্রমুখ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবিত 'হিন্দু জাতীয়তা'র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকের মুসলমান লেখকদের লড়াই করতে হয়েছে দুই ফ্রন্টে : হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, এবং খৃস্টান ঔপনিবেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত খৃস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে। তা করতে গিয়ে লেখার বক্তব্যের উপর তাঁরা যতো জোর দিয়েছেন লেখার সাহিত্যেগুণের উপর ততোটা নয়। তাঁদের রচনা পরিমার্জিত নয়, আড়ষ্ট। এই সকল উত্তেজক লেখকদের চিন্তায়ও ছিল গলদ। তাঁরা তাঁদের জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটির মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তাঁরা বাঙালি, নাকি বাঙালি মুসলমান, নাকি শুধু মুসলমান সে-প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত। ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা তাঁদের অবহেলা করে ঠেলে দিয়েছিল দূরে, তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় সরে গেল তাঁদের থেকে আরো খানিকটা দূরে। তাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তায় ও কর্মে দূরত্ব না কমে বরং বাড়তে থাকে। তাঁদের অস্বচ্ছ চিন্তাধারায় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ প্রভাবিত হয় এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঙালি জাতির সংহতি। হিন্দুরাও মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যে কোনোরকম আগ্রহ প্রকাশ না করায় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়ে উঠে।

শুরু থেকেই হিন্দু লেখকরা যেমন সমকালীন বিষয়ের সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়েও প্রচুর লিখেছেন, সম্ভবত তাঁদের অনুকরণে মুসলমান লেখকরাও ইসলাম ধর্ম ও প্রাচীন মুসলিম সভ্যতা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চেষ্টা করেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয়ের অনেকটাই অধিকার করে থাকে ইসলাম ও মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতা, ইসলামের মহাপুরুষদের জীবন ও চিন্তাধারা অর্থাৎ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা। ইসলামের মহাপুরুষদের এবং মুসলমান সাধুসন্তদের জীবনও তাঁরা বাংলাভাষায় লিখতে থাকেন। সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য অতি সামান্য, তবে তার ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নয়। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অনেকগুলি জীবনী প্রকাশিত হয় শতাব্দের প্রথম তিন চার দশকে। রেয়াজউদ্দিন আহমদের *হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত* (১৯৩৭), মোহাম্মদ আকরম খাঁর *মোস্তফা চরিত* (১৯২৫), গোলাম মোস্তফার *বিশ্বনবী* (১৯৪২), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৭-১৯৬৪) *মরুভাস্কর* (১৯৪১), এয়াকুব আলি চৌধুরীর (১৮৮৭-১৯৩৮) *মানব মুকুট* (১৯১৬) এবং *নূরনবী* (১৯২৯) এবং মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর (১৮৯৮-১৯৭৫) '*নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ* (১৯৫০) সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান এবং এ সকল জীবনী খুবই জনপ্রিয় হয়। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু লেখকও হযরত মুহম্মদের জীবনী প্রণয়ন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৯১০), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) এবং রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭)।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে ১৯৪৭-পূর্ব মুসলমান লেখকদের অবদান অনুল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও সমকালে যাঁরা কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতিউর রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৯), শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কাজী আবদুল অদুদ (১৮৯৪-১৯৭৪), মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। এই সকল লেখকের রচনাবলিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানপ্রধান গ্রামীণ সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, তবে তা যথেষ্ট শিল্পিতভাবে পরিবেশিত হয় নি। আগেই উল্লেখিত কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে মুসলমানসমাজের আশরাফ-আতরাফ প্রসঙ্গ এবং উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে।

জসীম উদ্দিন কবিতায় যেমন, তেমনি তিনি তাঁর সকল মাধ্যমেই গ্রামীণ জীবনের প্রাঞ্জল চিত্র আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন। গল্প-উপন্যাস তিনিও লিখেছেন। তাঁর *বোবা কাহিনী* সাধু ভাষায় রচিত, কিন্তু তাতে সহজভাবে প্রকাশ ঘটেছে পল্লীর কৃষিজীবী মানুষের অবিকৃত জীবন। মূলত প্রবন্ধকার লুৎফর রহমানের উপন্যাসগুলির নাম *বাসর উপহার*, *প্রীতি উপহার* এবং *রায়হান*। তিনি ছিলেন নীতিবাগীশ, উপন্যাসেও তিনি উচ্চ আদর্শ দ্বারা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। রোম্যান্টিক কবি শাহাদৎ হোসেন এক ডজনের বেশি উপন্যাস লিখেছেন, তবে কোনোটিই মানসম্মত নয়। আবদুল অদুদ তাঁর ছোটগল্প সংকলন *মীর পরিবার* (১৯১৯)-এর পরে উপন্যাস *নদীবক্ষে* (১৯২০)-তে চর এলাকার মানুষের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হুমায়ুন কবির-এর উপন্যাস *নদী ও নারী* (১৯৪২) পদ্মানদীতীরবর্তী মানুষের উপাখ্যান। মাহবুব উল আলমের *মোমেনের জবানবন্দী* (১৯৪৬) একটি আত্মজৈবনিক নক্‌শাধর্মী উপন্যাস, যেখানে নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৮০)-এর উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *সত্যমিথ্যা* (১৯৫৩) এবং *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫)। তিনি একজন অসামান্য ব্যঙ্গগল্পের লেখক। তাঁর ব্যঙ্গগল্পসংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৫), *আসমানী পর্দা* (১৯৫৭) এবং *গালিভারের সফরনামা* (১৯৫৯)। তাঁর গল্পে তিনি রাজনীতিক ও সামাজিক ভণ্ডামির সমালোচনা করেছেন। আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) উপন্যাস *চৌচির* (১৯৩৪), *সাহসিকা* (১৯৪৬), *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮) এবং *'আয়েশা* (১৯৫১) প্রচারধর্মী বক্তব্যে আড়ষ্ট। সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি কথাশিল্পী হিসেবে সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি।

৯.

১৯২৬-এর জুনে কয়েকজন তরুণ লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠনের পত্তন করেন। বাণিজ্য বিভাগের তরুণ অধ্যাপক আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এই

সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'শিখা', সেই সূত্রে এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখক রূপে পরিচিত হন। সাহিত্য সমাজের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। তাঁরা ঘোষণা করেন : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল অদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬), আবুল ফজল এবং আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)। তাঁরা সকলেই ছিলেন মূলত শক্তিশালী গদ্যলেখক। প্রথম পর্যায়ে সংগঠনটির সঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যুক্ত ছিলেন, তবে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি প্যারিস চলে গেলে সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আবুল হুসেনের বক্তব্য :

> "আমাদের [বাঙালি মুসলমান সমাজের] যুগ যুগান্তরের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা জাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা তো রাতারাতি হওয়া অসম্ভব।... এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোজন সাধন।"[১১]

সম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী এবং ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্যে বিশ্বাসী আবুল হুসেন এই নিবন্ধে আরো বলেন :

> "কেহ হয়তো মনে করবেন এ সমাজের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হওয়ায় হিন্দু সাহিত্যিকগণের কোন সম্পর্ক এতে নাই। কিন্তু এই বার্ষিক রিপোর্ট হতে আপনারা বুঝবেন যে এ-সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য; আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

মুসলিম সাহিত্য সমাজ এক যুগ টিকে থাকলেও প্রথম পাঁচ বছরই এই সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সংগঠনের উদ্যোগে অনেকগুলি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে হিন্দু-মুসলমান প্রগতিশীল সাহিত্যিকগণ সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয় এইসব সম্মেলনে। প্রগতিশীল মুসলমান তরুণদের মধ্যে এই সংগঠন যতোই জনপ্রিয় হতে থাকে, ঢাকার রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতারা ততোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। বিশেষ করে আবুল হুসেনের ধর্মসংক্রান্ত উদার সংস্কারমূলক চিন্তাধারায় তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তাফা দেন এবং স্বাধীন মত প্রকাশ সম্ভব নয় বলে ঘোষণা দিয়ে লেখালেখি বন্ধ রাখেন।

---

১১. বার্ষিক বিবরণী, *শিখা*, প্রথম বর্ষ. চৈত্র ১৩৩৩, ২১-২২।

ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষাতেই আবুল হুসেন লিখেছেন। জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর তিনটি ছোট প্রবন্ধের বই। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ছোটগল্প প্রভৃতির সমন্বয়ে তাঁর ভাবশিষ্য আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *আবুল হুসেন রচনাবলী* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ অব্দে। তাঁর দুটি ছোট বই *বাংলার বলশী* (১৩৩২) এবং *বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা* (১৩৩৫) অসামান্য কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা পড়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন : It has seldom been my lot to come across such a valuable brochure." বাঙালি মুসলমানের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনীহার সমালোচনা করে ১৯২০-এর দশকে তিনি বলেন :

> আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ ক'রে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক! ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইয়োরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখান করেছি—কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুন ভুলের কোন সংশোধনের চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছি।"

ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী সমাজের নিপীড়িত কৃষকের অবস্থা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে *বাংলার বলশী* পুস্তকে। তিনি রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষক কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবের দ্বারাই কৃষকের সমস্যার সমাধান হতে পারে। *মুসলিম কালচার* (১৯২৮) ইংরেজ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল রচিত একটি গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

সাহিত্য সমাজ-এরই আর এক নেতা কাজী আবদুল অদুদ ছিলেন উদার মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ। মুসলমান সমাজের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামিকে তিনিও কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্যে বিশ্বাস করতেন এবং ছিলেন জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধী। ১৯৪৭-এর পরে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে কলকাতায় থেকে যান। অবিচল অসাম্প্রদায়িক অদুদ সরল ভাষায় কোরআন-এরও অনুবাদ করেছেন। *হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম* (১৯৬৬) তাঁর একটি মূলবান গ্রন্থ। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অদুদের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *নবপর্যায়* (দুই খণ্ড, ১৩৩৩, ১৩৩৬), *পথ ও বিপথ* (১৯৪৬), *বাংলার জাগরণ* (১৩৬৩), *শাশ্বত বঙ্গ* (১৩৫৮), *সমাজ ও সাহিত্য* (১৩৪১) এবং *হিন্দু-মুসলমান বিরোধ* (১৩৪২) প্রভৃতি গ্রন্থে। *কবিগুরু গ্যেটে* (দুই খণ্ড, ১৩৫৩) এবং *শরৎচন্দ্র ও তারপর* (১৯৬১) তাঁর আর দুটি মূল্যবান গ্রন্থ। কাজী মোতাহের হোসেন বহুসংখ্যক সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের লেখক।

অনেকগুলো প্রবন্ধ সংকলিত হয় তাঁর *সঞ্চয়ন* (১৯৩৭) গ্রন্থে। মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৫) একজন মননশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর দুই খণ্ড *পারস্য প্রতিভা* (১৯৩২) ক্লাসিক্যাল ফারসি সাহিত্যের মহান নির্মাতাদের সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। *মানুষের ধর্ম* (১৯৪০) তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যও নিজস্ব-চিহ্নিত, তবে পরিশীলিত নয়। সাময়িক বিষয় নিয়েই লিখেছেন নজরুল। তাঁর তিনটি প্রবন্ধ-পুস্তক *যুগবাণী* (১৯২২), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬) এবং *রুদ্র-মঙ্গল* (১৯২৬) সমকালীন রাজনীতিকে ধারণ করে রেখেছে। সরকারবিরোধী বক্তব্যের কারণে *যুগবাণী* বৃটিশ শাসক বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৬) একটি পুস্তিকা। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত কবি আদালতে যে ঐতিহাসিক জবানবন্দী দেন সেটাই তাঁর *রাজবন্দীর জবানবন্দী*। এমন ওজস্বী ভাষায় প্রদত্ত কোনো জবানবন্দী পৃথিবীর আর কোনো ভাষার কোনো কবি শিল্পী সাহিত্যিক দিয়েছেন বলে জানা যায় না। বাংলা সাহিত্যের এ এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আবেগ নয় তিনি যুক্তিকে অবহেলা করেন নি। এজলাশে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন :

> "আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না।... আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীনে হ'ত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থে নীত হতেন, তা হলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।"

মোতাহের হোসেন চৌধুরী পরিমাণে লিখেছেন অল্প, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্যের স্থায়ী সম্পদ। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি *সংস্কৃতি-কথা* (১৯৫৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর আর দুটি বই *সুখ* (১৯৬৮) বারট্র্যান্ড রাসেলের *The Conquest of Happines* এর ভাবানুবাদ, এবং *সভ্যতা* (১৯৬৫) ক্লাইভ বেল-এর *Civilization*-এর অনুসরণে লেখা। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর অন্যতম কর্মী আবুল ফজল আমৃত্যু ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বিচিত্র কথা* (১৯৪০) *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (১৯৬০), *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৪) এবং *সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র* (১৯৬৮)। তিনি যুক্তিবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবী, সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসনকে তিনি সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে সকল রকম ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিরও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে।'

১০.

১৯৪৭-এ যখন উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে তখন বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত হয় : মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, অপরদিকে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গ হয় ভারতের একটি প্রদেশ। বাংলা বিভাগের ফলে বাংলা

সাহিত্যের অখণ্ডতা অবিভাজ্য থাকলো না। পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লেখকরা হলেন দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক—তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা অভিন্ন হতে পারে না। বিভাগের আগে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। প্রধান লেখকের রচনাবলি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো। পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীও বেরোতো সেখান থেকে। ইংরেজ শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুগল আমলে প্রতিষ্ঠিত অনগ্রসর ঢাকা নগরী অবিলম্বে হয়ে উঠলো 'পাকিস্তানী বাঙালী' লেখকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এইভাবে ১৯৪৭ বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। ১৯৪৭ থেকে পূর্ব বাংলায় সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম অর্জন করে এক স্বতন্ত্র চারিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ-সহ শাসকবর্গ ঘোষণা করেন যে 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। গোটা দেশের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ছিল বাংলাভাষী। শাসকদের এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও ছাত্র-যুব সমাজ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ শুরু করে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ঃ পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র-যুবক নিহত হন। আন্দোলনটি পরিণত হয় এক অভ্যুত্থানে। বাংলা ভাষার দাবি স্বীকৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার মর্যাদা। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের লেখক বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেছেন : "ভাষা-আন্দোলন শুধু জাতির নতুন সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নি, বরং সেটি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বাঙালী মুসলমান কয়েক দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে তাদের জাতীয় পরিচয় বিস্মৃত হয়েছিল। শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি তার আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করে, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক জীবন পূর্ব বাংলার মাটিতে নতুনভাবে সঞ্চারিত হতে শুরু করে।"[১২]

১১

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানী শাসন আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর বিপুল অধিকাংশের শিল্পমূল্য সামান্য। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসেবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), আবু রুশদ (১৯১৯), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েন উদ্দীন (১৯২৩-১৯৮৬), রশীদ করীম (১৯২৫), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬), মিন্নাত আলী (১৯২৭), জহির রায়হান

---

১২. Lession of February 21, *The Wave*, February 21, 1969.

(১৯৩৩-১৯৭২), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৪), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), শওকত আলী (১৯৩৫), আনোয়ার পাশা (১৯৩৫-১৯৭১), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), রাজিয়া খান (১৯৩৬), বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬) এবং হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯)। তাঁদের অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তাঁদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব বাংলার প্রথম পর্যায়ের কথাশিল্পীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ ভাষা ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ। এখানে এক জেলার উপভাষার সঙ্গে অন্য জেলার উপভাষার ব্যবধান অনেক। উচ্চারণের পার্থক্য শুধু নয়, শব্দের অর্থেও যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। বিভাগোত্তরকালের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী শওকত ওসমান চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব বঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *জননী* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে, তবে এটি রচিত হয় "১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ -এর মধ্যে"। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত *জননী*-র উপজীব্য মুসলমানপ্রধান গ্রামের সমাজের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা। তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) প্রথাগত প্রকরণে রচিত নয়, নিরীক্ষাধর্মী ও রূপকাশ্রয়ী। এতে শোনা যায় মানবতার জয়ধ্বনি। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *সমাগম* (১৯৬৭), *চৌরসন্ধী* (১৯৬৯) এবং *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০)। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী ছোটগল্পলেখকও। তাঁর গল্পসংগ্রহগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পিঁজরাপোল* এবং *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১)। শওকত ওসমানের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে। শেষ পর্যায়ে অসৃষ্টিশীল গদ্য তিনি লিখেছেন প্রচুর। মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে তিনিও সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'প্রথম আধুনিক বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিক' বলে খ্যাত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গ্রন্থের সংখ্যা সীমিত, কিন্তু শিল্পগুণে অসামান্য তাঁর রচনাবলি। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে তিনটি উপন্যাস, তিনটি ছোটো নাটক-নাটিকা এবং পঞ্চাশটির মতো ছোটগল্প। তাঁর প্রথম গ্রন্থ একটি ছোটগল্পের সংকলন *নয়নচারা* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৩৫০ সনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি অসামান্য গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস *লাল সালু* (১৯৪৮) ধর্মব্যবসায়ী কবলিত গ্রামীণ মুসলমান সমাজের এক বাস্তব দলিল। অজ্ঞতা, ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কার, ধর্মের নামে শাসনশোষণ প্রভৃতি এই উপন্যাসের উপজীব্য, *লাল সালু* ইংরেজি অনুবাদ *Tree Without Roots* ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-সালে। তা ছাড়া উর্দু, ফরাসী, চেক এবং জার্মান ভাষায় *লাল সালু* অনূদিত হয়েছে। যে অল্প কয়েকটি বাংলা উপন্যাস বহির্বিশ্বে পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছে 'লাল সালু' তারমধ্যে অন্যতম। প্রথাগত প্রকরণে রচিত তবে *লাল সালু*-র বিষয়বস্তু খুবই সাহসী ও আকর্ষণীয়। নায়ক মজিদ একজন ভণ্ড পীর যে বাংলাদেশের এমন একটি এলাকায় তার আস্তানা পাতে যেখানে "শিষ্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি"। মুসলমানপ্রধান সমাজে অন্ধ-বিশ্বাসকে পুঁজি করে কিভাবে ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের ভাগ্য গড়ে তোলে সেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। দ্বিতীয় উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)-র কাহিনী সামান্য : একটি যুবতী নারীর হত্যাকাণ্ড এবং সেটি ঘিরে এক যুবকের মনোবিশ্লেষণ। যে ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি সে-ই মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় অন্ধত্বের কথা এখানেও আছে। *চাঁদের অমাবস্যা* রচনার সময় ওয়ালীউল্লাহ কাফকা, সার্ত্রে এবং ক্যেম্যু-র ··· অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা উপস্থিত। তাঁর *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) বাংলা ভাষার এক অপূর্ব সৃষ্টি—এর পটভূমি যেন স্থান ও কালের উর্ধ্বে। 'চেতনা প্রবাহ রীতি'তে রচিত এই উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের খণ্ড খণ্ড চিত্র চিত্রশিল্পীর দক্ষতায় অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোয় ওয়ালীউল্লাহ আধুনিকতা ও অসামান্য মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর কথাশিল্পের উপজীব্য হিসেবে রশীদ করীম বেছে নিয়েছেন শহরের মধ্যবিত্ত জীবন। কলকাতার মুসলমান মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *তাঁর উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) এবং *প্রসন্ন পাষাণ* (১৯৬৩) উপন্যাসে। কলকাতায় লেখকের জন্ম এবং সেখানেই কাটে তাঁর যৌবন পর্যন্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বেশ পরে তাঁর অগ্রজ আবু রুশদ এবং তিনি পূর্ব বঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে আসেন।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রথম দিকের উপস্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *আলমডাঙ্গার উপাখ্যান* (১৯৫৪), *কাঁশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *জীবন-কাব্য* (১৯৫৬) এবং *কাঞ্চনমালা* (১৯৫৬)। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পথ জানা নাই* (১৯৫৬), *অনেক দিনের আশা* (১৯৫৬) এবং *শাহের বানু* (১৯৫৭)। এই শতাব্দীর প্রথম শ্রেণীর বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সমকক্ষ তিনি নন, তবে পূর্ব বাংলার নদীবহুল দক্ষিণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন গভীর মমতায় তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের নদীর মাঝি, ক্ষেতখামারের দরিদ্র চাষী এবং নিসর্গ উপস্থিত *কাঁশবনের কন্যা*-য়। *কাঞ্চনমালা*-র উপজীব্য বেদে-জীবন। আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৬২) উপন্যাসে অন্তেবাসী গ্রামের মানুষের ছবি পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা খুবই অনাভরণ।

শহীদুল্লাহ কায়সার রাজনীতি ও সমাজসচেতন বাম বলয়ের কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সারেং বউ* (১৯৬২) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলার পটভূমিতে রচিত। এক প্রবাসী সারেং-এর যুবতী পত্নীর একাকীত্বের সমস্যা আঁকা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *'সংশপ্তক'* (১৯৬৮)-এর পটভূমি বিরাট—ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের মানুষ উঠে এসেছে এতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময়কালীন বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের জীবন বেছে নিয়েছেন লেখক। শিল্প হিসেবে বিশেষ সার্থক না হলেও সামাজিক দলিল হিসেবে *সংশপ্তক* মূল্যহীন নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর সমসাময়িক আলাউদ্দীন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২) এবং *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) শিল্প হিসেবে অনেক সার্থক এবং কাহিনী সুসংবদ্ধ। *কর্ণফুলী*র পটভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা। *ক্ষুধা ও আশা* দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য, যেখানে অন্তেবাসী মানুষরা জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত। পাকিস্তান-যুগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শওকত ওসমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী হিসেবে আল আজাদ বিবেচিত হতেন। তিনি বামবলয়ের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০) এবং *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২) ব্যক্তিজীবনভিত্তিক এবং ১৯৩০-এর রোমান্টিক লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি অনেকগুলি ভালো ছোটগল্পের রচয়িতা। তাঁর গল্পসংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভী* (১৯৫৪), *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৪), *উজান তরঙ্গে* (১৯৬২) এবং *যখন সৈকত* (১৯৬৭)। নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষদের সুখ-দুঃখ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। সৈয়দ শামসুল হক একজন রোমান্টিক শিল্পী, যিনি শহরের উঠতি মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রিত করেছেন। তিনি একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী, তবে তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান রচনা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনেক পরে। স্বাধীনতাপূর্ব রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *অনুপম দিন* (১৯৬২) এবং *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪) উপন্যাসত্রয় এবং *তাস* (১৯৫৪), *শীত বিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪) প্রভৃতি ছোটগল্প-সংগ্রহ। তাঁর ভাষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শওকত আলী গভীর সমাজসচেতন কথাশিল্পী। তাঁর প্রধান রচনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয় একটি উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) এবং একটি গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮)। তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের লেখাগুলোই অধিকতর গভীর এবং মানুষের সংগ্রাম ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোয়। হাসান আজিজুল হক একজন শক্তিশালী ছোটগল্পলেখক। আলোচ্য সময়পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* (১৯৬৪) এবং *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৬৭)। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো নিপুণ হাতে অঙ্কিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বামপন্থী লেখকদের নির্মিত ধারারই তিনি অন্যতম প্রতিনিধি।

১২

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আধুনিক শিক্ষিত প্রবন্ধকারদের রচনার শৈলী ও বিষয়বস্তু তাঁদের পূর্বসূরিদের থেকে স্বতন্ত্র। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায় : মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে প্রাধান্য পায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে

সমকালীন সাহিত্য বিচারের আগ্রহ প্রকাশ পায় অধিকাংশ নতুন সমালোচকদের লেখায়। ষাটের দশকের অনেক লেখক তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে অতি দ্রুত। তাঁদের অধীত গ্রন্থাবলিই বিষয়বস্তু হয়ে উঠে তাঁদের রচনার। তাতে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শক্তিশালী প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটে।

আবদুল হকের (১৯১৮-১৯৯৭) *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২) এবং *সাহিত্য, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ* (১৯৬৮) দুটি মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি আবুল হুসেন, কাজী আবদুল অদুদ প্রমুখ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের চিন্তাবিদদের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিশীল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক। মোহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৫৪) এবং *তোষামদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৬৯) এবং আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) তাঁর *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা* (১৯৬৯) এবং *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* (১৯৭০)-তে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে নিহত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) একজন শক্তিশালী প্রবন্ধলেখক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর *মীর মানস* (১৯৬৫) উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের গভীর পর্যালোচনা। তাঁর আর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯) এবং *বাংলা গদ্যরীতি* (১৯৭০) প্রশংসিত হয়েছে। আহমদ রফিক (১৯২৯) তাঁর *শিল্প সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৫৮) গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), যিনি নিজে একজন কবি, আধুনিক কবিতার আলোচনা করেছেন তাঁর *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫)-য়। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১) এবং আনোয়ার পাশা (১৯২৯-৭১) রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। চৌধুরীর *রবি পরিক্রমা* (১৯৬৩) এবং *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা* (১৯৬৯)-তে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হন।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমর (১৯৩২) মূলত রাজনৈতিক লেখক। তিনি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আলোচনা করেছেন *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭) এবং *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* গ্রন্থত্রয়ে। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০) একটি অসামান্য কাজ। প্রগতিশীল ধারার লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬)-র স্বাধীনতার পরে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কে; স্বাধীনতার আগে বেরোয় তাঁর *অন্বেষণ*

(১৯৬৮)। কাজী দীন মুহম্মদের (১৯২৭) *সাহিত্য সম্ভার* (১৯৬৫), মুস্তফা নূরউল ইসলামের (১৯২৭) *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮), আলাউদ্দিন আল আজাদের *শিল্পীর স্বাধীনতা* (১৯৬২), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬)-এর *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* (১৯৬৮) এবং মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর (১৯৩৬) *নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৬৩), *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (১৯৬৫) এবং *মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৭), আনিসুজ্জামানের (১৯৩৬) *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪) এবং *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯) এবং ওয়াকিল আহমদের (১৯৪১) *সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান ও ওয়াকিল আহমদের কাজ গবেষণামূলক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবীর চৌধুরী (১৯২৩) এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮) সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

আবু জাফর শামসুদ্দিনের (১৯১১-১৯৮৮) *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য* (১৯৬৯) এবং *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (১৯৭৮), মোবাশ্বের আলীর (১৯৩১) *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (১৯৬৩) এবং *নজরুল প্রতিভা* (১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

১৩.

তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য ১৯৬০-এর দশকটি ছিল একটি আশার দশক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অসামান্য গতিবেগ সঞ্চার করে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা লেখকদের অনেকেই গভীরভাবে প্রভাবিত হন ঃ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁদেরও লক্ষ্য হয়ে উঠে। বহুসংখ্যক নতুন গদ্যলেখকের এই সময় আবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার চেয়ে অসংখ্য ছোটকাগজ—'লিটল ম্যাগাজিন হয়ে উঠে তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম। বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকাও ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) সম্পাদিত 'সমকাল' এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন লেখকদের মুখপত্র আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (১৯৪০) সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময় নতুনধারার লেখকরা প্রথাগত লেখকদের বিরুদ্ধে অনেকটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ষাটের দশকের প্রতিশ্রুতিবান লেখকদের অধিকাংশই পরে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যান, তবে কেউ কেউ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে শক্তিশালী লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ষাটের দশকের নতুন লেখকদের অধিকাংশই ছিল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল : জীবনবিমুখ রোম্যান্টিক পথ পরিহার করে তাঁরা জীবনঘনিষ্ট বাস্তববাদী ও বস্তুবাদী হয়ে উঠেন। তাঁদের গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যেমন আসে গুণগত পরিবর্তন তেমনি ভাষা, প্রকরণ, শৈলী প্রভৃতি

নিয়ে কেউ কেউ নিরীক্ষা করেন। কবিতার ক্ষেত্রে শুধু নয় গদ্য-লেখকদের জন্য এই দশকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় পূর্ব বাংলার বাংলা গদ্য অর্জন করে এক নতুন মাত্রা।

ষাটের তরুণ কথাশিল্পীদের প্রায় কেউই তখনো উপন্যাস রচনায় হাত দেননি, কিন্তু তাঁদের অনেকেই ছোটগল্পকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। হাসান আজিজুল হকের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের (১৯৩৯) *দুর্বিনীত কাল* (১৯৩৫) এবং *বহেনা সুবাতাস* (১৯৬৭), আবদুশ শাকুরের (১৯৪১) *'ক্ষীয়মান* (১৯৬১) এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩) *সত্যের মতো বদমাস* (১৯৬৮) ওই সময়ের গল্পগ্রন্থ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর প্রধান লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার পরে। আবদুল শাকুর ব্যাঙ্গ কৌতুকে দক্ষ। ষাটের দশকের কেউ কেউ তিরিশের রোম্যান্টিকদের অনুকরণে যৌনতাকে তাঁদের লেখায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন যা কখনো অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ক্ষুণ্ন হয়েছে শিল্প।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে পূর্ব বাংলার সৃষ্টিশীল ও মননশীল গদ্য ধারণ করেছে। তা করতে গিয়ে ভাষা, প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। ষাটের দশকের লেখকগণ তাঁদের ভেতরের আর্তি—তাঁদের স্বপ্ন ও সমাজের বাস্তবতা—প্রকাশ করতে গিয়ে উপযুক্ত শক্তিশালী ভাষা নির্মাণ করেন। বহুযুগের গতানুগতিক কলকাতাভিত্তিক সাহিত্যের ভাষার বন্ধন থেকে তাঁরা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের মুক্তি ঘটান। পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এখানে যে নতুন ধারার সাহিত্য গড়ে উঠে তার সূচনা ষাটের দশকেই।

১১

লোকসাহিত্য

ওয়াকিল আহমদ *

লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। জার্মানিতে একটি প্রবাদ আছে, কোন জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় তার লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব-ভাবনা আছে, আবেগকল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোকসাহিত্যের অধিকারী হয়। অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা না থাকায় তারা তাদের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিশাল জনগোষ্ঠী এই বিচিত্র শ্রেণীর ও বিপুল আয়তনের সাহিত্যভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে। জনগণের এ সম্পদ সময়ের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসে তার ভাষাসমুদ্রে বিচরণ করে। লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতাবর্জিত। রূপকথা, পুরাণ, জাতক ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় কল্পনা ও কাল্পনিকতাব স্থান নেই। ব্যক্তি রচনা করলেও সমষ্টি তা লালন করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়বস্তু, ভাষাভঙ্গি ও রূপরীতিতে প্রচলিত ধারাই অনুসৃত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও উদ্ভাবনশক্তির অভাব আছে। তবে নতুন সৃষ্টির উল্লাস না থাকলেও লৌকিক সাহিত্য ও শিল্পকলায় আনন্দ, সৌন্দর্য, রসবোধ ও মূল্যবোধের অভাব থাকে না। গ্যেটে বলেন, "Folktale is the father of fiction and folksong is the mother of poetry"—লোককাহিনী ও লোকসঙ্গীত উপন্যাস ও কবিতার জনক-জননী। লৌকিক ছড়া লিখিত ছড়ার ছন্দ ও রীতিকে প্রভাবিত করে। প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা লিখিত সাহিত্যের

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার অঙ্গীভূত হয়। শিল্পকলার অনেক আঙ্গিক ও মটিফ লোকঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক কথায়, লোকসাহিত্য জাতির সংস্কৃতির নির্মাণ ও বিকাশ সাধন করে থাকে। বিশেষকরে, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি সংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা। সমকালকে স্পর্শ করে তা প্রবাহিত ও প্রসারিত হয়। প্রয়োজনে পুরাতনকে বর্জন এবং নতুনকে গ্রহণ করে তা অগ্রসর হয়। একটি জাতির আত্মপরিচয়, প্রকৃতি ও চারিত্র্যধর্ম নির্মাণে ও মূল্যায়নে এর এমন ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই আমরা 'লোকসাহিত্য' অধ্যায়ের পরিকল্পনা করেছি। আমাদের দেশের বিপুল লোকসম্পদের পূর্ণ পরিচিতি একটি প্রবন্ধে ধারণ করা কঠিন। বর্তমান অধ্যায়ে লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ—এই আটটি শাখায় বিভক্ত করে বাংলা লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাহিত্য জীবনের জন্য, জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করার জন্য—লোকসাহিত্যে এই অভিধার পূর্ণ প্রতিফলন আছে। "নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলো ছারখার, অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার।" অথবা "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।" অথবা "শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে চিত্ত হলো কালি।" ইত্যাদি উক্তি সাধারণ মানুষের ইতিহাস ও সমাজসচেতনতা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। সমাজের উচ্চবর্গের ইতিহাস লেখা হয়েছে, নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা হয় নি, লিখতে হলে তাদের সৃষ্ট উপাদানকে অবলম্বন করতে হবে। সাধারণভাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বর্তমান অধ্যায়ের বিষয় নির্বাচন, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

লোকসঙ্গীত (Folk-songs)

"বাংলাদেশ বানের দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ।" অথবা "বাঙালির গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান।" এরকম লোক-উচ্চারণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো—বান হলে ভাল ধান হয়, ভাল ধান হলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটে, তারা অবসর পায় ও গান-বাদ্য করে আনন্দ প্রকাশ করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ভাল ফসলের উপর কৃষকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, পলিগঠিত সমতল, নরম মাটি, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, উর্বর মাটির অনায়াসলভ্য ফসল ও ঋতুবৈচিত্র্য বাংলার মানুষকে কল্পনাবিলাসী, আবেগধর্মী, শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। অরণ্য-পর্বত-মরু-মেরুবাসীর মতো জীবিকা ও অস্তিত্বের জন্য এদের বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় না। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সাময়িকভাবে ও আঞ্চলিকভাবে বাংলার জনজীবনকে ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করলেও বাংলার মানুষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে এসবের মোকাবেলা করেছে এবং বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত জীবন্ত শাখা হলো লোকসঙ্গীত। উচ্চ সঙ্গীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ। নানা কাঠামোর, নানা ভাবের, বিচিত্র সুরের লোকসঙ্গীত আছে। একক, দ্বৈত ও সমবেত সঙ্গীত আছে; আঞ্চলিক ও সর্ববঙ্গীয় সঙ্গীত আছে; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সঙ্গীত আছে; সাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন সঙ্গীত আছে; মৌসুমি ও সর্বকালীন সঙ্গীত আছে; নারী ও পুরুষভেদে সঙ্গীত আছে; ঘর-জলসার ও মাঠ-ঘাটের সঙ্গীত আছে। যেহেতু সঙ্গীত ভাবপ্রধান, সেহেতু জাতির অন্তর্জীবনের প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ ইত্যাদি বিচিত্র ভাবাবেগ ও মর্মানুভূতির চিত্র এতে স্পন্দিত হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও বৃত্তি সঙ্গীতের ভাব, রস, রুচি ও সুরসৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছে। বাংলার প্রকৃতিও সঙ্গীতের ভাব, রস, সুর ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছে। 'বারমাসির গান' প্রকৃতিভিত্তিক, 'ভাটিয়ালি গান' নদীভিত্তিক, 'ভাওয়াইয়া গান' প্রান্তরভিত্তিক। নদীর গতি, স্রোত, কূল, ঢেউ, পারাপার ভাটিয়ালি গানের ভাব ও সুরকে রূপ দিয়েছে। খোলা মাঠের বিস্তৃতি, রৌদ্রছায়া, দূরদিগন্ত, গাছপালা, মন্থর সময়, ক্লান্ত অপরাহ্ন ভাওয়াইয়া গানের ভাব ও সুরকে রূপ দিয়েছে। ব্রতের পূজা ব্রতের গানের ভাব ও সুরকে প্রভাবিত করেছে; বাউলের ধর্মসাধনা বাউল গানের ভাব ও সুরকে প্রভাবিত করেছে। মোহররমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জারি গানের ভাব ও সুর গঠন করেছে। এভাবে সারি, ঝুমুর, ঘাটু, ভাদো, টুসু, মুর্শিদী, গম্ভীরা ইত্যাদি গানের ভাব ও সুর বিচার করা যায়। বিষয়, উপলক্ষ গানের অবয়ব নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী, আভোগ সম্বলিত দশ-বারো চরণের লোকসঙ্গীত আছে; ব্রতগান, মেয়েলি গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা আকারে এর চেয়ে বড়; বারমাসি গানে ছয় ঋতুব্যাপী দুঃখানুভূতির বিবরণ থাকে, অতএব এ গান বেশ দীর্ঘ হয়। কবির লড়াই, আলকাপ, যাত্রাগান আরো দীর্ঘ হয়, কারণ সারারাত ধরে এগুলি পরিবেশন করতে হয়।

পেশাদার ও অপেশাদার গায়ক গান করে। পেশাদার 'গায়েন' বা 'বয়াতি' দল গঠন করে অর্থের বিনিময়ে আসরে গান গায়। 'কবিওয়াল' দলবল নিয়ে কবির লড়াই-এ অংশগ্রহণ করে। আলকাপের 'ছোকরা' ও ঘাটু গানের 'ঘাটু' পেশাদার গায়ক, উদাস 'বাউল' নিজেই গান করে অধ্যাত্মরসপিপাসা নিবৃত্ত করে। বৈরাগী-বোষ্টমী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বিবাহাদি উপলক্ষে মেয়েলি গীত গাওয়ার জন্য পেশাদার 'গীদাল' আছে। তবে সাধারণ মেয়েরাও গীত গায়; গ্রামের প্রায় সব পরিবারের মেয়েরা গীত জানে, গীত গাইতে পারে, অনুষ্ঠানে অথবা অবসরযাপনে গীত গেয়েও থাকে। খেতে-খামারে কৃষক, মাঠে-প্রান্তরে রাখাল, নদীনালায় মাঝি-মাল্লা, পথে-ঘাটে শ্রমিক নিজেদের চিত্তবিনোদন, অবসরযাপন অথবা শ্রমলাঘবের জন্য গান গায়। কবির ভাষায় এর প্রতিধ্বনি আছে—"কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।"

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। ভাব, চিত্র, কাহিনী অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসঙ্গীত বলা যায়। জর্জ হারজগ (George Herzog) বলেন, "Folksongs are best defined as songs which are current in the repertory of a folk-group."[১] অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "... it is oral circulation that is the best general criterion of what is a folk-song." সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট ও অর্থবাহী নয়। লোকসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ও সুর সংযোগে প্রচারিত রচনাকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়েছে। কে. এইচ. ব্রুকভ্যান্ড বলেন, "The folksong is song with melody, which originated anonymously among unlettered folk in time past and which remained in currency for a considerable time as a rule for centuries."

বাংলা লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ-সঙ্কলন-আলোচনা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসাহিত্য* (৩য় খণ্ড ১৯৬৫), *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর* (৩ খণ্ড), চিত্তরঞ্জন দেবের *পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ* (১৯৫৩), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরীর *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (১৯৭৩), মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের *হারামণি* (বিবিধ খণ্ড), বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্য-সংকলন* (বিভিন্ন খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নানা গ্রন্থের অধ্যায় হিসেবে লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বাংলা লোকসঙ্গীতের বিচিত্র প্রকারভেদ আছে, প্রকারভেদে বিভিন্ন নামও আছে। প্রায় পঞ্চাশোর্ধ গানের নাম এরকম : আলকাপ গান, ওন্নিগান, কবিগান, কীর্তন, খেমটা, ক্ষেত নিড়ানীর গান, গম্ভীরা, গাজন, গাজীর গান, গোসা গান, ঘাটু গান, চটকা, ছাদ পিটানোর গান, জাগ গান, জারি গান, ঝাঁপান, ঝুমুর, তর্জা, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, ধামালী, ধূয়া গান, নাটুয়া গান, নৈলা গান, বৃষ্টির গান, নৌকা বাইচের গান, টুসু, পটুয়া গীত, বাউল গান, বাঘাই শিরনীর গান, বারমাসি, বিচার গান, বিচ্ছেদের গান, বেদের গান/সাপুড়ের গান, বৈঠকি গান, বোলান গান, ব্রতের গান, ভাওয়াইয়া/দোতারা গান, ভাটিয়ালি, ভাঁজো গান, ভাদু গান, রয়ানী, মর্সিয়া গীত, মাইজভাণ্ডারী গান, মাদারের গান, মানিক পীরের গান, মারফতী গান, মালসী, মাহুত বন্ধুর গান, মৈষালী গান, মুর্শিদী গান, মেয়েলি গীত/ সোহেলী গীত, যাত্রাগান, রাখালি গান, লেটোর গান, শিরালীর গান, সাইটোরের গান, সারি গান, হাতি খেদার গান, হাপুর গান, হাবু গান, হোলীর গান, হুদমার গান, হুলোই গান ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের শ্রেণীকরণ করা কঠিন। কোন কোন পণ্ডিত আঞ্চলিক ও সর্বাঞ্চলীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাধারণ ও তত্ত্বপ্রধান, তালযুক্ত ও তালহীন, সংস্কারাগত ও সংস্কারনিরপেক্ষ—এমন স্থূলভাবে ভাগ করে নানা উপ-বিভাগ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য আঞ্চলিক (regional), ব্যবহারিক (functional), আনুষ্ঠানিক (ritual), কর্ম (work) ও প্রেম (love)—এই পাঁচটি ভাগ করেন। আশরাফ সিদ্দিকী আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, হাসিমূলক

---

১. Maria Edward Leach (ed.), *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend* (SDFML), Vol. 1, (New York 1949), 1033.

(humorous), কর্ম, প্রেম ও বারমাসি—এই ছয়টি ভাগ করেন। অঞ্চল, উপলক্ষ ও বিষয়ভিত্তিক এমন মিশ্র বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা বিষয়ভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য একটি শ্রেণীকরণ এভাবে করতে পারি :

> ১. প্রেম; ২. ধর্ম-আচার-সংস্কার; ৩. তত্ত্ব ও ভক্তি; ৪.কর্ম ও শ্রম; ৫. পেশা ও বৃত্তি; ৬. হাস্য-কৌতুক এবং ৭. মিশ্র ভাববিষয়।

বিষয়, অঞ্চল ও উপলক্ষভেদে সঙ্গীতগুলিকে নিম্নরূপ একটি সারণিতে বিন্যাস করা যায় :

সারণি ১

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
প্রেম	আলকাপ	মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী	
	গোসাগ্সন	নোয়াখালী	
	ঘাটু গান	ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা	ঢোল, করতাল, মন্দিরা
	ঝুমুর গান	পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম	খোল, মাদল, করতাল
	বারমাসি	সর্বাঞ্চলীয়	
	বারাশে	পাবনা, ফরিদপুর, যশোর	
	ভাওয়াইয়া	রংপুর,দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,	দোতারা
	মালসী	বগুড়া, রাজশাহী	
	মাহুত বন্ধুর গান		
	রাখালিয়া গান	রংপুর, দিনাজপুর	
	সাম্পান মাঝির গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী	
ধর্ম-আচার-সংস্কার	অহীরা গান	-	-
	কীর্তন	সর্বাঞ্চলীয়	শ্রীখোল, করতাল, মন্দিরা
	গম্ভীরা	মালদহ, রাজশাহী	হারমনিয়াম, তবলা খঞ্জনি, দোতারা
	গাজন	বীরভূম, মালদহ	

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
	গাজীর গান	খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ	-
	জাগ গান	উত্তরবঙ্গ	ঢোল, কাঁসি, নূপুর
	জারি গান	সর্বাঞ্চলীয়	দোতারা, ঢাক, ঢোল
	ঝাঁপান	—	-
	টুসু	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর	-
	ধামাইল গান	শ্রীহট্ট, ঢাকা	-
	নৈলার গান	-	
	বিচ্ছেদী গান	-	-
	ভাঁজো/ ভাদু	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম,	ঢোল
	ভাসান/রয়ানী	ময়মনসিংহ,	
	মাগনের গান	বরিশাল, ফরিদপুর	
	মর্সিয়া গান	মুর্শিদাবাদ,সিলেট	
	শিরালী গান	ময়মনসিংহ, সিলেট	শিঙ্গা
	হুদমা গান	রংপুর, দিনাজপুর	
	হোলীর গান/উরি গান	পশ্চিমবঙ্গ	
	মেছোনী খেলার গান	উত্তরবঙ্গ	
তত্ত্ব ও ভক্তি	বাউল গান	কুষ্টিয়া, যশোর, নদীয়া, খুলনা	একতারা, বাঁয়া
	ভাটিয়ালি	ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ	-
	মাইজভাণ্ডারী গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী	-
বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
	মারফতী গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,কুমিল্লা	
	মুর্শিদী গান	সর্বাঞ্চলীয়	সারিন্দা

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
কর্ম ও শ্রম	ক্ষেত নিড়ানীর গান	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা,সিলেট	সারিন্দা, খঞ্জনি
	ছাদ পিটানোর গান	ঢাকা, ময়মনসিংহ	সারিন্দা
	ধান কাটার গান	সর্বাঞ্চলীয়	সারিন্দা
	ধান ভানার গান	ঐ	-
	পাট কাটার গান	ঐ	-
	হাতি খেদানোর গান	চট্টগ্রাম	-
পেশা ও বৃত্তি	খেমটা	পুরুলিয়া, বীরভূম	-
	পটুয়া গীত	পশ্চিমবঙ্গ	
	পাল্কিওয়ালার গান	-	
	ফেরিওয়ালার গান	-	
	বেদের গান/সাপুড়ে গান	ময়মনসিংহ, ঢাকা	-
	বাওযালীর গান	খুলনা	-
	পুতুলনাচের গান	নদীযা	
হাস্য-কৌতুক	চট্‌কা গান		-
	নাটুয়া গীত	রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মযমনসিংহ	ঢোলক, বাঁশি, বেহালা
	বোলান	মালদহ	
	লেটো	বর্ধমান	-
	হাবু গান	ঢাকা	
মিশ্র ভাববিষয	কবি গান	সর্বাঞ্চলীয়	হারমনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, করতাল, বেহালা
	মেয়েলি/সোহেলী গীত	ঐ	ঢোলক, মন্দিরা
	সারি গান	ঐ	কাঁশী, ঢোল, করতাল

লৌকিক বা পার্থিব প্রেম প্রেমমূলক গানের এবং অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেম তত্ত্ব-ভক্তিমূলক গানের বিষয়বস্তু। প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান অনুভূতি। লোকসঙ্গীতের একটি বিরাট অংশ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। গান ও গীতিকা ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় এভাবে প্রেমের কথা নেই।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমের চিরন্তন প্রতীক। "কানু ছাড়া গীত নেই, রাধা ছাড়া সাধা নেই।" প্রবাদের মধ্যে এর স্বীকৃতি আছে। পার্থিব প্রেম, দেহজ কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অথবা খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রা গান, সারি গান, হোলীর গান ইত্যাদিতে রাধাকৃষ্ণের এধরনের রূপক আছে :

১. ঘাটু গান

কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনী
বনমালী তরুয়া মূলে।
যাইতে যমুনার জলে
সেই কালা কদম তলে
ও রূপ চাইতে কলসী নিল স্রোতে ॥—সিলেট

২. ঝুমুর

শুন গো রাই, বলি তোরে তোর সঙ্গে পিরিতি করে
আমার এই তো হলো ঘটনা।
পরাহিয়ে ফুলের মালা দেখ প্রেম যাতনা দিও না,
গুণমণি চাঁদ বদনি আমায় ভুলে থেক না।
নব নব তরী ভাসে সব গেল তোরি দোষে,
সে তো আমার যাওয়া হলো না ॥ —মেদিনীপুর

৩. চট্‌কা

প্রেম জানে না রসিক কালাচাঁদ,
ও সে ঘুইরে মরে মোন
কতদিনে বঁধুর সনে হইবে দরশন।
হাটিয়া যাইতি নদীর জল
থাকলুম কি
থুকলুম কি
খলাল খলাল করে রে।
হায় হায় পরানের বন্ধুরে ॥ —রংপুর

৪. ধামাইল

যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
এমন মধুর মুরলী ধ্বনি দহিতেছে অঙ্গ।

আয় ললিতে আয় বিশাখে,
শ্যামকে এনে দে,
যায় যদি রাইর কুলমান
পাই যদি তারে
আমার মন হইয়াছে উড়লপাখী
প্রাণে প্রেম তরঙ্গ ॥

৫. বারমাসি

মাঘ না মাসেতে মাধব মতুরায় গমন।
দশদিক খোয়াকার নব বিন্দাবন।
ফাগুন মাসেতে সখি না ফুটে কোন ফুল।
আমার কুঞ্জে নাহি কৃষ্ণ কে করে কার দোল।
চৈত্রেতে চাতক পংখী জল দে জল দে করে
সে ডাক শুনিয়া আমার পরাণ বিদরে ॥ —কুমিল্লা

৬. বিচ্ছেদী

মন দুঃখে মরিবে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে।
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল
শ্রীরাধা বিহনে রে ।।

৭. সারি গান

সুন্দরী লো বাইরইয়া দেখ
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥...
ভাল, আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥—ময়মনসিংহ

৮. হোলীর গান

নিধু বনে শ্যাম কিশোর সনে
খেলব হোলী আয় ॥
শ্যামল বরণ হৃদয় হরণ
আয় আয় সখি ধরি সে চরণ

শ্যাম যেন না পালায় ॥
আবীর ঢালিব শ্যামের গায়
খেলব হোলী আয় ॥

৯. আলকাপ

বনে কানুর বাঁশী বাজিল রে
সুর ও সোহাগে মন মাতিল রে ॥
পুলকে পুলকে উথলিয়া প্রেমে গদগদ হলো হিয়া।
মরমে শরমে আকুল প্রাণে
আমার মন ঘন ঘন বাজিল রে ॥ —মুর্শিদাবাদ

১০. মেয়েলি গীত

হায় গো জলে ঢেউ দিও না সখি
আমি জলের ঘাটে কৃষ্ণরূপ নেহারি।
এক কালা কদম্বতলে,
আর কালা যমুনা জলে
কোন কালা শ্যাম চিনিতে না পারি ॥

দৃষ্টান্তগুলিতে বহু নাম, যেমন রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, বৃন্দাবন, মথুরা, যমুনা, বাঁশি, কদম্ব ইত্যাদি উচ্চারিত হয়েছে, এগুলি সহজেই গাড়িয়াল ভাই, রাখাল, মৈষাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, মাঝি, সওদাগর, বানিয়া, নদী, হাওর, দোতারা, ভ্রমর ইত্যাদিতে পরিণত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত এ-ধরনের গানের অভাবও নেই। "ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।" (ভাওয়াইয়া), "আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু।" (ঐ), "তোর্ষা নদী উতাল পাতাল কার বা চলে নাও।" (ঐ), "আমার বাড়ি যান ও মোর প্রাণের মৈষালরে।" (চট্‌কা), "ও মোর বানিয়া বন্ধুরে।" (ঐ), "সুজন মাঝিরে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।" (ভাটিয়ালি), "ওরে ও ভ্রমরা, নিশীথে যাইও ফুলবনে।" (ঐ), "সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া।" (সারিগান), "আরে শোন রাখাল ভাইরে তোর মায়ে কইছে রে।" (রাখালিয়া গান) ইত্যাদি লোকসঙ্গীতে[২] রূপক-প্রতীক নেই, নিত্য পরিচিত মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির চিত্র আছে। গায়ক-গায়িকা নিজেদের আবেগ ও অনুভূতিকে আড়াল করার প্রয়োজন বোধ করে নি। তারা মনের কথা সহজ ভাষায় অকপটে প্রকাশের 'দুরন্ত সাহস' প্রদর্শন করেছে। "পীরিতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা

---

২. দৃষ্টান্তগুলি বুদ্ধদেব রায় প্রণীত *লোকগীতি-স্বরলিপি* (কলকাতা, ১৯৭৯) থেকে উৎকলিত।

ডোম।", "পীরিত রতন, পীরিত যতন পীরিত গলার হার/পীরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তার।" —প্রেম সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেই পল্লীকবি ও গায়ক 'দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছে; বলা যায়, এটা তাদের প্রেম-দর্শন। তবে এ প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, কন্টকাকীর্ণ ছিল; বিশেষকরে সমাজবন্ধন কঠোর হওয়ায় প্রেমে বিষাদের ও বেদনার সুর ফুটেছে বেশি। "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে ফাঁদ" উক্তিতে এরূপ প্রেমচেতনারই প্রতিফলন আছে। অন্য অভিজ্ঞতাও আছে—যথা "ছোটকালে পীরিত যেন কাঁঠালের আঠা/ছাড়াইলে না ছাড়ে ভাই এ বিষম লেঠা।"

বাংলা লোকসঙ্গীত প্রধানত চিত্রধর্মী। জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র কথায় ও সুরে অবলীলায় রূপ দেয় লোকশিল্পী। "গাও তোল গাও তোল কন্যা হে, কন্যা পেন্দো বিয়ার শাড়ী।", "ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া মাঝি পান খেয়া যাও।", "কত পাষাণ বাইন্দ্যাছ পতি মনেতে।", "জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন।", "লাল নীল চউর বাইয়া, হাটে যাওরে সোনার নাইয়া।" ইত্যাদি প্রেমসঙ্গীতে জীবনের খণ্ড চিত্র আবেগের ভাষায় রূপ পেয়েছে। এগুলিতে দেবভাব নেই, মানবভাবই প্রধান।

তত্ত্ব ও ভক্তিমূলক গানে আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত হয়েছে। দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দয়ালতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব নিয়ে রচিত হয়েছে বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, মাইজভাণ্ডারী গান। প্রধানত বাউল, ফকির, বৈরাগী ও ভক্তশিষ্য এসব গানের চর্চা করে। জীবন, সংসার ও জগৎকে অনিত্য ও দুঃখময় ভেবে তারা আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও মুক্তি খোঁজে। কেউ সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কেউ গুরু-মুর্শিদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।" (বাউল গান), "মন-মাঝি তোর বইঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।" (ভাটিয়ালি গান), "নদীর কূল নাই, কিনার নাইরে।" (ঐ), "ভবনদী পার করে দাও দয়াল মুর্শিদ আমারে।" (মুর্শিদী), "ও কি চমৎকার ভাণ্ডারে এক আজব কারবার।" (মাইজভাণ্ডারী গান) ইত্যাদি এরূপ তত্ত্বসঙ্গীত, যেগুলিতে সংসারবিমুখ ভাব ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে এসব গানে। এদেশের লোকসঙ্গীতে ভক্তিরস এসব গানের মাধ্যমে প্রবেশ করে। ফার্সি গজল ভক্তিরসের উৎস, যা বৈষ্ণব পদাবলীকেও প্রভাবিত করেছে।

ধর্ম, সংস্কার, আচার ও ব্যবহারমূলক আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের ধারা ও সংখ্যা বেশি। প্রেমসঙ্গীত জাতির সাধারণ চিরন্তন সত্তাকে তুলে ধরে, কিন্তু অনুষ্ঠাননির্ভর সঙ্গীত জাতির বিশিষ্ট সত্তাকে ব্যক্ত করে। "আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই" গানে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এমন আবেদন সরাসরি মেঘের দেবতার কাছেও করা হয়—''মেঘ রাজারে তুইনি সুদর ভাই/এক ঝাড়ি মেঘ দে ভিজ্যা ঘরে যাই।" এটি নৈল্যার বা বৃষ্টিপ্রার্থনার গান। মেঘকে দেবতা কল্পনা করে তার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। এটি

আদিম ধর্মবিশ্বাসের ফল : জড়বস্তুতে আত্মা আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মেঘের স্থলে আল্লাহর চেতনা আরোপ করা হয়েছে। ফসলের জন্য বৃষ্টি আবশ্যক। কৃষকের এই চাহিদা আদিম ও অকৃত্রিম। রংপুরের রাজবংশী কৃষকদের মধ্যে 'হুদমার গান' প্রচলিত আছে। হুদমা মেঘের দেবতা, কৃষক রমণীরা ক্ষেতে নগ্নভাবে নাচ-গান করে এবং পানি ঢেলে নকল চাষের অভিনয় করে। তাদের একটি গীত এরকম :

হিল হিলাইছে কমরটা মোর শির শিরাইছে গাও।
কোনঠে কি না গেইলে এলা হুদুমার দেখা পাও ॥
পাটানী খান পড়েছে খসিয়া,
আইসেক রে হুদুমা দেওয়া
তোর বাদে মুই আছ বসিয়া ॥—রংপুর

Like produces like— যাদুবিশ্বাসের এমন ধারণা থেকে বৃষ্টি ও চাষের অভিনয় করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ভাদু, টুসু, জাওয়া গান মূলত ব্রতকেন্দ্রিক। ভাদু ব্রত কুমারী মেয়েরা পালন করে নিজেদের সফল জীবনের আশায় ; জাওয়া শস্যোদ্‌গমের উৎসব (pre-harvest) আর ভাদু শস্যোৎসব (post harvest)। প্রাচীন যুগে লোকের দৃষ্টিতে ভূমির শস্যবতী ও নারীর সন্তানবতী হওয়া অভিন্ন ছিল। হিন্দু নারীসমাজে আরো অনেক ব্রত আছে, যেখানে সন্তান, শস্য, সম্পদ, জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে গান করা, ছড়া বলা ও আলপনা আঁকা হয়, এর সঙ্গে আছে নানা ধরনের স্ত্রী-আচার। এসব ব্রতের আচারে-বিশ্বাসে দেব-দেবী থাকলেও পরকালের মুক্তিচিন্তার স্থলে ইহকালের সুখ-শান্তি কামনা অধিক ব্যক্ত হয়। ব্রতের গানে পারিবারিক জীবনচিত্র ও ব্যবহারিক আবেগ-অনুভূতি ছড়িয়ে আছে।

শিব কৃষির দেবতা। শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন ও গম্ভীরা লোকোৎসব পালিত হয়। শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র নিয়ে গাজন গান রচিত হয়। আসলে এতে কৃষকজীবনেরই প্রতিবিম্ব থাকে :

ধান লাড় ধান লাড়, গোরী, আউলাইয়া মাথার কেশ।
জল চাইলে না দেও জল এই বা কোন দেশ ?
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দিও পানি, দেশ কেন নিন্দ ? —ময়মনসিংহ।

গম্ভীরা গানের জনপ্রিয়তা বেশি। এ গানের দুটি ধারা—একটি শিবের পারিবারিক জীবনচিত্র, অপরটি শিবের কাছে সাংসারিক জীবনের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের বিবরণ। একটি গীতের কয়েকটি চরণ এমন :

শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।

অনাবৃষ্টি করাা সৃষ্টি, মাটি করল্যা নষ্ট হে।
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইর‍্যা, দেখছ নাকি কষ্ট হে ॥—মালদহ

গম্ভীরার এই ধারায় বর্তমানে 'নানা-নাতি'র অভিনয় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের সমালোচনা করা হয়।

ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে বোরো ধান রক্ষা করার জন্য 'শিরালী' নামের ওঝা শিঙ্গা বাজিয়ে ও মন্ত্র গেয়ে মেঘ তাড়ায়। এ প্রথা ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এধরনের কাজ করতে গিয়ে শিরালী বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে।

গোয়াইলার শিরনী ও গোরক্ষনাথের শিরনী আচার পালিত হয় গরুর উদ্দেশ্যে। শস্যের মতো গরুও সম্পদতুল্য। কৃষিকাজে গরুর ব্যবহার অপরিহার্য। গরু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিরনী মানত করা হয়; ঘরে ঘরে গান গেয়ে শিরনীর চাল-ডাল-অর্থ সংগ্রহ করা হয়, একে 'মাগনের গান' বলে।

হিন্দু সমাজে দেব-দেবীর উদ্দেশে যেমন ব্রতগান আছে, মুসলমান সমাজে পীর-পীরানির উদ্দেশে তেমনি 'জাগ গান' আছে। পীরের মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী দীর্ঘ রাত্রি জেগে গাওয়া হয়। গাজী পীর, মাদার পীর, খোযাজ খিজির, মানিক পীর, সোনা পীর ও বদর পীর লোকদৃষ্টিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তাঁরা সন্তানহীনাকে সন্তান দেন, রোগ-ব্যাধি দূর করেন, ধন-সম্পদ দান করেন, গরু-বাছুর রক্ষা করেন। মাগনের গানের মতো জাগ গান গেয়ে শিরনীর চাল-ডাল সংগ্রহ করা হয়। জাগ গানে পীরমাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও এগুলিতে ধর্মভাব সামান্যই আছে, প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক চেতনা ও কল্যাণবুদ্ধিই মুখ্য। গাজী পীরের উদ্দেশে নিবেদিত গান 'গাজীর গান' নামে পরিচিত। সন্তান, স্বাস্থ্য অথবা সম্পদের জন্য মানত করে গাজীর গানের পালার আয়োজন করা হয়। যেহেতু এগুলি আখ্যানধর্মী ও বিবৃতিমূলক, সেহেতু আকারে দীর্ঘ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা সংক্রান্ত জাগ গানও আছে।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'জারি গান' বা শোকসঙ্গীত মোহররম উপলক্ষে গাওয়া হয়। কারবালার শোকাবহ ও বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে ছোট ও বড় আকারের জারি গান প্রচলিত আছে। মহররমের মিছিল, তাজিয়া, দরগাহ, দুলদুল, ইমামবাড়া, মাতম, মর্সিয়া ইত্যাদির সঙ্গে জারি গান ও নাচে ইসলামের শিয়া-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। সখিনার বিলাপকে কেন্দ্র করে রচিত জারি গান করুণ রসে ভরপুর :

নিশি প্রভাতকালে কোকিল বলে, ওরে সখিনা
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকো না

মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তোমার লাল ডিঙ্গাখানা ॥—যশোর

কারবালায় ফোরাত নদী আছে, নদীতে ডিঙ্গাও আছে, কিন্তু কোকিল নেই। নদী-নৌকা-কোকিল বাংলাদেশের চিত্র, এ পটভূমিতে বিলাপ রচিত হয়েছে। মৃত কাসেমের মায়ের বিলাপ এরকম :

ওরে বাপ কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়
হায় হায়।
আমার মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

জারিগান দলীয় সঙ্গীত; গায়েন ও দোহার মিলিতভাবে এ গান পরিবেশন করে। বর্তমানে জারি গানের বিষয়বস্তুর প্রসার ঘটেছে। 'ইসমাইলের কোরবানি' নিয়ে যেমন জারি আছে, তেমনি 'স্বাধীনতা দিবসের জারি'ও আছে।[৩] মোহররম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও মোহররম উপলক্ষে গীত জারি গানে ধর্মরস নেই; ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত জারি গানে মানবহৃদয়ের চিরন্তন আর্তি ও বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। জারি গানের প্রচলন আজও অব্যাহত আছে। নারীরা অন্তঃপুরে একই উপলক্ষে মাতম করে ও গান গায়—একে 'মর্সিয়া' বলে। সখিনার বিরহযাতনা ও আর্তনাদ গানের ভাষায় ও সুরে প্রকাশ পায়। এতে পতিহারা সখিনার ও সাধারণ বিধবার অন্তর্বেদনার মধ্যে তফাত থাকে না।[৪]

কর্মসঙ্গীত নামই প্রমাণ করে এটি শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জড়িত লোকসঙ্গীত। কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা দানের সাথে শ্রমভার লাঘব এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে কর্মসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। ক্ষেত নিড়ানো, ধান-পাট কাটা, ধান ভানা ইত্যাদি কৃষিকাজই প্রধান, তবে দাঁড় টানা, ছাদ পিটানো, জাল বোনা, তাঁত বোনা, মাটি কাটা, ভারী বস্তু টানা বা তোলা ইত্যাদি কাজেও কর্মসঙ্গীতের চর্চা আছে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গীতের কথা ও সুরের সরাসরি সম্পর্ক আছে।

১. ক্ষেত নিড়ানির গান

আয়রে তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই।
ভুঁই মোর গো মাতা-পিতা, ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ। ...
ওগো সপ্ত ডিঙ্গা মুধকরে যত ধান্য ধরে;
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥—ময়মনসিংহ

---

৩. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, (ঢাকা ১৯৭৩)। ২৬১ ; *লোকসাহিত্য সংকলন*, ১৮শ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮১), ৬৩ ।

৪. *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, ২৮৪-৮৫।

২. পাট কাটার গান

পূবের থান আইলো বাতাস নদী হইল এক
দ্যাশ পিরথিমী সাগর কইরা চরায় নামলো ঢল।
জনা ভাইরে ॥
কাঁচি বাগী সঙ্গে লইয়ারে পাট কাটিতে চলো
জনা ভাইরে ॥—ঐ

৩. ধান ভানার গান

আমরা ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পার দিয়া
ঢেঁকি নাচে আমরা নাচি হেলিয়া দুলিয়া
আমরা ধান ভানিরে ॥—ঐ

৪. নৌকা বাইচের গান

রঙের নাও রঙের বৈঠা রঙে রঙে বাও।
পাতাম কাঠের নৌকা আমার উড়াল দিয়া যাও রে
উড়াল দিয়া যাও ॥
রঙে রঙে বাওরে বৈঠা রঙের দোহার গাইয়া
মধুমালার দেশে ডিঙি শীঘ্র যাওরে বাইয়া
রঙের নাও রঙের বৈঠা ॥—ঐ

৫. ছাদ পিটানোর গান

রঙিলা ভাসুর গো, তুমি কেন দেওর হইলা না।
তুমি যদি হইতারে দেওর খাইতা বাটার পান
আর রঙ্গ রসে কইতাম কথা জুড়াইতাম পরাণ ॥—ঢাকা

এসব গান এবং জীবন অভিন্ন। শাস্ত্রকথা ও নীতিকথা শ্রমসঙ্গীতে স্থান পায় নি। জীবনের সাধ-আহ্লাদ, রস-রসিকতা, উল্লাস-স্ফূর্তি গানের কথায়, ছন্দে ও সুরে ছড়িয়ে আছে। "প্রাণ জাগিলেই গান জাগে"[৫] এই কথার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি আছে কর্মসঙ্গীতে।

পটুয়ারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত বৃত্তিজীবী মানুষ; ধর্মবিশ্বাসে না হিন্দু, না মুসলমান। তারা কাগজে, মৃৎভাণ্ডে পট আঁকে এবং পটের চিত্র অনুযায়ী গান রচনা করে, অতঃপর গ্রামে গ্রামে ও হাটে-গঞ্জে পট দেখিয়ে ও গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে। তাদের পটের বিষয়বস্তু

---

৫. প্রাগুক্ত, ২।

রাধাকৃষ্ণ, রাম-সীতা, নিমাই সন্ন্যাস, গাজী পীর ইত্যাদির জীবন ও লীলাকাহিনী। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 'পঞ্চকল্যাণী' পটে শিব, শ্যাম, সীতা, নিমাই ও অসতী নারীর চিত্র আছে; শ্যামসংক্রান্ত পটুয়া গানের কয়েকটি চরণ এরকম :

দেখ ভঙ্গী বাঁকা—

দেখ ভঙ্গী বাঁকা রাখাল সখা কদম্ব তলায়
বাজাইয়া মোহন বেণু গোপীর মন ভুলায় ॥
দেখ কুট্‌না বুড়ী—
দেখ কুট্‌না বুড়ী যুক্তি করে কুমন্ত্রণা দিয়া।
শ্যামের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় দিয়াছে ঘটাইয়া ॥
দেখ কাল ননদী—
দেখ কাল ননদী সদায় বাদী মজায় গণ্ডগোলে।
বলে দাদা, তোমার রাধা গিয়াছে জঙ্গলে ॥

তিনটি চিত্রকে তিন জোড়া চরণে বেঁধে গান রচিত হয়েছে। এ গান চিত্রধর্মী এবং জীবনধর্মী। পটুয়ার মতো বেদেরাও না হিন্দু, না মুসলমান। তারা অর্ধগৃহী, অর্ধ যাযাবর। বর্ষাকালে নৌকায় আশ্রয় নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। সাপ ধরা, সাপ খেলানো ও ওঝাগিরি প্রধান জীবিকা। এছাড়াও নানাবিধ ঔষধ বিক্রয় এবং চুড়ি ও সৌখিন দ্রব্য ফেরি করে তারা অর্থোপার্জন করে। সাপ ধরার মন্ত্র, সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র এবং সাপ খেলানোর গান বেদে নর-নারীর মুখ্য রচনা। রেকর্ডকৃত সাপ খেলানোর একটি গান নিম্নরূপ :

সাপ খেলা দেখবি যদি আয়রে সোনাবউ,
এমনি খেলা সাপের খেলা দেখেনি তো কেউ।
সাপে যখন ফণা ধরে
আলকাতরার মায় কাইনদ্যা মরে
মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ গর্তে চইলা যায় ॥
সাপের বাঁশী যখন বাজে
হেইলা দুইলা সাপ যে নাচে
বাঁশীর সুরে তালে তালে খেলেরে সোনাবউ ॥[৬]—ঢাকা

মনসা ও বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রসঙ্গ তাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু।

---

৬. *লোকগীতি-স্বরলিপি*, ১৪৬।

পুতুলনাচ দেখিয়ে ও গান গেয়ে জীবিকার্জন করে অপর এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। পুতুলনাচের প্রকৃতি ও বিষয় অনুযায়ী গান ছোট-বড় হয়। মঞ্চে যে পুতুলনাচ হয়, তা যৌথ শিল্প; সূত্রধর আড়ালে থেকে পুতুল নাচায়, যন্ত্রী যন্ত্র বাজায়, সরকার গান করে। দীর্ঘ কাহিনী পুতুল নাচিয়ে এবং পাঁচালি, কীর্তন, মালসী সুরে গান গেয়ে পরিবেশন করা হয়। মাঝেমধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। জীবনের খণ্ডচিত্র সম্বলিত পুতুলনাচ ও গান এক ব্যক্তি পরিবেশন করে। দাম্পত্য জীবনের সরস চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এজাতীয় একটি গানে :

ওলো সুন্দরি ! কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি।
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি।
কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি ॥ ...
তুমি আমার রৌদ্রের ছাতা, শীতের কাথা, মশার মশারি।
তুমি আমার রসে ভরা রসগোল্লা, তুমি আমার ডালপুরি।
কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি ॥

সমকালের প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করে আছে পুতুলনাচ ও গান।

ফেরিওয়ালা ফেরি করতে করতে গান করে। আবার ফকির-বৈরাগী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বাওয়ালীরা মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে প্রবেশের মুখে বাঘবন্ধনের মন্ত্র উচ্চারণ করে। হাতিখেদার গান হাতি ধরার উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত হয়। পেশার সঙ্গে রয়েছে এসব গানের নিবিড় সম্পর্ক। কর্ম ও জীবিকা উপলক্ষেই এ গান গাওয়া হয়, অন্য উপলক্ষে নয়। খেমটা নাচ ও গান ব্যবসায়বৃত্তির সঙ্গে জড়িত; এ উদ্দেশ্যে নাচনী দল আছে; এরা বাঈজীর গ্রামীণ সংস্করণ। প্রধানত নপুংসকেরা এ ধরনের নাচ-গান করে জীবিকা অর্জন করে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, লোকোৎসব ইত্যাদিতে নাচনীরা বা খেমটাওয়ালারা আমন্ত্রিত হয়ে যায় এবং নাচ-গান করে দর্শকের মনোরঞ্জন করে। গানের বিষয় লঘু রঙ্গরসাত্মক ও অশ্লীল হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম খেমটা গানের প্রধান বিষয়। চট্টগ্রামে একটি 'সাম্পান মাঝির গানে' গণচেতনা ও জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে :

কর্ণফুলি উজানে
কে কে যায় রে তোরা আমার সাম্পানে ॥
কর্ণফুলির উজানেতে চন্দ্রঘোনা আছে,
পাকিস্তান সরকার সেথায় পেপার মিল কইরাছে।
সেই মিলেতে কাগজ বানায় পাহাড়িয়া বাঁশবনে ॥—চট্টগ্রাম

চটকা, নাটুয়া, বোলান, লেটো, হাবু ইত্যাদি গানে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অশ্লীলতা আছে। এছাড়াও আলকাপ, কবির লড়াই, খেমটা, মেয়েলি গীত, সারি, ঘাটু ইত্যাদি গানও অংশত ব্যঙ্গরসাত্মক। মূলত মনোরঞ্জনই এ ধরনের গানের উদ্দেশ্য। গ্রামজীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-শোক, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মধ্যেও হাসির ঈষৎ রেখাটি যে বিলীন হয়ে যায় নি এসব গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও ঠাট্টা-মস্করার পাত্রকে অবলম্বন করে হাস্যরসের গানগুলি রচিত হয়।

১. চট্কা

আমার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লার মোর মাথা খান।
কাল মুরগীটা ওমন বইস্যাছে।
কন্যা আশা দিলি, ভরসা দিলি,
কলার মোথাত মোক বসাইয়্যা থুলি,
সারা রাইত মোক মশা কামড়াইয়াছে ॥—কোচবিহার

২. নৌকা বাইচের গান

তোরা বাওরে বাও-
রঙীন বাঁশের বৈঠারে মাধব নাইয়ার নাও ॥
উড়িয়া যায় শুয়া পাখী তার পায়ে নেপুর
মাথাত থাবরাইয়া কান্দে বৈরাগী ঠাকুর ॥—সিলেট

৩. মেয়েলি গীত

নয়া দামান আইন্যাছে মিঠাই পঞ্চ দিনের বাসি রে,
মিঠাইর মধ্যে মশা মাছি উড়েরে ॥
নয়া দামান আইন্যাছে শাড়ি পঞ্চ সিকি দাম রে
শাড়ির মধ্যে ভাইয়াব্যাঙ নাচে রে ॥
দামানের মায়ের ক্ষীর খাইয়া
ওলা ভোলা হাসে রে,
এক সের দুধে দশ সের দিছে পানি রে ॥—টাঙ্গাইল

৪. পাট কাটার গান

ষাইট বছর বয়সে নানার মাজ্জায় হইছে বাত।
তবু নানার কথা যেমন ম্যাগে বজ্রপাত ॥

ষাইট বছর বয়স তোমার দন্ত হইছে লুড়া।
ধলা চুলে নানা আমার কবে হইছে বুড়া ॥
ওগো ও সুন্দর নানা শোন মন দিয়া।
এই পাট বেচিয়া তোমার দিমু এক খান বিয়া।
সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত ॥—টাঙ্গাইল

৫. কবির গান

চাপান : এই দুইটা পুলাপান, এদের সাথে কিসের গান।
এরা গানের কি জানে, আসরে উইঠ্যা গল টানে ॥
উতোর : আমরা পুলাপান কি জানি,
জোয়ানের কাম, বুড়ার কেবল হাতানি
আমরা পুলাপান কি জানি ॥—ময়মনসিংহ

সাময়িক উত্তেজনা ও লঘু রসিকতা এসব গানের মৌলিক আবেদন। সাধারণ মানুষের রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা এসব গানে মূর্ত হয়ে আছে।

মিশ্র ভাব ও বিষয় নিয়ে রচিত গানগুলি লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে। কবিগানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক কাহিনী বা সমস্যাদি স্থান পায়। দাঁড়া কবি গানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবিত বিষয় আলোচিত হয়। কবিয়াল স্বভাবকবি, দুই দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ধারায় কবির লড়াই চলে। কবিয়াল কবিতার ভাষায় ছন্দ ও সুর সংযোগে অনর্গল বলে যেতে পারেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি ধর্মীয় ও নীতিবিষয়ক হয়ে থাকে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমাখ্যানকে 'সখীসংবাদ', শ্যামার ভক্তিমূলক গানকে 'ভবানী বিষয়' বলে।[৭] উনিশ শতকে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কবিগানের উৎপত্তি হয়। পরে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবিগানের 'খেউড়' অংশ আদি রসাত্মক; এতে রুচির কোন বালাই থাকে না। 'খিস্তি-খেউড়' কথাটির সেখান থেকেই উৎপত্তি। কবিগান ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, বাদ্য ও ভঙ্গী সংযোগে একটি সাঙ্গীতিক আবহ সৃষ্টি করে। শ্রোতৃগণ সারারাত ধরে তা শুনে মুগ্ধ হয় ও আনন্দ উপভোগ করে।

মেয়েলি গীত নারীসমাজের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ভাব-আলেখ্য। কন্যা-জায়া-জননীরূপে পরিবারে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে সংসারতরঙ্গে যে ভাবলীলা উত্থিত হয়, মেয়েলি গীতে মেয়েলি কণ্ঠে তার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে। কুমারীজীবন, বিবাহিত জীবন ও সংসারজীবনের সুখ-দুঃখের নানা ঘটনা ও বিচিত্র ভাব নিয়ে মেয়েলি গীত রচিত হয়। বিবাহ

৭. *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, ২২৯।

উপলক্ষে রচিত মেয়েলি গীতের সংখ্যা সর্বাধিক। 'কনে দেখা' থেকে শুরু করে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান 'ফিরানী' পর্যন্ত বিবাহের সর্বস্তরের আচার-অনুষ্ঠানে গীত গাওয়া হয়। পুরো বিবাহের আয়োজনটা মেয়েলি আচার এবং মেয়েলি গীত দ্বারা মালাকারে বেষ্টিত। ঢেঁকি যাঁতা, পাটা ইত্যাদিতে কাজ করে ও গীত গেয়ে পল্লীরমণী সারারাত কাটিয়ে দেয়। গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খৎনা, কান ফোটান, সখি পাতান ইত্যাদি উপলক্ষে গীত আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বিরহ ও নাইয়রকেন্দ্রিক মেয়েলি গীতও আছে। এসব গীতে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুটে উঠে; এগুলিতে আধ্যাত্মিকতার বা তত্ত্বের লেশ মাত্র চিহ্ন নেই। "বরের বেটা মারলে চড়, কেঁদে কেটে তারই ঘর।"—এই দর্শনকে সর্বস্ব জ্ঞান করে নারী স্বামীর ঘরে জীবন অতিবাহিত করে। বড় ভাব, বড় চিন্তা গ্রামীণ নারীর সংসারজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব হয় না। এ কারণে তাদের আচার ও গীতে বস্তুমুখী ও ইহমুখী চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সারি গানের সঙ্গে নদী, নৌকা-মাঝি-মাল্লা, পারাপার ইত্যাদি জড়িত আছে। রাধা-কৃষ্ণ, গৌরী-মেনকা, রাম-সীতা লীলাবিষয়ক পুরাণাশ্রিত গান, নিমাই সন্ন্যাসমূলক ইতিহাসাশ্রিত গান এবং নর-নারীর প্রেম-বিরহমূলক বাস্তব জীবনাশ্রিত গান সারিগানের অন্তর্ভুক্ত। নৌকাবাইচ উপলক্ষে গীত সঙ্গীতসমূহ সারিগানের প্রধান অংশ, তবে সাধারণভাবে দাঁড়-গুণ টানা বা পাল তুলে নৌকা চালানোর সময়ও গান গাওয়া হয়। এতে উদ্দীপনামূলক কর্ম ও দেহতত্ত্বের গান স্থান পায় :

১) শ্যাম কালিয়া তোর পিরীতে মইলাম জ্বলিয়া।
ডিঙ্গা সাজাও মাঝি ভাই যমুনাতে যাই;
কোথা আছে দেইখ্যা আসি নাগর কানাই ॥

২) আবের কাকই কিন্‌ন্যা দে, সাধের দেওরাইয়ারে
আবের কাঁকই কিন্‌ন্যা দে ॥
আবের না কাঁকই তাতে চন্দনের ফোটা,
আচড়াইয়া মাথার কেশ করতাম গোটা গোটা ॥

৩) আষাড়িয়া নয়া পানি আইলরে ভাই দেশেতে।
আয় রে ও ভাই আয় রে সবাই আয়রে ডিঙ্গা বাইতে ॥
উথাল পানি উদাস হাওয়া, ঢেউ লাগে তাই অঙ্গেতে।
আইরে ডিঙ্গা বাইতে ॥—টাঙ্গাইল।

৪) মন পবনে বেগ উঠ্‌ঠ্যাছে ভক্তিব বাদাম দেও নৌকায়।
হরি বল নৌকা খোল সাধের জোয়ার যায় ॥

আগের নায়ের মাঝি ভাল,
তরী বাইয়া আগে গেল
গাছের নাইয়া ডাকদ্যা বলে, নাও লাগাইও প্রেমতলায় ।।

এখানে চারটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে; এগুলিতে সারি গানের বিষয়, সুর, তাল ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। গলায় গান এলে ভাবের অভাব হয় না। গান ও জীবন তখন একাকার হযে যায়। সারি গান বাংলার সর্বাঞ্চলীয় ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত।

গীতিকা (Ballads)

গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ জীবনালেখ্য গীতিকা নামে অভিহিত। এর কাহিনী মূলত সরলরৈখিক ও পূর্ণাঙ্গ। গায়েন দোহার ও বাদ্যকর সহযোগে আসরে গান করেন, চারপাশে সমবেত শ্রোতা তা শুনে আবেগে ও আনন্দে আপ্লুত হয়। গীতিকা পাঠেরও উপযোগী ঃ একজন পাঠক কাব্যপাঠের জ্ঞান, আনন্দ ও সৌন্দর্য আহরণ করতে পারে। নাটকীয়তা গীতিকার আরো একটি বৈশিষ্ট্য। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গীতিকার আলেখ্য রচিত হয়। নাটকীয় ঘটনার বর্ণনায় নানা চরিত্রের সংলাপ, ক্রিয়া ও গতি সংবদ্ধ হয়। বিশেষত গায়েন যখন দোহার ও বাদ্যকবেব সাহায্যে আসরে ঘুরেফিরে গীতিকা পরিবেশন করেন, তখন গীত-নাচ-অভিনয়ের সমন্বিত দৃশ্যটি ফুটে উঠে। পরিবেশনের গুণে গীতিকা লোকনাট্যের আমেজ এনে দেয়। পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাতেও গীতিকার বিষয় ও রূপাঙ্গিকগত এসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ম্যাক এডওয়ার্ড লীচ বলেন :

> 1. A ballad is narrative. 2. A ballad is sung. 3. A ballad belongs to the folk in content, style and designation. 4. A ballad focuses on a single incident. 5. A ballad is impersonal, the action moving of itself by dialogue and incident quickly to the end.[৮]

পাশ্চাত্য গীতিকা ঘটনাপ্রধান, বাংলা গীতিকা বর্ণনাপ্রধান। এজন্যই পাশ্চাত্য দেশে ছোট ও বড় উভয় প্রকার গীতিকা আছে। আমাদের দেশের গীতিকা দীর্ঘ। দীনেশচন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১৯২৩) ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৩ খণ্ড) প্রকাশ করেন। এগুলিতে সর্বমোট ৫৪টি গীতিকা আছে। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে *মোমেনশাহী গীতিকা* (১৯৭১), *সিলেট গীতিকা* ও *রংপুর গীতিকা* প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দেব *বাংলার লোক-গীতিকথা* (১৯৮৬) প্রকাশ করেছেন। এখানে ৯টি গীতিকা আছে। সেগুলির অধিকাংশ ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত। পুনরাবৃত্তি ও পাঠান্তর বাদ দিলেও গীতিকার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় শতাধিক।

৮. *SDFML*, 106.

গীতিকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গাথা', 'পালা' ও 'গীতিকথা' শব্দেরও প্রচলন আছে। *মৈমনসিংহ গীতিকার* অন্তর্গত 'মহুয়া'র চরণসংখ্যা ৭৫৫, 'মলুয়া'র চরণসংখ্যা ১,২৪৭। 'মহুয়া'র কবির নাম দ্বিজ কানাই, 'চন্দ্রাবতীর' কবির নাম নয়ান চাঁদ, 'দেওয়ানা মদিনা'র কবির নাম মনসুর বয়াতি। 'দস্যু কেনারামে'র রচয়িতা চন্দ্রাবতী। কবির নাম থাকলেও রচনার মধ্যে কবির স্বতন্ত্র কবিত্ব নেই। মৌখিক ধারার রচনা বলে এতে এক এক গায়েনের প্রভাব পড়েছে এবং এভাবে তা ব্যক্তির রচনা হয়েও সমষ্টির রচনায় রূপান্তরিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের অন্য অনেক রচনার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ বলেন :

> After an individual ballad was imposed, then the folk came in. Ballads were oral. The folk took them over. Through the years of singing them the folk modified them, changed them, improved them sometimes, sometimes debased them, but the folk had their way with them, and over the years put their mark upon them.[৯]

গীতিকা লোকসাহিত্যের নবীনতম শাখা। দীর্ঘ কলেবর, নাট্যগীতের মিশ্র কলারীতি ও অন্যান্য শিল্পগুণ লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে লোকগীতিকা অন্তঃমধ্য যুগের রচনা, প্রাচীনযুগের রচনা নয়। তাঁদের ধারণা, দীক্ষিত লোকমানসই কেবল এরকম রচনা সৃষ্টি করতে পারে।

> Most scholars point out that the ballad is certainly the product of a primitive society, that it is highly artful and rather difficult form, that the music is intimately and fundamentally a part of it. All of this would argue for conscious trained authorship.[১০]

প্রধানত সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও নরনারীর সুখ-দুঃখের জীবনালেখ্য লোকগীতিকার কথাবস্তু। 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা', 'মধুমালা' ইত্যাদির কথাবস্তু রূপকথাধর্মী। বাকি গাথার কাহিনী, চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতা বাস্তব। লোককাহিনীর পাত্র-পাত্রীর নাম নেই, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, রাজকন্যা, পরীকন্যা, রাক্ষস, যাদুগিন্নী, সওদাগর, ধোপা, মালিনী, সন্ন্যাসী, পীর-ফকির ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক নামে তারা পরিচিত; তাদের রাজ্য ও আবাসগৃহও আছে, কিন্তু ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। গাথার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী ব্যক্তিনামে পরিচিত। তাদের ব্যক্তিত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে। তাদের রাজ্য ও আবাসের ঠিকানাও আছে। লোককাহিনীর সমাজকাঠামো আদিম সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু লোকগাথার সমাজকাঠামো মধ্যযুগ অতিক্রম করে যায় না।

---

৯. প্রাগুক্ত, 107.
১০. ঐ, 107.

বাংলার মধ্যযুগ ছিল সামন্তশাসিত; সামন্তসমাজের রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস, সঙ্কট-সংঘর্ষ, প্রেম-প্রীতি, ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-বৃত্তির ভেদাভেদ নিয়ে গীতিকাগুলি রচিত হয়েছে। তবে এখানে ব্যতিক্রমও আছে। মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্য ধর্মাশ্রিত। লোকসাহিত্যের অনেক শাখার মতো গীতিকাও ধর্মানুশাসন থেকে মুক্ত। বাংলা গীতিকায় নরনারীর বাস্তব জীবনের কথা আছে। এ জীবন মর্ত্যমুখী, বৈরাগ্যপন্থী বা স্বর্গমুখী নয়। *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগানে বর্ণিত জীবন ও সমাজ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :

> এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালীর ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষাণ চাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি হয় নাই। এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ঘবে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং বমণীদের জন্য পিঞ্জরা তৈরী হয় নাই।

তাঁর অপর উক্তি :

> এই গীতিকাগুলির নাবীচরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।[১১]

সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা, রুচি ও নৈতিকতার গুণে বাংলার গাথাগুলি স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা বহন করে।

পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানী বিষয়ানুসারে গীতিকাগুলিকে নিম্নরূপ ১২টি ভাগে বিভক্ত করেন :

১. অতিলৌকিক কাহিনীমূলক গীতিকা (ballads of the supernatural)
২. ধর্মীয় গীতিকা (religious ballads)
৩. রোমান্টিক বিয়োগান্তক গীতিকা (romantic tragedies)
৪. প্রেমোপাখ্যান (love and sentiment)
৫. রাখালি গীতিকা (pastorals)
৬. গৃহবিবাদ (domestic tragedies)
৭. ঐতিহাসিক গীতিকা (historical ballads)
৮. অপমৃত্যু ও বিপদ (accident and disaster)
৯. দস্যু (outlaws, pirates)
১০. আঞ্চলিক গীতিকা (regional ballads)
১১. লোকনায়ক (folk-hero)
১২. হাসির কাহিনী (humour)।[১২]

---

১১. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ গীতিকা,* (কলিকাতা ১৯৫৮, ৩য় সংস্করণ) (ভূমিকা)।

১২. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য,* (ঢাকা ১৯৬৩), ৩০৭-০৮।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাগুলিকে দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন—১. মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ২. দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা। তাঁর মতে, বৃহত্তর মৈমনসিংহ হলো পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল আর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল। 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া', 'কাফোন চোর', 'আয়না বিবি', 'কমল সদাগর', 'নুরুন্নেসা ও কবরের কথা' দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত গীতিকা। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের বাণিজ্যিক পেশা, দুঃসাহসিকতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এসব গাথায় প্রকাশিত হয়েছে। সে তুলনায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভাব ও বিষয় অধিকতর মানবিক গুণসম্পন্ন ও মাধুর্যমণ্ডিত। বাংলার এযাবৎ সংগৃহীত সামাজিক, ঐতিহাসিক, অলৌকিক লোকগাথাকে প্রেমমূলক, ধর্মীয়, বীরত্বসূচক, দস্যুতামূলক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামাজিক ও রূপকথাশ্রিত গাথাগুলি অধিকাংশই প্রেমমূলক। ঐতিহাসিক গাথাগুলি বীরত্বব্যঞ্জক। তিন-চারটি গাথায় দস্যুবৃত্তির নিষ্ঠুরতার কথা আছে। পুরাণ-ইতিহাসমিশ্রিত নাথগীতিকা ধর্মাশ্রিত।

গাথাগুলির মৌলিক বিষয় নরনারীর প্রেম—বিবাহপূর্ব প্রেম, বিবাহোত্তর দাম্পত্য প্রেম, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ প্রেম ইত্যাদি। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ১০টি পালার মধ্যে ৯টি প্রেমমূলক, ১টি (দস্যু কেনারামের পালা) দস্যুতামূলক। প্রেম মানবহৃদয়ের মহৎ, বেগবান, চিরন্তন ও সর্বজনীন অনুভূতি। এ শক্তি সীমাহীন ও দুর্বার, প্রেমের জন্য প্রাণ তুচ্ছ বিবেচিত হয়। নিচে একটি সারণিতে গীতিকাগুলিতে উপস্থাপিত প্রেমের বিচিত্র রূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে :

সারণি ২

গীতিকা	নায়ক-নায়িকা	প্রেম-বিবাহ	প্রতিনায়ক/ প্রতিনায়িকা/ খলচরিত্র	প্রতিবন্ধকতা	পরিণাম
১	২	৩	৪	৫	৬
মহুয়া	মহুয়া (বেদের পালিত কন্যা), নদের চাঁদ (সম্পন্ন জোতদার)	বিবাহপূর্ব অসম প্রেম	সওদাগর ও সন্ন্যাসী	পালক পিতার দলীয় ও ব্যবসায়িক স্বার্থ	বিয়োগান্তক (বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে মহুয়ার আত্মহত্যা)
মলুয়া	মলুয়া (কৃষককন্যা) চান্দ বিনোদ (কৃষকপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	কাজী (সামন্ত প্রতিনিধি)	প্রতিনায়কের পরদারলোলু-পতা ও কামচেতনা	বিয়োগান্তক (মলুয়ার নদীতে আত্মবিসর্জন)

১	২	৩	৪	৫	৬
চন্দ্রাবতী	চন্দ্রাবতী (ব্রাহ্মণকন্যা), জয়ানন্দ (ব্রাহ্মণপুত্র)	সমস্তরে বিবাহপূর্ব প্রেম	যবনকন্যা (বিধর্মী)	জয়ানন্দের প্রতারণা ও ধর্মান্তর গ্রহণ	বিয়োগান্তক (জয়ানন্দের নদীতে আত্মবিসর্জন)
কমলা	কমলা (জোতদারকন্যা), প্রদীপকুমার (জমিদারপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	কারকুন (কর্মচারী)	কারকুনের ব্যর্থ প্রেম ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা	মিলনাত্মক
দেওয়ান ভাবনা	সুনাই (ব্রাহ্মণ-কন্যা), মাধব (ব্রাহ্মণপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	দেওয়ান (সামন্ত প্রতিনিধি)	দেওয়ানের পরদার-লোলুপতা	বিয়োগান্তক (বিষপানে সুনাই -এর আত্মহত্যা)
রূপবতী	রূপবতী(রাজকন্যা), মদন (গৃহভৃত্য)	অসম বিবাহ	নবাব (সামন্ত প্রভু)	নবাবের রূপজ মোহ ও ভোগবাসনা	মিলনাত্মক
কঙ্ক ও লীলা	লীলা (ব্রাহ্মণকন্যা' কঙ্ক (পালিত চণ্ডালপুত্র)	বিবাহপূর্ব অসবর্ণ প্রেম	-	পিতা গর্গের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার	বিয়োগান্তক (বিরহ- যাতনায় লীলার মৃত্যু)
দেওয়ানা মদিনা	মদিনা(কৃষক-কন্যা), দুলাল (দেওয়ানপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	-	ভ্রাতা আলালের বংশীয় আভিজাত্য -চেতনা	বিয়োগান্তক (বিরহ -যাতনায় মদিনার মৃত্যু)
কাজল রেখা	কাজলরেখা (সওদাগরকন্যা), সূচরাজা (রাজপুত্র)	অসবর্ণ বিবাহ	কঙ্কণ দাসী	প্রতিনায়িকার প্রতারণা	মিলনাত্মক
ধোপার পাট	কাঞ্চনমালা (বণিককন্যা), জমিদারপুত্র	সমস্তরে বিবাহ	রুক্মিনী	প্রতিনায়িকার ঈর্ষাকাতরতা ও প্রতারণা	বিয়োগান্তক (কাঞ্চনমালার নদীতে আত্মবিসর্জন)

১	২	৩	৪	৫	৬
মৈষাল বন্ধু	সাজুতী (মহাজন-কন্যা), ডিঙ্গাধর (কৃষকপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	মঘুয়া ও কাঙ্গু রাজা (সামন্ত প্রভু)	বণিক মঘুয়া ও কাঙ্গুরাজার রূপজ মোহ ও কাম-প্রবৃত্তি	মিলনাত্মক
ভেলুয়া	ভেলুয়া (মহাজন-কন্যা), মদন (বণিকপুত্র)	বিবাহপূর্ব প্রেম ও বিবাহ	আবু রাজা (সামন্ত প্রভু)	প্রতিনায়কের রূপজ মোহ ও কামপ্রবৃত্তি,	মিলনাত্মক
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান	সখিনা (রাজকন্যা), ফিরোজ খাঁ (রাজা)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	-	পিতা উমর খাঁর প্রতিহিংসা-বৃত্তি	বিয়োগান্তক (স্বামীর তালাকনামা পেয়ে সখিনার আকস্মিক মৃত্যু)
মাঞ্জুরমা	মাঞ্জুরমা (গৃহস্থ-কন্যা), মনির ওঝা (বেদে)	বয়সগত বিসম বিবাহ	তরুণ হাসেন	প্রতিনায়কের সঙ্গে গৃহত্যাগ	বিয়োগান্তক (বৃদ্ধ মনিরের নদীতে আত্মবিসর্জন)
আয়না বিবি	আয়না বিবি (অনাথ কন্যা), মাসুদ উজ্জাল (সওদাগর পুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	--	মিথ্যা অপবাদ ও অবিচার	বিয়োগান্তক (আয়না বিবির আত্মহত্যা)
শ্যামরায়	ডোমকন্যা, শ্যাম রায় (রাজপুত্র)	অসবর্ণ পরকীয়া প্রেম ও বিবাহ	গাবর রাজা (সামন্ত প্রভু)	প্রতিনায়কের রূপতৃষ্ণা ও যৌনলালসা	বিয়োগান্তক (যুদ্ধে নিহত স্বামীর চিতায় সহমরণ বরণ)
শীলা-দেবী	শীলা (রাজকন্যা), রাজপুত্র	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	মুণ্ডা দস্যু	মুণ্ডার রূপজ মোহ ও কামপ্রবৃত্তি	বিয়োগান্তক (যুদ্ধে রাজ-পুত্রের মৃত্যু)
মুকুট রায়	রাজকুমারী, মুকুট রায় (রাজপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	-	-	মিলনাত্মক

১	২	৩	৪	৫	৬
বগুলার বারমাসি	বগুলা (রাজকন্যা), বণিকপুত্র	অসবর্ণ বিবাহ	প্রণয়বঞ্চিত রাজপুত্র	প্রতিনায়কের রূপজ মোহ ও পরকীয়া প্রেম	মিলনাত্মক
ফুল-কুমারী	ফুলকুমারী (কৃষককন্যা), সোনামিয়া (জমিদারপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	পরিবারের আভিজাত্যের গৌরব চেতনা	বিয়োগান্তক (বিরহ যন্ত্রণায়) প্রথমে নায়ক ও পরে নায়িকার মৃত্যু	

সারণিতে উল্লেখিত ২০টি গাথার মধ্যে ১৯টি গাথা *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* থেকে সঙ্কলিত। গাথাগুলিতে নায়ক-নায়িকা বর্ণ-বিত্ত-কুল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের ও কেউ অসমস্তরের। পরিণত বয়সে বিবাহ বা বিবাহপূর্ব প্রেম গাথা ছাড়া অন্য কোন রচনায় দুর্লভ। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপতি, সামন্ত প্রতিনিধি ও অন্যান্য বলবান ব্যক্তির রূপতৃষ্ণা, প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি, ভোগলালসার কথা আছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, উচ্চবর্গের ইন্দ্রিয়াসক্তি, সম্ভোগপ্রিয়তা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, সমাজের রক্ষণশীলতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, বহুবিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ এসব প্রেমগাথায় স্থান পেয়েছে। সারণির ২০টি গাথার মধ্যে ১২টি বিয়োগান্তক, ৮টি মিলনাত্মক। ভারতীয় কাহিনীতে বিরহ আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই; প্রয়োজনে এমনকি স্বর্গেও মিলন দেখানো হয়েছে। আরবীয়-ইরানী কাহিনী বিয়োগান্তক, সুফিতত্ত্বে আত্মা-পরমাত্মার প্রেম অনন্ত ও অতৃপ্ত। এজন্য কাহিনীকাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলন দেখানো হয় নি। গাথাগুলিতে প্রেমের মিলন ও মৃত্যুর বিবরণ সমাজ ও মানবজীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। এটিও বাংলা গাথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কৃষকপরিবার থেকে শুরু করে ধোপা, ডোম, বেদে, ব্রাহ্মণ, বণিক, জোতদার, রাজপরিবার পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর বিবরণ আছে। এতে কল্পনার আশ্রয় নেই, বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। বিষয় নির্বাচনে লোককবির স্বাধীনতা ও সমাজমনস্কতার কারণে মধ্যযুগের গাথাগুলিকে উপন্যাসকল্প রচনা বলা যায়। মধ্যযুগে ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানী কাহিনী অবলম্বনে *ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, সপ্ত পয়কর, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, গুলে বকাওলী* কাব্য রচিত হয়। গাথা রচনার প্রেরণা এসব রোমান্স কাব্য। রোমান্সের অনুসরণে নায়িকার অথবা নায়ক-নায়িকার নামে গাথার নামকরণ হয়েছে। মধ্যযুগেই গাথা রচনার শুরু ও সমাপ্তি, তবে গায়েন কর্তৃক এগুলি পরিবেশন এবং সাধারণ মানুষ কর্তৃক উপভোগ পরবর্তী যুগে অনেকাংশে হ্রাস পেলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

ময়মনসিংহে বোড়ো, হাজং, কোচ আদিবাসী বসবাস করে; তাদের ঐতিহ্য মাতৃতান্ত্রিক। পূর্ববঙ্গের গীতিকার নায়িকারা প্রেমের প্রকাশে ও পাত্র নির্বাচনে যেরকম স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছে তাতে মাতৃতান্ত্রিকতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সকালে উঠে যার মুখ দেখবেন, তার হাতে কন্যা সমর্পণ করবেন 'রূপবতী' পালার রাজা রামচন্দ্রের এমনি অভিপ্রায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; অতএব পাত্র নির্বাচনে পিতা ছিলেন নিঃশঙ্ক। রূপবতী পালায় এ-চেতনাই প্রস্তরীভূত (crystalised) হয়ে আছে। 'মানিকচন্দ্রের গানে' মা ময়নামতী মন্ত্রগুণী; সে মন্ত্রের সাহায্যে সতীত্ব পরীক্ষায় (chastity test) উত্তীর্ণ হয়েছে ও অন্যান্য বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এতে প্রাচীন যাদুবিশ্বাস ও সংস্কারই আছে। 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে ভারইয়া রাজা ও বীরসিংহের মধ্যে মন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এ যুদ্ধ হতো দ্বৈত, এমনকি রাক্ষসের বিরুদ্ধে নায়ক যুদ্ধ করে বাহুবলে শত্রু নিধন করে জয়ী হয়।

অধিকাংশ প্রেম-পরিণয়ে ধর্ম-বর্ণ-বিত্তে অসম স্তর লক্ষ্য করা যায়। পল্লীকবিগণ এসব গাথা রচনা করে সামাজিক উদারতা ও বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। লীলার প্রেমলীলা পিতা গর্গ সমর্থন করেন নি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কারণে। অনুলোম বিবাহ সমাজ মেনে নেবে না। প্রতিলোম বিবাহও সমাজ মেনে নেবে না বলে ডোমকন্যার সাথে শ্যাম রায়ের প্রেম বিবাহের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে নি। ডোমকন্যার মুখ দিয়ে কবি বলেন, "ছোটর সঙ্গে বড়র পীরিত বড়র জাতি যায় রে বন্ধু।" 'ধোপাব পাটে' ধোপাকন্যা কাঞ্চনমালা ও জমিদারপুত্রের প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। আভিজাত্যচেতনা থেকেই জমিদারপুত্র জমিদারকন্যা রুক্মিনীর পাণিগ্রহণ করে; বাল্যপ্রণয়ী কাঞ্চনমালাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কাঞ্চনমালার পিতা বলেন, "বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অগঠন।" আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার কারণে দেওয়ানপুত্র দুলাল স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে। সে পুত্রকে বলেছে, "অসম্মানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া।" মদিনা কৃষককন্যা, ধনী ও উচ্চ দেওয়ানপরিবারে তার স্থান নেই। দুলাল মদিনাকে তালাক দেয়। 'ফুলকুমারী গাথা'র ফুলকুমারী কাজেম পাটনীর মেয়ে, জমিদারপুত্র সোনা মিয়া প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করতে চাইলে বংশের অমর্যাদার কথা ভেবে মা বাধ সাধেন, সোনা মিয়া বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ বিসর্জন দেয়। ফুলকুমারী তা জানতে পেরে উন্মাদিনী হয়ে যায়। এর পরিণাম বিয়োগান্তক।[১৩]

জয়ানন্দ যবনীকন্যার রূপজমোহে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বাল্যপ্রণয়ী চন্দ্রাবতী তাকে প্রত্যাখ্যান করে, পরবর্তী সময়ে অনুতপ্ত জয়ানন্দ প্রেমভিক্ষা করেও ক্ষমা পায় নি। কেননা, "অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার/যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।" এ সংস্কার

---

১৩. প্রাগুক্ত, ২৯৯-৩০০।

ধর্মভেদের। চন্দ্রাবতী ও বংশীদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ; চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' এবং বংশীদাস 'মনসাভাসান' রচনা করেন। তাঁরা ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। বংশীদাসের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার 'যবনী'কে ক্ষমা করতে পারে নি, কিন্তু অবিবাহিত কন্যাকে ঘরে রেখেছেন সমাজের চক্ষুকে উপেক্ষা করে। এমনকি, বাল্যপ্রণয়ও সমর্থিত হয়েছে। গাথারচয়িতারা গৌরীদান প্রথার কথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। এখানেই তাঁরা বিপ্লব এনেছেন। যাযাবর বেদে সম্প্রদায় অনেক কিছুতে সংস্কারমুক্ত; বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতী স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। কিন্তু অবাধ মেলামেশা করার এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়। এটা গোত্রচেতনার ফল : স্ব-গোত্রবিবাহ (endogamy) সমর্থন পায়, ভিন্ন গোত্রবিবাহ (exogamy) সমর্থন পায় না। হুমরা বেদে পালিত কন্যা মহুয়ার মনোনীত পাত্র জোতদার নদের চাঁদকে 'দুষ্মন' ভেবেছে; তার মতে 'সুজন খেলোযার' যোগ্যপাত্র। "আমার পালকপুত্র সুজন খেলোয়ার। বিয়া তারে কর কন্যা চলো মোদের সাথ।" দলনায়ক হিসেবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব তার, এর জন্য সে নদের চাঁদকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি।

প্রতিনায়কের ভূমিকায রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজি, সওদাগর, সন্ন্যাসী, সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি চরিত্রই বেশি এসেছে। তারা অর্থশালী ও ক্ষমতাবান সামন্ত শ্রেণীভুক্ত। তারা ইন্দ্রিয়ের দাস—ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ, অপহরণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কূটকৌশল সর্বকিছুবই আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলা লোকগাথায় এ ধরনের চরিত্র এসেছে সামন্ত সমাজে বিরাজমান বাস্তব অবস্থাব কারণেই। গাথাকারগণ শ্রেণীচরিত্র হিসেবে এদের ঠিকভাবেই চিহ্নিত ও চিত্রিত করেছেন।

লোককাহিনী (Folktales)

গল্প শোনা মানুষেব চিরন্তন বাসনা। শিশুরা রূপকথার বিচিত্র গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে, তরুণ-যুবক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করে, শ্রমজীবী মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প শুনে আনন্দ পায় ও কাজের প্রেরণা লাভ করে, পথিক বিশ্রামের সময় গল্প শুনে অবসর যাপন করে, শ্রমণ-যাজক-মোল্লা-পুরোহিত গল্প বলে ধর্মকথা, নীতিকথা প্রচার করে। সকল বয়সের মানুষের জন্য গল্প আছে; গল্পের উপযোগিতাও আছে, আছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা। গল্প মূলত আনন্দ দান করে; চিত্তবিনোদনের ও অবসরযাপনের উৎকৃষ্ট উপায় তা। গল্প ধর্ম-নীতি-জ্ঞান শিক্ষাদানও করে। গল্প গদ্যে রচিত। গল্প বলা হয়; যেকেউ গল্প বলতে পারে; তবে কথকের গল্পের আমেজ ও আকর্ষণ অতুলনীয়। বলার ভঙ্গি দ্বারা কথক গল্পে প্রাণসঞ্চার করে। এক অনুচ্ছেদের ছোট গল্প থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত বলা যায় এমন বড় গল্পও আছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-অন্তরীক্ষ পর্যন্ত গল্পের

আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত; দেব-দৈত্য-জ্বীন-পরী-রাক্ষস খোক্ষস-ভূতপ্রেত-ডাইনী, রাজা-প্রজা, সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-ফকির, কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, পশু-পাখী, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত্রি অজস্র বিষয় নিয়ে গল্প রচিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই গল্প লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এ জনপ্রিয়তা এ যুগেও অক্ষুণ্ন আছে। তবে নগরসভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবের ফলে তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে রচিত বর্ণনামূলক গল্পকে লোককাহিনী বলা হয়। ছোট হোক, বড় হোক কাহিনীটি হবে পূর্ণাঙ্গ। একক ও সরলরৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমন বিচিত্র শাখাসম্বলিত জটিল গল্পও আছে। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর গল্প আকারে ছোট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প বড় হয়। লোককাহিনীতে এক বা একাধিক 'মটিফ' (motif) থাকে। আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী স্টিথ থম্পসনের মতে, মটিফ হলো কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা ঐতিহ্যে বেঁচে থাকার মতো ক্ষমতা রাখে।[১৪] এ উদ্দেশ্যে মটিফের মধ্যে কিছু অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় গুণ থাকে। রাশিয়ার লোকবিজ্ঞানী ভ্লাদিমির জে প্রপ একটি লোককাহিনীর অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার (function) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাহিনীর ঘটনাসমূহের কর্তা যা করে, তাই ক্রিয়াশীলতা। এই ক্রিয়াশীলতা স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয়। গল্পের মৌল কাঠামো এক বা একাধিক ক্রিয়াশীলতা দ্বারা গঠিত হয়।[১৫]

বিশ্বে লোককাহিনীর উপর গবেষণা হয়েছে বেশি; এ বিষয়ে গবেষণার পদ্ধতিও বিবিধ, যথা :

১. তুলনামূলক পদ্ধতি;
২. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি;
৩. নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি;
৪. সমাজতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পদ্ধতি;
৫. মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি;
৬. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি।

---

১৪. A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. Stith Thompson, *The Folktales*, (New York 1956), 415.

১৫. Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its significance for the cause of action. Functions of characters serve as stalle, contrast elements in a tale, independent of how and by whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale.

V.J. Propp, *Morphology of Folktale* (University of Texas Press, 1968), 14; মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপদ্ধতি*, (কলকাতা ১৯৮২), ১২।

এর সঙ্গে লোককাহিনীর শ্রেণীকরণেরও চেষ্টা হয়েছে। ফিনল্যান্ডের লোকবিজ্ঞানী এ্যান্টি আর্নী স্টিথ থম্পসনের সহযোগিতায় বিশ্বের লোককাহিনীকে মোট ২৪৯৯ টি টাইপে (type) বিভক্ত করেন। তাঁদের মতে, জীবজন্তুর গল্পে ১-২৯৯ টি, রূপকথা-ম্যাজিক-রোমাঞ্চের গল্পে ৩০০-১১৯৯টি এবং হাসির গল্পে ১২০০-২৪৯৯টি টাইপ আছে।[১৬] থম্পসনের মতে, টাইপ হলো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী জনশ্রুতিমূলক কাহিনী, যা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হিসেবে পরিবেশিত হয় এবং যার ব্যাখ্যার জন্য অন্য কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় না।[১৭]

রাজপুত্র বড় হলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশপথে উড়াল দিল। জনমানবহীন রাজপুরীর এক কক্ষে এক ঘুমন্ত রাজকন্যাকে দেখলো, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি পা-মাথার দিক বদল করে তাকে জাগিয়ে তুললো। রাজপুত্র রাজকন্যার কাছ থেকে রাক্ষসপুরীর ও রাক্ষসহত্যার খবর জানলো। রাজপুত্র কৌশলে পুকুরের তলদেশে কৌটায় রক্ষিত ভ্রমর হত্যা করে রাক্ষস নিধন করলো। অতঃপর সে রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহ করলো এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলো। এ কাহিনীর টাইপ হলো 'রাক্ষসহত্যাকারীর কাহিনী' (টাইপ ৩০০)। এতে একাধিক মটিফ আছে—পাখাওয়ালা পক্ষীরাজ ঘোড়া মটিফ-বি, অজানা-অচেনা রাক্ষসপুরী মটিফ-ই, মন্ত্রপূত সোনার কাঠি, রূপার কাঠি মটিফ-ডি, রাক্ষসদের আত্মার প্রতীক ভ্রমর মটিফ-বি, রাজকন্যাকে বিবাহ মটিফ-টি ইত্যাদি। রাজপুত্রের অজানার উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা, রাক্ষসের আবির্ভাব, রাজপুত্র ও রাক্ষসের দ্বন্দ্বে রাক্ষসহত্যা, রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহ এবং উভয়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—এই চারটি হলো ক্রিয়াশীলতা।

পাশ্চাত্যের এবং দেশের সমালোচকগণ বিষয় (theme), বিচারে অর্থ (meaning) ও রূপকল্প (form) বিচারে লোককাহিনীর শ্রেণীকরণ করেছেন। তাঁদের অনুসরণে একটি গ্রহণযোগ্য বিভাগের উল্লেখ নিচে করা হলো :

১. রূপকথা (fairy tale) ;
২. ব্রতকথা (religious tale) ;
৩. রোমাঞ্চকর কাহিনী (novella) ;
৪. বীরকাহিনী (hero tale) ;
৫. সন্তকাহিনী (sage tale) ;

---

১৬. Antti Arne and Stith Thompson, *The Types of Folktales*, (Helsinki 1964); আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৬৩), ১৮৯-৯১।

১৭. A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale. *The Types of Folktales*, 415.

৬. পুরাকাহিনী (myth) ;

৭. স্থানিক কাহিনী (legend) ;

৮. পশুকাহিনী (animal tale) ;

৯. নীতিকথা (fables) ;

১০. হাস্য-ব্যঙ্গের কাহিনী (humorous tale) ;

১১. ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী (explanatory tale)।[১৮]

বাংলাদেশে প্রায় সব শ্রেণীর লোককাহিনী আছে। নভেলা বা রোমাঞ্চকর কাহিনীর উর্বর ভূমি আরব-পারস্য। 'আলি বাবা ও চল্লিশ চোর', 'হাতেম তাই', 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল', 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ' ইত্যাদি কাহিনী *আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা* গ্রন্থ থেকে আগত। 'মধুমালা', 'রূপভান', 'চন্দ্রাবতী' ইত্যাদি দেশীয় কাহিনী। আমাদের দেশে বীরকাহিনীর অভাব আছে। *ধর্মমঙ্গল*-এর নায়ক লাউসেন একমাত্র বীরচরিত্র; তবে এ কাব্যের জনপ্রিয়তা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন রাজপরিবার, রাজবংশ নেই। বাংলার মানুষ যুগ যুগ ধরে শাসিত ও শোষিত হয়েছে। রাজারা বহিরাগত। এজন্য রাজত্বের শেষে রাজবংশ লোপ পেয়েছে। *মনসামঙ্গল*-এর চাঁদ সওদাগর প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, নির্ভীক চরিত্র। তাঁর মধ্যে সাফারিং আছে বটে, কিন্তু ডুয়িং নেই, এজন্য বীর হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি নেই। বাংলার লোককাহিনীর নায়ক-নায়িকা দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল, কর্মের উপর নয় অর্থাৎ তারা দৈববলে বলীয়ান, বাহুবলে নয়। ভারতীয় কাহিনীর বৈশিষ্ট্য তাই। ভারতীয় কাহিনীতে রক্ষাকর্তা বা উদ্ধারকারী শক্তি দেবতা; ইউরোপের লোককাহিনীতে ত্রাণকর্তা বা সহায়কশক্তি ধর্মযাজক বা সন্ন্যাসী; আফ্রিকার লোককাহিনীতে এ কাজটি প্রেতাত্মা সম্পন্ন করে।[১৯] দেববাদ, অদৃষ্টবাদ ছাড়াও বাংলার নায়ক-নায়িকা যাদুবিদ্যার উপরও নির্ভর করে। শ্রম বা সংগ্রাম করে কোন কিছু অর্জন করার চেয়ে অলৌকিকভাবে অনায়াসে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তারা। ভোগবাদী কর্মকুণ্ঠ চেতনা থেকে এমন মনোভাবের জন্ম। মন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এ সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হয়েছে। এটিকে বাংলার মানুষের জাতীয় চরিত্ররূপে চিহ্নিত করা যায়। সুকুমার সেন বলেন, এতে অনার্যের প্রভাব আছে। কোল-মুণ্ডা, সাঁওতালরা দৈব-অদৃষ্ট-যাদুর উপর বিশ্বাসী; তাদের ব্যবহারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক কিছুই এরকম বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। গুপ্তধন, পৈত্রিক সম্পদ, দান-যৌতুক, লুণ্ঠন ইত্যাদি উপায়ে আমাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি; মেধা, বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা অর্জনের আগ্রহ বা ধৈর্য কম।

১৮. *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ৪৪৫-৪৭; লোকসাহিত্য, ১৮৭-৮৯; মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক্-দিগন্ত*, (ঢাকা ১৯৬৮), ৬-১৭।

১৯. *ফোকলোর চর্চায় রূপাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপদ্ধতি*, ১১।

বাংলা লোককাহিনীতে মানবজীবন ও সমাজের অজস্র ছবি আছে। জাতির অনেক অজানা ইতিহাস এতে প্রচ্ছন্ন আছে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ নিয়ে গল্প আছে। তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে এই ইতিহাস বেরিয়ে আসে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, জন্মান্তরবাদ, সতীনবিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা, সবলের অত্যাচার, ধনীর ধনলিপ্সা, দরিদ্রের দুর্ভোগ, ধন ও বর্ণবৈষম্য, জাতি ও ধর্মভেদ, কৌলীন্যবিচার, দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা, দান-ধ্যান ইত্যাদি বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের ছবি লোককাহিনীতে পাওয়া যায়। পূর্বের গল্পসারে জনশূন্য রাক্ষসপুরীতে রাজপুত্রের গমন মৃত্যুলোকের অন্ধকারে গমনের প্রতীক, সোনা ও রূপার কাঠি দ্বারা রাজকন্যার নিদ্রা ও জাগরণ জন্ম-মৃত্যুর প্রতীক, রাজকন্যাকে উদ্ধার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পুনর্জন্মলাভের রূপক—এভাবে ব্যাখ্যা করেন কেউ কেউ।[২০] রাজা হলে সাত রানীর কথা আসে, ছোট রানী রাজার প্রিয়পাত্রী হন, অন্য রানীরা ঈর্ষাবশত তাঁকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলেন, ছোট রানী শেষ পর্যন্ত সফল হন এবং সুখী হন। এতে স্পষ্টতই বহুবিবাহের কথা আছে; বহুবিবাহের কুফলেরও কথা আছে। ছোট রানীর সফল হওয়াটা মটিফ-এল (successful youngest queen)।

ঠাকুরমার ঝুলির লালকমল-নীলকমল গল্পে কনিষ্ঠপুত্রের সফলতার কথা আছে। অপ্রতিশ্রুতিশীল সন্তানও শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য ও বিজয়ী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। *ঢাকার লোককাহিনীর* অন্তর্গত চূড়ামণি কিস্‌সার সাতটি গল্পের প্রথম গল্পের নায়ক রাজপুত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়; পিতা তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু সে প্রাণে বাঁচে এবং সর্পদংশনে মৃত রাজকন্যাকে জীবিত করে ও বিবাহ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। উভয়ে সাদরে গৃহীত হয়।[২১] তার সাফল্যের মূলে আছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীকথিত গুপ্তবিদ্যা—গাছের মন্ত্রপূত পাতা খেয়ে রাজপুত্র অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয় এবং অসাধ্য সাধন করে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম গল্পে রাজপরিবারে বাল্যবিবাহের কথা আছে। চূড়ামণি কিস্‌সার ষষ্ঠ গল্পের রাজকন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করেছে, স্বামী এলে উপপতির প্ররোচনায় তাকে হত্যা করেছে।[২২] এতে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। তবে এ প্রতিবাদ সমাজের কানে পৌঁছে নি, এ প্রথাও লোপ পায় নি। গল্পে প্রধানত রাজা সরল প্রকৃতির ও উজির কুটিল প্রকৃতির হন। সওদাগর লোভী ও কামুক, মালী-নাপিত লোভী ও দুর্বলচিত্ত, সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-দরবেশ সৎ ও অসৎ, জোলা ও জামাতা নির্বোধ, বামুন চতুর হয়।

---

২০. প্রাগুক্ত।

২১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *ঢাকার লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮০), ৩-১৯।

২২. ঐ, ৭৩-৮৬।

এর পাশাপাশি পশু-পাখির জগতে অনুরূপ চিত্র ও চরিত্র বর্ণিত হয়। শুক-সারি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী উপকারী পাখি (benevolent bird), শৃগাল-কাক চতুর প্রাণী, কুমীর-বাঘ বোকা, বক ও মেষ সরল প্রকৃতির জীব। জীবজন্তু বিষয়ক গল্পে এ ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। চতুর কাক কলসীতে নুড়ি ফেলে তলার পানি পান করতে সক্ষম হয়। আবার যে কাক চড়ুই-এর বুকের মাংস খেতে চেয়েছিল, সে শেষ পর্যন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। এ হলো হিংসার পরিণাম—এ গল্পের এটাই নীতিশিক্ষা। প্রথম গল্পের শিক্ষা হলো—"ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।" পশু-পাখি সংক্রান্ত সকল গল্পেরই কোন না কোন উপদেশ বা নীতিকথা আছে। ক্ষুদ্র ইঁদুর জাল কেটে বন্দি সিংহকে মুক্ত করে—এটি পরোপকারের দৃষ্টান্ত। বাঘের গলার কাঁটা তুলে বক রেহাই পায় নি, তার আক্রমণে প্রাণ হারায়—এটা হলো কৃতঘ্নতা। খাঁচায় বন্দি বাঘকে পথিক ব্রাহ্মণ মুক্ত করে বিপদে পড়ে, কিন্তু পণ্ডিত শৃগালের চতুরতায় সে রক্ষা পায়, বাঘ খাঁচায় পুনরায় বন্দি হয়—অকৃতজ্ঞ এভাবেই শাস্তি পায়। নিরীহ মেষশাবককে বাঘ স্রোতের উজানের পানি ঘোলা করার অজুহাত দেখিয়ে ভক্ষণ করে।—এ হলো দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। হাঁস সোনার ডিম দেয়, এক সঙ্গে অধিক ডিমের লোভে মালিক হাঁস হত্যা করে সব হারায়—এটি লোভীর শাস্তি। সৎ কাঠুরিয়া সত্য কথা বলে জলদেবতার কাছ থেকে উপহার স্বরূপ নিজের লোহার কুঠারসহ রূপার ও সোনার কুঠার লাভ করে, কিন্তু লোভী ও অসৎ কাঠুরিয়া মিথ্যাচরণ করে সবই হারায়। 'কাঠুরিয়া ও কুঠার' গল্পের উপদেশ হলো "সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়।" এভাবে বিচার করে দেখা যায়, লোকগল্পের জনশিক্ষামূলক তাৎপর্য আছে। বাংলার লোককাহিনীর এটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নিছক গল্পরস আস্বাদনের জন্য সারা রাত জেগে লোকে কাহিনী শোনে না, নীতি-উপদেশ-জ্ঞান শিক্ষালাভও করে থাকে।

রাজনীতিবিদ,ধর্মবেত্তা এবং শিক্ষকগণ নিজ নিজ বক্তব্যের অনুকূলে আজও নানা গল্পের অবতারণা করেন নিজের যুক্তিকে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। মাটির নিচে সোনা আছে, খুঁড়লে তা পাওয়া যায়—এই উপদেশ দিয়ে 'কৃষক ও কঞ্চি' গল্পের বৃদ্ধ চাষী নিজ সন্তানদের কৃষিকাজে প্ররোচিত করে। অবিচল এবং সনিষ্ঠ থেকে মন্থর গতিসম্পন্ন হয়েও কচ্ছপ খেয়ালি ও অহঙ্কারী দৌড়বিদ খরগোসকে পরাভূত করে। নিষ্ঠা সাফল্যের চাবিকাঠি, গর্ব পতনের মূল—এ শিক্ষাই 'কচ্ছপ ও খরগোস' গল্পে প্রচার করা হয়। গল্পের আসরে একজন মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনের সমস্যা, সঙ্কট, সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করে আনন্দের জগতে প্রবেশ করে এবং নতুন করে বাঁচার প্রেরণা ও জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে। মায়ের উপদেশ মতো ছেলে শ্বশুরবাড়িতে খেতে বসে শাশুড়ীর কথা উপেক্ষা করেও অল্প খায় এবং গভীর রাতে ক্ষুধার তাড়নায় রান্নাঘরে গিয়ে অন্ধকারে চুরির অপরাধে মার খায়। এ হলো বোকা জামাই-এর গল্প। অপর এক বোকা জামাতা রাজকন্যাকে বিয়ে করে; সে

মশারির মধ্যে প্রবেশের কৌশল জানে না, তাই মেঝেতে শুয়ে সারারাত কাটিয়ে দেয়। এসব গল্প নির্মল আনন্দ দেয়। অশ্লীল ও ভাঁড়ামিপূর্ণ গল্পও আছে। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি ভাঁড়ামিতে ও ব্যঙ্গরসে পূর্ণ। এগুলিও সাধারণ মানুষকে আনন্দের খোরাক জোগায়। গল্পরস, হাস্যরস ও নীতিশিক্ষার কারণে লোককাহিনীর আবেদন ও আকর্ষণ সমকালের প্রজন্মের কাছেও অম্লান হয়ে আছে।

লোকনাট্য (Folk-dramas)

আধুনিক নাটকের সংজ্ঞায় লোকনাট্যের কোন একক বা অভিন্ন ধারা নেই : উন্মুক্ত বা ঈষৎ আচ্ছাদিত আসরে নাচ, গান, বাদ্য, সংলাপ, অভিনয় সহযোগে লোকমনোরঞ্জক ও লোকশিক্ষামূলক নানা বিষয় পরিবেশিত হয়, যেমন ভাসান, যাত্রা, পালাগান, ঘাটু, গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি। এগুলির কোনটিতে গানের প্রাধান্য, কোনটিতে নাচের প্রাধান্য, আবার কোনটিতে অভিনয়ের প্রাধান্য। বিষয়, আঙ্গিক, পরিবেশনরীতি ও সময়স্থিতির দিক দিয়েও একটি থেকে অপরটির পার্থক্য আছে। স্থূলভাবে বিচারে এগুলিকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে স্পষ্টতই কোন অভিন্ন সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায় না। আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি সহজ সরলরৈখিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—"গ্রামীণ সমাজে জনসাধাবণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।" একজন গবেষকের অভিমত—"লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী-আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি সহজ সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীত, নৃত্য এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজু দৃঢ় ভাবভঙ্গীর দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয় তাই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য।" দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি প্রধানত 'যাত্রা'র কথা স্মরণে রেখে লেখা। লোকনাট্যের অন্য ধারায় এর সব লক্ষণ বিরাজ করে না।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও লৌকিক বিষয় এবং হাস্যকৌতুক নানা বিষয় নিয়ে এক এক ধারার লোকনাট্য রচিত হয়। যাত্রার বিষয়বৈচিত্র্য বেশি; কুশীলব, সংলাপ, অভিনয় সমন্বিত নাটকীয়তাও বেশি। পুরাণ, ইতিহাস, লোককাহিনী ও পালাগানভিত্তিক যাত্রা দেশের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। আলকাপে পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় বিষয় স্থান পায়। যাত্রার মতো আলকাপ সারারাত্রি ধরে চলে। আলকাপ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত। নাচ-গান-বাদ্য দিয়ে তা দীর্ঘায়িত করা হয়। গম্ভীরা মূলে শিব-শিবানীর গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য ছিল। শিবের গাজন উপলক্ষে তা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে গম্ভীরা সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবার যেকোন বিষয় নিয়ে রচিত হয় এবং 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় নাচ-গান-বাদ্য-সংলাপ সহকারে পরিবেশিত হয়। ব্যঙ্গ-কৌতুক এর মুখ্য

রস। এটি একাঙ্কিকা নাটকের মতো, স্বল্পায়তনে স্বল্প সময়ে শেষ হয়। রাজশাহী-মালদহ জেলায় গম্ভীরা প্রচলিত। যাত্রা ও আলকাপ থেকে গম্ভীরার এখানেই পার্থক্য। প্রধানত আলকাপ ও গম্ভীরা গানরূপেই আঞ্চলিকভাবে পরিচিত। লোকমনোরঞ্জক ঘাটু মূলত গীতিনাট্য। গায়েন ও দোহার গান করে, আর 'ঘাটু' নামে বালক কিশোরীবেশে নাচে, বাদক বাজনা বাজায়; নৌকার পাটাতনে আসর বসে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা গান ও নাচের মাধ্যমে রাতভর অভিনীত হয়। আলকাপেও 'ছোকরা' নামে তরুণ যুবক যুবতীবেশে নাচ-গান করে। উভয়ের বিষয়বস্তুতে ও পরিবেশনায় অশ্লীলতা আছে, এইজন্য উভয়ের আসর লোকালয়ের বাইরে বসে। এদিক থেকে যাত্রা ও গম্ভীরা ভিন্নধর্মী—ছোটবড় নারীপুরুষ একত্রে বসে এগুলি উপভোগ করে। ঘাটু ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত। ভাসানের বিষয় বেহুলা-লক্ষীন্দরের জনপ্রিয় কাহিনী; 'ভাসানযাত্রা' নামেও এর পরিচয় আছে। ভূমিসমতল বৃত্তাকার মঞ্চে গায়েন পদ্ধতিতে এটি অভিনীত হয়।

কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত জারি গান নৃত্য, বাদ্য, অভিনয় সহযোগে পরিবেশিত হয়। জারি গানের স্থান দরগাহ। মোহররম উপলক্ষে দশ-বারো জন তরুণ যুবক জারিদল গঠন করে এবং বৃত্তাকারে নেচে নেচে গান করে। একজন মূল গায়েন থাকে, অন্যবা দোহার হিসেবে ধূয়া গায় ও হাততালি দেয়। কারবালার কাহিনীকে ইমামচুরি, জয়নাবের বিলাপ, সখিনার বিবাহ ও বিলাপ, জয়নাল উদ্ধার ইত্যাদি পালায় বিভক্ত করে পরিবেশন করা হয়। জারির কথায় ও গানে, ভাবে ও ভাষায় ইসলামী ভাব সম্পূর্ণ বিরাজ করে। মুসলিম সম্প্রদায় এর উদ্ভাবক ও অনুশীলক। অভিনয়গুণের জন্য জারি গানকে রংপুরে 'জারিযাত্রা' বলা হয়।[২৩]

পুতুলনাচ লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পুরাণ, লোককথা ও সমাজ-আশ্রিত যেকোন কাহিনীকে পুতুলের অভিনয় দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়। পুতুলের অঙ্গভঙ্গি সুতার সাহায্যে সূত্রধর এবং সংলাপ-সঙ্গীত কথক-গায়ক দ্বারা সম্পন্ন হয়। নেপথ্যে থেকে বাদ্যকর বাজনা বাজায়। এসব কারণে পুতুলনাচের জন্য বিশেষ ধরনের মঞ্চ ও মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয়।

গীতাভিনয় সম্বলিত পালাগানকেও লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জনপ্রিয় আখ্যান নিয়ে পালাগান রচিত হয়। বাইদ্যানীর পালা, গাজীর পালা, বনবিবির পালা, সখিনার পালা মূল গায়েন, দোহার, বাদক সহযোগে আসরে পরিবেশিত হয়। পালাগান বিষয়-রস-রুচির দিক থেকে উন্নত মানের রচনা। সকল স্তরের নর-নারী দিনের প্রকাশ্য আসরে এ ধরনের লোকনাট্য উপভোগ করে।

---

২৩. *লোকসাহিত্য সংকলন,* ১৮শ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮১), দশ (ভূমিকা)।

মঞ্চে বা আসরে লোকনাট্যের উপস্থাপনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি স্তর থাকে : এক. মূল কাহিনীর পূর্বস্তর—যথা প্রস্তাবনা, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, বন্দনা। দুই. মূল কাহিনীর অভ্যন্তরীণ স্তর—যথা অভিনয়, নৃত্য, গীত, কথা ও সংলাপ, বাদ্য, সঙ বা ভাঁড় ইত্যাদি। দলের প্রধান সরকার বা সূত্রধর শুরুতে আসরে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাবনা আকারে পালা-আখ্যান-কাহিনী সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করেন। তিনি অন্তর্ধান করলে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান শুরু হয়; বাদকগণ মঞ্চে প্রকাশ্যে অথবা পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর সূত্রধর, দোহার ও নর্তক এসে দেব-দেবী, গুরু-জ্ঞানীগুণীর বন্দনা করেন। মূল কাহিনীর অভিনয়ে নাচ, বাদ্য ও সঙ আসে দর্শককে বিশ্রাম (relief) দেয়ার জন্য। রাম-সীতা, অর্জুন-দ্রৌপদী, রাধা-কৃষ্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, বেহুলা-লক্ষীন্দর, ঈসা খাঁ দেওয়ান, ফিরোজ দেওয়ান, জয়নব-হাসান, সখিনা-কাসেম, হানিফা-জয়গুন, হাতেম তাই, রহিম বাদশা, রূপবান, বাইদ্যানী, কাজলরেখা ইত্যাদি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লোকনাট্য রচিত ও পরিবেশিত হয়। বাংলার গ্রামে নর-নারী সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অত্যাচার-পীড়ন, সংগ্রাম-বিরোধ, প্রেম-স্নেহ, লোভ-লালসা, ভোগ, যৌনতা-মিশ্রিত এসব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়, দেব-দানব-নর-পরী, পশু-পাখি, যাদু-তন্ত্র-মন্ত্রের কাহিনী থেকে জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয় লাভ করে, বিচিত্র আবেগ-অনুভূতি-রসবোধের দোলায় আন্দোলিত হয়। কোন কোন কাহিনী থেকে তারা নীতি-উপদেশ শিক্ষা পায় : পাপে মৃত্যু, পুণ্যের জয় অথবা সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় অথবা অহঙ্কার পতনের মূল অথবা যে সহে সে রহে ইত্যাদি।

*লোকনাট্য*সংগ্রহ ও সঙ্কলনের অভাব আছে। বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্য সংকলনে* (১৮শ খণ্ড) 'জারিযাত্রা' শিরোনামে কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি লোকনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। এটি রংপুর থেকে সংগৃহীত। এর মূল সংলাপ গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে গান আছে। গানগুলি ঘটনাভিত্তিক, কাহিনীকে গতিশীল করে। আলকাপে গান আসে দর্শক-শ্রোতাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য, যাত্রার সঙের ভাঁড়ামিপনাও বিশ্রাম দেয়ার জন্য আসে। এদিক থেকে 'জারিযাত্রা'র গান মূল কাহিনীর প্রাণস্বরূপ, গম্ভীরার গানও আখ্যানের সাথে একাত্ম। আখ্যান ও গানকে আলাদা করা যায় না। উল্লিখিত জারিযাত্রার 'বন্দনা'র অংশবিশেষ এরকম :

পোতমে বন্দনা করি ধরমো নেরোনজন।
তাহারো চরণে হামার হাজারো সালাম ॥
ওত্তোরে বন্দনা করি মাবিয়ার শওর।
সেই জাগাতে বাদশাই করে এজিদ হারামখোর ॥

পচ্চিমে বন্দনা করি পারুজার মোকাম।
সেই জাগাতে তৈয়ার হইলো হাদিস আর কোরান ॥
দইকনে বন্দনা করি কালিদাও সাগর।
সেই সাগরোত ভাসায ডিঙ্গা চাঁদ সদাগব ॥
পুবোতে বন্দনা করি ভানুয়ার ভাস্‌কোর।
অজনি পোভাত হইলে দিন পড়ে নজর ॥...
ওস্তাদ গুরু বন্দি কমৌ জয়নাল মাষ্টার নাম ॥
মোন দিয়া শোন সগ্‌গই জারি যাতরার গান ॥[২৪]

পালাগানের বন্দনার কাঠামোটিও অনুরূপ : বলা যায় লৌকিক বন্দনার এটিই মানসম্মত কাঠামো। *মৈমনসিংহ গীতিকার* মহুয়া পালার বন্দনাগীতে অনুরূপ দিগ্‌বন্দনা, সভার শ্রোতৃবন্দনা, গুরু-বন্দনার কথা আছে।[২৫]

বন্দনার মতো যেখানে পূজা-ভক্তি-পবিত্রতা আছে, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্য একত্রে স্থান করে নিয়েছে, কোথাও বিরোধ নেই। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির এটাই আবহমানকালের বৈশিষ্ট্য। মিলন-মিশ্রণের এই স্রোত মূল কাহিনীর মধ্যেও প্রবাহিত। বিশেষজ্ঞ বলেন :

Mythological gods and goddesses, Sufi pirs and piranis had their share to contribute in enriching the themes. There are always some characters either in the form of mythological god or his representative who would come to the rescue of the honest people who suffer at the hands of the rural oppressors.[২৬]

লোকনাট্যের মানবচরিত্র সম্পর্কে মীরা গাঙ্গুলি বলেন :

অত্যাচারী রাজা, জমিদার, মনুষ্যত্বহীন ও স্বার্থান্ধ দেওয়ান, নায়েব, অবিচারক সুবিধাবাদী সমাজপতি, ভ্রাতৃদ্রোহী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নারীলোলুপ, কুসিদজীবী, বিভৎস স্বভাবের কাপালিক প্রমুখ যেমন লোকনাট্যের জায়গা জুড়িয়া বসে, তেমনি আবার কর্তব্যশীল, ভ্রাতৃবৎসল, অতিথিসেবাপরায়ণ, জনসেবী, স্বার্থত্যাগী, সহনশীল, প্রভুভক্ত, ধার্মিক, ভক্তিমান চরিত্রাদিও ইহাতে স্থান পাইযা থাকে।[২৭]

---

২৪. প্রাগুক্ত, ২৭।

২৫. *মৈমনসিংহ গীতিকা*।

২৬. শিশির মজুমদার, *উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য*, (কলকাতা ১৯৮৬), চ (ভূমিকা)।

২৭. মীরা গাঙ্গুলি, *বাংলা নাটকে লোক-প্রভাব*, (কলকাতা ১৩৮৯), ৯৫।

দেব, দেবকল্প মানব ও নরনারী চরিত্রআশ্রিত এসব নাট্যধর্মী রচনায় গ্রামের দর্শক-শ্রোতা নিজেদের জীবনের ছবিকে দেখে নানা আবেগে-অনুভূতিতে আপ্লুত হয়, রসধারায় সিক্ত হয়, যা বোধ-বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করে। চিত্তবিনোদনের, জীবনবোধের এবং নীতিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যের জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত আছে।

ছড়া (Rhymes)

ছড়া শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসরযাপন, জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ছড়ার চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লৌকিক ছড়া কেবল শিশুর জন্য রচিত হয় নি, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বয়স্ক সকল শ্রেণীর জন্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের নর-নারী বিভিন্ন উপলক্ষে ছড়ার চর্চা করে থাকে।

ছড়া লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির মতো ছড়া বর্তমানকালেও বহুলপ্রচলিত, সমাদৃত ও জীবন্ত। এর জনপ্রিয়তার কারণ বিবিধ :

১. ছড়া মূলত আবেগ-অনুভূতিজাত, বুদ্ধিজাত নয়।

২. ছড়ার চর্চায় সব বয়সের নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

৩. ছড়ার বিষয়বৈচিত্র্য আছে; লঘু-গুরু সব ধরনের বিষয় এবং হাস্য-করুণ-ব্যঙ্গ নানা ধরনের রস নিয়ে রচিত হয়।

৪. ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে, যা গতিশীল ও শ্রুতিমধুর।

৫. ছড়া আবৃত্তিসুখকর: এতে সঙ্গীত গীত হয়, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রবাদ প্রসঙ্গত বলা হয়, ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

৬. ছড়ার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সরল, এজন্য তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

৭. ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনিতৃপ্তকর বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।

৮. ছড়া চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম, নৈতিকতার বিচারে তা শ্লীল ও রুচিসম্পন্ন।

৯. ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে। বিশ্বের সব দেশে সব সমাজে ছড়ার প্রচলন আছে; এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও চির নতুন।

ছড়ার জনপ্রিয়তার যে নয়টি গুণের কথা বলা হলো, এগুলিকে ছড়ার বৈশিষ্ট্যরূপেও আখ্যায়িত করা যায়। ছড়া পদ্যে রচিত। অন্ত্যমিলযোগে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ছড়ার অবয়ব দুই থেকে আট/দশ চরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে মাগন, ব্রত ও গল্পাশ্রিত ছড়ার চরণসংখ্যা বেশি হয়।

(১)

খোকা ঘুমো ঘুমো
শান্তিপুরের বাঘ এসেছে দারুন-হুমো।

(২)

আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই
মা গিয়াছেন গয়াকাশী, ডুগডুগি বাজাই।

(৩)

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনাব উপায় কি
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

(৪)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হলো, তিন কন্যা দান ॥
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান,
এককন্যা রাগ করে বাপের বাড়ী যান ॥
বাপে দিল তেল সিন্দুর মালী দিল ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল ॥

(৫)

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ঢাঁই মিরগেল ঝাঁঝর বাজে ॥
বাজতে বাজতে চললো ডুলি,
ডুলি গেল কমলাফুলি ॥
কমলাফুলির টিয়েটা,
সূর্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই,
পানের খিলি কিনে খাই ॥
পানটি হলো ভোমরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
হলুদ বনে হলুদ ফুল
মামার নামে টগর ফুল ॥

এগুলি বাংলার লৌকিক ছড়ার প্রতীকমূলক (typical) দৃষ্টান্ত। ছড়ার অবয়ব, বিষয়, ছন্দ, রস, ধ্বনিসৌন্দর্য, সমাজবোধ, ঐতিহ্যচেতনা, জীবনদৃষ্টি এগুলিতে ফুটে উঠেছে। শিব পৌরাণিক দেবতা; বর্গী ঐতিহাসিক মারাঠা সৈন্য; কৃষক, মালী, ঢুলি সমাজের শ্রমজীবী মানুষ; বাবা, মা, মামা, ভাই, কন্যা পরমাত্মীয়; বিবাহ সামাজিক অনুষ্ঠান; ডুগডুগি, ঢাঁই, মাদল, ঝাঁঝর, ঢোল লোকবাদ্য; বাঘ, বুলবুলি, টিয়া, ভোমরা বাংলাদেশের পশু-পাখি, কীট; ধান, পান, রসুন, বাংলাদেশের ফসল; গয়া-কাশী, তীর্থযাত্রা, শিবের গাজন, ধর্মানুষ্ঠান, তিন পাত্রে কন্যাদান, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদিতে দেশ-সমাজ-জাতির অতীত ও বর্তমানের নানা উপাদান রয়েছে। এর সাথে আছে দৈনন্দিন জীবনের ছবি—শিশুকে ঘুম পাড়ানো, দুই ভাইয়ের আনন্দোল্লাস, কৃষকের খাজনা দেয়ার বেদনা, বধূর রান্না, কন্যার রাগ করে বাপের বাড়ি গমন, তেল-সিন্দুর দিয়ে প্রসাধন, দামী খোঁপা বাঁধা, হাটে গমন , পান কিনে খাওয়া, মায়ে-ঝিয়ে বিবাদ ইত্যাদি। আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-কল্পনার মিশ্রণে ছড়া আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক মনোরম শিল্পলোক সৃষ্টি কবে।

ছড়াকে 'গ্রাম্য কবিতা' বলা হয় । কবিতা সৃজনশীল রচনা, এতে ব্যক্তির আবেগ ও কল্পনা বাণীরূপ লাভ করে। সমাজের সমষ্টিগত মানুষের আবেগ ও কল্পনার বাঙময় রূপ ছড়া। এতে বাস্তব ও কল্পিত বিষয়ের মিশ্রণ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছড়ার অর্ধেক কল্পনার, অর্ধেক বাস্তবের। তিনি ছড়াকে 'স্বপ্নদর্শী' মনের সৃষ্টি বলেও উল্লেখ করেন। মানুষ, সমাজ, সংসার, প্রকৃতি, বিশ্বলোকের নানা চিত্র ছড়ায় প্রতিফলিত হয়। লোককবি যখন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখে, তখন তা হয় বাস্তব, আর যখন স্বপ্নদর্শী মন দিয়ে দেখে, তখন তা হয় কল্পিত।

উভয় বঙ্গে ছড়ার সংগ্রহ-সমীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থের একখানি ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত *বাংলার লোকসাহিত্য* (২য় খণ্ড, ১৯৬৩) এবং অপরখানি ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক রচিত *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা* (১৯৭৯)। প্রথম গ্রন্থে কথান্তরসহ প্রায় ১২০০টি ও দ্বিতীয় গ্রন্থে কথান্তর ব্যতিরেকে ৫২৫টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য সমাজ-রসতত্ত্বের দিক থেকে এবং নির্মলেন্দু ভৌমিক রূপতত্ত্বের দিক থেকে ছড়ার বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এছাড়াও ভবতারণ দত্ত '*বাংলাদেশের ছড়া*' (১৯৭০) গ্রন্থে ৮৭২টি ছড়া বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। বাংলাদেশে বদিউজ্জামান সম্পাদিত *লোকসাহিত্য সংকলনে* (১২শ খণ্ড, ১৯৭৫) ৫০০টি, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রণীত *যশোর-খুলনার ছড়া'য়* (১৯৬৩) ২৬০টি ছড়া সঙ্কলিত ও আলোচিত হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সঙ্কলন হলে বাংলা লৌকিক ছড়ার প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব।

ছড়ার শ্রেণীবিভাজন এক একজন এক একভাবে করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের আটটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন এভাবে : ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, খেলা, কন্যা,

পরিবার, প্রকৃতিজগৎ, অতিপ্রাকৃত ও সাহিত্যিক ছড়া। সম্ভবত এটিই তাঁর ছড়া সম্পর্কিত শ্রেণীবিভাজন। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী 'ছেলে-মেয়েদের জন্য সৃষ্ট ছড়া' ও 'বয়স্কদের উদ্দেশ্যে কথিত ছড়া' এমন দুটি প্রধান বিভাগ করে প্রথম বিভাগের ১৯টি এবং দ্বিতীয় বিভাগের ১৫টি উপবিভাগ করেন। তাঁর বিভাজন ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। নির্মলেন্দু ভৌমিক 'আনুষ্ঠানিক ছড়া' ও 'অনানুষ্ঠানিক ছড়া' এরকম দুটি প্রধান বিভাগ করে প্রথম বিভাগের ৩টি (বিবিধ বার্ষিক অনুষ্ঠান, কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন, মানবজীবন ও জগৎ) এবং দ্বিতীয় বিভাগের ৫টি মুখ্য উপবিভাগ (মানবজীবন সম্পর্কীয়, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি বিষয়ক, সাহিত্যিক বিষয়ক, নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক, বিচিত্র বিষয়ক) করেছেন। এ স্তরে উপবিভাগেরও বিভাগ আছে। 'মানবজীবন সম্পর্কীয়' ছড়ার পাঁচটি পর্যায় হলো 'ছেলেভুলানো ও শিশু সম্পর্কীয় ছড়া', 'খেলা, কৌতুক ও বিদ্রূপের ছড়া', 'দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন বিষয়ক' ছড়া, 'কর্মজীবন ও অবসরযাপন সংক্রান্ত ছড়া' এবং 'বৃত্তি বিষয়ক ছড়া'। তিনি সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি বিষয়ক ছড়াকে 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিষয়ক ছড়া', 'সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি বিষয়ক ছড়া', 'সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া' এবং 'স্থানের খ্যাতি-কুখ্যাতি বিষয়ক ছড়া' এই চারটি ভাগ করেন। নির্মলেন্দু ভৌমিকের শ্রেণীবিভাজনটি বৈজ্ঞানিক এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ, তবে জটিলতামুক্ত নয়। আমরা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য নিম্নরূপ একটি বিভাজনের পক্ষপাতী। এটি করা হয়েছে ছড়ার বিষয় গঠন, উপলক্ষ, উপযোগিতা ইত্যাদির সমন্বয় করে :

১. ছেলেভুলানো ও শিশুতোষ ছড়া ;
২. খেলার ছড়া ;
৩. পারিবারিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া ;
৪. আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া ;
৫. ঐন্দ্রজালিক ছড়া ;
৬. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া ;
৭. শ্রম-পেশা বিষয়ক ছড়া ;
৮. নীতি ও শিক্ষামূলক ছড়া এবং
৯. বিবিধ ছড়া।

চেতন-অর্ধচেতন শিশুদের ভুলানো অথবা আনন্দ দেয়ার জন্য মা-বোন, দাদী-নানী, ধাত্রীর মতো বয়স্ক নারী যেসব ছড়া আবৃত্তি করে, সেসব ছেলেভুলানো ছড়া। শিশু-কিশোর বালক-বালিকা নিজেরাই ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। এটি তাদের চিত্তবিনোদন ও অবসরযাপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এগুলিকে শিশুতোষ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছড়া

মুখস্ত করে শিশু স্মৃতিশক্তির অনুশীলন করে, আবার ছড়ার চর্চা করে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে চিত্তবিকাশের সুযোগ পায়।

কিশোর-তরুণ-যুবক নানা বয়সের নর-নারী যেসব ছড়া বলে খেলা করে অথবা খেলা উপলক্ষে ছড়া বলে সেসব খেলার ছড়ার অন্তর্ভুক্ত। হাডুডু, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, গাছুয়া-গাছুয়া ইত্যাদি খেলার 'বোল' হিসেবে ছড়া বলা হয়। এটি মূল খেলার বাড়তি অঙ্গ—খেলায় অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য এসব ছড়া বলা হয়।

পরিবার ও সমাজের অতীত ও বর্তমানের নানা স্তরের নর-নারীর জীবন ও চরিত্র অবলম্বন করে ছড়া রচিত হয়েছে। এগুলিতে মা, কন্যা, বাবা, ভাই, বোন, বধূ, শ্বাশুড়ী, জামাতা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজন যেমন, তেমনি ধোপা, নাপিত, মালী, তাঁতী, কামার, দারোগা, পেয়াদা, জমিদার, রাজা ইত্যাদি সামাজিক মানুষও আছে। এসব ছড়ার অভ্যন্তরে একটি ব্যাপক সামাজিক পটভূমি আছে।

ব্রত, গাজন, মাগন, বৃষ্টি, বন্যা, ফসল, ব্যাধি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া আছে। এগুলিতে লৌকিক ধর্মানুভূতি ও সংস্কারাদি নিহিত আছে। ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় আছে যাদু-মন্ত্রের প্রভাব। উভয় শ্রেণীর ছড়ায় নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের উপাদান আছে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়ায় শিশু-কিশোরদের লঘু হাস্যরসের পরিচয় আছে। প্রধানত সমবয়সের ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জামাতা, পশুপাখি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ ও সমালোচনা করে অথবা আক্রমণ বা হেয় প্রতিপন্ন করে এসব ছড়া রচিত হয়। কতক কাজে শ্রমলাঘব করার ও প্রেরণা দেয়ার অথবা চিত্তবিনোদনের শ্রমবিষয়ক ছড়া আছে। বাইস্কোপ দেখানোর সময় ছড়া কেটে চিত্রের বর্ণনা দেযা হয়। এটি পেশার সঙ্গে যুক্ত। নীতি-উপদেশ, অঙ্ক-জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্য ছড়া আছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সব শ্রেণীর ছড়ার বিভাজন সম্ভব নয়, তবে অধিকাংশ ছড়ার উপলক্ষ-উপযোগিতাভেদ সুস্পষ্ট। ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, যাদুমন্ত্রের ছড়া, নীতি-উপদেশের ছড়া ও আচার-অনুষ্ঠানের ছড়াকে স্পষ্ট ভেদরেখা দ্বারা আলাদা করা যায়। খেলার ছড়া খেলা উপলক্ষে, ব্রতের ছড়া ব্রত-পার্বণ উপলক্ষে, মন্ত্রের ছড়া যাদুটোনা, বশীকরণ ক্রিয়ানুষ্ঠান উপলক্ষে বলা হয়। খেলার ছড়া মাগন উপলক্ষে বা মাগনের ছড়া খেলা উপলক্ষে বলা হয় না। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় যে ছড়া বলা হয় আর শ্রমিক দিয়ে ছাদ পিটানোব সময় যে ছড়া বলা হয়, তার বাণী, সুর, ছন্দ-স্পন্দন, বিষয়, আবেদন একরূপ হতে পারে না। এসব কারণে ছড়ার শ্রেণীকরণে ছড়াচর্চার উপলক্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ছড়া জীবনের সাথে যে কত ঘনিষ্ঠ, ছড়ায় অঙ্কিত মানুষ, পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির চিত্র বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। এতে সমাজের খুঁটিনাটি চিত্র আছে, নরনারীর অন্তর্জীবনের ও বহির্জীবনের ছবি আছে, দেশের ভূমি-ঋতু, গাছপালা-পশুপাখির কথা আছে। এসব অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ড ছবি বিন্যস্ত করলে দেশ ও জাতির অলিখিত ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

পূর্বে উদ্ধৃত একটি ছড়ায় বর্গী কর্তৃক বাংলা আক্রমণের কথা আছে। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। নবাব আলিবর্দীর (১৭৪০-৫৬) রাজত্বকালে বর্গীরা বাংলাদেশ কয়েকবার আক্রমণ, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, বিশেষকরে কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খাজনা দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ঘুমপাড়ানোর ছড়ায় জাতির এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কথা চিত্রিত হয়েছে। আরেকটি ছড়া :

জাত মারলে পাদ্রী ধরে,
ভাত মারলে নীল বাঁদরে।
বিড়াল চোখে হাঁদা হেমদো,
নীলকুঠির নীল মামদো।।

এটিরও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে—খৃস্টান পাদ্রী ধর্মনাশ করে এবং নীলকর সাহেব কৃষককে শোষণ করে। বাংলার মানুষ দেড়শ'-দুশ' বছর আগে এসব শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। 'বাঁদর', 'মামদো' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, তবে এতে প্রতিরোধের চেতনা নেই। বর্গীর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধের চেতনা নেই, শুধু প্রতিক্রিয়াজাত বেদনাবোধ আছে।

উপরে উদ্ধৃত ৪নং ছড়ায় বহুবিবাহের যে চিত্র আছে, তাতে এক পাত্রে তিন কন্যা সম্প্রদানের কথা আছে। বাংলা নাথগীতিকা 'গোপীচন্দ্রের গানে'র রাজপুত্র গোপীচন্দ্র রাজকন্যা অদুনাকে বিয়ে করে পদুনাকে দান হিসেবে লাভ করে। চণ্ডীমঙ্গল-এর বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতির স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা পরস্পরের খুল্লতাত ভগ্নী ছিল। মুসলিম আইনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা তালাকের পর শ্যালিকাকে বিবাহ করা বৈধ বলে গণ্য হয়। সমাজতত্ত্বে এ ধরনের বহুবিবাহকে sororal polygyny বলে, এক পুরুষে একাধিক বোনের বিবাহ এ প্রথার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর আমেরিকার ক্রোদের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে।[২৮]

'বোন-সতীন'-এর কথা আছে একটি বিখ্যাত ছড়ায়, এর অংশবিশেষ এমন :

এতো বড়ো রঙ্গ জাদু এতো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥

২৮. সৈয়দ আলী নকী ও মুহাম্মদ হাবিবুব রহমান, *নৃবিজ্ঞান*, (ঢাকা ১৯৮৯), ১৪৮।

নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।

তাহার অধিক তিতো কন্যা, বোন-সতীনের ঘর ॥—রবীন্দ্র সংগ্রহ

হিন্দু বিবাহ-আইনে স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকাকে বিবাহ করা যায়। Cross cousin, গোত্রবিবাহ প্রথা (endogamy) পৃথিবীর বহু উপজাতির মধ্যে ছিল, বর্তমানে উন্নত সমাজেও আছে। বাংলার সমাজব্যবস্থার শিকড়ও অত্যন্ত প্রাচীন, যা প্রথা-পদ্ধতি-আচার-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রসারিত।

মন্ত্রের ছড়ায় প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারের বীজ আরো সজীব ও প্রকট। বৃষ্টি আবাহনের জন্য বলা হয়, " আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিব মেপে" আর বৃষ্টি বারণের জন্য বলা হয়, "লেবুর পাতায় করঞ্চা, এই মেঘখান উড়ে যা", কিংবা রৌদ্রের আকাঙ্ক্ষায় বলা হয়, "রৈদ দে রে রৈদানী,/চান্দের মার বকের হাত,/কলাতলায় গলা জল,/চচ্চর‍্যায়া রৈদ পড়।" বৃষ্টির মাগনে আচার পালনের সাথে ছড়াও বলা হয়। ছোট ছেলেমেয়ে মাথায় কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং ছড়া বলে মাগনের চাল-ডাল সংগ্রহ করে, গৃহস্থরা কুলায় পানি ঢালে; পানি দেহ বেয়ে মাটিতে পড়ে। এটি হলো বৃষ্টির নকল। এতে আছে সমপর্যায়ের যাদুর (sympathetic magic) বৈশিষ্ট্য। মাগনের ছড়ায় মেঘের দেবতাকে সরাসরি আবেদন জানানো হয় :

হ্যাদে লো বুন মেঘারানী,

হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি।

ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি,

বড় ভুঁইতে হাটু পানি।

মেঘারানীর ঘরখানি পাথরেব মাঝে,

হেই বৃষ্টি নামলো ঝাঁকে ঝাঁকে।

কালো মেঘা ধলো মেঘা বাড়ী আছনি ?

গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পারনি ?—ফরিদপুর

বৃষ্টির সঙ্গে ফসলের নিবিড় সম্পর্ক, বিশেষকরে প্রকৃতিনির্ভর কৃষিব্যবস্থায় সময়মতো এবং পরিমাণমতো বৃষ্টি কৃষকের প্রত্যাশিত; এই প্রত্যাশা মন্ত্রের ও মাগনের ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে। কৃষকদের দ্বারা ভূমিবরণ এবং শস্যের সাধভক্ষণ আচারে ভাল ও অধিক ফলনের আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে, এখানেও যাদুশক্তির প্রভাব আছে। ভূমিবরণের ছড়াটি এরকম :

বর বর বর বসুমতী বর

লটকাই লটকাই ধর।

পাড়া পড়শীর ভাগ্যে ধর
অতিথ পথিকের ভাগ্যে ধর
বসুমতীর বর ॥—চট্টগ্রাম

আর শস্যের সাধভক্ষণের ছড়ার ৪টি চরণ হলো :

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
সকল শস্যের গর্ভ বসে।
রামের হাতে গুমা,
ধান হইস তিন দুনা ॥—ময়মনসিংহ

সাধভক্ষণ আচারে উর্বরতাবাদ (fertility-cult)-এর স্পষ্ট প্রভাব আছে, যা প্রাচীন হয়েও সমকালীন ও সর্বজনীন। ব্রতের ছড়ায় আরাধ্য দেবতার কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করে ফলের প্রত্যাশা করা হয়। এখানে আবেদনটি প্রত্যক্ষ। 'দশপুত্তর ব্রতে'র ছড়া এরকম :

দশ পুত্তল পূজে যে, দশ ফল পায় সে।
মরিয়ে মনুষ্য হব, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব।
সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব, কৌশল্যা শাশুড়ী পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব, দুর্গার মত পা পাব,
শিবের মত বাপ পাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী বোন পাব,
কার্তিক-গণেশ ভাই পাব, লব-কুশ ছেলে পাব,
কুন্তীর মত ধীরা হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব,
কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব,
বিউলীর ডাল বর্ণ হব, দুর্বার মত লতিয়ে যাব ॥

চৈত্রসংক্রান্তির দিন তুলসীতলায় বালিকা মাটিতে কাঠির আঁচড় দিয়ে এক এক দেবতার মূর্তি আঁকে আর এমন কামনা ব্যক্ত করে। দেবকথায় ও পুরাণে এসব আদর্শ চরিত্র আছে; এদের গুণাবলী ধারণ করার অথবা সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার এরূপ আকাঙ্ক্ষায় ধর্মীয় চেতনা গৌণ, বৈষয়িক চেতনাই মুখ্য। সুস্থ, সুন্দর, আদর্শ জীবন তার কাম্য। এটাই তার জীবনদর্শন। যেখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ নেই, সেখানে আদর্শ চরিত্র ও জীবনের অনুসরণ কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। 'ভাই-ফোঁটা ব্রতে' সহোদর ভাইয়ের সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা করা হয়; 'লক্ষ্মীব্রতে' বাপ-ভাইয়ের নিরাপদ বাণিজ্যযাত্রার আকাঙ্ক্ষা করা হয়;

অধিক সন্তান, ভাল ফসল ও রোগ-শোক থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্রত আছে। ব্রত-মাগন-মন্ত্রের ছড়ায় ধর্মের মোড়কে বিষয়বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল; পরকালের সুখ-স্বপ্ন-আনন্দ অনুপস্থিত। ইহবাদ বাংলার লৌকিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্র (Charms)

"আওলা চাল বকের পাক্।/যেমন পিঠা তেমন থাক্।"—এটি হলো পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র। পিঠা গ্রামীণ সমাজের একটি জনপ্রিয় সৌখিন খাদ্য। আত্মীয়-স্বজন-অতিথি আপ্যায়নে পিঠা পরিবেশিত হয়। কেউ ক্ষতি করতে চাইলে এই মন্ত্র পড়ে পিঠা নষ্ট করতে পারে। তৈরি খাবারে 'নজর' দিলে বদহজম হয়—এ বিশ্বাসও গ্রামের মানুষের আছে।

"থুথুড়ি মাছের মুড়ি,/যেথায় মাছেব ঘর/ আমার বড়শি গিয়া পড়।"—এটি বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের মন্ত্র। বড়শিতে কেঁচো বা 'আটা' জড়িয়ে থুথু ছিটিয়ে এই মন্ত্র পড়ে ছিপ ফেললে মাছ ধরা পড়ে—এটাই বিশ্বাস।

"উঠ ফোট চোট/পাকিস্ না গলিস না/দোম্বল বাইন্ধ্যা উঠ"—কারো শরীরে ঘা বা ফোঁড়া হলে এই মন্ত্র বলে তার রোগের বৃদ্ধি ঘটানো হয়, রোগী দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট পায়। সাধারণ জ্বর-জ্বালা হলে রোগীকে পানিপড়া খাওয়ানো হয়; পীর-মোল্লা মন্ত্র পড়ে পানিতে ফুঁ দেন : "কাল ফিরানী কাল ফিরানী/জমজমের ঠাণ্ডা পানি।/খা আজরাইল পানি খা/এবার তুই ফিরে যা।"

ফসলের উপর যাতে মন্দ লোকের 'কুদৃষ্টি' না পড়ে এজন্য কৃষক বীজ বুনে ক্ষেতের চারপাশে পানি ছিটিয়ে দেয, আর ক্ষেতবন্ধনের মন্ত্র বলে : "জিও জালা, জিও/হাত ধুইয়া দিলাম পানি/ধান হইস্ পোড়া খানি/... আমার ক্ষেত দেখ্যা যে নজর লাগায,/তার মা-পুলা ভাতে মারা যায়।"

চোরের উৎপাত থেকে ঘরের সম্পদ রক্ষার জন্য 'চোরবন্দি মন্ত্র' আছে :

চোর-চোরানি গাছের পাতা।
যে চোর আইয়্যে কাট মাথা ॥
ভাঙ্গা লাঙ্গল পুরান ঈশ।
চোর বান্ধলাম চৌদিশ ॥
আসব চোরা হাস্যা, মরব চোরা কাইন্দা।
ঘরের গিরির দুয়ার বান্দা ॥
তেলের হাঁড়িত চক্মক্ লুনের হাঁড়িত ফুল।
হিন্দের মুখ বাইন্ধা থইছি ন জন চোর ॥

ভূত-প্রেতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য 'শরীর-বন্ধন মন্ত্র' আছে :

মণিমুক্তা দোলে মা মনসার গলে।
আমাকে দেখিয়া ভূত পিশাচ না চলে ॥
ডাক-ডাকিনী ভূতপ্রেত তোমরা পঞ্চ ভাই।
আমার শরীরে আসে কারো সাধ্য নাই ॥
কাঙ্গুরি কামিক্ষা মা চণ্ডীর আজ্ঞা হারিঝির পা।
দই মা কংকালী, দই মা ফুল্লরা, দই মা কালী ॥

এরকম বন্ধনমন্ত্র আরো আছে, যেমন 'অগ্নিবন্ধন মন্ত্র', 'সর্পবন্ধন মন্ত্র', 'বাঘের মুখ-খিলানি মন্ত্র', 'হাতিবন্ধন মন্ত্র', 'বোলতাবন্ধন মন্ত্র', 'বন্যা প্রতিরোধ মন্ত্র', 'গৃহবন্ধন মন্ত্র' ইত্যাদি। সাপে দংশন করলে 'বিষঝাড়া মন্ত্র', বাঘে কামড়ালে 'ঘা সারানো মন্ত্র,' ভূতে ধরলে 'ভূতঝাড়া মন্ত্র', শিংমাছের কাঁটা বিঁধলে 'বিষ নামানো মন্ত্র' ইত্যাদিও আছে। প্রথম মন্ত্রগুলি প্রতিরোধক, দ্বিতীয় মন্ত্রগুলি প্রতিষেধক। অন্যের ক্ষতি করার জন্য 'বাণমারা মন্ত্র' আছে, নারী-পুরুষ পরস্পরকে বশ করার জন্য 'বশীকরণ মন্ত্র'ও আছে। মন্ত্রগুলি দুই থেকে আট-দশ চরণে রচিত। কোনটি ছড়ার মতো আবৃত্তি করা হয, কোনটি শ্লোকের মতো পাঠ করা হয়। মন্ত্রের ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐতিহ্য কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও মিশ্রভাবে আছে। পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রের 'জমজম', 'আজরাইল', 'মনসা', 'চণ্ডী', 'কালী', 'হাড়িঝি', 'ডাক-ডাকিনী' ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ঐতিহ্যাগত। কোন মন্ত্রে দেব-দেবী, পীর-পীরানি বা ঐতিহাসিক ধার্মিক ব্যক্তির দোহাই আছে, কোন মন্ত্রে তা নেই। সাধারণ শব্দাশ্রয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে। মন্ত্রের ভাষায় কবিত্ব নেই, ভাষা প্রায় গদ্যাত্মক, অন্ত্যমিলেরও অভাব আছে। মন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য হলো, উপলক্ষ ও প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন এবং যেখানে সেখানে মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। বন্ধনমন্ত্র দ্বারা বাণমারার কাজ চলে না, বাণমারা মন্ত্র দ্বারা বন্ধনের কাজ চলে না, অনুরূপভাবে ভূত-ঝাড়া মন্ত্র দ্বারা সাপের বিষ নামানো যায় না, সাপের বিষঝাড়া মন্ত্র দ্বারা ভূত-প্রেতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা হয় না। বশীকরণ মন্ত্র দ্বারা বশীকরণের কাজ চলে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার নেই।

মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতকগুলি শব্দসমষ্টি। এতে মন্ত্রাচারীর বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। মন্ত্র হলো "a wish which must without fail be fulfilled." মন্ত্র অব্যর্থ ফল প্রত্যাশা করে, এজন্য এতে আবেদন-নিবেদন অপেক্ষা দাবির সুর বেশি। শীতলা বসন্তের দেবী, মড়ক আকারে দেখা দিলে এই রোগে বহু লোক প্রাণ হারায়। ওঝা ধূলা পড়ে 'গ্রামবন্ধন' করে এই মন্ত্র পড়ে :

যাওরে শীতলা সইরা যাও
উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও
কামিখ্যার পর্বতে যাও
যদি না যাও
তবে মহাদেব আর পার্বতীর মাথা খাও ॥

মন্ত্রের এই ভাষায় অনুরোধ ও প্রভাব দুটোই আছে। বাংলা মন্ত্রের এটাই গঠন-কাঠামো। মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু লৌকিক ক্রিয়া, একে মন্ত্রাচার বলা হয়। মন্ত্রের মধ্যে যাদুগুণ (magic power) আছে। যাদু প্রাচীনতম ধর্ম; Animism বা সর্বপ্রাণবাদের পরবর্তী স্তর যাদু বা ইন্দ্রজাল। জীব-জড় সকল বস্তুতে প্রাণ বা আত্মা আছে, তা-ই সর্বপ্রাণবাদের মূলকথা। শুভ-অশুভ, ইষ্ট-অরি সকল শক্তির অধিকারী হওয়া অথবা তাকে বশে আনার ও নিয়ন্ত্রণ করার চেতনা থেকে ইন্দ্রজালের উদ্ভব। আর্চার টেলর অলৌকিক অপ্রাকৃত বস্তুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অথবা বশীভূত করার কৌশলকে যাদু বলেন। তাঁর ভাষায় যাদু হলো—"The art of compulsion of the supernatural; also the art of controlling nature by supernatural means."[২৯]

যাদু প্রধানত দুই প্রকার—শুক্ল ইন্দ্রজাল (white magic) ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল (black magic)। শুক্ল ইন্দ্রজাল মঙ্গলজনক, কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল ধ্বংসাত্মক। যেমন ঝাড়ফুঁক চিকিৎসাদিতে যাদুব ফল মঙ্গলজনক; এসব প্রকাশ্যে অনুশীলিত হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি অনিষ্টকর; এগুলি গোপনে নিষ্পন্ন হয়। হাঁ-ধর্মী যাদু (positive magic) এবং না-ধর্মী যাদু (negative magic) রূপেও শ্রেণীভেদ আছে। প্রধানত বিধি-নিষেধ (taboo) জাতীয় যাদুকে না-ধর্মী যাদু বলা হয়; অন্যগুলি হাঁ-ধর্মী যাদু। অন্তরপ্রকৃতির ও কার্যফলের দিক থেকেও অনুকরণধর্মী যাদু (imitative magic), সমপ্রক্রিয়ার যাদু (sympathetic magic), সদৃশ যাদু (homeopathic magic), সংক্রামক যাদু (contagious magic), প্রেতসংক্রান্ত যাদু (witchcraft), জ্যোতিষ বা আগাম কথা (divination) ইত্যাদি শ্রেণীতে যাদুর বিভাজন আছে।

মন্ত্র হলো যাদুর বাঙময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে যাদুশক্তি আছে, মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু ক্রিয়া বা আচার পালন করে যাদুশক্তির প্রকাশ ঘটাতে হয়। মাদুলি, তাবিজ, তাগা, কবজ ইত্যাদি বস্তুকে মন্ত্রপূত করলে যাদুগুণসম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে গুণী, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালী প্রভৃতি পেশাদার ও অপেশাদার ব্যক্তি মন্ত্র জানেন এবং মন্ত্রের প্রয়োগ করেন।

---

২৯. *SDFML*, Vol. II. 760.

যাদুমন্ত্র গুপ্তবিদ্যা; সব কিছুতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। শিষ্য ছাড়া অন্যকে মন্ত্রশিক্ষা দেয়া যায় না। মন্ত্রের প্রতি শব্দের উচ্চারণ করতে হয়। বার-তিথি, ক্ষণকাল, স্থান-পাত্র ইত্যাদির বাছ-বিচার করে মন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়।

বাঙালির ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনে নানা ক্ষেত্রে যাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে। মধ্যযুগের কাব্য, ব্রতকথা, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ, লোকচিকিৎসা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আসামের কামাখ্যা ছিল মন্ত্রশিক্ষার কেন্দ্র, বাংলাদেশ থেকে লোক যাদুশিক্ষার জন্য সেখানে যেতো। পূর্বোক্ত গ্রামবন্ধনের মন্ত্রে 'কামিখ্যা পর্বতে'র উল্লেখ আছে। বাংলা লোককাহিনীতে বর্ণিত কায়ার পরিবর্তন বা আত্মার রূপান্তর (transformation of soul) একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ; স্টিথ থম্পসন একে ডি-৬৯৯ সংখ্যক মটিফের অন্তর্ভুক্ত করেন। 'গোপীচন্দ্রের গানে' রাজমাতা ময়নামতী মন্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। যমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বহয়। পল্লীকবি বলেন :

মহামন্ত্র গিয়ান লৈল বুড়ি ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
সোনার ভোমবা হৈল কাযা বদলিয়া ॥

ময়না গোদা যমকে তাড়া করেছেন; গোদা কায়া পরিবর্তন করলে ময়না 'মহামন্ত্রে'র সাহায্যে প্রতিপক্ষের উপযুক্ত রূপ ধারণ করে তাকে আক্রমণ করেন। তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে ইঁদুর ও বিড়াল, কৈতর ও বাজ, সরিষা ও ঘুঘু, মাছ ও পানকৌড়ি, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বৈষ্ণব ও মাছি ইত্যাদি রূপান্তর গ্রহণ, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার লড়াই হয়েছে। 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে ভারইয়া রাজা ও বীরসিংহের বিভিন্ন রূপান্তরে আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক লড়াই-এর বিবরণ আছে। পল্লীকবি বলেন :

মায়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধূলি উড়াইল।
মানুষ ভারইয়া রাজা বিরক্ত হইল ॥

এখানে 'মায়ানার মন্তর' বা মায়ামন্ত্রের কথা আছে। এক রাজা গাছ হলে অন্য রাজা কুড়াল, ময়ূর হলে বাজ, মাছ হলে উদ হওয়ার বিবরণ আছে। শেষের চিত্রটি এমন :

তুবরী মন্তরে বাজা ভালা কোন কাম করে।
সাচান হইয়া রাজা শুনি পথে উড়ে ।।

'তুবরী মন্তরে' পাখী হওয়া যায়।—এ শ্রেণীর লোককাহিনীর ভিত্তি হলো magical conflict root; এক্ষেত্রে দুজন যাদুকর জীবন-মরণ সংগ্রাম করে ধ্বংস হয়।[৩০]

---

৩০. Saratchandra Mitra, 'On the cult of Sonaraya of Northern Bengal', *Journal of Departmental Letters*, Vol. VIII, (Calcutta 1922) , 177.

রূপকথার অসহায় নায়ক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কাছ থেকে গাছের 'মন্ত্রপূত পাতা' ভক্ষণ করে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়, এমন বিবরণও বিরল নয়। ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় 'হিলারী' (শিলারী) পেশাদার মন্ত্রগুণী। ঝড়-বৃষ্টি-শিলা থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য হিলারীরা মাঠে গিয়ে মন্ত্রপাঠ করে ও শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ ও ঝড়-বৃষ্টি তাড়ায়। এ প্রথা আজও চালু আছে। তারা মন্ত্রের সাহায্যে গ্রামবন্ধনও করে থাকে :

নমঃশূদ্র যুগীনাথ গুরুমন্ত্র লৈয়া
হিলারীর পেশা করে সাধনা করিয়া ॥...
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান
মন্ত্রের রাগিনী শিখে নানান গুণজ্ঞান ॥
বেদে-বেদেনী মন্ত্র পাঠ করে সাপ ধরে।
ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা।
ওলট পালট পাতার ফোঁড়
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে।
দুধরাজ, মনিরাজ, কার আজ্ঞা ?
বিষহরির আজ্ঞা ॥

ওঝা সাপে-কাটা রোগীর দেহ থেকে মন্ত্রপাঠ করে বিষ নামায়। এ রীতি আদি কালেব, অদ্যকালেরও :

উংকুর শুংকুর ডোসখোর ভাই।
কোন সাপে মারিছে কামুড় কও আমার ঠাঁই ॥
উত্তম পবর্ত শিরাইছে যে
সকল গরল শিরাইছে সে। ...
রব্বে রহিম খাড়া আকাশের বিষ পাতাল যা।
যদি বিষ ভাটি ছাইড়া উজান যাস
তবে পদ্মাদেবীর মাথা খাস ॥

পঞ্চম চরণ প্রক্ষিপ্ত, হিন্দুয়ানি ভাবের মন্ত্রে মুসলমানি ভাবের চরণ সংযুক্ত হয়েছে। এটি মুসলমান ওঝার কাজ। নিচের ভূত-ঝাড়া মন্ত্রে মুসলমানি ভাব পুরোপুরি বজায় আছে :

আমার নাম দিদার বকশ শুইন মন দিয়া।
আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া।

শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি
হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নীরে উল্টাইবার পারি ॥
তোমার লাইগ্যা বইস্যা আছি, কও তোমার নাম।
কিবা জাত, কিবা গোত্, কোন খানেতে ধাম ?

বাউলী, মউল্যা, কাঠুরে বনে পাতা, মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের শিকার হয়। প্রবাদে আছে, "সাপের লেখা বাঘের দেখা"—কপালে লিখা থাকলে সাপে কাটে; কিন্তু বাঘের দেখা হলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত মৃত্যু, এ মৃত্যুযন্ত্রণা বনাঞ্চলের অধিবাসীর নিত্যদিনের। 'বাঘের মুখ খিলান মন্ত্র' দ্বারা হিংস্র প্রাণীর মুখ বন্ধ করা হয় :

আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ
এই বার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগরে বাঘার দাঁত কপাটি।
যদি রে বাঘ নড়িস্ চড়িস্
খ্যাঁকশিয়ালীর দিব্যি তোকে।

মন্ত্র অজ্ঞ ও অসহায় মানুষের বাঁচার উপায় মাত্র। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে তা রচিত হয় নি, বরং তা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। মন্ত্রগুণে বিশ্বাস দৈবনির্ভরতা ও অদৃষ্টবাদে ভরসা বাড়িয়েছে, প্রকৃত মুক্তি দেয় নি, কোন কোন মন্ত্রাচারে রোগী সেবাজনিত উপকার পায়; এতে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক উপকারও আছে। অন্যথায় মন্ত্র সম্পর্কিত আর যাকিছু সবই 'ব্যর্থ পরিহাসে' পরিণত হয়।

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, দৈব দুর্বিপাক, অসুখ-বিসুখ দ্বারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা বাঁচার জন্য মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের সংস্কৃতি একটি স্রোতে এসে মিশেছে। এই মিশ্র সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতি। এখানে 'রব্বে রহিম' ও 'পদ্মাদেবী' একত্রে মন্ত্রে স্থান পেয়েছে, কেননা সাপ যেমন হিন্দু-মুসলমান বিচার করে না, বিষের যন্ত্রণা মানুষভেদে ভিন্ন হয় না, তেমনি মন্ত্রের ভাষায় জাতিবিচার, ধর্মভেদ হয় নি। মন্ত্রের ভাষায় আল্লাহ্, রসুল, চণ্ডী, মনসা, শিব, পার্বতীর দোহাই থাকলেও তাতে আধ্যাত্মিকতা নেই, ঐহিক চেতনা ও স্বাস্থ্য , সম্পদ, সুখ, শান্তির বাসনা মুখ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রের বাণীবন্ধ ও ভাষাকর্ম শিল্পগুণবর্জিত। উদ্দেশ্যধর্মী রচনায় বক্তব্য প্রাধান্য পায়, শিল্পসাধনা গৌণ হয়ে উঠে।

ধাঁধা **(Riddles)**

'ধন্দ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি : অর্থ 'সংশয়', 'দুরূহ সমস্যা' ইত্যাদি। ধাঁধার প্রতিশব্দ 'হেঁয়ালি', যা সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। ধাঁধা হেঁয়ালি বা রহস্যপূর্ণ ভাষায় রচিত হয়। এটি মূলত একটি জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা বলে এর একটি উত্তরও আছে। উত্তরটি ধাঁধার ভাষায় পরোক্ষভাবে বিরাজ করে। মূল বিষয়কে আড়াল করে শব্দের জাল বুনে তা করা হয়। উত্তরদাতাকে এই উপমা-রূপক-প্রতীকের রহস্যভেদ করে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধার চর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়—একজন ধাঁধা ধরে, অন্যজন উত্তর দেয়। 'সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস/মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।'—এ ধাঁধার উত্তর 'লবণ'। রূপকের আশ্রয়ে এটি রচিত—'সাগর', 'লোকালয়', 'মা', 'পুত্র' প্রতীক শব্দ। সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়, আবার পানিতে দিলে ঐ লবণ গলে যায়। ধাঁধা-বর্ণিত পুরো চিত্রটি যেমন পরোক্ষ, তেমনি বিভ্রান্তিকর। এটি নির্মাণে মস্তিষ্কের অনুশীলন দরকার হয়। উত্তরদাতাকেও চিন্তা করে বা মাথা ঘামিয়ে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধা formulated thought বা নিগূঢ় চিন্তার ফল। সি. এফ. পটার বলেন :

> Contrary to common assumption that they are mere word puzzle proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myth, fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most widespread types of formulated thought.[৩১]

পটারের উক্তিতে একাধিক বক্তব্য আছে :

১. সাধারণ ধারণা অনুসারে ধাঁধা হলো বুদ্ধি বিহবলকর শব্দমালা।
২. সন্ধ্যাকালীন ভোজে কথক ধাঁধা বলে থাকে।
৩. ধাঁধা পুরাকাহিনী, রূপকথা, লোককাহিনী ও প্রবাদের মতো আদিকাল থেকে বহুলপ্রচলিত নিগূঢ় চিন্তার ফল।

অন্য সমালোচক mastery of thought বা চিন্তার দক্ষতার কথা বলেন। তিনি লিখেন, "It (riddle) presupposes a command of language, a mastery of thought and a powerful sense of rhythm," ধাঁধা রচনায় ভাষার উপর দখল, চিন্তার উপর দক্ষতা এবং ছন্দ সম্পর্কে প্রবল চেতনা থাকা দরকার। জার্মান লোকবিজ্ঞানী ফ্রেডরিক (Friedreich) বলেন, ধাঁধা হলো "an indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer or reader may be exercised in finding it out,"

---

৩১. *SDFML*, Vol. II, 938.

ধাঁধা একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ উক্তি। এটি এমনভাবে বিবৃত করা হয় যাতে শ্রোতা অথবা পাঠক তা খুঁজে বের করতে পারেন। এতে চিন্তাচর্চার অবকাশ আছে। তবে কথকের কাছে বিষয়টি অজানা থাকে না, শ্রোতা-পাঠকের কাছে অজানা থাকে। শব্দজালের সূত্র ধরে উপযুক্ত উত্তরটি বের করতে হয়। আর্চার টেলর ধাঁধার ভাষায় ধাঁধার সংজ্ঞা দিয়েছেন : "When first I appear I seem mysterious. But when I am explained I am nothing serious."

ধাঁধা রহস্যপূর্ণ রচনা, ব্যাখ্যা দ্বারা সেরহস্যভেদ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করে উত্তর দেয়া কঠিন। শ্রুতি-স্মৃতি থেকে ধাঁধা ধরা হয়, আবার শ্রুতি-স্মৃতি থেকে উত্তরও দেয়া হয়। যেহেতু ধাঁধার প্রকাশভঙ্গি পরোক্ষ (indirect presentation), সেহেতু এতে উপযুক্ত চিত্র বা ব্যঞ্জনা থাকতে হয়। ধাঁধা রচনায় বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ আবশ্যক হয়। তবে এতে আবেগের স্থান নেই। এজন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না। গদ্যে ও পদ্যে ধাঁধা রচিত হয়। সাধারণত গদ্যাত্মক একটি বাক্যে অথবা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত দুটি থেকে চারটি চরণে ধাঁধা সমাপ্ত হয়। বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণ থাকায় ধাঁধা প্রাণহীন প্রশ্নোত্তরে পরিণত হয় না; বরং প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্পের গুণে তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও রসধর্মী রচনার রূপ ধারণ করে। সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে, ধাঁধার প্রতীক-চিত্রকল্পের মধ্যে তেমনি উত্তর প্রচ্ছন্ন থাকে। বুদ্ধি, কল্পনা, কৌতূহল, রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিল্পীত মনের ছাপ ফুটে উঠে।

(১)

একটুখানি গাছে,
রাঙা বউটি নাচে। (মরিচ)

(২)

হায় তরমুজ করব কি
বোঁটা নাই তার ধরব কি ? (ডিম)

(৩)

এক মায়ের দুই ছেলে
কেউ কাউকে দেখতে নারে। (চোখ)

(৪)

কাঠের বেড়া ছনের ছাউনি
এর মধ্যে পুস্কনি। (নারিকেল)

(৫)
গাছে নাই, পাতায় নাই,
ফুলে আছে, ফলে আছে,
আর ডালে আছে। (ল-অক্ষর)

(৬)
দেশ আছে, মানুষ নাই,
সমুদ্রেতে জল নাই,
পাহাড়েতে পাথর নাই,
রেল-লাইনে গাড়ি নাই।
বন্দরেতে জিনিস নাই। (মানচিত্র)

এসব দৃষ্টান্তে বাংলা লৌকিক ধাঁধার রূপ ও রীতিগত (form and style) বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। এগুলিতে রচয়িতার চিন্তা, কল্পনা ও রসবোধের চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। গদ্যে রচিত ধাঁধাব সংখ্যা কম—দু'একটি এরকম : ১. 'কথায় আছে, কাজে নাই' (ঘোড়ার ডিম); ২.'খুললে ঘর, বন্দ করলে লাঠি।' (ছাতা); ৩. 'কোন ধানে চাল নাই ?' (অভিধান); ৪. 'কোন ড্রাইভার গাড়ি চালায় না ?' (স্ক্রু-ড্রাইভার)।

ধাঁধাকে লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখার একটি বলা হলেও যেহেতু এতে চিন্তাশক্তি ও প্রসাধনকলার ছাপ আছে, সেহেতু এটি পরবর্তীকালের রচনা হওয়াই সঙ্গত। গ্রিক পুরাণে ধাঁধা আছে; স্ফিঙ্কস ওডিপাসকে 'মানুষ' সম্পর্কীয় ধাঁধাটি ধরেছিল, ওডিপাস যথার্থ উত্তর দিয়ে থীবসের জনগণকে রক্ষা করে। উত্তর দিতে না পারলে তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। স্ফিঙ্কস মানবমুখী সিংহদেহী একটি দানব, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে পথিককে হত্যা করা তার একটি কূটকৌশল মাত্র। ধাঁধা এখানে কুচক্রীর হাতিয়ার হয়েছে। *মহাভারতে* বকরূপী যক্ষ পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেন; ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ব্যর্থ হয়ে প্রাণ হারান, কিন্তু যুধিষ্ঠির ধাঁধার উত্তর দিয়ে জলাশয় মুক্ত ও ভ্রাতাদের উদ্ধার করে জল পান করার সুযোগ পান। যক্ষ (মতান্তরে ধর্ম) অলৌকিক শক্তির অধিকারী; বুদ্ধির পরীক্ষায় মানুষ উত্তীর্ণ হয়েছে, মানুষ দেবতার ক্রীড়নক নয়; বুদ্ধিতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থে শবরূপী বেতাল রাজা ত্রিবিক্রম সেনকে হেঁয়ালির ছলে প্রশ্ন করেন। রাজা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বরলাভ করেন।[৩২] ভারতের আদি গ্রন্থ *ঋগ্‌বেদে* ধাঁধা আছে। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হোতৃ ও ব্রাহ্মণগণ একে অপরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। রাজারা রাজ্যজয়ের অভিলাষে 'অশ্বমেধ

---

৩২. শীলা বসাক, *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়,* (কলকাতা, ১৯৯০), ২৬৮।

যজ্ঞে'র আয়োজন করতেন। এটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। *অথর্ববেদে* ৪১টি ধাঁধা আছে। এগারো শতকের লেখক সাম়দেব ভট্টাচার্য রচিত *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে রাজা বিনীতমতী রাজকন্যা উদয়বতীর ধাঁধার উত্তর দিয়ে তাঁকে পরাস্ত করেন এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এটি ছিল বিবাহের শর্ত।[৩৩] সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে ধর্ম, নীতি ও বিদ্যা শিক্ষামূলক বহু ধাঁধা ও তত্তুল্য আর্যা ও শ্লোক আছে। *গামণিচণ্ড* শীর্ষক বৌদ্ধজাতকে রাজপুত্র ১৪টি ধাঁধার উত্তর দিয়ে সিংহাসনে বসার সুযোগ পান। এখানে ধাঁধা রাজা নির্বাচনের উপায় হয়েছে।[৩৪] বৌদ্ধজাতকে বর-কনে নির্বাচনে বুদ্ধির পরীক্ষা হিসেবেও ধাঁধা ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৫] মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে, বিশেষকরে মঙ্গলকাব্যে ও নাথগীতিকায় বহু সংখ্যক ধাঁধা আছে। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলের* বণিক খণ্ডে মনুষ্য বাকশক্তিসম্পন্ন শুক পাখি ধনপতির রাজসভায় ১৩টি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে, সভাস্থ পণ্ডিতগণ সেগুলির উত্তর দেন। 'ডিম' সম্পর্কিত একটি ধাঁধা ছিল এমন :

> বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
> জুগি পুরুষ তাহে আছে নিরাকার ॥
> যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।
> বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান ॥[৩৬]

আঠারো শতকের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গলে' নায়ক লাউসেন ও নটী সুরিক্ষার মধ্যে ধাঁধার তর্কযুদ্ধ হয়। লাউসেন মোট ৮ টি ধাঁধার উত্তর দিয়ে নটীকে পরাস্ত ও বশীভূত করে। লাউসেন পরাজিত হলে তাকে শর্ত মোতাবেক দাসত্ব করতে হতো। রামকৃষ্ণ রায়ের *শিবায়ন* কাব্যে ঋষিপত্নীগণ বাসরঘরে শিবকে ৮টি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে, শিব সেগুলির উত্তর দেন। *গোপীচন্দ্রগানে* রাজপুত্র গোপীচন্দ্র স্বীয় জননী ময়নামতীকে যোগশাস্ত্র বিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। উদ্দেশ্য ছিল মাতার শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানপরীক্ষা।

ধাঁধাচর্চার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ বিবিধ—এক. দানব-মানব ও লৌকিক-অলৌকিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব; এখানে জীবন-মরণের বাজি থাকে। দুই. যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধা বলা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। তিন. বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বর-কনে ও বরপক্ষ-কনেপক্ষ ধাঁধাচর্চা করে প্রধানত বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য। এক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ধাঁধা বলা হয় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। চার. ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও রাজত্ব

---

৩৩. ঐ, ২৬৮।

৩৪. ঐ, ২৬৯।

৩৫. ঐ, ২৬৯।

৩৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৭৫), ১২৫।

লাভ হয়। পাঁচ. ধাঁধার উত্তর দিয়ে বর লাভ হয় ও দণ্ড থেকে মুক্তি ঘটে। ছয়. ধাঁধার মাধ্যমে ধর্ম-নীতি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাত. ভোজসভায় আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসেবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়।

বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা বিবাহ, কৃষিকাজ, মৃতদেহ সৎকার, মন্ত্রাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধার অনুশীলন করে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির বিবাহানুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের গঁড় উপজাতির লোকেরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসেবে ধাঁধার চর্চা করে; তারা বিবাহানুষ্ঠানেও বরপক্ষকে ধাঁধা-যুদ্ধে নাজেহাল করে। আসাম ও বাংলাদেশের অরণ্যচারী নাগা, কুকি, গারো, কোচ ও মুরং উপজাতির কৃষককুল ফসল পাকার সময় ধাঁধা বলে আনন্দ করে।[৩৭]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও ধাঁধার প্রচলন আছে। আফ্রিকার বাথোঙ্গা গোত্রের মেয়েরা বৃষ্টির জন্য নগ্ন হয়ে নাচ-গান করে; এ সময় পুরুষ এসে উপস্থিত হলে তাকে ধাঁধা ধরে নাস্তানাবুদ করা হয়। তাদের ধারণা, এমন করলে বৃষ্টিপাত হয়। ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের সেলিবিসের অধিবাসীরা ধান পাকার ও কাটার সময় ধাঁধা বলে আমোদপ্রমোদ করে; এতে শস্যের ফলন বাড়ে। তারা শবদেহের সামনে ধাঁধা বলে অপদেবতাকে বিতাড়িত করে।[৩৮]

পূর্বে ও বর্তমানে আমাদের দেশে ধাঁধার চর্চা হয়েছে মূলত বিবাহোপলক্ষে বর ও কনে নির্বাচনে বুদ্ধি পরীক্ষায়, বিবাহবাসরে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের প্রতিযোগিতায়, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অবসরযাপনে এবং অঙ্ক-অক্ষরজ্ঞাননীতি শিক্ষার খেলায় এবং কখন কখন গৃহস্থালি কাজকর্মের ফাঁকে চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে।

আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী আর্চার টেলর *English Riddles From Oral Tradition* (১৯৫১) নামে একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলা ধাঁধার সঙ্কলনগ্রন্থের অভাব আছে। ব্যাপক জরিপ ও সমীক্ষা দ্বারা কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। বাংলা একাডেমী *বাংলাদেশের লোকধাঁধা'*(১৯৮০) শিরোনামে একখানি সঙ্কলন প্রকাশ করে। এতে ১৩টি জেলার সর্বমোট ১৩০২টি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে। কলকাতা থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলার লোকসাহিত্য* (৫ম খণ্ড) ও ডক্টর শীলা বসাক *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* (১৯৯০) শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। শীলা বসাক উভয় বাংলার বিভিন্ন জেলা

---

৩৭. প্রাগুক্ত, ২৭৪-৭৫।

৩৮. ঐ, ২৭৭-৭৮।

ও স্থানের সর্বমোট ১২৩০টি ধাঁধা সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করেন। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উভয় উদ্যোগ অসম্পূর্ণ, কারণ গ্রন্থে সকল স্থানের ধাঁধা সঙ্কলিত হয় নি।

ধাঁধার শ্রেণীকরণে মতবিরোধ আছে। হেলসিঙ্কির লোকবিজ্ঞানী 'উপমিত বস্তু' অনুসারে শ্রেণীকরণের প্রস্তাব দেন। আর্চার টেলর বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য অনুসারে বিভাজনের পক্ষপাতী। আশরাফ সিদ্দিকী উপমিত বস্তুর রূপবিচারে জীবজন্তু, গাছপালা, ব্যক্তি, বস্তু, রঙ, কার্যাবলী, বুদ্ধিপরীক্ষা, গল্প ইত্যাদি বিষয়ক ধাঁধার উল্লেখ করেন।[৩৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য ধাঁধাকে লৌকিক ও সাহিত্যিক এই দুই ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে নর-নারী, প্রকৃতি, পশুপাখি, গ্রহ-নক্ষত্র, তৈজসপত্র, মানুষের আচার-ব্যবহার, অঙ্কের হিসাব, কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বিভক্ত করেন। তিনি এমন বিভাজন কোথাও ধাঁধার বক্তব্য, কোথাও ধাঁধার উত্তর অনুযায়ী করেন।[৪০] ডক্টর শীলা বসাক উত্তরের বিষয় অনুযায়ী নর-নারী, দেব-দেবী, প্রকৃতি, গার্হস্থ্যজীবন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বাদ্যযন্ত্র, সংখ্যা, কাহিনী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেন।[৪১]

প্রশ্ন ও উত্তর মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা; উত্তরের বিষয়বস্তু-ব্যক্তি-ক্রিয়াগুণকে অবলম্বন করে ধাঁধার অবয়ব নির্মিত হয়। সাধারণত সাদৃশ্যবোধক রূপ-রঙ-গুণ-ধর্ম-ক্রিয়াদি দ্বারা ধাঁধার রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্প রচিত হয়। সাদৃশ্য বা তুলনা খুব নিখুঁত বা নৈকট্যবাচক হয়, তা-ও নয়। 'জলপিপি জলপিপি জলে করে বাস /হাড় নাই গোড় নাই মানুষ খাবার আশ।' (জোঁক), 'এক গাছে ছয় ফুল, ছয় ফুলে বার ফল।' (বৎসর, ঋতু ও মাস)। জলপিপি ও জোঁক পানিতে বাস করে এটুকুই সাদৃশ্য আছে—জোঁকের দেহে হাড় নেই, জোঁক মানুষের রক্ত খায়, দেহের গঠন ও স্বভাবের বিবরণ আছে। দ্বিতীয় ধাঁধায় কেবল সংখ্যায় মিল আছে; গাছ, ফুল, ফল দুরারোপিত সাদৃশ্য। প্রথমটিতে কৌতূহল, আনন্দ, রসবোধ, এমনকি সৌন্দর্যস্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এগুলিতে চিত্তবিনোদন, বুদ্ধিপরীক্ষা (intelligence test) ও অঙ্কশিক্ষার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। জলপিপির উপর জোঁকের এবং গাছের উপর বৎসরের চিত্র ও ধর্ম আরোপিত হয়েছে; এখানে উত্তরটিই মুখ্য, উত্তরের কথা মনে রেখে ধাঁধার রূপকাঠামো ও অর্থব্যঞ্জনা নির্মিত হয়। এদিক থেকে উত্তর ধরে ধাঁধার শ্রেণীকরণ করা যায়। ঐ সূত্র ধরে একটি গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপে করা যায় :

১. মানুষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : মানুষ, মানুষের দেহ, মানুষের ছায়া, আত্মা, জীবন, প্রাণ, মৃত্যু, শব, মুখমণ্ডল, মাথা, চুল, কপাল, চোখ, চোখের মণি, চোখের পাতা, ভুরু, অশ্রু, দৃষ্টি, নাক, কান, মুখগহ্বর, দাঁত, জিহবা, হাত, আঙ্গুল, বৃদ্ধাঙ্গুলি, কনুই, পেট, পাকস্থলী, নাভি, নাড়ি, লোম, স্তন, হাঁটু, পা, পদচিহ্ন।

---

৩৯. *লোকসাহিত্য,* ১২২-৩৯।
৪০. *বাংলার লোক-সাহিত্য,* ৫৩০-৬৮।
৪১. *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়,* ৩২।

২. পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নর-নারী : ভগবান, ব্রহ্মা-দুর্গা, পার্বতী, নারায়ণ, শালগ্রাম-শিলা, হরি, শিব, পঞ্চানন, হর-গৌরী, শিব-কালী, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, নীলাম্বর, বসুদেব, যম, জগন্নাথ, কার্তিক, গণেশ, কমলা, লক্ষ্মী, গঙ্গাদেবী, রাধা, মহামায়া, চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, যীশুখৃস্ট, মুহম্মদ, আকবর, আওরঙ্গজেব, শিবাজী, অশোক, পুলকেশী, কালাপাহাড়, বাল্মীকি, রত্নাকর, কৃত্তিবাস, কালিদাস, বিদ্যাসাগর, চাণক্য, খনা, বেহুলা, কালকেতু, দশরথ, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, লব-কুশ, অহল্যা, বামুন, কামার, গোয়ালা, পেয়াদা, কামলা, মুনি, সন্ন্যাসী, ব্যাপারী ইত্যাদি।

৩. প্রাণী ও প্রাণী-অঙ্গ : গরু, ষাঁড়, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, শূকর, কচ্ছপ, কাঁকড়া, কুমীর, ব্যাঙ, শামুক, শুশুক, হাঙর, উট, ক্যাঙারু, গণ্ডার, বাঘ, বানর, বেজী, শৃগাল, হরিণ, হাতি, কাক, কোকিল, কোকিলছানা, ঘুঘু, চড়াই, চিল, টিয়া, পায়রা, বক, বাজপাখি, বাদুড়, ময়ূর, মাছরাঙা, মুরগি, শকুন, শালিক, হাঁস, পিঁপড়া, আরশোলা, ইঁদুর, উইপোকা. উকুন, কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, চামচিকা, ছারপোকা, জোঁক, মাছি, মশা, তুতঁপোকা, বিছা, বোলতা, মাকড়সা, শুঁয়াপোকা, সাপ, কেন্নো, কেঁচো, জোনাকি, টিকটিকি, ফড়িং ইত্যাদি।

৪. উদ্ভিদ ও ফলমূলাদি : বীজ, গাছ, পাতা, কলাপাতা, কলসীগাছ, কলাইগাছ, অশ্বথ , আদা, আনারস, আলোকলতা, আলকুশি, ইক্ষু, ওলগাছ, ওষধিগাছ, কদমগাছ, কচুগাছ, কচুরিপানা, কার্পাস, কুমড়া, খেজুরগাছ, গম, আলু, গোলমরিচ, ঘাস, চা-পাতা, চালতা, চোরকাঁটা, জলপাই, তসরগুটি, তালগাছ, তামাকপাতা, তিলগাছ, তেতুঁলগাছ, দেবদারুগাছ, ধানগাছ, মরিচ, নারিকেল, নিম. ঝিঁ. পদ্ম, পলাশ, পানিফল, পাট, পান, পাথরকুচি, পুঁই, পেঁয়াজ, পেঁপে, পোস্ত, ফণিমনসা, বটগাছ, বটপাতা, বকুল, বাঁশ, বিছুটিগাছ, বেগুন, বেত, বেল, ব্যাঙের ছাতা, ভুট্টা, মহুয়া, মানকচু, মুর্তাগাছ, মূলা, রসুন, লাউ, শশা, শাপলা, শিম, শেওলা, সজনেগাছ, সরিষা, সুপারি, হলুদ ইত্যাদি।

৫. প্রকৃতি ও নিসর্গ : আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, আঁধার, আলো, কালপুরুষ, কুয়াশা, ঘূর্ণি, ছায়া, জল, ঝড়, দিন, রাত্রি, দিনমণি, ধোঁয়া, নদী, পাহাড়, প্রাতঃসূর্য, বরফ, বসন্ত, মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, রামধনু।

৬. খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র : খই, খিচুড়ি, ডিম, দুধ, ভাত, রুটি, পালং, কলা, তরমুজ, তাল, জাম, কাপড়, উনুন, ঢেঁকি, চিমটে, চরকা, চুড়ি, মানচিত্র, লাটিম, মশাল, মাচা, নৌকা, লাঙ্গল, গাড়ি, ঘোমটা, সিগারেট, হুক্কা, কবর, কলুর ঘানি, শিলপাটা, কলসী, কামারশালা, কাঁথা, খড়ের গাদা, গরুর খুঁটা, ঘোড়ার গাড়ি, তাস, হাঁড়ি, দেশলাই, দোকান ইত্যাদি।

৭. অক্ষর ও সংখ্যা : বিভিন্ন সংখ্যা, সন-তারিখ, ও একাধিক অক্ষরের শব্দ অবলম্বনে ধাঁধা রচিত হয়।

৮. বাদ্যযন্ত্র : একতারা, করতাল, খঞ্জনী, ঘন্টা, ঘুঙুর, ঢাক, ঢোল, বাঁশি, বীণা, বেহালা, মাদল, শঙ্খ, সেতার।

৯. ভাব ও ক্রিয়া : চুমা, লোভ, চুড়ি পরা, ঘোমটা দেয়া, গুণ টানা, মশলা বাটা, পান কোটা, নিদ্রা যাওয়া, উলু দেয়া, আহার করা, ঝাড় দেয়া, দাবা খেলা, চিড়ে কোটা, ধানভানা, মালা জপা, সাঁঝবাতি দেয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।

উপলক্ষ যাই হোক, তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসে, তাই বলা হয়। অর্থাৎ বিবাহ, খেলা বা কর্মোপলক্ষে স্বতন্ত্রভাবে কোন নির্দিষ্ট ধাঁধা নেই।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে ধাঁধা রচনা করা একটি জাতির কল্পনাশক্তি (imagination), বুদ্ধিবৃত্তি (intelligence), বস্তুজ্ঞান (knowledge), সৌন্দর্যচেতনা, কৌতুকবোধ ও চিত্তস্ফূর্তির পরিচায়ক। যেমন—

১. আকাশেতে আছি আমি গগনেতে নাই/কাননেতে আছি আমি অরণ্যেতে নাই। (ক-অক্ষর);

২. কাঁচাতে কাঁচবরণ সর্বলোকে খায়/পাকাতে সোনার বরণ গড়াগড়ি যায়।(বেগুন);

৩. পোযাকালে পিঁদে শাড়ী, জোয়ানকালে উলঙ্গ/বুড়াকালে মাথায় জটা, ভিতরে তার সুড়ঙ্গ। (বাঁশ);

৪. উড়তে পাখি ঝম্ ঝম্ বসতে পাখি লেদা/আহার করতে য্যায়া পাখি, লেজ পড়েছে বাঁধা। (ভুরি জাল);

৫. খাবার জিনিস নয়, তবু লোকে খায/বৃদ্ধ খেলে করে হায হায়/জোয়ান খেলে এদিক ওদিক চায়, শিশু খেলে কাঁদতে কাঁদতে যায়। (আছাড়);

৬. নীলকণ্ঠ গদাধর, তোমার পায়ে শত গড়/তুমি থাক ডালে, আমি থাকি খালে/তোমার আমার দেখা হবে মরণকালে। (মরিচ ও মাছ);

৭. খোদাব তৈযারী ঘর, নাহি কোন দুয়ার/যোগেন্দ্র পুরুষ এক থাকে নিরাহার/যখন পুরুষবর হয় বলবান/খোদার ঘর ভাইঙ্গা করে খান খান। (ডিম);

৮. তিন অক্ষরে নাম তার, পানিতে করে বাস/মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ছুঁইতে চায় আকাশ। (চিতল);

৯. আগে যায় ফিরে চায়, ওটি তোমার কে/ওর শ্বশুর আমার শ্বশুরকে বাপ ডেকেছে। (শাশুড়ী ও পুত্রবধূ);

১০. সিন্দুরেতে ডগমগ কাজলের রেখা/এমন কে সুন্দরী কন্যা বনে হলো দেখা। (কুঁচ)।

বস্তুনিষ্ঠ ও জাগতিক চেতনার সঙ্গে কল্পনাচাতুর্যের মিশ্রণে ধাঁধাগুলি মোহনীয় হয়ে উঠেছে। মানুষ ও সমাজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, প্রকৃতি ও আবহাওয়া, খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র ইত্যাদি নিয়ে এরূপ ধাঁধা রচনার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনবাদী চেতনার পরিচয় আছে। বাংলার লোকমানস সাংস্কৃতিক জীবনে কৌতুক ও আনন্দকে ধরে রাখতে পেরেছে। জীবনের ক্লেদ, মালিন্য, অস্বচ্ছতা ধাঁধায় রেখাপাত করে নি। 'মাথায জটা', 'নীলকণ্ঠ গদাধর', 'যোগেন্দ্র

পুরুষ', 'খোদার ঘর' ইত্যাদিতে ঐতিহ্য এসেছে অনায়াসে। কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিম ভাষা কোথাও নেই। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনরস শুকিয়ে যায় নি, বরং কৌতুকে ও আনন্দে তা কখনো কখনো স্পন্দিত হয়ে নির্মল আলোকে ঝলকিত হয়। ধাঁধার চর্চার মধ্যে তার প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্য লোকবিজ্ঞানী বলেন : "A genuine folk-riddle is a spontaneous expression, coming from the depths of the soul of a people or a race,.... Riddles are, therefore, in a real sense the vox populi".

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মার মর্মস্থল থেকে ধাঁধা বেরিয়ে আসে বলে তাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। 'এক বাড়ির তিন বউ/এক পালাইলে রান্না খোও।' (উনুন) —এটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরঙ্গতার ছবি। 'মামুরা সিন্নি রান্ধে খায়/আমাকে দেখ্যা দুয়ার দেয়।' (শামুক)—এখানে আত্মীয়তার মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। 'ধানের মধ্যে খামা/কুটুমের মধ্যে মামা।'—প্রবাদটি যখন রচিত হয়েছে তখন মামা ও ভাগ্নের মধ্যে মধুর সর্ম্পক ছিল, কিন্তু ধাঁধা রচনার সময় সে-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে এমনটি হয়েছে। 'একটুখানি গাছে/রাঙা বউটি নাচে।' (মরিচ), 'কালো বউয়ের কপালে চিক/জামাই এলে করে হিত।' (মাসকলাই)', 'ছোট ইটা ছেমরি,/নায়না ধোয়না এতই সুন্দরী।' (রসুন), 'তলে মাটি উপরে মাটি/মধ্যে সুন্দরী বেটি।' (হলুদ), 'ঘরের মধ্যে ঘর/ নাচে কন্যা-বর।' (মশারি) ইত্যাদি ধাঁধা পারিবারিক জীবনের সরস ও সজীব চিত্রকে ধারণ করে আছে। এগুলির অতীত নেই, এগুলি চির নতুন।

উপসংহারে ধাঁধার নিম্নরূপ ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় :

১. ধাঁধা বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত; এতে জাতির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। ধাঁধায় আবেগের স্থান নেই।

২. ধাঁধা বস্তুধর্মী ও জীবনবাদী রচনা; এতে জাতির ইহজাগতিক (secular) চেতনার প্রকাশ আছে। ধাঁধায় ধর্মের কথা একেবারেই নেই।

৩. কৌতূহল ও কৌতুকবোধ থেকে ধাঁধার জন্ম; এতে জাতির সরস জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ধাঁধায় নৈরাশ্যের চিত্র নেই।

৪. ধাঁধা প্রাচীন হয়েও চিরকালীন, জনশ্রুতিমূলক হয়েও সমকালীন। এর বিষয়বস্তু পরিচিত জগৎ থেকে নেয়া হয়। এজন্য এতে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই।

প্রবাদ (Proverbs)

লোকসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে প্রবাদ সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে আছে। আধুনিক যুগে সব ধরনের রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক,

সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার অহরহ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদ লোকসাহিত্যধারায় ক্ষুদ্রতম রচনা—একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি। 'বিষে বিষক্ষয়', 'পর্বতের মুষিক প্রসব', 'গরু মেরে জুতা দান', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে', 'অতি চালাকের গলায় দড়ি/অতি বোকার পায়ে বেড়ি' ইত্যাদি প্রবাদে দুই শব্দের বাক্য থেকে দুই চরণের বাক্য আছে। প্রবাদ যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গ ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের সামাজিক বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। দানাবাঁধা স্বচ্ছ স্ফটিকের সঙ্গে প্রবাদের উপমা দেয়া যায়। স্ফটিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফল। একটি প্রবাদ সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয়। 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'জোর যার, মুলুক তার', 'লাগে টাকা, দিবে গৌরীসেন', 'কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল', 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' ইত্যাদি প্রবাদের আটসাঁট গড়ন; এতে বাড়তি মেদ একটুও নেই। স্বল্প কথায় এত বেশি অর্থবহনক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় নেই।

প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষ উক্তি বা কথন। [প্র-পূর্বক 'বাদ' (বদ্+অ) প্রবাদ) যে উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তাই প্রবাদ। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মতো : সমাজমানসে জন্ম নিয়ে জীবনস্রোতের অনেক পথপরিক্রমা করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। এর পরে তা আর ভাঙে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 'ধান ভানতে শিবের গীত' অথবা 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদটির মৌলিক কাঠামোর পরির্বতন হয় নি। 'শিব' কৃষিদেবতা, 'মহীপাল' বাংলার পাল বংশের শক্তিশালী রাজা। প্রবাদের জন্মেতিহাসের দিক থেকে শিব আগে; অতএব এটি মৌলিক প্রবাদ; শিবের স্থলে মহীপাল পরে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ কাজে বড় বিষয়ের অবতারণা করলে এই প্রবাদ বলা হয়। 'কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল' অথবা 'সরকারের মাল দরিয়া মে ঢাল' প্রবাদে কোম্পানি ও সরকার শব্দের স্থানবদল হয়েছে। 'সরকার' ও 'দরিয়া' ফার্সি শব্দ, 'কোম্পানি' ইংরেজি শব্দ। ফার্সি ভাষার সঙ্গে বাংলার মানুষের আগে পরিচয় হয়েছে, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরে পরিচয় হয়েছে। সুতরাং সরকারযুক্ত প্রবাদটি মৌলিক।

স্পেন দেশীয় সংজ্ঞায় প্রবাদের সৃষ্টিতে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়া হয়েছে : "A proverb is a short sentence based on long experience."—প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। ফরাসী পণ্ডিত বলেন, "Proverbs are crystalized forms of human experience."—প্রবাদ হলো মানুষের অভিজ্ঞতার স্ফটিকীকৃত রূপায়ণ। এ্যারিস্টটল জাতির জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার উপর জোর দেন। তাঁর মতে প্রবাদ হলো "Fragments of an elder wisdom."

সমাজের প্রবীণ মানুষের বুদ্ধির সারসংক্ষেপ হলো প্রবাদ। দার্শনিক বেকনও প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির মেধা, বুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রতিফলন দেখেছেন। তিনি বলেন, "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs." আর্চার টেলরের সংজ্ঞাটি এরকম : "A proverb is a terse didactive statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one."[৪২] তাঁর মতে, প্রবাদ হলো ঐতিহ্যাশ্রিত নীতিশিক্ষামূলক নিটোল উক্তি, তিনি এ-ও বলেন যে, প্রবাদে একের বুদ্ধি ও বহুর জ্ঞান নিহিত আছে। ডবলিউ. সি. হ্যাজলিট প্রবাদকে লোকমনে ব্যাপ্ত সত্যের প্রকাশ বলেছেন; অলঙ্কার ও ছন্দের ভাষায় তা ব্যক্ত করা হয়। তাঁর ভাষায় : "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole."[৪৩] ডিজরেলি বলেন : "Proverbs were anterior to books, and formed the wisdom of the vulgar, and in the earliest ages were the unwritten laws of morality."

উপরের সংজ্ঞা থেকে প্রবাদ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য পাওয়া যায়—এক. প্রবাদে জাতির 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (long experience), 'পরিণত বুদ্ধি' (elder wisdom), 'নিটোল নীতিবাক্য' (terse didactive statement), 'নৈতিকতার অলিখিত বিধি' (unwritten laws of morality), এবং 'লোকমনে প্রবাহিত সত্যকথন' (words conveying a truth to the mind) প্রকাশিত হয়। দুই. প্রবাদের অবয়ব হলো 'একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য' (a short sentence), 'স্ফটিকীকৃত রূপ' (crystalized forms) ও 'শব্দগুচ্ছের সমন্বয়' (combination of words)। তিন. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত (current in tradition)। চার. উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ভাষায় (by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole) প্রকাশিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংহত বাক্য হলে প্রবাদ হয়, অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ প্রবাদ নয়—এগুলিকে 'বাগ্‌ধারা' (idioms) বা প্রবাদকল্প 'বাগ্‌ভঙ্গি' (proverbial phrases) নামে অভিহিত করা সঙ্গত। তবে বাংলায় কতক প্রবাদকল্প শব্দগুচ্ছকে, যেমন 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ', 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে', 'তেলেবেগুনে জ্বলে উঠা', 'কেঁচে-গণ্ডুষ করে লাগা' ইত্যাদিকে প্রবাদ থেকে আলাদা করা যায় না। অন্ত্যমিলবিশিষ্ট ও ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের প্রবাদের সংখ্যাও অনেক।

(১)

উনা ভাতে দুনা বল,
অতি ভাতে রসাতল।

---

৪২. *SDFML*, 902 .

৪৩. W. C. Hazlitt, *A Dictionary of American Proverbs and Proverbial Phrases*, P. X.

(২)

বাকি, বাক্য, বাটপারি,
এই তিন নিয়ে দোকানদারি।

(৩)

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখনষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।

প্রবাদগুলিতে কেবল জীবনদৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি নয়, যথেষ্ট রসবোধ ও কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। তা হলো এই যে, প্রবাদসৃষ্টির পেছনে একটি বিশেষ অর্থ আছে সত্য, কিন্তু প্রয়োগের কালে এর অর্থব্যাপ্তি ঘটে; মূল থেকে প্রয়োগের স্থান-কাল-পাত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' প্রবাদের জন্মোৎস হয়তো কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা; কিন্তু বর্তমানে এর প্রয়োগ ব্যাপ্তিলাভ করেছে; বাইরে সদ্ভাব, ভেতরে অসৎ উদ্দেশ্য—এমন যেকোন আচরণ বোঝাতে এরূপ প্রবাদের উল্লেখ করা হয়। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'চোরের মার বড় গলা', 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি ধরা না পড়ে', 'চোরের মন সদাই পুলিশ পুলিশ করে' ইত্যাদি প্রবাদ শুধু চোর ও চৌর্যবৃত্তির কথা বোঝায় না, নানা শ্রেণীর অসৎ ব্যক্তি ও তাদের অসৎ কর্ম বোঝাতেও এসব প্রবাদের ব্যবহার হয়। 'ঘোলা পানিতে মাছ শিকার' একটি বাস্তব ঘটনা; কোন ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার আচরণ বোঝাতে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা' প্রবাদটিও কোন এক নটের অদক্ষতা থেকে উৎসারিত; এখন অপটু, অদক্ষ, অক্ষম ব্যক্তি অজুহাত হিসেবে কিছু খাড়া করলে এই প্রবাদের উল্লেখ করা হয়। তবে নীতিশিক্ষা ও উপদেশমূলক প্রবাদগুলি বাচ্যার্থেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বোল্লেখিত ৩টি প্রবাদের এমন ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। আরো দৃষ্টান্ত দেয়া যায়—'অন্ন দেখে দিবে ঘি/পাত্র দেখে দিবে ঝি', 'মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল', 'শাক, অম্বল, পান্তা/তিন ওষুধের হন্তা', 'কথা, কড়া, কারসাজি/তিন কতে কবিরাজি', 'মশা, মোল্লা, শাঁখা/এই তিনে ঢাকা' ইত্যাদি বাদে ব্যক্তি বা স্থানের গুণ বা ধর্মবাচক প্রবাদের বাচ্যার্থই মুখ্য। তবে 'কড়ি থাকলে ভেড়াকান্ত'/দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত' বা 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে ফাঁদ' প্রবাদে ব্যঞ্জনা আছে। প্রথমটিতে বিত্ত সামাজিক মান-মর্যাদা বাড়ায়, দ্বিতীয়টিতে বিত্ত-বর্ণে সমতা না থাকলে সামাজিক সম্পর্কে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের স্বতন্ত্র শাখা বটে, তবে প্রবাদের স্বাধীন ব্যবহার নেই; গদ্য ও পদ্য রচনার মধ্যে প্রবাদ প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়। এ দিক থেকে বাচ্য বা ব্যঞ্জনামূলক যাই হোক না কেন, প্রবাদের অর্থই মুখ্য।

প্রবাদ সম্পর্কে জার্মানদেশে বলা হয়, "As the country, so the proverb"—যে দেশ যেমন, তার প্রবাদও তেমনি। স্কটল্যান্ডে বলা হয়, 'As the people, so the proverb'—যেমন মানুষ, তেমনি তার প্রবাদ। উভয়ের সমন্বয় করে বলা যায়, যে দেশের যে রকম মানুষ, সে দেশের ও সে মানুষের প্রবাদও তেমনি। অর্থাৎ একটি দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, প্রাণী, সম্পদ, উৎপাদন ও জাতির জীবনের নানা ধারা, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ঘর-সংসার ইত্যাদি বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়। বিপরীতভাবে বলা যায়, প্রবাদে একটি দেশের ও জাতির অন্তর্জীবনের নানা চিত্র পাওয়া যায়; এগুলি খণ্ড চিত্র, তবে খাঁটি চিত্র। কারণ প্রবাদ লোকমনের সত্যরূপ বহন করে (conveying a truth to the mind)। প্রবাদ বুদ্ধিপ্রধান রচনা, এজন্য অনুমিত হয় যে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা প্রবাদের আঙ্গিক গঠন (form) এবং প্রয়োগ-কৌশল (art of use) মানুষ পরবর্তীকালে আয়ত্ত করেছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে মিশরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদ আছে। ভারতীয় বেদ-উপনিষদে প্রবাদ আছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে কয়েকটি প্রবাদ আছে। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরি' প্রবাদটি চর্যাপদকর্তা ভুসুকু ব্যবহার করেন এগারো শতকে, চৌদ্দ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও* একই প্রবাদ ব্যবহার করেন; ষোল শতকে মুকুন্দরাম *চণ্ডীমঙ্গলে* তা ব্যবহার করেন। এ ধারা মধ্যযুগে অব্যাহত থাকে। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার ঘটে, প্রবাদের ব্যবহারও বহুল ও বিস্তৃত হয়।

Oxford Dictionary of English Proverbs গ্রন্থে দশ হাজার প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। বাংলা প্রবাদের এরকম সুপরিকল্পিত সঙ্কলনগ্রন্থ নেই। জেমস লঙ *প্রবাদমালা* (১৮৬৮) গ্রন্থে ২,৩৫৪টি প্রবাদ উৎকলিত করেন। কানাইলাল ঘোষাল *প্রবাদসংগ্রহ* (১৮৯০) গ্রন্থে ১,২১৮টি, দ্বারকানাথ বসু *প্রবাদপুস্তক* (১৮৯৩) গ্রন্থে ২,২৭১টি, সুবলচন্দ্র মিত্র *সরল বাংলা অভিধানে* (১৯০৯) ৩,২০১টি, সুশীলকুমার দে *বাংলা প্রবাদ* (১৩৫২) গ্রন্থে ৬,৬৮১টি প্রবাদ সঙ্কলিত করেন। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান দুই খণ্ডে *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (১৯৭৬) প্রকাশ করেন। এতে মোট ৮,৮৪২টি (৩,৪৩৮+৫,৪০৪) প্রবাদ আছে। সুশীলকুমার দে অক্ষরানুক্রমিক প্রবাদ বিন্যস্ত করেন এবং মোহাম্মদ হানিফ পাঠান বিষয়ভিত্তিক প্রবাদ বিন্যস্ত করেন। প্রথম খণ্ডের সূচিপত্রে ৭১টি বিভাগ আছে, যথা নারী, স্বাস্থ্যনীতি, আপন-পর, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দরিদ্র, ধনী-দরিদ্রের সম্বন্ধ, স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, পেটুক, নিষ্কর্মা, আহাম্মক, পরপ্রত্যাশী, চোর, শত্রু, কৃপণ, অপব্যয়ী, দাতা, নিন্দুক, ধূর্ত, অধর্ম, মধ্যপন্থী, উত্তম, ভীতু ও নির্ভীক, অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, স্বার্থ, অধ্যবসায়, সংসর্গ, প্রেম-প্রীতি, পাপ-ভীতি, একতা, ব্যবহারবিধি, কপটতা, বাগাড়ম্বর, প্রতিজ্ঞা, সুযোগ, হুজুগ, পরিহাস, সুদিন ও দুর্দিন, আশা ও নৈরাশ্য, বিপদের উপর বিপদ, উভয়সঙ্কট, দো-দীল,

স্বভাব অপরিবর্তনীয়, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরকে দিয়ে বাহাদুরি, অনধিকারচর্চা, অতি কিছুই ভাল নয়, বিষম ব্যাপার, সর্বনাশা কর্ম, অদৃষ্ট, পরিচয়-লক্ষণ, স্থান-কাল-পাত্রভেদ, নতুন ও পুরাতনের মূল্যভেদ, পথচলার হুঁশিয়ারি, জোর-জুলুম, গোপনীয়তা রক্ষা, কথার মূল্য, দ্ব্যর্থবোধক কথা, জনমত, বিচার-বিভ্রাট, ক্ষতচিহ্ন লুপ্ত হয় না, গো-ধন প্রসঙ্গ, লিখন-পঠন, ক্ষণিকতা, বৈরাগ্য ও বিবিধ প্রবাদ। এরকম বিভাজনে প্রবাদের পরিধি, বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তবে একে বৈজ্ঞানিক বিভাজন বলা যায় না। কারণ এ বিভাজন কোথাও বিশিষ্ট শব্দ, কোথাও বিষয়, কোথাও অর্থ ধরে হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন—প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র্য-নীতি। বার-তিথি-দিন-মাস-ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কিত বচন, প্রকৃতিমূলক, মাতা, কন্যা, বধূ, শ্বাশুড়ী, ননদ, সতীন ইত্যাদি রক্ত-পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কিত, নারীমূলক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানবচরিত্রমূলক ও নীতিমূলক প্রবাদের উল্লেখ করেছেন তিনি।[৪৪] তাঁর এরূপ বিভাজন সঠিক, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী আর্চার টেলর ও বি. জে. হুইটিং প্রবাদগুলিকে বিষয় বা প্রধান বিশেষণ বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দের নাম ধরে শ্রেণীবিভাগ করেন। আশরাফ সিদ্দিকী এমন রীতি অনুসরণে অক্ষরানুক্রমিক বিভাজন করেন। 'অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।', 'দুই সতীনের ঘর খোদায় রক্ষা কর', 'যদি বর্ষে আঘনে, রাজা যায় মাগনে'—এই তিনটি প্রবাদকে যথাক্রমে 'অল্প', 'সতীন' ও 'কৃষি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি।[৪৫] এরকম বিভাগ দ্বারা প্রবাদের কোষ বা সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করা সুবিধাজনক, তবে প্রবাদের বিচার-বিশ্লেষণ এজাতীয় বিভাগ দ্বারা হয় না। বাচ্যার্থ হোক, ব্যঞ্জনার্থ হোক, প্রবাদের বিষয় (theme) ও অর্থ (meaning) দ্বারা বিভাগ যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি। হাজার হাজার প্রবাদকে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা কঠিন। গ্রহণযোগ্য কয়েকটি মুখ্য বিভাগ এভাবে করা যায় : ১ প্রকৃতি ও নিসর্গ; ২. নারী ও পুরুষ; ৩. বৃত্তি ও বৃত্তিজীবী; ৪. মানবচরিত্র ও স্বভাবধর্ম; ৫. নীতি ও উপদেশ; ৬. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা; ৭. হাস্য-ব্যঙ্গ-নিন্দা-কৌতুক; ৮. প্রাণী ও জীবধর্ম; ৯. সমাজ-ধর্ম-দর্শন-অর্থনীতি-রাজনীতি; ১০. বিবিধ।

'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ', 'খাল কেটে কুমীর আনা', 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়', 'মরা হাতির লাখ টাকা দাম', 'হাতি কা দাঁত, মরদ কা বাত', 'হাতি খাদে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে', 'হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল', 'ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখনি', 'কাক ধূর্ত আর কাযেত ধূর্ত', 'মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার' ইত্যাদি প্রবাদে দেশের প্রাণিকুলের (fauna) পরিচয় আছে। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অবস্থা প্রভৃতি বোঝাতে প্রবাদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। গণ্ডার ব্যতীত অন্য সকল প্রাণী বাংলাদেশের জীবজন্তুর অন্তর্ভুক্ত।

---

৪৪. *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ৬০৪-০৭।
৪৫. *লোকসাহিত্য*, ২৬৮-২৭২।

'মশা, মোল্লা, শাঁখা এই তিনে ঢাকা', 'ধান, ডাকাত, খাল এই তিনে বরিশাল', 'সারেঙ, শুঁটকি, দরগা এই তিনে চাঁটগা', 'জমিদার, গান, মৈষের শিং, এই তিনে মৈমনসিং', 'আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান এই তিনে বর্ধমান', 'ষাঁড়, রাঁড়, সন্ন্যাসী এই তিন নিয়ে হলো কাশী' ইত্যাদি প্রবাদ এক এক স্থানের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। প্রবাদগুলি বাচ্যার্থনির্ভর। 'বামুন, বাদল, বান দক্ষিণা পেলেই যান।' 'সাপ, শালা, জমিদার তিন নয় আপনার', 'শাক, অম্বল, পান্তা তিন ঔষুধের হন্তা', 'রাও, বাও, নারী তিন কয়েতের বৈরী', 'বাকি, বাক্য, বাটপারি এই তিনে দোকানদারি', 'অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ তিনের রেখ না চিন', 'দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি এ তিন বড় উপকারী', 'তাস, তামাক, পাশা তিন কর্মনাশা' ইত্যাদি প্রবাদও বাচ্যার্থনির্ভর। ব্যক্তি-বস্তু-বিষয়বাচক তিন শব্দ দ্বারা প্রবাদের অবয়ব গঠিত। এ্যালান ডান্ডিস কথিত 'তিনের সূত্র' (the law of three) অনুসারে এমনটি হয়েছে।[৪৬] ছন্দ ও অন্ত্যমিল স্মৃতিতে ধারণ করার সুবিধা আছে। বিচিত্র বিষয়কে কাঠামোগত ঐক্যের মধ্যে ব্যক্ত করায় এতে করে প্রবাদ রচয়িতাদের শিল্পীত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'অর্থ অনর্থের মূল', 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', 'এক কড়ার মুরোদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই', 'হাতে নেই কড়াবট, প্রাণ করে ছটফট', 'টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়', 'হাট না বসতেই দাইড়ার কড়ি', 'পরের ধনে পোদ্দারি', 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি' ইত্যাদি প্রবাদ অর্থকেন্দ্রিক। সাধারণত অর্থের মন্দের দিকটি বেশি ফুটেছে। ধনবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণের চিহ্ন আছে এসব প্রবাদে।

'চাচা আপন জান বাঁচা', 'আপ ভাল তো জগৎ ভাল', 'আপনা হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো হাত', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম, দেশ দশ নিজের ধাম', 'আপন চরকায় তেল দাও' ইত্যাদি প্রবাদে আত্মমুখী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'একতাই বল', 'একের বোঝা দশের লাঠি', 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ', 'দশ চক্রে ভগবান ভূত', 'যেদিকে দশ সেদিকেই খোদা' প্রবাদগুলিতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও ঐক্যবোধের পরিচয় আছে। এগুলি বাংলার মানুষের বিশ্ববীক্ষা (world-view) সম্পর্কে আলোকপাত করে। 'রাখে আল্লাহ মারে কে ?', 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন', 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়', 'খোদা যাকে দেয় ছপ্পর ফেড়ে দেয়' প্রবাদগুলিতে অদৃষ্টবাদের (fatalism) কথা আছে। 'খাটে খায় দ্বিগুণ পায়, বসে খাটায় অর্ধেক পায়', 'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়' প্রবাদে কর্মবাদের লক্ষণ আছে। জগৎ-সংসারকে আদিকালে ধর্মবিশ্বাস, পরবর্তী যুগে দার্শনিক মতবাদ এবং আরো পরে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দ্বারা দেখা হয়; লোকবিজ্ঞানী একেই 'বিশ্ববীক্ষা' বলে অভিহিত করেন। বাংলার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে দৈব বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ ও

---

৪৬. Alan Dundes, (edited), *The Study of Folklore*, (New Jersey 1965), 131.

ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছে; বস্তুতন্ত্র বা যুক্তিবাদের স্থান খুব কম। শেষের দুটি প্রবাদে যুক্তি আছে। 'যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল', 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' প্রবাদ দুটিতে বিপরীতধর্মী দর্শন আছে। একটিতে বস্তুবাদী দর্শন, অপরটিতে নৈরাশ্যবাদী দর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

নর-নারীর স্বভাব-চরিত্র, পেশা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবাদের সংখ্যা অজস্র। পরিবার ও সমাজ সূত্রে রক্ত, জ্ঞাতি, স্বজন, পরিজন সম্পর্কিত যতো নর-নারী আছে, তাদের প্রায় সকলের স্বভাব-চরিত্র-আচরণ নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়েছে। প্রধানত এদের সমালোচনা করা হয়েছে; সমালোচনায় গুণ অপেক্ষা ত্রুটির দিক বেশি ধরা পড়েছে। এতে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকটি সূচিত হয়। মা-বাবা, মামা-মামী, মাসী-পিসী, চাচা, দাদা, বধূ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, জা, ভাসুর, দেবর, শ্যালক-শ্যালিকা, নাতি-নাতিনী, সতীন, সৎমা, সখী ইত্যাদি সম্পর্কে শত শত প্রবাদ আছে। এগুলির মধ্যে বাবা, মা, মামা ইত্যাদি ব্যতীত অন্যদের নিন্দা-ব্যঙ্গ-হীনভাব দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বিশেষত নারীর নিন্দা সমধিক। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, নারীবিষয়ক প্রবাদগুলির রচয়িতা নারীসমাজ; নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে আত্মীয়-স্বজনকে সুদৃষ্টিতে দেখা বা তার প্রতি সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।[৪৭]

'ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে', 'শাশুড়ী মল সকালে, খেয়ে দেয়ে সময় থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে', 'ননদিনী বায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কাল-সাপিনী', 'যমজামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা', 'শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি', 'দুই সতীনে ঘর, খোদাই রক্ষা কর' ইত্যাদি প্রবাদ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। যে সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃতি পায় না, সে সমাজে এমন প্রবাদ জন্মে ও লালিত হয়।

'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট', 'মোগল-পাঠান হদ্দ হলো ফার্সি পড়ে তাঁতী', 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, নিধিরাম পোদ্দার', 'আনাড়ি বৈদ্যে কান নষ্ট, কাঠমোল্লায় ঈমান নষ্ট', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট', 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি', 'কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত', 'বামন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর', 'বামুন, বাজ্র, বাঁশ তিনে বাস্তু নাশ', 'কড়ি দিয়ে কিনব দই, গয়লানী মোর কিসের সই', 'হাকিম নড়ে, হুকুম নড়ে না', 'ঝড়ে বক মরে, পীরের কেরামতি বাড়ে', 'চোরের নজর বোচকার দিকে', 'গাঁয়ের যুগী ভিক্ষা পায় না', 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'চালাক মাঝির ঘোপায় লা' ইত্যাদি প্রবাদে বিভিন্ন পেশার মানুষের চিত্র ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রবাদ দ্ব্যর্থবোধক—বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের স্বভাবের ও আচরণের অনিষ্টকর ও অপ্রীতিকর দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। মানুষ দক্ষতা, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে তবেই

---

৪৭. *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ ৬০৪।

সমালোচনার পাত্র হয়। সমাজে ভাল মানুষের অভাব আছে, মন্দ লোকের অভাব নেই, সে বাস্তবে প্রতিবাদ করতে পারে নি, তাই প্রবাদে সমালোচক (critic) হয়ে উঠেছে। 'সাপ, শালা, জমিদার, তিন নয় আপনার' প্রবাদটিতে আছে সামাজিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। প্রবাদকার এখানে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যে সমাজে 'পোলা বেচ পুরী বেচ খাজনা দিয়া আগ হচ' অর্থাৎ পুত্র-কন্যা বিক্রি করে হলেও জমিদারের খাজনা দিতে হয়, সে সমাজে জমিদারের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে না, অবজ্ঞাই জাগে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ', 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও', 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' ইত্যাদি প্রবাদে unwritten law of morality-র দৃষ্টান্ত আছে।

প্রবাদ ভাষার এক বিশাল ও অমূল্য সম্পদ। প্রবাদ বক্তব্যকে সুসংহত করে, ধারালো করে, অর্থবহ করে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "সুন্দরী, অলক-তিলকের ন্যায় প্রবাদবাক্যগুলি ভাষায় সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলে।"[৪৮] প্রবাদ ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যকে 'জনপদের হৃদযকলরব' বলেছেন। আমরা উপরের আলোচনায় লোকসাহিত্যের সকল ধারার একটি রূপরেখা দিয়েছি। শুধু 'জনপদের হৃদযকলবব' নয়, জীবনেব সঙ্গে জীবনের যোগ, সমাজের অভ্যন্তরের নানা মাত্রিক চলমানতা, জাতিসত্তাব স্পন্দন, ঐতিহ্যরস, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, নৈতিক চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা আলোকপাত করেছি। লোকসাহিত্যের শিকড় মাটি আর মানুষের গভীরে, দেশের প্রকৃতি আর জনগণের জীবনে ডাল-পালা, ফুল-ফল বিস্তার করে শিল্প-সংস্কৃতির এক আনন্দ ও সৌন্দর্যলোক রচনা কবেছে। বাংলার মানুষের তা নিজস্ব ও খাঁটি সম্পদ। 'তুমি হও বটবৃক্ষ, আমি হব লতা'— নারী পুরুষকে এমন দৃষ্টিতে দেখেছে। আর 'তুমি হও গহিন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি'—পুরুষ নারীকে এই দৃষ্টিতে দেখেছে। বিশ্ববাসী সম্পর্কে পল্লীকবির অভিব্যক্তি হলো—'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।' সমাজবন্ধন ও ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে বাংলার কবি চণ্ডীদাসও ঘোষণা করেন, 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বাংলা লোকসাহিত্যের বিচিত্র ভাব ও সুরে এরকম জীবনবোধ ও মানবমহিমার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রাশিয়ার লোকবিজ্ঞানী বলেন, "Folklore is an echo of the Past, but at the same time it is the vigorous voice of the Present."[৪৯] —ফোকলোর হলো একাধারে অতীতের প্রতিধ্বনি আর বর্তমানের প্রবল কণ্ঠস্বর। আশাকরি আমাদের আলোচনায় এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

৪৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী' (সভাপতির ভাষণ), *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৪২৫।

৪৯. Y. M. Sokotov, *Russian Folklore*, (New York 1980), 15.

১২

আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য

আবদুস সোব্হান*

আরবি সাহিত্য

খৃস্টীয় তেরো শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরপরই দেশের যেসব জায়গায় ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বসতি স্থাপন করেছিল সেসব জায়গায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। দেশের শাসকবর্গের ভাষা ফার্সি হলেও ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি প্রাধান্য পায়। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসাগুলোর ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আরবি সাহিত্যের বিকাশলাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মসজিদ ও মাদ্রাসা ছাড়াও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের পরিচালিত শিক্ষালয়গুলোও দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং তাঁরাও আরবি শিক্ষার প্রসারে প্রচুর অবদান রাখেন। ইসলামী শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়মেই কুরআন ও হাদিস শিক্ষা এবং সেই সাথে 'সিরাত' (মহানবীর জীবনী) মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের পুরোভাগে স্থান পায়। তার পরই স্থান পায় 'তফসীর' (ভাষ্য ও টীকা) এবং 'ফিকাহ্' (আইনবিজ্ঞান)। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত ধর্মনিরপেক্ষ ও পেশাগত বিষয়সমূহ উচ্চতর শিক্ষার্থীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করে। বাংলার আরবি শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু ফার্সির বেলায় তা প্রযোজ্য ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে ঐসব জায়গায় আসতে শুরু করে। এ ধরনের প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল গৌড়, পাণ্ডুয়া, দারাসবাড়ি, রংপুর, সোনারগাঁও, ঢাকা, বাঘা, সিলেট ও চট্টগ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ (আশি) হাজার।

---

* ফার্সি ভাষার অধ্যাপক, মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ, কলকাতা।

সবচেয়ে প্রাচীন যে আরবি পণ্ডিতের রচনা সংরক্ষণ করা হয়েছে তাঁর নাম কাজি রুকনউদ্দিন সমরকন্দী[১] তাঁকে বুখারার প্রখ্যাত হানাফী আইনবিদ সমরকন্দের অধিবাসী কাজি রুকনউদ্দিন আবু হামিদ মুহম্মদ আল-আমাদী বলে সনাক্ত করা হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন আলি মর্দান খিলজীর রাজত্বকালে (১২১০-১২১৩ খৃ.) বাংলায় কয়েক বছর চাকুরি করার পর তিনি ১২১৮-১৯ সালে বুখারায় ইন্তেকাল করেন। এই ভিজিটিং মুসলিম মনীষীই *অমৃতকুণ্ড*[২] নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি আরবিতে (এবং ফার্সিতেও) অনুবাদ করেন বলে ধারণা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপ ও ইরানের কয়েকটি পাঠাগারে এর কতিপয় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

খৃষ্টীয় তেরো শতকের শেষদিকে শেখ শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামা কর্তৃক ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁ-এ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষালয়টি ছিল[৩] বলতে গেলে সভ্যজগতের এই অংশে আধ্যাত্মিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা। সমকালীন বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ শরাফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী সোনারগাঁও-এ শেখ তাওয়ামার কাছে বাইশ বছরকাল তফসীর ও হাদীস শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বিহারের মানেরে প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেখানে একই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, যা মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত সুফি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সোনারগাঁও খানকাহ্‌টি এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল।

বাংলাদেশে আরবি শিক্ষার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল সিলেটে। খৃষ্টীয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাধক শাহ্ জালাল (মৃ. ১৩৪৭) কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই এটি পরিচালিত হতো। যদিও সে সময়ের কোন আরবি পুস্তকের নমুনা আমাদের কাছে নেই, তবু এটা প্রায় নিশ্চিত যে শাহ্ জালালের শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু এবং এখান থেকেই ইসলামী ধর্মান্তরকরণপ্রয়াসের মূল কাঠামো গড়ে উঠে। এই সাধকের প্রচার থেকে নিঃসৃত ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলা যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে আসে, তখনই এ প্রদেশে আরবি সাহিত্যের বিকাশলাভ ঘটে। সৌভাগ্যবশত বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি অনুসরণ করতেন এবং তার ফলে প্রাচ্যের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিপুল

---

১. Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal*, (2nd revised edition, Chittagong 1985), 94-96.

২. *অমৃতকুণ্ড* ও তার লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *Journal Asiatique*, Tome CCXIII, 292-344; *Journal of the Pakistan Historical Society* I: I (Dacca 1953), 54-55; Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, (Riyadh 1985), 844.

৩. S. H. Masumi, Sonargaon, *Islamic Culture*, XXVII : I (Dacca 1953), 1-12.

গতিসঞ্চার হয়। ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে স্থানীয় ধর্মগুরুদের সৃজনশীল তৎপরতা আরো জোরদার হয় এবং তাঁরা আরবি ভাষায় তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন।[৪] এ সময়ের প্রথম সারির পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন মৌলবি ওবায়দুল্লাহ আল-উবায়দি (১৮৩৪-১৮৮৫)। তিনি কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন এবং পরে হুগলী কলেজে আরবির অধ্যাপক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। এরপর ১৮৭৪ সালে তিনি ঢাকায় চলে যান এবং কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার আদর্শে সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে ১৮৮৫ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তা পরিচালনা করেন। তাঁর রচিত আরবি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *তাজকিরাত-উল-ফুহুম ফি তাহকিক-ই-মা'খাছ উল-উলুম, তারাজ আল-আজহার ফি সিভার-উল-ফালাসাফাত-উল-কিবির, তাশখিস-উল ইদরাক ফি হাকিকাত-উল-বারাকাত-উল আর্‌দওয়া উজুদ-উল-আফলাক,দরাইয়াত-উল-আদব ফি লিসান-উল আরব, আল-মানাহিল-উল-সাফিয়া ফি মাসাইল-উল-জুরাফিয়াহ, লুব-উল-ইরাব* এবং *তাদরিব-উল-তুল্লাব*।[৫] তিনি তাঁর আরবি কবিতার একটি সঙ্কলনের পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সঙ্কলনটি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর আরবি ভাষার ব্যাকরণ বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ বইটি আরবি শিক্ষার প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উবায়দির অন্যতম শিক্ষক আবদুর রহিম গোরখপুরী[৬] (১৭৮৫-১৮৫৬) ছিলেন একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ, কবি ও লেখক। তিনি বেশিরভাগ সময়ই কলকাতাবাসী ছিলেন, মাত্র বছর খানেক তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর আরবি কাসিদা ও কবিতাগুলো রচনা করেন। তাঁর কিছু মৌলিক আরবি রচনা এবং অনুবাদগ্রন্থও আছে। এগুলোর মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের উপর লিখা তাঁর একটি গ্রন্থ হচ্ছে *আনওয়ার-উল-মাশরিকিয়াহ ফি আমর বিল মানতিকিয়া*। গ্রন্থটি ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ঢাকার আর একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন আবদুর রহিম খাকি। তিনি প্রশাসন বিভাগে চাকুরি করতেন। তিনি আরবিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং নীতিশাস্ত্র বিষয়ক ফার্সি গ্রন্থ *জামী-উর-রমুজ* থেকে অংশবিশেষ আরবিতে অভিযোজন করেন। তিনি *কাসিদা বাদউল-আমালী* নামক আরবি গীতিকাব্যটি ফার্সিতে অনুবাদ করেন। মুহম্মদ ইসহাক বরদাওয়ানী (১৮৬৬-১৯৩৮) ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের

---

৪. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, S. K. Das, *Sahibs and Munshis of the Fort William College*, (New Delhi 1975).

৫. অধিকাংশ রচনাই লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়।

৬. A. F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh: Tradition and Transformation*, (Dhaka 1987), 24-31.

শিক্ষক ছিলেন এবং পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। তিনি আরবিতে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যেমন, *সিহ-উল-ওয়াউমুল ইলা ইলম্-ইল-উসুল*, *আল-হিকমাত-উল-বালিগা ফি মাকারিম-ইল-আখলাক ওয়াল-আদাব*, *আত-তাহকিকাত-উস-সুনিয়াহ* এবং *আল-নাউ-উল লামী*।

বাংলায় মুসলিম জাগরণের পাদপীঠ ঐতিহাসিক কলকাতা মাদ্রাসার[৭] সঙ্গে জড়িত ছিলেন জন্মগতভাবে বা বসতিস্থাপনসূত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসী আরবি ভাষায় সুদক্ষ পণ্ডিতবর্গ। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মুহম্মদ মুসা (মৃ. ১৯৬৪) ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় কয়েকটি উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলো হচ্ছে *তাহসিরিল মানতিক*, *তালিম-উল-ফারায়েজ*, *আল-বায়ান আল-আজহার ফি শারহ্-ই-ফিকাহ্ ইল-আকবর*, *রায়হানাত-উল-আদব*, *সুবহাত-উল-আদব*, *কিতাব-উল-ইনশা* এবং *কিতাব উল-আমালিহ*। আবদুর রহমান কাশগরি (১৯১২-১৯৭১) ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তিনি কেবল প্রখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিতই ছিলেন না, আরবি ভাষায় একজন মেধাবি কবি, সমালোচক এবং আভিধানিকও ছিলেন। আরবিতে রচিত তাঁর বইগুলো হচ্ছে *আল-জাহরত* (কাব্যগ্রন্থ), *ইলা শাবাব-ইল-আলম-ইল-মুহম্মদ আল্লাহ-উ-আকবার সাহুফল হাক্কিল মাসলুল* এবং *মাতারিহুল ঘুরবা*। *আল-মুফিদ* শিরোনামে তিনি আরবি, উর্দু ও বাংলা এই তিন ভাষার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিধানও সঙ্কলন করেন, যা ১৯৬১ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঢাকার অন্যান্য সমকালীন আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ নাদভী (১৯০০-১৯৭২), শেখ আবদুর রহিম (১৯০৪-১৯৭৩), মওলানা জাফর আহমদ উসমানী(১৮৯২-১৯৭৪), মুফতি দীন মুহম্মদ খান (১৯০০-১৯৭৪), মুফতি আমিনুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪), মওলানা আবুল হুফ্ফাজ ফসিহ (১৯০১-১৯৭৪) এবং শামসুল উলেমা মওলানা বিলায়েত হোসেন (১৮৮৭-১৯৬৪)। বাংলাদেশে আরবি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা সবাই অবদান রেখে গেছেন।

সুফী সাধকদের অভূতপূর্ব ও অবিরাম প্রচারকাজের ফলে ইসলামী অধ্যাত্মবাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষকরে চট্টগ্রাম এলাকা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এসব সুফি সাধকের অনেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই এলাকা ও তার আশেপাশে তাঁদের সমাধিও রয়েছে। কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতা তাঁদের এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হন।[৮] এরা হলেন সঙ্গীতগ্রন্থ *তাহকিকুল*

---

৭. কলকাতা মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Abdus Sattar, *Tarikh-i-Madrasah Aliah*, (Dhaka 1959).

৮. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ*, (ঢাকা ১৯৮৬), ১১৭-১৫৬।

আজাবির ফিস সামা-ইন মাজামির-এঁর রচয়িতা মওলানা শাহ্ মুহম্মদ আবদুল হাই; *সহিফাত-উল-আমল ওয়া মির তাউল আহওয়াল* এবং *ওয়াজা-ইফ-উল মুজাককিরিন* গ্রন্থের লেখক আবদুল আলি দুররী; *মাজাল্লাতুল আদিব লি-আজাল্লাত-ইস-সন্দ্বীপ, আল-তারিফ-লিল আদিব ইজ-জারিফ, জাওয়ামি-উল-কলিম, শারহ্ সাবা মুয়াল্লিকা*, এবং *আল-মানতুক* গ্রন্থের রচয়িতা আবুল আওয়াল জৌনপুরী; *কাসাইদ-ই-আরবি, নাজম-উল-আফাইদ* ও *মাকাতিব* গ্রন্থের লেখক শাহ্ সুফি ওয়ালি আহমদ নিজামপুরী; *খায়ের-উজ-সুফি ওয়ালি আহমদ নিজামপুরী, খায়ের-উজ-জাদ ফি সায়ের-ইত-দাদ নিমাল আরুদজ ফি নাজ'ম-ইল-ফুরুজ* এবং *আজিজুল কালাম ফি মাধ-ই-খায়ারিল আনাম* পুস্তকের লেখক মুফতি মুহম্মদ আজিজুল হক (মৃ. ১৯৬০), *নিম-আর রাসা'ইল ফি নাজম্-ইল মাসা 'ইল, আনিস-ইল-আরব ফি নাফিস-ইল-আরব* এবং *জালিস-উত-তারাব* গ্রন্থের রচয়িতা নাজির আহমদ আনোয়ারী এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের উপর আরবি ভাষার বহু ধর্মীয় প্রবন্ধের লেখক হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতি ফয়জুল্লা (মৃ. ১৯৭৬)। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী অঞ্চলেও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, মুহম্মদ আবদুল গনি, হাফিজ মুহম্মদ কোবাদ (মৃ. ১৯৭৫). মুহম্মদ নূরুল্লাহ (মৃ. ১৯৭২), নূর মুহম্মদ আজমী (মৃ. ১৯৭৩) এবং মমতাজউদ্দিন আহমদ (মৃ. ১৯৭৪)।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট শাহ্ জালালের আমল থেকেই সাংস্কৃতিক উন্নয়নতৎপরতায় তার প্রাধান্য বজায় রাখে। তবে ফার্সি ও উর্দুর মতো আরবিতেও এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের রেকর্ড পাওয়া যায় উনিশ শতক থেকে। মৌলিক রচনার দিক থেকে শহরের অভিজাত মজুমদার পরিবারের সউদ বখ্ত মজুমদার ও হামিদ বখত মজুমদার[৯] দু'জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। হামিদ বখত মজুমদার ব্যাপকভাবে বিভিন্ন আরবদেশ সফর করেন এবং আরবি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি তাঁর চাকর-বাকরদের সঙ্গেও সর্বদা আরবিতে কথা বলতেন। সব সময় সফরসঙ্গী হওয়ার ফলে তাঁর চাকরগণও আরবি জানতো। সিলেটের কাজি আবু মুহম্মদ আবদুল কাদির, যিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ইন্তেকাল করেন, তিনি কয়েকটি গবেষণামূলক আরবি পুস্তক রচনা করেন, যেমন *রিসালা-ই-রাদ-ই-মাকুল* (ওহাবীদের বিরুদ্ধে), *আল-ফাওয়াইদ-উল-কাদেরিয়া* এবং *আল-দররুল-আজহার ফি শার-ই-ফিক-ই-আকবর*। সিলেটের মওলানা আবু নসর ওয়াহিদ (মৃ. ১৯৮৫) ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং উন্নতমানের পাঠ্যবই লিখার মাধ্যমে আরবিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়

---

৯. Muhammad Bakht Majumdar, *Majumdar Family of Sylhet*, (Calcutta 1911), 7; *Bangladesh District Gazetteers* (Sylhet), Dhaka 1970.

ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পাঠ্যবইয়ের মধ্যে রয়েছে *মিরকাত-উল-আদব*, *বকুরাত-উল-আদব* এবং *নুকুব-আল উলুম*। আরবি ভাষার উৎকর্ষসাধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনারও অবদান রয়েছে। বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩) নদীমাতৃক এই দেশটির দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। রংপুরে তাঁর সমাধি রয়েছে। বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম হিসেবে বিবেচনা করা যাবে কিনা এই তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়টির উপর রচিত *নাসিমুল হারামাইন* একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় আরবি গ্রন্থ।

দিনাজপুরের কোরাইশ পরিবারের দু'ভাই আবদুল্লাহিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) এবং আবদুল্লাহিল কাফী (১৯০০-১৯৬০) শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবদুল্লাহিল কাফী এক ডজন আরবি গ্রন্থ রচনা করেন। পাবনা থেকে মৌলবি সৈয়দ আবদুর রশিদ শাহজাদপুরী *তুহফাতুল আরব ওয়াল আজমফী মাদহ্-ই সাঈদ-ই-ওয়ালাদ-ই আদম* শিরোনামে একটি সুন্দর কাসিদা রচনা করেন এবং আবদুল ওয়াহিদ সুলাকি আরবি ভাষায় বেশ কয়েকটি অনুপম প্রবন্ধ লিখেন, যেগুলোর মধ্যে *তাহজিবুল কালাম ফি তা'লিমুল ইসলাম*, *আল-কাওলুল মুনির আলা ফওজুল কবির* এবং *তা লখিসুল আসিস মিন হাদিস-ই-আহলিল হাদিস* অন্যতম।

আধুনিক বাংলাদেশেও আরবি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা সুস্থ ও সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিশুদ্ধ সাহিত্যগুণসম্পন্ন বহু আরবি গ্রন্থ বিপুল উদ্যমের সাথে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আধুনিক আরবি শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষাশিক্ষার বহু গাইড-বই প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ ও বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারগুলোও আজ বিভিন্ন আরবদেশ থেকে প্রাপ্ত আরবি সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকে প্লাবিত। সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনও বাংলাদেশে আরবি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফার্সি সাহিত্য

খৃস্টীয় তেরো শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনাধীনে আসার সময় থেকেই ফার্সি ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঘটে।[১০] উর্বর বাংলায় ফার্সি ভাষাভাষী তুর্ক-আফগান বিজেতাদের বসতিস্থাপনের ফলে এখানে যে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের সূচনা হয়, পরবর্তী সাতাশ বছর ধরে তা অব্যাহত থাকে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসক শ্রেণীর ভাষা অর্থাৎ ফার্সির প্রভাব উন্নয়নশীল বাংলা

---

১০. Abdus Subhan, 'Persian Studies in Bengal', *Proceedings of the 28th International Orientalist Congress*, (Canberra 1971).

ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটায় অসংখ্য ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। মুসলমানগণ মূল বাংলায় গ্রন্থ রচনা বা ইসলামী পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করেন। এমনকি, হিন্দু লেখকগণও তাঁদের বাংলা লেখায় ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁদের মুসলমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। বাস্তবে যেসব বিদেশী ভাষা বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করে, ফার্সি সেসবের মধ্যে সর্বপ্রাচীন।

মুসলিম শাসনের শুরুতেই বাংলাদেশে ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হয়। সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ ইসলামী ধর্মশিক্ষার ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র হওয়া ছাড়াও ফার্সি শিক্ষাবিস্তারের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রে মূল ফার্সি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় স্থানীয় লোকদের সরাসরি অনুপ্রাণিত করে। তখনকার ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গ কেবল কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন না, তাঁরা নিজেরাও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। মুসলিম সাধকদের প্রচারকাজের দ্বারাও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি জোরদার হয় এবং বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার ও সংহত করার কাজে তাঁরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞ সুফি ও তাঁদের ধর্মশালাসমূহ ফার্সি শিক্ষাবিস্তারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।[১১]

বাংলাদেশে সঙ্কলিত প্রাচীনতম ফার্সি গ্রন্থটির সঙ্গে আলি মর্দান খান খিলজীর নাম জড়িত রয়েছে। তিনি ১২০৯ থেকে ১২১৩ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এটা ছিল যোগবিদ্যার উপর রচিত সংস্কৃত পুস্তক *অমৃতকুণ্ড*-এর ফার্সি অনুবাদ। সমরকন্দের জনৈক কাজি রুকনউদ্দিন কর্তৃক এই বইটি অনুবাদের পেছনে একটি মজার কাহিনী আছে। বইটির আরবি সংস্করণের ভূমিকায় কাহিনীটির উল্লেখ আছে। কাহিনীটি হলো, ভোজর ব্রাহ্মণ নামক কামরূপের জনৈক বিখ্যাত যোগী সুলতান আলি মর্দান-এর রাজত্বকালে লক্ষ্ণণাবতীতে গিয়ে এক শুক্রবারে মসজিদে ঢুকে মুসলিম সাধকদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। জনগণ তাঁকে উক্ত কাজি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। কাজি সাহেবের কাছে তিনি আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মহানবীর মতবাদ জানতে চান। এ ব্যাপারে কাজি সাহেব যে উত্তর দেন তাতে যোগী এত মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর রচিত *অমৃতকুণ্ড* বইটি কাজি সাহেবকে উপহার দেন। কাজি সাহেব বইটির বেশ প্রশংসা করেন। কাজি সাহেব প্রথমে ফার্সি ও পরে আরবিতে বইটি অনুবাদ করেন। কাজি রুকনউদ্দিনকে

---

১১. বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, M. A. Rahim, *Social And Cultural History of Bengal*, Vols. I & II (Karachi 1963 and 1967). আরো দ্রষ্টব্য, S. M. Ikram & P. Spear, *Cultural Heritage of Pakistan*, (Karachi 1955), 110-118

সমরকন্দনিবাসী বিখ্যাত হানাফি আইনজ্ঞ কাজি রুকনউদ্দিন আবু হামিদ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ আলি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। ব্লখম্যানের মতে, আলি মর্দান খিলজীর শাসনামলে কাজি রুকনউদ্দিন কিছুকাল লক্ষণাবতীর কাজি হিসেবে চাকুরি করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১২১৮ সালে তিনি বোখারায় ইন্তেকাল করেন।[১২] কাজি *কিতাব আল-ইরশাদ* নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিন্দু যোগতন্ত্রের উপর লিখিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থটির ফার্সি সংস্করণ বাংলায় ফার্সি ভাষার প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে।

সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অন্যতম ছিলেন বিশিষ্ট সাধক মওলানা শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামাহ। তাঁর পরিচালিত সোনারগাঁও খানকাহ্ সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম।[১৩] সুফিবাদের উপর লেখা তাঁর *মাকামাত* নামক গ্রন্থটি তাঁর জীবিতকালে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[১৪] *তারাস্‌সুলিল আইন আল মুলকি* শিরোনামে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিসঙ্কলনের দুটি চিঠি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, লাহোরের মুফতি সাঈদ নাসিরউদ্দিন জনৈক ব্যক্তির অনুরোধে *মাকামাত*-এর একটি লিপি সরবরাহ করেন।

মার্জিত ফার্সিতে লিখিত *নাম-ই-হক* নামক একটি ধর্মীয় পুস্তক ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ বইয়ের অজ্ঞাতনামা লেখককে শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামাহ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। 'শরাফ' বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাস্তানে শিক্ষালাভ করেন বলে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার ভিত্তিতেই এটা করা হয়। এই সাধকের শিক্ষার আলোকে তাঁর কোন শিষ্যও বইটি লিখে থাকতে পারেন।[১৫] *ফিক্‌হ* (ইসলামী আইনশাস্ত্র।) নামক একটি গ্রন্থও তাঁর রচনা বলে মনে করা হয়। ধর্মতত্ত্ব এবং সন্তজীবনীর উপরও সাধকগণ ফার্সিতে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন হচ্ছেন মখদুম শরিফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী। তিনি সুফি মতবাদের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ অবদানের জন্য শেখ আলাউল হক এবং হজরত নূর কুতব্-ই-আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাটনার অধ্যাপক হাসান আসকারী শেষোক্ত ব্যক্তির কতিপয় ফার্সি পত্র (মকতুবাত) সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। খৃস্টধর্মের প্রচার ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে এই সাধকের রচিত *আনিসুল ঘুরাবা* নামক অনুবাদ ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থটি থেকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত নূর

---

১২. *Journal of the Pakistan Historical Society*, 1 : I (1953), 50-51.

১৩. Abdul Karim, *Social History*.

১৪. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1923, 274, 277.

১৫. বইটির লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, S. H. Masumi, 'Sonargaon'.

কুতব্-ই-আলম-এর পত্রগুলির মূল প্রতিপাদ্য সুফীতত্ত্ব হলেও একই সময়ে বাংলায় আগমনকারী অপর দুজন সুফির পত্রে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মীর সাঈদ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানী এবং মওলানা মুজাফফর শামস বলখী। হাজি গরিব ইয়ামানী নামক সাঈদ জাহাঙ্গির সিমনানীর একজন শিষ্য তাঁর মতবাদের উপর ভিত্তি করে ফার্সি ভাষায় সুফিবাদের উপর *লাতা-ইফ-ইব্ আশরাফী* নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৪৬৭ সালে আবদুল রাজ্জাক কর্তৃক সংগৃহীত তাঁর মকতুবাত (পত্রাবলী) থেকে তাঁর সাহিত্যিক সুরুচি ও সুফিবাদ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ মেলে।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ফার্সি অভিধান প্রণয়নের কৃতিত্বও বাংলার। *ফারহাৎ-ই-ইব্রাহিমী* নামক এ অভিধানটি ১৪৫৯ সালে মওলানা ইব্রাহিম কাও'য়াম ফারুকী জৌনপুরী কর্তৃক রচিত হয়। মাখদুম শরিফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় এটা *শরাফনামা* নামেই সমধিক পরিচিত। আবিসিনিয়ার ইলিয়াসশাহী রাজবংশের স্বল্পকালীন শাসনামলে সুলতান রোকনউদ্দিন বারবাক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪)-এর রাজত্বকালে বইটি রচিত হয়। এই উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনটি বাংলায় ফার্সি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির পরিচায়ক। সমকালীন কবি ও সাহিত্যকদের পরিচিতিমূলক জীবনবৃত্তান্তের সংযোজন বইটিকে আরো অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এসব কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে অন্যতম হলেন মেধাবি কবি ও সাহিত্যিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমির শাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমান। তিনিও *ফারহাঙ্গি আমির শাহাবুদ্দিন কিরমানী* নামক একটি ফার্সি অভিধানের কৃতী লেখক। ইব্রাহিম কাউওয়াম ফারুকী এই অভিধান থেকে বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিধানটি বর্তমানে চালু নেই। অভিধানটিতে আর যেসব কবির উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন আমির জয়েনউদ্দিন হারাবী মালিক-উশ-শুয়ারা, মনসুর শিরাজী, মালিক ইউসুফ বিন হামিদ, সাঈদ জালাল, সাঈদ মুহম্মদ রুকন্, সাঈদ হাসান এবং গ্রন্থকারের শিক্ষক শেখ ওয়াহিদী।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য যেসব শাখা ফার্সি সাহিত্যের আওতায় আসে সেসবের মধ্যে ছিল সমরবিদ্যা। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)-এর রাজত্বকালে সাঈদ মীর আলাভী নামে সুপরিচিত মুহম্মদ বুদাই ধনুর্বিদ্যার উপর *হিদায়াত-উররামী* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] এটি ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মুসলমান লেখকগণ যে ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন গ্রন্থটিতে তারই প্রমাণ আছে।

ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গের ঐতিহ্যবাহী পৃষ্ঠপোষকতায় গদ্যসাহিত্যের পাশাপাশি কাব্য সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাংলার শাসনকর্তা এবং দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন

---

১৬. Charles Rieu, *Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum*, Vol. II, (London 1881), No. 489.

বলবনের পুত্র নাসিরউদ্দিন বুঘরা খান কবি ও সাহিত্যিক পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। এসব কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শামসউদ্দিন দবির ও কাজি আসির। সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিবেচনায় শামসউদ্দিন দবিরকে বুঘরা খানের মীর মুনশি নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসায় তিনি স্তুতিকাব্য রচনা করেছিলেন, তা বাদাউনীর *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*-এ উদ্ধৃত আছে। এই স্তুতিকাব্যের কবিই ১২৮২ সালে সুলতান বলবনের সঙ্গে বাংলায় আসার জন্য বিখ্যাত কবি আমির খসরুকে রাজি করিয়েছিলেন এবং তাঁরই কথায় আমির খসরু বাংলায় কয়েক বছর থাকার পর সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৯২-১৪১০)-এর রাজত্বকালে বাংলায় ফার্সি কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়টাকে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ফার্সি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যাত করা চলে।[১৭] এই সুলতানের শাসনকালেই শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি হাফিজ শিরাজীর সঙ্গে বাংলার স্মরণীয় যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি বাংলার নাম উল্লেখসহ একটি ফার্সি গজল লিখে পাঠান। সেই গজলের একটি বিখ্যাত পংক্তি হচ্ছে :

> শাক্কার শিকান শাবান্দ হামা তুতিয়ান-ই হিন্দ
> যিন কান্দ-ই-ফারসিকে বা বাংগালা মিরওয়াদ

অর্থাৎ, 'বাংলায় গমনকারী এই ফার্সি মিছরি থেকে ভারতের সমস্ত তোতা চিনি তৈরি করবে।' অতএব দেখা যায়, বাংলার ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৫৭৬ সালব্যাপী বিস্তৃত সুলতানি আমলে উদার ও সংস্কৃতিমনা সুলতানদের শাসনকালে এ প্রদেশে ফার্সি শিক্ষার উন্নয়নের পথ সুগম হয়, যা পরবর্তী মুগল আমলেও লক্ষ্য করা যায়।

১৫৭৬ থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত যখন বাংলা বিরাট মুগল সাম্রাজ্যের সুবাহ ছিল, তখনো পূর্ববর্তী আমলের মতোই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হয়।[১৮] ঐ সময়ের এবং তৎপরবর্তীকালের কাহিনী ও জীবনীকারগণ মুনিম খান, ইসলাম খান, কাসিম খান, শাহ সুজা, শায়েস্তা খান ও মীর জুমলা প্রমুখ মুগল শাসনকর্তার দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব শাসনকর্তার সবাই শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা ফার্সি কবিতাকে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁদের আমলে বাংলায় আগত বহু ফার্সি কবিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মুহম্মদ শরিফ ইস্পাহানী আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত জ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন। দীন-ই-ইলাহি প্রচারের জন্য আকবর কর্তৃক বাংলায় প্রেরিত শরিফ

---

১৭. Zuhuruddin Ahmad, *Pakistan men Farsi Adab*, Vol. II, (Lahore 1964-74), 610-11.

১৮. ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, S. M. Taifur, *Glimpses of Old Dhaka*, (Dhaka 1956).

আমুলীর সঙ্গী হিসেবে তিনি বাংলায় আগমন করেন। আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় আর একজন বহিরাগত কবি ছিলেন মির্জা জাফর বেগ কাজউইনী। এই বিখ্যাত কবি নিজামী গানজাবীর রীতিতে *শিব্রনি-উ-খুসরু* নামে একখানি মসনবী রচনা করেন। এমনকি বাংলায় মুগল সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহিদেরকেও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যেতো। মির্জা নাথন নামক একজন নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসারও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি *বাহারিস্তান-ই-গায়বি* নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই বিখ্যাত বইটিতে লোকমান, মীর কাসিম এবং মালিক মুবারক প্রমুখ বহু সৈনিক কবির নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন এবং সমরাঙ্গনে সিপাহিদের বিজয় ও বীরত্বকাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। মির্জা নাথন প্রায় বিশ বছরকাল বাংলায় চাকুরি করেন এবং তাঁর এই গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা ও আসামে যেসব ঘটনা ঘটে এবং তিনি নিজেও যেগুলির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সেলিম তেহরানী, যিনি বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন, তিনি একজন মেধাবি কবি ছিলেন। বাদশাহ্‌র রাজকবি আবু তালিব কলিম-এর সঙ্গে পেরে না উঠায় সেলিম বাংলায় আগমন করেন এবং ইসলাম খানের অন্যতম প্রিয় সহচরে পরিণত হন। তিনি বিভিন্ন ধরনের কবিতাসম্বলিত একখানি দিওয়ান এবং *কাজা-ও-কদর* নামে একখানি মসনবী রচনা করেন। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এটি ফয়জীর *নাল দামান*-এর সমতুল্য। ইস্পাহানে জন্মগ্রহণকারী মীর জুমলা একজন উঁচুদরের পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি *কুললিয়ৎ* নামে বিশ হাজার চরণবিশিষ্ট একখানি কাব্য রচনা করেন। মীর জুমলার ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দিন তালিশ, যিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানে তাঁর প্রভুর সহগামী হন, ১৬৬৩ সালে *ফাতহ-ই-ইবরিয়া* নামে আসাম সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মীর জুমলার মৃত্যু থেকে ১৬৬৫ সালে চট্টগ্রাম জয় পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটে সেসবের বিবরণ রয়েছে।

মুগল আমলের আর একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন মুহম্মদ সাদিক। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনীগ্রন্থ *সুব্‌হ-ই-সাদিক*-এর লেখক।[১৯] ১৬২৮ সালে শাহজাহান কর্তৃক প্রেরিত বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খানের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। সাদিক অনেক বছরকাল জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থান করেন এবং সেখানকার বহু জ্ঞানী-গুণীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৬৩৯ সালে শাহ্ সুজা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি তাঁর দরবারে যোগ দেন। আট বছর পরিশ্রম করে ১৬৩৮ সালে তিনি যে বইটি শেষ করেন তা এই রাজপুত্রের নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। এর পরও তিনি বহুদিন বেঁচে ছিলেন। ১৬৫২

---

১৯. M. I. Borah, *An Account of the Immigration of Persian Poets into Bengal, The Dacca University Studies*, I : I (Dacca 1935) 141-150.

সালে সমাপ্ত *শাহিদ-ই-সাদিক* নামক তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। *সুবহ্-ই-সাদিক*-এ জাহাঙ্গীরনগরে বসবাসকারী বেশ কিছু ফার্সি সাহিত্যিকের নাম এবং ফার্সি কবির কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন পেশায় সৈনিক ছিলেন। শাহ সুজার শিক্ষক মীর আলাউল মুল্‌ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন লজিক গ্রন্থ *মুহাজ্জাহ*, ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ *আনওয়ার-উল-হিদায়া* এবং জীবনীগ্রন্থ *সিরাত-উল-ওয়াসিত*। তিনি একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। *পাদশাহনামার* লেখক আবদুল হামিদ লাহুরী তাঁকে বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাই মীর আব'উল মা' আলিও ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও কবিতায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর *সুরায়-ই-ইখলাস*-এর তফ্‌সীর একখানি বিচার গ্রন্থ; *মুয়াজ্জাজুল উলুম* তাঁর নিজের রচিত কবিতার একটি সঙ্কলন এবং তাঁর ভাই মীর আলাউল মুলক-এর উপর তিনি একখানি স্মৃতিকথা রচনা করেন। সে যুগের অবশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর মুহম্মদ মাসুম। শাহ্ সুজার ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি *তারিখ-ই-সুজা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। হস্তলিপিকারদের মধ্যে যাঁরা ঐতিহাসিক ও কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান হায়দরী, সা'ঈদউদ্দিন মুহম্মদ মাশহাদী এবং মুহম্মদ হুসেইন মানেরী গাফফারীর নাম উল্লেখযোগ্য। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ মু'আজ্জম-এর শাসনামলে ঢাকায় 'ওয়ালাহ হারাভী' নামে একজন প্রভাবশালী সুফি কবি বাস করতেন। ঢাকা সফরকালে মীর্জা আবদুল কাদির বেদিল-এর সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং বেদিল তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

আঠারো শতকের প্রথমভাগে মুর্শিদকুলী খান বাংলায় স্বাধীন সুবাদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত ইরান এবং উত্তর ভারত থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে আরো অনেক কবি-সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। সুবাহ বাংলার পূর্বাঞ্চল, বিশেষকরে ঢাকা থেকেও অনেক বুদ্ধিজীবী ও কবি সেখানে আগমন করেন। জাহাঙ্গীরনগরের ডেপুটি গভর্নর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানও[২০] সুকবি ছিলেন। তিনি 'মাখমুর' ছদ্মনামে লিখতেন। ১৭৮৫-৮৬ সালে ঢাকার নওয়াব-নাজিম আলি হাসান ঢাকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন। *তারিখ-ই-জাহাংগীরনগর* নামক এই ইতিহাস-বইটিতে আকবরের আমল (১৫৫৬-১৬০৫) থেকে তাঁর নিজের আমল পর্যন্ত ঢাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৭১৬ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার নাজিম নবাব নুসরত জঙ্গ *তারিখ-ই-নুসরতজঙ্গী*[২১] নামে একটি ফার্সি ইতিহাস রচনা করেন। ১৯০৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক কলকাতায় বইটি প্রকাশিত হয়।

---

২০. Mohar Ali. *Muslims of Bengal*, 586, 851.

২১. বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে সংস্করণটি তৈরি করেন।

বাংলার ইতিহাসের বৃটিশ আমলে, বিশেষকরে উনিশ শতকেও ফার্সি ভাষায় সাহিত্যচর্চার অসংখ্য প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে ঢাকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সময়ের সবচেয়ে নামী যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যায় তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পণ্ডিত, ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক আগা আহমদ আলি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নাদির শাহের সঙ্গে ভারতে আগমন করেন। তাঁর দাদা আগা আবদুল আলি, যিনি সর্বপ্রথম ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিশারদ। আগা আহমদ আলি ১৭৮০ সালের দিকে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মুনশি মু'তাসিম বিল্লাহ নামক একজন স্থানীয় আলেম এবং কবি খাজা আসাদুল্লাহ্ কাউকাব (মৃ. ১৮৫৯)-এর কাছে ফার্সি ভাষা শিখেন। তাঁর পিতা সুজা'আত আলির মতো তিনিও বিরল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। কথিত আছে, তাঁর একটি সুন্দর ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল এবং তাতে দু'হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে আগা আহমদ আলি ঢাকার ব্যক্তিগত পাঠাগারসমূহে সংরক্ষিত সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে শেষ করেন। এর অল্পকাল পরেই কলকাতায় তৎকালের দু'জন নেতৃস্থানীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল এবং ডঃ এইচ. ব্লখম্যানের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি একজন খ্যাতিমান গবেষকে পরিণত হন। কলকাতা মাদ্রাসায় ফার্সির শিক্ষক হিসেবে চাকুরি করাকালে *মু আইরিদ-ই বুরহান* নামে একটি বই লিখে আগা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। *বুরহান-ই-কাতি* নামক একটি প্রাচীন ফার্সি অভিধানের বিরুদ্ধে মির্জা গালিব যে অভিযোগ করেন এই বইয়ে তা খণ্ডন করা হয়। আগা আহমদ আলির বইয়ের জবাবে গালিব *তিঘ-ই-তিজতার* নামে অপর একখানি বই লিখেন। এঁর প্রতিবাদে ১৮৬৮ সালে বাঙালি পণ্ডিত *শামসির-ই-তিজতার* নামে আরো একটি বই লিখেন। মির্জা-আগা বিতর্ক ভারতীয় উপমহাদেশের ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত অধ্যায়। তাঁর অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ফার্সি চতুষ্পদী কবিতা সম্পর্কিত *রিসালা-ই-তারানা* এবং মসনবী ধরনের ফার্সি কবিতা সম্পর্কিত *হফ্ত আসমান*। কলকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর জন্য তিনি *সিকান্দারনামা-ই-নিজামী*, *ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীর*, *মা'সির-ই-আলমগিরি*, *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*, এবং *আকবরনামা* প্রভৃতি মূল্যবান ফার্সি তথ্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত গবেষক এ. এফ. এম. আবদুল আলির মতে, আগা ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কিত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক *তারিখ-ই-ঢাকা* নামক গ্রন্থটিও সঙ্কলন করেন। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আগা আহমদ আলি ১৮৭৩ সালে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং মির্জা সাহেবের লঙ্গরখানার নিকটস্থ গোরস্থানে তাঁকে কবর দেয়া হয়। বাংলাদেশে ফার্সি শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

গালিব সাহিত্য-বিতণ্ডার সঙ্গে ঢাকার দু'জন বিখ্যাত কবিও জড়িত ছিলেন। তাঁরা দিল্লীর কবির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন খাজা হায়দার জান শাইক, যাঁকে গালিব বুলবুল-ই-বাঙ্গালা (বাংলার বুলুবল) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ফার্সি

কবিতার একটি 'দিওয়ান' এবং একটি পত্র-গ্রন্থ রয়েছে। অপরজন হলেন সোনারগাঁও-এর মুনশি গোলাম মোস্তফা। তিনি তাঁর পত্রাবলী একটি আলাদা গ্রন্থে সঙ্কলন করে তার নামকরণ করেছিলেন *গারদ-ই-পাহাং-ই-গালিব*। শাইক ঢাকার বিখ্যাত খাজা পরিবারের লোক ছিলেন। উর্দু, ফার্সি ও সংস্কৃতে তাঁর অবদান শহরের প্রাচীনপন্থীরা এখনও স্মরণ করেন।[২২] ফার্সি জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় খাজা আবদুর রহিম সাবার নাম।[২৩] তাঁর *তারিখ-ই-কাশ্মিরিয়ান-ই-ঢাকা* নামক ফার্সি গদ্যগ্রন্থটি শহরের এই বিখ্যাত বংশের পারিবারিক ইতিহাসের এক তথ্যখনি। *মাকাতিব-ই-সাবা* নামে আবদুর রহিমের লেখা একটি ফার্সি পত্র-গ্রন্থও রয়েছে। খাজা গোত্রের আর একজন তরুণ খাজা আবদুল গাফ্ফার 'ওয়াফা' মেধাবি ফার্সি কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পত্রালাপের মাধ্যমে তিনি মির্জা গালিবেরও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ফার্সি কবি ও সাহিত্যিকদের পরম হিতৈষী খাজা আহসানউল্লাহ শাহিন[২৪] মির্জা মাহমুদ শিরাজী 'মাখমুর'কে বিশুদ্ধ ফার্সিতে ঢাকার ঐতিহাসিক ইমামবাড়া হোসেনী দালান-এর ইতিহাস লেখায় অনুপ্রাণিত করেন।

'বাংলায় উর্দু কবিতার জনক' বলে খ্যাত মৌলবি আবদুল গফুর নাসাখ[২৫] কাব্যক্ষেত্রে হাফিজ ইকরাম আহমদ জাইঘাম ও হাফিজ রশিদুন নবী ওয়াহশাত-এর শিষ্য ছিলেন। ফার্সিতেও তিনি সৃজনশীল কবিতা ও গদ্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ফার্সিতে তাঁর প্রধান বইটি হচ্ছে জীবনীগ্রন্থ *তাজকিরাতুল মা' আসিরি*। এটি অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এটির কোন কপি সহজলভ্য নয়। নাসাখের সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আজাদ ও সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ভ্রাতৃদ্বয়,[২৬] যাঁদেরকে আকবরের আমলের ফয়েজী ও আবুল ফজলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সৈয়দ মাহমুদ আজাদ একজন উঁচুদরের ফার্সি কবি ছিলেন। তাঁর কাসিদাগুলো সমাপ্তি ও গুণের দিক থেকে অনেক উন্নতমানের এবং খাকানী ও উরফীর মতো কবিদের রচনাগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর এবং উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় একজন দক্ষ লেখক। ফার্সি ভাষায়ও তাঁর পুরোপুরি দক্ষতা ছিল। সৈয়দ মুহম্মদ বাকির তাবাতাবাই ইরান থেকে এসে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। ১৯১০ সালে তিনি এখানেই ইন্তেকাল করেন এবং হোসেনী দালানে তাঁর কবর রয়েছে। তাঁর লেখা সুমধুর গীতি ও

---

২২. Taifur, *Glimpses of Old Dhaka*, Appendix.

২৩. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সি সাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৮৩), ৯৫-১০৩।

২৪. ঐ, ১০৭-১১৬।

২৫. নাসাখের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Md. Sadrul Haque, *Nassakh: Hayat-O-Tasneef*, (Ph. D Thesis, University of Karachi, 1979) আরও দ্রষ্টব্য, Abdus Subhan (ed), *Autobiography of Nassakh*, (Calcutta 1986).

২৬. আজাদ ভ্রাতাদের জীবনবৃত্তান্তের জন্য দ্রষ্টব্য, *The Journal*, (The Weekly periodical of the Englishman, Calcutta), Dated 8th & 15th July 1906.

স্তুতিবাদমূলক কবিতাগুলো সাহিত্য-সমালোচকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঢাকার স্বল্পপরিচিত ফার্সি কবিরা হলেন আবদুল মুনশি জাওকী, মুনশি ওয়ারিস আলি জিয়া, আগা মাহমুদ আলি, মসিহউদ্দিন শুরিস, কাজিমউদ্দিন সিদ্দিকী, মওলানা ফজলুল করিম, শাহ্ বুরহান উল্লাহ, মুনশি জালালউদ্দিন এবং মৌলবি মুয়াজ্জমউদ্দিন সাঈদ।

কিন্তু মওলানা উবায়দুল্লাহ আল-উবায়দী'র (১৮৩৪-১৮৮৫) অবদানের কথা উল্লেখ না করলে ফার্সি সাহিত্যে ঢাকার অবদানের কোন বিবরণই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং ঢাকায় অবস্থানকালে নিজেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। আরবি ও ফার্সি ভাষায় স্বীকৃত পণ্ডিত উবায়দী পূর্বাঞ্চলের এই মহানগরীতে এ দুই ভাষার মেধাবি শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের এক মহান চক্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ফার্সি কবিতা গুণ ও আঙ্গিকের দিক থেকে[২৭] শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি সা'দী, হাফিজ, জামী, সা'ইব, নাজিরী ও গালিব-এর কবিতার সমতুল্য। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *দাস্তান-ই-ফার্সি আমুজ*[২৮] ফার্সি ব্যাকরণের উপর একটি উন্নতমানের পুস্তক, যা আজও অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে গণ্য।

ঢাকা জেলার ইলাইচিপুর নিবাসী মৌলবি আবদুল করিম খাকি বৃটিশ প্রশাসনিক সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে রংপুর, ফরিদপুর ও মালদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আবদুল গফুর নাসাখ-এর মতো সরকারি কাজে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যান এবং নৈতিকতার উপর *রুমুজুল আখলাক, মিসবাহুল জিনান* এবং *ফাওয়াইদ-ই-খাকিয়া* নামে ফার্সি দিওয়ান রচনা করেন। উনিশ শতকের শেষদিকে খাকি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর দায়রায় তাঁর সমাধি রয়েছে। আরবি ও উর্দুর মতো ফার্সি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে শহরের সাংস্কৃতিক জগতের প্রাচীনতম ব্যক্তি হেকিম হাবিবুর রহমানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রদেশে ফার্সি গবেষণা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি চলতি শতকের প্রথম ৫০ বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালান। তাঁর *সালাসা-ই-গাসসালা*[২৯] গ্রন্থে বাংলায় রচিত ১৭৩টি ফার্সি পুস্তকের বিবরণ আছে।

ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের *চট্টগ্রাম* অঞ্চলেরও ফার্সির উন্নয়নে অবদান রয়েছে।[৩০] এ জেলায় ফার্সির প্রথম নমুনা দেখতে পাওয়া যায় বুজুর্গ উমিদ খান ও হামজা খানের মসজিদ তথা সতেরো শতকের সত্তরের দশকে নির্মিত শাহবাজ খানের ঈদগার ফার্সি

---

২৭. *Diwan-i-Ubaidi*, (Calcutta 1940).

২৮. বইটি প্রথমে ১৮৭৩ সালে আগ্রা থেকে এবং পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯. *সালাসা-ই-গাসসালার* ফার্সি অংশটি আরিফ নওশাকী কর্তৃক ১৯৮৮ সালে ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

৩০. *Bangladesh District Gazetteers* (Sylhet), Dhaka 1975.

শিলালিপিতে। আম্বরাবাদের মুনশি সিরাজউদ্দিনের ফার্সি পত্রাবলী আজও জেলার মাদ্রাসাছাত্রদের পাঠ্য। নওয়াব নুসরত জঙ্গ-এর রাজত্বকালে মির্জা মাহমুদ ও তাঁর পুত্র মুনশি আলি উন্নতমানের ফার্সি কবি ছিলেন। নওয়াব মুজাফফর জঙ্গ মুহম্মদ রেজা খানের ভাই হেকিম মুহম্মদ হোসেন আলাবী তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে চট্টগ্রামে বাস করার সময় এই জেলার ভেষজ লতাগুল্মের উপর *মাখজানুল আদবীয়া* নামে একটি বই লিখেন। জনৈক মুহম্মদ আফজাল আগফা হোসেন ও তাঁর বংশধরদের পরিবার সম্পর্কে ফার্সিতে *নসবনামা* নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত ফার্সি লেখক ছিলেন খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ। ১৮৭১ সালে তিনি *আহাদিসুল কাওয়ানিন*[৩১] নামে একটি বই লিখেন। এটি বৈশিষ্ট্যে অনেকটা চট্টগ্রামের গেজেটিয়ার জাতীয় গ্রন্থ ছিল এবং এতে একটি অতিরিক্ত অধ্যায় ছিল, যাতে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের নীতি সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তার সমালোচনা করা হয়। চট্টগ্রামের স্বল্পপরিচিত ফার্সি কবিদের মধ্যে ছিলেন সন্দ্বীপের মওলানা আবদুল আওয়াল, মুহম্মদ আবদুল আলি, মৌলবি ফয়জুল কবির শাউক, মৌলবি ফজুল্লাহ ইসলামাবাদী, মুহম্মদ সুলায়মান আরমান এবং আবদুল আলি দুররী।

সিলেট অঞ্চল ফার্সি শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগেই এ অঞ্চল ফার্সি ভাষাভাষী মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হিজরী দশম শতকেই এ অঞ্চলে সৃজনশীল ফার্সি সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৩২] উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, *মা'দানুল ফাওয়াউ*-এর লেখক সৈয়দ শাহ ইসরাইল এবং *জারারুল মুসান্নিক*-এর গ্রন্থকার বানিয়াচং-এর মুহাম্মদ আরশাদ। গেইলর সৈয়দ রায়হানউদ্দিন একজন বিশিষ্ট ফার্সি কবি ছিলেন। তিনি খোয়াবনামা ও *গুলবাকাওয়ালী* মসনবী রচনা করেন। সিলেটের মুনসেফ এবং নাসাখের বন্ধু নাসিরউদ্দিন আহমদ সামী ফার্সি ভাষায় *সুহাইল-ই-ইয়ামান* নামে হজরত শাহ্‌জালালের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সিলেটের মশার উপর *পুশশানামা* শীর্ষক একখানি সুন্দর ফার্সি মসনবীও রচনা করেন। আবদুল গফুর নাসাখ তার আত্মজীবনীতে এ বইয়ের কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সিলেটের সম্ভ্রান্ত মজুমদার পরিবারের সদস্য আল্লাহ বক্‌শ মজুমদার হামেদ-এর *তুহফাতুল মুহসিনিন* ও *দিওয়ান-ই-হামেদ* এবং হামিদ বখত মজুমদার-এর ফার্সি ইতিহাস *আন-ই-হিন্দ* সিলেট অঞ্চলের সৃজনশীল ফার্সি সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৩৩] সিলেটের অন্যান্য ফার্সি কবি, যাঁদের কবিতা আজও বর্তমান আছে, তাঁরা হলেন নাজির মুহম্মদ আব্দুল্লাহ আশুফতা, আবু মুহম্মদ আবদুল কাদির, আবুল হোসেন, আবদুর রহমান জিয়া, আবদুল মুন'ইম জাওকী, তাফাজ্জুল আলি ফাজলী এবং আবু মুহম্মদ খলিলুল্লাহ খলিল।

---

৩১. বইটি ১৮৭১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

৩২. *Bangladesh District Gazatteers* (Sylhet), Dhaka 1970.

৩৩. Abdul Jalil Bismil, *Sylhet men Urdu*, (Karachi 1983), 39-45, 75-78.

ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাজাপুরের কাজি পরিবার এক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক হচ্ছেন আবদুল গফুর নাসাখ, যাঁর নাম অন্যত্রও উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর পিতা কাজি ফকির মুহম্মদ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলকাতার সদর দীউয়ানি আদালতে ওকালতি করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিশ্বজনীন ইতিহাস *জামিউত তাওয়ারিখ*। এটি ১৮৩৬ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। ফকির মুহম্মদের অপর দুই পুত্র আবদুল হামিদ এবং আবদুল বারী সাঈদও সুকবি ছিলেন।

আবু মুইন আজদউদ্দীন আজুদ, শাহ সৈয়দ রেয়াজতউল্লাহ, নাসিরউদ্দিন সামী, সামসামউদ্দিন সামসাম এবং আশরাফউদ্দিন শারক্ কুমিল্লার নেতৃস্থানীয় ফার্সি কবি ছিলেন। বরিশালে জন্ম হয়েছিল মুহম্মদ ফাজিল, ইলাইচিরাম তালেব প্রমুখ কবির। ময়মনসিংহে ছিলেন কবি সৈয়দ নাজমুদ্দিন আহমদ 'নাদির' এবং মুহম্মদ আবদুল হাই আখতার। পাবনার সৈয়দ আবদুর রশিদ শাহজাদপুরী ছিলেন একজন সুফি প্রকৃতির পণ্ডিত। কিন্তু ফার্সি কবিতা রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং খাকানী ও উরফীর আদর্শে সুন্দর কাসিদা রচনা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উর্দুর মতো ফার্সি চর্চাও ব্যাহত হয়। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফার্সি ভাষার মাধ্যমে অর্জিত দেশের মূল্যবান ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। ইরানের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফলে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা ফার্সি ভাষা শিখছে। অন্যদিকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠাগারসমূহে সংরক্ষিত ফার্সি গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ বিপুল তথ্য-উপকরণের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দিন দিন আকৃষ্ট হচ্ছেন। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মরহুম এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশের ফার্সি ঐতিহ্যের প্রতি জ্ঞানী-গুণীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উর্দু সাহিত্য

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলায় বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে উর্দুর প্রচলন ঘটে। পূর্ব ভারতের এই নব অর্জিত রাজ্যটির প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইউরোপীয় অফিসারদের স্থানীয় হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেয়ার লোভনীয় চাকুরি নিয়ে অনেক উর্দু কবি ও সাহিত্যিক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করেন। প্রধানত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টায় এখানে আধুনিক উর্দু গদ্যরীতি এবং উর্দু ভাষাবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান ও শব্দার্থবিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন হয়। লখনৌ-এর সর্বশেষ নওয়াব ওয়াজিদ আলি শাহের নির্বাসনের সাথে সাথে লখনৌ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

কলকাতার মাটিয়াবুরুজ এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে বাংলার সর্বত্র উর্দু কবিতা প্রচলনের পথ আরো সুগম হয়।

কলকাতার পরে যে স্থানটিতে উর্দুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে সেটা হচ্ছে ঢাকা। সেখানকার বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও নওয়াবদের দরবারে উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে এবং এর ফলে স্বাভাকিবভাবেই উর্দু সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। দিল্লীর খাজা মীর-দার্দ-এর শিষ্য মির্জা জান তাপিশ[৩৪] ঢাকার নওয়াব নাজিম নওয়াব সৈয়দ আহমদ আলি খানের পারিষদ ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের জন্য *শামসুল বায়ান ফি মুস্তালিহাত-ই-হিন্দুস্থান* শীর্ষক একটি উর্দু গ্রন্থ রচনা করেন। বইটিতে উর্দু বাগধারার (ইডিয়ম) সঠিক ব্যবহারপদ্ধতি দেখানো হয়েছে। *কাওয়াইদ-ই-জবান-ই-উর্দু* এবং *হিকায়েত-ই-বুজুরগান-ই-উর্দু* গ্রন্থ দুটির লেখক আবদুল কাদির রাঙ্গিন ১৮১১ খৃস্টাব্দে নওয়াব নুসরত জঙ্গ-এর দরবারে চাকুরি করতেন। সে সময়ে ঢাকায় বসবাসকারী অন্যান্য কবি হচ্ছেন মির্জা গোলাম হোসেন আতিশ ও তাঁর দুজন শিষ্য শেখ আহমদ জান এবং মীর আমিব আলি আশনা।

উর্দু কবিতা রচনা ও কবিতা পাঠের আসর সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকার খাজা পরিবার বাংলার পূর্বাঞ্চলে উর্দু ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। খাজা হায়দার জান শাইক[৩৫] একজন অত্যন্ত সফল উর্দু ও ফার্সি কবি ছিলেন। মির্জা গালিব কলকাতায় এলে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। খাজা আসাদুল্লাহ কাউকাব (মৃ. ১৮৫৯) একটি উর্দু দিওয়ান রচনা করেন। অবশ্য তিনি প্রধানত ফার্সি ভাষায় লিখতেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার দিক থেকে খাজা পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন খাজা আবদুর রহিম সাবা। ফার্সি ভাষায় তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। উর্দুতে তিনি একটি অসমাপ্ত রোমান্টিক মসনবী রচনা করেন। *দাস্তান-ই-সাবা* নামে রচিত এই বইটি এখনো প্রকাশিত হয় নি। খাজা আবদুল গনির ভাই খাজা আবদুল গাফফার আখতার একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। উর্দুতে রচিত তাঁর অনেক সুন্দর গজল রয়েছে। খাজা আবদুল গনির পুত্র খাজা আহসানউল্লাহ শাহীন কবিতা রচনায় আখতারের শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক উর্দু গান রচনা করেন যা স্থানীয় সাহিত্যমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাদের পারিবারিক ইতিহাসগ্রন্থ *আহসানুল কাসাস*-এর উর্দু সংস্করণ রচনা করেন। খাজা নূরুল্লাহ জাহাঙ্গীর উর্দুতে *মাচলিনামা* রচনা করেন এবং উক্ত বইটি নওয়াব আহসানউল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। খাজা আতিকুল্লাহ শাইদা কবিতা ও গদ্য দুটোই

---

৩৪. Iqbal Azim, *Mashriqi Bengal men Urdu*, (Dhaka 1954), 25-29.

৩৫. ঢাকার খাজা পরিবার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Khwaja Ahsanullah, *Tarikh-i-Khandan-i-Kashmiriyan* (Urdu translation) in mass, available in Dhaka University Library; আরও দ্রষ্টব্য, Hakim Habibur Rahman, *Asudgan-i-Dhaka*, (Dhaka 1964) and *Dhaka Panchas Baras Pahle*, (Lahore 1949).

লিখতেন। তিনি *আফসানা-ই-ইব্রাতখিজ, দেব চৌধুরানী* এবং *খুদা-কি-শান* প্রভৃতি উপন্যাসও রচনা করেন। খাজা মোহাম্মদ আফজাল তাঁর সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঘটনাভিত্তিক কবিতা রচনায় বিশেষত্ব অর্জন করেন। খাজা আতিকুল্লাহ্ শাইদার পুত্র খাজা মোহাম্মদ আজম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাস *বড় বউ* উর্দুতে অনুবাদ করে উর্দু লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

উনিশ শতকে সমগ্র বাংলার উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আবদুল গফুর নাসাখ।[৩৬] তিনি সাধারণভাবে বাংলায় উর্দু কবিতার জনক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নাসাখ উর্দু ভাষায় বিরল দক্ষতা অর্জন করেন। আরবি ও ফার্সি ভাষায়ও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত সমকালীন বাঙালি সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি (১৮৩৯-১৮৯৪) যথার্থভাবেই তাঁকে 'ইসলামের সার্থক সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন। গ্রামবাংলার এই প্রখ্যাত উর্দু কবি তাঁর জন্মভূমিকে উর্দু কাব্যজগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চমৎকার রচনার মাধ্যমে তিনি ব্যাপক সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করেন। উর্দু কাব্যের পীঠস্থান দিল্লী ও লখনৌ থেকে বহু দূরে এক ভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ও লালিতপালিত একজন বাঙালির পক্ষে উর্দু সাহিত্যের দিকপালদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতিলাভ সত্যিকার অর্থেই কোন ছোটখাট কৃতিত্ব নয়। প্যারিস থেকে প্রকাশিত মান্থলি রিভিউসমূহে বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্য সাহিত্যবিশারদ গারসিন দ্য তাসিও এই কবির কবিতার প্রশংসা করেন। কবিতা রচনায় নাসাখ-এর হাতেখড়ি হয় রামপুরের হাফিজ রশিদুন নবী ওয়াহশাতের কাছে। পরে সেগুলো দেখেশুনে দিতেন বিখ্যাত সমসাময়িক পণ্ডিত, সুফি ও রসায়নবিদ হাফিজ ইকরাম আহমদ জায়গাম। নাসাখ-এর প্রধান প্রধান কাব্য ৪টি গ্রন্থে সঙ্কলন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো *দফতর-ই-বিমিসাল, আশ আর-ই-নাসাখ, আরমাখান* এবং *আরমাখানি*। এগুলোতে দিল্লী ও লখনৌর উর্দু কবিতার মিলিত প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। নাসাখ-এর কবিতা গালিব-এর কাছ থেকেও প্রশংসালাভ করে। কবির কাছে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে গালিব তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং সেগুলোকে লখনৌর বিখ্যাত কবি নাসিখের কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। এই প্রশংসায় যেকোন উর্দু কবিই গর্ববোধ করতে পারেন। গদ্য সাহিত্যে নাসাখ-এর স্মৃতিকথা *সুখান-ই-শু-আরা* এখন পর্যন্ত ভারতের, বিশেষকরে বাংলার উর্দুভাষী জনগণের সাহিত্য সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যের একটি অপরিহার্য উৎস। তাঁর উর্দু আত্মজীবনী[৩৭] লেখকের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক হলেও প্রদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বহু তথ্যসমৃদ্ধ একটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং উনিশ

---

৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Sadrul Haque, *Nassakh: Hayat-o-Tasneef*.

৩৭. নাসাখের আত্মজীবনী *খুদনবীশ্‌ত্-ই-সাওয়ানিহ-হায়াত-ই-নাসাখ*, লেখক কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা ১৮৮৬।

শতকের ঘটনাবহুল বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্যপুস্তক। বস্তুত নাসাখই একমাত্র উর্দু কবি যিনি দিল্লী ও লখনৌর উর্দু কাব্যলোকের সারাংশের সংমিশ্রণে একটি নিজস্ব নতুন উর্দু কাব্যরীতি উদ্ভাবনে সক্ষম হন, যা আজও প্রচলিত রয়েছে।

ঢাকার সৈয়দ মাহমুদ আজাদ ও সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ[৩৮] নাসাখ-এর সমসাময়িক ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদ আজাদ দিল্লী কাব্যরীতির আদর্শে রচিত উর্দু গজলের একটি দিওয়ান সঙ্কলন করেন এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ নিজের মধ্যে বাগ্মিতা ও ব্যঙ্গরসের অপূর্ব সমাবেশ ঘটান। সৈয়দ মোহাম্মদ-এর প্রবন্ধসঙ্কলনের নাম *খায়ালাত-ই-আজাদ*। লখনৌর বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক *আউধ পঞ্চ*-এ প্রবন্ধগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর যুগান্তকারী বই *নওয়াবি দরবার* ইউরোপীয় আদর্শে লেখা প্রথম উর্দু নাটক। বইটিতে মুসলমান রাজদরবারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায়। ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট আরবি ও ফার্সি সাহিত্যিক মৌলবি উবায়দুল্লাহ আল উবায়দী সোহরাওয়ার্দীর একটি উর্দু গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর বিদুষী কন্যা খুজিস্তা আখতার বানু *কাউকাব-ই-দারী* ও *আয়না ই-ইব্রাত* প্রভৃতি জনপ্রিয় উর্দু পুস্তক রচনা করেন। এগুলো অবিভক্ত বাংলার উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই মাদ্রাসার সাথে জড়িত অপর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন মৌলবি তাসাদ্দুক হোসেন।

ঢাকা জেলা সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মচারী রহমান আলি তাইশ (মৃ. ১৯০৬) শহরের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং কবি ও পণ্ডিত হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহানবীর প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতার সঙ্কলন *গুলজার-ইনা'ত*-এর বেশ কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *গুলদাস্থা-ই-খেয়াল, গুলশান-ই-কুদরত, মা আরকা-ই-শহর-উ-দিহাত, মানাজিরা-ই-আহান-উ-জার* এবং *উর্দু দিওয়ান* প্রভৃতি সবই তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা* নামের যে বইটি তাঁকে স্থায়ী খ্যাতি এনে দিয়েছিল সেটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইটি ঢাকা শহরের একটি নির্ভরযোগ্য গেজেটিয়ার।

বাংলার সৃজনশীল উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান শতকে একমাত্র অসাধারণ সংযোজক বলে যাঁকে আখ্যাত করা যায় তিনি হলেন শিফা-উল-মুল্‌ক হাকিম হাবিবুর রহমান[৩৯] (১৮৮০-১৯৪৭)। তিনি ছিলেন ঢাকার শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি। পেশায় চিকিৎসক এই ব্যক্তিটি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ, সাংবাদিক এবং শ্রেষ্ঠ মানববিজ্ঞানী। *হায়াত-ই-সুকরাত* নামক উর্দু বইটি রচনা এবং আবদুল করিম খাকীর *রুমুজ-ই-আখলাক* বইটির উর্দু অনুবাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর

---

৩৮. *The Journal* (Englishman's weekly edition), 8th July and 15th July 1906.

৩৯. Iqbal Azim, *Mashriqi Bengal*, 110-116.

সাহিত্যজীবন শুরু করেন। *ঢাকা পঁচাশ বরস পহলে* এবং *আসুদগান-ই-ঢাকা* হচ্ছে তাঁর স্থান সংক্রান্ত গ্রন্থ। ১৯২১ সালে মুদ্রিত তাঁর জনপ্রিয় উর্দু পুস্তিকা *তারক-ই-মাওয়ালাত*-এ তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট না করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান রচনা হচ্ছে *সালাসা-ই-গাসসালা* গ্রন্থটি। তিন খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে বাংলার আরবি, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে। হেকিম হাবিবুর রহমান ১৯০৬ সালে উর্দু সাপ্তাহিক *মাশরিক* এবং ১৯২১ সালে উর্দু মাসিক *যাদু* প্রকাশ করেন। বাংলার উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর এই উদ্যোগকে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা বলে গণ্য করা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাজা মোহাম্মদ আদিল এবং ফিদা আলি খান। খাজা মোহাম্মদ আদিল নিজে একজন সুকবি ছিলেন এবং সাপ্তাহিক *যাদু* পুনঃপ্রকাশ করে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তা পরিচালনা করেন। ফিদা আলি খান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বিষবৃক্ষ* সহজ উর্দুতে অনুবাদ করেন।

ডঃ আন্দালিব সাদানীর (১৯০৪-১৯৬৯) প্রশংসনীয় অবদানের উল্লেখ না করলে বর্তমান শতকের বাংলার উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাকিস্তানের জন্মের বহু আগেই কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কারণ ১৯২৮ সালেই তিনি উর্দু ও ফার্সির অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান সারা উর্দু বিশ্বে উন্নতমানের মৌলিক লেখা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *নিশাত-ই-রাফতা, তাহকিক কি রওশানিমেঁ*, উর্দু গজল *গুই আউর দাউর-ই-হাজির, ছোট খোদা* (ছোট উপন্যাস) ও *সাচ্চি কাহানিয়া*। এ ছাড়াও তাঁর লেখা বহু উর্দু নিবন্ধ উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিজ দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে ডঃ সাদানী নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষকরে বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকে উর্দু কবি ও সাহিত্যিক পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। উর্দুভাষী বাস্তুত্যাগীগণ ঢাকাকে তাঁদের সাহিত্যকর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করেন এবং *আঞ্জুমান তারাক্কি-ই-উর্দু, বাজম্-ই-আহবাব* প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উর্দু ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচেকানাচে দেশব্যাপী মোশায়েরার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ শরাফুল হোসাইনী (মৃ. ১৯৬০), ইসমাইল জবিহ্ (মৃ. ১৯৫৯), মির্জা ফকির মুহম্মদ (মৃ. ১৯৫৮), মওলানা তামান্না ইমাদি এবং হায়দার দেহলভী। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা রেজা আলি ওয়াহশাত[৪০] (মৃ. ১৯৫৬)। কবি হিসেবে তিনি তাঁর যুগের 'মির্জা গালিব' নামে

৪০. ওয়াহশাত-এর জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য,' Wafa Rashidi, *Hayat-i-Wahshat*, (Karachi 1982).

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সাহিত্যিক কৃতিত্বের দিক থেকে তাঁকে কাজি নজরুল ইসলাম বা আল্লামা ইকবালের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা যায়। ওয়াহশাত বহু শিষ্য রেখে যান। তাঁদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছেন আসক বানারসি, আহমদ আহসান আশক্, ওয়াক রশিদী, কমর সিদ্দিকী এবং আমিরুল ইসলাম শারকি। ওয়াহশাত-এর অন্যতম ভক্ত শিষ্য অধ্যাপক সৈয়দ ইকবাল আজিম তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *মাশরিকি বাঙ্গাল মে উর্দু*-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এটি এ বিষয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বাংলাদেশের উর্দু লেখকদের মধ্যে যাঁরা উর্দুভাষী জনগণের সাথে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে আহমদ আহসান আশকের নাম উল্লেখযোগ্য। নজরুল ইসলামের কিছু কবিতাসহ বাঙালি কবিদের অনেক কবিতা তিনি সাফল্যের সঙ্গে উর্দুতে অনুবাদ করেন। রফি আহম্মদ ফয়দীর *বাংলা তালিম* এবং ওয়াহিদ কায়সার নাদভীর *আসান বাংলা তালিম* উর্দুভাষী জনগণের মধ্যে বাংলা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। বই দু'টি যথাক্রমে ১৯৬১ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর আগে আবদুর রহমান বেখুদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক সঙ্কলিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তা প্রকাশিত হয়।

খাঁটি সাহিত্যসেবী ছাড়াও প্রশাসনিক সার্ভিসের কতিপয় সদস্য যেমন এফ. এ. করিম 'জিলী', সলিমুল্লাহ ফাহমী ও শাহাবুদ্দিন রহমতউল্লাহ প্রমুখও উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতা ও উপন্যাস রচনা করেন। দেশের অন্যান্য ভাষার মতো উর্দু ভাষার উন্নয়ন সাধনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বৃটিশ ভারতে স্থানীয় ভাষায় সাংবাদিকতার মোটামুটি ব্যাপক প্রচলন হলেও পূর্বাঞ্চলে এক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। লর্ড কার্জনের শাসনামলে ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ বিভক্ত হলে এখানে উর্দু ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়। সে সময়ের সর্বজনমান্য মুসলমান নেতা হাকিম হাবিবুর রহমান এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ভাষায় মাসিক *মাশরিক* প্রকাশ করেন। এটিই পূর্ব বাংলার মাটিতে প্রকাশিত প্রথম উর্দু সাময়িকী। এ সাময়িকীটিতে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় স্বার্থ সম্পর্কিত লেখার সমাবেশ ঘটতো। মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর লিখিত নিবন্ধাদি প্রকাশ করা ছাড়াও *মাশরিক* সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যবহুল লেখা প্রকাশ করতো। এতে প্রকাশিত বেশিরভাগ লেখা সম্পাদকের নিজের হলেও এ. এফ. এম. আবদুল আলি, সৈয়দ মাহমুদ আজাদ,

সৈয়দ শরাফুদ্দিন, মৌলবি নাজমুদ্দিন এবং খাজা মমতাজ জাহাঙ্গীর নাগরী প্রমুখ সাহিত্যিক এর সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অপর দু'টি উল্লেখযোগ্য মাসিক উর্দু পত্রিকা ছিল *যাদু* ও *আখতার*। *যাদু* পত্রিকাটিও হাকিম হাবিবুর রহমানই বের করেছিলেন। এটি দীর্ঘকাল চালু ছিল এবং সমগ্র উপমহাদেশের উর্দুপ্রেমিকদের মধ্যে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যাও ছিল ব্যাপক। *আখতারের* কেবল একটা সংখ্যাই বেরিয়েছিল। তবে বিষয়বস্তুর লালিত্যের দিক থেকে সেটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটাতে নিয়াজ ফতেহপুরী, রেজা আলি ওয়াহ্শাত্, নাতিক লাখনভী, আজিজ লাখনভী, ওয়াকিফ বিহারী মায়েল এলাহাবাদী প্রমুখ কবি ও লেখকের রচনা ছাপা হয়েছিল। *আখতার*-এর সম্পাদক আবদুর রব সিদ্দিকী (১৮৯১-১৯৪৪), যিনি খালিদ বাঙালি নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, তিনি প্রকৃতই উন্নত সাহিত্যরুচির লোক ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতা সুপণ্ডিত আবদুল হাই আখতার-এর কাছ থেকে তা লাভ করেছিলেন। পিতার নাম অনুসারেই তিনি মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। খালিদ বাঙালি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন।

১৩

সংস্কৃত সাহিত্য

পরেশচন্দ্র মণ্ডল*

বাংলায় সংস্কৃত চর্চা প্রথম কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে আর্যভাষা 'সংস্কৃতের' চর্চা যে আরম্ভ হয় নি, এ ব্যাপারে সম্ভবত কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মৌর্য ও গুপ্তযুগের লেখমালার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের বা তারও পূর্বে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল।[১] এরই ফলস্বরূপ সপ্তম শতকের মধ্যেই সংস্কৃতচর্চা বাঙালির হাতে বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়, যাকে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ 'গৌড়ীয় রীতি' নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন বাংলার গুপ্ত শাসনামলে সংস্কৃতচর্চা প্রসার লাভ করে এবং কিছু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থও রচিত হয়। এ সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চন্দ্রগোমীপ্রণীত *চান্দ্রব্যাকরণ*, গৌড়পাদ রচিত *গৌড়পাদ-কারিকা*, পালকাপ্যের *হস্ত্যায়ুর্বেদবিদ্যা* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

প্রাক-নবাবি যুগে সংস্কৃতচর্চা

পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় তাদের উদারতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলনের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন চলতে থাকে। শ্রীধরকৃত *অদ্বয়সিদ্ধি*, চক্রপাণি দত্তের *আয়ুর্বেদ দীপিকা*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* প্রভৃতি কাব্য, কবি বিদ্যাধরের *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়*, শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* ইত্যাদি সংগ্রহকাব্য পালযুগের সংস্কৃতচর্চার

---

* অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮১), ১৮২।

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব*, (কলকাতা ১৩৮২ বা. স.), ৩৫৮-৫৯।

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[৩] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পালরাজগণের শাসনামলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে পালরাজদের পরে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সেনরাজদের অভ্যুদয় ঘটে। শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ধর্মে-কর্মে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্মৃতি ও সংস্কার অনুযায়ী সমাজগঠনে প্রয়াসী হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে এ ধর্মের প্রসার ঘটান। সেনরাজদের শাসনামলে সংস্কৃতচর্চা এত প্রসারলাভ করেছিল যে এই যুগকে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার 'সুবর্ণ যুগ'[৪] বলা হয়। সেন বংশের শাসকগণ ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী এবং তাঁরা প্রায় সকলে কবিতা রচনা করেছেন। রাজা বল্লাল সেন হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থে সংস্কৃত ভাষায় *ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* নামে পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষণ সেনের পাঁচজন সভাকবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবরচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যখানি সংস্কৃত সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। সংক্ষেপে বলা যায়, পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লাল সেন, সর্বানন্দ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণ এতজন পণ্ডিত ও কবির আবির্ভাব সেনযুগের বাংলাদেশকে নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করেছিল।[৫]

মুসলিম শাসনামলে নানা কারণে সংস্কৃতচর্চায় শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তবে মুসলিম শাসকদের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যোৎসাহী শাসকের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বৃহস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, চতুর্ভুজ প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি পণ্ডিত সংস্কৃতচর্চার ধারাটি প্রবহমান রাখতে প্রয়াসী হন।[৬]

এই সময় বাংলাদেশে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। নবদ্বীপের অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *চৈতন্যভাগবত* থেকে নবদ্বীপে তৎকালীন সংস্কৃতচর্চার অনুকূল অবস্থার কথা জানা যায়।[৭] সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[৮] শূলপাণির *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* ও *শ্রাদ্ধবিবেক,* মধুসূদন সরস্বতীর *অদ্বৈতসিদ্ধি, প্রস্থানভেদ,* রামানন্দতীর্থের *অদ্বৈত প্রকাশ* ও *অধ্যাত্মবিন্দু* প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখযোগ্য

---

৩. R. C. Majumdar, *The History of Bengal,* Vol I, (University of Dhaka 1963), 310-17.

৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব,* (কলকাতা ১৩৮২), ৩৬৫।

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ),* (কলিকাতা ১৯৮১), ১৯৫।

৬. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুবাদক), (ঢাকা ১৯৮২), ২৭০-৭১।

৭. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত* , শ্রীসুকুমার সেন (সম্পাদিত), (নতুন দিল্লী ১৯৮২), ৭।

৮. রমেশচন্দ্র মজুদার এবং অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ),* (কলকাতা ১৩৮৫), ৩৩৬-৩৫৬

গ্রন্থ। কাব্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে রঘুনাথ দাস বিরচিত *দানকেলিচিন্তামণি*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *গোবিন্দলীলামৃত*, রামরাম শর্মার *মনোদূত*, রূপ গোস্বামীর *হংসদূত* ও *উদ্ধবসন্দেশ* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়।

মধুসূদন সরস্বতীর *কুসুমাবচয়*, *রূপগোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী*, *বিদগ্ধমাধব*, কবিতার্কিকের *কৌতুকরত্নাকর*, গোপীনাথের *কৌতুকসর্বস্ব* এযুগের নাট্যরচনার নিদর্শন। অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যশাস্ত্র রচনাতেও বাঙালি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কবি কর্ণপুরের *অলঙ্কারকৌস্তুভ*, কবিচন্দ্রের *কাব্যচন্দ্রিকা*, বলদেবের *কাব্যকুস্তভ*, রূপ গোস্বামীর *নাটকচন্দ্রিকা*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, *উজ্জ্বলনীলমণি* (বৈষ্ণব রসশাস্ত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাতেও বাঙালির অবদান তুচ্ছ নয়। জীব গোস্বামীর *হরিনামামৃত ব্যাকরণ*, ভরত মল্লিকের *একবর্ণার্থসংগ্রহ* ও *দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার. স্মৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্যই নবদ্বীপ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মহর্ষি গৌতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শন দীর্ঘকালের আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বারো শতকের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।[৯] এটিই নব্য-ন্যায়। মিথিলায় এই নব্য-ন্যায়ের উদ্ভব হলেও বাংলার নবদ্বীপই নব্য-ন্যায় চর্চার প্রকৃষ্ট স্থল রূপে চিহ্নিত হয়।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মিথিলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছাত্রকে সেখান থেকে ন্যায়ের গ্রন্থাদি, এমনকি নোটপত্রাদি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে দেয়া হতো না। ফলে ন্যায়চর্চা মিথিলাতেই ছিল সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের ন্যায়ের ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য মিথিলায় অধ্যয়ন করে ন্যায়গ্রন্থ *তত্ত্বচিন্তামণি*সহ *কুসুমাঞ্জলির* পদ্যাংশ মুখস্থ করে নবদ্বীপে ফিরেন এবং এই স্মৃতিতে ধৃত গ্রন্থের সাহায্যে নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়চর্চা শুরু করেন।[১০] তাঁর প্রধান শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে তর্কশাস্ত্রে পরাভূত করে নবদ্বীপের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচিত *চিন্তামণিদীধিতি* নব্যন্যায়ের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পনেরো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বাংলাদেশই নব্য-ন্যায়চর্চার পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হয়েছে। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণির *চিন্তামণিদীধিতির* উপর জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬৯০) ও গদাধর ভট্টাচার্য (১৬৫০) কৃত টীকা অপূর্ব চিন্তার উপাদানরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। রঘুনাথ শিরোমণি নব্যন্যায় চর্চার মূল স্তম্ভ গড়ে তোলেন। আর সেখানে জগদীশ ও গদাধর এই দুই মনীষী নব্যন্যায়ের বিরাট সৌধ রচনা করেন। এঁদের পর

---

৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা ১৯৮৩), ২৯৫।

১০. Satischandra Vidyabhusana, *History of Indian Logic*, (Calcutta 1921), 462.

কুসুমাঞ্জলিকারিকার হরিদাসী টীকা (হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার), রঘুনাথ শিরোমণি রচিত গ্রন্থের মাথুরী টীকা (মথুরানাথ তর্কবাগীশ), *ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* প্রভৃতি নানা রকম ন্যায়শাস্ত্রের টীকা ব্যাখ্যা নবদ্বীপসহ দেশের সমগ্র পণ্ডিত সমাজে পঠিত ও আলোচিত হতে থাকে।[১১]

আঠারো ও উনিশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্য

নব্য-ন্যায়চর্চার পাশাপাশি নব্যস্মৃতিও বাংলাদেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। সতেরো ও আঠারো শতকের কয়েকজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক এবং স্মৃতি-আচার্যের পরিচয় ও অবদান এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

এই ক্ষেত্রে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭ খৃ.)-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[১২] দীর্ঘ জীবনের অধিকারী এই মহাপণ্ডিত সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে এক অনন্য ব্যাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে *রামচরিত* নাটকাদি রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে *বিবাদভঙ্গার্ণব* নামে যে বিরাট গ্রন্থটি রচনা করে গেছেন এটিই তাঁকে যশস্বী করে রেখেছে। এই গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ দেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ (১৭৫৪- খৃ.)[১৩] নবদ্বীপ নিবাসী অপর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ওয়ার্ড (Word) সাহেবের গ্রন্থে দেখা যায় ১৮১৭ সালে কৃষ্ণকান্তের ন্যায় চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ জন। তিনি *ন্যায়রত্নাবলী, ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা, তর্কামৃততরঙ্গিনী, ন্যায়পত্রী* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বাংলাদেশের সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন[১৪] (১৮০৬-১৮৫৫ খৃ.) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদের মধ্যে অন্যতম। ছাত্রসমাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করে না গেলেও তাঁর রচিত পত্রিকাসমূহ দেশী-বিদেশী ছাত্রদের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

কালক্রমে উনিশ শতকে বাংলাদেশে নব্যস্মৃতির গৌরব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এই পর্যায়ে নব্য স্মৃতিচর্চায় কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন[১৫] (১৮৫৪-১৯১৭ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৌলিক রচনা *উদ্ধার চন্দ্রিকা* (নিবন্ধ) ১৩১২

---

১১. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, "বাঙ্গালার সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক বিস্মৃত অধ্যায়", *দেশ,* ২০ জুন ১৯৮৭, ৪১।

১২. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান,* (কলকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২২৫-৩৩।

১৩. ঐ, ২১৩-১৯।

১৪. ঐ, ২২২-২৩।

১৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান,* (কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ১৫৩।

বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সমুদ্র পার হয়ে যারা পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণ সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাপারটি *উদ্ধার চন্দ্রিকার* বিষয়বস্তু। এছাড়া তিনি *মনুসংহিতা* প্রভৃতি কুড়িখানি ধর্মগ্রন্থেরও টীকা রচনা করে গেছেন।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত[১৬] (১২৩৬-১২৯৬ খৃ.) গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের কৃতী সন্তান ও ছাত্র; বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি ন্যায় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে, নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের নির্বাণোন্মুখ উজ্জ্বলতার তিনি শেষ নিদর্শন। তিনি গদাধরীয় মুক্তিবাদ ও শক্তিবাদের টীকা রচনা করেন। তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ *ন্যায়তত্ত্বপ্রবোধিনী* তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ও ছাত্র সর্বেশ্বর সার্বভৌম সমাপ্ত করেন।

নব্যন্যায়ের আর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক হলেন মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন[১৭] (১২৪০ বঙ্গাব্দ)। আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তিত্বরূপে তিনি নন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। *ন্যায়প্রকাশ, বেদান্তপরিভাষাটীকা, অর্থসংগ্রহ* (মীমাংসা) গ্রন্থের টীকা, *তত্ত্বকৌমুদী* (সাংখ্য) টীকা এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর টীকা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ। এ ছাড়া তিনি *বাতদূত* নামের একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে নবদ্বীপে ন্যায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ[১৮] (১২৫০-১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)-এর নাম সুপরিচিত। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপক ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *সাংখ্যদীপনী*, *ন্যায়তত্ত্ববোধিনী*, *ন্যায়সপ্তপদার্থী*, *ন্যায়বার্তিক* (সম্পাদিত), *তত্ত্বচিন্তামণির মাথুরী টীকা* (সম্পাদিত), *ন্যায়কুসুমাঞ্জলির* টীকা, *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি বিবৃতি* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ[১৯] (১৮৭০-১৯৩৪ খৃ.) ভট্টপল্লী নিবাসী একজন বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত। সংস্কৃতচর্চা প্রবহমান রাখার জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গোবিন্দানন্দের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী, দানক্রিয়াকৌমুদী, শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী* প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এ ছাড়াও অনিরুদ্ধ ভট্টের *হারলতা* ও *কৃত্যরত্নাকর, গৃহস্থরত্নাকর, বিবাদরত্নাকর, দণ্ডবিবেক, রাজধর্মকৌস্তুভ* প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন।

---

১৬. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান*, (কলকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২২৪।

১৭. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, "বাঙ্গালীর সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক বিস্মৃত অধ্যায়", *দেশ* , ২০ জুন ১৯৮৭, ৪৩।

১৮. ঐ , ৪২-৪৩।

১৯. ঐ, ৪৪।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে নব্য-ন্যায়চর্চার ক্ষেত্রে যে বাঙালির নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[২০] (১৮৭৬-১৯৬১খৃ.)। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি ছিলেন সংস্কৃতচর্চার উত্তরাধিকারী। পিতামহ কাশীচন্দ্র, পিতা গঙ্গাধর এবং বাংলার গৌরব দার্শনিক প্রবর মধুসূদন সরস্বতীর উত্তরসূরি হিসেবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্কৃতচর্চায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর রচিত *স্মৃতিচিন্তামণি* নব্যস্মৃতিচর্চায় এক প্রশংসনীয় সংযোজন। এই গ্রন্থে হিন্দু মাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্ম-কর্ম ও নিত্যকর্ম সম্পর্কে ব্যবস্থাসহ বঙ্গানুবাদ রয়েছে।

নবদ্বীপসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে সংস্কৃতচর্চায় যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাদের পরিচয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মর্তব্য। এ ক্ষেত্রে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের[২১] (১৭১০-১৭৮২ খৃ.) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃতচর্চার জন্য ছিলেন অত্যুৎসাহী এবং এজন্য অর্থব্যয় করতেও ছিলেন মুক্তহস্ত। নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাঁলার পণ্ডিতগণ পর্যন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থানুকূল্য ভোগ করেছেন। তিনি নদীয়ায় অনেক টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং সেগুলোর ব্যয়ভার বহনের জন্য করমুক্ত ভূসম্পত্তি দান করে সংস্কৃতচর্চার পথ প্রশস্ত করেন। সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নদীয়ায় আগত বিদেশী ছাত্রদের জন্য তিনি মাসে দু'শ টাকা মাসোহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্যানুরাগী বিত্তবান ও জমিদারগণ দেশের শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, নাটোরের রামকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রাণী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ গোপাল সিংহ এবং ঢাকার রাজনগরের রাজবল্লভ সেন প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ সে যুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।[২২]

পূর্ব বাংলার রাজবল্লভ রাজনগরে টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব এবং পাঠশালা স্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান ছিলেন। মেধাবী ছাত্রদেরকে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করতেন। রাজনগরের নীলকণ্ঠ সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত নামের তিনজন কৃতী ছাত্রকে তিনি রাজনগর থেকে সংস্কৃতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।

এসময় নবদ্বীপ ছাড়া বাংলাদেশের ২৪-পরগণার ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী), গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের টোলসমূহেও উচ্চতর সংস্কৃতচর্চার ব্যবস্থা ছিল।[২৩]

---

২০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান,* (কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ১৫৩।

২১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা,* (কলকাতা ১৯৮২), ১০৬।

২২. ঐ, ১০৬।

২৩. ঐ, ১১০।

আঠারো শতকের কবি দয়ারামবিরচিত *সারদামঙ্গল* নামের কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নবদ্বীপে নব্যন্যায় অধ্যাপনার জন্য পাঁচটি টোল ছিল; এ ছাড়া সপ্তগ্রাম, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল।[২৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলেও নবদ্বীপে তথা বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার পরিচয় মেলে। লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলাদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ হতে ১৮৩৮ সালের মধ্যে তিনটি রিপোর্টে তিনি এদেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা হিসাবে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্থানীয় বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫] দ্বিতীয় রিপোর্টে বলেছেন যে, রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমায় ৩৮টি সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল।[২৬] তৃতীয় রিপোর্টে তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়, তখন সারা বাংলাদেশে এক হাজার আট জন শিক্ষকের কাছে দশ হাজার আট শত জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। টোলগুলোতে ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো।

এই বিখ্যাত রিপোর্ট তিনটিকে ভিত্তি করে কিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করে ১৮৬৮ সালে রেভারেন্ড জে. লং যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সেখানে বর্ণিত তথ্য অনুসারে সেসময়কার বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার অবস্থাটি জানা যায়। ১৮১১ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর[২৭] নদীয়ায় এবং ত্রিহুতে একটি করে মোট দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যদিও বাস্তবায়িত হয় নি, তবুও নদীয়ায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের রিপোর্টে (৯ জুলাই ১৮১৬) বলা হয়েছে যে নদীয়ায় তখন ৪৬টি সংস্কৃত টোল ছিল। এগুলো স্থানীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮০ জন। তবে নদীয়ায় ছাত্র ও টোলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ১৮১৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায় ৪৬টি টোলে ৩৮০ জন ছাত্র, ১৮১৮ সালে ৩১টি টোলে ৭৪৭ জন ছাত্র, ১৮২১ সালে ২৫টি টোলে ৫০০-৬০০ জন ছাত্র ছিল। এ থেকে মনে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ কমে গেলেও ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেছে।[২৮]

---

২৪. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুবাদক), (ঢাকা ১৯৮২), ২৩০।

২৫. সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, (কলকাতা ১৯৬৪), ১১৪।

২৬. ঐ, ১১৪।

২৭. Rev. J. Long, *Adam's Reports on Vernacular Education In Bengal and Behar*, (Calcutta 1868), 50.

২৮. ঐ, 50-51.

১৮১৮ সালের রিপোর্টে আরো দেখা যায়, তখন নদীয়ায় পাঁচ প্রকারের সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ৩১টি প্রতিষ্ঠানে ৭৪৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। এর মধ্যে নবদ্বীপেই নব্যন্যায় শিক্ষার ১৭টি কলেজে ছাত্র ছিল ৪৩২ জন। এছাড়া স্মৃতি, অলঙ্কার, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ পড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনেক ছাত্র পড়াশোনা করতো।[২৯]

ইউরোপীয় অবদান

সংস্কৃত সাহিত্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হলো কোম্পানি শাসনামলে। কোম্পানি কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্য সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিল। এই উৎসাহের প্রধান কারণ রাজনৈতিক। এই দেশকে সফল ও কার্যকরভাবে শাসন করার জন্য এ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ছিল একটি বাস্তব প্রয়োজন। এ ছাড়া বিশ্বমানব ও বিশ্ব সভ্যতাকে জানার রেনেসাঁজাত স্পৃহাও অনেককে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাচ্যবিদ এবং কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচারক স্যার উইলিয়ম জোনস।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫) ছিলেন সংস্কৃতচর্চার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ছিলেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত সংস্কৃতগুরু এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সরকারি পৃষ্ঠপোষক। হেস্টিংস-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম *Code of Gentoo Law* শীর্ষক বিখ্যাত হিন্দু আইন গ্রন্থটি সংকলিত হয়। সংকলন করেন নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড।[৩০] গ্রন্থের অনুক্রমণিকায় সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম রচনা।

সতেরো শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয়গণ সংস্কৃতচর্চার প্রয়াস পান। ১৬০৬ সালে রবার্ট ডি. নোবিলি নামে জনৈক পাদ্রী দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন এবং ১৬৬৪ সালে জার্মান নাগরিক Heinrich Noth, ১৬৯৯ সালে Henxleden নামের অপর একজন জার্মান সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন।[৩১] কিন্তু সংস্কৃত ভাষাচর্চা সম্পর্কে এই প্রয়াস ছিল বিচ্ছিন্ন এবং সুগঠিত পরিকল্পনা বহির্ভূত। ইউরোপীয়দের এই প্রাথমিক প্রয়াসে সংস্কৃত বিদেশীদের মধ্যে তেমন পরিচিতি লাভ করতে পারে নি।

সংস্কৃতচর্চার অগ্রদূত

ক. *জোনস*

বহু ভাষাবিদ আইনজ্ঞ উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ সালে কলকাতায় আসেন। তিনি এদেশে এসে উপলব্ধি

---

২৯. ঐ, 50-51.
৩০. বামনদাস বসু, পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা, *প্রবাসী*, ১২শ সংখ্যা, ৪০৭।
৩১. ঐ, ৪০৭।

করলেন যে, এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে সংস্কৃত ভাষা সেটা আরো চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি চার্লস উইলকিনস-এর মতো আরো কয়েক জন পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৩২] এই প্রাচ্যানুরাগীগণ মিলে স্থির করলেন যে, প্রাচ্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে যে বিপুল সম্ভার রয়েছে তাকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের সাথে সাথে নতুন গবেষণাধর্মী কাজ-কর্ম, নতুন আবিষ্কার ইত্যাদির পথও পরিষ্কার হলো এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের একটি বাংলা সংস্করণের পুঁথি পেয়ে জোনস ১৭৮৭ সালে রামলোচন পণ্ডিতের নিকট তা পড়তে শুরু করেন। তিনি প্রথমে বইটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন এবং ঐ ল্যাটিন থেকে পুনরায় ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। *ফেটাল রিং* নামে তাঁর এই অনূদিত গ্রন্থ ১৭৮৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডসহ চতুর্দিকে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল। লন্ডনেই সাত বছরের মধ্যে বইটির তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সবার আগে জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ফস্টারের অনূদিত জার্মান সংস্করণও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তৎকালীন সাহিত্যসম্রাট গ্যেটে *শকুন্তলা* পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন :

> Would'st thou the young year's blossoms and
> the fruits of its decline,
> And all by which the soul is charmed, enraptured,
> feasted, fed ?
> Would'st thou the Earth and Heaven in one Sole
> name Combine ?
> I name thee, O Sakuntala ! and all atonce is said.

১৯১২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর্থার ডব্লিউ. রাইডার *শকুন্তলার* আমেরিকান অনুবাদের সংস্করণ বের করেন। এছাড়া রুশ, ডাচ, ড্যানিশ, সুইডিশ, পোলিশ, চেক, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় *শকুন্তলার* অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর চীন, ইউক্রেন, তুর্কীস্থান, পারস্য ও ইন্দোনেশিয়ায় *শকুন্তলার* প্রবেশ ঘটেছিল।[৩৩] সংস্কৃত নাটক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর বিশ্ববিস্তৃতি ঘটিয়ে এবং এর স্রষ্টা কালিদাসকে বিশ্বকবির আসনে স্থাপন করে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্যবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়ে রয়েছেন।

---

৩২. Kali Kinkar Datta, *A Social History of Modern India*, (New Delhi 1975), 104-05.

৩৩. প্রণতি রায়, 'শকুন্তলা-র বিদেশযাত্রা', *দেশ*, ১৪ এপ্রিল ১৯৯০, ৪১-৪৬।

এছাড়া বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবেও জোনস-এর নাম উল্লেখিত হয়ে আছে। তিনি প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে সমস্ত ভাষার মূলে যে এক আদিম ভাষার চর্চা ছিল এ ব্যাপারে দৃঢ়মত পোষণ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।[৩৪]

স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণাসমূহ *এশিয়াটিক রিসার্চ* নামের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশ করে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি পাশ্চাত্য তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খ. *কোলব্রুক*

স্যার উইলিয়াম জোনসের মৃত্যুর পর যেসব পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতচর্চায় প্রভূত অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে হেনরি টমাস কোলব্রুকের (১৭৬৫-১৮৩৭) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৩ সালে কোলব্রুক বেঙ্গল সার্ভিসে রাইটারশীপ নিয়ে ভারতে আসেন এবং ১৭৮৬ সালে ত্রিহুতে রেভিনিউ কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে উৎসুক হন। তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যে হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় রীতিনীতিসহ সমাজের ব্যবহারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন।[৩৫] হিন্দু সমাজজীবনে অনুসৃত সতীদাহ প্রথার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি *ঋগ্বেদের* ভিত্তিতে রচিত তাঁর 'On the Duties of a Faithful Hindu Widows' নামের প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে পাঠ করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর এদেশীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেবসহ উইলসন, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রাচ্য ভাষাবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত প্রবন্ধে বিধৃত সতীদাহ প্রথার উৎস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[৩৬] ১৮৫৬ সালে উইলসন তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে *ঋগ্বেদে* সহমরণ সম্পর্কে বলা হয় নি, বরং বিধবার প্রতি জগতে বেঁচে থাকার নির্দেশ রয়েছে— "That the text of the *Rigveda* cited as authority for the burning of widows enjoins the very Contrary, and directs them to remain in the world."[৩৭]

১৮০১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় কোলব্রুক 'Sanskrit and Prakrit Languages' নামে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই নিবন্ধে তিনি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের পরিচয় তুলে

---

৩৪. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, (California 1969), 38.

৩৫. O. P Kejariwal, *The Asiatic Society of Bengal and The Discovery of India's Past*, (Delhi 1944), 78.

৩৬. ঐ, 78.

৩৭. H. H. Wilson, "On the supposed Vaidic authority for the burning of Hindu Widows, and on the funeral of the Hindus", *Journal of the Royal Asiatic Society of Ireland*, XVI (1856), 201.

ধরেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর অধ্যয়ন করে তিনি এ ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনায় উৎসাহিত হন এবং এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ১৮০৫ সালে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ ও তার ভাষ্যসমূহের ভিত্তিতে *Grammar of the Sanskrit Language* নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৮] সংস্কৃত ভাষা নিয়ে গবেষণা করে কোলব্রুক তাঁর পূর্ববর্তী গবেষক উইলিয়াম জোনস-এর মতকে খণ্ডন করে হিন্দির চেয়ে সংস্কৃতকে অধিকতর প্রাচীন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩৯]

সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদকর্মেও কোলব্রুক তাঁর যথোপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। ১৮০৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *হিতোপদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর এই অনুবাদ পূর্ববর্তী অনুবাদক জোনস ও উইলকিংস-এর গ্রন্থের তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কোলব্রুক সংস্কৃত অভিধান *অমর কোষের* অনুসরণে *Sanskrit Dictionary* প্রণয়ন করেন। এই অভিধানে শব্দের উৎস উল্লেখসহ প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিঞ্চিত বিবরণ স্থান লাভ করেছে।[৪০]

হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদকে* নিয়ে কোলব্রুক গবেষণামূলক রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। ১৮০৪ সালে তাঁর রচিত 'Essay on the Vedas or Sacred Writings of the Hindus' নামের প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির *The Asiatic Reasearches* পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪১] সম্ভবত তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিত যিনি সায়নভাষ্যসহ *ঋগ্বেদ* গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বৈদিক যুগকে ভারতীয় আর্য সভ্যতার সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেন।[৪২] বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি *বেদ, পুরাণ* প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং এদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথার ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করেন। প্রসঙ্গত তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সাথে তৎকালীন সমাজে অনুশীলিত রীতি-নীতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য নির্দেশ করে গেছেন। কোলব্রুকের *The Translation of Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance* বইটি প্রকাশিত হয় ১৮১০ সালে। এই গ্রন্থটির সহায়তায় এদেশে আগত ইউরোপীয়গণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত আইনে বিদ্যমান ধারা ও স্ববিরোধিতার স্বরূপ আধুনিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বুঝবার সুযোগ পান। এ গ্রন্থ দুটি উইলিয়াম জোনস্ এবং তাঁর প্রধান পণ্ডিত তর্কপঞ্চানন কর্তৃক ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ দুটিতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না

---

৩৮. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 95.

৩৯. David Kopf *British Orientalism*, 88

৪০. প্রাগুক্ত, 88.

৪১. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 98.

৪২. David Kopf, *British Orientalism*, 40.

থাকায় তা শিক্ষানবিশদের কাছে খুব একটা সমাদর লাভ করতে পারে নি বলে কোলব্রুক মনে করেন।[৪৩] অথচ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রশিক্ষণগ্রহণকারী কোম্পানির বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশে তথা ভারতে অনুসৃত হিন্দু আইন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে কোলব্রুক এদেশীয় আইন সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ কাজে অগ্রসর হয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, সর্বভারতে গ্রহণযোগ্য কোন বিশেষ একখানি হিন্দু আইনের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় না। যে *মিতাক্ষরা*-কে দক্ষিণ ভারত ও বারানসিতে মেনে চলা হতো সেটা কিন্তু বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে অনুশীলিত হয় নি। এদেশের আইনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোলব্রুকের গবেষণায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল।[৪৪] হিন্দু আইনের উপর কোলব্রুকের রচিত *ডাইজেস্ট* ১৭৯৮ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি দুই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তবে এই গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে কোলব্রুক একজন মহান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত হন।[৪৫] সংস্কৃত বিষয়ে তাঁর মেধা ও দীর্ঘ অনুশীলনের স্বীকৃতি হিসাবে ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দু আইন ও সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মীয় উৎসবাদি সম্পর্কেও কোলব্রুকের লিখিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। 'His Essay on the Religious Ceremonies of the Hindus' নামের প্রবন্ধটি *Asiatic Reasearches* নামের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় নির্দেশসহ সমাজজীবনের বাস্তব অনুশীলনের দিকটিও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এইভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কোলব্রুকের ধারণা হয় যে, হিন্দু ধর্মে বহু দেবদেবীর উপাসনার কথা থাকলেও হিন্দুগণ মূলত একেশ্বরবাদী। তিনি বলেন :

> If the doctrines of the Veda, and even those of the Puranas, be closely examined, the Hindu theology will be found consistent with monotheism, though it contains the seeds of polytheism and idolatry.[৪৬]

এছাড়া কোলব্রুক বেদান্ত দর্শনের শংকর, বল্লভ, মাধব, রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণের দার্শনিক অবদান সম্পর্কেও উল্লেখ করে গেছেন। হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে কোলব্রুকের রচনা

---

৪৩. ঐ, ৪৪-৪৭.

৪৪. ঐ, ৪৭.

৪৫. Kejariwal *Asiatic Society of Bengal*, 91.

৪৬. H. T. Colebrooke, "On the Religious Ceremonies of the Hindus, and of the Brahminas especially", Essay II, *Asiatic Researches*, Vol. VII, 279.

প্রণিধানযোগ্য। তিনি *যজুর্বেদ, সামবেদ* এবং কালিদাসের *রঘুবংশকাব্য* অনুসরণে হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে তথ্যনির্ভর রচনা উপহার দেন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাত্ত ছিল মূলত সংস্কৃত ভাষায়। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপির নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ব্যবহার করে কোলব্রুক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও অতুলনীয় অবদান রেখেছেন।

কোলব্রুকের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও প্রাচীন বিজ্ঞান নতুন চিন্তা-চেতনার আঙ্গিকে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। এই মহান সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৮১৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত থেকে কোলব্রুক সংস্কৃত চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

গ. *উইলসন*

কোলব্রুকের পর ইউরোপীয়দের মধ্যে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে প্রথমেই হোরাস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ডাক্তারের চাকুরি নিয়ে ভারতে আসেন। এদেশে আসার পর প্রাচ্যবিদ্যা, বিশেষ করে সংস্কৃতচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। উইলসন ১৮১৩ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কালিদাসের *মেঘদূত*। এই অনূদিত গ্রন্থটি বিশ্বের সুপরিচিত কালিদাসের কাব্য বলে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ সাড়া জাগায়। এই অনুবাদ সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বলা হয়, "one of the most perfect translations that adorns the literature of the nation."[৪৭]

মেঘদূত অনুবাদের পর উইলসনের সংস্কৃতচর্চার প্রশংসনীয় প্রকল্প হলো *Sanskrit English Dictionary* রচনা। তাঁর অপর মহান কীর্তি হিসেবে *রাজতরঙ্গিনী* আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান গ্রন্থ *রাজতরঙ্গিনী* সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :

> The fact remains that except Kalhana's Rajatarangini···there is no other historical text in the whole range of Sanskrit literature which makes even a near approach to it, or may be regarded as history in the proper sense of the term.[৪৮]

উইলসন *রাজতরঙ্গিনীর* ছয়টি সর্গের সমালোচনামূলক সারাংশ রচনাসহ এই গ্রন্থভিত্তিক ভারতীয় বিভিন্ন শাসকের কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করেন। *রাজতরঙ্গিনী*

---

৪৭. "Review of the Megha Dutt or cloud Messenger," *Asiatic Journal*, 1 (1816), 257.
৪৮. R. C. Majumdar, 'Ideas of History in Sanskrit Literature' in Philips (ed.), *Historians of India, 25.*

যেমন ভারতের অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরেছে, তেমনি উইলসনের প্রবন্ধ 'The Religious Sects of the Hindus' তদানীন্তন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় উপহার দিয়েছে। এছাড়া উইলসন *কূর্মপুরাণ* ও *অগ্নিপুরাণ* অবলম্বনে এদেশীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের সূচনা করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে উইলসন ভারতীয় আর্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদের* সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন।

এই সময় পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যভাষাচর্চার প্রতিও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কর্নেল বোডেন (Colonel Boden) নামের জনৈক ইংরেজের অর্থানুকূল্যে বোডেন চেয়ার নামে একটি সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতে অভিজ্ঞ উইলসন সাহেবই প্রথম উক্ত অধ্যাপক পদে মনোনীত হন।[৪৯] তিনি ১৮৩২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করে বোডেন চেয়ারে যোগদানের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে প্রায় ৩০ বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত থেকে অনেক পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করে পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করে যান।

ঘ. *প্রিন্সেপ*

উইলসন *এশিয়াটিক সোসাইটির* সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে লন্ডনে চলে যাওয়ায় সোসাইটির সদস্যগণ জেমস্ প্রিন্সেপকে উক্ত পদের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা টাঁকশালের প্রধান নিরীক্ষক (Assay Master)। এই সময় উইলসন প্রিন্সেপকে প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮২৯ সনে কোম্পানির বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মকর্তা জে. ডি. হার্বার্ট (J. D. Herbert) *Gleanings in Science* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের তৎকালীন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অবহিত করা এবং এদেশের উল্লেখযোগ্য অনুরূপ বিষয়সমূহ পাশ্চাত্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। হার্বার্ট কার্যান্তরে চলে যাওয়ায় প্রিন্সেপ ঐ পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং ১৮৩২ সালে সোসাইটির অনুমতিক্রমে *The Journal of the Asiatic Society* নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

স্থাপত্যবিদ্যা, রসায়ন ও পরিসংখ্যান বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত প্রিন্সেপের জ্ঞান-সাধনা এদেশের ইতিহাসচর্চার দিকে মোড় নেয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদে জেমস্ প্রিন্সেপের অবস্থানসময়ে (১৮৩২-১৮৩৫) এদেশ মহান আবিষ্কারে ভাস্বর হয়ে

---

৪৯. বামনদাস বসু, " পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা", *প্রবাসী* ,১২শ সংখ্যা, ৪০৯।

উঠে। এই সময় পুরাতত্ত্ব চর্চার (Indological Studies) ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতত্ত্বের স্থান পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ এবং তাতে উৎকীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার প্রভৃতি কাজের প্রতি প্রিন্সেপ আগ্রহী হন। ফলে পূর্ববর্তী গবেষক উইলিয়াম জোনস্, কোলব্রুক বা উইলসন যেখানে ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কক্ষে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পাঠে ব্যস্ত থাকতেন, সেখানে জেমস প্রিন্সেপ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।[৫০]

জেমস প্রিন্সেপ নিজে যেমন ছিলেন প্রতিভাশালী, তেমনি ছিলেন অন্যকে গবেষণা কাজে উৎসাহিত করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

তাঁর সমসাময়িক যেসব পাশ্চাত্য পণ্ডিত এদেশের ইতিহাসচর্চার উপাদানস্বরূপ প্রাচীন মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন আলেকজান্ডার বার্নেস (Alexander Burnes) তাদের অন্যতম। তাঁর সংগৃহীত মুদ্রাসমূহের ভিতর থেকে একটি বিশেষ মুদ্রার ভিত্তিতে রাজা কনিষ্কের পরিচয় তুলে ধরা হয়। টি. এস. বার্ট (T. S. Burt)-এর সহযোগিতায় প্রিন্সেপ ১৮৩৪ সালে এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের সঠিক পরিচয় উদ্ধারের প্রয়াস গ্রহণ করেন।[৫১] প্রসঙ্গত ডব্লিউ. এইচ. মিল (W. H. Mill)-এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি নিয়ে এদেশে আসেন এবং দীর্ঘকাল হাওড়ার শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই দেশে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি পাঠের জটিলতা নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। তৎকালীন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মিল গুপ্ত রাজবংশের একটি বংশতালিকা তৈরি করেন।[৫২]

প্রাচীন ভারততত্ত্ব উদ্ধারের অভিযানে জেমস প্রিন্সেপের সঙ্গে জে. স্টিভেনসন (J. Steveson)- এর নামও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাঁর অনুসন্ধানপদ্ধতি অনুসৃত হলে অশোক শিলালিপির পাঠোদ্ধারকার্য আরো আগেই সম্পন্ন হতে পারতো বলে ধারণা করা হয়। ত্রিহুত লিপি ও সারনাথের খননকাজে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রস্তরলিপির পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কানিংহাম, প্রিন্সেপ, উইলসন, মিল প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ ভারতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।[৫৩]

১৮৩৫ সালে সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত "On the Connection of various ancient Hindu coins with the Grecian or Indo-Scythic series" এবং "Notices of Ancient Hindu Coins" নামের প্রিন্সেপের প্রবন্ধ দুটিতে প্রথমবারের মতো অনেক নতুন রাজা ও রাজবংশ

---

৫০. ঐ, Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 224.

৫১. ঐ, 169.

৫২. W. H. Mill, "Supplement to the Historical Remarks on the Allahabad Inscription", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, III· 2, 344.

৫৩. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 185-87.

সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়, যা পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন রাজার মুদ্রা অবলম্বনে প্রিন্সেপ ভারতে মুসলিম রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপাদান দিয়ে গেছেন। এছাড়া প্রিন্সেপের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তাঁর মতে বাংলাদেশে পালবংশের উদ্ভব হলেও পালরাজগণ এক সময়ে সারা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে কনৌজে তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।[৫৪]

জেমস প্রিন্সেপের সময়ে হগসন (Hodgson) এদেশে এসে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেন। তিনি ১৮২৪ সাল থেকে কয়েক বছরের মধ্যে নেপাল হতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধদের ৯৪টি পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার দেন। হগসন শুধু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই করেন নি, নেপালী পণ্ডিতদের সহায়তায় মূল পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষা ও পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। হগসনের আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়। তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে Eugene Burnouf বলেন : "(Hodgson was) the founder of the true study of Buddhism on the basis of the texts and original remains."[৫৫]

জেমস প্রিন্সেপ *এশিয়াটিক সোসাইটিতে* থাকা অবস্থায় এদেশের প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, শিলার্লিপি, স্তম্ভলিপি ইত্যাদির সহায়তায় এদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের দ্বার উন্মোচন করে যান। প্রিন্সেপ পাঁচ বছর সোসাইটির সেক্রেটারি হিসেবে যে প্রকাশনা, মুদ্রা, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করে গেছেন তাতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় ১৮৩৮ সালে জেমস প্রিন্সেপ সোসাইটির সেক্রেটারি পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসার জন্যে ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয় এবং এক বৎসর রোগভোগের পর ১৮৪০ সালের ২২ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য মনীষীদের অবদানসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উইলিয়াম জোনস ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাঁরা এদেশে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোলব্রুক, ডেভিস, বুরু ও অন্যান্য। প্রাচীন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক মূল গ্রন্থাবলী নিয়ে উইলসন, প্যাটারসন, হগসন প্রমুখ ব্যক্তি গবেষণামূলক কাজ করে গেছেন। অপর দিকে প্রিন্সেপ, মিল,

৫৪. ঐ, 189.

৫৫. ঐ, 195.

কানিংহাম, বার্ট এবং আরো অনেক মনীষী প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, প্রত্নতত্ত্ব ও পদক সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এদেশের অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের তালিকায় জার্মান দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার-এর নামটিও সংযোজনযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম *ঋগ্বেদ* সম্পাদনা করেন, তাঁর রচিত পুস্তকসমূহের সহায়তায় প্রাচ্যদেশের ভাষা ও জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

উইলসন-এর মৃত্যুর পর মনিয়ার উইলিয়ামস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বোডেন চেয়ারে স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি *Sanskrit English Dictionary, Indian Wisdom, Religious Life and Thought in Modern India* প্রভৃতি পুস্তক রচনা করে এদেশের সম্পদ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে সংস্কৃত যে সাড়া জাগিয়েছিল, সে সর্ম্পকে ম্যাকডোনেল তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Since the Renaissance there has been no event of such worldwide significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the later part of the eighteenth century."[৫৬]

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কার পাশ্চাত্য দেশে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা এক সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ গবেষণা পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে পাশ্চাত্য দেশেও অনেক সোসাইটি গড়ে উঠেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর পরই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যকারিতার মাধ্যমে সংস্কৃতচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত তরুণ সিভিলিয়ানদের কর্মদক্ষতা ও নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এদেশবাসীর বিতর্কিত বিষয়সমূহ এদেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আর এজন্য এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সম্বন্ধে শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন।[৫৭]

---

৫৬. A. A. Macdonnell, *History of Sanskrit Literature*, (London 1917), 1.

৫৭. David Kopf, *British Orientalism*, 47.

কেরি (Dr. Carey), কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছাড়াও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোলোকনাথ শর্মা, মুনশি নজুরুল্লা, আবদুর রহিম ও অন্যান্য প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ কলেজের শিক্ষাদান কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিলেন।[৫৮] আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ভাষাসহ এদেশীয় প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দু-মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র, গভর্নর জেনারেল পরিষদের আইনসমূহ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, গ্রিক, ল্যাটিন, ক্লাসিক্যাল ইংরেজি সাহিত্য, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাস এই কলেজের পাঠ্য বিষয় রূপে গৃহীত হয়।[৫৯]

সে সময় দেশীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় এই কলেজে নিযুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষকগণ প্রাচ্য ভাষায় (বাংলায়) পুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে সংস্কৃতচর্চায় এই কলেজের অবদানও নগণ্য নয়। কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়, সেগুলো শ্রেণী বিন্যস্ত করে দেখা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে[৬০] সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ১৮০৫ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে যে কয়খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

A Grammar of the Sanskrit Language, (Colebrooke 1805); An *Essay on the Principles of the Sanskrit Language* (H.P. Forster);*The Grammatical Sutras or Aphorisms etc.* of Panini with Selections from Various Commentators (Nagree Character, 1809).

মুগ্ধবোধ (১৮০৭) এবং *সিদ্ধান্তকৌমুদী* (দেবনাগরী অক্ষরে, ১৮১২) ব্যাকরণের পরেই সংস্কৃত অভিধানের কথা এসে পড়ে। এই সময় প্রকাশিত হয় *হেমচন্দ্র কোষ* (১৮০৭), *অমর কোষ* (১৮০৭, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত), *অমর কোষ* (১৮০৮ কোলব্রুক) এবং এইচ. এইচ. উইলসন-এর *Sanskrit and English Dictionary* (১৮১৫)।

এদেশে প্রচলিত আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে *মিতাক্ষরা* (১৮১২), *মনুসংহিতা*, *দায়ভাগ* (১৮১৩), *বীরমিত্রোদয়* (১৮১৫), *দত্তকচন্দ্রিকা* (১৮১৭), *দায়ক্রমসংগ্রহ* (১৮১৮) প্রভৃতি স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নীরস ব্যাকরণ ও আইনের কাঠিন্যের মধ্যে শিক্ষার্থীদের যাতে সর্বক্ষণ বিচরণ করতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সরস সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে *নীতিশতক*, *শৃঙ্গারশতক*, *বৈরাগ্যশতক* (১৮০৬), কেরি ও মার্শাল সম্পাদিত ইংরেজি অনুবাদ টীকাসহ মূল সংস্কৃত *রামায়ণ* (১৮০৬-১৮১০), *গীতগোবিন্দ* (দেবনাগরী অক্ষরে ১৮০৮), উইলসন

---

৫৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পঞ্চম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮৫), ৬৪২।
৫৯. ঐ, ৬০৩।
৬০. David Kopf, *British Orientalism* 47.

সম্পাদিত ও ইংরেজি অনূদিত *মেঘদূত* (১৮১৩), *মাঘকাব্য* এবং *কিরাতার্জুনীয়ম* (১৮১৫), কোলব্রুক সম্পাদিত *হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত* (১৮০৬), *নলোদয়* (১৮১৪) ইত্যাদি কাব্য ও গল্পকাহিনীমূলক গ্রন্থ নির্বাচন করে অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে এই কলেজ সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের* প্রতিষ্ঠাতা *লর্ড ওয়েলেসলি* লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরদের বিনা অনুমতিতে কলেজ স্থাপন করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। কলেজটি তুলে দেবার নির্দেশ আসে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তখন লর্ড ওয়েলেসলি ১৪১টি অনুচ্ছেদে কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং সেই ডেসপ্যাচ ডিরেক্টরদের সভায় পাঠিয়ে দেন। ওয়েলেসলির অকাট্য যুক্তিপূর্ণ পত্রের ফলে ১৮০৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর তাঁকে জানানো হয়, কলেজ আপাতত চলতে থাকবে। অপর দিকে এই কলেজ বন্ধ করে দেবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র ছিল সক্রিয়। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন চার্লস গ্র্যান্ট। ভারতে কিভাবে ইংরেজি শিক্ষা ও খৃস্টান ধর্ম প্রচার করা যায় এজন্য তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনার সীমা ছিল না। ইংল্যান্ডের ডিরেক্টরগণ গ্র্যান্টের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং কোম্পানির নব নিযুক্ত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৮০৬ সালে হার্ট ফোর্ডে হেলিবেরি কলেজ (Haileybury College) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬১] সেখানে প্রাচ্য ভাষাসহ অন্যান্য সকল বিষয় পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ওখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাচ্য ভাষার দুর্বলতা লক্ষ্য করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকেই উক্ত ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কলেজের ব্যয়ভার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে হোল্ড ম্যাকেঞ্জি (Hold Mackenzie) ১৮২৫ সালে প্রস্তাব করেন যে, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ব্যয়বহুল প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার চেয়ে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে স্বল্প বেতনে কোম্পানির কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।[৬২]

১৮২৮ সালে গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসে জেনারেল *উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি কলেজের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত অধ্যাপক সহ পণ্ডিত ও মুনশিদের প্রায় সকলকেই চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেন। অবশ্য কিছু শিক্ষকের পেনশন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে কলেজের একজন সচিব, দুজন পরীক্ষক এবং কয়েক জন মুনশি ছাত্রদের ভাষা শেখানোর কাজে নিযুক্ত থাকলেন।

এই নতুন নিয়মে কলেজে ক্লাশ নেয়া ও লেকচার দেয়ার সুযোগ রইল না। কলেজটি মৃতকল্প অবস্থায় আরো কিছু দিন টিকে ছিল। অবশেষে ১৮৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তদানীন্তন বড় লাট ডালহৌসি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।[৬৩]

৬১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, [পঞ্চম খণ্ড], (কলকাতা ১৯৮৫), ৬২৬

৬২. প্রাগুক্ত, ৬৩৭-৩৮।

৬৩. David Kopf, *British Orientalism*, 235.

১৮১৩ সালের চার্টার আইনে দেশে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সরকার শিক্ষানীতি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল, কেননা সরকারের নীতি নির্ধারকদের এক দল এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। অপর দল ছিল প্রাচ্যশিক্ষা বলবৎ রাখার পক্ষে। এই দলের পক্ষে ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস। তাঁরই নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)।

এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশের জনগণ কোন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে বেশি উপকৃত হবেন এ নিয়ে তদানীন্তন বাংলার বিদ্বজ্জনের মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। রাজা *রামমোহন রায়* (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন এদেশী প্রগতিপন্থীদের অন্যতম। তিনি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি পত্র লেখেন। সেই বিখ্যাত পত্রটির সারকথা হলো, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠান দ্বারা এদেশের ছাত্ররা নতুন কিছুই শিখবে না, বরং সুপ্রাচীন কাল থেকে যে ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ও বেদবেদান্তের পঠন-পাঠন প্রচলিত আছে, সেটা নিয়েই প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। এদেশবাসীর সত্যিকার উন্নতির জন্য সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয় পড়াবার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের গড়ে তোলা উচিত। আর এজন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন ধীমান অধ্যাপক নিযুক্ত করতে পারলে এদেশবাসী শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে।[৬৪]

রামমোহন রায় যখন এদেশীয় প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ঠিক তখনই অপরদিকে সংস্কৃতচর্চাকে সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ করার প্রচেষ্টায় রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি সংস্কৃত চর্চার প্রসারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করেন।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় রাজা রাধাকান্ত দেব বিশাল সংস্কৃত অভিধান *শব্দকল্পদ্রুম* সঙ্কলন করেন। তাঁর সঙ্কলিত এই অভিধানের সাহায্যেই উইলসন, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদেশের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বৃত্তি এবং কলেজের অধ্যাপকদের আকর্ষণীয় বেতনসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করেন।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায়

---

৬৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য,* (কলকাতা ১৯৭২), ১০২।

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত এই ছয় বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।[৬৫] তবে এসব বিষয় ছাড়াও সময় সময় নতুন বিষয়ের সংযোগে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা বর্ধিত হয়েছে। যেমন ১৮২৬ সালে বৈদ্যক শ্রেণী ও জ্যোতিষ শিক্ষা; ১৮২৭ সালে ইংরেজি এবং ১৮৩৯ সালে বাংলা শ্রেণী খোলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে (২২ জানুয়ারি ১৮৫১) প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণই এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেতো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দেশে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি থেকে কায়স্থ সন্তানগণ এবং ১৮৫৪ সাল থেকে সব ভদ্র হিন্দুদের সন্তানগণও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সুযোগ লাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি চারটি শিক্ষা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন।[৬৬]

প্রথম পরিকল্পনায় (১৮৪৬) তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ্যবিষয় এবং পাঠদানপ্রণালী ও সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে যে ইংরেজি পড়ানো হতো তার পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদান প্রণালীর আমূল সংস্কার করারও প্রস্তাব রাখেন।

১৮৫০ সালে শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়েট সাহেবের নিকট বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা পেশ করেন : এতে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, ইংরেজি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে ইংরেজি চর্চা ঐচ্ছিক না রেখে আবশ্যিক করার প্রস্তাব রাখেন। এ রিপোর্টের উপসংহারে বিদ্যাসাগর বলেন যে, প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়িত হলে সংস্কৃত কলেজ অবশ্যই সংস্কৃতচর্চার যথার্থ কেন্দ্র হয়ে উঠবে আর উন্নত বাংলা সাহিত্যের উৎসভূমি হবে এই কলেজ এবং এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণই পরবর্তীকালে শিক্ষকরূপে জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় (বাংলায়) জ্ঞান ও সাহিত্যরস বিতরণে সমর্থ হবে।

১৮৫২ সালে প্রণীত তৃতীয় পরিকল্পনায় তিনি বলেন, উন্নত বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করাই বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা আবশ্যক। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি ভালভাবে শিখলে তারাই সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার জ্ঞান নিয়ে উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

---

৬৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* (চতুর্থ সংখ্যা), (কলকাতা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), ২৪৩।

৬৬. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা,* (কলকাতা ১৯৮৫), ৫২-৫৪।

১৮৫৩ সালে প্রণীত বিদ্যাসাগরের চতুর্থ পরিকল্পনায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন প্রথম উল্লেখ করা হয়। আর এজন্য বাংলা স্কুল স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম শিক্ষক তৈরি করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে এ ধরনের এক শ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলা দরকার এবং সেজন্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে তিনি তাঁর সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগরের চারটি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বাঙালিকে সংস্কৃত ও ইংরেজি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমান অনুশীলনে আগ্রহী হতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যাতে তিন-চার বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে অনেক পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর ই. বি. কাউয়েল (E. B. Cowell) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজকে স্কুল ও কলেজ এই দুভাগে বিভক্ত করেন। স্কুলের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করেন।এখানে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন ধারার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতচর্চার সূচনা হয় এবং এটাই ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ই. বি. কাউয়েলের পর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং তারপর ১৮৭৭ সালের ২০ মার্চ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সংস্কৃত চর্চার যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতি সাধিত হয়। সংস্কৃত চর্চাকে আকর্ষণীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে মহেশচন্দ্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রবর্তন করেন[৬৭] এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ সংস্কারে ব্রতী হন। তদানীন্তন ডি.পি. আই. ক্রফট্কে তিনি উপাধি পরীক্ষা পাঠক্রম তৈরি করে পাঠান এবং সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি ও বেদ এই চারটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭৯ সালের ১৪ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজে প্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি যুবকদের সংস্কৃতচর্চায় আগ্রহ লক্ষ্য করে ১৮৮১ সালে মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে উপাধি শ্রেণী খোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজে উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের (১৮৭৯) এক বৎসর আগেই অর্থাৎ ১৮৭৮ সাল থেকে ঢাকা সারস্বত-সমাজ সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ করে উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল।[৬৮] এসময় বাংলাদেশে

---

৬৭. 'Oriental Studies', *Calcutta University Commission Report*, Vol. II, 1919, 90.

৬৮. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা*, ১৭৯।

আরো কতগুলো সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা সারস্বত-সমাজের অনুকরণে পরীক্ষা গ্রহণ করে উপাধি দিতে থাকে। সংস্কৃতচর্চায় এরূপ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য ১৮৮৪ সালে পুরাতন উপাধি (তর্কভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বেদান্তবাগীশ ইত্যাদি) বর্জন করে তার পরিবর্তে তীর্থ উপাধি দানের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু উপাধির ক্ষেত্রেই নয়, কেন্দ্রীয়ভাবে সংস্কৃত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে একটি সংস্থাও গঠন করা হয়। পরে ১৯০৮ সলে বোর্ড অফ স্যাংসক্রিট একজামিনেশন (Board of Sanskrit Examination) গঠিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ পরীক্ষকরূপে তালিকাভুক্ত হন।[৬৯]

অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ পরিদর্শন করে ডি,পি,আই ক্রফট্ সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠান তার ভিত্তিতে টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রদের সন্তোষজনক পারিতোষিক প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায়।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল সংস্কৃত কলেজকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিভক্ত করে স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজিসহ বাস্তব প্রয়োজনীয় অবস্থার উপযোগী বিষয়সমূহ স্কুলপাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই পদ্ধতির শিক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে। অপরদিকে টোল ও চতুষ্পাঠী ভিত্তিক শিক্ষা ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। শাসক ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয় বলে বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংস্কৃত শিক্ষার সনাতন ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে আধুনিক শিক্ষার সাথে সংস্কৃতচর্চা অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসেবে সংযুক্তি লাভ করে সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে গৌণভাবে টিকে থাকে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের অবদান

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ছাত্রদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চার জন্য বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করে গেছেন। এখানে কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের অবদান স্মর্তব্য।

১. জয় গোপাল তর্কালঙ্কার[৭০] (১৭৭২-১৮৪৫) যশোর জেলার অন্তর্গত বজরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল থেকে শুরু করে ২২ বছর পর্যন্ত এই কলেজে তিনি কাব্য ও সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত *শ্রী বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক* গ্রন্থখানিতে ১১৯টি শ্লোক এবং পয়ার ছন্দে বাংলা অনুবাদ রয়েছে। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ *শিক্ষাসার*-এ স্থান

৬৯. 'Oriental Studies', *Calcutta University Commission Report,* 92.

৭০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৯-২৪।

পেয়েছে 'গুরুদক্ষিণা', 'চানক্য শ্লোক' ও শুভঙ্করকৃত 'আর্যা'। ১৮৩৭ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত *মহাভারতের* তৃতীয় খণ্ডের অন্যতম পরিশোধকও ছিলেন এই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

২. তারানাথ তর্কবাচস্পতি[৭১] (১৮১১-১৮৮৫) কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত ২৮ বছর ধরে ব্যাকরণের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি *বৈয়াকরণভূষণসার, র্ব্যামঞ্জুরী, সিদ্ধান্তকৌমুদী, ধাতুরূপআদর্শ* প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ টীকাসহ সম্পাদনা করেন। এছাড়া *কিরাতার্জনীয়, শিশুপালবধ,* কুমারসম্ভব ইত্যাদি কাব্যসহ *মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, মালবিকাগ্নিমিত্র* সংস্কৃত নাটকগুলোর তিনি সমালোচনামূলক সম্পাদনা করে গেছেন। তাঁর নিজস্ব টীকা ও ব্যাখ্যাসমেত *হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত* এবং *কাদম্বরী* গদ্য সাহিত্য প্রকাশিত হয়।

৩. মদনমোহন তর্কালঙ্কার[৭২] (১৮১৭-১৮৫৮) নদীয়ার বিল্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের একজন অধ্যাপক ছিলেন। *বাসবদত্তা, খণ্ডনাখণ্ডখাদ্যম, কবিকল্পদ্রুম. আত্মতত্ত্ববিবেক, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, মেঘদূত* প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ সম্পাদনা করে গেছেন তিনি।

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সমাজ সংস্কারসহ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখে গেছেন। সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭৩] বেথুন সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরবর্তীকালে প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের একটি প্রাথমিক পরিচয় দেয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। এছাড়া সংস্কৃতচর্চার সৌকর্য আনয়নের জন্য তিনি অনেক নাটক, ব্যাকরণ ও দর্শনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত *ব্যাকরণকৌমুদীর* চারটি ভাগই ছাত্র সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। *রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত* প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থসহ *অভিজ্ঞানশকুন্তলম, উত্তরচরিত, হর্ষচরিত, সর্বদর্শনসংগ্রহ* ইত্যাদি নাটক ও গদ্য সাহিত্য সম্পাদনা করে তিনি সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন।

---

৭১. ঐ, ১৫৪-৫৭।

৭২. ঐ, ১৬৫-৬৭।

৭৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৬৫), ৩৪২।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃতচর্চার পরিমণ্ডলে লালিত হয়েও আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী। এরই ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে। তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলন করে সংস্কৃতচর্চার আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেন। *সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা* গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন :

> প্রথমেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই একবারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্‌কর বোধ না হওয়াতে 'শিক্ষা সমাজের' সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ছাত্রেরা প্রথম অতিসরল বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতিসহজ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেক : তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদ্‌ অনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সংকলন ও দুই, তিনখানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল।[৭৪]

বিদ্যাসাগর রচিত তিন খণ্ড *ঋজুপাঠ* সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার* ও *রামায়ণ-মহাভারত* থেকে নির্বাচিত অংশবিশেষ নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের স্থূলতা, ভাঁড়ামি, আদিরসাত্মক এবং অশ্লীল ধরনের আখ্যান পছন্দ করেন নি। তিনি তাঁর "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব"-এ *হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকদেরকে রুচিহীনতার জন্য সমালোচনা করেছেন।

৫. প্রমথনাথ তর্কভূষণ[৭৫] (১৮৬৫-১৯৪৪) ২৪-পরগনা জেলার ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তারাচরণ তর্করত্ন কাশীতে অধ্যাপকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে প্রমথনাথ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরে তিনি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। তর্কভূষণ মহোদয় যেসব সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও অনুবাদ করেছেন সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *বিজয়প্রকাশ, রাসরসোদয়, বিশুদ্ধানন্দ চরিত, কোকিলদূত* ও *পূর্বমীমাংসার্থ সংগৃহীত টীকা*।

৬. যোগধ্যান মিশ্র[৭৬] সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই কলেজে ২৩ বছর অধ্যাপনার কাজে বহাল ছিলেন. সে সময় এই কলেজে যেসব ছাত্র

---

৭৪. *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), দেব কুমার বসু (সম্পাদিত), (কলকাতা ১৯৬৬), ৩০২।

৭৫. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ", *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ১১শ খণ্ড, (কলকাতা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), ২৫-২৮।

৭৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, (প্রথমভাগ), ২৪৬-৪৭।

সাহিত্য ও অলঙ্কার নিয়ে অধ্যয়ন করতো তাদের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ভাস্কর আচার্যের *লীলাবতী ও বীজগণিত* ছিল পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

যোগধ্যান মিশ্র ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদানের আগে দু'বছর উইলসন সাহেবের অধীনে গ্রন্থানুবাদকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কলকাতা বড় বাজারে সারসুধানিধি নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি হরচন্দ্র ও উইলস্টন সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৪০ সালে *ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা* নামের গ্রন্থটি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। যোগধ্যান মিশ্র ১৮৪৯ সালে কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

৭. মধুসূদন গুপ্ত[৭৭] সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর আগে ক্ষুদিরাম বিশারদ এই শ্রেণী খোলার সময় থেকে অধ্যাপনা করছিলেন। কিন্তু রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি তিন বছর অধ্যাপনা করার পর চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮৩২ সালে বৈদ্যক শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৩৫ সালে বৈদ্যক শ্রেণী বন্ধ হয়ে যায়। তখন অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত এনাটমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা প্রথম ভাগ ১২৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালে ২৪ নভেম্বর তারিখে *সমাচার চন্দ্রিকায়* তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশিত হয়।

বাংলার নবজাগরণ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মীয় জীবনে এক নতুন মুক্তচিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে; এটাই বাংলার নবজাগরণ। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এই মুক্তচিন্তার সূচনা হয়।[৭৮] তবে এর প্রেক্ষাপটটিও উপেক্ষণীয় নয়। বাদশাহী আমলের অবক্ষয়ের শুরু থেকেই এদেশের জনজীবনে ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি ও অবাঞ্ছিত নৈতিক অধঃপতনের ফলে জাতি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনি এক দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ শাসন। এই নতুন শাসকদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নতুন পরিবেশ, নতুন ভাবধারা ও নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে এদেশবাসী সজাগ হয়ে উঠে। এই নবজাগরণের ফলে অন্ধ অনুকরণের স্থলে আসে যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ প্রভৃতি মুক্তচিন্তার প্রবণতা, অন্ধ রক্ষণশীলতার পরিবর্তে নৈতিক উদারতা গ্রহণের মানসিকতা। শুরু হয় সমাজজীবন থেকে কুসংস্কার দূর করার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ধারাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। সংস্কারমুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অপরদিকে প্রাচীন সংস্কার ও

---

৭৭. ঐ, ২৫০।

৭৮. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, (দ্বিতীয় পর্যায়), (কলকাতা ১৯৭৮), ২৫।

ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা চালান রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিগণ।

এই নবজাগরণের ভাবধারায় উজ্জীবিত মনীষিগণ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষার সময়োপযোগী রূপদানে যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তা এখানে বিবেচ্য। এই পর্যায়ে প্রগতিপন্থীদের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজির দাপটে সংস্কৃত ভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সংস্কৃতচর্চায় কোন জাগতিক উন্নতি সম্ভব নয় বলে মনে করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংস্কৃত চর্চা ছেড়ে ইংরেজির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসেবে সংস্কৃত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্প পাঠ্যরূপে পাঠ্যক্রমে রাখার ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে অনেকে এই ভাষা অনুশীলন করেন। এই পর্যায়ে যারা এই ভাষায় অধ্যাপনা ও গবেষণায় শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) বহু প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য বাংলায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর টীকা-টিপ্পনী এই ভাষা সম্পর্কে অনেককে উৎসাহিত করে। তাঁর অনূদিত প্রতিটি নাটকে সংযোজিত হয়েছে একটি ছোট ভূমিকা, আর সেখানে স্থান পেয়েছে নাট্যকারের মন্তব্য। সংস্কৃতের প্রাচীন নাট্যকার ভাসের নাটক-নাটিকাগুলোসহ কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*, *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *বিক্রমোর্বশীয়*; ভবভূতির *উত্তরচরিত*, *মালতীমাধব*, *মহাবীরচরিত*; শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী*, *নাগানন্দ*; বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*; আচার্যক্ষেমীশ্বরের *চণ্ডকৌশিক*; ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার*; কৃষ্ণমিশ্রের *প্রবোধ চন্দ্রোদয়*, রাজশেখরের *বিদ্ধশালভঞ্জিকা*, *কর্পূরমঞ্জরী* *শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা* এবং কাঞ্চনাচার্যের *ধনঞ্জয়বিজয়* শীর্ষক সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাট্য অনুবাদকর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মূল নাট্য গ্রন্থাদির আদর্শ পুঁথি সংগ্রহ ও তার পাঠ নির্ণয়। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁর অনুবাদ নাটকগুলো হয়েছে যেমন উপভোগ্য, তাঁর গ্রন্থ ভূমিকাগুলো হয়েছে তেমনি আলোকদিশারী। আরো লক্ষণীয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূলানুসারী নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ এবং শিল্পীর সহৃদয় জীবনভাবনা নাট্যকার হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মের পারিবারিক ঐতিহ্যকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪)[৭৯] চট্টগ্রামের একজন বরেণ্য সন্তান। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা চর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

৭৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা মাঘ ১৩৭০), ৫-৯।

তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'কবিগুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কবি গুণাকরের অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কালিদাসের *রঘুবংশ,* মাঘের *শিশুপালবধ*, ভারবির *কিরাতার্জুনীয়* প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এই গ্রন্থগুলোর কাব্যিক অনুবাদসহ কবির জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ করে কবিগুণাকর বাংলা কাব্যের মাধ্যমে সংস্কৃত কাব্যের রস পরিবেশনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)[৮০] দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের অনেক পুঁথি-পুস্তক আবিষ্কার ও প্রকাশ করে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথিসমূহের মধ্যে যেগুলো এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—*বৃহদ্ধর্মপুরাণ, বৃহদস্বয়ম্ভু পুরাণ, চিত্ত -বিশুদ্ধি-প্রকরণ,* আনন্দভট্টকৃত *বল্লালচরিত*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, অশ্বঘোষকৃত *সৌন্দরানন্দ* এবং আর্যদেবকৃত *চতুঃশতক*।

উল্লিখিত সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ সালে তিনি রামচরিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদরচিত পুস্তক (অনূদিত ও সম্পাদিত) *সচিত্র রামায়ণে* বাল্মীকির *রামায়ণের* সরল-সহজ অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাল্মীকির সাহিত্যকর্মের প্রতি যেমন, কালিদাসরচিত গ্রন্থাবলীর প্রতিও হরপ্রসাদ ছিলেন তেমনি অনুরাগী। তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধের পরিচয় মেলে। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-কে অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন *শকুন্তলার মা, দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য, দুর্বাসার শাপ, শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী*। কালিদাসের অপর দু'খানি নাটকও হরপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। *বিক্রমোর্বশীকে* অনুসরণ করে তিনি রচনা করলেন *উর্বশীবিদায়,* আর *মালবিকাগ্নিমিত্রের* নাটকে বিদূষকের চরিত্র তুলে ধরে তিনি *অগ্নিমিত্রের ভাঁড়* উপহার দেন। এই তিনখানি নাটককে নিয়েই রচিত হয় *কালিদাসের মেয়ে দেখানো, এক এক রাজার তিন তিন রাণী।* আবার কালিদাসের কাব্যগুলির প্রতিও হরপ্রসাদের অনুরাগ কম ছিল না। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কুমার সম্ভব-সাতনা সতের সর্গ', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'রঘুতে নারায়ণ', 'রঘু আগে কি কুমার আগে', 'অজবিলাপ', 'রতি বিলাপ', 'রঘুকাব্য বড় কিসে'?, 'রঘুবংশে বাল্যলীলা', 'রামের ছেলেবেলা', 'রঘুবংশের প্রেম', 'রঘুবংশে প্রেম ও বিরহ' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রণয়নেব মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে বাংলা ভাষাভাষী বিদ্বজ্জনের পরিচয় ঘটিয়েছেন।

---

৮০. প্রাগুক্ত, সপ্তম খণ্ড, ১-৭২।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[৮১] (১৮৭০-১৯২০) ফরিদপুর জেলার খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত, পালি এবং তৎকালীন সরকারের ব্যবস্থাধীনে তিব্বতী ভাষায় অত্যন্ত গৌরবের সাথে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি, বাংলা, তিব্বতী, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৬ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল সতীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু প্রাচীন তথ্য উদঘাটন করতে সমর্থ হন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত পুস্তকসমূহের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। তিনি *ভবভূতি এবং তাঁর নাটক* ও শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী* এই দুটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলো। ন্যায় দর্শনের উপর রচিত *আত্মতত্ত্ব প্রকাশ*, গৌতমের ন্যায়সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ এবং *History of Indian logic* নামের গ্রন্থ রচনা করে সতীশচন্দ্র ভারতীয় দর্শনচর্চার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জননন্দিত *History of Indian logic* গ্রন্থটিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ—এ তিনভাগে তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ইংরেজি, বাংলা, তিব্বতী ভাষায় রচিত তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। অনন্য প্রতিভার অধিকারী সতীশচন্দ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (১৯২০) জ্ঞানসাধনা করে গেছেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[৮২] (১৮৭৬-১৯৬১খৃ.) সাবেক ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রধান কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সালে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৩১২ বঙ্গাব্দে নিজ গ্রামে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে ১৩৩৬ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে মহাভারতের একটি টীকাসহ বাংলা অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশে প্রয়াসী হন। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তিনি বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মহাভারতের মূল ও নীলকণ্ঠের টীকা, নিজস্ব টীকা ও বাংলা অনুবাদ দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থের নাম *স্মৃতিচিন্তামণি* (প্রথম প্রকাশ নকিপুর, খুলনা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্য প্রসিদ্ধ কাব্য ও নাটকসমূহের টীকাসহ অনুবাদ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করেন। সংস্কৃতচর্চায় অমূল্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

---

৮১. Satischandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic*, (University of Calcutta 1921), XVII-XXV

৮২. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ", *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ১১শ খণ্ড, (কলকাতা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), ৩৪-৩৫।

নানা শাস্ত্রের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ[৮৩] (১৮৮৭-১৯৬০ খৃ.) ১৮৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহীর রানী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ এবং পরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনাজীবনে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী রচিত *অদ্বৈতসিদ্ধির* টীকাসহ অনুবাদ সংস্করণ (১৯৩৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাসতীর্থের *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদসহ এতে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর ভারতীয় *দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়* নামের স্বল্প পরিসরের গ্রন্থটিও পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট আদৃত হয়েছে।

উপসংহার

আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি না করে সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন-জীবিকার সহায়ক ইংরেজি শিক্ষা এবং মাতৃভাষা বাংলার ক্রমোন্নতির ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতচর্চা এ দেশে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর পর্যায়ে চলে গেছে। তবে এর উপযোগিত্য২ া একবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলদেব ঠাকুর প্রমুখ প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক সংস্কৃত উপাদান গ্রহণ করে তাঁদের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। অনুরূপভাবে যাঁরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধান করে চলেছেন, তাঁদের নিকটও সংস্কৃতচর্চা আবশ্যক হয়ে রয়েছে। তাই দেখা যায়, সংস্কৃতচর্চা আজ গণমুখিতা পরিহার করে সুধী গবেষকগণের সাহচর্য পেয়ে চলেছে।

---

৮৩. ঐ, ৩১-৩৪।

১৪

সঙ্গীত

করুণাময় গোস্বামী*

উনিশ ও বিশ শতকের সঙ্গীত-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল আঠারো শতকে। পদাবলী কীর্তনের প্রবর্তক নরোত্তম ঠাকুর (রাজশাহী) পরলোকগমন করেন ১৬৮৭ সালে। তখন মুগল সরকার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সে যুগের প্রতিনিধিত্বশীল সঙ্গীতরচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। কোম্পানি ততোদিনে এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সময়কালে সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে এবং বলা যায় যে, উনিশ শতকের সঙ্গীতের ধারা উৎসারিত হয়েছে এই সময়কালেই। এই পরিবর্তনধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) প্রতিষ্ঠা করেন শাক্তপদ সঙ্গীতের ধারা। এঁরা শক্তিদেবীর উপর রচনা করেন অসংখ্য গীতিকবিতা। আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতা একটি আধুনিক শহরের রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইতিমধ্যেই শহরকেন্দ্রিক ধনী লোকেরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। কলকাতাকেন্দ্রিক এই নতুন সঙ্গীতচর্চার পরিবেশে এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক সঙ্গীতের প্রথম পুরুষ রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১)। রামনিধির প্রভাবে সমকালীন দুটি সঙ্গীতধারা, যথা শাক্তপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী ক্রমশ সঙ্গীতের মূলধারা থেকে বিদায় নেয়। ১৮৩৯ সালে যখন রামনিধি গুপ্ত মারা যান তখন বাংলার সঙ্গীতজগৎ মধ্যযুগীয় প্রভাব কাটিয়ে আধুনিক যুগের উজ্জ্বল মানবিক পথসন্ধানে ব্রতী হয়েছে।

চর্যা নামের একটি প্রামাণ্য সর্বভারতীয় প্রবন্ধগীতির মাধ্যমে বাংলা গান তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যের সূত্রপাত। তেরো শতকের বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব রচিত *সঙ্গীতরত্নাকর* গ্রন্থে চর্যার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই গীতিপ্রবন্ধের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

সর্বভারতীয় মান্যতা ছিল। এর বাণীর আধুনিক অর্থে গীতোচিত দৈর্ঘ্য এবং একটি প্রথাসম্মত গায়নকলা বাংলা গানকে সূচনাতেই এক প্রকার সংহতি দান করেছিল। বারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*-এর পদমালা গঠিত হয়েছিল ধ্রুব শ্রেণীর প্রবন্ধসঙ্গীতের আদর্শে। এটিও ছিল প্রাচীন ও বিপুলভাবে মান্য প্রবন্ধসঙ্গীতের একটি রূপ। চর্যাগীতি ও *গীতগোবিন্দ* এ-দুয়ের মাধ্যমেই বাংলা গানের সর্বভারতীয় রাগ-সাঙ্গীতিক পটভূমি গঠিত হয়। কিন্তু পনেরো শতকের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এসে বাংলা গানের রচনা ও গায়নকলায় আঞ্চলিক সঙ্গীতরীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* বাংলার আঞ্চলিক প্রবন্ধ, রাগ ও গায়নকলার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে এই আঞ্চলিক প্রাবন্ধিকতা ও সাঙ্গীতিকতা হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে মিলেমিশে অভাবিত স্ফূর্তি লাভ করে। পদাবলীর কাব্যগুণঋদ্ধ বাণীর সঙ্গে এই প্রাণবন্ত সমন্বয়ধর্মী সঙ্গীতকলার মিশ্রণে বাংলার কাব্যসঙ্গীতের একটি অসামান্য পর্যায় গড়ে উঠে। একে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালির মহাদানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৯০ সালের পর বাংলা গানের পটভূমিতে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)-এর আবির্ভাব। রাগসঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল বলেই মনে হয়। সঙ্গীতপ্রেমী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারের উচ্চ সাঙ্গীতিক পরিবেশ থেকে তিনি এই অধিকার অর্জন করে থাকবেন। ভারতচন্দ্র নানাভাবে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। দৈব মহিমা প্রচারমূলক আখ্যানসঙ্গীত মঙ্গলকাব্যের ধারায় অবতীর্ণ হলেও তাঁর রচনায় ক্রমেই সেই দৈবিকতার আবরণ ফিকে হয়ে আসে এবং তা মানবিক সঙ্গীতে পরিণত হবার প্রয়াস পায়। আখ্যানগীতির কাঠামোয় থেকেও যেভাবে তিনি খণ্ডগীতি রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন তাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দরের* আদি রসোচ্ছ্বাস পরবর্তীকালে যাত্রা, ঢপযাত্রা, কবিগানসহ নানা ধরনের গানে অনুসৃত হয়। কীর্তনসঙ্গীতের পরিমণ্ডলের বাইরে রাগাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনায়ও তিনি পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেন। শাক্তপদ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টাও ভারতচন্দ্রের রচনাতেই দেখা যায়। এই বিবেচনায় ভারতচন্দ্র রায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত উভয়েরই পূর্বসূরি।

বৈষ্ণব .পদাবলীর প্রবল স্রোত তখন ক্ষীয়মাণ। রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) উদিত হচ্ছেন শাক্তপদের অশেষ সম্ভাবনাময় সম্ভার নিয়ে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়:

> পূর্ণিমা প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাঙলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণবকবিতার পূর্ণ চন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাধনার সৌরকরজাল প্রখর হইয়া উঠিল। বাঙলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণস্পন্দনের আধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ক্রমস্ফুরিত ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।[১]

---

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, (কলকাতা ১৩৬৯), ৩।

রামপ্রসাদ সেন প্রবর্তিত শাক্তসঙ্গীতের এই ধারা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১) থেকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক বাঙালি সঙ্গীতকার অগণিত শাক্তপদ রচনা করে এই ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর দুই দশকের মধ্যেই টপ্পার সম্ভার নিয়ে বিহারের ছাপরা থেকে কলকাতার সঙ্গীতের আসরে এসে অবতীর্ণ হন রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) যিনি নিধুবাবু নামে ইতিহাসখ্যাত হয়েছেন। বিষয় ও সঙ্গীতকলায় টপ্পা ছিল এক নতুন ধরনের গান। টপ্পা প্রচলনের মাধ্যমে নিধুবাবু বাংলা কাব্যসঙ্গীত তথা বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত ঘটালেন। শ্যাম বা শ্যামার মাহাত্ম্যবর্ণনা ছিল তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রধান বিষয়। কিন্তু নিধুবাবু মানুষের হৃদয়বেদনাকে তাঁর টপ্পার বিষয় করে তুললেন। নরনারীর প্রেমসম্পর্ককে তিনি বর্ণনা করলেন তাঁর গানে। কোন প্রকার দৈবিকতা বা আধ্যাত্মিকতা রইলো না সেখানে। নরনারীর প্রেম একান্তই মর্ত্যবাসী মানুষের প্রেমরূপে বিধৃত হলো টপ্পায়। বাংলা কাব্যগীতির প্রবাহে মানবকেন্দ্রী সঙ্গীতের সম্ভাবনাময় সূচনা ঘটলো। সেই থেকে অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক ধারার কেন্দ্রে রইলো দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনা, আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যান, জগতোত্তর তৃষ্ণার প্রকাশ ইত্যাদি ; আরেক ধারার কেন্দ্রে রইলো মানুষের প্রেম, মানবজীবন সম্পর্কিত ইহজাগতিক বিষয়াদি। এক ধারাকে যদি বলা যায় ঈশ্বরকেন্দ্রী সঙ্গীত, অপর ধারাটিকে বলা যায় মানবকেন্দ্রী সঙ্গীত। এই মানবকেন্দ্রী সঙ্গীতের মাধ্যম হলো টপ্পা। হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রতিষ্ঠাতা গোলাম নবী ওরফে শোরীর টপ্পার প্রেরণায় নিধুবাবু এই নব সঙ্গীতধারার সূচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি বাংলা গান তথা বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে আধুনিক যুগেরও সূত্রপাত ঘটাতে সমর্থ হন। মানবতা উপাদানই এই আধুনিকতার মূলকথা। যে দুটি লক্ষণকে ধারণ করে বাংলা কাব্যগীতির আধুনিক যুগ সূচিত হয়েছিল তার একটি হচ্ছে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সর্বজনীন হৃদয়াবেগের প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি হচ্ছে রোমান্টিক চেতনার উদ্ভাসন। এ দুটি লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল নিধুবাবুর ক্ষুদ্রবন্ধ টপ্পা গানে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় তিনি প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন মানবহৃদয়সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমান্টিকতার আভাসও তাঁর গানেই প্রথম মূর্ত হয়ে উঠে। সমালোচকের এ মন্তব্য যথার্থ মনে হয় যে :

> তিনি শুধু টপ্পারই প্রতিষ্ঠাতা নন, বলতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রথম প্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। যদি মন্ময়তা এবং সৌন্দর্যব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত আবেগ ও ললিত প্রকাশরীতি রোমান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণ হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিহারীলালের পূর্বে রামনিধি গুপ্তই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম লিরিকরচয়িতা, তাঁর মধ্যেই আধুনিক যুগের রোমান্টিক চেতনার একটি সার্থক বিকাশ ঘটেছিল।[২] নিধুবাবু বাংলা গীতিকবিতার ধারায়

---

২. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক*, (কলকাতা ১৯৭৩), ৭

> এমন একটি পরমাশ্চর্য বিস্ময়রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাঙলাদেশে এমন গীতিকারের সাক্ষাৎ মেলে না যাঁর উপর নিধুবাবুর প্রভাব পড়ে নি।[৩]

নিধুবাবুর অপর অবদান, তিনিই বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের কেন্দ্রীয় স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। বাংলা গানের সূচনা ঘটেছিল প্রবন্ধগীতির পটভূমিতে এবং তার একটি সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত ছিল। কিন্তু পদাবলী কীর্তনের ব্যাপক অভ্যুদয়ে সেই যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে পড়ে। আঠারো শতকের শেষদিক পর্যন্ত বাংলা গানের যে বিকাশ তাতে রাগসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতটি খুব বড় হয়ে দেখা দেয় নি। অন্তত দিল্লী, লখনৌ, বারানসী প্রভৃতি কেন্দ্রে বিকাশপ্রাপ্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কেন্দ্রীয় রূপের পরিপ্রেক্ষিতটি বড় হয়ে দেখা দেয় নি। মূল কেন্দ্র থেকে বাংলার দূরত্ব, মূল ধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতার অভাব প্রভৃতিই রাগসঙ্গীতের কেন্দ্রীয় রূপের সঙ্গে বাংলা কাব্যগীতির সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই বাংলায় রাগসঙ্গীতচর্চা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে এবং ক্রমে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই সূচনাপর্বের সর্বাগ্রগণ্য রূপকার ছিলেন নিধুবাবু। তিনিই গোলাম নবীর টপ্পাধারার সঙ্গে বাংলা টপ্পার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করেন। কালী মির্জা নামে খ্যাত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ও (১৭৫০-১৮২০) টপ্পার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ স্থাপনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) খেয়ালের আদর্শে বাংলা গান রচনা শুরু করেন। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) বাংলায় ধ্রুপদ রচনার সূত্রপাত ঘটান এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ ঘরানার পত্তন হয়। এইভাবে আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অন্তত তিন উল্লেখযোগ্য ধারার সঙ্গে অর্থাৎ টপ্পা, খেয়াল ও ধ্রুপদের সঙ্গে বাংলা গানের সংযোগ স্থাপিত হয়।

প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। খাঁটি টপ্পা গান রচনায় যেমন বিপুল উৎসাহ দেখা দেয়, তেমনি আখড়াই থেকে কথকতা, পাঁচালী থেকে ঢপ কীর্তন পর্যন্ত বাংলা গানের নানা শাখায় টপ্পার সঙ্গীতশৈলী বিস্তার লাভ করে। পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), কথকতায় সিদ্ধ শ্রীধর কথক (জন্ম ১৮১৬), যাত্রাপালা রচয়িতা ও অভিনেতা গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০-১৮৭২), অন্যতম আদি বাঙালি যন্ত্রী আশুতোষ দেব (১৮০৩-১৮৫৬), সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩), উনিশ শতকের প্রথমদিকে আদি বাঙালি সঙ্গীতশাস্ত্রালোচক রাধামোহন সেন, এঁর সমসাময়িক জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক, নাট্যকার-সঙ্গীতকার-দেশব্রতী মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রমুখ টপ্পা রচনায় ও গায়নে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) টপ্পানুরাগী ছিলেন। তিনি টপ্পা ও টপখেয়াল আঙ্গিকে গান রচনা

---

৩. অরুণকুমার বসু, *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত*, (কলকাতা ১৯৭৮), ১৫।

করেন। সুলেখক ও সুগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৫-১৯৩৫) টপখেয়ালে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরও টপ্পার গভীর প্রভাব ছিল। টপ্পার সঙ্গীতপ্রবাহটি তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধরে টপ্পা ও টপ্পাপদ্ধতির গায়নকলা ছিল বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অতি বিশিষ্ট উপাদান। উনিশ শতকের নানা শাখায় শাখায়িত প্রেমসঙ্গীত টপ্পার ধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।

উনিশ শতকে সঙ্গীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির যে মুখ্য অর্জন সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে আঠারো শতকে বাংলায় বিকাশপ্রাপ্ত একটি সঙ্গীতবিষয় সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সে হচ্ছে কবিগান। লোকসাঙ্গীতিক পর্যায়ের ব্যাপার হলেও কবিগানের ভিতর দিয়ে বাঙালির এক ধরনের প্রথাবদ্ধ সঙ্গীতচিন্তার প্রকাশ ঘটে। সঙ্গীতসমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্রের ধারণা, কাওয়ালী গানের ধারা থেকে কবিগানের উৎপত্তি।[৪] তবে তাঁর এ ধারণাটি দুর্বোধ্য মনে হয়। বরং মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার পরবর্তী বৈষ্ণবীয় পালাগানে কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই ও সখীদের মধ্যে যে কথোপকথন ও প্রতর্ক, তার সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ কথকদের ছড়াকাটা প্রভৃতি যুক্ত হয়ে এই প্রশ্নোত্তরমূলক, দুই দলকেন্দ্রিক ও জয়-পরাজয়ভিত্তিক সঙ্গীতোপস্থাপনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, এটা পশ্চিম ভারত থেকে আমদানি করা ব্যাপার নয়। তবে একই সঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্র যে বলেছেন, কবিগানের পর্যায় সংগঠনের ভিতর দিয়ে বাঙালির মৌলিক সঙ্গীতসংগঠনচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে,তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ধ্রুপদ সঙ্গীতের চতুর্স্তবক অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগভিত্তিক গঠনকলা এবং খেয়াল বা খেয়ালেতর সঙ্গীতের দ্বিস্তবক অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরাভিত্তিক গঠনকলার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কবিগানের পর্যায়বিভাজন বাংলার একটি নিজস্ব ব্যাপার। চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ ও অন্তরা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে কবির গান আসরে উপস্থাপিত হয়। এগুলো সঙ্গীতোপস্থাপনায় বাঙালি লোককবির এক ধরনের কুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। দাঁড়া বা এইসব পর্যায়যুক্ত সুশৃঙ্খল কবিগানের প্রবর্তক হিসেবে রঘুনাথ দাস (আ. ১৭২৫-১৭৯০)-এর নাম পাওয়া যায়। গোজলা গুঁই (আ. জন্ম ১৭০৪) আদি কবিয়াল হিসেবে পরিচিত। গোজলা গুঁই-এর শিষ্য লালু, নন্দলাল, রামজী ও রঘুনাথ দাস কবিগানের প্রারম্ভিক ভিত্তিটি রচনা করেন। আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই ঘটে কবিগানের অসাধারণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি। রাসু (১৭৩৫-১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০৭), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮), এন্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) প্রমুখ কবিয়ালের দ্বারা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবি-গীতশৈলীর

---

৪. Rajyeshwar Mitra, 'Music' in N. K. Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757-1905)*, (University of Calcutta 1967), 543.

প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি শ্রোতাসাধারণের মধ্যে অব্যাহত থাকে। চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানি দেওয়ান একালের কবিগীতসংগঠনে বিশেষ অবদান রাখেন।

উনিশ শতক বাংলা শীলিত সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কালপর্যায়। এই সময়ে বাংলা শীলিত সঙ্গীতের বিষয়গত বিকাশ যেমন বহুমুখী হয়ে উঠে, তেমনি এর রূপবন্ধগত বিকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি হয়। রূপবন্ধগত বিকাশের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রমিত রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের ব্যাপারটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর সূচনাতেই নিধুবাবু বাংলায় টপ্পাসঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) খেয়াল অঙ্গে গীত রচনা করেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) তৈরি ধ্রুপদ গানের দৃষ্টান্তে সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরে বাংলায় ধ্রুপদ রচনার একটি পরম্পরা তৈরি হয়। খুব দ্রুত ধ্রুপদ গানের এই আবহটি কলকাতায় বিস্তারলাভ করে। হিন্দুস্থানী রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলায় গান রচনার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে আধুনিক ও প্রামাণ্য রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের পথ উন্মোচিত হয়। পূর্ববর্তী যুগসমূহে আঞ্চলিক প্রবন্ধগীতির যে প্রভাব বাংলা গানে লক্ষ্য করা যায়, তাকে কাটিয়ে উঠে তখন থেকে একটি আধুনিক রাগসাঙ্গীতিক শৃঙ্খলার সঙ্গে বাংলা গানের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শুধু বাণী রচনায় নয়, গায়নকলায়ও গানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এর ফলে বাংলা গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রামাণ্য কেন্দ্রীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাংলা গানের সমৃদ্ধ বাণী অবলম্বনে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সার্বিক বিকাশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবন্ধের সঙ্গে এই যোগাযোগ সুদূরপ্রসারী অবদান রাখে। পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাধিত ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই ছিল সূত্রপাত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রূপে, রসে ও ভাবে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে তোলার এক ঐতিহাসিক সুযোগ উপস্থিত হয় তখন থেকে। প্রেমসঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও স্বদেশসঙ্গীত এই তিন ধারায় উনিশ শতকের বাংলা শীলিত সঙ্গীতের প্রধান বিকাশ ঘটে।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যগীতিতে মানবিক প্রেমানুভূতির রূপায়ণ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখযোগ্য প্রধানত এ কারণে যে, সবধরনের দৈবী রূপক ভেদ করে মানুষের প্রেমানুভূতিকে বিশুদ্ধ ব্যক্তিমানুষের প্রেম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ ঘটছিল বাংলা গানে, উনিশ শতকের গোড়াতেই তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে। ভারতচন্দ্রের গানে এর সূচনা ঘটতে পারতো। কিন্তু সেখানে প্রেমের হৃদয়ঘটিত সৌকর্য বিলাসকেলিকলার চাতুর্যকে ভেদ করে এগোতে পারে নি। আঠারো শতকের কবিগীতরচয়িতারা এ কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে ব্রজলীলার দূরত্ব থেকে নগরের লৌকিক সীমান্তে এনে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছিলেন। কবিয়ালদের গানে বিধৃত বিরহ রাধা-কৃষ্ণের মাথুর বিরহের চেয়ে লৌকিক নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যর্থতারই অধিকতর সমীপবর্তী। নিধুবাবু প্রেমসঙ্গীতকে সেই সীমান্তটুকুও পার করিয়ে একান্তভাবে মানুষের হৃদয়সঙ্গীত করে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে "কবিসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই প্রেমের প্রসঙ্গ বাংলা গানে প্রথম প্রবেশ করেছিল এবং নিধুবাবুই সর্বপ্রথম কবিসঙ্গীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে কেবল ব্যক্তিপ্রণয়ের রীতিতে প্রেমগীত রচনা করেছিলেন।"[৫] এই নব ব্যবহৃত গীতবিষয়ের জন্য নতুন সঙ্গীতবন্ধেরও প্রবর্তন করেছিলেন নিধুবাবু। এই প্রেমসঙ্গীতের বিরহ-বিষাদের ছোঁয়ালাগানো নায়ক-নায়িকা সম্পর্ককে সাঙ্গীতিকভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি টপ্পার মাধ্যম নিয়ে আবির্ভূত হলেন। হিন্দুস্থানী টপ্পার দ্রুত তান ও প্রচুর উল্লম্ফনযুক্ত সুরকর্তন পরিহার করে ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে দানাদার, দোলায়িত তানযুক্ত, বিষাদে কাতর যে সুররূপটি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রধানত তাকে অবলম্বন করেই সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাংলা প্রেমসঙ্গীত পল্লবিত হয়ে উঠে। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই গান বিষয়বিন্যাসের অজস্রতাসহ টপ্পার সঙ্গীতকলাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছে।

পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা বাংলা প্রেমের গানের বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বাধীন নির্বাচন, অনুরাগের অধিকার ঘোষণা প্রভৃতি এ গানে প্রতিফলিত হয়। তথাপি বিচ্ছেদই সেই নবাঙ্কুরিত প্রেমের গানের বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়, নায়ক-নায়িকার হাহাকারই সেই গানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। প্রেমসঙ্গীতের এই ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) আবির্ভাব এর অন্তর্গত রোমান্টিকতাকে আরো গভীর করে তুলতে সাহায্য করে। তিনিই প্রকৃতিকে ব্যক্তিচিত্তের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী করে তোলেন গানে, মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের বর্ণিল পটভূমি হয়ে উঠে নিসর্গ। চিরন্তনী নারী সম্পর্কেও অপার রহস্যবোধ বিহারীলালের গানে ও কবিতায় অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। বিহারীলাল সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত সুরের এমন মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[৬] নিধুবাবু-বিহারীলালের প্রেমসঙ্গীতের যে ধারা, পরবর্তীকালে সেটিই সঙ্গীতে ও বাণীতে অজস্রধার উচ্ছ্বাস লাভ করে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে প্রবর্তিত বাংলা কাব্যগীতির এক বিশিষ্ট ধারার নাম ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক সঙ্গীত—এই অর্থে ব্রহ্মসঙ্গীত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মোক্ত ব্রহ্মোপাসনাকে কেন্দ্র করে এই গীতধারার সূত্রপাত ঘটে। ব্রাহ্মধর্মোক্ত ঈশ্বর এক, অবিচ্ছেদ্য ও নিরাকার। ব্রহ্মসঙ্গীত নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনাগীতি। ব্রাহ্মধর্মের

---

৫. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত,* ১০৬।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড,* (বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৪৮), ৪৩২।

মতো ব্রহ্মসঙ্গীতেরও প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ব্রহ্মসঙ্গীত নামটিও তাঁরই দেয়া। সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা ও চিত্তশুদ্ধির কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর প্রবল আস্থা ছিল। সঙ্গীতকে তিনি ব্রহ্মোপাসনার বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বছরই রামমোহনরচিত গীতিসংগ্রহগ্রন্থ *ব্রহ্মসঙ্গীত* প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রবর্তন বাংলা গানের ইতিহাসে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এর ফলে একদিকে বাংলা ভক্তিগীতি কালক্রমে সৃষ্ট নানাবিধ পৌত্তলিক স্থূলতামুক্ত হয়ে ভক্তি প্রকাশের এক উচ্চাঙ্গ বিশুদ্ধলোকে উন্নীত হতে সমর্থ হয়, অপরদিকে এই গানে রাগসঙ্গীতবন্ধের ব্যবহারের ফলে বাংলা কাব্যগীতিতে রাগসাঙ্গীতিক পরিশীলন অর্জনে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

রামমোহনের আগ্রহে বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) সমাজমন্দিরে সঙ্গীতাচার্যরূপে নিযুক্ত হন। বিষ্ণু চক্রবর্তী আদি বাঙালি ধ্রুপদগুণীদের অন্যতম। তাঁর অবস্থানে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁর ধ্রুপদোপম সুরযোজনার ফলে প্রথম থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে একটি ধ্রুপদীয় সঙ্গীতাবহ গড়ে উঠে। সূচনায় রামমোহন ছাড়াও বেশ কয়েকজন গীতরচয়িতা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বিষ্ণুর মতো সুরকার ও সঙ্গীতাচার্য এবং রামমোহন রায়ের বন্ধুস্থানীয় গীতরচয়িতাদের সাহচর্যে সূচনাকালেই ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি দৃঢ় সাঙ্গীতিক ও কাব্যিক ভিত্তি গড়ে উঠে। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পাঁচ বছর পরেই ইংল্যান্ডে রামমোহনের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর পর যাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের সবাই ছিলেন সঙ্গীত-সংস্কৃতিবান পুরুষ। তাই রামমোহনপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসঙ্গীতাদর্শ কারো দ্বারা অবহেলিত হয় নি। কালক্রমে সমাজে ভাঙন দেখা দিয়েছে, মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ কেউ নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবে সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্মসঙ্গীতাদর্শ বজায় থেকেছে। বরং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাঙ্গীতিক প্রয়াস দেখা দিয়েছে। ফলে ব্রহ্মসঙ্গীত বহুমুখী ও বিপুল হয়ে উঠেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর উপর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদপ্রেমী ছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীকেই তিনি সমাজে সঙ্গীতাচার্যরূপে বহাল রাখেন। সেজন্য তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদসঙ্গীত বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর মতানুসারীদের সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন (১৮৬৬)। এই সমাজের উপাসনাসঙ্গীতে কীর্তনসঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪০-১৯১৬) প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলে (১৮৭৮) সেখানেও কীর্তনাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হতে থাকে। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আদি

ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই ধারায়ই ব্রহ্মসঙ্গীতের সর্বোচ্চ রূপটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতেই বাণী ও সুরে ব্রহ্মসঙ্গীতের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে।

ঐতিহাসিকভাবে একটি বিষয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসঙ্গীতরচয়িতাগণ নানাভাবে বাংলা শীলিত সঙ্গীতপ্রয়াসকে সংস্কারমুক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে একদিকে যেমন ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা হয়, অপরদিকে কীর্তন, বাউল সহ নানা ধরনের লোকসঙ্গীত, ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরভঙ্গি এই উপাসনাসঙ্গীতের ধারায় এসে মিলিত হয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "এইভাবে শতাব্দীকালের মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত যথার্থই এক সর্বসঙ্গীতের মিলনমহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং বাঙলা কাব্যসঙ্গীতের পরিণতি ও ভবিষ্যৎকে অনাগতকালের অসীম সম্ভাবনায় মুক্তি দিয়েছে।"[৭]

উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের পাশাপাশি পৌত্তলিক হিন্দুধর্মসাধনায়ও নবজাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণের শাক্তধর্ম শাখায় নেতৃত্ব দেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। বৈষ্ণব শাখায় নেতৃত্ব দেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শিশির ঘোষ প্রমুখের প্রভাব প্রচলিত হিন্দু ধর্মভাবনায় যথেষ্ট বেগ সঞ্চার করে। ফলে শুরু থেকে নগরবাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মধর্মান্দোলন আরো সীমিত হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৌত্তলিক ভক্তিসঙ্গীতেও নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। শ্যামাসঙ্গীত ও শ্যামসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন সৃজনোদ্যম দেখা যায়। আবহমান হিন্দুধর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর রচনায়।

মানুষের যে কয়টি হৃদয়বৃত্তি তার সৃজনশীল চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে দেশপ্রেম এর অন্যতম। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে দেশপ্রেমের গভীর অনুভব রূপায়িত হতে শুরু হয় এবং ক্রমে কয়েকটি কালপর্যায়ে এই সঙ্গীতধারা বিপুলভাবে পল্লবিত হয়ে উঠে। স্বদেশসঙ্গীত, স্বদেশী গান, মুক্তির গান, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতি নানা নামে এই দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতধারা আখ্যায়িত হয়েছে। এই সঙ্গীতপ্রবাহের মূল প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। ইংরেজবশ্যতা ও ইংরেজশাসনের সংস্পর্শে এসে এই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎপত্তি ঘটে। ক্রমে দেশোন্নতি ও সামগ্রিক সামাজিক মুক্তির নানা আকাঙ্ক্ষা এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশাত্মবোধক সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানা চিন্তাশীল রচনা বাঙালির অন্তরে এই প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আগেকার বাংলা গানে দেশের নিসর্গশোভা বা সমাজজীবনের বর্ণনা থাকলেও স্বদেশসঙ্গীত

---

৭. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত*, ১৮১।

বলতে দেশপ্রেমনির্ভর যে শ্রেণীর গানের কথা বুঝি, তার যথার্থ বিকাশ এর আগে ঘটে নি। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই বাঙালির মনে স্বদেশপ্রেমের জন্ম হয়।"[৮] দেশবন্দনা, পূর্বগৌরবগাঁথা, জন্মধন্যতা প্রভৃতি চিরন্তন বোধ সেই পরাধীনতার বোধ থেকেই বিপুল বেগে উৎসারিত হয়ে উঠে।

এই গানের পটভূমি তৈরি হয়েছিল সাহিত্যের ব্যাপক আয়োজনে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-এর কবিতায় স্বাদেশিকতার প্রথম স্পন্দন ধ্বনিত হতে থাকে। ক্রমে বহু কবি ও গীতিকার স্বদেশী প্রেরণায় গান রচনা করে বাংলা কাব্যগীতিতে এই নতুন ধারা যুক্ত করেন। "সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্র অনুরাগ ঘোষণা, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও দেবেন্দ্রনাথের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* মাধ্যমে দেশভক্তির উদ্দীপক রচনা প্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন, *নীলদর্পণের* অনুবাদ প্রকাশ ও অভিনয় প্রভৃতি বিচিত্র বিবিধ ঘটনায় আমাদের স্বদেশচেতনার ইতিহাস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে হিন্দুমেলাই সেই বৃহত্তম ঘটনা, বাঙলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ইতিহাসে যার প্রভাব সর্বাগ্রগণ্য।"[৯] এই মেলা সম্পর্কে *জীবনস্মৃতিতে* রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন :

> আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। সেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।[১০]

এই স্বাদেশিকতা প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হলো গান। "তৎকালীন জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের অন্যতম মাধ্যম এবং জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হলো এযুগে রচিত স্বদেশী গানগুলিতে।"[১১]

এইভাবে সাহিত্যে দেশবোধের স্ফুরণের পটভূমিতে একটি মেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সম্ভাবনাময় সূচনা ঘটলো। ইতিহাসের দিক থেকে এই গীতধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : ১. প্রাক-বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ে বা হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়ে রচিত গান, ২. বঙ্গভঙ্গ পর্যায় এবং ৩. বঙ্গভঙ্গপরবর্তী পর্যায়।

---

৮. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান,* (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী ১৯৮৩) ৯।

৯. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত,* ১৯৪-১৯৫।

১০. *রবীন্দ্র রচনাবলী,* সপ্তদশ খণ্ড (কলকাতা ১৩৫০), ৩৪৮।

১১. *বাংলা স্বদেশী গান,* ৭।

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে (১৮৬৭) কোন গান গাওয়া হয়েছিল কিনা তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গাওয়া হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচিত বিখ্যাত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি। মেলায় প্রায় প্রতি অধিবেশনেই উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গানটি গাওয়া হতো। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান ও জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ের রচনা। "এই গান প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।"[১২] মেলা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) রচনা করেন একটি বিষাদ জাগানো দেশাত্মবোধক গান—'মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি'। ভারতবর্ষ এক মলিন, দুঃখভারাক্রান্ত, অশ্রুমতী নারীমূর্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে নটবেহাগ রাগে রচিত এ গানে। দেশমাতার ক্রন্দসী প্রতিমা ইতিপূর্বে কোন গীতবন্ধে এমনভাবে মূর্ত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে সূচিত হয় উদ্দীপনার ধারা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে সূচিত হয় বিষাদের ধারা। হিন্দুমেলা যুগে এবং পরবর্তীকালে উদ্দীপনার ধারা প্রাধান্য লাভ করলেও মাতৃভূমির দুরবস্থা অবলম্বনেও প্রচুর বিষাদাত্মক গান রচিত হয় বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ধারায়। মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসু রচিত স্বদেশী গান একাধিক অধিবেশনে গীত হয়। তাঁর গানে ইংরেজের অধীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র মর্মযাতনা প্রকাশ পেয়েছে। মেলার অন্যতম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) একটি গানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন : 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)-এর 'ভারতসঙ্গীত', গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)-এর 'কতকাল পরে বল ভারতরে', বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯০১)-এর 'এই কি সেই ভারত' প্রভৃতি গান হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে সাদরে গীত হয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' গানটি ছিল সেকালের দেশাত্মবোধের মন্ত্রতুল্য। হিন্দুমেলার শেষের দিককার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। এসব গানে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিষাদের ভাবই প্রবল। *বঙ্গদর্শন*-এর ১২৮৭ চৈত্র সংখ্যায় 'বন্দে মাতরম' গানটি প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। এই সংগঠনের দেশব্রতে বুদ্ধিজীবীদের সহমর্মিতা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশিত হতে থাকে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গাওয়া হয়। কংগ্রেসের দ্বাদশ কলকাতা অধিবেশনে স্বরচিত সুরে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটি পরিবেশন করেন। তখন থেকেই দেশাত্মবোধক গান হিসেবে এর জনপ্রিয়তা লাভের সূত্রপাত। সরলা দেবী চৌধুরানীর (১৮৭২-১৯৪৫) 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী' গানটি ১৯০১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয়। এইভাবে বাংলা দেশাত্মবোধক গান এসে বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

১২. সুভাষ চৌধুরী, 'মুক্তির গান', *দেশ বিনোদন*, (কলকাতা ১৩৯১), ১৭৮।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যায়ে (১৯০৫-১৯১১) বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বলা হয় যে, "হিন্দুমেলা যুগে স্বদেশী গানের উদ্ভব, কিন্তু এর সার্থক বিকাশ ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ যুগে।"[১৩] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছে বাংলা গানের ইতিহাসে এর অন্য কোন নজির নেই। বিখ্যাত থেকে অখ্যাত গীতিকাররা, এমনকি যাঁরা এর আগে গান লিখেন নি তাঁরা পর্যন্ত স্বাদেশিক আবেগে গীত রচনা করলেন। কলকাতা থেকে দূরবর্তী পল্লীশহরগুলোয় পর্যন্ত শত শত স্বদেশী গীতসঙ্কলন প্রকাশিত হলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুখ্য সঙ্গীতকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ সমকালীন সঙ্গীতরচয়িতা বঙ্গভঙ্গের প্রেরণায় গান রচনা করেন।

বঙ্গভঙ্গপর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য গান রচনা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গান রচনা করেছিলেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি এসময়ই রচিত হয়। এসব গীত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতায় গানগুলো আচ্ছন্ন হয় নি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এইসব গানে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এযুগে রচিত অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছিলেন। বাউল সুরই বেশি। এর ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের সাঙ্গীতিক দিকটিও অনুভব করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত গানগুলো এযুগে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি এদের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যও ছিল অন্য ধরনের। তাঁর 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্যপুষ্পভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' প্রভৃতি কালজয়ী স্বদেশসঙ্গীত সে সময়কার আন্দোলনে গভীর প্রেরণা জোগায়। এসব গানে প্রযুক্ত পাশ্চাত্য সুরঢঙ এবং সুরের ক্রমোত্থান ও ক্রমপতনের ভঙ্গিটি কেবল বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় নতুন বলে নয়, অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত বলেও অভিনন্দিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এ ধরনের রচনার সাহায্যে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের নতুন সাঙ্গীতিক পরিকল্পনার দিগন্ত উন্মোচিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতিও রচনা করেছিলেন।

রজনীকান্ত সেনের গানও বঙ্গভঙ্গ যুগে যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান গান হয়ে দাঁড়ায়। স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের যে উদ্দীপনা, তা রজনীকান্তের এই গানটিতে বিশিষ্ট রূপ লাভ করে।

---

১৩. *বাংলা স্বদেশী গান*, ৭।

অতুলপ্রসাদ সেন দেশাত্মবোধক গান বেশি রচনা করেন নি। তাঁর মোট তেরোটি স্বদেশী গানের প্রায় প্রতিটিই জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের এক উত্তাল কেন্দ্র ছিল বরিশাল শহর। সেখানকার সংগ্রামের সঙ্গীতাত্মা ছিলেন মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। মুকুন্দের প্রেরণাদাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) রচিত বেশ কয়েকটি স্বদেশী গানও বঙ্গভঙ্গ যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচয়িতারূপে মুকুন্দ শীঘ্রই বরিশালের সীমা অতিক্রম করেন এবং সারা বাংলার পটভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বাঙালি সঙ্গীতকার তাঁর মতো এমন বজ্রনাদী, এমন নির্ভয়, এমন অগ্নিগর্ভ গান রচনা করেন নি। মুকুন্দ দাস চারণকবিরূপে খ্যাত হয়েছিলেন। স্বদেশী যাত্রা ও জনজাগরণের গান নিয়ে তিনি দেশব্যাপী অক্লান্তভাবে পরিক্রমণ করেছেন। পরাধীনতা ও সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে জনজাগরণে মুকুন্দ দাসের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা স্বদেশী গানের অধিকাংশ প্রবণতাই মুকুন্দ দাসের সঙ্গীত রচনায় রূপায়িত হয়েছিল। দেশকে মাতৃদেবতারূপে গণ্য করে গীতরচনার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল মুকুন্দ দাস তার বিশিষ্ট ধারক ছিলেন। দেশমাতৃকা আর শক্তিমাতৃকাকে একাকার করে তিনি গান রচনা করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে গান রচনা করেছিলেন। নারী নির্যাতন, মজুদদারি, ভূমিহীন চাষীদের শোষণ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রেরণাদায়ক গান রচনা করেন মুকুন্দ দাস। স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও কল্যাণকামী সমাজজীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর অন্তরে। তারই পবিত্র শিখাটি তিনি জ্বালিয়েছিলেন গানে। আর সে শিখাটি তিনি সর্বশক্তি দিয়ে বহন করে বেড়িয়েছেন আমৃত্যু, দেশবাসীর অন্তরে সঞ্চিত অন্ধকার দূর করার জন্য।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনী রায়, সরলা দেবী চৌধুরানী প্রমুখ বহু গীতরচয়িতা ও সঙ্গীতকার এই যুগে প্রচুর প্রেরণাদায়ক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পর্যন্ত বাঙালির স্বদেশচেতনা প্রধানত গানেই মূর্ত হয়েছে। সেসব গানের একটি বিশিষ্ট অংশের বাণী সংরক্ষিত হলেও সুর সংরক্ষিত হয়েছে অতি সামান্য। অনেক গানের শিরোদেশে রাগতালনাম নির্দেশিত থাকলেও ঠিক কি সুরে সেসব গান গাওয়া হতো তা বোঝা যায় না। এই পর্বে গীত রচনায় উন্মাদনা এতই প্রবল ছিল যে, স্বদেশী গান রচনা করেন নি এমন বাঙালি কবি বা মনীষী খুঁজে পাওয়া ভার।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য সঙ্গীতকারদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন। অতুলপ্রসাদ স্বদেশী গান রচনার ধারা ত্যাগ করে ভিন্নতর সঙ্গীতস্রোতে নিমজ্জিত হন। সে যুগের মুখ্য সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথও প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। দেশাত্মবোধক গান রচনায় তাঁর আর তখন উৎসাহ নেই। শুধুই রইলেন মুকুন্দ দাস তাঁর গান আর যাত্রা নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যখন সূচনা তখন থেকেই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। "এতো অনস্বীকার্য যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বৈপ্লবিক তথা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছিল।"[১৪] এই পটভূমিতে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষদিক থেকে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা যখন স্তিমিত হয়ে আসছিল, তখন বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু তাঁদের অসম সাহসী আত্মদানের মাধ্যমে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে এক রক্তাপ্লুত অধ্যায়ের সূচনা করেন এবং এর পরেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তখনই বাংলা স্বদেশসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচয়িতাদের মৃত্যুতে বা সে ধারা থেকে সরে দাঁড়ানোয় সেক্ষেত্রে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণের উজ্জ্বল অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হলেন নজরুল। সেই অগ্নিযুগের জন্য যে অগ্নিক্ষরা সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল নজরুলের আবির্ভাবে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪), দিলীপকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৮০), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (মৃ. ১৯৭৪) প্রমুখও বঙ্গভঙ্গপরবর্তী এবং নজরুলের সমসাময়িক যুগকে দেশাত্মবোধক গান রচনায় সমৃদ্ধ করেন।

বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির পঞ্চপ্রধানের প্রসঙ্গে যাবার আগে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত সাঙ্গীতিক ঘটনাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত প্রয়োজন। কেননা, বাংলায় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এবং বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারগুলো এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাঙালির রাগসঙ্গীতচর্চার সঙ্গেই এর সর্বোচ্চ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

আঠারো শতকের প্রথমদিক থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। তখন মুগল দরবার, রাজপুরুষ ও দরবারঘনিষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রিত সঙ্গীতজ্ঞরা ভাগ্যান্বেষণে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। ক্রমে তাঁদের অনেকেই বাংলায় আসেন এবং কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, চুঁচুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি সঙ্গীতকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮৩) সঙ্গীতসভায় কলাবতদের সমাবেশের যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত বিশিষ্ট গায়ক, বাদক ও নর্তকীরা তাঁর সভায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে সেখানকার উচ্চ সাঙ্গীতিক পরিবেশের কথা জানা যায়। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যতম আদি বাঙালি ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) রামমোহনের আমন্ত্রণে ব্রহ্মমন্দিরে যোগ দেন। তবে ইংরেজদের শাসনাধীন ভারতবর্ষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে কলকাতার আত্মপ্রকাশের পর এই স্থানটি বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত-সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

---

১৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*, (কলকাতা ১৩৭৭), ৪১।

সেখানকার উঠতি ধনাঢ্য পরিবারগুলো রাগসঙ্গীতের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। দিল্লী অঞ্চল থেকে আগত অনেক কলাবত এঁদের গৃহে অধিষ্ঠিত হন। তবে হিন্দুস্থানী কলাবতদের বাংলায় আগমনের স্রোতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিপুল বেগ সঞ্চার করে। সে হচ্ছে লখনৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের কলকাতার মেটেবুরুজে আগমন। অযোগ্যতার অজুহাতে ইংরেজ সরকার ১৮৫৬ সালে ওয়াজিদ আলিকে নির্বাসিত করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে যোগসাজশ আছে এই অভিযোগে নবাবকে কিছু দিন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। ১৮৫৮ সালে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাব স্থায়ীভাবে মেটেবুরুজে বসবাস শুরু করেন। ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন সঙ্গীতকলার উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও ছিলেন কবি, গায়ক, বাদক ও নৃত্যবিদ। লখনৌ কথকনৃত্যঘরানার প্রবর্তক ও ঠুংরি প্রচলনকারী হিসেবে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর গুণপনায় ও উদার পৃষ্ঠপোষকতায় আকৃষ্ট হয়ে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যকলার দিকপাল-রূপকাররা লখনৌ দরবারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের সঙ্গীতসভার পর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের সঙ্গীতসভাই উত্তর ভারতের সমৃদ্ধতম সঙ্গীতসভা। ওয়াজিদ আলি যখন কলকাতায় এলেন, তখন গোটা সঙ্গীতসভাই সঙ্গে নিয়ে এলেন। লখনৌর ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতসভা মেটেবুরুজে তথা কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। লখনৌ ঠুংরি ও কথকনৃত্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো কলকাতা। এলেন নৃত্যপটিয়সী বাঈজীর দল। কণ্ঠসঙ্গীতের অন্যান্য শাখা ও যন্ত্রসঙ্গীতের দিকপাল-গুণীরা এলেন। ওয়াজিদ আলির সঙ্গীতসভার প্রেরণায় শহর কলকাতাতেও হিন্দুস্থানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতার জোয়ার বয়ে গেল। সেজন্য ওয়াজিদ আলির মেটেবুরুজের সভাবহির্ভূত বহু গুণী কলকাতার নানা গৃহে অধিষ্ঠিত হতে থাকলেন। তাই সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে প্রথমে দিল্লী ও পরে লখনৌ ম্রিয়মান হয়ে পড়লে কলকাতা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মুখ্য কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সারা বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেখান থেকেই যোগাযোগ স্থাপন করে সঙ্গীতগুণীরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন জমিদারের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকেন। কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত ময়মনসিংহের গৌরীপুর, কালীপুর, রামগোপালপুর, ভবানীপুর, মুক্তাগাছা, শেরপুর থেকে রাজশাহীর নাটোর, তালন্দ জমিদারগৃহ পর্যন্ত দিকপাল গুণীদের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠে। এত দিন পর্যন্ত বাংলা ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র থেকে দূরে। আঠারো শতক পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক রাগসঙ্গীতের যেসব তরঙ্গই বাংলা গানে এসে পৌঁছেছে, সেসব শীঘ্রই বাংলায় নিজস্ব সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যে আত্মীকৃত হয়ে গেছে। শোরীর আদর্শে নিধুবাবু ও কালী মির্জার বাংলা টপ্পা প্রবর্তনার মধ্য দিয়েই আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কেন্দ্রীয় ধারার সঙ্গে বাংলা গানের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে নিধুবাবুর টপ্পা, রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ, রঘুনাথ রায়ের খেয়াল প্রবর্তন এবং প্রবীণতর কয়েকটি সঙ্গীতসভার মাধ্যমে বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে ধারাটি এসে পৌঁছে, তা মেটেবুরুজের দরবারে বিপুলসংখ্যক হিন্দুস্থানী কলাবতের অধিষ্ঠান ও বাংলার নানা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক গুণীর আগমনের ফলে এক বিরাট জলোচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। বাংলার সঙ্গীতচর্চার বিশাল ক্ষেত্র এর প্রভাবে

আরো রাগসঙ্গীতানুগ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা হিন্দুস্থানের নানা কেন্দ্রে পল্লবিত ঘরানাসমূহের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের হিন্দুস্থানী গুণীরা বাংলার নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে শিষ্য তৈরিতে নিয়োজিত হলে এখানেই বিভিন্ন ঘরানার বিকাশ ঘটতে থাকে। পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি আনন্দবাদ্যে এবং সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি তারবাদ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষদিক থেকেই বাঙালি গুণীরা তালিম নিতে শুরু করেন এবং তখন থেকেই যন্ত্রবাদনে বাঙালিদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বাঙালির আগ্রহ ও উদ্যমের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে কণ্ঠসঙ্গীতে। এর মধ্যে ধ্রুপদেও বাঙালির অতি বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং হিন্দুস্থানী ধ্রুপদকলার সর্বভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় গুণীদের মধ্যে বাঙালির স্থান হয় উল্লেখযোগ্য।

এক সময় বাংলায় বাঈজীদের বিপুল কদর ছিল। কলকাতাসহ বাংলার বড় শহরগুলোতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাগানবাড়িতে বা মূল ভবনের ফরাশঘরে বা নাচমহলে তাঁদের আসর বসতো। সেখান থেকে সুদূর পল্লী অঞ্চলের ভূম্যধিকারীদের গৃহে পর্যন্ত তাঁরা মুজরো করতে যেতেন। এটাও ইংরেজ শাসনের প্রধান নগররূপে কলকাতার অভ্যুদয়েরই ফল। দিল্লী ম্রিয়মান, লখনৌ ম্রিয়মান, কলকাতায় জাঁকজমক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানকার উঠতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য ভারতের নানা অঞ্চলের বাঈজীরা এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর দরবারস্থ বা আশ্রিত বাঈজীদের নিয়ে কলকাতা এলে এই নগর বাঈজীসংস্কৃতির এক কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলায় ক্রমে বাঈজীসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থাকে। নিকি বাঈজী, অসরুন বাইজী, জীন্নত বাঈজী, বেগমজান, হিঙ্গুল বাঈজী, মির্জা জান, নান্নী জান, সুপন জান প্রমুখ কলকাতায় প্রথম যুগের বাঈজীদের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায় নিকির গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে নিকির আসর হতো। তৎকালীন বিবরণে এঁর বিশেষ প্রশংসা পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের বাইজীদের মধ্যে শ্রীজান, মালকাজান, গওহরজান, হীরাবুলবুল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাগসঙ্গীতে ও নৃত্যে এঁদের অধিকার কিংবদন্তির মতো হয়ে আছে।

উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলায় যখন হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রঙ্গীতে বাঙালির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ঠিক তখন থেকেই বাঙালি সঙ্গীতালোচকদের হাতে বাংলা ভাষায় সঙ্গীতালোচনার ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে। এর সূচনা ঘটে রাধামোহন সেনের হাতে। ইনি টপ্পা রচনায়ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪) প্রমুখের মননশীল রচনাবলী অবলম্বনেই বাংলায় সঙ্গীতালোচনার প্রকৃত বুনিয়াদ গড়ে উঠে। ভারতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বসঙ্গীতের ব্যাপক আলোচনার জন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অতুলনীয় সম্মান ও যশ অর্জন করেছিলেন।

বাঙালির আধুনিককালের সঙ্গীত-সংস্কৃতির পঞ্চপ্রধান পুরুষের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে যাবার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)-এর কথা বলতেই হবে। বাঙালির

সঙ্গীত-সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি কিছুটা উপেক্ষিত। কিন্তু অতি ব্যাপক তাঁর অবদান। উনিশ শতকের সদ্যবিকশিত বহুমুখী সাঙ্গীতিক প্রেরণাকে তিনিই মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ডে। আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রচলনকারী, গীতিকার, সুরকার, সেতার-বেহালা-পিয়ানো বাদক, সঙ্গীতগবেষক, সঙ্গীতপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, সঙ্গীতসঙ্ঘ স্থাপনকারী ও পরিচালক প্রভৃতি নানা ভূমিকায় তিনি বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক কীর্তি। স্বরলিপি প্রবর্তন নিয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তারই উৎকর্ষ ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তনায়। তদুপরি *স্বরলিপি, গীতিমালা, বীণাবাদিনী, সঙ্গীতপ্রকাশিকা* প্রভৃতি প্রকাশ করে এই স্বরলিপিপদ্ধতির প্রচারের জন্যও তিনি নিরন্তর প্রয়াস চালান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রীতিতে কিছু কিছু পরীক্ষামূলক সুরযোজনার কাজ করলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন রাগসঙ্গীতের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি সেকালের বাংলা গানের প্রচলিত সুরভঙ্গির সংস্কারেও ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রথম পর্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গঠিত হয়েছিল। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের আগে তিনিই বাংলায় সম্পূর্ণ রচিত সুরের আদর্শ প্রবর্তন করেন। আগেকার যুগে বাংলা শীলিত সঙ্গীতে রাগের সাধারণ রূপ অবলম্বনে গান রচনা করা হতো। গায়ক তাঁর সাধ্যমতো উপস্থিত সুরবিহারের সাহায্যে গায়নকলায় বৈচিত্র্য সম্পাদন করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ রচিত সুরের আদর্শে বাংলা গানের বাণীবন্ধের মর্মানুসারী সুর রচনায় ব্রতী হন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সুর রচনার এই ধারাকে অসামান্যভাবে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে আসার আগে বাংলা নাটকের গান সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। মঞ্চনাটকের শুরু থেকেই যাত্রার ঐতিহ্য অনুসরণে প্রচুর পরিমাণ বাংলা গান রচিত হতে থাকে এবং ক্রমে নাটকের গান ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োজনে পেশাদার সুরকার, সঙ্গীতপরিচালক ও গায়কের আবির্ভাব ঘটে। ফলে আবহমান আত্মাভিমুখী বাংলা গানের পটভূমিতে একটি মনোরঞ্জনী ও পেশাদারি মাত্রা যোজিত হয়। ত্রিশের দশকে সবাক চিত্রের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সঙ্গীতকলার এই পেশাদারি ও জনমনোরঞ্জনী প্রবাহের বিপুল প্রসার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটকের অভিনয় হয়। লেবেদেফ নামে জনৈক রুশ নাগরিক কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিতের সহযোগিতায় *দি ডিজগাইজ* নামে একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন এবং নাম দেন 'কাল্পনিক সংবদল'। সেই নাটকে ভারতচন্দ্র রায়ের *বিদ্যাসুন্দর*-এর গান সংযোজিত হয়। নাটকে গান না থাকলে শ্রোতা-দর্শকদের প্রতিক্রিয়া অনুকূল হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় ছিল। কেননা

পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক যাত্রাভিনয় ছিল সর্বাংশেই গীতপ্রধান উপস্থাপনা। তাই অভিনয়পিপাসুদের মধ্যে গান শোনার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছিল। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত ও ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন* ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের *কীর্তিবিলাস* নাটক। তারাচরণ ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকে অভিজ্ঞ ছিলেন। যাত্রায় সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। সেকথা তিনি তাঁর নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন। তাঁর নাটকে গান প্রাধান্য লাভ করে নি। যোগেন্দ্র গুপ্তও *কীর্তিবিলাস*-এর ভূমিকায় যাত্রায় সঙ্গীতের বাহুল্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে সঙ্গীতরচয়িতা ও আদি বাঙালি যন্ত্রী আশুতোষ দেব সাতু বাবুর কলকাতার বাড়িতে বৈদ্য নন্দকুমার রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা মৌলিক নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলার* অভিনয় হয়। এই নাটকে গানের ব্যবস্থা ছিল এবং গান রচনা করে দিয়েছিলেন কবিচন্দ্র নামে জনৈক গীতিকার। ১৮৫৮ সালে শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটিকা অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন *রত্নাবলী* রচনা করেন এবং সে বছরেরই জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে এর অভিনয় হয়। এই নাটকে বারোটি গান ছিল এবং গান রচনা করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য গুরুদয়াল চৌধুরী। এতগুলো গান কেন যোজনা করতে গেলেন রামনারায়ণ ? এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যাত্রার সঙ্গীতসাফল্যই তাঁকে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। *রত্নাবলীর* বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ লিখেছিলেন :

> যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগের অসীম অশ্রদ্ধা আছে তথাপি এককালে সঙ্গীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত-সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এ অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।

এ নাটকের সঙ্গীত পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান বাদন সংগঠন করেন। রাজেশ্বর মিত্রের ধারণা, আখড়াই গানের যন্ত্রবাদনের মাধ্যমেই অর্কেস্ট্রা গঠন প্রচেষ্টার সূত্রপাত।[১৫] সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়ই সঙ্গীতজ্ঞ যদুনাথ পালের সহায়তায় ক্ষেত্রমোহন অর্কেস্ট্রা বাদন সংগঠন করেন। রামনারায়ণের পরবর্তী নাটক *মালতীমাধব*-এর জন্যও বনোয়ারীলাল নামে জনৈক গীতিকার বেশ কয়েকটি গান রচনা করে দেন। জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেও গীতিপ্রধান নাট্যাভিনয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। সঙ্গীতবিদ ও গীতিকার কালীপ্রসন্ন সিংহ যেসব নাটক রচনা করেন তাতে প্রচুর গান অন্তর্ভুক্ত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তও (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর নাটকে গান ব্যবহারের বেলায় সেকালের শ্রোতা-দর্শকদের অভিরুচির কথা ভেবেই হয়তো যথোচিত সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। যথেষ্ট গান

১৫. *The History of Bengal (1757-1905)*, 545.

প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর নাটকে। তাঁর প্রেমের গানে নিধুবাবুর টপ্পার প্রভাব প্রচুর। সমসাময়িক নাট্যরচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) তাঁর নাটকে গান ব্যবহারের প্রচলিত রীতিকে তেমন প্রশ্রয় দেন নি।

তবে ১৮৭২ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের গৃহে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আগেকার সৌখিন রঙ্গমঞ্চের তুলনায় নাটকে গানের ব্যবহার আরো বেড়ে যায়। এখন থেকে টিকিট বিক্রি করে পেশাদারি কৌশলে রঙ্গালয় চালাবার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফলে শ্রোতা-দর্শকদের আকর্ষণ করার ব্যাপারটিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হয়। তার জন্য গানের আকর্ষণী শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যাপারটিকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাছাড়া তখন হিন্দুমেলায় স্বাদেশিক গানের উন্মাদনা চলছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখের নাটকেও দেশাত্মবোধক গানের প্রচুর ব্যবহার ঘটতে দেখা গেল।

প্রায় একই সময়ে গীতাভিনয়ের সূচনা ঘটে। নাট্যাভিনয় ও যাত্রাভিনয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল গীতাভিনয়ের ঐতিহ্য। গীতাভিনয় ছিল গীতমুখ্য উপস্থাপনকলা। নির্মিত মঞ্চ নয়, বরং অস্থায়ী খোলা মঞ্চে একটি যবনিকা সম্বল করে গীতাভিনয় প্রদর্শিত হতো। তৎকালীন বিখ্যাত নাটকগুলিকে কাটছাঁট করে অর্থাৎ গদ্যসংলাপ কমিয়ে দিয়ে তাতে প্রচুর পরিমাণ গান যোজনা করে এই গীতবহুল গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৬৫ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *পদ্মাবতী* নাটকের গীতাভিনয় হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকরে* এর প্রশংসা করা হয় এবং এই গীতবহুল নাট্যোপস্থাপনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয়।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য ছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। সঙ্গীত রচয়িতারূপে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাটকে তিনি প্রচুর পরিমাণে গান ব্যবহার করেছেন এবং নাটকের মুখবন্ধ ও ভাষণাদিতে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বিদেশী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটককে গানশূন্য করা কখনোই অভিপ্রেত হতে পারে না, বরং সঙ্গীতগৌরবই বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাটকে গীত সংযোজনের এই যে ধারা, গানের সাহায্যে জনমনোরঞ্জনের এই যে প্রচেষ্টা—একে একেবারে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোমোহনের ভাবশিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি ছিলেন অক্লান্ত গীতরচয়িতা। তাঁর রচিত ১৩৭০টি গানের প্রায় সবই নাটকের গান। এর মধ্যে অনেক গানই মঞ্চের বাইরে সুর ও কাব্যগুণে জনসাধারণের চিত্তে স্থান করে নিতে পেরেছিল। বাংলা মঞ্চকে কেন্দ্র করেই সুরকার-গীতিকার-গায়ক শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। গিরিশ ঘোষের বহু জনপ্রিয় গানের সুর রচনা করেন শশিভূষণ কর্মকার, বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও রামতারণ সান্যাল। এঁরা সব ধরনের প্রাচীন ও প্রচলিত বাংলা গানের সুর আহরণ করে গিরিশ ঘোষের গানে যোজনা করেন। ফলে এঁর গান খাঁটি বাংলা সুরভঙ্গির ভাণ্ডারবিশেষে পরিণত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অভিনেতা ও মঞ্চাধ্যক্ষ। ফলে জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা নাটক রচনা করতেন। তাঁরা প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীতের ব্যবহার করেছেন। যে ধরনের নাটকই হোক, বিষয়বস্তু যাই হোক, গান ব্যবহারে কেউ কোথাও কার্পণ্য করেন নি। এই সময়ে বাংলা নাট্যগীতি রচনায় যাঁরা বিশেষভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০১), অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২), প্রমথনাথ মিত্র, রাধানাথ মিত্র (১৮২৫-১৯২১), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই ঐতিহাসিক জমকালো দিনগুলোয় আবির্ভূত হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। তিনি মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু তাঁর নাট্যপ্রেরণা ছিল বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। তথাপি নাটকে গানের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করেন নি তিনি। বরং নাটকে তিনি প্রভূত পরিমাণে গান ব্যবহার করেছেন। নিজে গীতরচয়িতা ছিলেন বলে নাটকে গান ব্যবহারের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তবে গানকে তিনি নাটকানুসারী করে তুলেছিলেন। সেকালের ব্যাপারটা এমন ছিল যে নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবির কারণে না হলেও জনমনোরঞ্জনের জন্য গান শোনাতে হবে এমন একটা ধারা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে গানের ব্যবহারকে নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং অসামান্য সব গান সংযুক্ত করেছিলেন নাটকে, যেগুলো মঞ্চের সীমা অতিক্রম করে বাঙালির চিরকালীন গানের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

সৃজনশীল জীবনের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। এর আগে গীতিনাট্য রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুঞ্জবিহারী বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ মিত্র প্রমুখ। মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের গীতাভিনয় তো ছিলই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য পূর্ববর্তী সবকিছুকে অতিক্রম করে বাংলা নাট্যসঙ্গীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। ক্রমে গীতিনাট্য, ঋতুনাট্য এবং সাধারণ নাটকে প্রচুর পরিমাণ গান ব্যবহারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যগীতিতে এক অসামান্য অধ্যায় সংযোজন করেন।

পরবর্তী যুগের নাট্যকাররাও নাটকে গান ব্যবহারের ধারা অব্যাহত রাখেন। তবে একথা ঠিক, নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারটা ধীরে ধীরেই গুরুত্ব পাচ্ছিল। শ্রোতা-দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছিল অভিনয়কলার কঠিন উপায়ের মাধ্যমে, সহজভাবে গান শুনিয়ে নয়। ত্রিশের দশকেও নাটকে গানের ব্যাপারটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকে যে, সে যুগের অনেক বিখ্যাত নাট্যকারকে দেখি কাজী নজরুল ইসলামকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিতে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ও তৎপরবর্তীকালীন নাট্যকর্মে

যেভাবে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও পাশ্চাত্য শিল্পান্দোলনের অভিঘাত এসে লাগতে থাকে, তাতে সহজ মধুর কল্পনাবিলাস ও তার সহযোগী গানের ব্যবহার কমে যায়। মঞ্চসাফল্যের উপাদান হিসেবে গানের স্থানও নিতান্তই ম্লান হয়ে পড়ে। অভিনয়কলার সহায়ক উপাদান হিসেবে মঞ্চব্যবস্থাপনা, আলোকসম্পাত, শব্দনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারিগরি বিষয়ে বিপুল উৎকর্ষ ঘটে। এইসব কৌশলগত উৎকর্ষ মঞ্চকে বিপুল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নাট্যোপস্থাপনা অসামান্যভাবে গতিশীল হয়ে উঠে। বাংলা নাটকের অনেক দিনের পুরনো ধ্যানধারণার রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। ফলে নাগরিক নাট্যায়োজনে গানের ভূমিকা কমে আসে।

এইভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বিকাশের এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অতি ব্যাপক আয়োজন এবং নানা শাখায় বাংলা গানের বিকাশ এর পটভূমি তৈরি করে। এই যুগরচনার আভাস পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মে, তবে এর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের সারা চল্লিশের দশক এই পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সুবর্ণ যুগ রচনার কাজ চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব এক স্বর্ণোজ্জ্বল ঘটনা। বাংলা কাব্যগীতিকে উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল ও বহুমুখী অবদান রাখেন তার মূল্যায়ন আজো শেষ হয় নি। প্রবন্ধে, অভিভাষণে, পত্রে, আলাপ-আলোচনায়, রোজনামচায় একদিকে যেমন তিনি অক্লান্তভাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন, অপরদিকে আপন সঙ্গীতকর্মে তিনি এর পরমোন্নত রূপটিকেও প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে প্রেম, ব্রহ্মোপাসনা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার স্বর্ণাভ উত্তরণ ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায়। গভীর ব্যঞ্জনাময় বাণী ও তার মর্মানুসারী সুরের সম্মিলনে বাংলা কাব্যগীতির যে রূপটি তিনি নির্মাণ করেন তা আজো এক অনতিক্রম্য সৌন্দর্যের দ্যুতি ধারণ করে আছে। শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রায় সমার্থক ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল বহুমুখী সংস্কৃতিচর্চার এক অসামান্য কেন্দ্রস্থল। সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবস্থান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর আমলে সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে এই বাড়ির অভ্যুদয় ঘটলেও এর সঙ্গে সাঙ্গীতিক আবহ যুক্ত হয়েছিল আরো আগে, দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ রামলোচন ঠাকুর (১৭৫৪-১৮০৭)-এর সময়ে।

রামলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতচর্চার ও পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্যের সূত্রপাত তাঁর আমল থেকেই। দেবেন্দ্রনাথের আমলে এসে এই ধারা বিশাল আকার ধারণ করে এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীত রচনার ও চর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিশু তখন ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে এক মহা প্রস্তুতির পর্ব চলছিল। বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণীরা অধিষ্ঠিত আছেন এই বাড়িতে, আর তাঁদের তত্ত্বাবধানে বয়োজ্যেষ্ঠরা তালিম নিচ্ছেন। প্রথাবদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাঁর সঙ্গীতমানস ঋদ্ধ হয়েছিল প্রধানত গুণীদের সাহচর্যে। অসামান্য আহরণী ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেন। গীতরচনা ও সুরারোপের পথে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। শ্রীকণ্ঠ সিংহ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের শিক্ষা ও সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানস গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

১৮৭৫ সালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতরচনা শুরু করেন। তবে সমালোচকদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনার কাল হিসেবে ১৮৮১ সালকেই ধরা ভাল, কেননা "এই সময় থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা ক্রমপর্যায় করা সম্ভব, এর পূর্বেকার রচনা বিক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায়ও খুব অল্প।"[১৬] সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনাকাল ৬১ বছর বিস্তৃত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। তিনটি যুগপর্বে এই কালসীমা বিভক্ত। ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম যুগ, ১৯০১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ এবং ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ বিস্তৃত। প্রথম যুগকে বলা হয়েছে প্রস্তুতির যুগ, দ্বিতীয় যুগকে বলা হয়েছে পরীক্ষার যুগ এবং তৃতীয় যুগকে পরিণতির যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের গান সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত। দ্বিতীয় যুগে প্রধানত সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত গানের ধারা পরিত্যাগ করে তিনি রাগসঙ্গীতের ভিত্তিতে মৌলিক সুর রচনায় ব্রতী হন। লোকসঙ্গীত সম্পর্কেও এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। রাবীন্দ্রিক তালগুলোও এই যুগে রচিত হয়। তৃতীয় যুগে এসে পাওয়া গেল প্রকৃত রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গীতিমালা। "পরিণত বয়সে নানা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার শেষে যেসব সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন, এই শেষ যুগে তাই হলো প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসম্মত রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এইসব গানই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান।"[১৭] এই যে পরিণত যুগের রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরের মর্মগ্রাহী মিশ্রণে এর সুরভঙ্গিটি গঠিত। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, দ্বারের পাশে পল্লী

---

১৬. শুভ গুহঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা*, (কলকাতা ১৩৬৬), ৪।

১৭. প্রাগুক্ত, ১২।

গ্রামে। ... নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো তিনি এই পল্লীসঙ্গীত, এই লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমগ্র ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করানো প্রতিভার কাজ। ... সেই জন্য রবিবাবুর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়ালি, বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারী সুরপদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়ালি- বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। ... এই যুগের গানই তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চীৎকার যেমন এর মধ্যে নেই, তেমনি দরবারী সঙ্গীতের অজস্র তানের ও তালের নিরর্থক গুণ্ডামিও এর মধ্যে নেই। অথচ তাদের সদগুণ সবই রয়েছে, আনন্দের সব উচ্চাঙ্গের উপাদানই রয়েছে, রয়েছে লোকসঙ্গীতের ভাবসম্পদ এবং দরবারী সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, ভদ্রতা ও শালীনতা।"[১৮]

গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতি এই চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক নামে দুটি বিভাগও রয়েছে। পূজা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সাড়ে ছয়শত গান রচনা করেন। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারায়ই পূজা পর্যায়ের সঙ্গীতরচয়িতারূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। বিপুল সংখ্যক বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতাকে নিরাকার ব্রহ্মের স্তবগান রচনা করতে দেখা যায়। তবে এই গীতধারার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। সুর ও বাণীর উৎকর্ষে এই গানের ভিতর দিয়ে বাংলা ভক্তিগীতির কালজয়ী রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঈশ্বরানুগত্যের গভীর অনুভব এই গানে এমন সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তা বিশ্বাসী মানুষ মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করে। তাই ব্রাহ্ম আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মস্তবসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি। এ গান সাম্প্রদায়িক প্রার্থনাসঙ্গীতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। একেশ্বরবোধের প্রমূর্ত সাঙ্গীতিক বাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত কালোত্তীর্ণ গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

স্বদেশ পর্যায়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত সংখ্যায় অল্প। স্বদেশী আবহে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার সূত্রপাত ঘটলেও এবং চিন্তায় ও কর্মে দেশহিতৈষণার গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে থাকলেও কবি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন সর্বমোট ৭০টির বেশি নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বেই (১৯০৫-১৯১১) রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান রচনায় সর্বাধিক মনোনিবেশ করেন। দু'একটি গানের কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সব উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গানই এই সময়ে রচিত। এসব গীতরচনার প্রধানবৈশিষ্ট্য এই যে, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতা এদের গ্রাস করতে পারে নি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এসব গানে গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফলে এ গান আন্দোলনের সাময়িকতাকে অতিক্রম করে বাঙালির চিরকালীন স্বদেশসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। এ যুগে রচিত অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে বাউল

---

১৮. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কথা ও সুর,* (কলকাতা ১৩৯০), ৫০।

সুরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। দেশাত্মবোধক গীতিরচনাকে দেশের আবহমান সঙ্গীতে গ্রথিত করার মধ্যে যে কী গভীর জনসংলগ্নতার মাত্রা থাকে, তা রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক লোকজ আঙ্গিকের গানে উপলব্ধি করা যায়। পূর্ববর্তী যুগের রাগসঙ্গীত, বিশেষকরে খেয়াল ও টপ্পার সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা থেকে রবীন্দ্রনাথের এই পদক্ষেপটি এক গভীর ব্যতিক্রম। এর ফলে বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যময় সাঙ্গীতিকতার মাত্রা যোজিত হয় এবং তা পরবর্তী যুগের দেশাত্মবোধক গান রচনার প্রবাহকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

বাংলা কাব্যগীতির ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতালোচকরা একে বলেছেন ঋতুসঙ্গীত। ষড়ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে লীলাবৈচিত্র্য তা রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতে যেমনটি রূপায়িত হয়েছে তেমন আর কারো রচনায় পাওয়া যায় না। এ শুধু আকাশে বাতাসে তরুলতায় পুষ্পপল্লবে ঋতুক্রমে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আসে তার রূপায়ণ মাত্র নয়, ঋতুক্রমে সংবেদী হৃদয়ের পরিবর্তনশীল ভাবোচ্ছ্বাসকেও এই গীতিমালায় সম্যক আস্বাদন করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক অতি গভীর। সব শ্রেণীর গানেই প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে মানবহৃদয়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। রাগসঙ্গীত পরিকল্পনায়ও প্রকৃতির গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতির কোলে লালিত। প্রকৃতির স্পন্দন মানুষের প্রাণে ও গানে আপনিতেই ধ্বনিত হয়ে উঠতো। নাগরিক সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকলো। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লুপ্তপ্রায় সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে তাকে গভীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর গানে; ঋতুউৎসবের প্রবর্তন করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রুদ্ধপ্রায় বাতায়নগুলোকে খুলে দিয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ কথাটির উপর যে, মানুষের জন্ম কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বে তার জন্ম; মানুষের চিত্তমহলের দ্বার খুলে বিশ্বপ্রকৃতিকে আহ্বান না করলে বিরাটের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনসাধনের বড় উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎসব, প্রকৃতির গান ; গানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির বিপুলতাকে, এর সজীব গভীর প্রভাবকে যতোটা উপলব্ধি করা যায় আর কোন কিছুতেই ততোটা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর ভাষায় :

> প্রকৃতির সঙ্গে গানের যতো নিকট-সম্পর্ক এমন আর কিছু না—আমি নিশ্চয় জানি এখন যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি, তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর বিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, .. কথাতো ওই একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।[১৯]

---

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা,* (কলকাতা ১৯৬৬), ১৯৮।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে বাংলার ষড়ঋতুর লীলার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে আভ্যন্তর ছন্দটি বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে আমরা নিবিড় করে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি ঋতুউৎসব, তাঁর অজস্র প্রকৃতির গান আমাদের মধ্যে এই বোধটিকেই তীব্র করে তোলে যে, মানবপ্রকৃতি আর বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। প্রকৃতি বিষয়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা তিনশ'র মতো। এর উপর রয়েছে শতাধিক ঋতুকালীন প্রেমসঙ্গীত। এদের সমবায়েই বাংলা প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সর্বোত্তম রূপটি গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যা চারশ'র উপর। সংখ্যার দিক থেকে পূজাপর্যায়ের গানের পরই এর স্থান। প্রেমসঙ্গীত রচনার ধারাটি রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ অবধি বিস্তৃত। এর মধ্যে কি সঙ্গীতে, কি বিষয়বস্তুতে আমরা একটা ক্রমোত্তরণ লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমদিককার গানে আমরা ব্যক্তির ভালবাসাকে পাই, তার একান্ত হৃদয়বেদনাকে পাই, আমাদের পরিচিত জীবনাবেষ্টনীকে পাই, যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সেখানে অনুভব করা যায়। কিন্তু শেষের দিকের গানে এমন আর পাওয়া যায় না। সেখানে ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তায় লীন হয়ে যায়, বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে উঠে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ব্যক্তিসত্তার স্থূল উপস্থিতি ছিল না কখনোই, কিন্তু পরিণত রচনায় ব্যক্তির প্রাণস্পন্দনের চেয়ে নিখিল মানবের প্রাণস্পন্দনই বেজে উঠে অতি গভীরভাবে। অনাবশ্যক হলেও প্রথম জীবনের গানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সূত্রসন্ধান করে তাদের কোন না কোন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা যায়, করলে তার এক রকম জৈবনিক অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু পরিণত যুগের গানে সে সূত্র অনাবশ্যক, সেখানে জীবনের চিরকালীন সূত্রটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। সে গান নির্বিশেষ ভালবাসার গান। যাকে উদ্দেশ করে সে গান রচিত হয়েছে, তিনি পরম আকাঙ্ক্ষিতা, কিন্তু অপ্রাপণীয়া। তাঁকে পেলে হয়তো জীবনের অনেক দুঃখ ঘোচে, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি চিরবিচ্ছেদের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা। প্রেমের গান পরিণামে দুঃখেরই গান, বিচ্ছেদেরই বাষ্পাকুল কথামালা। এই অশ্রুবাষ্প জমে উঠেছিল রামনিধি গুপ্তের গানে, রবীন্দ্রনাথের গানে তা বর্ষণ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান বেদনারই প্রমূর্ত বাণী। কোন কোন প্রেমের গানের ব্যঞ্জনা এমন হয়ে উঠেছে যে, সে গানের সঙ্গে পূজার গানের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁর বিচ্ছেদে কবির অন্তরাত্মা কাতর, তিনি যেন কোন অনির্দেশ্য রমণীসত্তা নন, যেন কবির জীবনদেবতা তিনি, যেন ব্রহ্মসঙ্গীতের জীবননাথ— এমনও ঘটে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন প্রেমের গানে।

ব্রহ্মসঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানেও একটি উল্লেখযোগ্য সাঙ্গীতিক ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিককার সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত গানের স্তর অতিক্রম করে এই গান রাগসঙ্গীতের কাঠামোয় মৌলিক সুর রচনার স্তরে এসে দাঁড়ায়। তারপর আসে পরিণত রবীন্দ্রসুর রচনার পালা, যে যুগে প্রেমের গানগুলোয় সহজ সুরের বাঁধুনীতে এক অসামান্য আর্তির রূপায়ণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানগুলো বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অসামান্য গুরুত্ব লাভ করেছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর যে গান আছে, গানের সংযোজনেও এসব অনুষ্ঠানে যে নতুন মাত্রা যোজিত হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন করে জানালেন এসব রচনায়। নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, শিল্পোৎসব, বিবাহ, জন্মোৎসব, মৃত্যুশোকপালন প্রভৃতি উপলক্ষসহ নানা অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ যেসব গান রচনা করেছেন সেগুলো বাঙালির জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক আদর্শ ছিল ধ্রুপদীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন, "এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—এক দিকে তার বিপুলতা-গভীরতা, আর এক দিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।"[২০] গভীরতা, আত্মদমন ও সুসঙ্গতি এই তিনটি ধ্রুপদীয় বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। বাণীবন্ধের গভীরতম আকুতিকে প্রকাশ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাবীন্দ্রিক সাঙ্গীতিকতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এজন্যই খেয়াল, টপ্পা বা ঠুংরির নির্বাধ সুরবিহারের পথ ত্যাগ করে কবি ধ্রুপদীয় আত্মদমন ও সুসঙ্গতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সুরযোজনার ক্ষেত্রে তা দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ সঙ্গীতের স্তবক বিন্যাসরীতিকেও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতেই স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগক্রমে চার স্তবকবিশিষ্ট আধুনিক বাংলা এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আগেকার বাংলা গীতরচনার রীতি ছিল সাঙ্গীতিক বিবেচনায় দুই স্তবকে বিভক্ত। গানের পদ দুইয়ের বেশি স্তবকে রচিত হলেও সঙ্গীতের দিক থেকে তা ছিল স্থায়ী ও অন্তরাক্রমে গঠিত। রবীন্দ্রনাথই চার স্তবকে গান রচনার প্রামাণ্য রূপটির প্রতিষ্ঠা দান করেন।

এমনিভাবে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসঙ্গীতসাধনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় এসে এক উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করে। বাণী রচনায় ও সুরারোপণে বাংলা গানকে তিনি যে জায়গায় পেয়েছিলেন তা থেকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় উৎকর্ষের এমন এক স্তরে একে উত্তীর্ণ করেছিলেন যে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। একদিকে ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা যেমন তাঁর মধ্যে এসে সুবর্ণপ্রসূ হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে প্রেমসঙ্গীতের ধারাটিও তাঁর রচনায় পরমোন্নত রূপ লাভ করেছিল। বাংলা প্রকৃতির গান তাঁরই অনন্য অবদান। পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের সামনে ছিল এই বিপুল রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতকলা পরবর্তীকালের জন্য আলোকবর্তিকারূপে কাজ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাতা দ্বিজেন্দ্রলাল। দেশাত্মবোধ, প্রেম ও হাস্য এই তিনটি বিষয় অবলম্বনেই প্রধানত তিনি গান রচনা করেন। কতিপয়

---

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ১৬৫।

ভক্তিগীতিও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) ছিলেন অন্যতম আদি বাঙালি খেয়ালগায়ক ও খেয়াল অঙ্গে গীতরচয়িতা। বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের ছোট হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর চেয়ে ২৮ বছর আগে মারা যান এবং তাঁর পরিণত সঙ্গীতজীবনও রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনা পর্যায়ের অনেক আগেই শুরু হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতভঙ্গিকে অত্যন্ত রসসম্মতভাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অঙ্গগত করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছেন। দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে সাধিত পূর্ব ও পশ্চিমের এই সমন্বয় বিশেষ দ্যোতনাবাহী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুরের ক্রমোত্থান ও ক্রমপতনের ভঙ্গিটি বাংলা গানের সুরযোজনার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। কালিদাস রায় অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন এ সম্পর্কে :

> সঙ্গীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। এই গীতগুলির অধিকাংশই কোরাস গর্ভগীত। এই গানগুলি যখন নানা রঙ্গমঞ্চে গাওয়া হত, তাতে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত। যে-সভামণ্ডপে গাওয়া হত সে-মণ্ডপ যেন গম্বুজের তলের মতো গম গম করত, যে পথে গাওয়া হত সে পথ যেন সুরগঙ্গায় পরিণত হত। ... বিলাতি সুরে যাকে বলে movement, তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, উদ্দীপনা বা উন্মাদনায় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালই লক্ষ্য করেন উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে—এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়।[২১]

রাগসঙ্গীতের রূপবন্ধে পাশ্চাত্য কোরাসভঙ্গিম গায়নকলার প্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রলালকে অভাবিত সাফল্য এনে দেয়। তিনি সামরিক মার্চ সঙ্গীতের ঢঙে সুরযোজনার ক্ষেত্রেও পথিকৃতের কর্ম সম্পাদন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে বাণীরচনা ও সুরনির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর গভীর সৃজনশীল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাগসুর ছিল তাঁর সুর রচনার ভিত্তি। কিন্তু প্রথাগত, প্রচলিত রাগসুরের অনুবর্তনকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তিনি রাগসুরের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই নতুন স্র সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি টপ্পার ঢঙ এনেছেন, খেয়ালের ঢঙ এনেছেন, টপ্পায় ও খেয়ালে মিশিয়ে টপখেয়ালের ঢঙ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই একটি স্বকীয়তা, বাণীবন্ধের মর্মানুসারিতার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আগে এই সুরপ্রক্রিয়ার বিষয়টি দ্বিজেন্দ্রলালেই সবচেয়ে প্রবলভাবে পাওয়া গিয়েছিল। হাস্যগীতি রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা হাস্যগীতির তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার এবং হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতরচয়িতারূপেই বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ উভয় শ্রেণীর গানেই তাঁর সমতুল্য দক্ষতা ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতভঙ্গিকে তিনি অসাধারণ কৌশলে তাঁর হাসির গানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে কালিদাস রায়ের মূল্যায়ন :

---

২১. কালিদাস রায়, 'প্রাককথন', দিলীপকুমার রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র কাব্যসঞ্চয়ন*, (কলকাতা ১৯৬৯), ধ

> সুরকার হিসেবে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় প্রথম হাসির গানে। এইসব গানে বাঙালির হৃদয়ের সহজ মাধুর্যের সঙ্গে বিলাতি সুরের প্রাণ-প্রাচুর্য সম্মিলিত হয়ে সকলকে চমকিত করেছিল। ... কবি নিজে যখন এই সব গান গাইতেন তখন হাসতে হাসতে সকলের বুকে পিঠে খিল ধরে যেত। তা কি শুধু কথার জন্য? দরাজ উদীরিত সুরের জন্যই প্রধানত। গানগুলি শুধু পড়লেই হাসি পায়। আবৃত্তি শুনলে সে হাসির উদ্দীপনা বাড়ে, কিন্তু এর আসল সুরে গাওয়া শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। সুরকার কবি নিজে যখন গাইতেন তখন অট্টহাস্য রোধ করা কঠিন হত। বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মিলন যে কী অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারত তা এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল।[২২]

গীতরচনা ও সুরকৃতিতে দূরপ্রসারী অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে যে স্থানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রাপ্য ছিল তা তিনি পান নি। তাঁর সমকালে রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাবই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রগীতির সংরক্ষা, প্রচার ও মূল্যায়নের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ না থাকায় তা সঙ্গীতের প্রবহমান জনরুচি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে আধুনিক ও অন্তর্মুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এবং এর সঙ্গে বিশ্বসঙ্গীতকে মেলাবার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

বাংলা কাব্যগীতির ইতিহাসে রজনীকান্ত সেন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। সুমধুর ভক্তিসঙ্গীত ও উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাত্মবোধক গান রচনার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন কবি ও গীতরচয়িতারূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই রজনীকান্ত গীত রচনায় ও গান গাওয়ায় আগ্রহ প্রদর্শন করেন। আইনজীবীরূপে রাজশাহীতে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি সঙ্গীতকার ও গায়করূপে সুখ্যাত হন। ১৮৯৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজশাহী শহরে যান। সেখানে তাঁর মুখে হাসির গান শুনে রজনীকান্ত এই গানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন ও হাস্যগীতি রচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে (১৯০৫) সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার যে বিপুল জোয়ার আসে রজনীকান্ত তাতে অংশগ্রহণ করেন। রজনীকান্ত সেনের জীবনে এর পর পরই বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। পুত্র ও কন্যাবিয়োগের যন্ত্রণা সহ্য করে উঠতে না উঠতেই তিনি প্রথমে মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও পরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীতরচনায় বিরাম ঘটে নি তখনো। কণ্ঠ রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি গানও গেয়ে চলেছেন। রজনীকান্তের কবিতা ও গীতিসঙ্কলন গ্রন্থের সংখ্যা আট। তিনি তিনশ'র মতো গান রচনা করেন।

হাস্যগীতি, দেশাত্মবোধক গান ও ভক্তিগীতি এই তিন প্রধান শ্রেণীতে রজনীকান্ত সেনের গান বিভক্ত। রজনীকান্তের হাসির গান বর্তমানকালে গাওয়া হয় না বললেই চলে।

---

২২. কালিদাস রায়, প্রাগুক্ত, ঐ।

দেশাত্মবোধক গীত রচনার মধ্যে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি বর্তমান কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশাত্মবোধক গানে যেসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটে সেগুলোর অধিকাংশই রজনীকান্তের রচনায় রূপায়িত হয়। তবে বিদেশী পণ্যবর্জনের ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করে। "এই একটিমাত্র গানই বাঙালিকে দেশজ শিল্পের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে। এই একটি মাত্র গানেই রজনীকান্ত দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন।"[২৩] রজনীকান্ত রচিত 'আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট', 'ফুলার কল্লে হুকুম জারি' গান দুটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল।

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় ভক্তিগীতি রচয়িতারূপেই রজনীকান্ত সেনের মুখ্য প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণের এমন বিনম্র মধুর গান খুব কমই রচিত হয়েছে। অমৃততৃষ্ণার এমন ব্যাকুলতা, পরম সান্ত্বনা, পরম নির্ভরের এমন গীতরূপ বাংলা ভাষায় কমই দেখা যায়। দুঃখ যতো বেশি পেয়েছেন, যন্ত্রণা যতো গভীর হয়েছে, ঐশী করুণাকে তিনি ততোই নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কোন অভিমান নেই, কোন ক্ষোভ নেই, জীবনে দুঃসহ বিপর্যয়কেও তিনি ঈশ্বরের দয়া হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সেই বোধকেই রূপায়িত করেছেন এক একটি গানে। 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর', 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে', 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু', 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়', 'তোমারি দেওয়া প্রাণে', 'আমি সকল কাজের পাই হে সময়', 'পাতকী বলিয়ে কি গো', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' প্রভৃতি ভক্তিগীতিতে রজনীকান্ত নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন : "একথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে-একটি চিরসলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা অবিনশ্বর।"[২৪]

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)

বাংলা কাব্যগীতির সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের পাশেই অতুলপ্রসাদ সেনের আসন। তিনি নানাভাবে বাংলা কাব্যগীতিপ্রবাহকে সমৃদ্ধিদান করেছিলেন। তবে হিন্দুস্থানী গানের ঢঙকে গভীর রসবত্তার সাথে বাংলা গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারটিকে তাঁর বিশেষ অবদানরূপে বিবেচনা করা হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ঠুংরি গানের মনোরম চালকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অঙ্গগত করে তিনি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন।

---

২৩. রজনীকান্ত সেন, *কান্তকবি রচনা সম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, (কলকাতা ১৩৬৯)।

২৪. *কান্তকবি রচনাসম্ভার*।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজার অঞ্চলে অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম। মাদারীপুর জেলার মগরগ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। পিতা রামপ্রসাদ সেন, মাতা হেমন্তশশী দেবী। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে অতুলপ্রসাদ মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। কালীনারায়ণ ছিলেন ভক্তিগীতি রচয়িতা ও গায়ক। তাঁর সাহচর্য অতুলপ্রসাদকে সঙ্গীতের পথে আসতে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৯০ সালে অতুলপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। কিছুদিন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি ইংল্যান্ড যান ও সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় ও রংপুরে কিছুকাল আইনব্যবসা করে তিনি লখনৌ যান ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্গসংস্কৃতিতে অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠতম দান তাঁর গানগুলো লখনৌয়ে রচিত হয়। কর্মব্যস্ত ও বেদনাবিদ্ধ জীবনে সঙ্গীতই ছিল তাঁর অন্তরতম অবলম্বন এবং প্রাণের গভীরতম আকুতিটি তিনি গানেই প্রকাশ করে রেখে গেছেন।

অতুলপ্রসাদরচিত গানের সংখ্যা বেশি নয়। তিনি ২১০টির মতো গান রচনা করেছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। দেবতা, প্রকৃতি, মানব, স্বদেশ প্রভৃতি বিবিধ পর্যায়ে গানগুলো বিভক্ত। গানের শ্রেণীকরণে তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অতুলপ্রসাদের গানে দুটি সাঙ্গীতিক ধারার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি হচ্ছে হিন্দুস্থানী, বিশেষকরে ঠুংরি। অতুলপ্রসাদ বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ঠুংরির সাঙ্গীতিকতাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে বাউল ও কীর্তনের। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাউল-কীর্তনের সুরঢংকে জারিত করে তাঁর গানে প্রয়োগ করেছিলেন, অতুলপ্রসাদও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও নরনারীর ভালবাসা হচ্ছে অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পর্যায়ে তিনি ১৪টি গান রচনা করেন। দেশের অতীত গৌরবের উপস্থাপনা, বর্তমান দুরবস্থায় খেদ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য উৎসাহ, মাতৃভাষাপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রচলিত বিষয় অবলম্বনেই অতুলপ্রসাদ দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। মাতৃভাষাপ্রীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা গানটি (মোদের গরব মোদের আশা) তাঁর রচনা। সাম্প্রদায়িক প্রীতি তথা হিন্দু-মুসলিম প্রীতির পটভূমিতে রামপ্রসাদী সুরে অতুলপ্রসাদরচিত 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে' গানটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথরচিত ও প্রসাদী সুরে গ্রথিত মিলন গান দ্বারা এক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অতুলপ্রসাদ সেন ৫৫টি ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। এই পর্যায়ের গানে বাউল ও কীর্তনাঙ্গ সুরের যেমন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটেছে, তেমনি এক ধরনের মরমী আকুলতা অধিকাংশ গানেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। রাগসঙ্গীতাঙ্গে রচিত গানগুলোতেও এই ধরনের আকুলতার প্রকাশ

ঘটতে দেখা যায়। এ ছিল অতুলপ্রসাদ সেনের বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশরীতি। তাঁর সঙ্গীতকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে সহজ, মধুর ও আকুলতামিশ্রিত প্রকাশভঙ্গিতে। তাঁর ভক্তিসঙ্গীতে এই সহজ, মরমী মাধুর্যেরই চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। নরনারীর ভালবাসা নিয়ে রচিত অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা ১০০-র উপর। "অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে আছে প্রিয়সঙ্গবিহীন করুণ আর্তি। ব্যক্তিজীবনে তিনি অসফলপ্রণয় ভিক্ষু। মিলনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি তাঁর স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। তাই তাঁর গানে যৌবনের স্বপ্নবিলাস নেই, বেদনা আছে, নেই আন্দোলিত বায়ুহিল্লোলে কামনার উল্লাস, রয়েছে নিঃসঙ্গতার নিঃশব্দময় দীর্ঘশ্বাস, কুলপ্লাবিত ধারাজল, বাদল রাতের তমসা আর বুকভাঙ্গা এক রাশ অভিমান।"[২৫] বাংলা প্রেমের গানের যে চিরন্তন বিষয় অর্থাৎ বিচ্ছেদবোধ, তাকেই অতুলপ্রসাদ রূপায়িত করেছিলেন স্বকীয় সঙ্গীতভঙ্গিতে, যা ছিল ঠুংরির নির্যাসে তৈরি; খেয়াল বা লোকসঙ্গীতের ঢঙও যখন এসে এই গানে মিশেছে, তখনও অতুলপ্রসাদের নিজস্ব সঙ্গীতভঙ্গিকে সহজেই চিনে নেয়া যায়, আকুলতা ও সহজ সৌকর্য যার প্রধান বিষয়। অতুলপ্রসাদ সেন দীর্ঘকাল বিলেতে ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতকলাকে তিনি কখনো নিজের সঙ্গীতকর্মে ব্যবহার করেন নি। হিন্দুস্থানী লঘু রাগসঙ্গীত ও বাংলা লোকসঙ্গীত, বিশেষকরে বাউল ও কীর্তনের সুর ভেঙেই তিনি গান রচনা করেছেন। অনেক দিক থেকে তিনি সঙ্গীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী, কিন্তু অনেক দিক থেকে পৃথকও। এক ধরনের লঘু রাগসাঙ্গীতিক চালের মধ্যে তাঁর সঙ্গীতব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল একালের বাংলা গানের পঞ্চ প্রধান নির্মাতার মধ্যে অতুলপ্রসাদই গানকে তাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর গানের স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম দুই প্রধান বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতা এবং এঁদের রচনাকর্মই বাঙালির সঙ্গীতাকাঙ্ক্ষায় এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত-সংস্কৃতির অতি প্রবল রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নকালেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এবং আবির্ভাবমাত্রই যেমন কবিতায়, তেমনি গানে নজরুল তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র অনেক, এর জন্য নজরুলের গৌরবও বিপুল। তবে এই দুই মহান সঙ্গীতরচয়িতার অবদানের সমগ্রতায়ই আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপের প্রতিষ্ঠা।

কৈশোরেই নজরুলের কবিত্ব ও সঙ্গীতপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। লেটোর দলের জন্য গান রচনার ভিতর দিয়েই নজরুল প্রাথমিক সঙ্গীতখ্যাতি লাভ করেন। সেসময় তিনি নানা

২৫. কনক দাস, 'অতুলপ্রসাদের গান', সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *দেশ বিনোদন*, (কলকাতা ১৩৯১), ৬০।

ধরনের গান ছাড়াও কয়েকটি পালা রচনা করেন। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে করাচি থেকে কলকাতা ফেরার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে নজরুল ইসলামের সঙ্গীতকর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায়।

নজরুলের সঙ্গীতজীবনকে যদি কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম পর্বটি হয় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচনামূলক। কবি সারাজীবনই কম-বেশি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন, তবে প্রথম পর্বে তিনি প্রধানত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচয়িতা। এই গীতিধারায় তিনি এক মহান যুগস্রষ্টারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বহুবিস্তৃত অবদান সমকালে যেমন বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তীকালেও তা জনপ্রিয়তার সাথে গীত হয়েছে এবং নব সঙ্গীতপ্রয়াসে প্রেরণার উৎসরূপে গৃহীত হয়েছে। পরাধীনতাসহ নানা সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নজরুল তাঁর গানকে ভাষায়, ছন্দে এবং সুরে আবেদনের এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, সে গান সমকালকে অতিক্রম করে দেশবোধের স্থায়ী গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছে। যেসব গান বাঙালির চিরকালীন স্বদেশসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে সেসবের মধ্যে সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বিচারে কাজী নজরুল ইসলামের গানই সর্বাধিক।

বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যখন আবির্ভূত হন, তখন এ ক্ষেত্র থেকে প্রধান বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতাদের প্রস্থানের ফলে একদিকে যেমন শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে পূর্বরচিত গানগুলোও তখনকার বৃটিশবিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মর্মজ্বালাকে তেমন উপস্থাপিত করতে পারছিল না। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ নজরুল খুব সহজেই সেই অগ্নিক্ষরাকালের স্পন্দনকে তাঁর গানে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। বাংলা গানে বীররস রূপায়ণের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটলো।

বক্তব্য প্রকাশের বিবেচনায় নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন দেশবন্দনামূলক গান, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, নারীজাগরণমূলক গান, মুসলিম জাগরণমূলক গান, দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের আবহমান ধারায় নজরুল যেমন গান রচনা করেছেন, তেমনি নতুন কয়েকটি ধারাও তিনি সংযোজন করেছেন। পূর্বতন ধারাগুলোও তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যে নতুন মাত্রা ধারণ করে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান নজরুলরচনায় বীররসের উন্মাদনাময় রূপায়ণে এক নতুন সংগ্রামী মাত্রা লাভ করেছে। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের বিশিষ্ট সংযোজন। হিন্দুমেলা যুগ থেকেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে নজরুলই বলতে গেলে বাংলায় প্রথম

গান রচনা করেন। এ ব্যাপারে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁকে বিশেষ প্রেরণা দান করে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরই নজরুল এসব গান রচনা করেন। এসব গানের ভিতর দিয়ে তাঁর শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়। সাম্যবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ নজরুলের এক বিশিষ্ট অবদান। চল্লিশের দশকের শুরুতে সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণায় শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে গণনাট্যের মঞ্চ থেকে এক ধরনের গান গাওয়া হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ গীতিকার-সুরকার এই শ্রেণীর গান রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাম্যবাদী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলোই এইসব গানে প্রচারিত হতে থাকে। এই গানের নাম হয় 'গণসঙ্গীত'। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা লক্ষ্য করা যায় তখন থেকে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শোষিত শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও শান্তির আকাঙ্ক্ষাও গণসঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠে। গণনাট্যসঙ্ঘকে কেন্দ্র করে যদিও বাংলা গানের এই বিশিষ্ট ধারার বিকাশ, কিন্তু এর পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় কাজী নজরুল ইসলামের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। গণসঙ্গীতের প্রধান আকাঙ্ক্ষাগুলো নজরুলের গানেই প্রথম রূপায়িত হয়। সেজন্য বাংলায় গণসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে নজরুলের রচনায় আমাদের পৌছতেই হয়।

নজরুল ইসলামের কিছু সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান মুসলিম জাগরণমূলক গান হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এইসব গানে তিনি নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় মুসলিম জাগরণমূলক সঙ্গীতকর্মকে একটি নবধারার রচনার সূত্রপাতরূপে গণ্য করা যায়। নজরুলের আগে আর কোন প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি কবি মুসলিম জাগরণের বিষয় অবলম্বনে এমন প্রেরণাদায়ক সঙ্গীতমালা রচনা করেন নি। হিন্দুমেলা যুগ থেকে স্বদেশী যুগ পর্যন্ত সমাজজাগরণের গান রচিত হয়েছে প্রচুর। পূর্বগৌরবের উপস্থাপনে, আদর্শ ও ঐতিহ্যের সন্ধানে সেসব গানের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তার প্রায় সর্বাংশেই ছিল হিন্দু। ফলে জাগরণের সাধারণ আহ্বান জানানো হলেও মুসলমান সমাজের কোন প্রতিনিধিত্ব সেখানে ছিল না। তাই একটা শূন্যতা থেকেই যাচ্ছিল। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে বিরাজিত এই শূন্যতা মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন নজরুল। সাধারণভাবে রচিত তাঁর যে জাগরণী সঙ্গীত, তাতে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান তো জানালেনই, তাতে মুসলিম সমাজকেও উদ্বুদ্ধ করা হলো; আবার শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের প্রতি জেগে উঠবার আহ্বান ধ্বনিত করেও গান রচনা করলেন তিনি। এর ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। আধুনিক জীবনের আলোকে সংগ্রামের রক্তাক্ত আহ্বানে জেগে উঠবার জন্য বাঙালি মুসলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করার যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মুসলমানদের সামাজিক প্রগতির জন্য নজরুলের এই উদ্দীপনাময় সঙ্গীত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের যে অংশটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হিসেবে খ্যাত, তাতেও কাজী নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট অবদান রেখেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনকে নজরুল তাঁর জীবনের অন্যতম মহান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালি কবি ও সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আকুতি তাঁর রচনায়ই সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারা দুটিকে তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই মিলিত ধারাটিকে উচ্ছ্রিত করে তুলেছিলেন নানা ধরনের রচনায়, বিশেষ করে কবিতায় ও গানে। আর কোন বাঙালি কবির মধ্যে এই ঘটনাটি এমন প্রবলভাবে ঘটে নি। আর কেউ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শকে সামনে রেখে নিজ রচনাকে উভয় সংস্কৃতির সহাবস্থানের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন নি। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সূচনাকাল থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে গান রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা ছিল এই শ্রেণীর গানের মূল উদ্দিষ্ট। এ গানকে বলা হয়েছে মিলনগান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য বাঙালি দেশাত্মবোধক গীতরচয়িতা মিলনগান রচনা করেছেন। তবে সাম্প্রদায়িক মিলন কামনার অতি গভীর রূপায়ণ ঘটেছে নজরুল সঙ্গীতে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন/কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার' চরণদ্বয় বাংলা গানের ইতিহাসে প্রবাদসম খ্যাতি লাভ করেছে।

দেশাত্মবোধক গানের পর্যায়টি সমাপ্ত করতে না করতেই নজরুল একটি ভিন্নতর সঙ্গীতসৌন্দর্য সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় একটি নতুন অধ্যায় সংযোজনে উৎসাহী হয়ে উঠেন। তিনি গজল রচনায় ব্রতী হন। গজল মূলত পারস্যসঙ্গীত। লঘু হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের পটভূমিতে উর্দু গীতিসাহিত্য অবলম্বনে বহু আগেই ভারতবর্ষে গজল সঙ্গীতধারার প্রবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বাংলায় গজল সঙ্গীতকলার বিস্তার সম্ভব হয়ে উঠে নি। নজরুলের আগে অতুলপ্রসাদ সেন অনধিক ছয়টি গজল শ্রেণীর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি বাংলা গানের ধারায় যুগ রচনার মতো কিছু করে উঠতে পারেন নি এবং তাঁর গজল বাঙালি শ্রোতৃচিত্তকে প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয় নি। কাজী নজরুল ইসলামই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তন করেন। বাংলায় যে গজল রচিত হতে পারে এবং তা যে এমন অসাধারণভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে সেকথা বাঙালি শ্রোতা ও রসজ্ঞরা বুঝতে পারলেন নজরুলের গজল শোনার পরই। বাংলা কাব্যগীতির প্রচলিত পরিস্থিতিতে নজরুলের গজল এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং এই ব্যতিক্রমী সঙ্গীতসৌন্দর্য বাঙালি সঙ্গীতরসিকদের চিত্ত এত দ্রুত জয় করেছিল যে গজল রচনার ফলাফল প্রত্যক্ষ করার জন্য কবিকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় নি। গীত হওয়ামাত্র শ্রোতাসাধারণ তাঁকে পরম আদরে বরণ করে নিল। গজলের অভিনব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করলেন দিলীপকুমার

রায়, নলিনীকান্ত সরকার, সাহানা দেবী প্রমুখ বরেণ্য গায়ক-গায়িকা। গজলের উচ্ছল রোমান্টিকতা, পারসিক অনুষঙ্গ, মাতানো সুরভঙ্গি বাঙালি সঙ্গীতামোদী সমাজের সামনে অকস্মাৎ যেন বিস্ময়ভরা আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হলো। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মকর্তারাও গজলখ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুলকে তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করতে উৎসাহবোধ করেন।

১৯২৮ সালের মার্চ মাসের দিকে গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে নজরুল ইসলামের যোগাযোগ ঘটে। প্রথমে কোম্পানির গীতিকার ও সুরকার এবং পরে প্রশিক্ষক ও প্রধান প্রশিক্ষকরূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকেই নজরুলের অসাধারণ ও বহুমুখী সৃজনশীল সঙ্গীতজীবনের বিকাশ। তখন থেকে কবি সর্বতোভাবে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ে নজরুলের সঙ্গীতসাফল্যকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা কষ্টকর। তবে সক্রিয় জীবনের শেষের দিকে তিনি যে কলকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাকে এই সঙ্গে ধরে নিলে নজরুলের সঙ্গীতসাফল্যের প্রধান ক্ষেত্রগুলো ছিল রাগসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, আধুনিক গান, লোকসঙ্গীতানুগ গান প্রভৃতি। দেশাত্মবোধক গান ও গজলের কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় রেকর্ডসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগটি তৈরি হয়েছিল নজরুলের রচনাকে কেন্দ্র করে। রেকর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, সবাক চিত্রের প্রচলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গান সম্পর্কে যে ব্যাপক জনআকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল সেযুগে এবং তার পটভূমিতে সঙ্গীত ও চিত্রব্যবসায়ীরা যেভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিগুলো গড়ে তুলছিলেন, তার প্রতি সৃজনশীলভাবে নজরুল অত্যন্ত অনুকূল প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন এবং তিনি তাতে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সমুন্নত ধারায় ইসলামী ভক্তিগীতি রচনার ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নজরুলপূর্ব যুগে হাম্‌দ, নাত প্রভৃতি ইসলামী ভক্তিগীতি পর্যায়ে বাংলায় যেসব গান রচিত হয়েছিল সেসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকগীতি পর্যায়ের রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাণী ও সুরগৌরবে সেসব গান আধুনিক জীবন ও সঙ্গীতমনস্ক মুসলমান সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী ছিল না। নজরুলই যুগোপযোগীভাবে ইসলামী ভক্তিসঙ্গীত রচনার সূচনা করেন এবং বহু বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক গান রচনা করে ধারাটিকে একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এ ধারায় যাকিছু কাজ হয়েছে নজরুলের গানই তার প্রেরণা ও পটভূমি।

বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুল ইসলামের হিন্দু ধর্মসঙ্গীত শ্রেণীর রচনাও এক অসামান্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এই পর্যায়ে নজরুলের সঙ্গীতরচনা এমন বিস্ময়করভাবে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় যে তাতে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আর কোন বাঙালি ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতার কর্মে হিন্দুধর্মসম্পৃক্ত বিষয়াদির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ সম্ভবত

ঘটে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতধারা প্রবর্তিত হলে বাংলায় নিরাকার ঈশ্বরের স্তবগান রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এই ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের ফলে এক অবিচ্ছেদ্য ও নিরাকার ঈশ্বরের বন্দনাগীতি রচনার রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে। ফলে আবহমান বাংলা ভক্তিগীতি রচনার ধারা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে নজরুলের রচনাকে কেন্দ্র করে আবহমান বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন ঘটে। অগ্রগণ্য শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতারূপে নজরুল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

আধুনিক বাংলা গান নামে খ্যাত সঙ্গীতশ্রেণীর প্রবর্তনে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই গীতিধারা প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রেরণা তাঁর রচনা থেকে এসেছিল। জনবোধ্য ও জননন্দন সঙ্গীত রচনাই ছিল আধুনিক গীতিধারার প্রধান প্রবণতা। জনচিত্তমনস্কতা ছিল নজরুলপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে গ্রামোফোন, সবাকচিত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জননন্দন সঙ্গীত রচনার এই ধারা যখন গড়ে উঠতে থাকলো, তখন অতি অনায়াসে তিনি এর নেতৃত্ব দিতে পারলেন। বাংলা প্রেমের গানের একটি অসাধারণ পর্ব নজরুলের আধুনিক গান শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

লোকসঙ্গীতানুগ বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর অবলম্বনে গান রচনার যে ধারাটির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বর্তমান শতকের গোড়ারদিকে, ত্রিশের দশকে এসে তা রেকর্ড কোম্পানি, চলচ্চিত্র ও বেতারকে কেন্দ্র করে বিপুল ও বহুমুখী হয়ে উঠেছিল। বহু জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতানুগ গান রচনা করে এবং লোকসঙ্গীতকে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্তস্থানীয় কর্মসম্পাদন করে নজরুল বাংলা গানের প্রবাহকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুরঢঙ অবলম্বনে লোকসঙ্গীতানুগ গান রচনা করেছিলেন, অতুলপ্রসাদও এই পথানুসারী ছিলেন, কিন্তু নজরুল ইসলাম ঝুমুর, ঝাপান, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি নানা ধরনের সঙ্গীতরূপ অবলম্বনে গান রচনা করে এই গীতধারাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। বিশেষকরে ঝুমুর সঙ্গীতানুগ বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেন।

বাংলা গানের ক্ষেত্রে রাগসঙ্গীতের রূপায়ণের ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ এক অধ্যায় রচনা করেছিলেন। বাংলা গানের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলরচনায় বাংলা গান ও হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকলার ব্যাপক সংযুক্তিতে বাংলা গানের জগৎ সুরসৌকুমার্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠে। বেতার, রেকর্ডপ্রতিষ্ঠান ও সবাকচিত্রকে কেন্দ্র করে সুরসমুচ্ছল বাংলা গানের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগে, তার প্রধান প্রেরণা এসেছিল নজরুলের এই বিপুল ও বৈচিত্র্যময় রাগসঙ্গীতানুগ সঙ্গীতকর্ম থেকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী

সঙ্গীতকলার প্রথাসম্মত রূপায়ণের ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটে এবং রাগসঙ্গীত অবলম্বনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নতুন উদ্যোগ দেখা দেয়। নিরীক্ষামূলক সঙ্গীতকর্মেও নজরুল অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি নবরাগ রচনায় উদ্যোগী হন ও লুপ্তপ্রায় রাগগুলোর পুনরুজ্জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এ পর্যায়ে রাগপ্রধান বাংলা গানের ভিত্তিরচনা নজরুলের এক ঐতিহাসিক সাঙ্গীতিক কীর্তি।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতি এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়। আধুনিক সঙ্গীতকলার বিকাশ, গীতিকার-সুরকার-গায়ক শ্রমবিভাজন, রেকর্ডকরণপদ্ধতির যান্ত্রিক উৎকর্ষ, সবাকচিত্রের প্রবর্তন, সবাকচিত্রে নেপথ্য গায়নের বিকাশ, বেতারের সাঙ্গীতিক কর্মসূচির সম্প্রসারণ প্রভৃতির প্রভাবে আবহমান সাঙ্গীতিকতার অনেক উপাদান বর্জিত বা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং নতুন সঙ্গীতযুগের সূচনা ঘটে। নজরুল ছিলেন বিগত ও বিকাশমান যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ। তিনিই বাংলা গানের ধারায় আবহমানকালের শেষ প্রধান প্রতিনিধি।

সেই ক্রান্তিকালে উদ্ভিন্নমান আধুনিক সঙ্গীতযুগকে নির্মাণ করতে এসেছিলেন গীতিকাররূপে হীরেন বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, অনিল ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, বাণী কুমার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালকরূপে হীরেন বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, বিনয় গোস্বামী, হিমাংশু দত্ত, নিতাই মতিলাল, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, চিত্ত রায়, রাইচাঁদ বড়াল, বিষণচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক; এবং গায়ক-গায়িকারূপে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া, রাধা রাণী, শৈলদেবী, কে মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, যূথিকা রায়, শচীন দেববর্মণ, আব্বাসউদ্দিন আহমদ, সত্য চৌধুরী, মৃণালকান্তি ঘোষ, জগন্ময় মিত্র, সুপ্রভা সরকার, কে. এল. সায়গল প্রমুখ। এইসব কৃতী সুরকার, সঙ্গীতপরিচালক, গায়ক-গায়িকা ও গীতিকারের অবদানে আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ রচিত হয়। এঁদের কর্মের পশ্চাৎপট তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিপুল সঙ্গীতরচনা। তবে এই ঐতিহ্যকে অসাধারণ সৃজনশীলতার সঙ্গে এঁরা নব নবভাবে ব্যবহার করেন এবং সারা ভারতবর্ষের আধুনিক সঙ্গীতপ্রয়াসকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। বলতে গেলে পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত জনপ্রিয় ফিল্ম ও রেকর্ডসঙ্গীত এবং আধুনিক সঙ্গীতকলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই ছিল সূত্রপাত। গণনাট্য আন্দোলনের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের একালের গোটা রোমান্টিক সঙ্গীতসাধনা এই ঐতিহ্যের অনুবর্তী।

১৯৪৩ সালের গণনাট্য আন্দোলন বাংলা গান এবং বৃহত্তর অর্থে বাঙালির যাবতীয় সৃজনশীল প্রয়াসের ব্যাপারে একটি অত্যন্ত প্রভাবক ঘটনা। এই আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে গণসঙ্গীত আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানিয়েছেন :

> ত্রিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে International Column-এ রালফ ফকস, কডওয়েল, লরকার মতো শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রগতিবাদী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নতুন দায়বদ্ধতার প্রেরণা জাগিয়েছিলো। সেই প্রেরণাতেই ১৯৩৫ সালে জন্ম নিয়েছিলো প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সর্বভারতীয় কৃষকসভা। লাল ঝাণ্ডার নীচে সংঘবদ্ধ কৃষকশ্রেণী ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থায় কৃষিবিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে নবসংস্কৃতি আন্দোলনের পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছিলো।
>
> ১৯৩৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনের প্যান্ডালে প্রেমচন্দকে প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পটভূমিতেই প্রগতি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার, কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার দায়িত্ব এসে গেলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় '৩৯ সালে। '৪১ সালে হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। তখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্টরা, গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়। প্রগতি লেখক-শল্পী সংঘ থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশের কারণ ছিলো। লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক জনতার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। সুতরাং গণনাট্য সংঘের আলাদা সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিলো।[২৬]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় বুলেটিনে এর কর্মাদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> নাটকে, সঙ্গীতে, নৃত্যে এ যাবৎ রূপায়িত প্রগতিশীল ভাবনাবলীকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সুসংহত ও শক্তিশালী করে তুলবে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শিল্পকলাকে স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচার এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য জনগণ যে সংগ্রাম করছেন তার প্রকাশমাধ্যম ও সংগঠনমাধ্যমরূপে গড়ে তোলা। গণনাট্য সংঘ সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংরক্ষা এবং জনগণকে তাদের সমস্যাবলীর কারণ ও সমাধান সম্পর্কে অবহিত করবে। সংঘ একত্ববোধ এবং সুন্দর ও ন্যায়ানুগ বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে দ্রুত সচেতন করে তুলবে।[২৭]

জনগণকে এই লক্ষ্যে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠলো গান—সমাজ পরিবর্তনের গান, শোষণমুক্ত সমাজ রচনার গান, মেহনতি মানুষের উত্থান ও বিজয়ের গান। গণনাট্য সঙ্ঘের স্কোয়াডগুলো কৃষক-শ্রমিক- মেহনতী মানুষের মধ্যে এই

---

২৬. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া,* (কলকাতা ১৯৯০), ৭৯।

২৭. সুধী প্রধান, *সংস্কৃতির প্রগতি,* (কলকাতা ১৩৮৯), ১৯৯।

গান গেয়ে বেড়াতে থাকলো। বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীর মতো সঙ্গীতকাররা এগিয়ে এলেন সমাজ পরিবর্তনের গান রচনা করতে। প্রথমদিকে এই গানের কোন নাম ছিল না। পরে এর পরিচয় হলো গণসঙ্গীত নামে। সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জনে শোষিত মেহনতি মানুষকে অনুপ্রাণিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রেরণায় এই প্রথম বাঙালি গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকারা এগিয়ে এলেন। শোষিত শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও শান্তির আকাঙ্ক্ষাও এই গানে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। দেশাত্মবোধক বাংলা গানে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা গানের রূপ এমনই। একদিকে বহু শাখায়িত রোমান্টিক আধুনিক গান, অপরদিকে গণসঙ্গীতসহ নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গান। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানসহ প্রচলিত সঙ্গীতও ছিল।

ভারতবিভাগোত্তরকালে কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের যে বিকাশ, তার মুখ্য প্রবাহটিকে রোমান্টিক আধুনিক গান হিসেবে অভিহিত করা যায়। চলচ্চিত্র, বেতার ও রেকর্ড কোম্পানির প্রয়াসের পটভূমিতে এই গীতধারার স্ফূর্তি। পূর্ববর্তী গীতিকার ও সুরকারদের সঙ্গে এসে আসন পাতলেন নতুন কিছু গীতিকবি ও সুরকার। প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পীদেরও আবির্ভাব ঘটলো। এলেন মোহিনী চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গীতিকার এবং অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, দিলীপ সরকার, সুধীন দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুরকার। হীরেন বসু ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো অগ্রজ গীতিকার-সুরকাররাও নিজেদের যুক্ত রাখলেন এই প্রয়াসের সঙ্গে। এঁদের মিলিত প্রয়াসে আধুনিক রোমান্টিক বাংলা গানের মনোরম উচ্ছ্বাস ঘটে এবং নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সেই ধারাটিই আজ অনুসৃত হচ্ছে। তবে পশ্চিম বাংলায় আধুনিক সঙ্গীতকলার পরিস্থিতি বর্তমানে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে স্পষ্ট অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একসময় যে কলকাতা সারা ভারতবর্ষের আধুনিক সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক ছিল, সেখানেও পরম্পরাগত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের পথ পরিত্যাগ করে অতি লঘু পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও হিন্দি ফিল্মের গানের অনুকরণ করতে দেখা যাচ্ছে। আধুনিক বাংলা গানের যে উজ্জ্বল যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতে, নানা ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও তা ষাটের দশকের শেষদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু এর পর থেকেই সেই সমৃদ্ধ সঙ্গীতপ্রবাহে ভাটা পড়ে এবং গভীর সৃজনশীলতার পরিবর্তে ক্রমেই অনুকরণবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। অন্তত সত্তরের দশকে এসে সেসব লক্ষণই প্রকট হয়ে উঠে।

রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের যে বিকাশ, তার দুটি প্রধান স্রোতোধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটি রোমান্টিক

প্রেমের গানের এবং অপরটি দেশাত্মবোধক গানের। কিন্তু এই বিষয়ে কিছু বলার আগে একটি কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে যে, ঢাকাকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শুরুর দিনগুলোয় তীব্র বেগ পেতে হয়। কেননা এত বড় একটা ভূমিকা পালনের পূর্বপ্রস্তুতি ঢাকার ছিল না। পরন্তু তখন সেখানে চলছিল এক দারুণ সাঙ্গীতিক শূন্যতা। ভারতবর্ষ তথা বাংলা বিভাগের পরিণামে পূর্ব বাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দুর ভারতে চলে যাবার পরিপ্রেক্ষিতেই এই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চা প্রধানত হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজে সঙ্গীতচর্চা তখনো উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবিষ্ট হয় নি, আবছাভাবে একটা প্রারম্ভের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মাত্র। আবদুল আহাদ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *আসা যাওয়ার পথের ধারে*-তে এই শূন্যতা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। আবদুল আহাদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশিক্ষক হিসেবে কলকাতায় খ্যাতি অর্জন করেন। বিভাগোত্তরকালে অনেক বাঙালি মুসলিম সঙ্গীতগুণীর মতো তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে যোগ দেন। পূর্ব বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতির সেবায় আবদুল আহাদ নানাভাবে কাজ করেন। তবে তাঁর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সুরকার হিসেবে, আধুনিক ও দেশাত্মবোধক উভয় শ্রেণীর গানেরই সুরকার হিসেবে তিনি অতি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। শুরুর দিককার সাঙ্গীতিক শূন্যতা পূরণে তিনি অগ্রণীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল আহাদ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থে যাঁরা সেই ভারতবিভাগপরবর্তী শূন্যতা মোচনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সাঙ্গীতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টান্তেই ধীরে ধীরে বাংলাদেশে একটি সঙ্গীত-সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠে এবং ক্রমে এই শূন্যতা বিমোচিত হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আব্বাসউদ্দিন আহমদের কথা। তিনি ছিলেন জননন্দিত গায়ক। কলকাতা থেকে তিনিও ঢাকায় চলে আসেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই। বহুমুখী গায়নপ্রতিভার অধিকারী এই গুণী শুধু গায়করূপে নয়, সঙ্গীতসংগঠক হিসেবেও সেই শূন্যতার যুগটিকে কাটিয়ে উঠার ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিমল রায়, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আফসারী খানম, অঞ্জলি রায়, শাহজাহান হাফিজ, সুলতান আলম, আবদুল হালিম চৌধুরী, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ প্রমুখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আবদুল আহাদ, যাঁরা গায়করূপে এবং যাঁদের কেউ কেউ গীতিকার, সুরকার ও গায়করূপে '৪৭-পরবর্তীকালে এদেশে সঙ্গীত-সংস্কৃতির সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এর আগে আধুনিক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতপ্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। '৪৭-পরবর্তীকালে ঢাকায় আধুনিক গানের বিকাশের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। চলচ্চিত্র ও রেকর্ড কোম্পানির মতো পৃষ্ঠপোষক সংস্থা ছিল না। বেতারের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল

অপ্রতুল। ক্রমে বেতারের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়, ষাটের দশকের প্রথমদিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা মেলে এবং এই দশকের শেষেরদিক থেকে টেলিভিশনও আধুনিক গানের বিশিষ্ট প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে রেকর্ড কোম্পানির কোন কার্যকর সেবা এখানে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। প্রথমত, ঢাকা বেতারকেন্দ্র এবং পরে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলায় আধুনিক গানের বিকাশ। সিকানদার আবু জাফর, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখের মতো গীতিকার ও আবদুল আহাদ, সমর দাস প্রমুখের মতো সুরকারের স্মরণীয় অবদানে পূর্ব বাংলায় আধুনিক বাংলা গানের একটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তি গড়ে উঠে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতির আরো প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় স্পন্দন অনুভব করা যায় দেশাত্মবোধক গানের প্রবাহে। একথাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশাত্মবোধক গান এক ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে জন্মলাভ করে। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে এই সংঘর্ষের প্রেরণা। এখানকার সমাজমানসে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একেবারে সূচনায়ই দানা বাঁধতে শুরু করে।

এই যে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই দীর্ঘ সংঘর্ষ, এর প্রেরণায় বহু গান রচনা করা হয়েছে। পূর্বপ্রচলিত গানের সঙ্গে এই নবরচিত সঙ্গীতাবলীও পরম আদরে গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গণজাগরণী গানের সাথে সাথে গাওয়া হয়েছে পূর্ব বাংলায় রচিত গণসঙ্গীত। গণনাট্যের কর্মীদের সাথে পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের গণসঙ্গীত কর্মীরাও যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মুক্তাবিন্দুর মতো স্বদেশসঙ্গীত পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণাকে আরো গভীর এবং আরো সংক্রামক করে তুলেছে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা রবীন্দ্রনাথের গানে এক দৃঢ় নোঙর খুঁজে পায় যখন রাজনৈতিক আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের দিকে। তখন দেশাত্মবোধক গানও রচিত হতে থাকলো প্রচুর পরিমাণে। সমগ্র বাংলাদেশে স্বদেশসঙ্গীত রচনার এক প্রেরণা সঞ্চারিত হলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর দেশাত্মবোধক বাংলা গান রচনার যে ধারাটি স্তিমিত হয়ে এসেছিল, নজরুলের রচনায় তা আবার বেগবান হয়ে উঠে। নজরুল ভিন্নতর সঙ্গীতে নিবিষ্ট হলে তাতে আবার মন্দা দেখা দেয়। গণনাট্য আন্দোলনে এসে আবার এক ধরনের দেশাত্মবোধক গান রচনায় উৎসাহ জাগে। কিন্তু সে ধারাটি গড়ে উঠতে না উঠতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী এবং শেষের দিকে স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পটভূমিতে বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে থাকে এবং তাতে আবহমান সকল বিষয়ই স্থান পায়। একে বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এই সময়ে রচিত গানগুলোর মধ্যে দুটি গানের উল্লেখ বিশেষভাবে

করতে হয়। দুটি গানই পূর্ব বাংলার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে অতি উল্লেখযোগ্য স্তম্ভবিশেষ। একটি গান ১৯৫২ সালে রচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গান : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং অপর গানটি ১৯৭১ সালে রচিত মুক্তিযুদ্ধের গান : 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। প্রথম গানটির বাণী রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী, সুরকার আলতাফ মাহমুদ। দ্বিতীয় গানটির বাণী রচয়িতা গাজী মাযহারুল আনোয়ার, সুরকার আনোয়ার পারভেজ। এ দুটি গানের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের ও তৎপরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মস্পন্দনকে অনুভব করা যায়।

১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে বাংলাদেশের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে নির্মাণ করেছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকারের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরকার হিসেবে এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল আহাদ, সমর দাস, খাদেম হোসেন খান, মীর কাশেম খান, আবেদ হোসেন খান, আবু বকর খান, মসিহ উল আলম, ধীর আলী, মনসুর আলী, রাজা হোসেন খান, সুধীন দাশ, রবীন ঘোষ, খান আতাউর রহমান, সুবল দাস, সত্য সাহা, প্রাণেশ দাস, সাধন সরকার, খন্দকার নূরুল আলম প্রমুখ। গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন সিকানদার আবু জাফর, ফররুখ আহমদ, সাইয়েদ সিদ্দিকী, আহসান হাবীব, মাসুদ করীম, আজীজুর রহমান, আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, খান আতাউর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাজী মাযহারুল আনোয়ার প্রমুখ।

নাটক ও নাট্যকলা

সৈয়দ জামিল আহমেদ*

উৎপত্তির একদম গোড়া থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত কালপরিধির মধ্যে বাংলায় নাটক ও নাট্যকলা কিভাবে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এর সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। এই দুরূহ কাজে আমরা যথাসাধ্য তুলে ধরার উদ্যোগ নেবো সেসমস্ত লভ্য অভিনয়-উপাচার, যাকে নির্দেশ করা চলে যেকোন ত্রিমাত্রিক পরিবেশে দু'দল মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই জীবন্ত উপস্থাপনা হিসেবে; এবং যা "পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে চারপাশের সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের বেঁচে থাকার যৌথপ্রচেষ্টা দ্বারা।"[১] উল্লিখিত এই উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ও একটি লিখিত পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত, অথবা হতে পারে পুরোপুরি তাৎক্ষণিক ও মুখে মুখে প্রচারিত এবং এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকতে পারে এদের অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। আমরা আলোচনার সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে নাট্যকলার এক বিশেষ প্রকরণ হিসেবে এরপর থেকে পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামোসম্পন্ন লিখিত 'পাঠ' (written text)-কে 'নাটক' (drama) নামে অভিহিত করবো।

অধিকাংশ পণ্ডিতজন যে মত সমর্থন করেছেন তা হলো, ঔপনিবেশিক শাসনের মিথস্ক্রিয়ার ফল হিসেবেই উনিশ শতকে বাংলায় নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে। বর্তমান অধ্যায়ে এর বিপরীতে প্রমাণ উত্থাপন করা হবে যে, গুটিকতক শহুরে অভিজাতের হাতে নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও বৃটিশ শাসনের বহুশত বছর আগে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়। বিবর্তনের এই জটিল ধারাবাহিক

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Ngugi Wa Thiongo, *Homecoming*, (London 1972), 2.

প্রক্রিয়াটি, যা ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশপরবর্তী নাট্যকলা আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই বাংলার জনগণের দ্বারা সৃষ্ট নাট্যকলার অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে। তাই এই পর্বের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণকে আলাদা দুটি বিস্তৃত পটভূমিতে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো : (ক) বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য, এবং (খ) উপনিবেশ প্রভাবিত নাট্যকলা ও ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ।

ক. বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য

বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রীতি-পদ্ধতি-কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। নিম্নোক্তভাবে আমরা সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি : ১. সংস্কৃত নাটক-রচনা সূত্র ও এর অনুসিদ্ধান্তসমূহ; ২. কথানাট্য; ৩. নাটগীত; ৪. জনগণের রসবোধ; ৫. মিশ্রনাট্য এবং ৬. পুতুলনাচ।

১. *সংস্কৃত নাটক-রচনা সূত্র ও এর অনুসিদ্ধান্তসমূহ*

এযাবৎ প্রাপ্ত সকল তথ্য ও নমুনা বিচারে বস্তুত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলা কখনো আর্য সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করে চলে নি। এই মতের সমর্থন মেলে *নাট্যশাস্ত্র* (১৪/৪৩-৪৬)[২] নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে। খৃস্টজন্মের দুশ' বছর আগে ভরতমুনি রচিত এই গ্রন্থে বাংলায় প্রচলিত নাট্যধারা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা 'ওড্র-মাগধী' রীতি অনুসরণ করে এবং আবেগদীপ্ত উত্তেজক সংলাপ ও অলঙ্কারবহুল শব্দ ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্য-ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই, যেমন বিশ্বনাথ (*সাহিত্যদর্পণে*), ধনিকা (*দশরূপার অবলোকে*), সারদা তানাইয়া (*ভাবপ্রকাশনে*) প্রমুখ ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত দশটি প্রধান নাট্যধারার অতিরিক্ত 'উপরূপক' নামক এক ধরনের ক্ষুদ্র নাট্যগুচ্ছের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব অপ্রধান নাট্যগুচ্ছ তথা 'উপরূপক' ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূলধারাবহির্ভূত হলেও জনগণের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে তা পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং বেশ গুরুত্ব লাভ করে। আচার্য অভিনব তাঁর *অভিনবভারতী* গ্রন্থে উপরূপককে 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ' নামক এমন এক ধরনের নাট্যাভিনয়ের শ্রেণীভুক্ত করেছেন, যা সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে মঞ্চস্থ হওয়ার বিষয়টির উপর জোর দেয়।[৩] এখানে এর কয়েকটি প্রকরণের নামোল্লেখ করা যায়, যেমন 'কাব্য' (এক রকম অনুকরণমূলক নাচ এবং গান ও নাচের

---

২. Bharatmuni. *Natyasastra* : *A Treatise on Hindu Natyakala and Histrionics*, trans. Manmohan Ghosh, (Calcutta 1967), XIV, 43-46, 248.

৩. G. H. Tarlekar, *Studies in the Natyasastra*, (Delhi 1976), 41.

যৌথ প্রদর্শনী), 'চিত্ররাগ কাব্য' (বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সহযোগে গঠিত)[৪] , 'রাসক' (এক ধরনের নৃত্য, যার একাংশ গীতিনৃত্যের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়) এবং 'ভানি' (এক রকম গীতিনৃত্য)[৫] এ সবগুলোই স্পষ্টত বাংলার 'কথানাট্য ও নাটগীত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেখানে নাচ ও গানের রয়েছে প্রধান ভূমিকা। আমরা পরে দেখবো সঙ্গীত এবং নৃত্য কিভাবে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক উপাদানরূপে ভূমিকা পালন করে এসেছে। অধিকন্তু, ভানার 'রূপক' নামে *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত আদিতে জনপ্রিয়, স্বগতোক্তিমূলক ও একক অভিনেতা দ্বারা অভিনীত যে নাটক, তাও বৈশিষ্ট্যবিচারে বাংলার কথানাট্যের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া *নাট্যশাস্ত্রে* দুই অথবা তিন জন অভিনেতা কর্তৃক সম্পাদিত 'বীথি' নামক আরো যে এক ধরনের একাঙ্কিকার সন্ধান পাওয়া যায়,তার সাথেও বাংলার 'নাটগীত' রীতির নাট্যাভিনয়ের অনেকাংশে মিল রয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের শাসনামলে (৭৫০-১১৬২ খৃ.) জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত সাগর নন্দী রচিত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ বর্তমানে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। গ্রন্থটির নাম *নাটকলক্ষণরত্নকোষ* এবং এটি দশম শতকের শেষদিকে অথবা একাদশ শতকের প্রথমদিকে কোন এক সময় রচিত হয়ে থাকবে। সাগর নন্দী কয়েক ধরনের সংস্কৃত নাটকের একটি তালিকা প্রস্তুত করে গেছেন; যদি শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের ধারণা সঠিক হয়, তবে সেগুলো অবশ্যই রামকাহিনী[৬] অবলম্বনে রচিত বাংলা গান ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া নাট্যতত্ত্বের উপর রচিত এই গ্রন্থটির অস্তিত্ব দ্বারা নিশ্চিত করে অন্য কিছু বলা সম্ভব না হলেও এটা ধারণা করা যায় যে, তখনও সাহিত্যকর্মের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং সম্ভবত তা পাল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

বেশ নিকট-অতীতে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যকর্মের মধ্যে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* উল্লেখযোগ্য। জয়দেব বারো শতকের শেষদিকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। *গীতগোবিন্দকে* বিভিন্নভাবে 'চিত্ররাগকাব্য' এবং 'নাটগীত'[৭] শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলফন্‌সো-কার্কালা *গীতগোবিন্দকে* ('কৃষ্ণ বিষয়ক গান') যাত্রাগানের বাচনাংশের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য একটি একক ঐকতানের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।[৮] এসব পণ্ডিতজনের নিরীক্ষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে *গীতগোবিন্দের* অভ্যন্তরে গান ও নাচের বিপুল ভূমিকাকে স্বীকৃতিদান এবং

---

৪. ঐ, 42.
৫. Avaloka on *Dasharupaka*, Quoted by Surendra Nath Shastri in *Laws and Practice of Sanskrit Drama*, Vol. I, (Varanasi 1961), 145-146.
৬. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৯১), ৪০৮।
৭. Tarlekar, *Natyasastra*, 42.
৮. John B. Alphonso-Karkala (ed.), *An Anthology of Indian Literature*, (Harmondsworth 1871), 503.

এতে চরিত্রায়ণের বিষয়টিকে (তিনটি চরিত্রের) গ্রহণ করে নেয়া। জয়দেব 'জনপ্রিয়' ও 'অভিজাত' এই দুয়ের মাঝে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে থাকবেন, এটাই সম্ভবপর। তিনি সেসময়ে প্রচলিত জনপ্রিয় রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানকে 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ উপরূপক' নামক সংস্কৃত ধ্রুপদ ঐতিহ্যের গঠনকাঠামোর মধ্যে একত্রিত করে পরিবেশন করেন এবং এমন একটি ধারা নির্মাণ করে যান, যা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে অনুসৃত হয়েছে। পরে আমরা দেখবো, এহেন সংস্কৃত ঐতিহ্যচর্চা উনিশ শতকেও বৈষ্ণব ও অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ধারার চর্চা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর রূপলাভ করে এবং পরবর্তীকালে বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী *গীতগোবিন্দের* কাহিনী অবলম্বনে তাদের মাতৃভাষায় (বাংলায়) রচিত 'নাটগীত' ধাচের এক জনপ্রিয় নাট্যরীতির প্রচলন ঘটায়।

তেরো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় তুর্কী বিজয় অভিযানের ফলে রাজসভাকেন্দ্রিক অভিজাত সংস্কৃত ঐতিহ্যচর্চা এক বিরাট ধাক্কা খায় এবং এর বিকাশ গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সাহিত্যবিশারদগণ পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজা শাসিত মিথিলা ও নেপালে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেন। ফলে এই শিল্পচর্চা চৌদ্দ শতকের শেষে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাংলায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সালতানাত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত আর নতুন করে বঙ্গীয় মুসলিম রাজসভায় স্থানলাভ করতে পারে নি। ফলে বাংলায় সংস্কৃতচর্চার ধারা দিন দিন ক্ষয়িষ্ণুতার পথে ধাবিত হয়।

নেপালী রাজসভার কবিগণ কিন্তু বারো শতক থেকেই সংস্কৃত ভাষায় নাটকের মূলপাঠ লিখে আসছিলেন। এসবের অধিকাংশই রামকাহিনী বিষয়ক এবং এতে সঙ্গীতাধিক্যের দরুন তা 'চিত্ররাগকাব্য' শ্রেণীভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।[৯] *গীতগোবিন্দের* এই ধারা মিথিলার রাজানুকূল্য লাভ করে এবং উমাপতি উপাধ্যায়ের সংস্কৃত ভাষায় রচিত *পারিজাতহরণ*-এর (১৩২৪ খৃ.) মাধ্যমে আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়। এটি সঙ্গীতের সাহায্যে পদ আকারে পরিবেশন করা হতো এবং এর কৃষ্ণ বিষয়ক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পেতো বাদ্যযন্ত্রের সুললিত সুরমূর্ছনায়। মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি বিদ্যাপতিও (১৩২৪-১৪৭৫ খৃ.) এই ধারায় তাঁর *গোরক্ষবিজয়* (১৪০৩ খৃ.) রচনা করেন এবং অবধারিতভাবে মিথিলার রাজানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল। *গোরক্ষবিজয়* বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এটি বাংলাসহ চারটি ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র নাটক, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নাথ সিদ্ধাচার্যগণ (এঁরা বাংলার প্রাচীন কবি ও সাধক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধধর্মের একটি শাখার প্রচার ও প্রতিনিধিত্ব করতেন। এঁদের প্রায় সকলেই বাঙালি

---

৯. সুকুমার সেন, *নাট নাট্য নাটক*, (কলকাতা ১৩৭২ বা. স.), ৭৬-৭৭। এগুলোকে সেন চিহ্নিত করেছেন 'সঙ্গীত নাটক' হিসেবে।

ছিলেন)। নাটকটির আখ্যানভাগের অভ্যন্তরে আরেকটি উপনাটক আছে, যা গোরক্ষনাথ কর্তৃক মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে অভিনীত হয়।

যাহোক, ষোড়শ শতকের সমগ্র বাংলাদেশ যে আন্দোলনটির দ্বারা প্লাবিত হয়, তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩০ খৃ.) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন। এই আন্দোলন বাংলার সমাজব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এটি ছিল সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ, পীড়নমূলক হিন্দু বর্ণপ্রথা এবং বহিরাগত তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদস্বরূপ। চৈতন্যের বৈষ্ণববাদের ভিত্তি ছিল এই উদ্দীপনাময় সাধারণ বিশ্বাস যে, প্রেমই ঈশ্বর এবং এই মতবাদ জনসাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী উভয় অংশেরই বিপুল সমর্থনলাভে সক্ষম হয়। শ্রীচৈতন্যের শিষ্যগণ সাফল্যজনকভাবে স্থানীয় নাট্যকলার কাঠামো উন্নয়নের পর সংস্কৃত ভাষা ও ঐতিহ্য অবলম্বনে এবং অভিজাত শ্রেণীর আনুকূল্যে ব্যাপকহারে নাট্যপাঠ রচনা শুরু করেন। এ বিষয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করবো, কিন্তু এটা ঠিক যে, তা সত্ত্বেও তাঁরা জনপ্রিয় নাট্যকলার ঐতিহ্য এবং *গীতগোবিন্দের* প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের একজন শিষ্য রামানন্দ রায় উড়িষ্যার রাজা গজপতির রাজসভায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সংস্কৃত নাট্যপাঠ *জগন্নাথবল্লভ* (পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট এবং অষ্টচরিত্র সমন্বিত) রচনা করেন।[১০] যদিও *জগন্নাথবল্লভ* 'চিত্ররাগকাব্য' শ্রেণীভুক্ত ও *গীতগোবিন্দ* দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত, তবুও এর পূর্ববর্তী রচনাগুলোব সঙ্গে এটি অসদৃশ এর গদ্যে রচিত সংক্ষিপ্ত সংলাপের জন্য। ১৫৪২ সনে পরমানন্দ দাস (কবি কর্ণপুর, ১৫১৪) সংস্কৃত ভাষায় দশাঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক রচনা করেন চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে এবং এর নাম দেন *চৈতন্য চন্দ্রোদয়*।[১১] দৈবেকীনন্দন সিংহের সংস্কৃতে রচিত *গোপীনাথ বিজয়* এখন হারিয়ে গেছে।[১২] গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৬-১৬১৩) কর্তৃক সম্ভবত সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় *সঙ্গীত মাধব* নামক যে নাট্যপাঠটি এসময়ে বাংলার কোন এক স্থানে রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়—তাও আজ কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[১৩] তবে এসবের মধ্যে 'যাত্রা' নাট্যরীতির ক্রমবিকাশে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এবং আজও অস্তিত্বশীল তিনটি কৃষ্ণবিষয়ক সংস্কৃত নাট্যপাঠ হচ্ছে রূপ গোস্বামী বিরচিত সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট *বিদগ্ধ মাধব* (১৫২৪), দশাঙ্কবিশিষ্ট *ললিত মাধব* (১৫২৯) এবং একাঙ্কিকা *দক্কেলী কৌমুদী* (১৫৪৯)। *দক্কেলী কৌমুদী* এমন একগুচ্ছ চরিত্র সমবায়ে গঠিত, যারা নিজেরা গান করে এবং গদ্যভাষায় কথা বলে। তাছাড়া এর প্রদর্শনীতে নৃত্যের আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১৪]

---

১০. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৩৩৭-৩৮।
১১. ঐ, ১৫৯-৬১।
১২. ঐ, ৩৮০।
১৩. ঐ, ৪০৯।
১৪. ঐ, ৯৫ এবং ১৩৯।

জগন্নাথবল্লভ ষোড়শ শতকের কোন এক সময় লোচন দাস কর্তৃক সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।[১৫] *বিদগ্ধ মাধব* ১৬০৭ সনে যদুনন্দন দাস কর্তৃক *রাধাকৃষ্ণলীলা রসকদম্ব* নামে অনূদিত হয়েছিল।[১৬] সতেরো শতকে অকিঞ্চন দাসও *জগন্নাথবল্লভ* অনুবাদ করেন।[১৭]

এসব ছাড়াও চৈতন্যদেবের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ, যেমন বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত* এবং আরো অগণিত কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা ও গান জনসাধারণের মাঝে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সতেরো শতকে এসবেরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় 'কৃষ্ণযাত্রা' বাংলার প্রধান নাট্যধারাসমূহের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সতেরো শতক থেকে নেপালী রাজদরবারে রচিত বেশ কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপি এখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এগুলোর রচয়িতাদের মধ্যে রাজকবি রামভদ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ললিতপুরের রাজা সিধিনার সিংহ মাল্লার পৃষ্ঠপোষকতায় (মৃ. ১৬৫৭) সংস্কৃত এবং মৈথিলী-ব্রজবুলি-বাংলার মিশ্র উপভাষায় *হরিশ্চন্দ্র নৃত্য* রচনা করেন। একই রাজসভায় জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক *গোপীচন্দ্র নাটক* নামে আরেকটি নাট্যপাঠ রচিত হয়, যার অধিকাংশ সংলাপ, গান ও কবিতার ভাষা ছিল বাংলা। ১৬৬৫ সনে রচিত রামভদ্রের আরেকটি নাটক সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, সিধিনার সিংহ মাল্লার পুত্র রাজা শ্রীনিবাস মাল্লার উৎসাহে তিনি নাটকটি রচনা করেন এবং এর নাম দেন *ললিতকুবলয়াস্ব মদালসাহরণোপাখ্যান শিবমহিমা নাটক*। নেপাল ও এর পার্শ্ববর্তী রাজ্য ভাটখাঁও থেকে যে তিনটি নাট্যপাঠ উদ্ধার করা গেছে তন্মধ্যে দুটোর রচয়িতা হলেন বানসামনি ওঝা। একটির নাম *মুদিত কুবলয়াস্ব* নাটক (১৬২৮) এবং অপরটি *হরগৌরী বিবাহ নাটক* (১৬২৯)। ভাটখাঁওরাজ জয়জগজ্যোতি মাল্লা *কুঞ্জবিহারী নাটক*[১৮] নামের আরো একটি নাট্যপাঠ রচনার ক্ষেত্রে পালন করেন প্রশংসনীয় ভূমিকা। যাহোক, উল্লিখিত নাটকসমূহ আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এগুলো এই অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক ধ্রুপদী নাট্য ঐতিহ্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। এসময়ে মুসলিম শাসকবর্গের আনুকূল্য ছাড়া ধ্রুপদী দরবারি নাট্যকলা যে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মাধ্যমেই অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু সামন্ত ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তা আমরা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।

---

১৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, ৪৯। এই একই নাট্যপাঠ সতেরো শতকে সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন অকিঞ্চন দাস।

১৬. ঐ, ৫০।

১৭. ঐ, ৪৯।

১৮. সুকুমার সেন, *নাটক,* ৭৮, ৮৩।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেখা যায়, সতেরো শতকে নেপাল রাজদরবারে অনুশীলিত নাট্যরচনার ধারা বারো শতক থেকে প্রচলিত 'চিত্ররাগকাব্য' নামক নাট্যরীতিকেই সাধারণভাবে অনুসরণ করে এসেছে। এসব নাটকে থাকতো সঙ্গীতের সমারোহ এবং কখনো এতে সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হতো। কিন্তু গোড়ার দিককার নাট্যপাঠ থেকে এগুলোর স্বাতন্ত্র্য এই যে, এতে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সংক্ষিপ্ত গদ্যসংলাপ অধিকহারে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এতে জনপ্রিয় নাট্যকলার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। উপরে যে ছয়টি নাটক সম্পর্কে বলা হলো, এর মধ্যে *গোপীচন্দ্র নাটক* আমাদের কাছে বিপুলভাবে মূল্যবান শুধু এতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার প্রাচুর্যের জন্য। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে, *হরগৌরী বিবাহ নাটক* মৈথিলী ভাষায় রচিত এবং উপরোক্ত ছয়টি নাট্যগুচ্ছের মধ্যে এতে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রভাব সবচেয়ে কম। এসব উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তৎকালে পূর্ব ভারতে (বাংলা, আসাম ও নেপাল) নাট্য রচনার একটি নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছিল।[১৯] এই ধারার নাটকের বিশেষত্ব হলো, এগুলো ছিল চার অঙ্কে বিভক্ত এক একটি ক্ষুদ্র নাটক, যা শুরু হতো সূত্রধর-নটী নামক সংস্কৃত ঐতিহ্যের এক প্রারম্ভিকার দ্বারা। এতে গদ্য-সংলাপগুলো থাকতো সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সংস্কৃত শ্লোক ও গানসমূহ বাংলা ভাষায় পুনঃরচিত হয়ে গীত হতো। *মুদিত কুবলয়াশ্ব নাটকে* এর প্রারম্ভিকা সম্পর্কিত যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার অংশবিশেষ হচ্ছে এই রকম :

> নাটক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে মঞ্চসজ্জা সম্পন্ন হবে। এরপর নাটকের গায়ক (...) ও বাদকদল (...) সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ (...) করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক গান গাইবে। তারপর নান্দীপাঠ হবে। (...) যবনিকা পতনের পর সূত্রধর নান্দীশ্লোক পাঠ করবে (. . .)। নান্দীপাঠের পর সূত্রধর মঞ্চে আভির্ভূত হবে। করব রাগে ও যুতি তালে সে 'গণপতি' শ্লোকটি আবৃত্তি করবে এবং চতুষ্পার্শ্বে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে নৃত্যের তালে তালে গান গাইবে। ... (সূত্রধর বলবে), 'চলো, আমরা আর অহেতুক (অনুষ্ঠানে) বিলম্ব না করি।' সে মঞ্চের পশ্চাৎদিকে ফিরে তাকাবে এবং বলবে, 'প্রিয়ে, এখানে এসো' আর তৎক্ষণাৎ গান গাইতে গাইতে মঞ্চে এসে উপস্থিত হবে নটী।[২০]

বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ আঠারো শতকে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত নাট্যপাঠ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রেমদাস ১৭১২ সনে কবি কর্ণপুরের *চৈতন্য চন্দ্রোদয়* অনুবাদ করেন *চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী* নামে। স্বরূপচরণ গোস্বামী ১৭৮৭-৮৮ সনে অনুবাদ করেন রূপ গোস্বামীর *ললিত মাধব নাটক* এবং এর নাম দেন *প্রেমকদম্ব*। একই শতকে গোপাল দাস

১৯. ঐ, ৭৬-৯৪।

২০. প্রাগুক্ত, ৮৫।

ও পরাণ দাস নামক দুজন বৈষ্ণব সাধু রামানন্দ রায়ের *জগন্নাথবল্লভ নাটক* পৃথকভাবে অনুবাদ করেন।[২১] অনুবাদকর্ম ছাড়া এসময়ে মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। এই শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়েই ভারতচন্দ্র রচনা করেন *চণ্ডী নাটক*। এই নাট্যপাঠটি অসম্পূর্ণ এবং এতে বাংলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি ও ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের ভূমিকাংশ সংস্কৃত রীতি অনুসরণে রচিত। এতে সূত্রধর আবৃত্তি করে সংস্কৃত ভাষায় ও নটী কথা বলে মিশ্রবাংলা ও প্রাকৃতে। এছাড়া বিদ্যানাথ বাচস্পতি *চিত্রভজনা* নামে মিশ্রভাষার আরেকটি নাট্যপাঠ রচনা করেছিলেন, যা ১৭৭৭-৭৮ সনে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।[২২]

সংস্কৃত নাট্যপাঠ অনুবাদের ঝোঁক উনিশ শতকেও অব্যাহত থাকে, কিন্তু সেসব অনুবাদ বৈষ্ণববাদী কিংবা 'চিত্ররাগকাব্য উপরূপক' জাতীয় ছিল না, বরং এসময়ের অনুবাদগুলি ছিল প্রথাগত সংস্কৃত নাট্যকলার প্রধান স্রোতোবাহী। এসবের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ছিল প্রহসনধর্মী। যেমন, *হাস্যার্ণব* অনূদিত হয়েছিল কবি জগদীশের দ্বারা ১৮২২ সনে এবং *ধূর্তনর্তক* ও *ধূর্তসমাগম*—এই দুই সংস্কৃত প্রহসনও একইভাবে অনূদিত হয়। কৃষ্ণ মিশ্রের ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদয়* অনূদিত হয়েছিল কাশিনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি কর্তৃক *আত্মতত্ত্ব কৌমুদী* নামে। ১৮২৮ সনে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার অনুবাদ করেন গোপীনাথের *কৌতুকসর্বস্ব* নাটক। *শকুন্তলা* অনূদিত হয় রামতর্ক ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৮৪৮ সনে, নীলমনি পাল কর্তৃক *রত্নাবলী* অনূদিত হয় ১৮৪৯ সনে এবং রামগতি ন্যায়রত্ন অনুবাদ করেন *মহানাটক* ১৮৫১ সনে।[২৩]

উপরোক্ত অনুবাদ-নাটকসমূহের পর যোগেন্দ্রগুপ্ত রচিত *কীর্তিবিলাস*-ই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে গৌরব ধারণ করে আছে। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫১ সনে এবং বৈশিষ্ট্যবিচারে বাংলা ভাষার প্রথম ট্র্যাজেডিও এটি। *কীর্তিবিলাস* যে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব অনুসরণে লিখিত, তার প্রমাণ এতে নান্দীপাঠের ব্যবহার এবং সূত্রধর ও নটী চরিত্রের উপস্থিতি। নাটকের ভাষা গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত, কিন্তু বিশেষত গদ্যের ঢং কৃত্রিম এবং অতিরঞ্জন ভারাক্রান্ত। ১৮৫২ সনে আমরা পাই তারাচরণ শিকদার রচিত দ্বিতীয় মৌলিক বাংলা নাটক *ভদ্রার্জুন*। এর ভাষা সাবলীল ও সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত। যদিও নাটকটির এক-তৃতীয়াংশ রচিত হয়েছে পদ্যে, তবু এর সাফল্য এখানেই যে, এটি ভবিষ্যতের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য গদ্যভাষার জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়ে যায়।

---

২১. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৩২৫-২৬, ৩৩৭।

২২. সাচ্চানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, (কলকাতা ১৯৭৪), ৩৯৭-৯৮।

২৩. ঐ, ৪০০।

আধুনিক রীতিতে প্রস্তুত মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হবার গৌরব বিবেচনা করলে বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত *কুলীন কুলসর্বস্ব*-কেই চিহ্নিত করতে হয়। এটি ১৮৫৪ সনে রচিত হলেও মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৫৭ সনে জয়রাম বসাকের কলকাতাস্থ বাড়িতে। ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটি মূলত একটি কমেডি এবং তা গদ্য-পদ্য উভয় ভাষারীতিতে নির্মিত। অবশ্য এর গদ্যাংশ সাহিত্যধর্মী ও কৃত্রিম। এতে সংস্কৃত ঐতিহ্যানুগ নান্দীর ব্যবহার এবং সূত্রধর-নটী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি একে সংস্কৃত প্রথাগত নাট্যধারার কাছে ঋণী করে রেখেছে।[২৪] কিন্তু এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের মূলধারার বিরোধিতাও করে যখন আমরা দেখি, সমকালীন সামাজিক সমস্যা, যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয় নাটকটিতে তীক্ষ্ণ সমালোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যাহোক, সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ধারা বাংলায় আরো কিছুকাল ধরে চললেও সমকালীন নাট্যচর্চার বিকাশে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বহীন। এ পর্যায়ে *বেণীসংহার* ও *রত্নাবলী* অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৫৮ সনে, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদ করেন *বিক্রমারবৈশ্য*। কিন্তু এসব অনুবাদপ্রচেষ্টা বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে সাহসী দিকনির্দেশনা দানে ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনতা এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রভাব সমাজদেহে যতোই দৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছিল, সংস্কৃত নাট্যকলার আদর্শ মধ্য-উনিশ শতকী বাঙালি সমাজের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ঠিক ততোখানি অক্ষমতা প্রদর্শন করছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-১৮৭৩) এসময়ের একমাত্র সাহিত্যিক দিকপাল, যিনি এই ক্রান্তিকালে দুই যুগের সেতুবন্ধন হিসেবে আবির্ভূত হন এবং আধুনিক ইউরোপীয় কলাকৌশল প্রয়োগে বাংলা নাটককে সংস্কৃত নাট্যকলার একঘেয়ে প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। আমরা পরে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করবো, তবে এখানে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, এই মধ্য-উনিশ শতক থেকেই প্রকারান্তরে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব এবং এর সিদ্ধান্তসমূহের প্রভাব বাংলা নাট্যকলা থেকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত হতে থাকে। শুধু শাস্ত্রীয় সাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ হয়ে থেকে কিংবা পরোক্ষে স্থানীয় নাট্যকলায় কিছুটা প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শ নবযুগের ঝোড়ো হাওয়ার মাঝে অসহায়ভাবে দুলতে থাকে।

বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরীতিকে প্রভূত পরিমাণে বিকশিত করেছিল, যার একটি হলো 'কথানাট্য' এবং অন্যটি 'নাটগীত'। প্রথাগত সংস্কৃত নাট্যকলার মতো এগুলো কেবল পুনরাবৃত্তিমূলক যান্ত্রিক কলাকৌশল অথবা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে নি, জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্কের মধ্য দিয়েই

---

২৪. প্রাগুক্ত, ৪০১-৬।

এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয় এবং কখনো জনগণই হয়ে দাঁড়াতো এর রচয়িতা ও একনিষ্ঠ সমর্থক। 'কথানাট্য' হলো এমন এক ধরনের প্রদর্শনী, যেখানে একজনমাত্র কুশীলব (গায়েন অথবা কথক) গদ্যে বা পদ্যছন্দে কাহিনী বর্ণনা করে যায়, কখনো নাচে, কিন্তু সকল সময় বিভিন্ন মেজাজের চরিত্রসমূহ অভিনয় করে দেখায়। এসময় পাশে বসে থাকা একদল কোরাস গায়ক (প্রায়ই এদের সংখ্যা হয়ে থাকে চার জন) তাদের কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নিঃসঙ্গ কুশীলবকে সহায়তা করে চলে। অন্যদিকে কথানাট্যের এমনতরো একক বর্ণনামূলক অভিনয়ের তুলনায় নাটগীত রীতিতে কিছু বাড়তি সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। এতে অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি তিনজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটে এবং একটি কোরাসদল বাদ্যযন্ত্র সহকারে কথানাট্যের মতোই তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে চলে। এমনিভাবে স্থানীয় জনপ্রিয় নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধ্রুপদী নাট্যকলা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে বিভিন্ন 'উপরূপক', বিশেষকরে 'নাট্যাত্মকপ্রবন্ধ'গুলো লক্ষ্য করলে। মধ্যযুগের হাতে-লিখা পাণ্ডুলিপিসমূহের প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জা কথানাট্য ও নাটগীত রীতির নাট্যপ্রদর্শনী সম্পর্কে ধারণা গঠনে আমাদের দৃষ্টিকে আরো সম্প্রসারিত করে দেয়।[২৫] তখন এসব নাট্যপ্রদর্শনীর জন্য কোন স্থায়ী সরকারি মঞ্চকাঠামো ছিল না। সাধারণত বাড়ির বহিরাঙ্গন, উপাসনালয়প্রাঙ্গণ, রাজবাড়ির কোন কক্ষ অথবা মেলাউৎসবাদির জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত মাঠই ছিল এসবের অনুষ্ঠানস্থল, যেখানে তিনদিক অথবা চতুর্দিক ঘিরে বিন্যস্ত থাকতো দর্শকের সারি এবং এর মাঝখানে মাটিতে মাদুর বিছানো স্থানে চলতো কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানমালা। এছাড়া দর্শকসংখ্যা আশাতিরিক্ত হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত উঁচু ঢিবি অথবা বাঁশের খুঁটির উপর কাঠের টুকরা স্থাপন দ্বারাও কখনো কিছুটা উন্নত ধরনের মঞ্চ তৈরি করা হতো। কথানাট্য অনুষ্ঠানের সময় যা সচরাচর দর্শকদের দৃষ্টি কাড়তো তা হলো কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবের হস্তস্থিত একজোড়া করতাল ও অগ্রভাগে মিহি আঁশগুচ্ছ শোভিত ছোট্ট একটি ধর্মীয় লাঠি এবং তার পায়ের গোড়ালিসন্ধিতে বাঁধা ঘুঙুর। অবশ্য যদি অনুষ্ঠানের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ না হতো, তবেই কেবল কুশীলবকে এমন সজ্জায় দেখা যেতো।

২. *কথানাট্য*

প্রায় হাজার বছরকাল আগে থেকেই যে বাংলায় কথানাট্য রীতির নাট্যানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তার নমুনা সহজেই উপস্থাপন করা যায়। কপিলা বাৎসায়ন "খৃস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ

---

২৫. "Arts of Bengal : The Heritage of Bangladesh and Eastern India", a brochure published on the occasion of an exhibition organized by the White Chapel Art Gallery, in collaboration with Victoria and Albert Museum, 9 November-30 December 1979, London, 14.

শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল *চর্যা* নামক এমন এক ধরনের গানের" অস্তিত্ব নির্দেশ করেন।[২৬] সাধারণভাবে 'চর্যাপদ' (সঠিক জীবনাচরণ সম্পর্কিত বাণী) নামে পরিচিত এসব গানের পাঠ রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তবে নীতিশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত এই গানগুলির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, চর্যাপদগুলো নবম শতকেরও পূর্বকালের রচনা এবং কমপক্ষে সপ্তম শতক থেকে এসব গান রচিত হতে শুরু করে। 'বুদ্ধ নাটক'-এ (বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক নাটক) এরকম একটি চর্যার ব্যবহার লক্ষণীয় :

> বজ্রাচার্য নৃত্য করছে, দেবী গান গাইছে,
>
> বুদ্ধনাটক সকলেই বুঝতে পারে না।[২৭]

কিছু গবেষক অবশ্য হাজার বছরের পুরনো তিব্বতীয় রেখাচিত্রের অস্তিত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে দেখা যায় 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ' বিপুল সংখ্যক দর্শকের সামনে 'যোগাসনে' বসে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন।[২৮] এই সূত্রটুকু পাওয়ার পর আমাদের পক্ষে এটা ধারণা করা নিরাপদ হবে যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধুগণ জনগণের মধ্যে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্য এমন এক ধরনের নাট্যপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন, যা নাচ, গান এবং শারীরিক কসরৎ তথা যোগাচার সহযোগে প্রদর্শিত হতো।

কথানাট্য রীতির নাট্যপাঠের উপাদান অন্বেষণের জন্য যদি আমরা ইউরোপীয় নাট্যপাঠের ঐতিহ্যের অনুরূপ স্থানীয় নাট্যকলার সংলাপধর্মী উপকরণসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান চালাই, তবে তা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়বে, কারণ কথানাট্য মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর নাট্যপাঠের জন্য অভিনেতাগণ বরাবর নির্ভর করতো একরকম পরিমিত বর্ণনাধর্মী কবিতার উপর। সম্ভবত এসব কবিতা প্রথমাবস্থায় মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হতো এবং তেরো শতকের দিকেই কেবল তা লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে।[২৯] এ ধরনের পরিমিত বর্ণনামূলক কবিতাগুলোর বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বিচার করলে আমরা এগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি :

---

২৬. Kapila Vatsayan *Traditional Indian Theatre : Multiple Streams*, (New Delhi 1980), 138.

২৭. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, (Dhaka 1966), text 17, 54.

২৮. Salim-al-Deen, "Folk Theatre Tradition in Bangladesh : Gram Theatre," brochure published on the occasion of the International Seminar on theatre Journals in Asia, organised by International Theatre Institute, Dhaka, January 17-19, 1991, pages not numbered. .

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলকাতা ১৯৮৯)। ভট্টাচার্য বিশ্বাস করেন যে, তেরো শতকেও মঙ্গলকাব্য অস্তিত্বশীল ছিল (পৃ. ২৭)। তিনি মঙ্গলকাব্যে একধরনের মৌখিক বর্ণনা ও রচনাপদ্ধতির ঐতিহ্য সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক. *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* বর্ণিত আর্যদেবতা ও বীরগণের কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

খ. মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত স্থানীয় অনার্য দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

গ. জঙ্গনামায় বর্ণিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

ঘ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও ময়মনসিহ গীতিকায় দৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনী ভিত্তিক কবিতা।

ক. আর্যদেবতা ও বীরদের কাহিনী কথানাট্যের মাঝে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরীতির উদ্ভব ঘটায় : 'পাঁচালী', 'কথকতা' এবং 'কীর্তন।' কৃত্তিবাস ওঝার (জন্ম ১৩৯৯ খৃ.) *রামায়ণ*, কাশীরাম দাসের (সতেরো শতকের প্রথমদিকে) *মহাভারত*, কবীন্দ্রের (পনেরো শতকের শেষে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে) *ভারতপাঁচালী* এবং *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (১৪৭৩-১৪৮০ খৃ.) হলো মধ্যযুগীয় কবিদের হাতে রচিত অসংখ্য বর্ণনামূলক কাব্যসংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি, যেগুলো পাঁচালী ও কথকতা শ্রেণীর কথানাট্যে নাট্যপাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পাঁচালী আগে যেমন ছিল, এখনও পূর্বোল্লিখিত পাঠবর্ণনা পদ্ধতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে; যদিও এর কিছু পাঠ কোরাস সহযোগেও গাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচালী বর্ণনাকারী তার কাজ বসে বসেই সমাধা করে থাকে, কিন্তু সে এই অবস্থাতেও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারা এবং কণ্ঠস্বরের উঠানামা দ্বারা পাঠে বর্ণিত চরিত্রসমূহ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কপিলা বাৎসায়ন কথিত চর্যাসমূহ নবম শতাব্দীর বাংলায় অস্তিত্বশীল থেকে থাকে, তবে সেসব অবশ্যই পাঁচালী গায়কগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, যার সম্ভাব্য প্রাথমিক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় ত্রয়োদশ শতকে এবং এর বিপুল জনপ্রিয়তা আসে পনেরো শতকে। এই সময় থেকেই প্রথম আমরা পাঁচালীর লিখিত পাঠ হাতে পাই। নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকে এসেই কেবল পাঁচালীতে সংযুক্ত হয় সংলাপরীতি, কিন্তু তা অভিনীত হতে থাকে সেই একজন বর্ণনাকারী দ্বারাই। এসময়ে নতুন সংযোজন হিসেবে আরো আসে 'সঙ' চরিত্রটি। পাঁচালীর মধ্যে গান ও ছড়া আবৃত্তি অথবা নাচের মাধ্যমে সঙ চাইতো নির্দিষ্ট সামাজিক অসঙ্গতিগুলোকে হাস্যকরভাবে অনুকরণ করতে। উনিশ শতকী বাংলার সমসাময়িক সামাজিক বিষয়াদি, যেমন তালাকপ্রাপ্ত রমণীর পুনঃবিবাহ, আয়কর সমস্যা কিংবা প্রতীমাপূজাবিরোধী রাগী ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কিত পাঁচালী খুবই জনপ্রিয় ছিল।[৩০] এমনকি বর্তমানকালেও এই কাঠামোর অনুষ্ঠানমালা গ্রামবাংলায় আগের মতোই দর্শক-শ্রোতাদের চিত্ত বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করতে সমর্থ।

'কথকতা' উৎপত্তিলাভ করে পাঁচালীর পরে (সম্ভবত আঠারো শতকেও এটি অস্তিত্বশীল ছিল)[৩১] এবং পাঁচালীর সাথে এর পার্থক্য মূলত বর্ণনাকারীর ভূমিকা দ্বারা

---

৩০. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা,* (কলকাতা ১৯৭২), ২১০-১২।

৩১. সুকুমার সেন, *ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, ৫০৯।

চিহ্নিত। এতে বর্ণনাকারী কুশীলব গদ্যভাষায় বর্ণনামূলক কবিতাবলী ব্যাখ্যা করে শোনায়, কাহিনীর চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে এবং শুধু বসা অবস্থানে থাকে না বলে চরিত্রচিত্রণে পাঁচালী-রীতির চেয়ে তার শারীরিক সুবিধা বেশি থাকে। যদিও এই নাট্যকাঠামোটি এখন মৃতপ্রায়, তবু গ্রামবাংলায় কোথাও কখনো 'কথকতা'র প্রদর্শনী আজও আমাদের চোখে পড়ে। ষোড়শ শতকে বাংলায় যে ঘোরতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়, সেসময় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুসারীগণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় অখণ্ডতার এক অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিলেন। এই কাজ সার্থকভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁরা বিকশিত করেন এমন কিছু অনুষ্ঠান প্রকরণ, যা মানুষের আত্মিক উৎকর্ষলাভের বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ধারণামতে, ঈশ্বরের নামসমূহের পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ উচ্চারণ মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সান্নিধ্যলাভের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে নিশ্চিত ও দ্রুততম পথ হচ্ছে পরমাত্মার উদ্দেশে সম্মিলিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রেমই হওয়া উচিত সকল প্রকার ধর্মীয় অনুশীলনের মূলকথা।

এইভাবে লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত বিরল ঘটনাসমূহের একটি হিসেবে প্রমোদানুষ্ঠান বৈষ্ণবদের কাছে ধর্মীয় প্রার্থনার সমান মর্যাদা ও গুরুত্বে অধিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্ভাবিত দুটি অভিনয়রীতির একটি হলো কথানাট্যের অন্তর্গত 'কীর্তন'। প্রথমদিকে চৈতন্যের জীবিতাবস্থায় কীর্তন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁরই প্রশংসাগীতি। এটি এমন একদল লোককে নিয়োজিত করে, যারা ভক্তিগদগদ চিত্তে মহাপ্রভুর নাম সমস্বরে ও সমমীড় সহযোগে গেয়ে থাকতো। সতেরো শতকের শুরুতে অনুষ্ঠিত একটি বৈষ্ণব উৎসবে একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক কোরাস সহযোগে গীত হওয়ার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম 'পদাবলী কীর্তন' প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 'কৃষ্ণলীলা' বর্ণনাই ছিল পদাবলী কীর্তনের উদ্দেশ্য। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এটি এমন এক জটিল সঙ্গীতকাঠামোয় রূপান্তর লাভ করে, যা 'মঙ্গলকাব্যের' বিস্তৃতিকেও অতিক্রম করে যায়।[৩২] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমরা একে এই রূপেই দেখি, কিন্তু তারপরই পদাবলী কীর্তন পরিণত হয় 'ধাপ কীর্তনে'। ধাপ কীর্তনে কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবকে আমরা একই সাথে আবৃত্তি, গান, গদ্যবর্ণনা, নৃত্য ইত্যাদি সম্পাদন এবং বর্ণনামূলক অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রচিত্রণে প্রয়াসী হতে দেখি। এখানেও বর্ণনাকারীকে সহায়তা দেয়া হয় সম্মিলিত কোরাসধ্বনি ও বাদ্যবাদন দ্বারা। আমরা দেখতে পাই, এই তিন ধরনের কীর্তন আজো বাংলার গ্রামাঞ্চলে আগের মতোই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ ক'রছে।

---

৩২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৭০-১৭১।

খ. আর্য দেবদেবী ছাড়াও বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে অনার্য দেবী, যেমন মনসা, চণ্ডী, শীতলা ও অনার্য দেবতা ধর্ম, সূর্য, শিব এবং আরো কিছু দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব, যেমন 'সিদ্ধাচার্যগণ' প্রভৃতির প্রতি প্রবল আনুগত্য ও ভক্তিভাব বিদ্যমান ছিল। অনার্য দেবদেবীর প্রতি সম্মান ও প্রশংসাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানাদি প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল— 'মঙ্গলকাব্য' এবং 'নাথগীতিকা'। মঙ্গলকাব্য রচিত হতো শক্তিসাধন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত দেবদেবীগণের প্রশংসা এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান অনার্যচেতনাকে তুলে ধরে। তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে এধরনের বর্ণনামূলক অনুষ্ঠানপাঠ রচনা অব্যাহত থাকে। উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম হওয়া ছাড়াও মঙ্গলকাব্য ছিল এমন এক ধরনের নাট্যপাঠ, যা একটি নিরক্ষর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাববিনিময়ে সক্ষম সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এখানেও একজন বর্ণনাকারী কুশীলব গান ও নাচের দ্বারা কাহিনী বর্ণনা করে যেতো এবং বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে দেখাতো, আর স্বাভাবিকভাবেই তাকে সহায়তা করা হতো একদল কোরাস গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রী দিয়ে।[৩৩] বাড়ির উঠোন, উপাসনালয় কিংবা মেলাচত্বরে প্রদর্শিত হতো মঙ্গলকাব্য অনুষ্ঠানমালা এবং একগুচ্ছ দর্শকশ্রোতা বৃত্তাকারে ঘিরে বসতো প্রদর্শনীস্থলকে। মঙ্গলকাব্য রচনাকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট ছক ছিল। সম্পূর্ণ নাট্যপাঠটি অবিচ্ছিন্ন ষোলটি পর্বে বিভক্ত করে নিবেদন করা হতো, যার আটটি পর্ব অনুষ্ঠিত হতো দিনের বেলায় (দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) এবং বাকি আটটি রাতে (সূর্যাস্তের পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত)। অনবরত চলার পরেও মঙ্গলকাব্যের ষোলটি পর্বের অনুষ্ঠানবৃত্ত সমাপ্ত হতে সাধারণত পুরো আটদিন আটরাত্রি লেগে যেতো। ব্যতিক্রম ছিল কেবল *মনসামঙ্গল* ও *ধর্মমঙ্গল* কাব্য। সর্পদেবী মনসার উদ্দেশে নিবেদিত মনসামঙ্গল অনুষ্ঠান শুধু দিনের বেলা প্রদর্শিত হতো এবং একাদিক্রমে ত্রিশ দিন পর্যন্ত চলতো। আর ধর্মদেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত ধর্মমঙ্গল অনুষ্ঠান চলতো একনাগাড়ে বারো দিন বারো রাত।

মঙ্গলকাব্যকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মধ্যযুগে বাংলার জাতীয় নাট্যকলা হিসেবে। এটি ছিল একাধারে জনপ্রিয় ও অর্থব্যঞ্জনাময় এবং তা শুধু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে নি, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অনুষ্ঠান হিসেবেও মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব আমাদের কাছে অত্যধিক।[৩৪] ষোড়শ শতকে বৈষ্ণববাদের সর্বপ্লাবী তরঙ্গাভিঘাত এই বৃত্তানুষ্ঠানের জয়যাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে নি, বরং এতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে কুলীন ব্রাহ্মণ্যচক্রের কাছে সাধারণ মানুষের এই দাবি যে, তাদের নিজস্ব জীবনদর্শনকেও দিতে হবে যথাযথ স্বীকৃতি। এর ফলে মঙ্গলকাব্যের অভ্যন্তরে নাটকীয়ভাবে মূর্ত হয়ে উঠতো শৈব-শাক্ত বিরোধ।

---

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৮৭-৮৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, ১৪।

মঙ্গলকাব্যগুলো যে-যে দেবীর প্রশংসা কীর্তনার্থে নিবেদিত হতো সে-সে দেবীর নামানুসারেই কাব্যের নামকরণ হতো। একই বিষয়ে একাধিক কবি বন্দনাগীতির পাঠ রচনা করতেন। এভাবে আমরা মনসাদেবীর স্তুতিমূলক কাব্যকে *মনসামঙ্গল*, চণ্ডীদেবীর প্রশংসায় নিবেদিত কাব্যকে *চণ্ডীমঙ্গল*, ধর্মদেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত কাব্যকে *ধর্মমঙ্গলকাব্য* নামে আখ্যায়িত হতে দেখি। আঠারো শতকের পর থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলো এদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও কাঠামো থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। এমনটি হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের ফলে বাংলায় যে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাতে জনসাধারণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অথচ এতকাল গণমানুষের ত্রাতা হিসেবে পূজিত স্থানীয় দেবদেবীগুলো এই দুঃসময়ে নিষ্ক্রিয় থাকার দরুণ জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে স্রেফ অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়।[৩৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলোর গল্প-গাথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকঐতিহ্যের মাঝে স্থান করে নেয় এবং এটাই পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ 'যাত্রা' নাট্যানুষ্ঠানের উদ্ভব ঘটাতে সহায়তা করে। এরই ফলশ্রুতিতে 'চণ্ডীমঙ্গল' রূপান্তরিত হয় 'চণ্ডীযাত্রায়' এবং 'মনসামঙ্গল' রূপলাভ করে 'ভাসানযাত্রার'। ভাসানযাত্রা বাংলার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বিশেষকরে বৃহত্তর বরিশালে আজও বিপুলভাবে জনপ্রিয়।

'নাথ বর্ণনামূলক সাহিত্য' মূলত নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের[৩৬] জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই রচিত হতো, কিন্তু অবশেষে এটি এর নিজস্ব ধর্মীয় চরিত্র হারায় এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের কাছেও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রধানত মৌখিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও সাধারণের দ্বারা সৃষ্ট এসব গীতিকা মঙ্গলকাব্যের মতো বিভিন্ন স্তর বা পর্বে বিভক্ত নয়, বরং সবসময় এগুলো সমাপ্ত হতো এদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের মধ্য দিয়েই। গীতিকাগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গীতিকা ছিল নাথ সিদ্ধাচার্যদের প্রশস্তিমূলক এবং সম্ভবত এগুলোই *বুদ্ধনাটকের* সাথে হারিয়ে যাওয়া অতীতের যোগসূত্র পুনর্নির্মাণ করেছিল। মঙ্গলকাব্যের মতো নাথগীতিকা ভাগ্যবিধাতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির পূজা করে নি, বরং মানবতা ও মানবশক্তির মাহাত্ম্য উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এর প্রদর্শনবৈশিষ্ট্য সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ছিল, তবে যে-একটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল তা হলো, মঙ্গলকাব্য বর্ণনাকারীর মতো নাথগীতি বর্ণনাকারী কুশীলবের হাতে চামর ও পায়ে ঘুঙুর এই দুটি ধর্মীয় প্রতীক শোভা পেতো না। যথারীতি রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান হিসেবেই এগুলো জনসমক্ষে প্রদর্শিত হতো এবং একেকটি ভাববিষয় একের পর এক জুড়ে দিয়ে অনুষ্ঠানে গতিসঞ্চার করা হতো।[৩৭] নাথগীতিকার প্রকৃত

---

৩৫. ঐ, ১০০।

৩৬. বৌদ্ধধর্মের একটি আঞ্চলিক শাখা, যা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মূলধারার সঙ্গে মিশে যায়।

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৯১-৯৭, ১০০।

উদাহরণ হিসেবে ষোড়শ শতকে রচিত *গোরক্ষবিজয়* কাব্যের নাম করা যায়। মধ্যযুগের খ্যাতিমান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ এটি রচনা করেন। অবশ্য একই নামে কবি বিদ্যাপতির নাট্যপাঠ *গোরক্ষবিজয়* গ্রন্থখানি অন্তত পনেরো শতকের আগেও যে এদেশে নাথগীতিকা রচিত হতো সে ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বর্ণনাধর্মী রচনাগুলি ছিল মূলত রানী ময়নামতি ও তাঁর পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ঐতিহাসিক কথাকাহিনীভিত্তিক (যা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামেই সুপরিচিত)। সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত এগুলো এদের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা সচরাচর খুব কম নাট্যপাঠের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে।[৩৮] এই বর্ণনামূলক কাহিনীকাব্যের অবশিষ্ট কিছু অংশ 'মীননাথের গান' ও 'গোরক্ষনাথের গান' নামে আজও উত্তরবঙ্গে (বৃহত্তর রংপুরে) গীত হয়ে থাকে।[৩৯]

গ. কথানাট্যের তৃতীয় ধারাটি গঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর, আধ্যাত্মিক সাধক, মহানবী ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবনকাহিনী অবলম্বনে। মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত এসব পরিমিত বর্ণনামূলক রচনা সাধারণভাবে পুঁথি নামে পরিচিত। বৈশিষ্ট্যবিচারে দেখা যায়, এসব পুঁথির ভাষা বাংলা হলেও তা প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফার্সি শব্দ সহযোগে রচিত। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার, ১৫৭৬ সনে সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর এদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আরবি-ফার্সি ভাষার কদর বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলিম কথাকারগণ রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত এবং মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত এ দুটি ভাষা থেকে শব্দসম্ভার আত্মীকৃত করায় সম্যক উৎসাহী ছিলেন। মুসলিম খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও বীরদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ষোড়শ শতকের এমনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুঁথিগ্রন্থ হলো শেখ ফয়জুল্লাহর *সত্যপীরের পাঁচালী*, দৌলত উজির বাহরাম খানের *জঙ্গনামা*, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, *শবে মেরাজ*, *ওফাতে রসুল* ইত্যাদি। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার উপর রচিত সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথিগ্রন্থ হলো মুহম্মদ খানের *মুকতুল হোসেন* (১৬৪৬)। এই গ্রন্থের আদর্শে এরপর থেকে কারবালা বিষয়ক অসংখ্য পুঁথি রচিত হতে থাকে, যেগুলো সাধারণভাবে 'জঙ্গনামা' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, ইসলামী ঐতিহ্যভিত্তিক পুঁথিসাহিত্য এর পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানকাঠামো থেকেই উদ্ভূত। সুকুমার সেন যুক্তি দেখান, মঙ্গলকাব্য যেভাবে গীত হতো, ইসলামী ভাবধারায় রচিত পুঁথিগুলিও প্রায় অনুরূপভাবেই পাঠ করা হতো।[৪০] সুকুমার সেনের এই মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে, কারণ, শেখ

---

৩৮. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৮৯।

৩৯. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, (ঢাকা ১৯৮২), ২২।

৪০. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৪৭৮।

ফয়জুল্লাহ সত্যপীর কাহিনী অবলম্বনে যে পুঁথিটি লিখেছেন তাকে তিনি 'পাঁচালী' নামেই অভিহিত করেছেন। সুতরাং একথা বলে সমাপ্তি টানা যায় যে, একটি অশিক্ষাপীড়িত সমাজে পুঁথি পাঠ করা হতো প্রায় পাঁচালীর অনুসরণে, এবং অবশ্যই ষোড়শ শতকের পূর্ব থেকে এই রীতি মৌখিকভাবে বিদ্যমান ছিল। আঠারো শতকে 'কথকতার' ধারা বর্ধিত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পুঁথিসাহিত্য এই ধারার অনুষ্ঠানকাঠামোকেও আত্মীকৃত করে নেয় এবং জন্ম দেয় 'গাজীর গান', 'মাদার পীরের গান' ও 'মানিক পীরের গান' যেগুলো আজও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে গীত হয়ে থাকে। 'জঙ্গনামা' অনুষ্ঠানটিও পাঁচালী থেকে কথকতা পর্যন্ত একইভাবে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে অবশেষে 'জারি' (শোকসঙ্গীত) নামে স্থানীয় জনসমাজে প্রভূত খ্যাতিলাভ করে। কোন অজ্ঞাত কারণে এজাতীয় আর সমস্ত পুঁথির চাইতে জারিগান অধিক সাফল্যলাভে সমর্থ হয় এবং কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবের গৎবাধা কর্মকাণ্ডের সাথে 'কোরাস-নৃত্য' যুক্ত করে এটি গঠন করে এর এক অনন্য অনুষ্ঠানকাঠামো। বৃহত্তর ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে জনমনে আজও ব্যাপক প্রভাববিস্তার করে থাকা এই জারিঅনুষ্ঠানে বীরত্বব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী ভাবসমূহের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর কোরাস-নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমবেশি পঁচিশ জন এবং এরা পায়ে ঘুঙুর পরিধান করে আর এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে একেকটি সুদৃশ্য রুমাল। এর নৃত্যাংশটুকু সত্যিই ভারি উদ্দাম ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও অবশ্য জারিগান কোরাস-নৃত্য ছাড়াই পরিবেশিত হয়। এতে প্রায় দশ সদস্যের একদল বাদ্যযন্ত্রী একটি দৃঢ় বৃত্ত রচনা করে আসন গ্রহণ করে এবং বর্ণনাকারীকে কণ্ঠ ও যন্ত্রবাদনের দ্বারা সহায়তা দেয়। বর্ণনাকারী কুশীলব একাই বাদ্যযন্ত্রীদের সৃষ্ট বৃত্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে, গান গায় অথবা আবৃত্তি করে এবং এই শিল্পীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত দর্শক–শ্রোতাগণ আবার আরেকটি বড় বৃত্ত রচনা করে মাটিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকে। গবেষকগণ জারিকে আঠারো শতকের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানরীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪১] সুতরাং এই ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, এই অনুষ্ঠানরীতি সতেরো শতকেও *মুকতুল হোসেন* জাতীয় রচনার মাধ্যমে অস্তিত্বশীল ছিল, এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল বর্ণনামূলক রচনাপাঠের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. খৃস্টীয় পনেরো শতকের গোড়াতেই ধর্মভাবমুক্ত ঐহিক বাণী সম্বলিত 'কথানাট্য' অনুষ্ঠানরীতির চতুর্থ ধারাটির উদ্ভব ঘটে প্রধানত রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত মুসলমান কবিদের মাধ্যমে। তাঁরা পারস্যদেশীয় রচনাসমূহ সরাসরি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেন অথবা সেসবের ছায়া অবলম্বনে কাহিনীকাব্য রচনা করতেন। সচরাচর পুঁথি নামে আখ্যায়িত এসব রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'প্রেম' এবং তা বৃহত্তর মানবতার ধারণা সম্পর্কে মানুষের মনে গভীর অনুসন্ধিৎসা জাগাতে পারতো। এতে থাকতো জীবনের সহজ আনন্দোচ্ছ্বাস, মানবিক সৌন্দর্য, নিসর্গপ্রীতি এবং শারীরিক কামনানুভূতির এক উজ্জ্বল প্রকাশরূপ। এই

৪১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৪৭৮।

ধারার আবির্ভাবের ফলেই বাংলায় প্রথমবারের মতো সাহিত্য ও শিল্পকলা ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে গেল এবং এতে প্রাধান্য পেলো ও মূর্ত হয়ে উঠলো দেবতা নয়, রক্তমাংসে গড়া লৌকিক মানুষ। এই ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম হচ্ছে : ষোল শতকে রচিত শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা;* দৌলত উজির বাহরাম খানের *লাইলি মজনু* এবং দোনা গাজীর *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল;* সতেরো শতকে রচিত আলাওলের *হপ্ত পয়কর* ও *সয়ফুল মুলুক;* আঠারো শতকে মোহাম্মদ মুকিম প্রণীত *গুলে বকাওলী* এবং উনিশ শতকী রচনার মধ্যে মোহাম্মদ খাতেরের *আলেফ-লায়লা*। বর্ণনামূলক এই পুঁথি অনুষ্ঠানে সচরাচর কথানাট্যের সকল বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেতো, কিন্তু প্রায়ই বর্ণনাকারী কুশীলব তার পায়ে ঘুঙুর ও হাতে ধর্মদণ্ড বহন করা থেকে বিরত থাকতো। বাংলার সর্বত্র অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এসব পুঁথিপ্রদর্শনীও সমান জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হয়।

সতেরো শতকে প্রধানত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোককাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাবমুক্ত এক ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে, যা এখন আমাদের কাছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে সুপরিচিত। আকারে মঙ্গলকাব্যের চেয়ে হ্রস্ব এই গীতিকাগুলি নশ্বর মানুষের বিয়োগাত্মক প্রেমের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ধারণায় পূর্ণ। পুরোপুরি মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত এসব গীতিকা সর্বপ্রথম ১৯২৩ সনে সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গীতিকাগুলিতে মানবতাবাদ, মানবীয় কামনা-বাসনা, বলিষ্ঠ নারীচরিত্রের উপস্থিতি এবং ধর্মীয়-নৈতিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, তা একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করে। সতেরো শতক থেকে এসব গীতিকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনসমক্ষে কথানাট্যের রীতিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং সাধারণভাবে সকলের কাছে 'পালাগান' নামে খ্যাতিলাভ করেছে। এ সমস্ত পালাগানের পালাকারদের কেউ কেউ অনুষ্ঠানকে আরো বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এতে অতি সাধারণ কিছু বাড়তি উপাদান (যেমন একটি বালিশকে ঘোড়া, মৃতব্যক্তি, বা ভারীবস্তুরূপে প্রদর্শন) সংযুক্ত করেন এবং মঞ্চে উপবিষ্ট কোরাস-গায়কদের মধ্য থেকে একজনকে বর্ণনাকারী কুশীলবের সাথে সংলাপে নিয়োজিত করেন। এর ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানে নাটকীয়তা, উত্তেজনা, রসঘন মুহূর্ত ও বিষাদময়তা আগের চেয়ে আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুঠে উঠার অবকাশ পায়। উনিশ শতকের কোন এক সময় এই গীতিকাগুলিতে 'যাত্রা' অনুষ্ঠানের প্রভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পূর্বে অনুসৃত সংলাপরীতি ও চরিত্রচিত্রণকলা সহকারেই এ থেকে 'বাইদ্যার গান' এবং আরো স্বল্প কয়েকটি অনুষ্ঠানপ্রকরণের উদ্ভব ঘটে।[৪২]

৩. *নাটগীত*

মধ্যযুগের অভিনয়কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ত্রি-চরিত্রবিশিষ্ট *গীতগোবিন্দের* সাঙ্গীতিক আদর্শটি এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশলাভ করে নাটগীত

৪২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য,* ১০০।

রীতি। আমাদের মাতৃভাষায় রচিত প্রথম সুনির্দিষ্ট নাটগীত অনুষ্ঠানপাঠ হলো বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এর মূল উপাদান আহরিত হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* ও *মহাভারত* থেকে। কপিলা বাৎসায়নের এ সংক্রান্ত উক্তি থেকে জানা যায় :

> সমগ্র কাহিনীটি পরিবেশন করা হতো ত্রি-চরিত্র—যথা কৃষ্ণ, রাধা এবং একজন বৃদ্ধা মহিলা বড়াই-এর গীতিধর্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে। এই চরিত্রগুলোর নাটকীয় গঠনকৌশলের জন্য এটি মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও নাট্যপ্রদর্শনীর আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে একটি নাট্যপাঠ ছিল, এই মত সুকুমার সেন এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যও সমর্থন করেছেন।[৪৪] প্রচুর নৃত্যসহযোগে অনুষ্ঠিত এই নাট্যপাঠ সম্ভবত চক্রাকারে পরপর কয়েকদিন ব্যাপী প্রদর্শিত হতো। মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীত রীতির অনুষ্ঠান যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কীর্তিবাস অনূদিত *রামায়ণের* নিম্নোক্ত শ্লোকে :

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
> কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গল ॥
> নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পশরে ॥[৪৫]

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি (বিশেষত বিবাহোৎসব) এবং ধর্মীয় উৎসবে নাটগীত প্রদর্শিত হতো কখনো বাড়ির উঠোনে, গণমিলনায়তনে অথবা মন্দিরসংলগ্ন ময়দানে। 'নাটগীত' এবং 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ উপরূপক'-এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো ভাষাগত—প্রথমটি রচিত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায়, আর পরেরটি সংস্কৃতে।

তা ছাড়া যে-কেউ ধরে নিতে পারে যে, গণমাধ্যম হিসেবে এর গদ্য ও রম্য অংশে ধ্রুপদী মুদ্রার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক আবেগবাহী উপাদানই বেশি ব্যবহৃত হতো। নাটগীত সচরাচর উপাদান সংগ্রহ করতো *মহাভারত*, *রামায়ণ* ও *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* থেকে, এবং ঘটনাক্রমে শুধু কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে নি বিধায় পরে ষোড়শ শতকের দিকে এটি মৌলিক গুরুত্বলাভে সক্ষম হয়। চরিত্রগতভাবে নাটগীতরীতি এর নিজস্ব কাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঝেড়ে ফেলে এবং ষোড়শ শতকে বঙ্গীয় জনসমাজে ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণ–ধারণার বিস্তৃতির দরুন এটি মূলত 'প্রেম' বিষয়ের মাঝেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মঙ্গলকাব্যের মতো এটিও সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার

---

৪৩. Kapila Vatsayan, *Theatre*, 139.

৪৪. সুকুমার সেন, *নাটক*, ৭৯ এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৪৫-৫২।

৪৫. উদ্ধৃত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৯১।

উত্থানকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর ফলে প্রায়ই এতে কোনরকম সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না।

চীনা পর্যটক ফেই সিনের লেখায় তৎকালীন বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৯৩-১৪১০) রাজসভার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড় নগরী। সুলতানের দরবারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজকীয় ভোজসভায় বিচিত্র বেশভূষাসজ্জিত ও বিবিধ অলঙ্কারপরিহিত রমণীকুলের নাচ-গান দেখে তিনি অত্যন্তমুগ্ধ হন এবং এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৪৬] এটা খুবই সম্ভব যে, ফেই সিন আসলে সুলতানের দরবারে একটি নাটগীত অনুষ্ঠানই প্রদর্শিত হতে দেখেছিলেন। যাহোক, নিচে সংযোজিত কতিপয় সাহিত্যপাঠের উদাহরণ থেকে অনুমান করা যাবে যে, মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীতের ক্রমবিকাশমান একটি ঐতিহ্য বেশ ভালভাবেই বিরাজ করছিল। শেখ ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষবিজয়* (১৫৪৫-এর মধ্যে রচিত) কাব্যের এই পদাংশটুকু লক্ষ্য করা যাক :

> নাট চর নাটুয়া তাল বহে ছলে।
> তোহ্মার মাদলে কোন গুরু গুরু বোলে ॥[৪৭]

বলরাম দাসের (১৫৩০-১৬১০?) *প্রেমবিলাস*-এ পাওয়া যায় :

> গৌর বরণ-মনি আভরণ
> নাটুয়া মোহন বেশ।[৪৮]

এবং কৃষ্ণদাসের *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* (১৬১৫) গ্রন্থে মিলবে :

> প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা
> দেখিলা সকল তাহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা।[৪৯]

চৈতন্যদেব স্বয়ং অন্তত তিনটি নাটগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বলে জানা যায়, যার মধ্যে দুটি প্রদর্শিত হয় নীলাচলে, সেখানকার রাজার সক্রিয় সহযোগিতায়। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* এই ঘটনার উল্লেখ আছে।[৫০]

চৈতন্যের আবির্ভাব এবং ষোড়শ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব মতবাদের দ্রুত বিস্তৃতিকালে নাটগীত অনুষ্ঠানরীতি সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পর্যাপ্ত

---

৪৬. এম. আর. তরফদার, "চৈনিক পর্যটকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, (ভাদ্র-অগ্রহায়ন ১৩৬৪ বা. স.), ৮০; উদ্ধৃত হাবিবুর রহমান, লোকসঙ্গীত, ৬।

৪৭. উদ্ধৃত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৫৩), ২১।

৪৮. উদ্ধৃত আবদুর রহমান খান, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রমিক পরিচয়*, (ঢাকা ১৯৮৪), ১২৮।

৪৯. সুকুমার সেন, *নাটক*, ৯৮।

৫০. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৫৭-৫৮।

গুরুত্ব লাভ করে। বৃন্দাবন দাসকৃত অসমাপ্ত চৈতন্যজীবনী *চৈতন্য ভাগবতে* (১৫৪৮) এমন একটি অনুষ্ঠান-প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে, যেখানে চৈতন্যদেব স্বয়ং রুক্মিণী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। এ উপলক্ষে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় শামিয়ানা ও পর্দা টাঙানো হয়েছিল। এ সময়ে এখানে শিল্পীদের পোশাক পরিবর্তন, প্রসাধন বা সাজগোজের জন্য আলাদা একটি কক্ষ (সাজঘর) সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সকলেই ছিলেন পুরুষ এবং তারা সাজঘরের আড়ালে থেকে নিজেদের এমনভাবে সজ্জিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন যে, দর্শকের সারিতে বসা ভক্ত-অনুসারীগণ মঞ্চে দণ্ডায়মান তাদের অনেককে ঠিকমতো চিনতেই পারে নি। অবশ্য অনুষ্ঠানটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়, কারণ চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিমূলক প্রেমানুভূতি দ্বারা এত বেশি আপ্লুত হন যে, অভিনয় বন্ধ রেখে কোলের উপর কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। উপরোল্লেখিত অনুষ্ঠানটি যে নাটগীত ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং এর সম্প্রসারিত রূপই যে 'কৃষ্ণযাত্রার' (আঠারো শতকে 'কালীয়দমন যাত্রা' নামে পরিচিত ছিল) জন্ম দিয়েছে, কপিলা বাৎসায়নের মতো গবেষকও সেটাই বিশ্বাস করেন।[৫১] আজ সমকালীন বাংলাদেশের সাধারণভাবে 'যাত্রা' নামক যে স্থানীয় নাট্যরীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এরই পূর্বসূরি হচ্ছে কৃষ্ণযাত্রা। সুকুমার সেন প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী চৈতন্য প্রবর্তিত 'যাত্রা' এখনো পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে স্থানীয় লোকরঞ্জক গোষ্ঠী 'নেটো'র দলে অনুশীলিত হতে দেখা যায়।[৫২]

ষোড়শ শতকের কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো এর অভিনেতাদের অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং বাদ্যযন্ত্র ও কোরাসের সমন্বয়ে গঠিত অর্কেস্ট্রা দলের সরাসরি উপস্থিতি একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতো। কোরাস পরিচালনা করতো সম্ভবত একজন কাহিনী বর্ণনাকারী দলনেতা (অধিকারী)। গান (কুশীলবগণ, বর্ণনাকারী ও কোরাসের মাধ্যমে গীত) ও নাচ (কুশীলবগণ কর্তৃক পরিবেশিত) ছাড়াও কৃষ্ণযাত্রায় নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের সমাবেশ লক্ষণীয় :

ক. তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্যসংলাপ ব্যবহার, যা সংলাপরূপে ব্যবহৃত গানের চেয়ে আলাদা ;

খ. কেবল পুরুষ অভিনেতাগণ দ্বারা যাত্রার সকল চরিত্র উপস্থাপন ;

গ. রম্য অনুকাহিনীর উপস্থিতি ;

ঘ. কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর উপস্থিতি;

ঙ. ধ্রুপদী রাগভিত্তিক সঙ্গীতের উপস্থিতি;

চ. অঙ্গসজ্জা ও পোশাকের বিশিষ্ট ব্যবহার;

---

৫১. Kapila Vatsayan, *Theatre*. 140.

৫২. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১০।

ছ. প্রলম্বিত অনুষ্ঠান-প্রদর্শনী;

জ. দর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বিনিময়;

ঝ. কোন উঁচু মঞ্চ ও পর্দা ছাড়াই উন্মুক্ত স্থানে বৃত্তাকারে প্রদর্শনীর আয়োজন।[৫৩]

বৈশিষ্ট্যবিচারে দেখা যায়, নির্দিষ্টভাবে কৃষ্ণযাত্রা ও সাধারণভাবে নাটগীত রীতি নিজস্ব নাট্যকাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করে শাস্ত্রোক্ত নয়টি প্রধান রসের অন্যতম 'শৃঙ্গার রসের' মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং বস্তুত ভক্তিমূলক প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় কৃষ্ণযাত্রা 'পরমাত্মা' তথা কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বিবিধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রেমের বিচিত্র প্রকাশরূপকে ফুটিয়ে তুলতেই বেশি আগ্রহী ছিল। কেন আঠারো শতকে এসে ভারতীয় নাট্যকলা সাধারণভাবে উন্নতির পথ থেকে সরে গিয়ে অবনতির পথে বাঁক নিলো ? এই প্রশ্নে ফভিয়ান বাওয়ার মনে করেন, "মানবীয় আবেগ-অভিজ্ঞতার বিশাল পরিসরকে উপেক্ষা করে কেবল প্রেমসম্পর্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মমগ্ন থাকাই এই আধোগামিতার কারণ।"[৫৪]

সতেরো শতকে কৃষ্ণযাত্রার বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে তৎকালীন অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান-প্রদর্শনীতে পরিণত হওয়ার কারণ দ্বিবিধ : প্রথমত রূপ গোস্বামী ও অন্যান্যদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকর্ম এবং দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব মতবাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। বৈষ্ণববাদীদের অনেকেই কৃষ্ণযাত্রার পাঠ রচনা করেছেন বলে জানা যায় এবং এঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের অনুসারী চন্দ্রশেখর দাস ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত কয়েকটি নাট্যপাঠের মাঝে প্রথমটির নাম *হরিবিলাস*।[৫৫] অন্যদিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এবং চরিত্রে দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে কৃষ্ণযাত্রার আরেকটি অনুষ্ঠানপ্রকরণ গড়ে উঠে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, বরং চেতন্যদেবই আবির্ভূত হন কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে। এই নতুন ধারার নাটগীত অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয় 'চৈতন্যযাত্রা'।

আঠারো শতকে বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায় ও উপাসক শ্রেণী তাদের কথানাট্যের বর্ণনামূলক ঐতিহ্য থেকে যাত্রারীতির বিকাশসাধনে সক্ষম হয়। যেমন 'শক্তিযাত্রার' উদ্ভব ঘটায় শাক্তগণ, 'নাথযাত্রা' রচনা করে নাথগণ এবং পাল রাজাদের জনপ্রিয় কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয় 'পালযাত্রা'।[৫৬] কিন্তু কৃষ্ণযাত্রা ও চৈতন্যযাত্রা বরাবর

---

৫৩. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৫৮-৫৯।

৫৪. Faubion Bowers, *Theatre in the East : A Survey of Asian Dance and Drama*, (New York 1956), 32.

৫৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৬৪।

৫৬. ঐ, ১৬৯।

অন্যসব যাত্রানুষ্ঠানের উপর এদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আঠারো শতকে যাত্রাকাঠামোকে নতুন রূপে বিন্যস্ত করেছিল, তা হলো এতে 'নারদ' ও 'ব্যাসদেব'-এর মতো কিছু হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সংযোজন এবং বিশেষকরে আঠারো শতকের শেষার্ধে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অর্জনের দিকে এর ক্রমাগ্রসরণ। এই পরিবর্তনের স্পষ্ট সাক্ষ্য মিলবে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়', যার কাহিনী নির্মিত হয়েছে কবি ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* একটি অধ্যায় অবলম্বনে। সম্ভবত যাত্রানুষ্ঠানে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলেই পরবর্তীতে বাংলায় পেশাদার ভ্রাম্যমান বাদকদলের উদ্ভব ঘটে।[৫৭]

যাত্রা সচরাচর উন্মুক্ত স্থানেই প্রদর্শিত হতো। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, সরকারি উৎসবময়দান এবং ধনী ব্যক্তিদের বসতবাড়ির উঠোনে এটি স্বচ্ছন্দে অনুষ্ঠিত হতে পারতো। বৃন্দাবন দাস প্রদত্ত বর্ণনা বিচার করলে দেখা যায়, ষোড়শ শতকে যাত্রা প্রদর্শনের জন্য কোন উঁচু মঞ্চের প্রয়োজন পড়ে নি। তাছাড়া আঠারো শতকে সাধারণ্যে যাত্রানুষ্ঠানের বর্ধিত জনপ্রিয়তা বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝানো হয়েছে এর প্রদর্শনীগুলোয় এক বিরাট সংখ্যক দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতির কথা। আর যেহেতু এটা ছিল নির্ভেজাল এক গণমাধ্যম, তাই এমন ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, দর্শকগণ প্রদর্শনীস্থানের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে আসনগ্রহণ করতো এবং অভিনেতা-কলাকুশলীদের অভিনয় যেন দর্শকগণ সহজেই দেখতে পারে সেজন্য অনুষ্ঠানস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি মাটির উঁচু ভিত্তি, বাঁশের খুঁটি অথবা কাঠ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হতো। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মনে করেন, রাত্রিকালীন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা সহজসাধ্য ছিল না বিধায় দিনের বেলাতেই যাত্রা অনুষ্ঠান করতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হতো। এ সময়ে নাচ ও গান ছিল আগের মতোই অনুষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র প্রভাবিস্তারকারী উপাদান। কিছু জনপ্রিয় গীতের সাথে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চাকে মানসম্মত মনে করা হতো আর এতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'ঢোলক' ছিল অপরিহার্যভাবে দৃশ্যমান।[৫৮] অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে ছিল মন্দিরা, করতাল ও খোল।[৫৯] যাত্রায় গীত প্রতিটি গানের শেষে অধিকারী প্রথাসম্মতভাবে মঞ্চে আগমন করতেন এবং নির্দিষ্ট গানের ব্যাখ্যামূলক একটি বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এভাবে এই প্রদর্শনকাঠামোর মধ্য দিয়েই দীর্ঘকাল ধরে চলেছে যাত্রানুষ্ঠানের বিকাশ ও বিবর্তন, আর বাংলার যেসব অঞ্চলে আঠারো শতকী যাত্রা সর্বাধিক প্রসারলাভ করেছিল সেসবের মধ্যে বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও যশোর ছিল অন্যতম।[৬০]

---

৫৭. ঐ, ১৬৯-৭৩।

৫৮. প্রাগুক্ত, ১৬৯-৭৩।

৫৯. জিয়া হায়দার, "যাত্রার উপস্থাপনা পদ্ধতি", যাত্রা-উৎসব ১৯৭৮-৭৯ উপলক্ষে প্রকাশিত *পুস্তিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, (পৃষ্ঠানম্বর মুদ্রিত নেই)।

৬০. *গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য*, *লোকনাট্য*, ১৬৯-৭৩।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কালপর্বে স্থানীয় নাট্যকলার সবগুলো শাখাতেই সেসময়ের সামাজিক অধোগতির সাধারণ চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাত্রাকে বিশেষত এর নাচ ও গানের মধ্যে নিহিত অশ্লীলতার অভিযোগে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। তথাপি সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদন আগের মতোই বিদ্যমান ছিল। এসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এমন কয়েকটি যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে কৃষ্ণযাত্রা (কালীয় দমনযাত্রা), চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা ও ভাসানযাত্রার নাম উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে চণ্ডীযাত্রা এসেছে চণ্ডীমঙ্গল থেকে এবং ভাসানযাত্রা এসেছে মনসামঙ্গল থেকে।[৬১] আমাদের উল্লিখিত সময়কালেও যাত্রানুষ্ঠানে অস্তিমান ছিল সূত্রধর চরিত্রটি, যার কাজ ছিল অনুষ্ঠান চলাকালীন মূল কাহিনীর বিভিন্ন অংশকে গ্রথিত করতে কিছুক্ষণ পরপরই ধারাবর্ণনাসহ মঞ্চে আবির্ভূত হওয়া।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেশাদার যাত্রাদলের প্রযোজক-ব্যবস্থাপক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম যাত্রানুষ্ঠানে কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করেন। সেসময়ে এই পদক্ষেপ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং ক্রমে তা সর্বত্র আদর্শ নমুনা হিসেবে গৃহীত হয়। তাঁর এই সংস্কারের ফলে নাট্যপাঠের সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, যেমনকরে এর আগেই গুরুত্বলাভ করেছিল গদ্যভাষায় সংলাপ রচনার বিষয়টি। তাছাড়া এই সংস্কার গদ্যরচনার কৌশলকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তখন বিভিন্ন যুগের নাট্যচরিত্র ও নাট্যপাঠের ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে সঙ্গতি রেখে সমসাময়িক কালের পরিধেয় সামগ্রীর মিশ্রণ ও সাযুজ্যবিধানের বিষয়টি ছিল প্রায় উপেক্ষিত। সংস্কারের ফলে এই ত্রুটি দূর করে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং অতি সাধারণ আকারে হলেও এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যাত্রানুষ্ঠানে গীত প্রতিটি গানের সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়, তবে গানসংখ্যা আগের চেয়ে আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া ধ্রুপদী রাগ-রাগিনী ব্যবহারের প্রবণতা জন্ম দেয় নতুন রীতি ও মেজাজবিশিষ্ট জনপ্রিয় যাত্রাগীতি। আগে বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতা যে যেভাবে পারতো নাচের মাধ্যমে অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করতো, কিন্তু এখন এই যথেচ্ছ চর্চা ব্যাহত হয়। স্বল্প সময়ের জন্য কেবল কয়েকজন নির্দিষ্ট চরিত্রাভিনেতাকেই নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয় এবং নারীচরিত্রগুলি আগের মতোই পুরুষ দ্বারা অভিনীত হতে থাকে। কিন্তু গানের উৎকর্ষসাধনের জন্য এতে যুক্ত করা হয় ঐতিহ্যবাহী 'জুড়ি' প্রথা। এই প্রথায় পুরুষ অভিনেতার জন্য তার পরিবর্তে গান গেয়ে দিত অভিজ্ঞ পুরুষ কণ্ঠশিল্পী এবং নারী চরিত্রের জন্য গান গাইতে নেপথ্যে ব্যবহার করা হতো মানানসই

---

৬১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ১০০।

বালকশিল্পীকে। এতে কখনো গায়কদের সমবেত কোরাসও প্রয়োজনমতো জুড়ে দেয়া হতো।[৬২] এই সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশকিছু পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র, যেমন বেহালা, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ইত্যাদি যাত্রা-অর্কেস্ট্রায় সংযুক্ত হয়ে একে আরো সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করে তোলে।[৬৩] অনুষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে কণ্ঠসঙ্গীত প্রক্ষেপের ঐতিহ্যবাহী নিয়মটি পরিত্যক্ত হয়, তবে এই শতাব্দীর বিদায়লগ্নে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের প্রভাবে এখানে অন্য একটি প্রথারও প্রচলন ঘটে। এটি হলো যাত্রানুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে কিছুক্ষণ প্রারম্ভিক অর্কেস্ট্রাবাদন পর্ব। আরেকটি প্রথা ছিল অনুষ্ঠান চলাকালে দর্শকদের কাছ থেকে দান বা বকশিস সংগ্রহ করা। এটি ছিল উনিশ শতকের অনুষ্ঠানাদিতে সাধারণভাবে দৃশ্যমান ঘটনা এবং আজো এর প্রচলন লক্ষ্য করা যাবে 'গাজীর গান' ও অন্যান্য কিছু স্থানীয় নাট্যানুষ্ঠানে। অবশ্য উনিশ শতক শেষ হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে আমরা এই প্রথাটিকে কেবল যাত্রার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়তে দেখি।

উনিশ শতকী যাত্রানুষ্ঠানে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংযোজন হলো 'সঙ' বা ভাঁড় চরিত্রের উপস্থাপনা। এসব সঙ বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করতো, তবে তাদের ভাঁড়ামো ছিল কিছুটা অশ্লীল প্রকৃতির।[৬৪] আজো যাত্রানুষ্ঠানে দুই কৌতুক-অঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে এইসব সঙের সংক্ষিপ্ত অথচ সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৬৫]

বিশ শতকে যাত্রানুষ্ঠানে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, অনুষ্ঠানের প্রযোজক-ব্যবস্থাপক পদে 'অধিকারী'কে সংযুক্ত করা হয়; যিনি এরপর থেকে কলাকুশলী ও সাজসরঞ্জামসহ পুরো যাত্রাদলের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন। অথচ উনিশ শতক সমাপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত অধিকারীর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত নাট্যপাঠ রচনার মধ্যে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বর্ণনাকারীর ভূমিকাতেও তিনি অবতীর্ণ হতেন এবং সঙ্গীত ও নাট্যদৃশ্যের সাথে দর্শক-শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। কখনো কোন বিষয়ে তাকে উপস্থিত বক্তব্যও রাখতে হতো। বিশ শতকের শুরুতে অধিকারীর এই দায়িত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নাটকের পাঠ রচনার জন্য তখন থেকে তার আর কোন ভূমিকা থাকলো না। তিনি পছন্দসই নাট্যপাঠ সংগ্রহের জন্য প্রায়শ দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করতেন—কখনো নগদ টাকা দিয়ে যাত্রাদলের বাইরে থেকে নাট্যপাঠ কিনে আনতেন, অথবা এ বাবদ নাটকলেখককে চুক্তি মোতাবেক প্রতি প্রদর্শনীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

---

৬২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য,* ১৯৬-২০৬।

৬৩. জিয়া হায়দার, "যাত্রা"।

৬৪. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য,* ১৯৬-২০৬।

৬৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, ৪১১।

প্রদান করতেন। ফলে এরপর হতে যাত্রানুষ্ঠানে বর্ণনাকারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এবং এক সময় যাত্রা থেকে এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে।

যাত্রানুষ্ঠানে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছিল তা হচ্ছে এতে 'বিবেক' নামক চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি। সর্বপ্রথম আমরা এই চরিত্রটি উপস্থাপিত হতে দেখি অহিভূষণ ভট্টাচার্যের *সুরাট উদ্ধার* নাটকে, উনিশ শতকের একেবারে শেষে।[৬৬] নৈতিকতা বিষয়ক নাটকে যেভাবে বিমূর্ত গুণাবলীতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হতো, প্রায় অনুরূপভাবে যাত্রার প্রধান চরিত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত করতে বিবেক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতো। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, যাত্রানুষ্ঠান চলাকালীন যেকোন সময় যেকোন স্থানে হঠাৎ গান গাইতে গাইতে বিবেকের আগমন ঘটবে এবং কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট চরিত্রের উদ্দেশে অথবা ঘটনার উপর মন্তব্য করার পর পুনরায় সে দর্শকসারির পিছন দিক দিয়ে বিশ্রামকক্ষে ফিরে আসবে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিবেক চরিত্রটি আর বিমূর্ত থাকে নি; একে বাস্তব চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং এরপর প্রায়শ একজন উদাসী বাউলরূপেই আমরা একে যাত্রামঞ্চে আবির্ভূত হতে দেখি।[৬৭]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ছিল যাত্রানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর এটা সাধিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সাধারণভাবে নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় উদ্দীপনামূলক পৌরাণিক উপাখ্যান ও সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ধর্মভাবমুক্ত লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকে থাকতো ধোঁয়াটে ভাবানুভূতিময় কাল্পনিকতা। এরকম বিসদৃশ অবস্থায় তখন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মুকুন্দদাস ও তাঁর দল 'স্বদেশী যাত্রা পার্টি।' মুকুন্দদাস (একাধারে অভিনেতা, গায়ক, পরিচালক, নাট্যকার; জন্ম বরিশালে ১৮৭৯ সালে, মৃত্যু ১৯৩৫ সালে) তাঁর স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে প্রচলিত নাট্যকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন সাধন করেন। সমকালীন উত্তপ্ত সমাজ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম ও দেশপ্রেম, বর্ণপ্রথা, সামন্ত নির্যাতন ইত্যাদিকে তিনি সাফল্যের সাথে নাটকের বিষয়বস্তুরূপে প্রদর্শনে সক্ষম হন। ১৯০৫ সনে নিজস্ব যাত্রাদল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুকুন্দদাস অদম্য নিষ্ঠা ও মনোবল সহকারে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে তিনি তাঁর যাত্রাদলের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে নজিরবিহীন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। এসময়ে এই জনপ্রিয় প্রদর্শনী পণ্ড করতে পুলিশ বারবার হানা দিয়েছে তাঁর যাত্রামঞ্চে, ঔপনিবেশিক

---

৬৬. ব্রজেন্দ্র কুমার দে, "যাত্রার পালা", যাত্রা-উৎসব ১৯৭৮-৭৯ উপলক্ষে প্রকাশিত *পুস্তিকা,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, (পৃষ্ঠানম্বর মুদ্রিত নেই)।

৬৭. ঐ।

শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাঁর তিন-তিনটি নাটক এবং কারাভ্যন্তরে আবদ্ধ করে রেখেছে তাঁকে পুরো তিনটি বছর। বিশেষকরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও সংগ্রামী আদর্শের দ্বারা তিনি যাত্রানুষ্ঠানে আর্থ-সামাজিক সচেতনতা সংযুক্তির পথ উন্মুক্ত করে যান।[৬৮] কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত না চল্লিশের দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়বস্তু যাত্রার ধর্মীয়পুরাণাশ্রয়ী প্রথাগত চরিত্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। সাধারণভাবে সমাজ-রাজনৈতিক বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল দেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমান একতা। অধিকন্তু, এ সময়ে পুরুষ অভিনেতা দ্বারা নারী চরিত্রে অভিনয়ের পুরনো চর্চার পরিবর্তে সরাসরি নারী অভিনেতাকে ব্যবহার করা হতে থাকলে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা বিভক্ত হলে যাত্রানুষ্ঠান এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হয়। নবপর্যায়ে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান সরকার যাত্রার উন্নতিতে এ সময় খুব সামান্যই আগ্রহ দেখায়। অবশ্য এটা ঠিক যে, যাত্রার আয়োজক ও এর সাথে জড়িত অভিনয়শিল্পীগণ তখনকার অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাদি ও জাতীয় চাহিদার সঙ্গে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে যুক্ত করতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অধিকাংশ যাত্রানুষ্ঠানের বিষয় থাকতো হয় ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থূল দেশপ্রেম প্রদর্শন, নয়তো অতি-রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে সেকেলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে আবেগভারাক্রান্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে; যাত্রাকে এ সময় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নাটকরচয়িতার বিরাট ঘাটতিজনিত সমস্যারও মোকাবেলা করতে হয়েছে। যাহোক, এ সময়ে আমরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা বরিশালে 'গুনাই যাত্রা' নামক এক ধরনের যাত্রানুষ্ঠানকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখি। গুনাইবিবি নাম্নী এক পল্লীরমণীর লৌকিক প্রেম ও তার জীবনের বেদনাময় করুণ ঘটনাবলী হচ্ছে এই যাত্রার উপজীব্য। যদিও লৌকিক কাহিনীর পাশাপাশি ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক যাত্রার অস্তিত্ব বজায় ছিল, তথাপি 'ভাসানযাত্রা' ও 'কৃষ্ণযাত্রার' নাচে-গানে সমৃদ্ধ লৌকিক কাঠামোটির বিকাশের সাথে সাথে এর অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন ব্রজেন্দ্র কুমার বিশ্বাস এবং একজন খ্যাতিমান অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস।

সাধারণত যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় একটি ১৮´ × ১৫´ অথবা ২০´ × ১৮´ মাপের আয়তাকার মঞ্চে, যার চতুর্দিক উন্মুক্ত থাকে এবং তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মঞ্চটি নির্মিত হয় অস্থায়ীভাবে শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মঞ্চের দুই বিপরীত দিকে বাদ্যযন্ত্রীদলের সদস্যদের মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা থাকে। এজন্য প্রধান মঞ্চের সাথে যুক্তাবস্থায় তাদের জন্য ১´—৬´ উঁচু এবং ৩ ফুট চওড়া আরো দুটো সহায়ক কাঠামো নির্মিত হয়। মঞ্চের তৃতীয় দিকে প্রায় ৩০ ফুট দূরে অবস্থিত গ্রীনরুমটি মঞ্চের সঙ্গে ৩ ফুট চওড়াএকটি (অথবা দুটি)

---

৬৮. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ২৭৩

ঢালপথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অভিনেতাগণ এই ঢালপথেই গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। দর্শকগণ মঞ্চের চতুর্দিকে (কখনো তিন দিকে) পরিবেষ্টন করে বসে এবং একটি ফাঁকা স্থান সংরক্ষিত রাখা হয় মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য। প্রদর্শনী চলাকালীন আশেপাশের সমস্ত শূন্যস্থান দর্শকে পূর্ণ হয়ে যায়। দর্শকদের মাথার উপর টাঙানো থাকে তাঁবুর মতো একটি আচ্ছাদন, যা অনুষ্ঠানস্থলকে সুরক্ষিত রাখে। রাত্রিকালে শিশির ও কুয়াশাপাত থেকে অভিনেতা-কলাকুশলীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যাত্রামঞ্চের চারকোণায় চারটি খুঁটি পুতে তার উপর কাপড়ের অস্থায়ী ছাদ তৈরি করা হয়। স্থানীয় সুবিধা অনুসারে আলোর উৎস হিসেবে মঞ্চের চারকোণায় খুঁটিতে চারটি কোরোসিনের লণ্ঠন অথবা বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলিয়ে রাখা হয়। সচরাচর রাত ন'টা বা দশটার দিকে প্রদর্শনী আরম্ভ হয়ে থাকে, কিন্তু এর অন্তত দু'ঘণ্টা আগে থেকেই মঞ্চে নিযুক্ত একজন ঘোষক ঘণ্টা বাজিয়ে অনবরত দর্শক-অভিনেতাদের একথা জানিয়ে যায় যে, মাত্র আর কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠানটি শুরু হতে যাচ্ছে। একই সময়ে বাদকদলের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রথম সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে গ্রীনরুম থেকে যাত্রাদলের সকল সদস্য (ষাট থেকে সত্তর জন) একসঙ্গে প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়ে উঠে। প্রথম ঘণ্টাধ্বনির প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দ্বিতীয় আরেকটি ঘণ্টা বেজে উঠলে উপস্থিত বাদকদলের সদস্যগণ সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে আসনগ্রহণ করে প্রায় পৌনে একঘণ্টা যাবৎ ধীরলয়ে উদ্বোধনী বাজনা বাজিয়ে চলে। উদ্বোধনী বাজনা দর্শকদের কাছে এই বার্তা পৌছে দেয় যে, অনুষ্ঠান শুরুর চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে এসেছে। দর্শকদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশ এ সময়ে দ্রুত যার যার আসন গ্রহণ করে বসে পড়ে, ফলে যাত্রামঞ্চের চারপাশে আর তিল ধারণের স্থান থাকে না। বাদকগণ উদ্বোধনী বাজনা বাজিয়ে খানিক বিশ্রাম নেয় এবং যেইনা তৃতীয় ঘণ্টাটি বেজে উঠে, তৎক্ষণাৎ তারা ধীরলয়ের পরিবর্তে দ্রুতলয়ের বাজনা শুরু করে দেয়। এরপর যাত্রাদলের নাচিয়ে-গায়কগণ সমবেতভাবে গেয়ে উঠে একটি দেশাত্মবোধক গান। আগে এই দেশাত্মবোধক গানের পরিবর্তে অনুসৃত হতো একজন দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের হিন্দু প্রথাভিত্তিক ভক্তিমূলক কোরাসগীতি; কিন্তু '৪৭-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার (তথা পূর্ব পাকিস্তানের) যাত্রানুষ্ঠানে এর বদলে প্রবর্তিত হয় দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার রীতি। এই পরিবর্তন সাধিত না হয়ে উপায় ছিল না, কারণ ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতিমালায় ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ় স্থান অধিকার করে ছিল। যাহোক, দেশাত্মবোধক গানের পর ঘণ্টাকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় নাচ-গান, হাস্য-কৌতুক সমবায়ে গঠিত 'ভ্যারাইটি শো' বা বিচিত্রানুষ্ঠান। এটা ঠিক যে, এই 'ভ্যারাইটি শো'র কিছু অংশ পরিশীলিত দর্শকরুচির কাছে শালীনতার সীমা অতিক্রমকারী বলে মনে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি সাধারণ দর্শকদের নিরতিশয় আগ্রহের দিকটি বিবেচনা করে এগুলো যাত্রানুষ্ঠানে বহাল রাখা হয়। বিচিত্রানুষ্ঠান শেষ হতে যখন মধ্যরাত গড়িয়ে যায়, ঠিক তক্ষুণি চতুর্থ ও চূড়ান্ত ঘণ্টাটি উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে উঠে। এ সময়ে বাদকদল অন্যূন তিন মিনিটকাল অত্যন্ত দ্রুতলয়ে যন্ত্রসঙ্গীত বাজিয়ে যাত্রানুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা জারি করে চলে। শুরু হয় বৈশিষ্ট্যে অতি রোমাঞ্চকর, ভাষায় ওজস্বী এবং উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক

নাট্যকলার প্রভাবে পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট ও চার ঘণ্টাকাল দৈর্ঘ্যের এক অনন্য নাট্যানুষ্ঠান—'যাত্রা'।

অভিনয় চলাকালে অভিনেতাকে সংলাপ বলায় সাহায্য করার জন্য একজন 'প্রম্পটার' থাকে। প্রম্পটার বাদকদলের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নমঞ্চের এক কোণে বসে প্রতিটি গর্ভাঙ্ক, প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ নাট্যপাঠ নিম্নস্বরে আবৃত্তি করে যায়। প্রতিটি গর্ভাঙ্ক শেষ হওয়ার সংকেতস্বরূপ সে একটি ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথে আরম্ভ হয়ে যায় নাচ, গান, ভাঁড়ামি, কৌতুক ইত্যাদি এবং পরবর্তী গর্ভাঙ্ক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এসব দর্শকরঞ্জক বিষয় অনুষ্ঠানকে জমিয়ে রাখে।[৬৯] এভাবে পুরো প্রদর্শনীটি যখন সমাপ্ত হয়, তখন পূর্বের আকাশে ফুটে উঠে রক্তিম আভা—ভোর হওয়ার আর বেশি বাকি থাকে না।

নাটগীত অনুষ্ঠানরীতির ক্রমবিকাশ চিহ্নিত করে প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমরা আমাদের দেশে যাত্রানুষ্ঠানের বিবর্তনধারা প্রত্যক্ষ করেছি। যদিও যাত্রা হচ্ছে নাটগীত রীতির প্রধান শাখা, তথাপি এই রীতিকাঠামো থেকে উদ্ভূত অন্যান্য উপশাখাগুলির উত্থানও এসময়ে লক্ষ্য করা যায়। নিচে এরকম তিনটি উপশাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ঘাটু

একটি ঘাটুদলে থাকে 'সরকার' (দলনেতা ও মূল গায়ক), তার কোরাস/ অর্কেস্ট্রা সদস্যগণ এবং সচরাচর চারজন নাচিয়ে-অভিনেতা। এই নাচিয়ে-অভিনেতাদের নির্বাচন করা হয় বারো থেকে ষোল বছর বয়সী বালকদের মধ্য থেকে এবং তারা মূলত নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকে। উক্ত বালকেরা মাথায় মেয়েদের মতো করে লম্বা চুল রাখে এবং তাদের আনুষ্ঠানিক পোশাক হলো শাড়ি। এই অনুষ্ঠানরীতির নাম ঘাটু হওয়ার কারণ, এর প্রদর্শকেরা এদের নৌকা ঘাটে বেঁধে সেখানেই নৌকার পাটাতনের উপর অবস্থান নিয়ে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে। প্রধানত বর্ষা মওসুমেই এরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং ঘাটে ঘাটে অনুষ্ঠান দেখিয়ে আয়-রোজগারের চেষ্টা চালায়। এদের নৌকার পাটাতনের একপাশে অবস্থান নেয় কোরাস গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীগণ আর অন্যপাশে অভিনেতারা। স্বকণ্ঠে গীত গানগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও এর অভিনেতারা কোরাস গায়কদের সহযোগিতায় কখনো কেবল বর্ণনামূলক কাহিনীই অভিনয় করে থাকে বা নৃত্যে অংশ নেয়। নাচিয়ে-অভিনেতাগণ ধ্রুপদী নৃত্যকলার নিয়ম-কানুন কিছুই অনুসরণ না করলেও রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত তাদের নৃত্যানুষ্ঠান এতোই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত ও রুচিশীল যে, তা আমাদের মনে কার্যকরভাবে প্রেমের বিরহ-বেদনা জাগিয়ে তুলতে পারে। যদিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে, তথাপি ঘাটু উপভোগ্য মূলত এর সম্পূর্ণ ধর্মভাবমুক্ত লৌকিক প্রেম ও আদিরসের জন্য।[৭০]

---

৬৯. জিয়া হায়দার, "যাত্রা"।

৭০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ২২৫-৩২, এবং ওয়াকিল আহমদ. *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা ১৯৭৪), ১০৬-৮।

ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো ছাড়াও নাটগীত রীতির সকল বৈশিষ্ট্যসহ এই অনুষ্ঠান প্রকরণটি প্রধানত উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে (পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের অংশবিশেষ) দৃশ্যগোচর হয়। স্বল্প কিছু গবেষকের মতে, এই অভিনয়রীতি ষোড়শ শতকের পূর্বকালেও বর্তমান ছিল। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেন সিলেটবাসী সেই বৈষ্ণবকে, যিনি তরুণ বালকদের নিয়ে একটি নাটুকেদল গঠন করে সেসময় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের অংশসমূহ অভিনয় করে বেড়াতেন।[৭১] যাহোক, বৈষ্ণবীয় ভক্তিচর্চাউদ্ভূত এই নাট্যরীতি সম্ভবত উনিশ শতকে এসেই লৌকিক ও পেশাদার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকবে। বিশ শতকে এসে এই ঘাটুর অভিনেতা ও এর দর্শকবৃন্দ বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল ত্যাগ করে মূলত গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

ছোকরানাচ

ঘাটুর মতো ছোকরানাচও কোন বিশেষ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসরণ করে প্রদর্শিত হয় না। এই দলে আছে 'গীদাল' (দলনেতা ও মূল কণ্ঠশিল্পী), বাদকদলের সদস্যরা এবং নাচিয়ে-অভিনেতাগণ, যাদের সকলেই পুরুষ। দলের সদস্যরা যে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিধান করে থাকে তা অনেকটা ঘাটুসদৃশ, তবে এদের বয়স প্রায়ই ঘাটু অভিনেতাদের চেয়ে বেশি হয় এবং এর নাচিয়ে-অভিনেতারা পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রেও অভিনয় করে থাকে।

ছোকরানাচের মূলবিষয় সাধারণভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। যেকোন ছোকরা প্রদর্শনীতে মূল কণ্ঠশিল্পী (গীদাল)। সে তার বাদকদলসহ প্রদর্শনীস্থলের একপাশে অবস্থান নিয়ে যে বর্ণনামূলক গান পরিবেশন করে চলে, অন্যান্য নাচিয়ে-অভিনেতারা একেই নৃত্য ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিস্তৃত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে। তবে অনুষ্ঠান চলাকালে অভিনেতাদের গীতি-সংলাপ এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যে, তখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট করেই ধরা পড়ে। বাংলাদেশের উত্তরাংশ, বিশেষত রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে যুবসমাজের মধ্যে ছোকরানাচ অনুষ্ঠান আজো এর প্রেমঘন হার্দিক আবেদনের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণত গ্রামীণ মেলা অথবা বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের সময় ছোকরা নাচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৭২]

অষ্টক

আর একটি অনুষ্ঠানরীতি, যা ঘাটু বা ছোকরানাচ থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রধানত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই বেশিকরে চোখে পড়ে, তার নাম অষ্টক। সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক এই অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে একদল তরুণী সমভিব্যাহারে। এতে কাহিনী বর্ণনাকারী মূল শিল্পী যখন শ্রীচৈতন্য বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক

---

৭১. এম. সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী, "লোকসাহিত্যে ঘাটু গান", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫ম খণ্ড, নং-২, (১৩৬৮ বা. স.), ৫৯; উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমদ, *লোকনাট্য*, ১০৮।

৭২. আরও দেখুন ওয়াকিল আহমদ, ঐ, ১১০-১১।

গাথা সুর সহযোগে উপস্থাপন করে চলে, তখন ক্ষুদ্র একটি বাদকদল এতে অংশ নেয় এবং অনধিক চারজন তরুণী এর সমতালে নির্বাক অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এই তরুণীরা একইসঙ্গে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রেই রূপদান করায় পারঙ্গম।

জনগণের রসবোধ

সংস্কৃত নাট্যকলায় 'প্রহসন রূপক' ছাড়াও উৎকর্ষ বিচারে অসাধারণ স্বল্প কয়েকটি প্রহসনের সন্ধান আমরা পাই। উদাহরণস্বরূপ বোধায়ন কবি'র *ভাগবদ-অজ্জুকিয়াম,* মহেন্দ্র বিক্রমাবর্মণ-এর *মত্তবিলাসপ্রহসন* ও শঙ্খধরের *লতাকমলিকা*-র নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলোর উপস্থিতি এই ধারণাকেই সমর্থন করে যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে কৌতুকচর্চা বা রসচর্চার ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় একটি মজার ব্যাপার হলো, বর্ণসচেতন সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাদের লেখা নাটকে নিম্নবর্ণের চরিত্র সংযোজনের এতোই বিরোধী ছিলেন যে, এমনকি পেটুকেপনাসর্বস্ব 'বিদূষক' (ভাঁড়) নামক তুচ্ছ কৌতুক চরিত্রটিতেও তারা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণত্ব আরোপে কোনরকম সঙ্কোচবোধ করেন নি।

বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় কৌতুক-ঐতিহ্য বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝেও যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল তা বোঝা যায় এখানে প্রচলিত অসংখ্য হাস্যরসাত্মক গানের অস্তিত্ব দেখে। এসব গানের একাংশ আবার সংলাপ আকারে রচিত।[৭৩] উনিশ ও বিশ শতকে লিখিত অসংখ্য নাটক ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং প্রমোদানুষ্ঠানে যে রসচর্চা হতো তার প্রমাণ মিলবে নারায়ণদেবের *পদ্মপুরাণ* ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে, বিশেষকরে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে*।[৭৪]

সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, 'সঙ' (ভাঁড়)-কেন্দ্রিক একজাতীয় অনুষ্ঠানরীতি বাংলায় বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পনেরো শতকের পর পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।[৭৫] মধ্যযুগের ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের আনন্দোৎসব অথবা প্রমোদানুষ্ঠানে যেমন দেখা যেতো, তেমনি বাংলা অঞ্চলেও ক্ষমতাকাঠামোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার একটি মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে সাধারণ মানুষের মাঝে সঙ অর্জন করেছিল প্রভূত জনপ্রিয়তা। এখানে অজস্র কৌতুক-গান, নাচ ও হাস্যরসাত্মক অভিনয়কলার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগের বাংলায় বিরাজমান ছিল এক বিশিষ্ট রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যদিও 'সঙ' রীতির অনুষ্ঠানটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে, তথাপি সুপ্রাচীন একটি ঐতিহ্যের অবশেষ আকারে এটি আজো গ্রামে-গঞ্জে 'বহুরূপী' নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টিকে আছে।

---

৭৩. দেখুন এম সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি,* (ঢাকা ১৯৭৩), ১৯৫-৯৯।

৭৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন বদ্যানাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যের লোকনাট্যের ধারা,* (১৩৭৮ বা. স.)।

৭৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১।

বাংলায় এক সময়ে জনপ্রিয় এইসব রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানরীতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা কঠিন। তার কারণ, এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত আজো সংগৃহীত হয় নি। তবে সুকুমার সেন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত ঘোষ, অশোক কুমার মিশ্র প্রমুখ গবেষকদের মতামতের উপর নির্ভর করে এর উদ্ভব সম্পর্কে নিম্নপ্রকল্পিত ছকটি উপস্থাপন করা যেতে পারে[৭৬]:
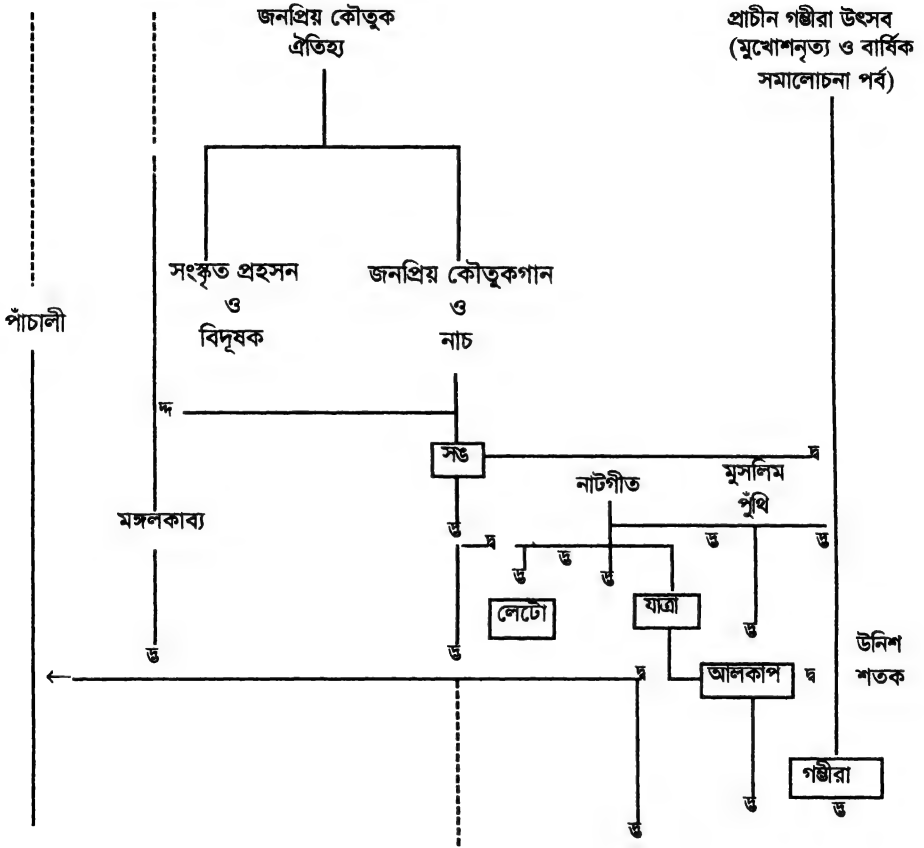
৭৬. দেখুন সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ২১১-১৩; প্রদ্যোৎ ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ঃ গম্ভীরা*, (কলকাতা ১৯৮২); অশোক কুমার মিশ্র, *বাংলা প্রহসনের ইতিহাস*. (কলকাতা ১৯৮৮), ৩-৫।

এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাসহ সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটি সুপ্রাচীন ধারা অস্তিত্বশীল ছিল। এই কৌতুক-ঐতিহ্য দুটি পৃথক অনুষ্ঠানকাঠামোর জন্ম দেয়—একদিকে অভিজাত সংস্কৃত দরবারি নাট্যকলায় 'প্রহসন' ও কিছু নিয়মিত চরিত্র, যেমন 'বিদূষক', অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৌতুক-অনুষ্ঠানরীতি। এসব অনুষ্ঠানপ্রকরণ, বিশেষকরে 'সঙ' রীতির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের 'মঙ্গলকাব্য' ও অন্যান্য আরো কিছু অনুষ্ঠানে।[৭৭] পনেরো শতকের পূর্বকালে প্রধানত বিভিন্ন গণউৎসবাদিতে 'সঙ' তথা মার্কামারা বোকাটে গোছের এই চরিত্রটি কথানাট্যের কাছাকাছি রীতিতে অতিরঞ্জিত অনুকরণে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের চিত্রগুলো তুলে ধরতো। সঙ যখন গান গাইতো, নাচতো এবং বিভিন্ন উপহাসজর্জরিত কৌতুকচরিত্রে অভিনয় করতো, তখন একদল বাদ্যযন্ত্রী ও কোরাসগায়ক বিচিত্র সুরমূর্ছনায় তাকে সহযোগিতা দিয়ে যেতো। সম্ভবত পনেরো শতকের ঠিক পরেই এই সঙ-রীতির অনুষ্ঠান থেকে নাটগীত ঐতিহ্যের প্রভাবে উদ্ভূত হয় 'লেটো'। লেটো আজো পশ্চিম বাংলায় বহুলপ্রচলিত। এতে আছে আগেই বাঁধা হয়েছে এমন সব গান ও একটি কাহিনী রূপরেখা। এই কাহিনীর অনুসরণে লেটোশিল্পীগণ নৃত্যে অংশ নেয় এবং নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় মুখে মুখে সংলাপ বচনা করে সহজ সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখে। যদিও লেটোর বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক গ্রামীণ জীবনের সরস সমালোচনা, তবুও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অশ্লীলতার অভিযোগে কখনো একে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। সাধারণত গ্রামীণ উৎসবাদি ও পল্লীর সাপ্তাহিক হাট-বাজারে লেটোর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পর্বটির ইতি ঘটে যখন 'পাঁচালী' ও 'যাত্রা' অন্য সব কিছুকে পেছনে ফেলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায় এবং উনিশ শতকে এসে ক্ষীয়মান সঙ-রীতি চূড়ান্তভাবে উল্লিখিত দুটি অনুষ্ঠানকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৭৮] এরই অবশেষ হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ এবং বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় আজো গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

প্রদ্যোত ঘোষের মতে, গম্ভীরা উৎসব বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি অনার্য সভ্যতা থেকে আগত, এবং যদিও বিশ শতকের সূচনালগ্নেই প্রথম একে নাট্যকলা প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তথাপি বলা দরকার যে, এর রয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছরের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।[৭৯]

গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয় গ্রামের কোন উন্মুক্ত স্থানে এবং এর আগ্রহী দর্শকবৃন্দ আনুমানিক ১৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার চক্র রচনা করে অনুষ্ঠানস্থলের চতুর্দিকে আসনগ্রহণ করে থাকে। অনার্য দেবতা শিবের প্রতি সম্মান দেখাতে গম্ভীরার আয়োজন করা হয় এবং

---

৭৭. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৫৫৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, ২১১-১৩ এবং সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১।

৭৯. প্রদ্যোৎ ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি*, ৫৬, ৬৮-৭১।

কোন মঞ্চ ছাড়াই সাধারণ সমতল ভূমিতে তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানস্থলের অনতিদূরে এর সঙ্গে সংলগ্ন একটি গ্রীনরুমের ব্যবস্থা থাকে, যা নির্মিত হয় স্থানান্তরযোগ্য কিছু হালকা নির্মাণোপকরণ দ্বারা। গম্ভীরা ৬টি পর্বে বিভক্ত : ক. ভূমিকাপর্ব (যেখানে সকল অভিনেতা-কলাকুশলীকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়), খ. প্রার্থনাপর্ব (যেখানে শিবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং অভিনেতা-কলাকুশলীগণ তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে তা থেকে মুক্তিলাভে শিবের সাহায্য প্রার্থনা করে), গ. দ্বৈতাভিনয় (যেখানে দুটি চরিত্র একটি বিদ্রূপনাট্যে অংশ নেয়), ঘ. চতুরাভিনয় (যেখানে চারটি চরিত্র একটি বিদ্রূপনাট্যে অংশ নিয়ে থাকে) ঙ. বর্ণনাপর্ব এবং চ. প্রতিবেদনপর্ব (যেখানে দুজন অভিনয়শিল্পী স্থানীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সমালোচনা পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় আলোচিত সমস্যাগুলোর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান উপস্থাপন দ্বারা। সমালোচনামূলক ও কৌতুকপূর্ণ এই গম্ভীরা অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে থাকে, যেখানে স্থানীয় জনসাধাবণ নিজ সম্প্রদায়কৃত সারা বছরের কর্মকাণ্ডগুলো মূল্যায়নের সুযোগ পায়। এতে কেবল সঙ্গীতাংশটুকুই থাকে পূর্বরচিত আর বাদবাকি গদ্যসংলাপ উপস্থিত মতো মুখে মুখে রচনা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় নারীবিহীনভাবে শুধু পুরুষ অভিনেতা ও একদল বাদ্যযন্ত্রীর সহায়তায়।[৮০]

সম্ভবত এমন হয়ে থাকবে যে, উনিশ শতকে গম্ভীরা শুধুমাত্র এক ধরনের বর্ণনামূলক অনুষ্ঠানরীতি হিসেবেই বর্তমান ছিল। আজ এটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা মূলত যাত্রা ও আলকাপ রীতির সঙ্গে এর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার, গ্রহণ-বর্জনেরই ফলাফল। 'আলকাপ' (আরবীয় ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'কৌতুক') এখন পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না; সম্ভবত উনিশ শতকের দিকে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এখানে এর প্রচলন ঘটায়। এতে আছে গান, নাচ ও কৌতুকপূর্ণ ছন্দ-কবিতা এবং দর্শকেরা সারারাতব্যাপী এই অনুষ্ঠান অতি আগ্রহের সাথে উপভোগ করে থাকে। অনুষ্ঠানে সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে রচিত রঙ্গ-কবিতা, অভিনয় এবং গানসহযোগে বর্ণিত কোন একটি জনপ্রিয় লোককাহিনীর উপস্থাপনা থাকে।[৮১] সম্ভবত নাটগীত ধারার অনুষ্ঠানরীতি এবং মুসলিম পুঁথি ঐতিহ্যের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই আলকাপ উদ্ভূত হয়ে থাকবে।[৮২]

আলকাপ অনুষ্ঠানে 'সঙ' একটি অপরিহার্য চরিত্র এবং চলতি ঘটনাবলী নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে দর্শকদের আনন্দ দেয়াই এখানে তার কাজ। অন্যদিকে যখন গম্ভীরা উৎসব শুরু হয়,

---

৮০. প্রাগুক্ত, ৫৬-৬৯।

৮১. ঐ, ৮৬-৮৯।

৮২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৫৫৫।

তখন সঙকে এক মজার কৌতুকমিছিল নিয়ে উৎসবস্থানের পথে পথে অগ্রসর হয়ে এলাকা প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। বছরের উল্লেখযোগ্য বড় বড় সামাজিক অনিয়ম-অনাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সঙ এসময় প্রদর্শন করে থাকে তার নিজস্ব ধাঁচের অতিরঞ্জিত কৌতুকাভিনয়।[৮৩]

এতোক্ষণ ধরে যেসব কৌতুক-রঙ্গরীতি আলোচিত হলো, অধিকাংশ সময় সমাজের অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক সেসব হয়েছে অবহেলিত, কোণঠাসা এবং অশ্লীলতার অভিযোগে পরিত্যক্ত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রকৃত গণমাধ্যম হওয়ার দরুন শাসনক্ষমতার মূলকাঠামোকে সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করতে এসব অনুষ্ঠানরীতি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সঙ্গত কারণে আজকের আধুনিক গবেষকদের কাছে এটি অবশ্যই দাবি করতে পারে সবিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব।

৫. *মিশ্রনাট্য*

উপরে যেসব অনুষ্ঠানকাঠামো সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি, সেগুলোর পাশাপাশি বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরো কিছু অনুষ্ঠানরীতি উদ্ভাবন করে. যেগুলোর মধ্যে কোনরকম বর্ণনামূলক অথবা নাটকীয় চরিত্রাভিনয় অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও এদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে প্রধানত 'কবিগান' ও 'পাটুয়াগান' নামক এজাতীয় দুটো অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

'কবিগান' হলো বিতর্কের এমন একটি কাঠামো, যেখানে দু'জন পেশাদার চারণকবি পরস্পর বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বাদ্যযন্ত্র ও কোরাসের সহযোগিতায় মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণাত্মক কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে ছুড়ে দেয়। বিপক্ষের ছুড়ে দেয়া এই ধাঁধা বা রসাল বক্তব্যের আড়ালে নিহিত সূক্ষ্ম যুক্তি খণ্ডনে যে ব্যর্থ হয়, প্রতিযোগিতায় তারই হার হয়। যদিও কবিগান মূলত ধর্মীয় চরিত্রসম্পন্ন, তথাপি বর্তমানে এটি এর অনুষ্ঠানপরিধির মধ্যে ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীমূলক বিষয়, এমনকি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। গবেষকগণ এই প্রদর্শনীকাঠামোর উৎস নির্ণয়ে স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত। রক্ষণশীল মত এই ধারণা দিতে সচেষ্ট যে, এর উৎপত্তি ঘটেছে আঠারো শতকে। এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীগণ বলতে চান, অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতকেরই কোন এক সময় কবিগান উৎপত্তিলাভ করে থাকবে।[৮৪] মধ্য আঠারো শতকে সাধারণভাবে 'খেউড়' নামে পরিচিত

---

৮৩. প্রদ্যোৎ ঘোষ, *সংস্কৃতি*, ৯০-৯২।

৮৪. আরো তথ্যের জন্য দেখুন যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, (ঢাকা ১৯৮৫), ২৪-২৫।

কামোদ্দীপক বক্তব্য সংবলিত কবিগানের একটি শাখা পশ্চিম বঙ্গের শান্তিপুর ও এর আশেপাশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া বিভিন্ন লোকপ্রিয় ধাঁধা অবলম্বনে রচিত 'তর্জা'ও ছিল পশ্চিম বঙ্গের একটি জননন্দিত অনুষ্ঠানরীতি। পূর্বপরিকল্পিত গীতিকাঠামো সমবায়ে গঠিত 'দাড়াকবি' নামের আরেকটি আঠারো শতকী কবিগানরীতিও বেশ উল্লেখ করার মতো। এর গীতিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত গানগুলোর বিশেষত্ব এই যে, অনুষ্ঠানে সেসব গান বিতর্ক আকারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।[৮৫]

কবিগানে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল তাদের বিতর্ককে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কোন কবিগান অনুষ্ঠানে একজন রাধার পক্ষ এবং অন্য প্রতিযোগী কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে পারস্পরিক যুক্তিবাণ নিক্ষেপে তৎপর হয়ে উঠে। অনুরূপভাবে এ দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালকে 'এজিদ-হোসেন', 'সত্য-মিথ্যা' কিংবা 'নারী-পুরুষ' ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী ভূমিকা বা চরিত্র অবলম্বনে তুমুল বিতর্কে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

বিখ্যাত কবিয়াল চট্টগ্রামের রমেশ শীল (১৯০৭-১৯৬৭) কবিগানের বিষয়বস্তুতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। তিনি মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব অবলম্বনে পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, অথবা বুর্জোয়া সংস্কৃতি বনাম গণসংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে কবিগানের বিতর্ককাঠামোর মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন।[৮৬] তাঁর এই সাফল্যের ধারা আজও অব্যাহত আছে এবং আমরা দেখি, অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠানকাঠামো হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো কবিগান সবিশেষ সমাদৃত।

জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট আরেকটি স্থানীয় অনুষ্ঠানকাঠামো হচ্ছে 'পাটুয়াগান'। এতে এক ভ্রাম্যমাণ বাদকদল (প্রধানত বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং অংশত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পরিদৃশ্যমান) গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বর্ণনামূলক গান ও হাতেআঁকা বিভিন্ন ধরনের ছবি সহযোগে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে। পাটুয়াগানের কলাকুশলীদের বেশভূষা ও আচার-পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকলেও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এরা এই দুই সম্প্রদায়ের কোন একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্ভবত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী আচারপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের কারণেই এরা এই দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। এদের প্রদর্শিত অনুষ্ঠানকাঠামোটি অবশ্যই খুব পুরনো এবং এর উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একে সপ্তম শতকেরও পূর্বকালীন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৮৭] এতে চিত্রপ্রদর্শন ও বর্ণনার মাধ্যমে যে

৮৫. ঐ, ২৭-২৮।

৮৬. ঐ, ৩২।

৮৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ১৭৪।

কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয় তা সচরাচর বাংলার স্থানীয় অনার্য দেবীবৃন্দ (প্রধানত সর্পদেবী মনসা), আর্য দেবতা (রাম ও কৃষ্ণ) এবং মুসলিম সাধুপুরুষ ও ঐতিহ্যবাহী বীর প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে উল্লেখ্য যে, এতে যখন আর্য দেবদেবী বা চরিত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তখন সেগুলোকে আর আর্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে মনে হয় না। কারণ, স্থানীয় অনার্য দেবদেবী ও চরিত্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য আরোপ করেই অনুষ্ঠানে এদের উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।[৮৮]

৬. *পুতুলনাচ*

পুতুলনাচ সম্পর্কে লিখিত *Bread and Puppet Theatre* গ্রন্থ প্রণেতা প্রখ্যাত পুতুলনাচিয়েদের অন্যতম আমেরিকার পিটার সুম্যান এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আজকের আধুনিক অভিনয়শিল্প মূলত পুতুলনাচ থেকেই অস্তিত্বলাভ করে থাকবে। বাংলাদেশের মুস্তাফা মনোয়ারসহ অন্যদের বিশ্বাস, ভারতের স্থানীয় মূর্তিপূজকদের তখনকার পদক্ষেপ থেকেই সর্বপ্রথম পুতুলনাচের উদ্ভব ঘটে, যখন তারা চাইলো তাদের উপাস্য নিস্পন্দ পুতুলগুলোয় কিছুটা গতিসঞ্চার করতে। এর ফলে ভক্তদের সামনে তাদের দেবদেবীর কৃতিত্বকাহিনীকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলে ধরা সম্ভব হলো। সুকুমার সেন এবং স্বল্প কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যকলা অন্তত আংশিকভাবে হলেও পুতুলনৃত্যকলা থেকে উদ্ভবলাভ করেছে। সুকুমার সেন আরো মনে করেন, কালীদাসের সময়ে তাঁর সংস্কৃত নাটক *শকুন্তলার* কিছু অংশ অভিনীত হয়েছিল পুতুলের সাহায্য নিয়েই। অধিকন্তু তাঁর মতে, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যপ্রদর্শক দল গঠিত হতো মূলত তিন প্রধান কুশীলব সমবায়ে—'সূত্রধর' বা হস্তস্থিত সুতার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পুতুল পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি, একজন পুরুষ ও একজন নারী আবৃত্তিকার। নারী আবৃত্তিকার অবশ্য প্রয়োজনে সম্মুখনৃত্যেও অংশগ্রহণ করে থাকতো।

ভারতীয় পুতুলনাচের সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে জনপ্রিয় রীতিকাঠামো হচ্ছে 'সূত্রপুতুল', আর বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, এর উদ্ভব ঘটেছে কমপক্ষে তিনহাজার বছর আগে। অনুরূপভাবে সূত্রপুতুল রীতির পুতুলনাচ বাংলাদেশেও সর্বাধিক জনপ্রিয়। ধারণা করা হয়, অন্তত আটশ' বছর আগে অভিনয়শিল্পের এক প্রভাবশালী রীতিকাঠামো হিসেবে এই অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

বাংলায় সূত্র পুতুলরীতির পুতুলনাচের জন্য সচরাচর যে ধরনের সূত্রপুতুল ব্যবহৃত হয় সেসব ১০´´ থেকে ১২´´ বা বিরলে ১৮´´ উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এসব পুতুল কোমরের ঊর্ধ্বাংশে বাঁধা দুই অথবা তিনটি সুতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এগুলোর কোমরের নিম্নাংশ এমনভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে যে তাতে পদযুগলই শুধু দেখা

---

৮৮. ঐ, ১৭৩।

যায়। যেসব উপকরণ সহযোগে পুতুলগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো হচ্ছে ধানের তুষ, নলখাগড়ার মণ্ড, কাপড় ও ভাত দিয়ে বানানো এক ধরনের আঠা। কখনো পুতুলের মূলকাঠামোটি কাঠ দিয়েও তৈরি করা হয় এবং সেক্ষেত্রে কাঠামোর গায়ে তুষ ও কাদার মিশ্রণ লেপে দিয়ে তার উপর কাপড়ের আবরণ সেঁটে দেয়া হয়। দেখা গেছে, ঐতিহ্যগতভাবে দ্বি-চরিত্রবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণ অনুষ্ঠান কাঠামোটিই পুতুলনাচের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পুতুলনাচ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বাংলায় দণ্ড বা বাঁশের তৈরি পুতুল নির্মাণের ইতিহাস কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়শ' বছরের পুরনো। সচরাচর বড় মেলা উৎসবে জনতা কর্তৃক পছন্দকৃত যেসব দণ্ডপুতুল দৃশ্যগোচর হয় তার আকার সূত্রপুতুল থেকে বেশ বড় হয়ে থাকে। এদের উচ্চতা তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত হতে পারে। একজন পুতুলনাচিয়ে এজাতীয় একটি পুতুলই কেবল নাচাতে পারে এবং শুধু দু'রকমভাবে পুতুলগুলোকে নাচানো সম্ভব—প্রথমত এদের অবস্থান পরিবর্তন দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত দুই হাতের উঠানামা দ্বারা। এছাড়া কোমর কিংবা নিম্নাঙ্গের কোনরকম সঞ্চালন এসব পুতুলের পক্ষে সম্ভব নয়। আজকের বাংলাদেশে কখনো দণ্ডপুতুলের উদ্ভব বা প্রসার ঘটে নি। আজো পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়াতেই কেবল এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অন্য দুটি পুতুলনির্মাণ রীতি 'দস্তানা' ও 'ছায়া'ও কিন্তু পূর্ব বঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত নয়। মনে করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বপ্রথম দস্তানাপুতুল তৈরির রীতি প্রবর্তিত হয়। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী জাভার বিখ্যাত ছায়াপুতুল প্রকৃতপক্ষে এর উৎপত্তির জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের কাছেই ঋণী।

বাংলাদেশে পুতুলনৃত্যকলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এদেশের পুতুলনাচিয়েদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ার এখনো ঢাকায় এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষায় রত এবং ইতিমধ্যেই তিনি এমন কিছু নতুন পুতুলনাচরীতি উদ্ভাবন করেছেন যা নিঃসন্দেহে সার্থকভাবে পাশ্চাত্যের অগ্রসরতাকে সাঙ্গীকৃত করতে সমর্থ হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের একদা ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ আজ অনেকটাই উৎকর্ষহীন হয়ে পড়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এর অধিকাংশ প্রদর্শনরীতিতেই এখন পুতুলের পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে একদল জীবন্ত অভিনেতা, যারা সচরাচর অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশনে অংশ নিয়ে থাকে। যাহোক, সবশেষে একথা স্বীকার করা ভাল যে, পুতুলনাচ বিষয়ে বাংলাদেশে এতো অল্প গবেষণা হয়েছে, যেজন্য এ অঞ্চলের এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানরীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা জানতেও পেরেছি খুব কম।

খ. উপনিবেশপ্রভাবিত নাট্যকলা ও ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এক গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। দেশটি প্রথমে ইংল্যান্ডের শিল্পকারখানার কাঁচামাল সরবরাহকারী ও পরে

বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত হওয়ায় এদেশের সমাজ তথা জনগণের মাঝে জন্মলাভ করে এক ধরনের 'ঔপনিবেশিক মানসবৈকল্য'। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠে দ্বিধাবিভক্তি, যা বাংলার আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একটি সুসমন্বিত একক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'গ্রামীণ' ও 'শহুরে'—এই দুই পৃথক পথে চালিত করে। শহুরে অভিজাত শ্রেণী, যারা সংখ্যালঘু কিন্তু অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান, তারা নিজেদের নগর-সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় ধাঁচে সাজাতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও এবং তা নতুন দিকনির্দেশে সক্ষম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সাথে এটি সংযোগ হারিয়ে ফেলে। নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ও পরিণতি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার শহুরে অভিজাত শ্রেণীর নাট্যকলা উনিশ শতকী ভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। নগর-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কেবল '৪৭-পরবর্তীকালে, যখন এটি নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। যাহোক, আমাদের পক্ষে বাংলায় উপনিবেশপ্রভাবিত নাট্যকলার বিকাশ আলোচনা করা সুবিধাজনক হবে যদি মধ্য-আঠারো শতক থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সময়কালকে আমরা নিম্নোক্ত পাঁচটি কালপর্বে ভাগ করে নিই :

১. ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রবর্তন (১৭৫৩-মধ্য উনিশ শতক)
২. অনুকরণ, আত্মীকরণ ও গঠন (১৭৯৫-১৮৭০)
৩. কল্পনাবিলাস ও গণনাট্যশালা (১৮৭০-১৯২০)
৪. সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ : শিশির কুমার থেকে *নবান্ন* (১৯২০-১৯৪০)
৫. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থানীয় নাট্যকলার উন্নয়ন (১৮৮১-১৯৩৯)

১. ইউরোপীয় নাট্যকলা প্রবর্তন (১৭৫৩-মধ্য উনিশ শতক)

ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি ভারতে আরো একটি জিনিস বয়ে এনেছিল। এটি হচ্ছে স্থানীয় নাট্যকলার চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন এক ধরনের নাট্যকাঠামো।

যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালের পলাশী ট্র্যাজেডির পর বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, এবার তা তার প্রবাসী বৃটিশ বাণিজ্যিক কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতায় নাট্যপ্রদর্শনী আয়োজনে উৎসাহ প্রদান শুরু করে। তখন সেসব প্রদর্শনীতে কেবল স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর সদস্যদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। পরবর্তীকালে ১৮২০ সনের পর এসব ইংরেজের সান্নিধ্যে আসা স্থানীয় অভিজাতদের মাধ্যমেই কলকাতার শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি প্রথম ইউরোপীয় নাট্যকলা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। কিন্তু এর আগে সকল নাটকই রচিত ও

মঞ্চস্থ হতো ইংরেজ দ্বারা, আর অভিনয়ের জন্য মঞ্চনির্মাণ ও নাট্য প্রদর্শনরীতি ছিল ইংল্যান্ডে বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় রীতিরই হুবহু অনুকৃতি মাত্র।

যতোদূর জানা যায়, বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় ১৭৫৩ সনে, এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ১৭৫৬ সনে কলকাতা নগর আক্রান্ত ও বিজিত হলে এটি এরপর বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৭৭৫ সনে প্রতিষ্ঠালাভ করে 'দি নিউ প্লে-হাউজ' (কলকাতা থিয়েটার নামেও প্রসিদ্ধ), যা ১৮০৮ সনে এর বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অনবরত শেক্সপিয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান, ফারকুহার ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করে চলে। এসব নাট্যপ্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রবেশমূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি এবং প্রথম অবস্থায় এর নারীচরিত্রে রূপদানের জন্য পুরুষ অভিনেতাদেরই ব্যবহার করা হতো। অবশ্য কয়েক বছর পর মঞ্চে নারীচরিত্রে নারীশিল্পী ব্যবহারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে কলকাতা থিয়েটারও পূর্বতন রীতি পরিবর্তন করে মঞ্চে প্রথমবারের মতো নারীশিল্পী উপস্থাপন শুরু করে। এসময়ে আরো যেসব নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, এবারে সেগুলোর একটি কালক্রমিক তালিকায় চোখ বুলানো যাক। প্রথমেই আছে : মিসেস বৃস্টোর বাড়িতে স্থাপিত ক্ষুদ্র নাট্যশালা (১৭৮৯-৯০); হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (১৮৯৭-৯৮); এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮১২-১৪); চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৪৯); সেনানিবাসস্থ দমদম থিয়েটার (১৮১৭-২৪); বৈটককোনা থিয়েটার (১৮২৪-২) এবং সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-৪৯)। এসব নাট্যশালার মধ্যে চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটারই ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতিলাভে সমর্থ হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব, যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বত্ব পরিবর্তনের ঠিক আগের দিনটিতেও এই থিয়েটার পরিচালিত হতো ইংরেজ দ্বারা, এখানে প্রদর্শিত নাটকগুলো সবই ছিল ইংরেজি (শেরিডান, গোল্ডস্মিথ, শেক্সপিয়র ও লন্ডনের মঞ্চসমূহের জনপ্রিয় নাটক) এবং এদের অভিনেতা, কলাকুশলী সবই ছিল ইংরেজ। সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বেশ ক'জন বাঙালি (দ্বারকানাথ ঠাকুর, মোতিলাল শীল, রাধামাধব ব্যানার্জী, রমানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য) এবং এই থিয়েটারটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে বৈষ্ণব চরণ আঢ্য, বিশেষত *ওথেলো* নাটকে তাঁর অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য (১৭ আগস্ট, ১৮৪৯)। আঢ্য ছাড়া এই থিয়েটারের বাকি সবাই ছিল ইংরেজ এবং এখানে শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হয়ে থাকতো।

ইংরেজি থিয়েটারের এই ধারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্যশালা হচ্ছে : মিসেস লুইস এর থিয়েটার রয়েল, ফোর্ট উইলিয়মস্থ থিয়েটার রয়েল, অপেরা হাউজে মিসেস ইংলিশ-এর থিয়েটার, লিন্ডসে

থিয়েটার, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানীয় বাংলা থিয়েটার উত্থান লাভ করলে এসব ইংরেজি থিয়েটার পূর্বেকার সকল তাৎপর্য হারায়।[৮৯]

২. *অনুকরণ, আত্মীকরণ ও গঠন (১৭৯৫-১৮৭০)*

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র নাট্যরীতি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে একীভূত হয়ে গঠন করেছিল বাংলা নাটকের এক বিশিষ্ট রূপ ও কাঠামো। নাটগীত (প্রধানত যাত্রা), সংস্কৃত রীতি ও ইংরেজি রীতি এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নতুন ধারার বাংলা নাট্যকলা পরবর্তীকালে এদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

ইউরোপীয় রীতিতে প্রস্তুত আধুনিক মঞ্চে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করার দুর্লভ কৃতিত্ব কোন বাঙালির নয়, গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় নাট্যপ্রেমিক সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর এই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন করেন। নাট্যপাঠ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন রিচার্ড জড্রেল (১৭৪৫-১৮৩১)-এর কৌতুকনাট্য *দি ডিজগাইজ*। তিনি নিজেই নাটকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন (মলিয়েরের *লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর*-ও তিনি ভাষান্তরিত করেন) এবং কলকাতাস্থ ২৫ ডুমতোলা (বর্তমানে এজরা) স্ট্রিটে অবস্থিত বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রথম এর মঞ্চ-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ একই স্থানে এটি দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের দর্শনীমূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি (প্রথম প্রদর্শনীতে ৮ টাকা ও ৪ টাকা এবং দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে ১ স্বর্ণ মোহর)। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রতিটি প্রদর্শনীই ছিল অত্যন্ত জমজমাট এবং উপচে পড়া দর্শক-শ্রোতায় নাট্যশালা ছিল পরিপূর্ণ।[৯০]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষায় একটি নাটক লিখেন এবং এর নাম দেন *দি পারসিকিউটেড*। কিছু গবেষক দাবি করেন, ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর আদলে নাটক রচনার এটিই প্রথম কোন এদেশীয় উদ্যোগ।[৯১] কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইউরোপীয় নাট্যকলার, বিশেষত শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শ প্রচার ও চর্চায় যে দুটি প্রতিষ্ঠান পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা হলো হিন্দু কলেজ এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। একজন বিশুদ্ধ নাট্যামোদী, হিন্দু কলেজের আর. এল. রিচার্ডসন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কলকাতা থিয়েটারে পরিদৃশ্যমান শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁর ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করতে চাইতেন। তাছাড়া স্কুল ও কলেজে নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলামেও শেক্সপিয়রকে গ্রহণ করা হলো এর অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে। ফলে

---

৮৯. Sushil Mukherjee, *The Story of Calcutta Theatres : 1753-1980*, (Calcutta 1982), 2-7.

৯০. ঐ, 8-10.

৯১. কমলকুমার স্যান্যাল, *বাংলা নাটক সমীক্ষা*, (কলকাতা ১৯৭৬), ৫৯।

১৯২০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে শেক্সপিয়রীয় আদর্শ বজায় থাকে এবং ১৯৪০ সালের আগে কিছুতেই এর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা সম্ভব হয় নি। ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি নাট্যশালা শেক্সপিয়রকে যে কতো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় নিয়োজিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ঘটনায়, যখন ১৮৩১ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাঁর হিন্দু থিয়েটার উদ্বোধন করেছিলেন শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* (পঞ্চম পর্ব) এবং সংস্কৃত নাটক ভবভূতির *উত্তর রাম চরিত* (প্রথম পর্ব)-এর ভাষান্তরিত ইংরেজি নাট্যরূপ মঞ্চস্থ দ্বারা। হিন্দু থিয়েটার সক্রিয় ছিল বড়জোর এক বৎসর এবং এর কারণ সম্ভবত এই যে বাংলা ভাষায় নাটক মঞ্চায়নে এটি উৎসাহ প্রদর্শন না করে ইংরেজি ভাষাতেই নিজেদের সকল তৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছিল।[৯২]

নিকট অতীতে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকেও দুই নাট্যধারা—সংস্কৃত ও নাটগীত একত্রে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকাংশে বজায় রেখে চলেছিল, যদিও ইংরেজি নাট্যধারার চেয়ে এরা অধিক শক্তিশালী ছিল না। সংস্কৃত নাট্যকলার প্রতিক্রিয়া আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। একমাত্র নাটগীত ধারাটিই এদেশের মধ্যবিত্ত জনাংশের মধ্যে আগের মতো জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তার কারণ এই শ্রেণীটির ইংরেজি থিয়েটারে প্রবেশাধিকার প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ১৮৫৩ সালে মঞ্চস্থ *বিদ্যাসুন্দর* নাটককে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। এর কৃতিত্ব এখানে যে এটি ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক যা ইউরোপীয় কলাকৌশলের দ্বারা উপস্থাপিত। নাটকটির বিশেষত্ব হলো, একে সেসময়ে জনপ্রিয় ধারার যাত্রানুষ্ঠান থেকে আধুনিক মঞ্চে তুলে আনা হয় এবং আরো পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকাহিনী থেকে বিযুক্ত হয়ে এটি যাত্রানুষ্ঠানে প্রদর্শনোপযোগী বিকাশ লাভ করেছিল। *বিদ্যাসুন্দর* নারী ও পুরুষ উভয় অভিনয়শিল্পী সহযোগে কলকাতায় নবীনচন্দ্রের বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। ধনবান ও সৌখিন বাঙালি সংস্কৃতামোদীরা নাটকটির নির্মাণব্যয় বাবদ দুই লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থই নিজেদের তহবিল থেকে মিটিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অর্থের একটি বড় অংশই ব্যয়িত হয়েছিল ইংরেজদের কাছ থেকে মঞ্চসজ্জা-উপকরণ আমদানির পেছনে।[৯৩]

অন্যদিকে, দেশের শিক্ষায়তনগুলোতে শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শ ও ইউরোপীয় রোমান্টিক নাট্যনির্মাণরীতির প্রভাব অব্যাহত থাকে। ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গর্ভনমেন্ট হাউজে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাফল্যের সাথে *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই সাফল্য কলেজের ছাত্রদের পরবর্তী বছরগুলোতে

---

৯২. Sushil Mukherjee, *Theatres*, 13-14.

৯৩. ঐ, 14-15.

আরো কিছু সংখ্যক ইংরেজি নাটক মঞ্চায়িত করতে উৎসাহ যোগায়। ১৮৫২ সালে মেট্রোপলিটান একাডেমির ছাত্ররা *জুলিয়াস সিজার* নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।[৯৪] ১৮৫৩ সালে *ভানুমতি চিত্তবিলাস* নামে প্রকাশিত হয় *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* নাটকের হরচন্দ্র ঘোষকৃত বঙ্গানুবাদ। একই বছর ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রবৃন্দ উল্লিখিত নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু এসময়ে পূর্বোক্ত অনূদিত নাট্যপাঠের পরিবর্তে মূলপাঠই অনুসরণ করা হয়।[৯৫] ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ও উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে একটি নিয়মিত থিয়েটার কোম্পানি *দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার* প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে পেশাদার ইংরেজ অভিনেতাদের সাহায্যে মঞ্চস্থ করে যথাক্রমে *ওথেলো* (১৮৫৩), *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* (১৮৫৪) এবং ১৮৫৫ সালে *হেনরি দ্য ফোর্থ* এর প্রথম পর্ব। এসময়ে বহু বাঙালি দর্শক এসব নাট্যানুষ্ঠানের চারপাশে ঔৎসুক্য সহকারে সমবেত হয়েছিল, যদিও ইংরেজি না জানার কারণে তারা নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে সক্ষম ছিল না।[৯৬] তথাপি, পরবর্তীকালের সুযোগ্য নাট্যকার সৃষ্টিতে এসব অনিয়মিত নাট্যানুষ্ঠান এবং নিয়মিত পেশাদার নাট্যপ্রদর্শনীর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

১৯৫০ সাল নাগাদ কলকাতার কয়েকজন ধনবান ব্যক্তির বাসভবনে স্থাপিত হয় আধুনিক মঞ্চসুবিধাযুক্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিগত নাট্যশালা। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪) ইংরেজি ভাষায় মঞ্চস্থ করে *জুলিয়াস সিজার* নাটক; আশুতোষ দেবের (সতু বাবু) থিয়েটার ১৮৫৭ সালে প্রদর্শন করে *শকুন্তলা* নাটকের বঙ্গানুবাদ; কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যাৎসাহিনী থিয়েটার *বেনীসংহার* ও *বিক্রমোবর্শী* নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু এসব নাট্যশালার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-১৮৬১), যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চকাঠামো নির্মাণপ্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসেবে গৌরবের দাবিদার। পাইক পাড়ার রাজাগণ তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই মনোরম নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু নাটক নয়, এর উচ্চাঙ্গের অর্কেস্ট্রা, যথানুপাতিক নেপথ্যসজ্জা, গ্যাস ও লাইম আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি ইংরেজ দর্শকদের জন্য সংস্কৃত *রত্নাবলী* নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তিনি এই বেলগাছিয়া থিয়েটারের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম নাট্যজগতে আবির্ভূত হন। *রত্নাবলী* অনুবাদসূত্রে তিনি থিয়েটারের জন্য নাটক রচনায় উৎসাহবোধ করেন এবং বেলগাছিয়া থিয়েটার ১৮৫৯ সালে তাঁর প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা*

---

৯৪. P. Guha Thakurta, *The Bengali Drama*, (London 1930), 49-50.

৯৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস: ১৭৯৫-১৭৬*, (কলকাতা ১৯৩৩), ৩০ ও ৪০।

৯৬. P. Guha Thakurta, *Drama*, 50.

মঞ্চস্থ করে। এরপর থেকে মধুসূদন আরো নতুন নাটক ও প্রহসন লেখায় মনোনিবেশ করেন। তিনি লিখেন *পদ্মাবতী* (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫), *একেই কি বলে সভ্যতা* (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৬৫), *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (প্রকাশিত ১৯৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭), *কৃষ্ণকুমারী* (প্রকাশিত ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭) এবং *মায়াকানন* (প্রকাশিত ১৮৭৪)।

বাংলা থিয়েটারে সর্বপ্রথম মধুসূদনের হাতেই ইউরোপীয় নাটক রচনারীতির এক অপূর্ব আত্মীকরণ সুসম্পন্ন হয়। নাটকের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সচেতন ব্যবহার এই প্রথম এক পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামোর অঙ্গীভূত হয়। যদিও মধুসূদন ঘোষণা করেছিলেন, "সংস্কৃতের প্রতি দাসসুলভ মুগ্ধতার যে বেড়ি আমাদের উপর চেপে বসেছে, আমি তা ছুড়ে ফেলে দিতে চাই", তথাপি তিনি তাঁর এই ইচ্ছের যথার্থ প্রতিফলন অন্তত *শর্মিষ্ঠায়* ঘটাতে পারেন নি। সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী*-র গঠনকাঠামোর সাথে *শর্মিষ্ঠার* গঠন, বিশেষত এর পরিণতিসূচক সাদৃশ্য ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাঁর পরবর্তী নাটক *পদ্মাবতীর* গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : ক. এতে সর্বপ্রথম মুক্তছন্দরীতি তথা অমিত্রাক্ষর রীতি ব্যবহার, যা বাংলা ভাষা এবং বাংলা থিয়েটারে সম্পূর্ণ অভিনব সংযোজন, খ. গ্রিক উপকথার (সোনালী আপেল) ব্যবহার এবং গ. ক্রমবর্ধমান শেক্সপিয়রীয় প্রভাব ও সংস্কৃত নাট্যরীতির ক্রমহ্রাসমান প্রভাব। তাঁর *কৃষ্ণকুমারী* নাটকটি বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি এবং প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক হওয়ার গৌরবও এর। মধুসূদন তাঁর জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অন্তিম দিনগুলোতে লিখেছিলেন সর্বশেষ নাটক *মায়াকানন*। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা অনেকটা কৃত্রিম ও সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে উঠে। সম্ভবত বিরূপ সময়ের প্রতিঘাতে জর্জরিত মধুসূদন এসময়ে নাটক লেখায় তাঁর পূর্বেকার সকল প্রতিশ্রুতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সংস্কৃতমুগ্ধতার যে বেড়ি তিনি আমাদের ভাষা ও সাহিত্য থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিভাবান যুগন্ধর নিজেই তাতে জড়িয়ে পড়েন।

যাহোক, মধুসূদন দত্তের অনন্য কীর্তিগাথার মাঝে কেবল প্রহসনগুলোই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলোর ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারালো ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে এরা সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। *একেই কি বলে সভ্যতা*-য় মধুসূদন উনিশ শতকী এক অতি-আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন, যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত ছিল এবং বাঈজীনাচ, সুরাসক্তি ইত্যাদি নানাবিধ উশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপে নিমজ্জিত থেকে এর মধ্যে সভ্যতা অনুসন্ধান করতো। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*। সম্ভবত মলিয়েরের *তার্তুফ* থেকে তিনি এটি রচনায় প্রেরণা লাভ করে থাকবেন। সমাজের ভালমানুষির মুখোশ আঁটা প্রভাবশালী শ্রেণীটির ভণ্ডামি ও অসাধুতার স্বরূপ উন্মোচনই ছিল এর উদ্দেশ্য। পাইকপাড়ার রাজার অনুরোধে

লিখিত এই নাটকটি প্রদর্শনের জন্য মহড়া পর্যন্ত গেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এতে বিচলিত উল্লিখিত শ্রেণী প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করলে অবেশেষে মহড়া বন্ধ রেখে এর প্রদর্শনী বাতিল করতে হয়।[৯৭]

নাটকের কাহিনীবিন্যাসে বিভিন্ন ঘটনার ঐক্য সৃষ্টিতে মধুসূদন ছিলেন একজন সক্ষম কারিগর, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে নাটকীয় মুহূর্তের সংযোজনে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়শ নিমজ্জিত হতো দীর্ঘ স্বগতোক্তির মাঝে এবং অপ্রয়োজনীয় নিসর্গ বর্ণনা ও একঘেয়ে সংলাপ নাটককে করে তুলতো ভারাক্রান্ত। তথাপি মধুসূদন অত্যন্ত সার্থকভাবে ইউরোপীয় নাট্যকলা, বিশেষভাবে শেক্সপিয়রীয় নাট্যকৌশলসমূহ বাংলা নাটকে প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ বাঙালি নাটক রচয়িতাদের জন্য পথনির্দেশনা রেখে যান। তিনি ছিলেন সংস্কৃত যুগ থেকে নতুন যুগে উত্তরণের সেতুবন্ধ স্বরূপ এবং সেজন্যে একজন প্রথাবিরোধী নতুনের প্রবর্তক সমাজের প্রথাপন্থী রক্ষণশীলদের কাছ থেকে যতোটুকু তিক্ত সমালোচনা ও বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তার সবটুকুই তাঁকে একাকী সইতে হয়েছিল।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (প্রকৃত নাম গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র, ১৮৩০-১৮৭৩) তাঁর পূর্বসূরির হাতে সদ্যগঠিত নাট্যকাঠামোকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষালাভকারী দীনবন্ধু ডাক বিভাগে চাকুরিসূত্রে এক বিরাট গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তিনি ১৮৬০ সালে লিখিত তাঁর *নীল দর্পণ* নাটকটি (প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৬১ সালে, ঢাকায়) প্রকাশ করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই নাটকে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের যথেচ্ছ নিপীড়ন-নির্যাতনকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। বহুজনের বিবেচনায় *নীল দর্পণ* 'জনপ্রিয় প্রতিবাদের এক বাস্তববাদী নাটক', কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে এটি মেলোড্রামার অন্তর্ভুক্ত। রক্ত, নির্যাতন এবং জমির মালিক ও চাষীদের উপর নেমে আসা ভয়াবহ দুর্দশাচিত্রের ব্যবহার এতে অতি রোমাঞ্চকর ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। যাহোক, এই নাট্য প্রতিবাদ যে শহুরে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে কার্যকর অবদান রেখেছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে এরপর বাংলা নাটককে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরো প্রায় অর্ধশতককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যে পর্যন্ত না দেশ ও জনগণের সমাজ-রাজনৈতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ কোন নতুন বিষয় উপস্থাপন করতে নাটকের ডাক পড়লো।

নীল দর্পণের পর দীনবন্ধু রচনা করেন *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩), *লীলাবতী* (১৮৬৭) ও *কমলে কামিনী* (১৯৭৩) নাটকত্রয় এবং তিনটি প্রহসন—*বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) ও *জামাই বারিক* (১৮৭১)। *নবীন তপস্বিনীর* কাহিনীনির্মাণ-

---

৯৭. Madhusudan's letter to Gour Basak, উদ্ধৃত, by P. Guha-Thakurta, *Drama*, 74.

কৌশলে দীনবন্ধু যে তাঁর পূর্বতন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এতে তিনি একাধারে এমনভাবে করুণরস ও হাস্যরসের অবতারণা করেন যে আমরা যেন এর ভিতর শেক্সপিয়রের *মেরি ওয়াইভস অব উইন্ডসর* কৌতুকনাট্যের অনুরণন শুনতে পাই। অন্যদিকে এক জটিল কাহিনীকাঠামোর অধীনে *লীলাবতীকে* বিন্যস্ত করে দীনবন্ধু নিঃসন্দেহে তার মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছেন। নাটকটিতে তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রেমের সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণকে। দুর্ভাগ্যজনক যে এর প্রেমদৃশ্যগুলো হয়ে উঠেছে কৃত্রিম ও এতে অধিকাংশ চরিত্র অবতীর্ণ হয়েছে নিছক দ্বিমাত্রিক কার্ডবোর্ডসুলভ ভূমিকায়। *কমলে কামিনী* ঐতিহাসিক নাটক এবং দীনবন্ধু এতে বীররসের প্রবাহ সঞ্চার করতে চাইলেও কাহিনীনির্মাণগত দুর্বলতার জন্য তাঁর পরিকল্পনা সফল হয় নি। বরং নাটকের চেয়ে দীনবন্ধুর সার্থক প্রহসনগুলোর সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশিকরে ধরা পড়ে। সচরাচর হাস্যরসের মূর্ত প্রতীক বা একজন খাঁটি হাস্য যাদুকর'[৯৮] হিসেবে পরিচিত দীনবন্ধু মিত্র *সধবার একাদশী* প্রহসনে তথাকথিত প্রগতিশীলদের অন্তঃসারশূন্যতা ও তাদের পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকে ধরাশায়ী করতে তাঁর ব্যঙ্গ আক্রমণদক্ষতার পুরোটাই ব্যবহার করেছেন। *বিয়ে পাগলা বুড়ো*-তে তিনি যৌনবাতিকগ্রস্ত জনৈক বৃদ্ধের কার্যকলাপের নির্মম সমালোচনা দ্বারা প্রকারান্তরে সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণীর প্রতি তীব্র উপহাস ছুড়ে দেন। তাঁর এই দুটো প্রহসনেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট : প্রথমটিতে *একেই কি বলে সভ্যতার* ও দ্বিতীয়টিতে *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*-এর। *জামাই বারিক* দুটো কাহিনীর নিপুণ বিন্যাসে তৈরি প্রহসন, যেখানে বিদ্রূপ করা হয়েছে সেই বিদ্যমান সামাজিক প্রথাকে, যার কারণে একজন জামাতা আয়-রোজগার ছাড়াই নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থানের অধিকার লাভ করে থাকে। অবশ্য শেক্সপিয়রের *টেমিং অব দি শ্রু* নাটকের সঙ্গে *জামাই বারিক*-এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর মাধ্যমেই ইউরোপীয় নাট্যকলা বাংলা থিয়েটার অঙ্গনে সুদৃঢ় আসন গেড়ে বসে। অন্যদিকে, ১৮৬০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাবের আওতায় অভিযোজিত হয়ে নাটগীত (বিশেষত যাত্রা) রীতি থেকে উদ্ভব ঘটে এক নতুন নাট্যপ্রকরণের, সাধারণ্যে যা 'গীতাভিনয় নামে' পরিচিতি লাভ করে। এতে থাকতো গানের ছড়াছড়ি এবং আধুনিক নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ও কৌশলগত সুবিধাদি ছাড়াই তা প্রদর্শিত হতো। প্রথম অবস্থায় এই ধারাটি ভারতীয় উপকথা এবং সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত অনুবাদগুলির সীমিত কাহিনী-পরিসরে আবদ্ধ থাকে। এর সর্বপ্রথম

---

৯৮. Bankim Chandra's remark in *Dina Bandhu Jibani*, উদ্ধৃত, P. Guha Thakurta, *Drama*, 113.

নিদর্শন হচ্ছে ১৮৬৫ সালে আনন্দপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *শকুন্তলা* নাটক। এর অনুসরণে হরিমোহন রায় লিখেন *রত্নাবলী* (১৮৬৫-৬৬) এবং তিনকড়ি ঘোষাল রচনা করেন *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৬৫)। হরিমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা মনমোহন বসু এবং তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই ধারাটির পরিপূর্ণতা বিধানে সক্ষম হন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সজ্ঞান প্রচেষ্টা ছিল বাংলা নাটকের সঙ্গে ইউরোপীয় নাট্যকলার সংমিশ্রণ ঘটানো, কিন্তু মনমোহন বসু এর বিপরীতে স্থানীয় নাট্যরীতি তথা যাত্রাকাঠামোকে আরো উন্নত রূপ দিতে প্রয়াসী হন। ফলে যাত্রার চেয়ে গীতাভিনয়ের কাহিনীকাঠামোয় আসে আরো দৃঢ়তা এবং একটি কেন্দ্রীয় ভাবস্রোত থাকায় তা যাত্রা অপেক্ষা বেশি গতিশীলতা লাভ করে। যাত্রায় ব্যবহৃত দীর্ঘ গানের পরিবর্তে এতে প্রচুর ছোট ছোট খণ্ডগান সংযোজিত হয়।

পূর্ববর্তী নাট্যধারাগুলির মতো গীতাভিনয় ভক্তিমূলক ও করুণ রসাশ্রয়ী ভাবাবেগের প্রতিই জোর দেয় বেশি। আর এই ধারার প্রাণপুরুষ মনমোহন বসু তাঁর নাটকের জন্য উপাদান সংগ্রহ করতেন প্রধানত সংস্কৃত নাট্যকলা থেকে। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে *রামাভিষেক* (১৮৬৭), *সতী* (১৮৭৩) ও *হরিশ্চন্দ্র* (১৮৭৫) বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল।

৩. *কল্পনাবিলাস ও গণনাট্যশালা (১৮৭০-১৯২০)*

দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে বাংলার প্রথম গণনাট্যশালা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। কলকাতায় মধুসূদন স্যান্যালের আপার চিৎপুর রোডস্থ নিজস্ব বাসভবনে থিয়েটারটি স্থাপিত হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬৯-১৮৭২) সাথে যুক্ত অত্যুৎসাহী একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টাতে এটি প্রতিষ্ঠালাভ করে, যাঁদের একাংশ পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটার-তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেন নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকবৃন্দসহ শহরের অনেক প্রভাবশালী গুণী ব্যক্তি। এভাবে একে একে গণনাট্যশালা ও পেশাদার নাট্যকোম্পানিগুলি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকলে কলকাতাভিত্তিক শহুরে নাট্যশিল্পে স্বল্পকালের মধ্যে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। এর কিছুকাল পর ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে বেঙ্গল থিয়েটার। ৯ বীডন রোডে মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এটি জনসমক্ষে আবির্ভূত হয় এবং অর্জন করে বাংলার লিখিত ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজস্ব থিয়েটারভবন থাকার গৌরব। *শর্মিষ্ঠা* নাটকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার বাংলা নাট্যমঞ্চে সর্বপ্রথম এর প্রদর্শনীতেই নারীচরিত্রসমূহ চারজন নারী অভিনেত্রী (জগত্তারিনী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) দ্বারা অভিনীত হয়। কলকাতার এসব গণনাট্যশালায় আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতির ব্যবহারকে আদর্শ বিবেচনা করা হতো, কিন্তু ৮ অক্টোবর ১৮৮৭ তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে *পাণ্ডব নির্বাসন* নাটকটি

প্রদর্শনের সময় সর্বপ্রথম ডায়নামোসৃষ্ট বিদ্যুৎ দ্বারা বাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে মঞ্চে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার রীতি প্রবর্তিত হয়।[৯৯]

গণনাট্যশালার ইতিহাসে এর প্রাথমিক বছরগুলো চিহ্নিত হয়ে আছে বৃটিশ রাজের প্রতি তিক্ত-কঠোর ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ রচনার দ্বারা এবং এই প্রক্রিয়া তুঙ্গে উঠে যখন সরকার কুখ্যাত 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬' জারি করে বসে। যে নাট্যপ্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে এই আইন প্রবর্তন করা হয় তা হলো *জগানন্দ* ও *যুবরাজ* নামক একটি প্রহসন। ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এটি দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। এতে জগানন্দ রায় নামের একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি আইনজীবী প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রিত করে আনেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শঙ্খধ্বনি দিয়ে পুরনারীরা তাঁকে গৃহে বরণ করে নেয়—এমন একটি ঘটনায় উক্ত জগানন্দের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ-উপহাস। অনতিবিলম্বে নাটকটি নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহেই এটি ভিন্ন নামে (*হনুমান চরিত্র*) আবার নাট্যমঞ্চে ফিরে আসলে এর উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মে মাসের প্রথম দিন এ উপলক্ষে পুলিশকে বিদ্রূপ করে এক কৌতুকনাট্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তার আগের সন্ধ্যাতেই সবকার এক ঘোষণার দ্বারা কুৎসাপূর্ণ, সম্মানহানিকর, প্রজাবিদ্রোহমূলক ও অশ্লীলতাপূর্ণ নাট্যপ্রদর্শনী নিষিদ্ধকরণে পুলিশের হাতে অর্পণ করে বিপুল ক্ষমতা।[১০০] বাঙালিদের মধ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে এই বিল পাস হয়ে যায়। এই আইনটি আজও বহাল আছে এবং সবধরনের নাগরিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্বাহ্নে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

গণনাট্যশালাগুলোর অব্যাহত প্রতিষ্ঠা নাট্যশিল্পকে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। ধনবান অভিজাততন্ত্রের পরিচারিকা হিসেবে এতদিন নাট্যকলাকে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে এবার সে এক ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায় এবং অর্জন করে নিজস্ব শক্তি ও বৈদগ্ধ। কিভাবে এটি সম্ভব হয়েছিল তা বুঝতে হলে আমাদের এই সময়ের সামাজিক অবস্থার চিত্রটি স্মরণ রাখা দরকার। এসময়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সারা বাংলাময় অব্যাহত থেকেছে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ও ঐতিহ্যবাদের ক্রমিক উত্থান। বাংলার রেনেসাঁসে প্রতিমাপূজাবিরোধী প্রগতিশীল শক্তি এই শতকের প্রথম থেকে চেষ্টা করে আসছিল যাকিছু প্রথাগত তার সবটাই সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে; কিন্তু ষাটের দশক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে লাগলো। অবশ্যই এই প্রতিক্রিয়ার গতিপথ ছিল প্রগতিশীল চিন্তা

---

৯৯. Sushil Mukharjee, *Theatres*, 53-54.
১০০. ঐ, 45-46.

ও কর্মকাণ্ডের বিপরীত দিকে, তথাপি ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯০০ সাল নাগাদ কলকাতার শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ এর অভ্যন্তরে বিরাজিত প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মবিমুগ্ধতা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। নাট্যকলাও এই জাগরণের প্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে সর্বসাধারণের নাগালের মাঝে, আর দৃশ্যপটে এর নতুন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভূত হয় নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

১৮৭০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে নাট্যকলার উত্তরণ ঘটেছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়, যা স্থায়ী হয়েছিল ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, তা ছিল মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) প্রভাবিত কাল। এসময়ের নাটকসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো রচিত হয়েছে প্রধানত মিথ, সাধু-সন্তদের জীবন এবং ধর্মীয় বীরদের বীরত্বগাথা অবলম্বনে; যথার্থ ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায়। প্রায় ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালে চলমান দৃশ্যপট অধিকার করতে শুরু করে দেশপ্রেমের চেতনাসঞ্জাত ঐতিহাসিক নাটক এবং যদিও এসময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলেন, তথাপি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন তাঁর সমকক্ষ; অন্তত তা ধরা না হলে তাঁকে গিরিশচন্দ্রের উপরেই স্থান দিতে হয়। যুদ্ধপর্ব থেকে এর পরবর্তী স্বল্প কয়েক বছর পর্যন্ত বাণিজ্যিক নাট্যাঙ্গনে ক্রমাবনতি দশা লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত প্রধান নাট্যপ্রকরণ ছাড়াও এসময়ে রচিত হয়েছে সামাজিক নাটক, অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কৌতুকনাট্য ও গীতাভিনয়। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তখনো শেক্সপিয়রীয় পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট রোমান্টিক বিষাদাত্মক নাটক রচনারীতিই ছিল বিশেষভাবে অনুসরণীয় আদর্শ। এর অভিনয়রীতি বড় আনুষ্ঠানিক ও অলঙ্কারবহুল, নাটক মেলোড্রামাসদৃশ এবং সাধারণ প্রবণতায় তা ছিল মূলত এক ধরনের "নাচ, গান, মঞ্চকৌশল ও চোখধাঁধানো ছলা-কলা সহযোগে গঠিত জীবনবিমুখ পলায়নবাদী চিত্তবিনোদন।"[১০১] এমনকি ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত বছরগুলোতেও বাংলার বাণিজ্যিক নাট্যালয়গুলো সাধারণভাবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার চেষ্টা করেছে মূলত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য। কিন্তু এই অবস্থার প্রধান ব্যতিক্রম হচ্ছে ডি. এল. রায় ও গিরিশ ঘোষ এবং এঁদের কিছু ঐতিহাসিক নাটক।

১৮৫০-এর দশক থেকে সক্রিয় দুটি স্থানীয় নাট্যরীতির একটি হচ্ছে সংস্কৃত রীতি। আমরা দেখতে পাই, মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের পর এটি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু অন্যটি অর্থাৎ নাটগীত রীতি গীতাভিনয়-এর মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

---

১০১. Rustom Bharucha, *Rehearsals of Revolution : The Political Theatre of Bengal*, (Honolulu 1983), 23.

ডামাডোলের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। গিরিশ ঘোষ ও অন্য কয়েকজনের নাটকে এই রীতির প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যকর্মেও গীতাভিনয় রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। উন্মুক্ত যাত্রা প্রদর্শনী ও আধুনিক নাট্যমঞ্চ উভয়ের জন্য রচিত হয়েছে এই রীতির অসংখ্য নাটক। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে গীতাভিনয় দ্রুত এর জনপ্রিয়তা হারায় এবং ক্রমান্বয়ে তা জনসম্মুখ থেকে অপসৃত হয়। বলাবাহুল্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমেই বাংলার শহুরে সমাজে স্থানীয় নাট্যকলা এর নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র এই দু'জন বাংলা নাটকের সাথে ইউরোপীয় নাট্যকলার 'কাঠামো' এবং 'ভাবধারা' উভয়ের সংশ্লেষ ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসময়ে বঙ্গীয় সমাজে পুনর্জাগরণ দেখা দিলে 'ভাবধারা' তলিয়ে গিয়ে শুধু পশ্চিমা কাঠামোটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। গিরিশ ঘোষের কাছে শেক্সপিয়র ছিল আদর্শ নমুনা। তাঁর কথায়, "মহাকবি শেক্সপিয়র হচ্ছেন আমার আদর্শ। আমি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"[১০২] কিন্তু গিরিশ ঘোষের এই বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা দেখি তাঁর আদর্শিক ভাবকাঠামো ও মানসসংগঠন কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* এবং কাশিরাম দাসের *মহাভারত* অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে।[১০৩] তাঁর মিথ-আশ্রয়ী নাটকগুলো সম্পর্কে একথা আরো বেশি করে খাটে, কেননা এতে যাত্রানুষ্ঠানের স্পষ্ট অনুরণন শোনা যায় এবং বিশেষকরে এতে যেন বয়ে যেতো ভক্তিরসের প্রবল বন্যা। এইসব নাটকে মনমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায় এবং তাঁদের গীতাভিনয়সমূহের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমাজ বিষয়ক নাটকের জন্য *নীলদর্পণ* ও ইতিহাস বিষয়ক নাটকের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে লাভ করেছেন অনুপ্রেরণা। তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই দ্বিমাত্রিক; হয় সাদা নয় তো কালো এবং সেগুলো গঠিত এই মূলসূত্রানুসারে যে, সকল ক্ষেত্রেই কুনীতি পরাভূত হবে সুনীতির কাছে। কার্যত মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকে যে নারী চরিত্রগুলি পুরনো প্রথাবদ্ধ ভূমিকার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল, গিরিশ ঘোষ তাদের পুনরায় চার দেয়ালের মাঝে অবরোধবাসিনীরূপে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তাঁর নারীরা কেউ কেউ যেন মাতৃত্বের এমন এক আদর্শ, যার কাছে বিচিত্র জগৎসংসার থেকে যায় সম্পূর্ণ অজানা, অপরিজ্ঞাত। তাঁর নারীরা সকলেই একেক জন আদর্শ স্ত্রী, যাদের নিঃশর্ত সতীত্ব ও সৎগুণাবলী খুঁজে পায় না এমন কোন প্রভু, যে তাকে রক্ষা করবে তার বৈরী স্বামীর হাত থেকে। তবে বাংলা থিয়েটারের ভাষাকে এক নতুন

---

১০২. গিরিশ ঘোষের উক্তি, কুমুদ বন্ধু মিত্র প্রণীত *গিরিশচন্দ্র নাট্য সাহিত্য* গ্রন্থে, পৃ. ৩৯। উদ্ধৃত অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* (কলকাতা ১৯৭৯), ১৮৪।

১০৩. অজিত কুমার ঘোষ, *ইতিহাস,* ১৮৪।

গঠনকাঠামো প্রদানের ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষের অবদান প্রশ্নাতীত। মধুসূদন ও দীনবন্ধুতে যে নাট্যভাষা হয়ে উঠেছিল কৃত্রিম এবং নিশ্চল, গিরিশ ঘোষের শক্তিশালী কলমের টানে তা লাভ করে গতি ও বহমানতা। তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন, তাঁর ভাষায়, "বিশুদ্ধ প্রয়োজনের তাগিদে"[১০৪] এবং প্রায় সত্তুরটি নাটক লিখে পরিগণিত হন একজন চূড়ান্ত সৃষ্টিপারদর্শী নাট্যকারে। তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকগুলোতে এর নায়কদের এক আদর্শায়িত চিত্র তুলে ধরেন, এদের উপর আরোপ করেন দেবত্ব এবং অতীতকে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে উত্থাপন করেন নির্ভেজাল রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। এর প্রমাণ মিলবে তাঁর নিম্নলিখিত নাটকগুলোয় : *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬, শ্রী চৈতন্যের জীবনভিত্তিক), *প্রফুল্ল* (১৮৮৯, একটি মেলোড্রামা, যেখানে এক সমৃদ্ধিশালী বাঙালি পরিবারের পতন দেখানো হয়েছে), *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯০৬, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক) এবং *আবু হোসেন* (একটি গীতাভিনয়)। এর মধ্যে শেষোক্ত দুটি ছাড়া এসময়ে তাঁর নাটকগুলোর যদিও তেমন করে আর পুনরুত্থান ঘটে নি, কিন্তু তবু বাংলা নাটককে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে উপভোগ্য ও জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর সাফল্য ছিল অসামান্য। একজন ব্যতিক্রমী বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা ও শক্তিশালী নাট্যপরিচালকের পরিচয় বাদেও 'চরিত্রাভিনয়', 'চরিত্রবর্ণন' এবং 'অভিনেতা প্রশিক্ষণ'-এর ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষ যে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধ প্রবর্তন করে গেছেন সেজন্যও তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।[১০৫]

গিরিশ ঘোষের সমসাময়িক আরো দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যরচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯)। অমৃতলাল বসু একে তো নিজে ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনয়শিল্পী, তদুপরি বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কুপ্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর ব্যঙ্গনাট্যগুলো তাঁকে বাড়তি খ্যাতি এনে দেয়। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবদান রেখে গেছেন কিছু বিদেশী ভাষার নাটকের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ সম্পাদন এবং কতগুলো ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে। শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* ও মলিয়েরের *লা বুর্জেঅস জেন্টিলহোমে* তাঁর অনূদিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলা থিয়েটার ভুবনে ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে বলা যায় যে সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে (*কৃষ্ণকুমারী*) এই ধারার সূচনা ঘটে, বিকশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা, সম্প্রসারিত হয় গিরিশ ঘোষের মাধ্যমে এবং ডি. এল. রায় একে চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিপক্বতা দান করেন। কোন সন্দেহ নেই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে তাঁর মৌলিক অবদান হচ্ছে নিখাঁদ স্বদেশপ্রেম, কিন্তু

---

১০৪. ঐ, ১৮২।

১০৫. Rustom Bharucha *Revolution*, 24.

নাট্যনির্মাণকৌশলগত দিকে তিনি তেমন সাফল্য দেখাতে পারেন নি, তাঁর নাটকগুলো প্রায়ই ঢিলেঢালা, দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয় রকম দীর্ঘ।

ঐতিহাসিক নাটকের জন্য হাস্যরসাত্মক ও রোমান্টিক বাংলা গান রচনায় উৎকর্ষলাভকারী দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন পেশায় একজন সরকারি কর্মকর্তা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর তিনি কিছুকাল ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৮৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগলাভ করেন। তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে *রানা প্রতাপ সিংহ* (১৯০৫), *নুরজাহান* (১৯০৮) ও *শাহজাহান* (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। ঐহিক ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ডি. এল. রায় আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ বাংলার দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করেন মর্ত্যবাসী মানুষের দিকে এবং এর দ্বারা বাংলা থিয়েটারের গতিপথেও আনেন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। বৈশিষ্ট্যবিচারে তাঁর সৃষ্টিকর্ম মানবতার বিজয়মহিমায় উদ্দীপ্ত, বস্তুজগতের প্রতি পুনর্জাগরিত আগ্রহে পরিপূর্ণ, কাহিনীনির্মাণের ক্ষেত্রে বেগবান এবং মানবিক দ্বন্দ্বসম্পৃক্ত ও ট্র্যাজিক অনুভূতিতে আপ্লুত। গিরিশ ঘোষের মতো তিনি সরাসরি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই সমস্ত ঔপনিবেশিক যুগের বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আদর্শস্থানীয়, যাঁরা শাসকজাতির সংস্কৃতিকে সাফল্যের সাথে আত্মীকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মেজাজ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কি সার্থকভাবেই না শেক্সপিয়রীয় নাট্যকলার মর্মার্থ এতে গৃহীত হয়েছে! তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অতিমানবীয়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান, বীরধর্মের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং পুরুষালি বীর্যবত্তাসম্পন্ন। বীরত্বব্যঞ্জক ভাবানুভূতি ব্যবহারে পারদর্শিতা এবং ভাষার অপূর্ব সংগঠনক্ষমতা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাফল্যের কারণ। কিন্তু এই ভাষারীতিই আবার কখনো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে যখন সামাজিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা নির্বিশেষে তাঁর সকল চরিত্র একই ভাষাভঙ্গিতে কথা বলেছে। তিনি তাঁর নাটক থেকে স্বগতোক্তি পরিহার করেন, চরিত্রচিত্রণে মোটা দাগের আশ্রয় নেন আবার একই সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলোয় সুচারুভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখেন। তাছাড়া চরিত্রগুলির অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ফুটিয়ে তুলে জটিল চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তিনি এমন এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেন, যা বাংলা থিয়েটারে ইতিপূর্বে আর কখনো পরিলক্ষিত হয় নি।

৪. *সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ : শিশির কুমার থেকে নবান্ন (১৯২০-১৯৪০)*

গিরিশ ঘোষ ও ডি. এল. রায়ের মৃত্যু এবং প্রথম মহাযুদ্ধের অপচ্ছায়া দূরীভূত হওয়ার পর নাট্যনির্মাণরীতি ও নাট্যমঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা থিয়েটার বহন করছে এক অসাধারণ পরিবর্তনের সাক্ষ্য। এ সময় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি জনগণের বৃহত্তর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়; তথাপি যেসব পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করে সেসব নাটকের কেন্দ্রস্থলে

অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় 'মানুষ'। ফলে হিন্দু অবতার রামচন্দ্রের আবেদন অন্যান্য মহাকাব্যিক বীরদের থেকে বরং একজন মানবিক গুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ হিসেবেই অধিক ফুটে উঠতে থাকে। ঐতিহাসিক নাটক থেকে মেলোড্রামা অন্তর্হিত হয় এবং এতে ইতিহাসসমর্থিত সত্যতা প্রতিপাদনের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র, যার প্রতিফলন ঘটেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলোয়, তা বঙ্কিমী উপন্যাসের শক্তিশালী রোমান্টিকতা এবং গিরিশ ঘোষের নাটকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বাংলা থিয়েটারে গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়। পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামো অপসৃত হতে শুরু করে এবং ইবসেন ও বার্নার্ড'শ প্রবর্তিত কলাকৌশল সেস্থান অধিকার করতে থাকে, যদিও রোমান্টিক নাট্যকলার অস্তিত্ব বরাবরের মতো অক্ষুণ্ণই রয়ে যায়। এসময়ে নাট্যনির্মাণরীতিতে ঝোঁক পরিবর্তনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। শিশির কুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) প্রদর্শিত অভিনয়রীতি হয়ে উঠে কম অলঙ্কৃত তথা আনুষ্ঠানিক এবং অধিকতর স্বাভাবিক। অভিনয়কলা, ঘটনার অর্থপূর্ণ বিন্যাস ও অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গিকে একত্রে গ্রথিত করার বিষয়টিতেও গুরুত্বারোপ করা হয়। *রঘুবীর* নামক বিদ্যাবিনোদের একটি নাটকে শিশির কুমার ভাদুড়ী যেভাবে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সে সম্পর্কে বর্তমানকালের বাংলা নাট্যশালার সবচেয়ে প্রতিভাবান অভিনেতা শম্ভু মিত্র মন্তব্য করেন :

> যদি কেউ এটা উপলব্ধি করতে চাইতো যে, কীভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সীমানায় আবদ্ধ শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ক্রমে মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে, তবে তাকে অবশ্যই তাঁর (শিশিরের) অভিনয়কলা দেখতে হতো। যখন কেউ হেসে উঠার উপক্রম করতো, তখন হঠাৎ তিনি তাঁর সমস্ত হাস্যরস সংবরণ করে নিতেন। আমি অনুভব করতাম তিনি আমার সমস্ত অনুভূতিকে দ্রুত এক ভীতিপ্রদ পরিভ্রমণে আকাশের উর্ধ্বে অত্যুচ্চ স্থানে নিয়ে গিয়ে তারপর আমাকে ফেলে রেখে যেতেন একাকী—মৃত্যুর মুখোমুখি।[১০৬]

১৯৩১ সালে বাংলা থিয়েটারের আলোকসজ্জা ও সেট ডিজাইন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকল্পে আমেরিকা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সতু সেন। তারই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝেতে সন্নিবেশিত বাতির (ফুটলাইট) প্রচলন উঠে গিয়ে মাথার উপর স্থাপিত নির্দেশনাত্মক আলোকব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রঙিন ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হতে শুরু করে বক্স-সেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন ও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালসঙ্গতিহীনতা ক্রমান্বয়ে কালসচেতন ঐতিহাসিক নির্ভুলতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে। নেপথ্যসঙ্গীত হিসেবে জীবন্ত অর্কেস্ট্রা ব্যবহারের ধারাও ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। নাটকের মধ্যে গান ও নাচের গুণগত মান উন্নত হয় এবং পূর্ববর্তীকালে সচরাচর দৃশ্যমান একঝাঁক নাচিয়ে রমণী বা সখীদল ক্রমশ এর প্রায়োগিক মূল্য হারিয়ে নাট্যমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। এই সময়টি অবশ্য আরো একটি বিষয়ের উত্থান দ্বারা চিহ্নিত, আর তা হচ্ছে নাটকনির্মাণে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে একজন

১০৬. Raka, *Bengali Theatre*, 98, quoted by Rustam Bharucha, *Revolution*, 33.

পরিচালকের আগমন, যিনি সবকিছুকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে সংস্থাপিত করবেন। সামাজিকভাবে এসময়ে সংস্কৃতমনা অভিজাত গোষ্ঠীর কাছে নাটক একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর বহুসংখ্যক ব্যক্তি থিয়েটারকে জীবিকার্জনের এক মর্যাদাপূর্ণ উপায় হিসেবে বেছে নিতে থাকে।

এদিকে, চিত্রধর্মিতার প্রতি ক্রমবর্ধমান মোহ এবং সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার আধিপত্য পূর্বকালীন অনুষ্ঠানরীতি 'গীতাভিনয়কে' ক্রমে কোণঠাসা করে ফেলে। একসময় তা দৃশ্যপট থেকে প্রায় মুছেই যায়। এই কালপর্বটি একদিকে শহুরে থিয়েটারের চিত্রধর্মিতার প্রতি মোহ এবং অন্যদিকে গ্রামীণ নাট্যকলার নিজস্ব নাট্যপ্রদর্শনরীতি এই দুয়ের মধ্যে নির্দেশ করছে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য। এর একমাত্র লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন' যে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এই কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯), সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭) এবং আরো স্বল্প কয়েকজন। মন্মথ রায় ছিলেন জেলাশহরের একজন আইনজীবী, যিনি খ্যতি অর্জন করেন ১৯২৩ সালে *মুক্তির ডাক* নামে একটি গুরুগম্ভীর একাঙ্কিকা লিখে এবং এরপর থেকেই তাঁর অনুসরণে একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়ে যায়। তিনি অনেকগুলো সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেন আর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আছে কয়েকটি পুরাণাশ্রয়ী নাটক, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যা পূর্ববর্তীকালের এজাতীয় রচনা থেকে পৃথক। মন্মথ রায়ের নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০ সালে রচিত তাঁর *কারাগার* নাটকটি বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এখানে তিনি *ভাগবত পুরাণ* থেকে বেছে নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ সংক্রান্ত একটি সুপরিচিত কাহিনী, যেখানে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে, একদিন এই শিশুটিই ধ্বংস করবে নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসক কংসকে। নাটকটি ছিল গান, নাচ ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাপক ব্যবহারে ভারাক্রান্ত এবং এটি অনুসরণ করেছে পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট গঠনকাঠামো, যা স্বল্পকাল পরে অন্যান্য নাট্যকারগণ পরিত্যাগ করেন। এছাড়া মন্মথ রায় আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন যাদের মধ্যে *খনা* (১৯৩৫) ও *মীরকাশিম* (১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য। তিনি খ্যাতিলাভ করেন তাঁর সাবলীল সংলাপ, জমজমাট চিত্রকল্প, চরিত্রগুলোর অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলায় পারদর্শিতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা, চরম পরিণতি সৃষ্টিতে সাফল্য এবং নাট্যমধ্যে কার্যকর বিস্ময় উৎপাদন ও দ্রুতগতিশীল নাটকীয় কার্যকলাপ সংযোজনে কুশলীপনার জন্য। তিনি নাটকের বিস্তৃতি কমিয়ে একে আরো ছোট করে ফেলেন এবং পুরনো খণ্ডিত মুক্তছন্দ রীতির পরিবর্তে সহজ কিন্তু কাব্যিক গদ্যভাষা ব্যবহার করেন।[১০৭]

---

১০৭. Sushil Mukherjee, *Theatres*, 561-62.

সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন সাংবাদিক এবং একজন দুর্দশাগ্রস্ত, পতিত রমণীর জীবন নিয়ে ১৯২৯ সালে লিখিত *রক্তকমল* নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পেশাতেই নিয়োজিত থাকেন। যখন নাটকের স্থায়িত্বকালের আদর্শ মান ছিল পাঁচ ঘণ্টা, তখন তিনি মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তাঁর নাটককে পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত করে নির্মাণ করেন এবং প্রতিটি দৃশ্যের শেষে একজন বর্ণনাকারীর কণ্ঠে জুড়ে দেন একটি গান। এই গানগুলোর রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। আর্থিক বিবেচনায় নাটকটিকে সফল বলা না গেলেও ঠিক এর পরের বছরই তিনি আসেন একটি ঐতিহাসিক নাটক *গৈরিক পতাকা* নিয়ে। যখন দেশব্যাপী চলছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তুঙ্গ আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগমথিত ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী নাটকটি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত করে দেয়। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনকারী অপর ঐতিহাসিক নাটক হলো *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৩৮)। ঐতিহাসিক নাটকগুলোয় তিনি পুরোপুরি ঐতিহ্যপন্থী এবং ডি. এল. রায়ের প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত। তথাপি বাংলা থিয়েটারে সচীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অবদান হচ্ছে সামাজিক চিন্তাভাবনা, যার মাধ্যমে তিনি নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকরীতি উভয়ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন। তিনি পরিহার করেছেন পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামো এবং চরিত্রসমূহের মধ্যে উপযুক্ত মনস্তত্ত্ব আরোপে হয়েছেন সচেষ্ট। সচীন্দ্রনাথ তাঁর *ঝড়ের রাতে* (১৯৩১) নামক সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক নাটকে দৃষ্টিপাত করেছেন নারী-মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে এবং সমর্থন করেছেন নারীমুক্তির ধারণা। গণমানুষের সংগ্রাম সমর্থনকারী একজন অগ্রসর চিন্তার নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর নিজের লেখা *জননী* (১৯৩৩), *প্রলয়* (১৯৩৭), *নার্সিং হোম* (১৯৪০) ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় নাটক থাকা সত্ত্বেও তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবি, দেবদাস* প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদান করেন।[১০৮]

তাঁর সমসাময়িক বিধায়ক ভট্টাচার্য ১৯৩৮ সনে লিখিত *মেঘমুক্তি* নামক সামাজিক নাটকের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আবির্ভূত হন। তিনি পরিবর্তনশীল একটি সমাজে শহুরে মধ্যশ্রেণী এবং এর পরিবর্তনেরই অভিঘাতে '৩০ ও '৪০-এর দশকে এই শ্রেণীটির পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট মূল্যবোধের সঙ্কটচিত্র অঙ্কনের জন্য সুপরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে *মাটির ঘর* (১৯৩৯), *বিশ বছর আগে* (১৯৩৯), *রক্তের ডাক* (১৯৪১) ইত্যাদি অন্যতম। এসময়ে বাণিজ্যিক নাট্যশালাগুলোর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, এমন এক জাতীয় পরিস্থিতিতে কলকাতাভিত্তিক বাণিজ্যিক নাট্যশালাগুলো তরল ভাবোচ্ছ্বাসসিক্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক মেলোড্রামাসমূহ মঞ্চায়নে

---

১০৮. প্রাগুক্ত, 562-63.

ব্যস্ত থেকেছে, যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষ, ফেনায়িত হিংস্রতা এবং বৃটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তির দাবিতে ছিল আন্দোলনমুখর। যদি শিল্পমাধ্যমসমূহের ভূমিকা হতে হয় সঙ্কটমুহূর্তে নিজ সম্প্রদায়ের যৌক্তিক চেতনার বিশ্লেষণী মুল্যায়ন ও অন্তর্দৃষ্টি সংযোজন দ্বারা একে একটি আদর্শিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করা, তবে সন্দেহ নেই শহুরে বাণিজ্যিক নাট্যালয়গুলো সে ভূমিকা পালনে হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ১৯৩৬ সালে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় লেখকদের মধ্যে মুলুকরাজ আনন্দ, মুনশি প্রেমচাঁদ, সাজ্জাদ জহির ও অন্যান্যরা মিলে গঠন করেন 'প্রগতিশীল লেখকসঙ্ঘ' (PWA) এবং লখনৌতে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রথম অধিবেশন। PWA-র দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায় ১৯৩৮ সালে। এতে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

> ভারতের নতুন সাহিত্যকে অবশ্যই আজ সংহতি প্রকাশ করতে হবে আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাসমূহের সঙ্গে—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং রাজনৈতিক দমননীতি হতে উদ্ভূত সমস্যার সঙ্গে। যেসব বিষয় আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে বশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা ও যুক্তিশূন্যতার পানে, আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচনায় সেসব প্রত্যাখ্যান করি। যেসব বিষয় আমাদের মধ্যে যৌক্তিক সমালোচনার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে; যা প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসমূহকে যুক্তির আলোতে ফেলে পরীক্ষা করে দেখে; যা আমাদের সক্রিয় হতে, সঙ্ঘবদ্ধ ও রূপান্তরিত হতে সহায়তা করে, আমরা সেসব বিষয়কেই শুধু প্রগতিশীল বিবেচনায় গ্রহণ করি।[১০৯]

কিন্তু শিল্প ও সামন্তবাদের মধ্যে নিহিত আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বৃহত্তর সমাজ-পরিমণ্ডলে বিরাজমান ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সর্বপ্রথম যে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলার অধিকাংশ অগ্রণী লেখক-শিল্পীগণ (যামিনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ) একতাবদ্ধ হয়ে ১৯৪২ সালে গঠন করেন 'ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী ইউনিয়ন'। নবগঠিত এই ইউনিয়ন কলকাতা, হাওড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর নৈকট্যলাভের জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, যদিও এই সময় পর্যন্ত সংস্কৃতিতে কর্তৃত্বকারী মহল একে অবজ্ঞাই করে গেছে।[১১০] অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২ মে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে জন্মলাভ করে 'দি ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে IPTA।

PWA যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল IPTA তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এটি শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদেরকে

---

১০৯. From the amended manifesto of All-India Progressive Writers' Conference, Calcutta, 1938, quoted by Bharucha, *Revolution*, 37.

১১০. বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন, Rustam Bharucha, *Revolution*, 37-39.

সাধারণ গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। IPTA-র ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য দেশব্যাপী অশান্ত পরিস্থিতির কারণে বেশ ভালভাবেই অর্জিত হয়। একদিকে পুলিশী দমননীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, খাদ্যাভাব, শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও কৃষকদের অমানবিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে স্থানীয় নাট্যকলার বিভিন্ন শাখা কর্তৃক এইসব সমকালীন বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান রচনা—এই দ্বিধারিক অবস্থা IPTA-র জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। বাংলায় কবিগান-এর এক লোকশিল্পী কবিয়াল রমেশ শীল ক্রমবর্ধমান সামাজিক চেতনা ও নাট্যশিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং স্থানীয় অনুষ্ঠানরীতিতে সাধন করেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে রমেশ শীল তাঁর অনুষ্ঠানকাঠামো থেকে সামন্ত মরমীবাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এতে সংযোজন করেন স্বদেশপ্রেমের ধারণা ও শ্রেণীসচেতনতা। এদিকে মধ্য-চল্লিশের দশক প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপ ও ভস্মস্তূপের মাঝে ফেলে রেখে যায় বাংলা নামে এক ভূতুড়ে ভূখণ্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালির কঙ্কালসার মৃতদেহ। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৪৩ সালের ভয়ালতম দুর্ভিক্ষ, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি মানবসৃষ্ট দুর্বিপাক। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধরত বৃটিশ সৈন্যদের জন্য এদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি শুরু হলে সারাদেশে ভয়ানক খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং পরিণামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

> আমি কলকাতার রাস্তায় একটি শিশুকে মৃতদেহগুলোর উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে অসহায়ভাবে তার মাতার বক্ষদেশ অনুসন্ধান করতে দেখলাম। (শিশুটি জানেনা ওর) মা ততোক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।[১১১]

মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এই তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে IPTA-র বাংলা শাখা মঞ্চস্থ করে বিজন ভট্টাচার্য লিখিত *নবান্ন* নাটকটি, যার পরিচালনায় যৌথভাবে ছিলেন শম্ভু মিত্র ও নাট্যকার নিজে। বাংলা থিয়েটারে *নবান্নর* প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রাথমিকভাবে এটি জনসমাজে নাট্যচর্চাকারীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। প্রশ্ন উঠে, যদি তারা পেশাদার নাট্যকর্মী হিসেবে বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ নাটকসৃষ্টিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের সামনে আর কি কি বিকল্প পথ খোলা রইলো ? কলকাতার *নবান্ন*-পরবর্তী নাট্যকলা, যার সূত্রপাত ৫০-এর দশকের প্রথম থেকে, তা এরপর এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই গোড়াপত্তন করে গ্রুপ-থিয়েটার নামে এক নতুন নাট্যধারার। এর তাৎপর্য হলো এই যে, একদল আদর্শিকভাবে উদ্বুদ্ধ নাট্যকর্মী অর্জন করতে চাইলো এমন এক যোগ্যতা যে একই সঙ্গে তাঁদের কাজে সমাজ-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ—

---

১১১. ঐ, 45 & 49.

দুইই বজায় থাকবে। সেসময়ে থিয়েটারের এই ধারণা আর্থিক দিক দিয়ে অলাভজনক ছিল বিধায় তারা সবাই নাটক থেকে অর্থগ্রহণে অসম্মত হন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবিকার প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

নাটকরচনা এবং নাটকপ্রদর্শনী উভয় ক্ষেত্রেই *নবান্ন* প্রবর্তন করেছিল এক নতুন যুগ। বিজন ভট্টাচার্য ঘরোয়া ভাষাভঙ্গি ও চূড়ান্ত নাটকীয় রীতিতে তাঁর বাস্তব উপলব্ধি ব্যক্ত করতে চাইতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> গণসংগ্রামের কাহিনীগুলো কিছুতেই আমাদের সময়কার বীরদের কারো চেয়ে কম মহত্ত্ব ধারণ করে না, এমনকি গ্রীক দেবতাদের কর্মকাণ্ড থেকেও এসব কম রোমাঞ্চকর নয়। ডাইওনিসীয় প্রথাসমূহ আমাদের দেশে আজও বিদ্যমান। শুধু প্রতীক্ষা এমন এক চোখের জন্য, যা এসব দেখবে এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনার্থে মঞ্চে নিয়ে যাবে। আর এতেই নিহিত আছে আমার শক্তির উৎস।[১১২]

ভট্টাচার্যের নাটকের চরিত্রগুলো অধিকাংশই বাস করে গ্রামীণ বাংলায় এবং তারা কথা বলে তাদের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষায়। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, "আমি এদেশের সাধারণ মানুষকে খুব ভাল করে চিনি। কিভাবে তারা কথা বলে, হাসে, এবং আবেগ বিনিময় করে, তা আমি জানি।"[১১৩] *নবান্ন* নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য নিজে, তৃপ্তি ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র, শোভা সেন প্রমুখ পরবর্তী কয়েক বছরে কলকাতা মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু নাটকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার এবং জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কযুক্ত অভিনয়কলার জন্য তাঁরা একদিকে ইতিহাসও সৃষ্টি করে গেছেন।

সাধারণভাবে IPTA এবং নির্দিষ্টভাবে *নবান্ন* নাট্যকলায় সঞ্চার করে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা ও সচেতনতা। সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের সমস্যাগুলো আলোচনার জন্য একটি ফোরাম গঠনে পদক্ষেপ নিয়ে এটি থিয়েটারের মূল ধারণা ও কর্মতৎপরতাতেও আনে মৌলিক পরিবর্তন। *নবান্ন*-র পথ ধরে কলকাতায় সূচিত হয় গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলন এবং সৃষ্টি হয় বাংলাবিভক্তির এক দুর্দশাময় উপাখ্যান। কিন্তু বিভক্তিপরবর্তী পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকলা সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এমন একটি নাট্যধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই, যা উল্লিখিত দুটি পর্বের সমান্তরালে বয়ে চলেছিল।

---

১১২. প্রাগুক্ত, 45.

১১৩. Samik Bandopadhaya's interview with Bijon Bhattacharya "Janasad-haraner Ami", published in the first issue of *Promu*, (Calcutta 1978), quoted by Rustam Bharucha, *Revolution*, 48.

৪. *রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থানীয় নাট্যকলার উন্নয়ন (১৮৮১-১৯৩৯)*

গিরিশ ঘোষ, ডি. এল. রায় এবং গণনাট্যশালার অন্যান্যদের পাশাপাশি বাংলার বড় মাপের সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬১-১৯৪১) প্রচুর নাটক লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলো অদ্বিতীয় এ কারণে যে, এতে মিশ্রণ ঘটেছে স্থানীয় নাট্যকলা, জীবন সম্পর্কিত এক সুগভীর ভারতীয় দর্শন (সেই সঙ্গে বেদের দার্শনিক অংশ উপনিষদ ও মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব) এবং ইউরোপীয় নাট্যকলা ও নাট্যনির্মাণ কৌশলের। মিশ্রণটি এতোই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত যে, এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না এবং তা প্রায় মূর্ত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এমন নয় যে তা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার তা অতিপাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্কৃত সাহিত্যিক ভাষাও নয়—তাঁর ভাষা 'কাব্যিক' এবং এর সহজ প্রবহমানতা আপাত দৃষ্টিগোচর বিষয়ের তলদেশ থেকে দরকারি জিনিসটি বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। যে শক্তভিতের উপর তাঁর নাটকের কাহিনীগুলো সংস্থাপিত তা খুবই অন্তর্মুখী এবং মানবজীবনের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটন ও আত্মিক মুক্তিলাভের উপায় অনুসন্ধানে অভিলাষী। কয়েকটি মাত্র কৌতুকনাট্য বাদে বিরল অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সাধারণ নাট্যশালায় মঞ্চস্থ তাঁর নাটকগুলো তেমন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। তথাপি তাঁর রচনা প্রমাণ করেছে যে, নাট্যকর্মী ও শিক্ষিত মহলে সেগুলো বিপুল প্রভাববিস্তারে সক্ষম। আমাদের যা স্মরণ রাখা জরুরি তা হলো, বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সার্থকভাবে লালন করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান নাট্যকর্মগুলো ধারণ করছে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি এক কালপরিধিকে। তিনি তাঁর নাট্যজীবন আরম্ভ করেন ১৮৮১ সনে *বাল্মিকী প্রতিভা* নামক গীতিনাট্য দিয়ে, এর কিছুকাল আগে তিনি জীবনের প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরেছেন এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। গীতিনাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথ সেসময়ে কলকাতায় জনপ্রিয় গীতাভিনয় (এর উৎপত্তি স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য থেকে এবং আমরা তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি) রীতি অনুসরণ করেন এবং ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাথে ইউরোপীয় উপাদান সংমিশ্রণে তাঁর অনবদ্য দক্ষতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাষিক উৎকর্ষ দ্বারা একে আরো এগিয়ে নেন। *বাল্মিকী প্রতিভায়* প্রদর্শিত হয় এক রোমান্টিক অভিনয়কৌশল ও মঞ্চনকশা।[১১৪] (পারিপার্শ্বিক ব্যাকড্রপ : জীবন্ত গাছপালার শাখা দিয়ে তৈরি অরণ্যমধ্যে হরিণ, আলোকসজ্জা ও বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদি) সহযোগে এটির হুবহু অনুকরণে ১৮৯৩ সালে প্রদর্শিত হয় *কাল মৃগয়া*। ১৮৮৪ সালে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* ('সন্ন্যাসী' নামে ইংরেজিতে অনূদিত) নামে তাঁর একটি নাট্যধর্মী কবিতা প্রকাশিত হয়।

---

১১৪. অজিত কুমার ঘোষ, *ইতিহাস*, ৩১৪-১৫।

এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর ভাষায় :

> এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কবিতাখানিকে আমার সমস্ত সাহিত্যকর্মের ভূমিকা হিসেবে দেখা যেতে পারে; অথবা এটা হতে পারে সেই ভিত্তিভূমি, যেখানে আমার সমস্ত লেখালেখির বসবাস— সেইখানে, সেই সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে।[১১৫]

এর কয়েক বছর পরে আরো দুটো চমৎকার নাটক তিনি আমাদের উপহার দেন—একটি *রাজা ও রানী* (১৮৮৯) এবং অপরটি *বিসর্জন* (১৮৯০)। এই দুটো নাটকেই রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রীয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডি নির্মাণের আপন দক্ষতা যাচাই করে নেন। পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাটক দুটোর ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সন্নিবেশিত নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে। *বিসর্জন* গোঁড়া ধর্মান্ধতাকে বর্জন করে মানববাদের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং *রাজা ও রানী* সোচ্চার কণ্ঠে আত্মকেন্দ্রিক প্রেমের ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে—আর অধিকাংশ রবীন্দ্র সমালোচকের মতে এ দুটোই তাঁর সবচেয়ে সেরা নাটক। কিন্তু এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ আর শেক্সপিয়রীয় রীতি অবলম্বনে নাটক লিখেন নি। এর পরিবর্তে ১৮৯২ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময় তিনি নিম্নোক্ত কতগুলো ছন্দোবদ্ধ নাটক রচনায় উৎসর্গ করেন, যেগুলো *মহাভারত*-এর একেকটি অনুকাহিনী (কেবল *সতী* বাদে, এটি নেয়া হয় মারাঠা ইতিহাস থেকে) অবলম্বনে লিখিত : *চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তি সম্বাদ* ও *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*। সমালোচকগণ চিহ্নিত করেছেন যে, এইসব নাটক প্রকৃত নাটকীয় চরিত্রসম্পন্ন নয়, বরং বর্ণনামূলক কাব্য এবং নাটকের সংমিশ্রণজাত এক নতুন ধরনের মিশ্রসাহিত্য মাত্র। এসব নাটকের চরিত্রগুলো বহির্মুখী নয়, বরং এদের আচরণ সর্বাংশে অন্তর্মুখী। যে ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, এরা সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ উত্থাপন করে, সমালোচনা করে, আর্জি জানায় অথবা বিচারে প্রবৃত্ত হয়।[১১৬] যদি কেউ বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার অন্তর্গত নাটগীতরীতিরই এক ক্রমবিকশিত রূপ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যপাঠগুলোকে গ্রহণ করে নিতে পারে, কেবল তবেই এসবের প্রকৃতি সহজে অনুধাবন করা যাবে। নাটগীত-এর মতো রবীন্দ্রনাথও এসব নাটকে চরিত্রসমূহের আত্মশক্তির অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন এবং নাটগীত রীতি অনুসরণে এগুলোতেও সংযোজন করেছেন অনধিক দুই অথবা তিনটি চরিত্র। যেমন : *বিদায় অভিশাপ*-এ চরিত্রসংখ্যা দুটি, *গান্ধারীর আবেদন*-এ প্রধান ৩টি, *কর্ণকুন্তি সম্বাদ*-এ ৩টি এবং *নরকবাস*-এ একটি কোরাস দলের সঙ্গে ৩টি চরিত্র।

---

১১৫. Rabindranath Tagore, *My Reminiscences*, (New York 1917), 239-40, উদ্ধৃত P. Guha Thakurta, *Drama*, 184.

১১৬. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, (কলকাতা ১৯৬৬), ১২-১৪।

নাটগীত অনুষ্ঠানে যেমন গান এবং শরীরী বাসনা ও ভক্তিরসের অধিক্য দেখা যেতো, রবীন্দ্রনাথ এর পরিবর্তে কাব্যরস সহ অন্যান্য রস ব্যবহার করেন। তাঁর এইসব নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুঘটনার কার্যকারণসম্পর্কের মধ্যে বিকশিত না হয়ে বরং আপেক্ষিক রকম স্থির থাকে, যা নাট্যকারকে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো এমন এক সুবিধা প্রদান করে, যেখানে ধীরে ধীরে ঘটনাপ্রবাহের বিকাশ ঘটানো যায় এবং চরিত্রের গভীরে প্রবেশ সহজতর হয়।

কাব্যনাটক রচনার এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটো কৌতুকনাটকও লিখেছিলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), যা *শেষরক্ষা* নামে ১৯২৪ সালে পুনর্লিখিত হয় এবং দ্বিতীয়টি হলো *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭)। এই দুটি ১৯২৬ সালে লিখিত *চিরকুমার সভার* সঙ্গে একত্রে গঠন করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কৌতুকরীতি। তীক্ষ্ণ, রসাল ও বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর কৌতুকনাটক এবং তৎকালীন কলকাতার রঙ্গালয়ে নির্মিত এজাতীয় নাটকের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।

১৯০২ সালে 'রঙ্গমঞ্চ' নামে এক প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি এই মর্মে মত দেন যে, এইসব রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার চারদিক ঘিরে স্থান দখল করে থাকা 'মূল্যবান বাজে জিনিস'-গুলো অপসারণ করা দরকার। একই প্রবন্ধে তিনি যাত্রা অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, যেখানে তিনি দেখতে পান দর্শক ও অভিনেতার মাঝে কোন কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হয় নি। ১৯১৬ সনে *ফাল্গুনী* নাটকের মুখবন্ধে তিনি আবারো ঘোষণা করেন, "মঞ্চে রং-করা ব্যাকড্রপ ব্যবহার অর্থহীন। আমরা চাই হৃদয়ের ব্যাকড্রপ, যেখানে সঙ্গীতের তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছবিটি।" ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণরীতির বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, যখন ১৯২৯ সনে *তপতী* নাটকের মুখবন্ধে আমরা তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখি যেখানে তিনি অনুভব করছেন—আধুনিক ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের ব্যাকড্রপ এক বিরক্তিকর উপদ্রব ও ছেলেমি ছাড়া আর কিছু নয়।[১১৭] এটা ঠিক যে, ১৮৮০ সালের দিকে নাট্যনির্মাণরীতি ও এর কলাকৌশলগত দিক সম্পর্কে তাঁর অন্তরে যে ধারণা (*বাল্মিকী প্রতিভা* ও *বিসর্জন*-এ প্রকটিত) বিরাজ করতো তা সেই শতাব্দীর পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে অনেকটা দূরীভূত হয়। একটি যথার্থ নাট্যনির্মাণরীতির জন্য তাঁর আকুলতা তাঁকে কাব্যনাট্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে স্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাধারণভাবে প্রতীকী বা রূপকধর্মী নাটক নামে পরিচিত তাঁর সম্পূর্ণ নতুন নাট্যনির্মাণরীতি উপস্থাপনে সক্ষম হন নি।[১১৮] তাঁর এধরনের নাটকগুলো

১১৭. অজিত কুমার ঘোস, *ইতিহাস,* ৩১৬, ৩১৮।

১১৮. এই ধরনের নাটকের শ্রেণীপরিচয় চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সমালোচকগণ দ্বিধাবিভক্ত। তাই বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য আমরা এগুলোকে 'প্রতীকী-রূপকাত্মক'-এই অভিধায় অভিহিত করবো।

হচ্ছে : *সারদোৎসব* (১৯০৮), *রাজা* (১৯১১), *ডাকঘর* (১৯১২), *অচলায়তন* (১৯২২), *মুক্তধারা* (১৯২২) ও *রক্তকরবী* (১৯২৬)।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারে ইউরোপীয় প্রতীকবাদ আমদানি করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইউরোপে যা ছিল বাস্তববাদ ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ, বাংলায় তা-ই ছিল স্বাভাবিক জাতিগত বৈশিষ্ট্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতীকবাদী রূপকাত্মক নাটকগুলোর মধ্য দিয়ে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন এক 'জীবন দেবতা'কে, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিরূপ এবং যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গঠনের মধ্য দিয়ে জীবনের অদৃশ্যমান মর্মবস্তু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।[১১৯] তাঁর নাটকে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রেরণাদায়ক শক্তি উদ্ভূত হয় মানুষের সেই আত্মচেতনা হতে, যা জড় বস্তুর আধিপত্য থেকে নিরন্তর মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ, যেমন, *রক্তকরবী*-তে নন্দিনী, *ডাকঘর*-এ অমল, *অচলায়তন*-এ পঞ্চক এবং *মুক্তধারা*-য় অভিজিৎ—এরা সবাই সেই আত্মার মুক্তিসন্ধানী মানুষ, যারা বস্তুগত বাধা, বস্তুশৃঙ্খল ও বস্তুআবদ্ধতার বন্ধন শিথিল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। *অচলায়তন*-এ এই বস্তুবন্ধন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গোঁড়ামি, *ডাকঘর*-এ এটি জ্ঞানীলোকের অনড় আইনপ্রয়োগ দ্বারা লভ্য তথাকথিত নিরাপদ বিশ্ব, *মুক্তধারা*-য় এটি সাম্রাজ্যবাদ, *রক্তকরবী*-তে এর স্বরূপ হচ্ছে কঠোর বস্তুবাদ এবং *রাজা* নাটকে এটি বাহ্যিক সৌন্দর্য ও বস্তুগত ভোগসুখ মাত্র। এই সমস্ত রবীন্দ্রনাটকের অন্তর্নিহিত মূলসুরটি হলো—অশেষ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই কেবল সত্যকে উপলব্ধি করা যায়; আর এর প্রমাণ মিলবে *মুক্তধারা*-তে অভিজিৎ এবং *রাজা* নাটকে সুদর্শন এই চরিত্র দুটির পরিণতি লক্ষ্য করলে। যাহোক, অজিত কুমার ঘোষ সঠিকভাবেই রবীন্দ্রনাট্যের মূলসুর চিহ্নিত করেন এভাবে যে, যন্ত্রণাভোগ ও দুঃখই জীবনের শেষকথা নয়, আত্মশক্তি এবং বস্তুর মধ্যকার অনন্ত সংগ্রামে আত্মশক্তিই জয়লাভ করবে; মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, বরং মৃত্যুর মধ্যে বয়ে চলে জীবনের বিজয়গৌরব (*মুক্তধারা* ও *ডাকঘর* অনুসারে); অথবা এই আশাবাদ যে, কোন একদিন বস্তুর বন্ধন ছিন্ন হবেই হবে (*রক্তকরবী* অনুসারে)। আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে ট্র্যাজেডির ধারণা ছিল তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী। ফলে তাঁর কোন একটি চরিত্রকে আমরা প্রগাঢ় দুঃখ-দুর্দশার নির্মম গ্রাসে পতিত হতে দেখি না। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমেই ট্র্যাজেডিকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্ভবত সঠিক কাজই করেছিলেন, যদিও *বিসর্জন* নাটকে তিনি এই রীতিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত তথাকথিত প্রতীকী-রূপকাত্মক নাটকগুলো আসলে একটি মিশ্রণ মাত্র—নাটগীত (সঙ্গীতের আধিক্য এবং ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টিতে কার্যকারণপদ্ধতির অনুপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত) ও ইউরোপীয় নাট্যকলার (মানবিক দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রনির্মাণের কতিপয় কৌশল প্রয়োগ দ্বারা

---

১১৯. প্রমথনাথ, *প্রবাহ*, ১৫৩।

চিহ্নিত) এক সচেতন সংশ্লেষণ ঘটানো হয়েছে এখানে। বস্তুর সঙ্গে আত্মশক্তির সংঘাত *রক্তকরবী* ও *মুক্তধারায়* প্রধান, *অচলায়তন*-এ তা তখনো প্রবল, *রাজা* নাটকে যুদ্ধের পর আর দৃশ্যমান নয় এবং *ডাকঘর*-এ এই সংঘাত প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন, যদি সেসবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা তাদের উপর রোমান্টিকতা অথবা বাস্তববাদিতার আলো প্রক্ষেপ করি, তাহলে তা খুব সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। কারণ 'নন্দিনী' ও 'অমল' এসেছে *নাটগীত*-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে এবং তারা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের অস্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট—যেমন করেছে বেহুলা, কৃষ্ণ ও ইমাম হোসেন। তাঁর ভ্রাম্যমাণ গায়ক চরিত্রের (*রাজা* ও *ডাকঘর*-এ ঠাকুর্দা এবং *অচলায়তন*-এ দাদা ঠাকুর) সাথে যাত্রানুষ্ঠানের 'বিবেক' ও রহস্যবাদী 'বাউল' চরিত্রদ্বয় অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার *অচলায়তন*-এ পঞ্চকের বিদ্রোহ এবং *ডাকঘর*-এ দূরকে কাছে পেতে অমলের আকুল প্রার্থনা—এ সবই রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল দর্শনের বিশেষ প্রভাব নির্দেশ করে। কিন্তু তিনি তাঁর নাটকের উপর স্থানীয় ঐতিহ্য সরাসরি চাপিয়ে দেন নি; তিনি যে এক ভিন্নতর যুগের প্রতিনিধি, সেই যুগসচেতনতা তাঁর মধ্যে ছিল। এদেশের স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় প্রতীকবাদীদের ধারণাসমূহ প্রয়োজনমতো অভিযোজিত করেই তিনি তাঁর অনবদ্য নাট্যরীতি নির্মাণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর নাটগীত রীতির প্রভাব তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষদিকে আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁর *শেষবর্ষণ, বসন্ত,* (১৯২৩), *নটরাজ ঋতু, রঙ্গশালা* (১৯২৭), *নবীন* (১৯৩১) এবং *শ্রাবণ-গাথা* (১৯৩৪) ইত্যাদিতে নাটকীয় উপাদানের অভাব এতো স্পষ্ট যে, স্বল্প কিছু পণ্ডিত তো এসবকে নাটক হিসেবে গ্রহণ করতেই স্বীকৃত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাচ-গানের প্রাচুর্য দিয়ে চিহ্নিত এসব রচনা স্থানীয় নাট্যচর্চার নিরিখে অবশ্যই নাট্যপাঠ। বলা যায়, স্থানীয় নাট্যকলার এই নাচ-গানপ্রধান বৈশিষ্ট্য শেষজীবনে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল, যখন তিনি রচনা করেন *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৮) ও *শ্যামা* (১৯৩৯)। লক্ষণীয় ব্যাপার যে, এই তিনটি নাটক রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনার একধরনের পুনর্লিখন মাত্র। গায়ক ও বাদক সমবায়ে গঠিত একটি কোরাস দল হচ্ছে তাঁর এই নাটকগুলোর অত্যাবশ্যকীয় অংশ। যদিও কোরাস দলের উপস্থিতি, গান, বাদ্যযন্ত্র ও নাচ, তুলনামূলকভাবে নাটকীয় সংঘাতের প্রতি কম গুরুত্বদান এবং সেইসাথে আত্মার গভীর অনুসন্ধানের আগ্রহ ও একটি কার্যকারণ সম্পর্কের সম্প্রতিক্রিয়াধারা নির্মাণের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের রসসৃষ্টি—এই সবকিছু রবীন্দ্র নাট্যকলার একটি অনন্য কাঠামো গঠনে সাহায্য করেছে, তথাপি আবারো বলতে হয়, স্থানিক নাট্যকলার প্রভাব এতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান। রবীন্দ্র চরিত্রগুলো যদিও বাস্তবতার ধারণা দিয়ে আঁকা নয়, তবুও কেউ একজন এর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা সহজেই অনুভব করতে পারেন। তাঁর নাট্যভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য ভাষা নয় বটে, কিন্তু যা বাস্তবতাকে ফুটিয়ে

তোলে এই ভাষা তারই নির্যাসস্বরূপ এবং সে কারণে তা দৈনন্দিন জীবনের ভাষার চেয়েও অধিকতর 'বাস্তব'। তাঁর এই ভাষিক বাস্তবতা যে প্রক্রিয়ায় 'অন্তর্মানুষ'-এর অপরিমিত গভীরতা থেকে উদ্ভূত হয় তা স্থানীয় নাট্যরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাটকের সম্ভাব্য একমাত্র সফল পরিচালক শম্ভু মিত্র যথার্থই বলেন, "সমাজ-রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে অবস্থান করেও আমাদের সোনালী যুগের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথই সক্ষম হয়েছেন।"[১২০]

পূর্ব বাংলায় ইউরোপীয় রীতির নাট্যকলা

ঔপনিবেশিক আমল

পূর্ব বাংলার ঔপনিবেশিক যুগের শহুরে নাট্যকলার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন বেশ পরীক্ষাসাধ্য কাজ যখন বলা হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল স্রেফ অনুকরণের অনুকরণ মাত্র—

> কলকাতা ছিল বাংলা নাট্যকলার কেন্দ্র যা পশ্চিমকে অনুকরণ করতো এবং ঢাকা ছিল সেই কেন্দ্র যা অনুকরণ করতো কলকাতাকে। ঢাকায় কিছুই মৌলিক ছিল না, আর অনুকরণ ছিল বাছবিচারহীন, এমনকি কখনো অনুকরণ করা হতো কিছু না বুঝেই।[১২১]

আঠারো শতকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মূলত জঙ্গলাকীর্ণ এবং জলাভূমিময়। উনিশ শতকের মধ্যে এসব অঞ্চল জনবসতি ও চাষাবাদের জন্য পরিষ্কার করে ফেলা হয়।[১২২] প্রায় ১৮৫০ সালের দিকে এখানে মাত্র গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছোটখাটো শহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিল। এসব ক্ষুদ্র শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নদীপথ ছাড়া ছিল না অন্য কোন কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থার অস্তিত্ব, এমনকি নগরবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল না তেমন কোন উপায়-উপকরণ। এসব শহুরে বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবীগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক, যারা তাদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়ির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রক্ষা করে চলতো সামাজিক ও বৈষয়িক সম্পর্ক। এমন এক নীরস ও নিরানন্দ পরিবেশে এসব শহরবাসী শুধু যে 'নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য' উন্নততর সভ্য (যেহেতু তা পশ্চিমী) চিত্তবিনোদন বলেই ইউরোপীয় নাট্যরীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা নয়, তারা একে

---

১২০. Sombhu Mitra, "Building from Tagore", *The Drama Review*, 15 : 3 (1971), 204.

১২১. ব্রজগোপাল দাস, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,* (১৮৪৭-১৯৭১), (ঢাকা ১৯৮৮), ৪৮, লেখককৃত অনুবাদ।

১২২. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার,* (ঢাকা ১৯৮৫), ১৩।

সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমরূপেও বিবেচনা করেছিল। ফলে কলকাতায় যেভাবে সামন্ত-ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীর উদ্যোগে এই শিল্পমাধ্যমটির গোড়াপত্তন হয়, পূর্ব বাংলায় ঠিক সেভাবে তা ঘটে নি। এখানে উদ্যোগ এসেছে জমিদার ছাড়াও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি আমলাদের উচ্চপদমর্যাদাধারী অংশকেও এই উদ্যোগের সঙ্গে শরিক হতে দেখা গেছে। পূর্ব বাংলার নাট্যকলা কলকাতার অনুকরণে গড়ে উঠলেও পরে এটি চরিত্রগতভাবে পৃথক রূপ ধারণ করে শুধু এই কারণে যে, গোড়া থেকেই এটি স্থানীয় শহুরে মধ্যশ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত হতে পেরেছিল। অবশ্য এদেশে প্রবাস-জীবন যাপনরতদের মনোরঞ্জনের জন্য এদেরই দ্বারা সৃষ্ট ইংরেজি নাটককে কিছুতেই উল্লিখিত ধারার অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যাবে না। ঢাকায় এরকম নাটক সর্বপ্রথম দর্শন করে বৃটিশ সিভিলিয়ান ও সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ১৮৫৭ সালের ১ জুন। এদিন বৃটিশ নৌসেনার দল মঞ্চস্থ করেছিল *ক্যাওস ইজ কাম এগেইন* এবং *অরিজিনাল* নামক দুটি কৌতুকনাট্য। অন্যদিকে উনিশ শতকী পূর্ব বাংলায় স্থানীয় উদ্যোগের ফলে নাট্যক্ষেত্রে তিনটি বিশেষ ধারা বিকাশ লাভ করে—(১) সৌখিন দলসমূহ, যারা বিশেষ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নাট্যপ্রদর্শন করতো, (২) সামাজিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ সৌখিন দলসমূহ, যারা প্রায়ই দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করতো এবং (৩) পেশাদার নাট্যপ্রতিষ্ঠানসমূহ।[১২৩]

পূর্ব বাংলায় আধুনিক মঞ্চকাঠামোয় মঞ্চস্থ সর্বপ্রথম নাটক হলো ১৮৫৬-৫৭ সনে বরিশালে প্রদর্শিত দুর্গাদাস করের *স্বর্ণশৃঙ্খল*। এটি লিখিত হয় ১৮৫৫ সনে, পরে ১৮৬৩ সনে ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং আবার ১৮৬৩-র জুলাই মাসে বরিশালে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে নাটকটি পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।[১২৪] আধুনিক মঞ্চে আয়োজিত নাট্যপ্রদর্শনের আরেকটি প্রাথমিক উদাহরণ হচ্ছে যশোরের এক পল্লীগ্রামে ১৮৫০ সনের ১ জানুয়ারি স্কুলছাত্রদের দ্বারা অভিনীত *শকুন্তলা* নাটক।[১২৫] ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত নাটক হলো দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* (১৮৬১)। মধুসূদনের *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৯৭২) এবং এজাতীয় অন্যান্য নাটক নিয়ে ১৮৭০ সাল নাগাদ ঢাকার সৌখিন নাট্যদলগুলি আধুনিক মঞ্চে আবির্ভূত হলে তারা ঢাকাবাসীদের কাছ থেকে লাভ করে বিপুল সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা।

---

১২৩. ঐ, ২৩-১৪।

১২৪. সুকুমার,বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৩২-৩৩।

১২৫. ঐ, ৩৯।

১৮৭০ ও ১৮৮০ সালের মধ্যে সৌখিন নাট্যপ্রদর্শনী ঢাকার বাইরে, বিশেষত বিক্রমপুরের আশপাশের গ্রামগুলো (হাছারা, কালীপাড়া, শ্রীনগর বজ্রযোগিনী), পাবনা (মালঞ্চি), কুমারখালি (মহিষবাগান, মেখলা)[১২৬] এবং টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রামগুলোয় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঢাকার বাইরে নিম্নোক্ত অঞ্চলে সৌখিন নাট্যপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় : কুষ্টিয়া (*জমিদার দর্পণ* ১৮৭১), শেরপুর (*একেই কি বলে সভ্যতা* ১৮৬৫), মুক্তাগাছা (মুক্তাগাছা এমেচার থিয়েটার পার্টি, ১৮৯৪), ফরিদপুর (ফরিদপুর টাউন থিয়েটার, ১৮৭০), ময়মনসিংহ (অমরাবতী নাট্যসমাজ, ১৮৯২), কুমিল্লা (১৮৮৫ সালের পর), রাজশাহী (উনিশ শতকের শেষে), যশোর (নিউ আর্য থিয়েটার, ১৮৮৫) এবং রংপুর (রংপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৮৯১)।[১২৭]

প্রথম স্থায়ী পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলা যায়, ঢাকা কলকাতাকে পথ দেখিয়েছিল। ১৮৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় নির্মিত হয় ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল।[১২৮] ঢাকাভিত্তিক সৌখিন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই হলভবনটি পালন করেছিল ব্যাপক উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা। ১৮৯০ সালে ভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সেস্থলে গড়ে উঠে ক্রাউন থিয়েটার। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী নাট্যালয়গুলো গড়ে উঠেছিল জনগণের মধ্যশ্রেণীর উদ্যোগ ও প্রভাবশালী জমিদারদের সহযোগিতা—এই দুইয়ের সংযোগে। কোন কোন স্থানে, যেমন বগুড়া, ময়মনসিংহ ও রংপুরে প্রধান সরকারি কর্মকর্তাগণও নাট্যালয় নির্মাণপ্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এমন উদাহরণ আরো দেখতে পাওয়া যাবে রাজশাহীতে (গোপাল রায় নাট্যশালা ও ভিক্টোরিয়ান রঙ্গমঞ্চ, উনিশ শতকের শেষে), টাঙ্গাইলের সন্তোষে (সন্তোষ জমিদারের নাট্যশালা, ১৮৯০), যশোরে (অভিভূষণ বাবুর বাসভবন, ১৮৯০), কুমিল্লায় (কুমিল্লা টাউন হল বিল্ডিং, ১৮৮৫ এবং ১৯০৮ সালে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ), দিনাজপুরে (দি ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার, ১৯০৪), বগুড়ায় (এডওয়ার্ড ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৯০৫), রংপুরে (রংপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৯১০) এবং ময়মনসিংহের গৌরিপুরে (জমিদার বাড়ি, ১৮৯৪)।[১২৯]

সামাজিক ও শৈল্পিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ কিছু সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর প্রবেশপত্র বিক্রির মাধ্যমে নাট্যপ্রদর্শনের জন্য ঢাকায় ১৮৭০ সন নাগাদ থিয়েটার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও তাৎপর্য লাভ করে।

---

১২৬. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ২৯-৩০।
১২৭. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ২১-৪৫।
১২৮. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ২৮।
১২৯. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ২১-৪৫।

১৮৭১ সালে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল মঞ্চে তারা *শরৎ সরোজিনী, মেঘনাদ বধ, মহারাষ্ট্র কলঙ্ক* ইত্যাদি নাটক প্রদর্শন করে। নবাবপুর এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি ছিল আরেকটি জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী, যা মঞ্চস্থ করে *শকুন্তলা*-র বাংলা নাট্যপাঠ (১৮৭১) এবং ১৮৯৮ সালের পরেও এই প্রতিষ্ঠান নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল বলে জানা যায়।[১৩০] আরো একটি নাট্যদল, যা গিরিশ ঘোষের *বিল্বমঙ্গল* প্রদর্শন করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা হচ্ছে ১৮৮৮-তে প্রতিষ্ঠিত ইলিসিয়াম থিয়েটার। এদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বুধ ও শনি—সপ্তাহের এই দুই দিন এরা নিয়মিত নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতো।[১৩১] *নীল দর্পণ* নাটক প্রদর্শনকালে সরকার এই নাটকের বিশেষ কিছু অংশের জন্য আপত্তি জানানোর পর নাট্যদলটি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে না পেরে অবশেষে বিলুপ্ত হয়।[১৩২] উনিশ শতকের আরো দুটো উল্লেখযোগ্য নাট্যগোষ্ঠী হচ্ছে 'সনাতন নাট্যসমাজ' (১৮৮৯-এ প্রতিষ্ঠিত) এবং 'অলিম্পিয়া থিয়েটার' (১৮৮৯), যারা এসময়ে ঢাকাই থিয়েটার জগতে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা।

এছাড়া উর্দু ভাষায় নাট্যচর্চা ঢাকায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং যতোদূর জানা যায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাঝে মাঝে উর্দু নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। এসবের মধ্যে 'ফারহাত আবজা' ১৮৯০ সালের মধ্যে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনের যোগ্যতাসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এ দলটির রয়েছে সমসাময়িক নাট্যকার আলি নাফিস লিখিত ৩০টি উর্দু নাটক মঞ্চায়নের অনন্য কৃতিত্ব।[১৩৩]

ঢাকায় সর্বপ্রথম পেশাদার নাট্যচর্চার দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়, যখন ১৮৮২ সালের ৩০ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে 'পূর্ব বাঙলা নাট্য সমাজ' মনমোহন বসুর *রামাভিষেক* নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। সম্ভবত 'নাট্য সমাজ' ১৮৭২ সালের আগেও নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতে পারে, যা আমাদের জানা নেই। তবে যেটুকু জানি তা হলো, তাদের অভিনীত *রামাভিষেক* নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং কিছু অজ্ঞাত কারণে ১৮৮৩ সালের দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হলে এরই কতিপয় সদস্য মিলে গঠন করেন 'ঢাকা থিয়েটার কোম্পানি' (১৮৮৩)। এঁদের অভিনীত নাটকের নাম ছিল *নবনাটক*।[১৩৪] ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে যে পর্যন্ত না ক্রাউন থিয়েটার

---

১৩০. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩২।
১৩১. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৭।
১৩২. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩৪।
১৩৩. ঐ, ৩৫।
১৩৪. ঐ, ৩৮।

প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, সে পর্যন্ত ঢাকার পেশাদার নাট্যচর্চা সম্পর্কে আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারি নি। ক্রাউন থিয়েটার সোম, বুধ ও শনি—সপ্তাহে এই তিন দিন রাতব্যাপী *চৈতন্যলীলা* ও *পূর্নচন্দ্র*-র মতো নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করতো।

পরবর্তীকালে থিয়েটারটি ঢাকার নবাবপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে *দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরানী, বিজয় বসন্ত* ও অন্যান্য নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানি। কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি এই কোম্পানির প্রায় জন্মলগ্ন থেকে এতে অন্তত বছরাধিক কাল অভিনয় করেন বলে জানা যায়।[১৩৫]

দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে জুন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ ও নয়াবান প্রথমবারের মতো ঢাকার মঞ্চে আবির্ভূত হন ১৮৮০ সালে ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে অনুষ্ঠিত নাটক *ইন্দ্রসভা*-তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।[১৩৬] স্থানীয় নাট্যানুষ্ঠান ছাড়াও কলকাতা থেকে আগত ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলও ঢাকায় তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে ১৮৭৩ সালের ১২ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। তাদের প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে ছিল *নীল দর্পণ, কৃষ্ণকুমারী, সধবার একাদশী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* ইত্যাদি। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে একবার এবং ১৯৭৯ সালে পুনর্বার ঢাকা সফর করে। বোম্বে থেকে এসে একটি দল ঢাকার দর্শকদের জন্য হিন্দিতে *ইন্দ্রসভা* নাটক প্রদর্শন করে যায়। এছাড়া 'স্টার কোম্পানি' ১৮৮৭ সালে এবং 'বীণা কোম্পানি' ১৮৮৮ সালে ঢাকা সফর করে।[১৩৭]

উনিশ শতকী নাট্যকলার সঙ্গে সাধারণভাবে পূর্ব বঙ্গ ও বিশেষভাবে ঢাকাকেন্দ্রিক বিশ শতকী নাট্যকলার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নিহিত আছে এদের গুণগত মানের মধ্যে। পেশাদার নাট্যদলগুলো সারা রাত ধরে হালকা বিনোদনমূলক নাটক উপহার দিত এবং এর সঙ্গে যুক্ত করতো বেশ ভাল মাত্রার নাচ ও গান। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের মালিকানা পরিবর্তিত হলে এর নতুন নামকরণ হয় লায়ন থিয়েটার। এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটির প্রদর্শনীতালিকায় যেমন থাকতো বাঙালি অভিনেত্রীসমৃদ্ধ উর্দু নাটক (*বুলবুল-এ-বিমার, শিরি-ফরহাদ, জালমা-এ-পারিশতান*), তেমনি থাকতো স্থানীয় বাঙালি নাট্যকাররচিত প্রহসনও (যোগেন গুপ্তের *চিড়িয়াখানা*, বিপিন বিহারী দাসের *লাঞ্ছনা* ইত্যাদি)।[১৩৮] ইতিমধ্যে নাট্যনির্মাণব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশাদার

---

১৩৫. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৯।
১৩৬. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩৫।
১৩৭. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ১৭-১৮।
১৩৮. ঐ, ৯, ১০, ১৩।

নাট্যশালাগুলো প্রভূত দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় এবং এসময়ে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটলে অবশেষে শিল্পটি এমনভাবে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে যে তা আর কখনো পুনঃসঞ্চার করা যায় নি। অধিকাংশ নাট্যগৃহ রূপান্তরিত হয় সিনেমা হলে এবং কেবল সৌখিন নাট্যদলগুলোই সময় সময় এসব স্থানে তাদের প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতো। সৌখিন নাট্যদলগুলো তা সত্ত্বেও বিক্ষিপ্তভাবে তাদের নাট্যপ্রয়াস অব্যাহত রাখে প্রধানত কলকাতায় জনপ্রিয়তালাভকারী নাটকসমূহের উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ঢাকায় দ্রুত গড়ে উঠে বেশ কিছু 'নাট্যচক্র', যেমন ওয়ারী নাট্যচক্র, টিকাটুলি নাট্যচক্র, আর্মানিটোলা নাট্যচক্র, শব্জি মহল নাট্যচক্র, গেণ্ডারিয়া নাট্যচক্র, ফরাশগঞ্জ নাট্যচক্র ইত্যাদি। এদের মঞ্চসফল নাটকগুলোর মধ্যে *সীতা, রাম, জোনা, শাজাহান, বাজী রাও, কারাগার, অশোক, টিপু সুলতান* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাব' বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রচেষ্টা নিয়েছিল মধ্যবিত্ত ঘরের নারী অভিনেত্রী দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার, কিন্তু এ উদ্যোগ সাফল্য লাভ করে নি। পরে এই নাট্যচক্রের প্রধান সংগঠক 'ঢাকেশ্বরী নাট্যসমাজ' নামক আরেকটি নাট্যদলের সঙ্গে যৌথভাবে দর্শনীর বিনিময়ে অনুরূপ একটি নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। কিন্তু এবারের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। ১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগে কোন এক সময়ে বলধার জমিদার একটি পেশাদার নাট্যদল গঠন করে অন্তত পাঁচ কি ছয় বছর ধরে তাঁর স্বরচিত ও স্বনির্দেশিত নাটকসমূহ মঞ্চস্থ করতে থাকেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।[১৩৯] এ সময়ে ১৯৩০-এর দশকে সৌখিন উর্দু নাট্যচর্চার ধারাটিকে বেশ বেগবান হয়ে উঠতে দেখা যায় প্রধানত এর রোমান্সধর্মী নাটকগুলোর জন্য। এসব জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে রয়েছে *গুল নাহার* (১৯৩১), *আনজুমান আরা* (১৯৩২), *আলম আরা, হোসনা আফরোজ, গুলশান-ই-জানফিদা, বিমার-এ-বুলবুল, শিরি-ফরহাদ* (১৯৩৬-১৯৩৭ সনের দিকে) ইত্যাদি। ঢাকায় উর্দু নাটকের এই জনপ্রিয় ঐতিহ্য নাট্যকলার প্রতি বাংলার মুসলমানের সাধারণ আগ্রহকেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে।[১৪০]

১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পটভূমিতে IPTA একটি যথার্থ ধনাত্মক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। দেশপ্রেমমূলক গান (পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে) এবং নাট্যানুষ্ঠান (কলকাতার *নবান্ন*, বরিশালে ১৯৪৫ সালে) আয়োজনের মাধ্যমে এটি জনগণের মাঝে সমাজসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। 'ঢাকা থিয়েটার' নামক ঢাকার একটি নাট্যদল ১৯৪৩ সনে তাদের একটি রূপকধর্মী নাটক *মেশিন ও মানুষ* প্রদর্শন দ্বারা বেশ আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রজগোপাল দাস রচিত নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে

---

১৩৯. প্রাগুক্ত, ১০-১১।

১৪০. ঐ, ১৩।

মানবসমাজের আভ্যন্তর সঙ্কট এবং নাটকে এর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান উদ্ভাবনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যদলটি পাঁচদিনে এই নাটকের মোট দশটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল এবং এগুলো সবই দর্শনীর বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সাফল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা রণেশ দাশ গুপ্তের এক-চরিত্র বিশিষ্ট সমাজচেতনামূলক নাটক মঞ্চস্থ করে, যেগুলোর একটি হচ্ছে *আমন ধান* এবং অন্যটি *ওরা ঘর বাঁধতে চায়* ।[১৪১]

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই কালপর্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ সমাধা করেছে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রগণ প্রথমে ডি. এল. রায়ের *বঙ্গনারী* (১৯২১) নাটকটি দিয়ে শুভসূচনা করে এবং পরবর্তী চার বছরে মোট নয়টি নাটক মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব দেখায়। নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করে এবং একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জনে সমর্থ হয়। তারা ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সনের মধ্যে গিরিশ ঘোষের *প্রফুল্ল*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *ক্ষুধা* এবং রবীন্দ্রনাথের *বৈকুণ্ঠের খাতা* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ছয় বছরে এই ছাত্ররা আরো সাতটি নাটক উপহার দেয়, যেগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *শেষরক্ষা*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মেঘমুক্তি* ও বনফুলের *মধুসূদন* ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪২]

উপনিবেশোত্তর কাল

১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর পেছনে ছিল বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, যাকে উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক ট্র্যাজেডি বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য অন্যদিকে একই সময়ে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র এতকাল শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকা অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বিরাট সুযোগও এনে দেয়। ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের অর্থপুষ্ট বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। দেশবিভাগের পর তারা ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস শুরু করলে স্থানীয় নাট্যকারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। নবোদ্ভূত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনীতি ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্তির দিকে এগোতে থাকে, যার একদিকে অবস্থান

---

১৪১. ঐ, ১২।

১৪২. প্রাগুক্ত, ১৪-১৫।

নেয় রক্ষণশীল ইসলামী মৌলবাদী শক্তি এবং অন্যদিকে জড়ো হতে থাকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী শক্তি। সুকুমার সেন[১৪৩] এই সময়কালকে যথার্থভাবে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :

ক. ১৯৪৭-১৯৫১ : আত্মপরিচয়ের সঙ্কট

খ. ১৯৫২-১৯৫৭ : বসন্ত জাগরণ

গ. ১৯৫৮-১৯৬৭ : দমন ও প্রতিরোধ

ঘ. ১৯৬৮-১৯৭১ : বিস্ফোরণ

ক. *১৯৪৭-১৯৫১ : আত্মপরিচয়ের সঙ্কট*

এ সময়ে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। ফলে এখানেও দুটো প্রধান শিল্পপ্রবণতা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে। এদের একটি হচ্ছে রক্ষণশীল-মৌলবাদী ধারা, যা ঢাকার বাইরের মফস্বল শহরগুলোয় অধিক শক্তিসঞ্চয় করে এবং মূলত কেন্দ্রীভূত থাকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যেই ' এসব নাটক সাধারণভাবে মহিমামণ্ডিত করতে চাইতো মুসলিম ইতিহাসকে। মুগল ঐতিহ্য, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহ, মুসলিম বাংলা এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিমণ্ডলেই এই ধারা এর সহজ গতিপথ এবং সার্থকতা অনুসন্ধান করে ফিরতো। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাট্যরচয়িতাগণ হচ্ছেন আকবরউদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), শাহাদাৎ হোসেইন (১৮৯৩-১৯৫৩) ও ইবরাহিম খলিল (জন্ম ১৯১৬)। আকবরউদ্দিনের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে *সিন্ধু বিজয়, সুলতান মাহমুদ*; রূপকাত্মক নাটকের মধ্যে *বন্দীমুক্তি* এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে *আযান* ও *অভিশাপ* উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুটি ছাড়া তাঁর সব নাটকই ইসলামী ঐতিহ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। শাহাদাৎ হোসেইন লিখেন কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক নাটক, যেমন *মসনদের মোহ, সরফরাজ খান, আনারকলি* ইত্যাদি। ইব্রাহীম খাঁ রচিত গুরুত্বপূর্ণ নাটকের মধ্যে *কামাল পাশা* ও *আনোয়ার পাশা* ঐতিহাসিক শ্রেণীর নাটক এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান কামনায় নিবেদিত। তাঁর *কাফেলা* একটি একাঙ্কিকা, যার পটভূমি হচ্ছে গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারা। আর ইবরাহিম খলিলের *স্পেন বিজয়ী মুসা* নাটকটিতে স্পেনে মুসলিম বিজয়াভিযানের কাহিনী ফুটে উঠেছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে।[১৪৪]

---

১৪৩. কালপর্বে বিভক্তির এই বিষয়টি এবং আলোচ্য পৃষ্ঠাগুলোয় এসংক্রান্ত বিশ্লেষণ সুকুমার সেন কর্তৃক পরিচালিত এক ব্যাপক ও তথ্যপূর্ণ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত। দেখুন সুকুমার সেন, *ইতিহাস*।

১৪৪. প্রাগুক্ত, ৮১-৮৯।

নাট্যকলায় পরিলক্ষিত দ্বিতীয় মূলধারাটির অস্তিত্ব এ সময়ে প্রধানত ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। এই ধারায় অবস্থানরত আদর্শগতভাবে প্রগতিপন্থী ও গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী নাট্যকারগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক নাট্যচর্চার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শতকত ওসমান (জন্ম ১৯১৭), নুরুল মোমেন (জন্ম ১৯০৮), আশকার ইবনে শাঈখ (জন্ম ১৯২৫), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), জসীমউদদীন (১৯০৩-১৯৭৬), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), ওবায়দুল হক (জন্ম ১৯০২) এবং সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম ১৯২২)।

শওকত ওসমান তাঁর দ্বি-অঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক *তস্কর ও লস্কর*-এ সমসাময়িককালের নৈতিক মূল্যবোধের স্খলনজনিত সামাজিক সঙ্কটকে চিত্রায়িত করেন। তাঁর পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট প্রহসনধর্মী *কঙ্কর মণি* নাটকে আছে সমাজের বিত্তশালী এলিট শ্রেণীর প্রতি তীর্যক সমালোচনা এবং *আমলার মামলা* নামক পরবর্তী নাটকে শওকত ওসমান আক্রমণ পরিচালনা করেছেন সরকারি আমলাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। নুরুল মোমেন তাঁর *নেমেসিস* নাটকে একজন মাত্র অভিনেতার দ্বারা সম্পন্ন করেন এক কৌতূহলী নিরীক্ষণ। এতে ঘটনাস্থল অপরিবর্তিত রেখে অর্থনৈতিক চাপেব ফলে কীভাবে সমাজে নৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয় তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পরবর্তী নাটক *রূপান্তর*-এ তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন এক পারিবারিক জীবনের জটিলতর রূপ। আশকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক *বিরোধ* অঙ্কন করে গ্রামবাংলার সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রতিকৃতি। তাঁর *পদক্ষেপ* নাটকেও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামীণ জীবন এবং এতে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। *দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার* ওবায়দুল হকের পাঁচটি একাঙ্কিকার সঙ্কলনগ্রন্থ, যেখানে তিনি সমসাময়িককালের সামাজিক ব্যাধিসমূহকে বিদ্রূপ করেছেন। আবুল ফজল সমকালীন জীবনের এক সরস চিত্র তুলে ধরেছেন *একটি সকাল* নামক তাঁর চারটি একাঙ্কিকার সঙ্কলনগ্রন্থে। *আলোকলতা* নামক তাঁর দ্বিতীয় একাঙ্কিকা সঙ্কলনের বিষয়ও হচ্ছে সামাজিক সমস্যাবলী। এর অন্তর্ভুক্ত চারটি নাটক কৌতুকধর্মী, তন্মধ্যে *ভাই ভাই*-তে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজের একটি অংশ নিরন্তর ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে চলেছে। গ্রন্থভুক্ত পঞ্চম নাটক *তা তো হবেই* উপস্থাপন করে এক দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পরিবারের মর্মস্পর্শী কাহিনী। আবুল ফজলের পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক হচ্ছে *প্রগতি ও কায়েদ এ-আজম।* শেষোক্তটি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর জীবনভিত্তিক পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাটক। মুনীর চৌধুরী এ সময়ে দুটি নাটক প্রকাশ করেন। এর একটি *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত* এবং অন্যটি *বেশরিয়তী।* এই দুই নাটকেই সামাজিক সমস্যাকে কৌতুকভঙ্গিমায় উপস্থাপনের চেষ্টা আছে। সৈয়দ আলী আহসানের *জোহরা মুশতারি* ও *কুরবানী* নাটকদ্বয় কাঠামোগত নতুনত্বের দাবিদার, তবে জাপানী 'নোহ্' থিয়েটারের সুস্পষ্ট প্রভাব এতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই কালপর্বে নাট্যকার হিসেবে আমরা জসিমউদ্দীনকেই কেবল এককভাবে

গ্রামবাংলার একান্ত নিজস্ব নাট্যকলার ঐতিহ্য অনুসরণে যত্নবান হতে দেখি। তাঁর *পদ্মাপার* নাটককে আখ্যায়িত করা হয়েছে রহস্যাত্মক-রূপক বলে, যা বাউল দর্শনের ভিত্তিতে রচিত। নাটকটিতে উত্তর বঙ্গের স্থানীয় *'মনাই যাত্রার'* রূপ ও রীতির লক্ষণীয় প্রভাব রয়েছে। তাঁর *বেদের মেয়ে* ত্রি-অঙ্কবিশিষ্ট নাটক এবং জসিমউদ্দীন এতে উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় *হুমরা বাইদা* উপাখ্যানটি ব্যবহার করে বাংলার সাপখেলা প্রদর্শক বেদে সম্প্রদায়ের এক অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন।[১৪৫]

এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের বাকি অংশকে নাটকনির্মাণে নেতৃত্ব প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাটকগুলোর বেশিরভাগই ছিল সামাজিক বিষয়ভিত্তিক এবং সেসব ছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, নুরুল মোমেন, আশকার ইবনে শাঈখ ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখ লিখিত উপন্যাসের নাট্যরূপ অথবা এঁদের লেখা অবলম্বনে রচিত নাটক। উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চার নির্দেশনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সক্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব। ভার্সিটি ক্যাম্পাসের বাইরে প্রদর্শিত নাটকসমূহ ছিল সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় বিষয়ভিত্তিক। সামাজিক নাটকের মধ্যে ১৯৫১ সনে মাহবুব আলি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের *বিজয়া*-র মঞ্চায়ন উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে নারীচরিত্রে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ ছিল সেসময়ে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত *টিপু সুলতান* ও অন্য কয়েকটি মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঢাকার বাইরের শহর এলাকাতেও মুসলিম বীরদের কাহিনীসম্ভূত ঐতিহাসিক নাটকই ছিল অধিক জনপ্রিয়। মঞ্চসফল এজাতীয় নাটকের মধ্যে *শাজাহান, টিপু সুলমান ও সিরাজউদ্দৌলা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪৬]

খ. *১৯৫২-১৯৫৭ : বসন্ত জাগরণ*

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন রক্ষণশীল মৌলবাদী ও গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছিল। রঙ্গমঞ্চের পর্দাতেও আমরা এই ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ্য করি; বিশেষত গণতন্ত্রী-মানবতাবাদীদের লিখিত নাটকসমূহে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক সচেতনতার ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। এসব নাট্যকার কখনো কখনো খুবই কৃত্রিম এবং শহুরে এলিটের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেও তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে অধিকতর

---

১৪৫. প্রাগুক্ত, ৮৯-১০৬।

১৪৬. ঐ, ৭২-৮০, ১২৮।

ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যাহোক, এটা অনস্বীকার্য যে, তাদের নাট্যপাঠ ও প্রদর্শনী ছিল গতিশীল এবং সেসময়ে বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যুর মোকাবেলা করছিল, এর বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে সেসব নাটক ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী দল ঢাকায় তাদের তৎপরতা চালাতো মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে। এ সময়ে তাদের প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী এবং আনিস চৌধুরীর নাটকই ছিল বেশি। রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো, প্রগতিবাদীদের কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতো যাদের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার প্রতিফলন ঘটতো না।[১৪৭]

মুনীর চৌধুরীর নবযুগ সৃষ্টিকারী নাটক *কবর* সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে, যখন লেখক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি কারাগারে বসেই নাটকটি লিখেন এবং তাঁর সঙ্গী অন্যান্য রাজবন্দি সহযোগে সেখানেই তা মঞ্চস্থ করেন। এটি পূর্ব বাংলার নাট্যকলাকে এক নতুন ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করে। কারাকর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বন্দিগণ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের সীমিত সামর্থের মধ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, যা ছিল '৪৭-উত্তরকালে এদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাট্যানুষ্ঠানসমূহের অন্যতম। তাঁরা বৈদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে হারিকেন, মোমবাতি ও দিয়াশলাই জ্বালিয়েই নাট্যপ্রদর্শনীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করেন। নাটকটির প্রকৃত আবেদন ও গুরুত্ব নিহিত এর রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে—যেমন একজন নাগরিকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ঘোষণা এবং সুতীব্র মানবিক দুর্দশার (পুলিশী নৃশংসতা ও গণহত্যা) চিত্র তুলে ধরা। যদিও আরইউন 'শ-এর *বারি দ্য ডেড* নাটকের গভীর প্রভাব এতে লক্ষণীয়, তথাপি বাংলা নাটকের ইতিহাসে *কবর* এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে এর সহজ-সরল অভিব্যক্তি ও প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য। ১৯৫৫ সনে বার্নাড 'শ-এর *ইয়্যু নেভার ক্যান টেল* অবলম্বনে রচিত মুনীর চৌধুরীর অপর নাটক *কেউ কিছু বলতে পারে না* সাহিত্যিক ও নাট্যকলাগত মূল্যের বিচারে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।[১৪৮] এ সময়ে লিখিত তাঁর অন্য দুটি নাটক *মানুষ* এবং *নষ্ট ছেলে* বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক বীক্ষণ ও মূল্যায়ন তুলে ধরে।

আনিস চৌধুরীর মানচিত্র (প্রথম প্রদর্শন ১৯৫৫) দারিদ্র্যকবলিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক সঙ্কটকে প্রতিফলিত করে। এটি মঞ্চায়নকালে প্রথাগত রঙিন ব্যাকড্রপের পরিবর্তে একজন স্কুলশিক্ষকের গ্রামীণ বসতভিটার অবিকল ছবি ব্যবহৃত হয়।[১৪৯] আশকার ইবনে শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা* প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীরে বসবাসকারী

১৪৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ১২৫-২৬, ১৪০-৪২।
১৪৮. ঐ, ১৩১, ১৪৯, ১৫০, ১৯১-১৯৪।
১৪৯. ঐ, ১৫০।

মানুষের জীবন ও তাদের সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এতে দেখা যায় যে, এইসব সংগ্রামী মানুষ সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টিতে মদদদাতা জমিদারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় এবং অবশেষে তাদের জমির ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় মৌলবাদ অনুসরণের বিরুদ্ধে নাটকটিকে এক দৃঢ় প্রতিবাদরূপে গণ্য করা যায়। লেখকের *দুরন্ত ঢেউ* নামক গ্রন্থটি সামাজিক বিষয়ে রচিত তাঁর কয়েকটি ক্ষুদ্র নাটিকার একটি সঙ্কলন। এগুলোর মধ্যে *দুর্যোগে* ভাষা আন্দোলনের বিদ্রোহ এবং সামগ্রিকভাবে *দুরন্ত ঢেউ* মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলে।[১৫০]

শতকত ওসমানের পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট ঐতিহাসিক রূপক নাটক *বাগদাদের কবি*-ও সমকালীন সামাজিক অবিচার এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রতিবাদে সোচ্চার।[১৫১] শহুরে সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষকরে এর ক্ষয়িষ্ণুতা ও দুর্নীতির করুণ দিকগুলো ফুটিয়ে তুলতে ওবায়দুল হক লিখেন *এই পার্কে*।[১৫২] অন্যদিকে জসীমউদ্দীন আগের মতোই বাংলার গ্রামীণ উপাদাননির্ভর নাটক রচনায় তাঁর আগ্রহ বজায় রাখেন এবং জনপ্রিয় এক লোককাহিনীর ভিত্তিতে লিখেন *মধুমালা* নাটক। তিনি নাটকে সঙ্গীত যোজনায় যথেষ্ট সাফল্য দেখালেও দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ব্যবহৃত ভাষা শহুরে শিষ্ট বাংলা ভাষাগোষ্ঠী থেকে বেশ দূরবর্তী হয়ে পড়ে। পল্লীবাংলার সামগ্রিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় সার্থক তাঁর আরেকটি নাটকের নাম হচ্ছে *পল্লীবধূ*।[১৫৩] পাশাপাশি *ময়মনসিংহ গীতিকার* অন্তর্ভুক্ত জনপ্রিয় কাহিনীর ভিত্তিতে আজিমুদ্দিন আহমদ (১৯০৪-১৯৭১) *মহুয়া* নাটক রচনা করলেও পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট রোমান্টিক নাটক হিসেবে এর সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন এটি তেমন সফল হতে পারে নি।[১৫৪] উপরে উল্লেখিত নাটক ও নাট্যরচয়িতাগণ ছাড়া ক্ষুদ্র আরেক দল নাট্যকার ছিলেন, যাঁদের সৃষ্টিকর্মে ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না, বরং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁদের কর্মকাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে—আকবরউদ্দিনের ঐতিহাসিক নাটক *নাদির শাহ* ও *সমাধি*, ইবরাহিম খলিলের ঐতিহাসিক নাটক *ফিরিঙ্গি রাজ*, গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন নিয়ে লিখিত ইব্রাহীম খাঁর *ঋণ-পরিশোধ* এবং আবদুল হকের (জন্ম ১৯১৮) মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক নাটক *অদ্বৈত*। যদিও ঢাকার বাইরের শহর এলাকাগুলোতেই রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থান করছিল, তথাপি ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সেসব অঞ্চলের

১৫০. প্রাগুক্ত, ১৬০-৬৫।
১৫১. ঐ, ১৬৫-৬৮।
১৫২. ঐ, ১৬৯-৭০।
১৫৩. ঐ, ১৭৬-৭৭।
১৫৪. ঐ, ১৫৯-৬০।

নাটকসমূহে পরিলক্ষিত ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনতার মাঝে স্থান করে নিচ্ছিল। ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রবণতা সেসব অঞ্চলে যদিও ঢাকার তুলনায় অনেক বেশি প্রবল ছিল, তথাপি স্বল্পকিছু প্রগতিবাদী নাটকের মধ্য দিয়ে একটি ধনাত্মক বিকাশের ইঙ্গিত অনুভব করা যেতো। এসব নাটকের মধ্যে ছিল *বৈকুণ্ঠের খাতা* (নারায়ণগঞ্জ ১৯৫৫), *উল্কা* (দিনাজপুর, ১৯৫৭; রংপুর এবং রাজশাহী, ১৯৫৬), *ছেঁড়া তার* (রাজশাহী, ১৯৫৭) ইত্যাদি।[১৫৫] নাট্যকর্মীরা এসময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরব হয়ে উঠেন। তা হচ্ছে, তাঁরা এমন একটি স্থায়ী থিয়েটারভবন নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেন, যা পূর্ব বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব পূরণে সক্ষম হবে। এই দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৫৬ সাল নাগাদ। এটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে সপ্তাহকালব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। অবশেষে সে বছরেই পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স সরকারি অর্থসাহায্যে ৮০০ আসনবিশিষ্ট একটি থিয়েটারভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।[১৫৬]

পূর্ববর্তী কালপর্বের সঙ্গে তুলনায় ১৯৫২-১৯৫৭ কালপর্বটি ছিল নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে, এমনকি নাট্যপ্রদর্শনরীতিতেও অভিনব অগ্রগতি সাধনের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। অধিকন্তু এসময়েই প্রতিষ্ঠালাভ করে 'ড্রামা সার্কেল' (১৯৫৬), যা গঠন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি দল এবং এই দলটি স্থানীয় নাট্যকলায় আধুনিক পাশ্চাত্য কলাকৌশল প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা এসময়ে যেসব নাটক প্রদর্শন করে সেগুলোর মধ্যে দুটো ভাষান্তরিত বিদেশী নাটক *দ্য প্রটেস্টর অব ইসপাহান* (১৯৫৬), *ইয়্যু নেভার ক্যান টেল*[৫৭] এবং *মানচিত্র* (১৯৫৭) উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী কালপর্বের অনিশ্চিত পরিস্থিতি এমন একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের পথ খুলে দেয়, যা নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য বয়ে আনে এবং অর্থবহ নাট্যাঙ্গন নির্মাণের জন্য ঢাকায় অদক্ষ হলেও অমিত প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে।

৩. *১৯৫৮-১৯৬৭ : দমন ও প্রতিরোধ*

গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী বলে পরিচিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাট্যকর্মীরা সামাজিক সুবিচার ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে এতদিন সোচ্চার ছিল, ১৯৫৮ সনে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করে তাদের বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, ১৪৫-৪৮।

১৫৬. ঐ, ১৫২-৫৫।

১৫৭. হেদায়েত হোসেইন মোর্শেদ, "ড্রামা সার্কেল ঃ প্রসঙ্গকথা এবং একক বজলুল করিম", রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা.* (ঢাকা ১৯৮৬), ২১৭।

কার্যকরভাবে হরণ করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ইসলামীকরণ নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার বিপরীতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনাতা এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য ও অর্থবহ প্রয়োজনের নিরিখে নাট্যকলার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এসময়ে জনপ্রিয় নাট্যকলার[১৫৯] সপক্ষে এবং মৌলবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব আহ্বান ছিল বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত। পূর্ববর্তী কালপর্বে যাঁরা নাট্যাঙ্গনে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন নুরুল মোমেন, আশকার ইবনে শাঈখ, শওকত ওসমান প্রমুখ, তাঁরা সরকারি রাজনৈতিক দমননীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরাপত্তার কারণে এসময়ে পালন করেন 'নিরপেক্ষ' বা 'চাতুর্যপূর্ণ' ভূমিকা। সর্বপ্রথম সংগঠিত ও কার্যকর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সূচনা ঘটে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাট্যজগতের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সাঈদ আহমদ ও ড্রামা-সার্কেল পূর্ব বাংলার নাট্যকলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ভাবচেতনা প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হন। এসময়ে একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের পূর্বোক্ত দাবি ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করলেও তা আগের মতোই নিষ্ফল থেকে যায়।

অন্যান্য জেলাশহরের মতো ঢাকাতেও নাটক রচনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। জেলাশহরগুলোতে এসব নাটকের প্রদর্শনীসংখ্যাও ঢাকার মতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও সেসবের মধ্যে সেকেলে হয়ে পড়া পুরাণাশ্রিত ও ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। এসময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে বাংলা একাডেমী আয়োজিত একটি ছয়দিনব্যাপী সেমিনারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'ড্রামাটিক লিটারেচার এ্যান্ড থিয়েটার আর্টস্'। ১৯৬৪ সনে শেক্সপিয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজন করে *ভ্রান্তিবিলাস* নাটক (শেক্সপিয়রের *কমেডি অব এররস্* অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত গদ্যানুবাদ অনুসরণ করে এর নাট্যরূপ দেন রামেন্দু মজুমদার এবং তা পরিচালনা করেন মুনীর চৌধুরী)। একই বছর একাডেমী আরো একটি উল্লেখযোগ্য নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে আর তা ছিল মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারী*[১৬০]। এসময়ে ঢাকার গুটিকয়েক মাত্র পেশাদার নাট্যদলের মধ্যে 'থিয়েটার' ছিল অন্যতম। ১৯৫৭ সনে একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে এটি ১৯৬৪ সন পর্যন্ত এর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে।[১৬১] কিন্তু ড্রামা সার্কেল ছাড়া '৪৭-পরবর্তী বাংলা থিয়েটার সম্পর্কিত কোন

১৫৯. কালিপদ দাস, "পূর্ব পাকিস্তান গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গ", *দৈনিক সংবাদ,* জানুয়ারি ২১, ১৯৬৫; উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা,* ২৫৫।

১৬০. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা,* ২৪৮-৫০, ২৫৯।

১৬১. আশকার ইবনে শাঈখ, *বাংলা মঞ্চনাট্যের পশ্চাৎভূমি,* (ঢাকা ১৯৮৬), ৯৭।

মুল্যায়নই সম্পূর্ণ হবে না। এই নাট্যদলটি প্রবর্তন করে আধুনিক মঞ্চসজ্জার ধারণা, যা বিভিন্ন নাট্যনির্মাণোপকরণের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংশ্লেষণ ঘটায়। সামগ্রিক অভিনয়কলা, নাট্যকলার অঙ্গীভূত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং 'সাইক্লোরামা'র কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আদর্শ ত্রিমাত্রিক মঞ্চবিন্যাস গঠন ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ড্রামা সার্কেলের আধুনিক পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নাট্যচর্চার স্বাক্ষর বহন করে। এই কালপর্বে ড্রামা সার্কেল যেসব নাটক নির্মাণ ও প্রদর্শন করে সেগুলো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* (১৯৫৮), *তাসের দেশে* এবং *রাজা ও রানী* (১৯৬১); সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর *বহিপীর* (১৯৬১); সাঈদ আহমদের *কালবেলা* (১৯৬২); সফোক্লিসের *ইডিপাস রেক্স'র* (১৯৬২) অনুবাদ; বার্নার্ড শ'র *আর্মস এ্যান্ড দ্য ম্যান* (১৯৬৩) এবং মিলারের *অল মাই সানস্* অবলম্বনে লিখিত নাটক (১৯৫৯)। এই নাট্যদলটির সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে তিনি হচ্ছেন বজলুল করিম (মৃ. ১৯৭৭)। দলের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি এর নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব পালনে যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তা আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।[১৬২]

এসময়ের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) অন্যতম। তিনি তাঁর নাটকে ইউরোপকেন্দ্রিক শৈল্পিক ভাবচেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির এক সাফল্যজনক প্রয়োগ ঘটান, যা বাংলা নাট্যকলা ইতিপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। সচরাচর 'প্রতীকবাদ' নামে আখ্যায়িত তাঁর এই রীতি কিন্তু বস্তুসংযোগ অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতীকবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, কারণ তাঁর প্রতীকবাদে আছে প্রবল বস্তুআসক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি। তাঁর একাঙ্কিকা *বহিপীর* স্বল্পসংখ্যক নিটোল ও বহুমাত্রিক চরিত্রের দ্বারা চিত্রিত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণী ও নবোত্থিত পুঁজিপতি শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যকার মূল্যবোধের চরম সংঘাতময় সম্পর্ক তুলে ধরে : দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আমেনা নাম্নী একজন বোবা রমণী কর্তৃক স্বীয় স্বামী ও সন্তান হত্যার কাহিনী নিয়ে লিখিত ওয়ালিউল্লাহর আরেকটি নাটক হচ্ছে *তরঙ্গভঙ্গ*। এখানে আমেনার আভ্যন্তর মনস্তত্ত্ব ও নিগূঢ় সামাজিক বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ত্রি-চরিত্রবিশিষ্ট *উজানে মৃত্যু*-র নায়ক একজন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও জীবনযুদ্ধে পরাজিত নৌকাচালক। এর অপর দুই চরিত্র হচ্ছে শ্বেতশুভ্র বসন পরিহিত 'সত্য' এবং কালো আলখাল্লাধারী 'মিথ্যা'। এই ছোট্ট রূপকধর্মী নাটকে উক্ত নৌকাচালকের আত্মার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য ও মিথ্যার নিরন্তর লড়াই দেখানো হয়েছে। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রদর্শিত সকল নাটকেই মঞ্চপরিকল্পনায় তিনি নির্ভেজাল, মৌলিক ও অগতানুগতিক চিন্তাধারার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।[১৬৩]

---

১৬২. হেদায়েত হোসেইন মোর্শেদ, "ড্রামা সার্কেল", ২১৪-১৭।

১৬৩. ঐ, ১৭৫-৮৩।

এই উপমহাদেশের নাট্যকলার ইতিহাসে 'এ্যাবসার্ড নাটক' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সাঈদ আহমেদের (জন্ম ১৯৩১) *কালবেলা* (১৯৬৬) নাটকটি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর সঙ্ঘটিত ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনাকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে লেখক ঘূর্ণিঝড়ের নিবিড় অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন কার্যকরভাবে গড়ে তোলেন এক বিমূর্ত জগত, যেখানে ঘূর্ণিঝড় নিজেই হয়ে উঠে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।[১৬৪] এই সময়কালে অপর নাট্যকার মুনীর চৌধুরী যেসব নাটক রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে—যুদ্ধবিরোধী ঐতিহাসিক *রক্তাক্ত প্রান্তর* (যেখানে জাতীয় অন্তরাত্মার চেয়ে বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে ব্যক্তিসত্তার মর্মমূলে); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির পটভূমিতে রচিত পূর্ণদৈর্ঘ্য কমেডি *চিঠি*; ক্যাম্পাসজীবন অবলম্বনে রচিত কৌতুকনাট্য *মর্মান্তিক* এবং তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটকের একটি সঙ্কলন *দণ্ডকারণ্য*।[১৬৫] আশকার ইবনে শাইখও এসময়ে অনবরত লিখে গেছেন। তাঁর *অগ্নিগিরি* ও *রক্তপদ্ম* দুটি ঐতিহাসিক নাটক। কয়েকটি সামাজিক নাটকের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন নিয়ে লিখা *অনুবর্তন*, জেলে সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামভিত্তিক *বিল বাওড়ের ঢেউ* এবং গ্রামীণ পটভূমিতে নীতিকথামূলক *এপার ওপার* উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ১৯৫৭ সালে বৃটিশ ভারতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের চেতনাকে সেসময়ে পূর্ব বাংলায় চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টায় তিনি লিখেন *অনেক তারার হাতছানি*।[১৬৬] এ পর্যায়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন আলাউদ্দীন-আল-আজাদ (*মরক্কোর যাদুকর, ঈহুদীর মেয়ে, মায়াবী প্রহর, ধন্যবাদ*); আজিমুদ্দীন আহমেদ (*মা, অহঙ্কার, কাঞ্চন*); নুরুল মোমেন (*যদি অমন হতো, আলোছায়া, নয়া খান্দান, আইনের অন্তরালে*); আনিস চৌধুরী (*এ্যালবাম*); বজলুর রশীদ (*উত্তর ফাল্গুনী, শীলা ও শৈলী, সুর ও ছন্দ*); সিকান্দার আবু জাফর (*সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল, মাকড়শা, শকুন্ত উপাখ্যান*); রাজিয়া খান (*আবর্ত*) এবং লায়লা সামাদ (*বিচিত্রা*)। স্থানীয় উপাদান-উপকরণকে নাটকের সঙ্গে যুক্ত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক দুটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটক হচ্ছে ফররুখ আহেমেদের *নওফেল ও হাতেম* এবং বজলুর রশীদের *ধনুয়া গাঙ্গের তীরে*। প্রথমটি একটি ত্রি-অঙ্কবিশিষ্ট নাটক, যার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে গ্রামবাংলায় বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় পুঁথি সাহিত্য থেকে। অন্যটির কাহিনী নেয়া হয়েছে *ময়মনসিংহ গীতিকা* হতে। এ দুটির মধ্যে *নওফেল ও হাতেম* প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৬১ সালে এবং সমালোচকদের কাছ থেকে লাভ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা।

---

১৬৪. ঐ, ৩১১-১৪।

১৬৫. প্রাগুক্ত, ২৮৪-৮৮।

১৬৬. ঐ, ২৬০-৬৬।

৪. *১৯৬৮-১৯৭১ : বিস্ফোরণ*

দীর্ঘ এক দশকেরও অধিক কালব্যাপী পাকিস্তানী মৌলবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক শাসনের পর ১৯৬৮ সনের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ও '৭৯-এর গণঅভ্যুত্থান এই দুটি রাজনৈতিক ঘটনা একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনকে আরো ঘনীভূত করে তোলে, যা চূড়ান্তভাবে ১৯৭১ সনে এসে বাঙালির রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাসংগ্রামে পর্যবসিত হয়। এই কালপর্বে নাট্যচর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে—ক্রমবর্ধমান হারে নাট্যকর্মীদের জনসম্পৃক্তি অর্জন এবং তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরে বর্ধিত সংখ্যায় উচ্চ শিল্পমানসম্পন্ন নাটক রচনার পরিবর্তে বর্ধিত সংখ্যায় নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের বিক্ষুব্ধ দিনগুলোয় জনতা ও নাট্যকর্মীদের সম্পৃক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, দেশের অন্যান্য শহরসহ সমগ্র ঢাকা নগরী শিল্পী-জনতার ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি তৎপরতায় প্রকম্পিত হয়ে উঠে। সর্বত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় রচিত পথনাটক ও উন্মুক্ত প্রদর্শনীসমূহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এসব নাটকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : ১৯৬৮ সনে 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' প্রযোজিত গোর্কীর *মা* এবং জন রীডের *টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড* অবলম্বনে একটি ছায়া-নাটক; ১৯৭১ সনে উদিচী আয়োজিত দুটি নাটক *শপথ নিলাম* ও *রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্যে*; ১৯৭১ সনে 'পারাপার' আয়োজিত পোস্টার এবং একই সনে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' আয়োজিত *ভোরের স্বপ্ন*।[১৬৭] একদফা দাবিতে '৭১-এর মার্চ মাসের দিনগুলোতে জনগণের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সরকারি প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণভার নিজ হাতে তুলে নেয়। এ সময়ে বাঙালি শিল্পীগণও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রেডিও ও টেলিভিশনকেন্দ্রসমূহের অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৬৮] এই সময়কার রাজনীতিতাড়িত নাটকগুলো অধিকাংশই সংক্ষুব্ধ ও স্থূল প্রকৃতির হলেও এবং এসবের মধ্যে শৈল্পিক উৎকর্ষের ঘাটতি থাকলেও সময়ের দাবি পূরণে তা পালন করে প্রত্যাশিত ভূমিকা। কেবল জনগণের হৃৎস্পন্দন অনুভবই নয়, নাট্যশিল্পীগণ এসময় অর্জন করেছিলেন সেই স্পর্ধা, যা তাদেরকে দমন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে। একটি স্বাধীন ও সুখী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাঙালি জনগণের মধ্যে যে বিপুল আবেগ-উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল নাট্যকলা তখন সহজেই এর শিখরে আরোহণে সক্ষম হয়।

নাট্য-ইতিহাসের এই পর্বে সাঈদ আহমেদ বিশিষ্ট হয়ে আছেন *মাইলপোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* নামক তাঁর দুটো নিরীক্ষাধর্মী নাটকের জন্য। *মাইলপোস্ট*-এ নাট্যকার এক অযৌক্তিক

---

১৬৭. প্রাগুক্ত, ৩৬৬-৭২।

১৬৮. ঐ, ৩৭১-৭২।

ও অসমঞ্জস বিশ্বব্যবস্থার অধীনে মানবাত্মার ক্ষুধাকে রূপদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অপর নাটক *তৃষ্ণায়* বৈশিষ্ট্যে রূপকধর্মী এবং এতে মানবসত্তার অস্তিত্বের সঙ্কট ও উদ্বর্তনকে উপস্থাপন করতে নাট্যকার একটি সুপরিচিত লোককাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিয়া হায়দারের আরেকটি নিরীক্ষাধর্মী নাটক *শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* সমসাময়িক নাট্যকলায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মানবসমাজে বিদ্যমান শান্তি সম্পর্কিত মিথকে নাট্যকার তাঁর এই প্রতীকধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরী এসময়ে প্রকাশ করেন তাঁর ছয়টি স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটক সমবায়ে গঠিত নাট্যসঙ্কলন *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*। তাঁর তীক্ষ্ণ কিন্তু সূক্ষ্ম রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সুশীল রসিকতা এসব নাটকে নিহিত সংক্ষিপ্ত সমাজনিরীক্ষণকে দান করে এক ব্যতিক্রমী উৎকর্ষ। উক্ত নাট্যসঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত একটি নাটক *ফিট কালাম*-এ দেখা যায় একজন বোরকাপরিহিত ব্যক্তিকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ নিষিদ্ধ গোপন রাজনৈতিক দলের কর্মী সন্দেহে আটক করে। নাটকের শেষে আটক ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেলেও তার প্রকৃত পরিচয় কি সে রহস্য কখনো উন্মোচন করা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাট্যকার কার্যকরভাবে এ ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করার উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে নেন। শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদারের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত *ক্রীতদাসের হাসি* এ সময়ের আরেকটি প্রধান নাট্যকর্ম। এতে নির্যাতিত মানুষের তিক্ত প্রতিবাদের এক রূপক-কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় এই মর্মবাণী উপস্থাপন করেন যে, ঐশ্বর্য দাস ক্রয় করতে পারে বটে, তবে তা কখনো ক্রীতদাসের হাসিটুকু কিনতে সক্ষম নয়। এই কালপর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন : আশকার ইবনে শাইখ (*লালন ফকির, প্রচ্ছদপট*); নুরুল মোমেন (*শতকরা আশি, যেমন ইচ্ছা তেমন, রূপরেখা, হোসেইন সফদারের উইল*) এবং বজলুর রশীদ (*একে একে এক, ধান কমল, রূপান্তর*)।[১৬৯]

এতক্ষণ আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দ্বারা আমরা বাংলা নাট্যকলার বিবর্তনের ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছি। নাট্যকলা আজ বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে দুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সহকারে বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের শহুরে নাট্যকর্মীগণও নাট্যকলায় বাংলার স্থানীয় উপাদানসমূহ সন্নিবেশনের জন্য বিভিন্নভাবে পরীক্ষাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনি এক উদ্দীপনাময় পরিস্থিতিতে আমরা আজ গর্বভরে উদ্‌যাপন করি নাট্যকলায় আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে এবং স্বীকার করে নিই সেইসব আন্তঃসাংস্কৃতিক উপাদানের সম্পৃক্তি, যা আমাদের শিল্পকলাকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত ও সমৃদ্ধ করেছে।

---

১৬৯. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৩৮২-৯৮।

স্থাপত্য ও চিত্রকলা

পারভীন হাসান*

আবহমানকাল থেকে বাংলার চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প শাসকশ্রেণীর ধীকল্প (idea), রুচি-অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব এই যে বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্থাপত্য ও চিত্রকলা এতে এমনভাবে সমন্বিত হয়েছে যেন তা এদেশের বদ্বীপ পরিবেশ ও মৌসুমি আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। দেখা যায় যে, ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আগত প্রতিটি শাসকশ্রেণী এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রচলিত শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। তুর্কী, আফগান, মুগল, ইংরেজ সবাই তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে বঙ্গীয় শিল্পকলায় অবদান রেখেছে। এদের অবদানের একটি কালক্রমিক বিবরণ দেয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। মসজিদ, দরগাহ, মন্দির, ঐহিক (secular) ইমারত ও অন্যান্য স্থাপত্য কাঠামোসমূহের শতাব্দীওয়ারি বিবরণ দেয়া হয়েছে এজন্য যে আমাদের ধারণা, এর ফলে বাংলার স্থাপত্য ও চিত্রকলাশিল্পের বিকাশধারা নির্ণয় অধিকতর সুবিধাজনক হবে।

স্থাপত্য

আঠারো শতক : মসজিদ ও দরগাহ

খৃষ্টীয় সতেরো শতকের প্রারম্ভে বাংলায় মুগল শাসন সুসংহত হওয়ার সময় থেকে এ ভূখণ্ডের, বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থাপত্য দিল্লীর রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুকরণে রূপায়িত হতে থাকে। ফলে এ অঞ্চলের প্রাক-মুগল যুগের স্থাপত্যের প্রকট আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা হারিয়ে যায়। প্রাক-মুগল যুগের ইষ্টকনির্মিত ইমারতগুলো ছিল ভারিক্কিভাবের; এগুলোর অপ্রলিপ্ত বহির্গাত্র ছিল পোড়ামাটির ফলকে

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অলঙ্কৃত; ছাদ ও কার্নিস ছিল গ্রামীণ কুটিরের খড়ের চালের অনুকরণে বক্রাকৃতি; খিলানগুলো ছিল সূক্ষ্মাগ্র ও গম্বুজগুলো অনুচ্চ স্কন্ধযুক্ত অর্ধগোলাকৃতির। অল্প ক'বছরের কথা বাদ দিলে পুরো সতেরো শতক ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী থাকাকালে এখানে একটি বিশিষ্ট মুগল আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতি বিকাশ লাভ করে। পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরে প্রচলিত পোড়ামাটির অলঙ্করণের স্থলে ইমারতগাত্র প্রলেপসজ্জিত হয়, আর অলঙ্করণের কৌশল হিসেবে কুলুঙ্গি ও লতাপাতাপুষ্পের অনুকৃতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। অভ্যন্তরস্থল আচ্ছাদনের জন্য বিভিন্ন রকমের ভল্ট (বক্রাকৃতির ছাদ) প্রচলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আড়াআড়ি সংস্থাপিত অগভীর কৌণিক ভল্ট বা বক্র কার্নিসের সমতল ছাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রকমারি প্রলিপ্ত পৃষ্ঠতল দ্বারা অলঙ্কৃত গম্বুজের ঠেকনো তৈরি হয়।

আঠারো শতকের শুরুতেই বাংলা ও উড়িষ্যার দীউয়ান হিসেবে মুহম্মদ হাদী কারতলব খান বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁকে 'মুর্শিদকুলী খান' উপাধিতে ভূষিত করা হলে এরপর থেকে তিনি সাধারণ্যে এই নামেই পরিচিত হন। আঠারো শতকের শুরুতে ঢাকায় দুটি মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী শতকে বিকশিত বাংলার পরিণত মুগল স্থাপত্যের মহান ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। এর একটি বেগম বাজারে কারতলব খানের মসজিদ যা মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক তাঁর ঢাকায় অবস্থানকালে (১৭০০-১৭০৩ খৃস্টাব্দে) নির্মিত বলে কথিত, এবং অন্যটি লালবাগে অবস্থিত খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ, যা শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৭০৪ খৃস্টাব্দে নির্মিত (যথাক্রমে ছবি নং ১ ও ২)।

সুলতানি আমলে অপরিবেষ্টিত আঙিনাসহ মসজিদ নির্মাণের প্রচলিত ধারা অব্যাহত থাকে। উল্লিখিত দুটি মসজিদের উঁচু চত্বরের চারদিকে বক্রাকৃতির ছাদযুক্ত কক্ষগুলো দোকান অথবা মাদ্রাসাছাত্রদের পাঠশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। প্রথাগতভাবে এগুলো পোড়া ইট দিয়ে তৈরি; গাঁথুনীতে সুরকি হিসেবে ব্যবহৃত হয় গুঁড়ো ইট ও চুন, যা সচরাচর শামুকখোল থেকে প্রস্তুত। পরিকল্পনার দিক দিয়ে এই মসজিদগুলো প্রচলিত মুগল স্থাপত্য আদলের আওতায় পড়ে। এগুলো একক আইলবিশিষ্ট ও বহুপত্র সম্বলিত (laterel) পার্শ্বিক খিলান দ্বারা একাধিক বে (bay)-তে বিভক্ত। কারতলব খানের মসজিদটি পাঁচ বে-বিশিষ্ট আর মৃধার মসজিদ তিন বে-বিশিষ্ট। এগুলোর প্রাচীর প্রলেপযুক্ত ও বহির্দেশ আয়তাকার প্যানেলের প্রয়োগে মূর্তিমান। অন্যান্য মুগল লক্ষণাদির মধ্যে এগুলোতে রয়েছে সোজা কার্নিস, গম্বুজে মারলন (merlon: ছাদের কিনারে সংগামার্থে তৈরি উঁচু অংশবিশেষের আদলে তৈরি নক্সা) শোভিত পিপা এবং পদ্ম ও কলসখচিত চূড়া, কুলুঙ্গি অন্তর্ভুক্ত প্রবেশপথ, চৌকেন্দ্রিক খিলান, দেয়ালে সংযুক্ত সরু স্তম্ভ ও চাঁদোয়া (kiosk : ছত্রী)।

কারতলব খানের মসজিদের উত্তরভাগে সংযুক্ত রয়েছে ঝুঁকানো ছাঁইচযুক্ত ইট নির্মিত দোচালা ছাদের একটি কক্ষ। গ্রামীণ দোচালা ঘরের ছাদের চাল দু'টি শীর্ষের সঙ্গমরেখা

(আলি) থেকে দু'পাশে ঢালু হতে হতে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে এবং প্রান্ত দু'টি সচরাচর বক্র হয়। বক্র আলি ও ছাঁইচের ফলে ছাদটি দেখতে কুঁজাকৃতি বলে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেকটি চাল বাঁশের কাঠামোতে নলখাগড়া অথবা জাফরিকর্ম দিয়ে ভরাট করে তৈরি করা হয়। চারচালা ঘরের চাল শীর্ষ আলি থেকে চতুর্দিকে ঢালু হয়। মুগল স্থাপত্যে এরকম ছাদযুক্ত কক্ষের ব্যবহার সিংহপ্রবেশদ্বারেও পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় এগুলো পোড়ামাটির অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে স্থানীয় পীরদের দরগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত মুসা খানের মসজিদও চতুর্দিকে কক্ষ পরিবেষ্টিত ও সুউচ্চ ভিতের উপর নির্মিত এবং নির্মাণকালের বিচারে এটিকে অষ্টাদশ শতকে ফেলা যায়। মসজিদমঞ্চে আরোহণের সিঁড়িটি দক্ষিণ দেয়ালে সংস্থাপিত এবং মসজিদের সামনে রয়েছে একটি উন্মুক্ত চত্বর।

আঠারো শতকের বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ সমূলে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে নতুন বৃহদায়তন বহুতল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পুনর্নির্মাণ সত্ত্বেও যেসব মসজিদে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে, সেগুলো আঠারো শতকের প্রথমার্ধের এবং সেগুলো প্রায়ই তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, যার মধ্যগম্বুজটি দু'টি পার্শ্বগম্বুজের চেয়ে বৃহত্তর। অভ্যন্তরে বে-গুলো বহুপত্র সম্বলিত পার্শ্বিক খিলান দ্বারা আলাদা করা হয়েছে। দেয়াল ও গম্বুজের ক্রান্তিস্থলগুলো পরিস্ফুট করা হয়েছে ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভোপরি বহুপত্র খিলানসারি অথবা ক্ষুদ্র স্কুইঞ্চের উপর মারলনসারি ব্যবহারের সাহায্যে।

এসব মসজিদের কয়েকটির নির্মাণকাল শিলালিপি দ্বারা নির্ধারিত, যেমন ঢাকা বোর্ড কার্যালয়ের অদূরে বক্‌শীবাজারস্থ খাজা দেওয়ানের মসজিদ (১৭০৪-০৫) এবং নিউ মার্কেটের অদূরে বলাকা প্রেক্ষাগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মরিয়ম-সালেহার মসজিদ (১৭০৬)। ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত তারা বা সিতারা মসজিদ বাংলাদেশের সর্বাধিক অলঙ্করণসমৃদ্ধ মসজিদ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এ মসজিদের পূর্বদিকে একটি বারান্দা নির্মাণ করান, এবং সমগ্র মসজিদটিকে বিদেশী চীনামাটির টাইল ও স্থানীয়ভাবে 'চিনি-টিক্‌রী' নামে পরিচিত চীনামাটির খণ্ডাংশযোগে তৈরি মোজাইক দিয়ে আচ্ছাদিত করান। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার প্রাঙ্গণে অবস্থিত আজিমপুর এতিমখানা মসজিদ (১৭০৫-০৬) ও আজিমপুর দায়রা শরিফ মসজিদ উভয়ই এক-গম্বুজবিশিষ্ট।

নিশ্চিতরূপে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত এবং কিছু কিছু মুগল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে টিকে থাকা যেসব মসজিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে সোনারগাঁও-এর গোয়ালদিতে অবস্থিত আবদুল হামিদের মসজিদ (১৭০৫-০৬), কিশোরগঞ্জের বোকাইনগর কেল্লা মসজিদ (১৭০৫),

মহাস্থানে অবস্থিত শাহ সুলতান মাহী সওয়ারের দরগাহ-মসজিদ (১৭১৮) নোয়াখালীর বাজরা মসজিদ (১৭৪১) এবং দিনাজপুরের পাকের-হাটের অদূরে অবস্থিত লাল বেগের মসজিদ (১৭৫৮-৫৯)।

১৭০৩ সালে মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এ নগরী বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেশমব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খানকে মকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ নামকরণের অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৭১৭ সালের দিকে বাদশাহ ফররুখশিয়র ইংরেজদেরকে যখন ফরমান মঞ্জুর করেন, মুর্শিদকুলী খান তখন দীউয়ান ও সুবাদার উভয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আর সে সুবাদে মুর্শিদাবাদও বাংলার সর্বশেষ মুগল রাজধানীতে পরিণত হয়।

স্বীয় রাজধানী মুর্শিদাবাদকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলী খান যেসব ইমারত নির্মাণ করেন সেগুলোর মধ্যে অদ্যাবধি টিকে থাকা সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হচ্ছে জামি মসজিদ, যা 'কাটরা মসজিদ' নামেও পরিচিত। শিলালিপির তারিখ অনুযায়ী এটি ১৭২৪-২৫ সালে নির্মিত (ছবি ৩)। বাংলায় নির্মিত মুগল মসজিদগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম এবং এতে নির্মাতার ধর্মপরায়ণতা ও শক্তিমত্তার প্রকট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে অবলুপ্ত এ মসজিদটি ৫৪ বর্গমিটার মাপের একটি উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়।[১] এটির একক আইল ও পাঁচ বে-বিশিষ্ট পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে ঢাকায় বিকশিত মুগল রীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে এর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রবেশদ্বারের খিলান ও বহির্গাত্রের অলঙ্করণশৈলী ভারিক্কি ভাবের ইঙ্গিতবহ, যা প্রাক-মুগল যুগের স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ১৫৩৫ সালে গৌড়ে নির্মিত জাহানিয়া মসজিদের উল্লেখ করা যায়। এর বহুপত্র সম্বলিত খিলানের গোলাকার গঠন আদি ইউরোপীয় প্রভাব হয়তো নির্দেশ করে। মুগল রীতি থেকে এটির যে বিচ্যুতি তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে নিযামতের স্বাধীন প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। 'সুবাদার' পদবিধারী হলেও মুর্শিদকুলী খান প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন, কারণ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের গৃহবিবাদের ফলে দিল্লীর মুগল শক্তির অবক্ষয় সূচিত হয়। মসজিদটির চতুর্দিকেই রয়েছে গম্বুজাচ্ছাদিত দ্বিতল কক্ষাদি, যা সম্ভবত একটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু হলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় বৃহৎ আঙিনার প্রবেশতোরণের অভ্যন্তরস্থ সমাধিগাহে। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজবংশ ইলিয়াসশাহী বংশের শাসক সুলতান সিকান্দার শাহের সমাধির কথা। জনশ্রুতি আছে, সিকান্দর শাহ ১৩৭৪-৭৫ সালে পাণ্ডুয়ায় তাঁরই নির্মিত আদিনা মসজিদের

১. Catherine Asher, "Inventory of Key Movements" in George Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal* (UNESCO, Paris 1984), 37-140.

প্রবেশদ্বারের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হন। মুর্শিদকুলী খানের দৃষ্টান্তের অনুকরণে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উভয়কেও তাঁদেরই নির্মিত মসজিদগুলোর প্রবেশদ্বারের নিচে কবরস্থ করা হয়।

জামি মসজিদের উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রয়েছে মুর্শিদকুলী খানের জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব শুজাউদ্দীনের সমাধিক্ষেত্র। এ স্থানে ১৭৪৩ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন নবাব আলিবর্দী খান, যিনি শুজা-আল-দীনের পুত্রকে হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। প্রধান প্রবেশপথের উভয়দিকে নিমগ্ন স্তম্ভরাজিযুক্ত ও তিন বে-বিশিষ্ট এ আয়তাকার মসজিদটিতে ঢাকার সুবিদিত মুগল নির্মাণশৈলীর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, যা আলিবর্দী খানের কর্তৃত্বের মূল আধার মুগল রাজশক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি বহন করে। সদর দেয়ালে মুখ্য প্রবেশদ্বারের ঊর্ধ্বে সংযুক্ত স্তম্ভসারির উপর সংস্থাপিত একটি দোচালা ছাদের নক্সা এবং পার্শ্ববর্তী প্রবেশদ্বারগুলোর উপর চৌচালার নক্সা রয়েছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে মধ্যগম্বুজের উভয় দিকে রয়েছে চৌচালা ধনুকাকৃতির ছাদ (ভল্ট)। পশ্চিম প্রাচীরে উদ্‌গত দোচালা মিহরাব প্রথম এ মসজিদেই পরিদৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদে আঠারো শতকের আরো কয়েকটি মসজিদেও এ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আলিবর্দী খানের খোশবাগস্থ সমাধিসৌধের আভ্যন্তর পরিকল্পনা ঢাকার লালবাগের পরীবিবির সমাধিসৌধের একটি সাদামাটা রূপ বলে প্রতীয়মান হয়। আর এটির চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দা নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধের বারান্দারই অনুরূপ।

১৭৫৬-৫৭ সালে শাসনরত নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ইমামবাড়ার একমাত্র টিকে থাকা অংশ 'মদিনা' এক অনুপম ধর্মীয় ইমারত এবং এতে নবাবদের শিয়া মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। জনশ্রুতি মতে একক গম্বুজবিশিষ্ট এই বর্গাকার ইমারতের ভিত ইরাকের কারবালা থেকে আনীত মৃত্তিকা দিয়ে ভরাট করা হয়। মহানবীর দৌহিত্র হোসেনের শাহাদৎস্থলের সাথে এর এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে শিয়া কর্তৃত্বের এক আদি উৎসের সাথে মুর্শিদাবাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মুর্শিদাবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চক মসজিদ (ছবি ৪)। নবাব মীর জাফরের স্ত্রী মুন্নি বেগম কর্তৃক ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে শেখ খলিলুল্লাহর তত্ত্বাবধানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। সাত বে-বিশিষ্ট এ মসজিদে রয়েছে পাঁচটি ক্রমঃপ্রসারমান গম্বুজ ও দু'টি চারচালা প্রান্তিক ভল্ট। সামনের বৃহৎ ঘেরা সাহনের চারদিকের কক্ষগুলো একটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অন্তঃখচিত (pietra-dura) প্রস্তর অলঙ্করণের ফলে এর শিলালিপিটি অনুপম রূপ পেয়েছে, কারণ অন্যসব শিলালিপির বেশিরভাগই কালো পাথরে উৎকীর্ণ। জাঁকালো পূর্ব প্রাচীরের প্রবেশদ্বারের গোলাকৃতি খিলানগুলো পাখা-নকশাসজ্জিত বহুপত্র সম্বলিত খিলানবিশিষ্ট কুলুঙ্গিতে সংস্থাপিত বলে এতে ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষণীয়। এটি নির্মিত হয় মুর্শিদকুলী খানেরই প্রশাসনিক

কেন্দ্রস্থলে। সম্ভবত তাঁর পুনরুজ্জীবিত কর্তৃত্বের এটি একটি অক্ষম বহিঃপ্রকাশ। এ সময়ে বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা বৃটিশের হাতে চলে যায়, আর এ ঘটনার প্রভাব শুধু কিছু স্থাপত্যিক উপাদানেই সীমিত থাকে নি, বরং এ ইমারতে লক্ষণীয় সার্বিক সংযমপ্রবণতায়ও তা বিধৃত।

মহানবীর পদছাপ সম্বলিত একটি দরগাহের নামানুসারে অভিহিত 'কদম শরিফ ইমারত' প্রকল্পের মধ্যে নির্মাণতারিখযুক্ত সর্বপ্রথম ইমারত হলো এর মসজিদটি। মীর জাফরের প্রধান খোজা খান-ই-আলা ইতওয়ার আলি খান কর্তৃক ১৭৮০ সালে এটি নির্মিত হয়। তিন বে-বিশিষ্ট একটি গতানুগতিক মসজিদ হলেও গম্বুজের অভিনব গঠনশৈলীর জন্য এটি অনন্য। এর গম্বুজগুলো শিরাল ও অতিশয় সঙ্কুচিত স্কন্ধবিশিষ্ট বলে দেখতে এগুলো কন্দাকার। বেশ আগে বিজাপুর ও দিল্লীতে দেখা গেলেও পূর্ব ভারতে এ আকৃতির গম্বুজের আবির্ভাবের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত (ছবি ৫)। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ঢাকার লালবাগ দুর্গের সতেরো শতকের মসজিদটির গম্বুজ ও শিরাল এবং পার্শ্বস্থিত গম্বুজগুলোও সঙ্কুচিত অবয়বের। এতে বোঝা যায় যে, ১৭৮০ সালে লালবাগ মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিটি সম্ভবত এর গম্বুজ নির্মাণের সূত্রেই উৎকীর্ণ।

মহানবীর পদছাপ সম্বলিত দরগাহটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৮৮ সালে। অনুচ্চ এ ইমারতের দক্ষিণ দিকে পাঁচটি খিলানবিশিষ্ট দ্বার রয়েছে, আর এর একহারা সমতল ছাদে সংযোজিত হয়েছে একটি কন্দাকৃতি গম্বুজ। এটির আভ্যন্তর পরিকল্পনাও গৌড়ীয় কদম রসুলেরই প্রায় অনুরূপ, এবং সেখান থেকেই পদছাপটি সরিয়ে আনা হয়েছিল। জনশ্রুতি মতে, পদছাপটি আরব দেশ থেকে আনয়ন করে প্রথমে পাণ্ডুয়ার মসজিদে সংস্থাপিত হয় ও পরে হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। সরকারি দপ্তরাদি কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে মহানবীর এ পদছাপটিকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেয়ার ঘটনাটি এ নগরীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়ের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সম্ভবত এর ধর্মীয় মর্যাদাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত।

মনে হয় এ ধরনের আরো কতিপয় দরগাহ আঠারো শতকে সারা বাংলা জুড়ে নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ ইয়াসিন কর্তৃক ১৭১৮ সালে চট্টগ্রামে নির্মিত কদম-ই-মুবারক মসজিদ অন্যতম। রহমতগঞ্জের রসুলনগরে অবস্থিত এ মসজিদটি আঠারো শতকের চট্টগ্রামের একটি অতিশয় সুরক্ষিত ইমারত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ ইমারতের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে সংযুক্ত কক্ষাদি। বিশ্বাস করা হয় যে, উত্তর পার্শ্বের কক্ষে মহানবীর পদছাপটি রয়েছে, আর দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে আছে কাদেরিয়া সুফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদির জিলানীর (মৃঃ ১১৬৬) পদছাপ, যাঁকে শ্রদ্ধাভরে 'গাউস-ই-পাক' সম্বোধনে স্মরণ করা হয়। ইমারতটি নির্মিত সায়াহ্নকালীন মুগল রীতিতে।

আরেকটি কদম রসুল ইমারত রয়েছে লক্ষ্যানদীর পূর্ব তীরে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে অবস্থিত নবীগঞ্জে। মির্জা নাথানের মতে, রসুলের এ পদছাপটি বণিকদের কাছ

থেকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করেছিলেন মাসুম খান কাবুলী, যিনি ১৫৮০ সালে মুগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন। পদছাপটি ক্রয় ও পরে দরগাহে সংস্থাপনকে গণসমর্থনলাভ ও বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে মাসুম খানের একটি সচেতন প্রয়াস বলে মনে করা যেতে পারে। বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান) ১৬২৪ সালে এ দরগাহটি পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে তাঁর প্রতিশ্রুত একটি মঞ্জুরির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] বর্তমানে প্রাচীরঘেরা পূর্বদিকে বারান্দাযুক্ত সাদামাটা বর্গাকার ইমারতটি ১৭৫৮ সালে গোলাম নবী কর্তৃক নির্মিত হয়।

মন্দির

দিল্লীতে মুগল রাজশক্তির অবক্ষয়ের ফলে এ প্রদেশে (বাংলায়) এক নব্য আমলা শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয়বর্গকে নিয়োগদান করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলাগণ, বিশেষভাবে রাজস্ব বিভাগের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং এদের বেশ কয়েকজনকে জমিদারি প্রদান করা হয়। বংশগত এ শক্তিধর ভূস্বামীরা যতোকাল প্রাদেশিক সদর দপ্তরে নির্ধারিত রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন ততোকাল তাদের প্রায় পূর্ণস্বাধীনতাভোগের সুবিধা প্রদান করা হতো। তাদের নির্মিত মন্দিরগুলো ছিল সুবৃহৎ ও জটিল নকশাভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের উল্লেখ করা যায়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মঞ্জুরকৃত ফররুখশিয়ারের ফরমানের পরবর্তীকালে বৃটিশ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সাধিত হয়। শীঘ্রই গজিয়ে উঠে পণ্য-উৎপাদনকারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক সম্পদশালী উদ্যোগী বণিক (বানিয়া) সম্প্রদায়। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাবি শাসনের অবক্ষয় ঘটলে এ নব্য বিত্তশালী বাঙালি সম্প্রদায় ভূমিক্রয়ে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে এবং জমিদার উপাধি লাভ করে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া ও বীরভূম জেলায় বিপুলসংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাতাদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়াও মন্দিরনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়।

মসজিদে যেমন, মন্দিরের ক্ষেত্রেও তেমনি নির্মাণোপকরণ ছিল ইষ্টক, যা বৌদ্ধ যুগ থেকে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী, মন্দিরস্থপতিরা সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।[৩]

---

২. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, trans. by M. I. Borah, (Govt. of Assam 1936), Vol. II, 710.

৩. Tarapada Santra 'Architects and Builders' in George Michell (ed.), *Brick Temples of Bengal* (Princeton 1983);

উত্তর ভারতীয় উড়িষ্যার রেখা-দেউল মন্দির রীতির শৈলীগত প্রভাবই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বহির্দেয়ালের সুবিন্যস্ত ছন্দায়িত অভিক্ষেপণ ও কুলুঙ্গি এবং করবেল প্রণালীতে তৈরি শূন্যগর্ভ বুরুজে এ প্রভাব সুস্পষ্ট। উড়িষ্যা ও বিহার সন্নিহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে 'দেউল' অভিধার এ মন্দিরগুলোর রয়েছে সর্বাধিক প্রাধান্য। তবে হুগলী ও বর্ধমানেও এগুলো পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে এ গোত্রের মন্দিরের খানিকটা ভিন্ন রূপ হচ্ছে বাকেরগঞ্জ জেলার মাহিলারায় অবস্থিত সরকারের মঠ। নবাব আলিবর্দী খানের আমলে সরকার রূপরাম দাসগুপ্ত কর্তৃক এটি নির্মিত হয় (ছবি ৬)।

অনুপ্রেরণার দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে চৌদ্দ-ষোল শতকের বাংলার স্বাধীন সালতানাতের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য, যার বহুল ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গম্বুজ, ভল্ট ইত্যাদি এবং ঠেকনোকৌশল হিসেবে খিলান, স্কুইঞ্চ পান্দান্‌তিভ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এ ঐতিহ্যে আঞ্চলিক নির্মাণকাঠামোগুলো স্থায়ী উপাদান দ্বারা নির্মিত হয়। এভাবে কুটির-নকশা ও বক্রকার্নিশ ইটের ব্যবহারে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। অলঙ্করণের কাজে পোড়ামাটির ফলকও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্য প্রভাবশালী উৎস ঢাকায় পরিদৃষ্ট সতেরো শতকের মুগল স্থাপত্য। মুসলিম স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাবে আবির্ভাব ঘটে মন্দির নির্মাণের দু'টি নতুন রীতির—এর একটি সাধারণ কুটিরসদৃশ ও অন্যটি রত্নচূড়াযুক্ত। কুটির রীতিতে খড়ের চালযুক্ত কাদামাটি বা বাঁশের তৈরি গ্রামীণ কুঁড়েঘরের অনুকরণ করা হয়। সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্য ঐতিহ্যে যেখানে কুঁড়েঘরের কোন কোন উপাদানমাত্র, যেমন বক্র কার্নিশ ইত্যাদি ইট দিয়ে তৈরি হতো, সেখানে এখন আমরা আস্ত কুটিরই ইটে গ্রথিত হতে দেখি। এক-বাংলা বা 'দো-চালা' হলো কুটির রীতির সহজতম রূপ। এটা যে আবাসিক কুঁড়েঘরের অনুকরণে তৈরি তা এক সম্প্রসারিত ভিতের উপর নির্মিত। দুটি চালা এবং ত্রিকোণ প্রান্ত সম্বলিত আঠারো শতকের এরকম কয়েকটি মন্দিরের একটি রাজশাহীর পুঠিয়ায়, একটি নওগাঁয়ের কালিগ্রামে, একটি পাবনা জেলার হান্দিয়ালে (১৭৭৯ সালে ব্রজরাম দাস কর্তৃক নির্মিত), একটি যশোরের অদূরে সেনহাটি মন্দির ও আরো একটি ফরিদপুরের কাইচালে অবস্থিত।

মন্দির স্থাপত্যে জোড়-বাংলা বা যমজ মন্দিরকুটির হচ্ছে সবচাইতে সুস্পষ্ট দেশীয় অবদান। দু'টি সংলগ্ন এক-বাংলা সমবায়ে এটি তৈরি এবং এর মধ্যে পশ্চাতেরটিই প্রকৃত মন্দির। পুরুলিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী এগুলো ছড়িয়ে রয়েছে এবং যশোর, খুলনা ও পাবনা জেলায় এগুলোর সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে পাবনা শহরে অবস্থিত দক্ষিণ রাঘবপুরের জোড় মন্দিরটি উত্তমরূপে সংরক্ষিত (ছবি ৭)।

চার-চালা মন্দির চারটি ঢালু চালবিশিষ্ট। বর্গাকৃতি ভিতের উপর নির্মিত হলে চালগুলো ঊর্ধ্বে এক বিন্দুতে মিলিত হয় আর আয়তাকার ভিতের উপর হলে সঙ্গমরেখা

বা আলিতে গিয়ে শেষ হয়। কক্ষটি বর্গাকৃতি হলে অভ্যন্তরে এটি পান্দান্তিভের উপর সংস্থাপিত গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এ গম্বুজের বহিঃস্থ শীর্ষদেশেই শুধু কুটিরছাদ তৈরি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যন্তরটিও চৌকৌণা বা পিরামিড আকৃতির হয়। মন্দিরফাসাদ (সম্মুখ দেয়াল) এক বা তিন প্রবেশদ্বার- বিশিষ্টও হতে পারে। এ ধরনের মন্দির পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায়ই দেখা যায়। চার-চালা ভল্ট দিয়ে ছাদের একাংশ আচ্ছাদনের যে রীতি, তার ব্যবহার বাংলার সুলতানি আমলেও কখনো কখনো পরিলক্ষিত হয়। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদটি এ রীতির প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। পোড়ামাটির জমকালো অলঙ্করণসমৃদ্ধ ফাসাদবিশিষ্ট চারচালা মন্দির হচ্ছে পাবনার হাটিকুমরুল শিব মন্দির ও রাজশাহীর পুঠিয়ার গোবিন্দ মন্দির (ছবি ৮)। ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সম্পূরক ইমারত চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই মূলত চার-চালা। এগুলোর কার্নিশের বাঁকগুলো নকশারূপে ছাদেও পুনঃপ্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলোর প্রাচীরগাত্র প্রলেপযুক্ত এবং স্থাপত্যশৈলীর বিচারে আঠারো শতকের মুগল স্থাপত্যরীতির সাথে এগুলো সম্পর্কযুক্ত।

চার-চালা ইমারতের উপরে ক্ষুদ্রকায় প্রতিরূপ নির্মিত হলে সেটি আট-চালায় পরিণত হয়। অত্যধিক জনপ্রিয় ও ব্যাপক প্রসারপ্রাপ্ত এ শ্রেণীর মন্দির বিশেষভাবে লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা জেলায়। আর বাংলাদেশে এ জাতীয় মন্দিরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে নলডাঙ্গার রামেশ্বরী মন্দির, তেলকুপীর শিবমন্দির ও ধূলগ্রামের রঘুনাথ মন্দির এবং খুলনা জেলার দোহাজারীতে অবস্থিত জোড় শিবমন্দির।

চূড়াবিশিষ্ট বা রত্ন-রীতির মন্দিরও ছিল খুব জনপ্রিয়। এজাতীয় মন্দিরে বক্র কার্নিশ পর্যন্ত নিম্নাংশ কুটির-রীতিতেই নির্মিত হয়। এ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাদের উপর সংস্থাপিত হয় এক বা একাধিক বুরূজ-শীর্ষ, যা 'রত্ন' অর্থাৎ মণি নামে অভিহিত।

রত্ন-রীতির সহজতম রূপ হচ্ছে একরত্ন মন্দির। এতে থাকে একটি মাত্র চূড়া আর এটির অবস্থান মধ্যবিন্দুতে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় মল্ল রাজগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দির গুচ্ছই এ শ্রেণীর বিশালতম ও সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক নিদর্শন। সাধারণত এগুলোর তিন দিকে স্তম্ভসহ বারান্দা এবং পশ্চাতে দরদালান (corridor) থাকে। মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বা স্মৃতিসৌধের সাথে রয়েছে এ শ্রেণীর মন্দিরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। ১৫৩১ সালে গৌড়ে নির্মিত কদম রসুল ইমারতের সাথে বিষ্ণুপুর মন্দিরের তুলনা করলে এ মিল লক্ষ্য করা যায়। ত্রি-খিলান দরবারান্দা, পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ ফাসাদ (সম্মুখ প্রাচীর) ও ছাদপ্রান্ত থেকে দূরবর্তী ক্ষুদ্র গম্বুজ এ যোগাযোগ স্পষ্ট প্রমাণ করে। মসজিদের সাথে এগুলোর বৈসাদৃশ্য চতুর্দিক জুড়ে অবস্থিত বারান্দায় নিহিত। তাছাড়াও এগুলোতে রয়েছে সিঁড়িপথ যা দ্বিতীয় মন্দিররূপে ব্যবহৃত উর্ধ্ব-চূড়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

পঞ্চরত্ন মন্দিরে থাকে পাঁচটি চূড়া। এর একটি মধ্যস্থলে ও অবশিষ্ট চারটি চার কোণে অবস্থিত। পঞ্চরত্ন ও আট-চালা রীতির মন্দির বাংলায় সর্বাধিক জনপ্রিয়। পশ্চিম

বঙ্গে এগুলো বেশি সংখ্যায় বিরাজমান এবং এগুলোর ক্ষুদ্র চূড়াগুলো সর্বক্ষেত্রেই রেখাদেউল (ক্রমঃসঙ্কোচনশীল চূড়াবিশিষ্ট); অথচ বাংলাদেশে এর সমগোত্রীয় মন্দিরগুলো চালাবিশিষ্ট। অতীতের মুসলিম স্থাপত্যের সাথে এগুলোর সংযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। পূর্ব ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে ছাদের বিভিন্ন স্তরে গম্বুজসারি ও চাঁদোয়াসারির প্রয়োগ ছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিহারের সাসারামে শেরশাহের সমাধিসৌধ ও ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ। উভয়ই ষোল শতকে নির্মিত। চূড়াকে মন্দিরের অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিরূপ প্রয়োগে ভূষিত করার রীতি সুপ্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বার্মার পাগানে এমন কতকগুলো মন্দির আজো বিদ্যমান, যেগুলোতে ধাপবিশিষ্ট ছাদের কোণে কোণে স্তূপাকার চূড়া সংস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ থাটবিনিয়্যু (১১৪৪) ও টিলোমিলো (১২১৮) মন্দিরদ্বয়ের উল্লেখ করা যায়। পাগানের এসব মন্দিরের আদি রূপ বর্তমানে বাংলায় অবিদ্যমান হলেও এগুলো কোন এককালে যে এখানে বিদ্যমান ছিল, সেকথা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। অতএব, পাগান মন্দিরের ছাদে চূড়া বা স্তূপ সংস্থাপনের রেওয়াজ সম্ভবত বাংলা অঞ্চল থেকে ধার করা হয়েছিল।

অন্য সম্ভাব্য উৎসটি হচ্ছে রথ। প্রাচীনতম রত্নমন্দিরের পূর্বেকার কোন রথ আজ আর টিকে না থাকলেও মন্দিরের এমন কিছু কিছু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়, যেগুলোতে অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় রথসিত্র বিধৃত রয়েছে। পঞ্চরত্নমন্দির রীতির সাথে উত্তর ও মধ্য ভারতে পরিদৃষ্ট পঞ্চায়তন মন্দিরগুচ্ছের কিছু কিছু সম্বন্ধ থেকে থাকবে, যা একক পিঠিকার উপর নির্মিত ও পঞ্চয়াতন নামে পরিচিত। এরূপ মন্দির অধিক সংখ্যায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে। এ শ্রেণীর মন্দির বাংলাদেশে আছে মাত্র দু'টি, যার একটি ১৭০৩ সালে যশোরের মুহম্মদপুরে নির্মিত হরেকৃষ্ণ মন্দির এবং অন্যটি ১৭৪৩-৪৫ সালে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জে নির্মিত প্রাণগোপাল মন্দির। এই শেষোক্ত মন্দিরের ফাসাদ ভূপাতিত হয়ে গেছে।

চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরশ্রেণীসমূহের মধ্যে নবরত্ন রীতির মন্দির সর্ববিখ্যাত। নির্মাতার জন্য এ মন্দির বয়ে আনতো উচ্চ মর্যাদা। মূলত এটা পঞ্চরত্ন মন্দির, যার উপরে একটি অতিরিক্ত তলা নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এগুলো প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয় মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলায়। বাংলাদেশের এ জাতীয় বিরল মন্দিরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলোর আয়তনগত বিরাটত্ব। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নিদর্শন (ছবি ৯)। দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ ১৭৫২ সালে এটি নির্মাণ করেন। চতুর্দিকের তিন আইলবিশিষ্ট দরবারান্দাসহ ত্রিতল এ মন্দিরের নিচতলার পরিমাপ ১৫ বর্গমিটার। এর সবশুদ্ধ ন'টি চূড়াই উনিশ শতকের ভূমিকম্পে বিলয়প্রাপ্ত। এর ফাসাদ চতুর্দিকে প্রতি ইঞ্চি ও স্তর নির্বিশেষে পোড়ামাটির ফলকে অনুপমভাবে সুসজ্জিত। খুলনার সোনাবাড়ীয়ায় ১৭৫৭ সাসে হরিনাথ সেন কর্তৃক নির্মিত শ্যামসুন্দর মন্দিরটিও ত্রিতল, তবে আকারে এটি ক্ষুদ্রতর এবং পোড়ামাটির অলঙ্করণও এতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

'চান্দনী' বা 'দালান' নামে খ্যাত সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরও খৃস্টীয় আঠারো শতক থেকে নির্মিত হতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে হাওড়া জেলার গাজীপুরে ১৭১৪ সালে নির্মিত দ্বিতল গোবিন্দ মন্দিরটিই কালনির্ণীত সর্বপ্রথম মন্দির। এগুলোর 'S' আকৃতির ব্র্যাকেট ভারী কার্নিশের ভার বহন করে। এ শ্রেণীর আদিপর্বের মন্দিরগুলোতে রয়েছে স্তম্ভ ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ, আর উনিশ শতকের মন্দিরগুলোতে রয়েছে আধুনিক স্তম্ভ ও আস্তরের (stucco) অলঙ্করণ। ইন্দো-মুসলিম প্রাসাদস্থাপত্যে সম্ভবত এর কোন পূর্ববর্তী নমুনা ছিল, যা পরবর্তীকালে মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতীকীরূপে পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

উড়িষ্যা ঐতিহ্যের 'রেখা' ও 'পীড়া' সমন্বিত রীতির মন্দির বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত সন্নিহিত পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় অভিন্ন রূপে লক্ষণীয়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কখনো কখনো এ শ্রেণীর মন্দিরের সম্মুখে অতিরিক্ত চালা বা সমতল ছাদবিশিষ্ট দরবারান্দা সংযুক্ত হতে দেখা যায়।

আঠারো ও উনিশ শতকে গৌণ নকশাগত বৈসাদৃশ্য নিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠে 'দোলমঞ্চ' ও 'রাসমঞ্চ'। বাংলার যেসব অঞ্চলে কৃষ্ণপূজা অনুষ্ঠিত হতো সেসব অঞ্চল্ জুড়ে এগুলো ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়। পূজ্য দেব-দেবীকে চতুর্দিক থেকে লক্ষ্যগোচর করার উদ্দেশ্যে এগুলো খাড়াভাবে সংস্থাপিত হতো চার বা আট দিকে খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারবিশিষ্ট সুউচ্চ পিঠিকার উপর। মূল 'দোলমঞ্চ' হলো পিরামিডের অনুকরণে খাড়াভাবে নির্মিত সিঁড়িগুচ্ছ বা মঞ্চ, যার কাদামাটিতে গড়া নমুনা আজো দেখতে পাওয়া যায়। 'দোলমঞ্চ' নির্মাণ আঠারো শতকে এক মামুখী ব্যাপারে পরিণত হয়। এগুলো বর্গাকৃতির এবং রাসমঞ্চের তুলনায় ক্ষুদ্রকায়। পঞ্চবিংশতি চূড়াবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ রাসমঞ্চ দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় কর্তৃক গোপালপুরে নির্মিত হয় ১৭৫৪ সালে। বর্তমানে এটি বিধ্বস্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত গির্জাসমূহ ও বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনে নির্মিত ইমারত সকল এশ্রেণীর স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৬৯০ সালে জব চার্ণক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতা ভারতে বৃটিশ শক্তির অবস্থানস্থায়িত্বের ক্রমঃপরিবর্তনশীলতার ফলে সহসা একটি রাজকীয় নগরীতে রূপান্তরিত হয়। কোন সুস্পষ্ট রাজকীয় স্থাপত্যশৈলী ভারতে কখনো বিকশিত হয় নি বটে, তবে পুরো বৃটিশ শাসনামল এক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কেটে যায়। আঠারো শতকের প্রথমভাগেই কলকাতায় ছিল একটি দুর্গ, গির্জা, আদালতভবন ও উদ্যানশোভিত ঘরবাড়ি। ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও স্বাস্থ্যগত উভয় কারণে তখন পর্যন্ত নির্মাণকর্মকাণ্ড নদীতীরেই সীমিত থাকে।[৪]

---

৪. Philip Davies, *Splendours of the British Raj* (Penguin Books, Harmondswoth 1987), 14;

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় দেওয়ানি স্থানান্তরের পর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী হিসেবে অধি-ষ্ঠিত থাকে। বিশ লক্ষ পাউন্ড অর্থব্যয়ে একটি নতুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এর সীমানাপ্রাচীরের বাইরে ময়দানের চতুর্দিকে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি ভবনগুলো স্থান পায়। ফলে দুর্গের চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ ময়দান এলাকা দুর্গ থেকে নির্বিঘ্নে কামান দাগানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দিত। কলকাতা নগরী অচিরেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের বিত্তবৈভবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে জমকালো সব ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এগুলোর যুৎসই তুলনা চলতো শুধু ইংল্যান্ডের পল্লীভবন ও সমকালীন পালাডিয়ান বিশাল বাসভবনগুলোর সাথে।[৫] এর মধ্য দিয়ে সূচিত হলো ভারতীয় পরিবেশে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল উদ্যানপরিবেষ্টিত ও ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল বা ত্রিতল ভবন, যার অন্তঃস্থিত কক্ষগুলো প্রশস্ত বারান্দাদ্বারা সুরক্ষিত।

হেস্টিংস-এর ভবনটি নির্মিত হয় ১৭৭৭ সালে আলিপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। গোড়ার দিকে এটি ছিল একটি সাধারণ সাদা রঙয়ের দ্বিতল ঘন ক্ষেত্রবিশিষ্ট (cufical) ইমারত, যার নিচতলায় ছিল বসবাসের ঘরগুলো। বড়লাট হেস্টিংস এগুলো এতই পছন্দ করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর ডেইল্‌স্‌ফোর্ডের বাড়ির উদ্যান বানিয়ে নিয়েছিলেন আলিপুরের উদ্যানেরই আদলে। এর কাছাকাছি রয়েছে বেলভেডেয়ার, যার মধ্যাংশ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহৃত এ ভবনটি এক সময়ে বাংলার ছোট লাটদের এবং পরবর্তীকালে দিল্লী থেকে আগত পরিদর্শক ভাইসরয়দের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হতো। উভয় ভবনই পরে সম্প্রসারিত করা হয়।

১৭৮০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিকুলের কার্যালয় হিসেবে কলকাতার মুখ্য মুক্তাঙ্গনের উত্তর দিকে নির্মিত হয় একটি বিরাট অট্টালিকা। সমকালীন নকশাচিত্রে এটিকে একটি সুদীর্ঘ সাদামাটা সেনাছাউনি সদৃশ অট্টালিকারূপে লক্ষ্য করা যায়। এর জানালাগুলো সবই একই ধরনের, এবং আয়োনীয় স্তম্ভ ও ক্ষুদ্র স্তম্ভসারির প্যারাপেট (ছাদের কিনারা) বিশিষ্ট উদগত মধ্যমাংশ দিয়ে এর ফাসাদে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়েছে। এটিকে 'রাইটার্স বিল্ডিং' বলে অভিহিত করা হয়। কারণ, কোম্পানির চাকুরিতে নবনিযুক্ত কেরানিবর্গের প্রশিক্ষণের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এ অংশটি ব্যবহার করে। 'বেঙ্গল

---

৫. ইতালির শ্রেষ্ঠতম স্থপতিদের অন্যতম এন্‌ড্রিয়া পাল্লাডিও (১৫০৮-৮০) কর্তৃক নির্মিত ইমারতরাশি থেকে উদ্ভূত এক বিশেষ স্থাপত্য-রীতি। তিনি ছিলেন সুসমঞ্জস পরিকল্পনা ও ঐক্যানুপাতিক রোমান স্থাপত্যের প্রবক্তা। ইংল্যান্ডে মহান পাল্লাডীয় রীতির পুনঃপ্রবর্তন সূচিত হয় আঠারো শতকের গোড়ায় এবং আবাসিক অট্টালিকাসমূহে তা সীমিত থাকে। নব্য-ধ্রুপদী (neo-classical) আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এর দ্বারা সুচিহ্নিত হয়।

সচিবালয়' হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সালে আয়োনীয় (Ionic) ফাসাদ ও পেডিমেন্ট (pediment) যুক্ত করে এ ভবনের সম্মুখভাগ নতুন করে নির্মিত হয়[৬] (ছবি ১০)।

সন্ত জন-এর গির্জা নির্মিত হয় ১৭৮৭ সালে, এবং পরবর্তী শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এটি ক্যাথিড্রাল গির্জার মর্যাদায় সমাসীন থাকে। এটা তিন বে সম্বলিত নেভ্ ও গ্যালারিবিশিষ্ট। চুনারের বেলে পাথর দিয়ে খুব সহজেই সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থে এতে ডরিক রীতি অনুসৃত হয়। এর চূড়াটি বেটে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এর চতুর্থ ধাপটি ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে বাদ দেয়া হয়েছে। এর বহির্ভাগে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রে রয়েছে কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধিসৌধটি। প্রস্তরনির্মিত অষ্টকোণী প্যাভিলিয়ন হাল্কা ধরনের কুটির)-এর গম্বুজাকৃতির চাঁদোয়ার শীর্ষে শোভা পায় শব-ভস্মের কলস। এর প্যারাপেটে আছে এক সারি কানজুরা বা শোভাবর্ধক মারলন, আর অষ্টকোণ ক্ষেত্রের প্রতিটি দিকে রয়েছে খর্ব খিলানের একাধিক প্রবেশদ্বার।

আর্মেনীয়রা তাদের একান্ত নিজস্ব গির্জা 'সন্ত নাযারেথ' নির্মাণ করে ১৭২৪ সালে। উত্তরকালে ঢাকায় নিজেদের গির্জা নির্মাণে এটিকে তারা আদর্শরূপে গ্রহণ করে।

ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ বিত্ত-বৈভবে এ সময়ে কোনক্রমেই কলকাতার সমকক্ষ ছিল না। ফলত পূর্ববঙ্গে প্রাচীনতম ইউরোপীয় স্থাপত্য কেবলমাত্র গির্জা নির্মাণেই গণ্ডিবদ্ধ থাকে। তেজগাঁয় অবস্থিত হলি রোজারির গির্জাটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম গির্জা, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। সতেরো শতকে পর্তুগীজগণ নির্মাণ করে একটি ছোট্ট গির্জা (chapel), যা পরবর্তীতে ১৭১৪ সালে সম্প্রসারিত হয়। এটি একটি নেভ্ (nave), আইল (aisle) ও বর্গাকার এ্যাপস্ (apse) বিশিষ্ট বেসিলিকান (basilican) গির্জা, যার ছাদ সমতল ও চূড়াবিহীন। এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতকগুলো খৃস্টান সমাধি প্রস্তরফলক। পর্তুগীজ ভাষায় উৎকীর্ণ ৭ জুন ১৭১৪ সাল তারিখযুক্ত চয় ডেভিয়েট্স-এর সমাধি-প্রস্তরফলকটি এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকার সমাধি প্রস্তর-ফলকগুলোর মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। আগস্ট ১৭১৪ সাল তারিখ সম্বলিত এ্যাভিয়েটিস-এর সমাধিসৌধটিও এখানে অবস্থিত এবং এটি প্রাচীনতম আর্মেনীয় সমাধিসৌধ। এতে নিজস্ব গির্জা নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্মেনীয়রা পর্তুগীজ চ্যাপেলসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রটি ব্যবহার করতো বলে প্রতীয়মান হয়। এর পূর্বদিকের সম্মুখ প্রাচীরের বহিরঙ্গের ঢেউখেলানো উপরিতলের ঊর্ধ্বে রয়েছে একটি ক্রুশ এবং এটি মুগল ও খৃস্টীয় উপাদানসমূহের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ (ছবি ১১)। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের

---

৬. আয়োনিক, ডরিক, কোরিন্থীয়ান, তুস্কান ইত্যাদি নির্দেশ করে ধ্রুপদী (গ্রেকো-রোমান) স্থাপত্যের স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষস্থ টোপশ্রেণী। পেডিমেন্ট অট্টালিকার সম্মুখভাগের উপরিদেশে ত্রিকোণ স্তম্ভবিশেষ।

মধ্যে রয়েছে ফুলদানিভিত্তিক খাঁজকাটা স্তম্ভরাজি, চতুষ্কোণ খোপবিশিষ্ট প্রাচীরগাত্র ও খিলানবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারের উপর অধিক বক্র ছাঁইচ। এসবের সাথে আরো রয়েছে একাধিক ক্রুশ ও মা মেরির কোলে শিশু যিশুর মূর্তি।

আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে হলি রেজারেকশন (Holy Resurrection) আর্মেনীয় গির্জাটি নির্মিত হয় ১৭৮১ সালে একটি পুরনো চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষের উপর (ছবি ১২)। এর শিলালিপিটি রয়েছে মূল উপাসনাস্থলের সম্মুখাংশে। এ গির্জার সাথে কলকাতার গির্জা ও আর্মেনিয়ার ইখ্‌মিয়াদযিনের গির্জার কিছু সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যাকিছু পার্থক্য লক্ষণীয় তা কেবল এসব গির্জার আকার-আয়তন, নির্মাণোপকরণ ও আবহাওয়া, উপযোগিতার মধ্যে নিহিত। জোহানেস আরাপিয়েট সার্কিস কর্তৃক ১৮৩৭ সালে নির্মিত এর মূল সূক্ষ্ম চূড়া ও ঘটিকা বুরূজটি ১৮৯৭ সালের মহা ভূকম্পে ভূপাতিত হয়। পূর্বদিকে অবস্থিত এ্যাপস্‌টি ধনুকাকৃতি ও এর শীর্ষে রয়েছে মুকুটসদৃশ শোভাবর্ধক প্যারাপেট। এর উত্তরে ও দক্ষিণে রয়েছে সুপ্রশস্ত বারান্দা। অভ্যন্তরস্থ মূল উপাসনাস্থলটি মেঝের তুলনায় উত্তোলিত ও রেলিংঘেরা এবং বিপরীত প্রান্তে রয়েছে একটি গ্যালারি, যাতে প্রবেশের জন্য আছে ঘোরানো সিঁড়ি। যিশুর নৈশভোজ উৎসব ও ক্রুশে তাঁর প্রাণবধের ঘটনার স্মারক ১৮৪৯ সালে চার্লস পোট কর্তৃক অঙ্কিত দু'টি তৈলচিত্র সমন্বয়ে এর বেদিমঞ্চ গঠিত।

ওয়ারির খৃস্টান গোরস্থানের পুরাতন অংশে স্থান পেয়েছে প্রথাসিদ্ধ নিও ক্লাসিক্যাল[৭] সমাধি স্থাপত্য, যেমন পিরামিড, ওবেলিস্‌ক্ (ক্রমসঙ্কোচনশীল চতুষ্কোণ স্তম্ভ), চাঁদোয়া শবাধার। বেক্ (Beck)-এর সমাধিসৌধটিই এক্ষেত্রে বাকি সবগুলোকে ছাপিয়ে নজর কেড়ে নেয়। (ছবি ১৩)। জনশ্রুতি মতে, কলম্বো সাহেবের সমাধি হিসেবে পরিচিত এ চৌকো ইমারতের শীর্ষে রয়েছে গম্বুজ আচ্ছাদিত একটি সুউচ্চ অষ্টকোণ বুরূজ (tower) এবং অন্তঃস্থলে রয়েছে পরিচয়বিহীন তিনটি সমাধি। চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ ক্ষেত্রের প্রতিটি দিকেই রয়েছে প্রবেশদ্বার। এতে দৃশ্যমান মুগল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহুপত্র সম্বলিত খিলানবিশিষ্ট জানালা ও অন্তঃপ্রবিষ্ট কুলুঙ্গিসমৃদ্ধ প্রাচীর, আর প্যারাপেটের প্রতি কোণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোজিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকার চূড়া। দেয়ালগাত্রে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট রয়েছে কতকগুলো সমাধি-প্রস্তরফলক। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১৭৯১ সালে প্রয়াত ইযেকিয়েল বেক-এর স্মৃতিফলকটি। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরিরত ও ১৭৭৪ সালে প্রয়াত উইলিয়ম কার্কম্যানের সমাধিফলকটিও রয়েছে এখানে এবং এটিই ঢাকায় ওলন্দাজদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন।

---

৭. নিও-ক্ল্যাসিসিজমঃ বিশেষ নির্মাণ-রীতি যা তৎপূর্ববর্তী 'ব্যারক' (Baroque) ও 'রকোকো' (Rococo) রীতিদ্বয়ের মাত্রাধিক্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভূত হয় আঠারো শতকের ইউরোপে, প্রাচীন পৃথিবীর মাহাত্ম্য পুনরুদ্ধার করে স্থাপত্যে সাদামাটা ও মহৎ ভাব-গাম্ভীর্য প্রবর্তন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

সামন্ত প্রভু বা জমিদারগণ, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধিধারী, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে প্রসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করতেন। এগুলো ছিল তাঁদের স্ব স্ব এলাকার শাসনকাজ পরিচালনার কেন্দ্রস্থল। এ দেশের পূর্ববর্তী ও বর্তমান শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত যথাক্রমে মুগল ও নিও-ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যধারার সুসমন্বয় ঘটে এসব অট্টালিকায়। রাজশাহীর অদূরে নাটোর ছিল বৃহত্তম জমিদারিগুলোর অন্যতম। সাড়ে সাইত্রিশ একর ভূমি জুড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়িটি কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ সমন্বয়ে গঠিত। ডেপুটি কমিশনারের দপ্তররূপে ব্যবহৃত মূল অংশের মধ্যভাগে রয়েছে একটি অভিক্ষিপ্ত বারান্দা (porch) ও দুপ্রান্তে দু'টি পেডিমেন্টবিশিষ্ট উদ্‌গত গলিপথ (bay) (ছবি ১৪)। এর অর্ধবৃত্তাকার খিলানগুলো কোরিন্থীয় স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত এবং ফাসাদটি জ্যামিতিক ও পুষ্প-নকশায় সজ্জিত। এ অট্টালিকার মধ্যভাগে অবস্থিত সুবৃহৎ অভ্যর্থনাকক্ষের উভয়দিকে সুবিন্যস্ত রয়েছে এগারোটি করে প্রশস্ত এপার্টমেন্ট (কয়েকটি কক্ষের সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা)। অভ্যর্থনাকক্ষের অভ্যন্তরে ছাদ পার্শ্ববর্তীগুলোর তুলনায় উত্তোলিত এবং আঠারোটি বাতায়নপথে (clerestory) আগত আলোকে এটি আলোকিত। মূলে এগুলো রঙিন শার্সিকাঁচসমৃদ্ধ ছিল। এর মেঝেটি কৃষ্ণ ও শুভ্র মর্মর, পাথরে বাঁধাইকৃত।

কান্তনগরের নবরত্ন মন্দিরের উদ্যোক্তা মহারাজা প্রাণনাথ কর্তৃক দিনাজপুরে নির্মিত দোতলা মূল প্রাসাদভবনটি বর্তমানে বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। এটির ছিল প্রশস্ত বারান্দা ও আয়োনীয় স্তম্ভবিশিষ্ট জাঁকালো সুদৃশ্য ফাসাদ।

কারখানা হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নীলকুঠিও সারা দেশ জুড়ে নির্মিত হয়। সাধারণত সাদাসিধে ও দেয়ালঘেরা এসব ইমারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক তাৎপর্য ছিল না বললেই চলে।

উনিশ শতক : মসজিদ ও ইমামবাড়া

দীউয়ানি কার্যালয়সমূহ, সরকারি কোষাগার এবং দীউয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ কোলকাতায় স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের ষাটের দশকের বাংলার সমৃদ্ধতম ও সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ মুর্শিদাবাদ নগরীর ভাগ্যে ঘনঘোর দুর্দিন নেমে আসে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে এটি কলকাতাভিত্তিক বৃটিশ প্রশাসনের ভাতাভুক্ত ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণাধীন নামমাত্র নবাবের বসবাসের স্থানে পরিণত হয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই মুর্শিদাবাদের স্থাপত্যে এর বৃটিশ-নির্ভরতা ও মূলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ প্রতিফলিত হয়।

১৮০১ সালে নির্মিত মিয়া হালালের তিন বে-বিশিষ্ট মসজিদের ফাসাদ ও খাঁজকাটা কন্দাকৃতি গম্বুজ হচ্ছে এর ঐতিহ্যগত উপাদান। সম্ভবত মুর্শিদাবাদের সব মসজিদের মধ্যে এটিরই অভ্যন্তরভাগ সর্বাধিক সুবিস্তৃত ও আস্তরের নানা নকশায় অলঙ্কৃত। বিপুল সজ্জার

অট্টালিকার জনপ্রিয়তার যুগপৎ চরমোৎকর্ষ ও পরিসমাপ্তির এটিই ক্রান্তিবিন্দু। কেননা, বৃটিশ প্রভাবের ফলে এ সময় থেকে অধিকতর সুসংযত স্থাপত্যরীতির প্রচলন শুরু হয়। এ ধারানুক্রমে মিয়া হালালের মসজিদ নির্মিত হওয়ার মাত্র বারো বছর পরে নির্মিত ফারহাত আল্লাহ্ খানের মসজিদটি সাদাসিধে, অনাড়ম্বর ও সমতল ছাদযুক্ত, যদিও এটি প্রথমোক্তটির মতোই তিন বে-বিশিষ্ট। প্রাচীর ও মিহ্রাব, যা প্রচলিত নিয়মে অলঙ্কৃত থাকে, এক্ষেত্রে সেসব অনাচ্ছাদিত। মুর্শিদাবাদ রীতির অনুবৃত্তিতে এর মিহ্রাবের বহিঃস্থ অভিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোই শুধু দোচালা আকৃতির ছাদবিশিষ্ট।

১৮২৯-৩৭ সময়কালে নির্মিত নবাবের বাসভবনেই সর্বোৎকৃষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বৃটিশনির্ভরতা। ডারবিশায়ারের কেডল্স্টন হলের অনুকরণে নির্মিত কলকাতার সরকারি ভবনের আদলে এটি নির্মাণের জন্য নওয়াব হুমায়ুন ঝা ইউরোপীয় স্থপতি ডানকান মেকলিওডকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উচ্চ পদমর্যাদার বৃটিশ কর্মকর্তা ও তথাকার সব ইউরোপীয় বাসিন্দার উপস্থিতিতে এ ভবনের নির্মাণকার্যের উদ্বোধন বিষয়ে অবগত হওয়া যায় এর দ্বি-ভাষিক শিলালিপি থেকে।

এর দশ বছর পর ১৮৪৭ সালে ইতিপূর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ইমামবাড়ার স্থলে নির্মিত হয় নতুন আরেক বিশাল ইমামবাড়া। এর পরিমাপ হচ্ছে ২০৯×৯৫ মিটার। পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ ইমামবাড়াটি নবাবের প্রাসাদের চেয়েও বৃহত্তর (ছবি ১৫)। মহানবীর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাৎবার্ষিকী উৎসব মোহররম পর্ব শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়। একটি শিলালিপির সাক্ষ্যানুসারে এর পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাণতত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যথাক্রমে নবাব ফেরিদুন শাহ ও সাদিক আলি খান। নবাবের প্রাসাদের সরাসরি উত্তরদিকে নির্মিত এই ইমারতের গঠনশৈলীও ইউরোপীয় স্থাপত্য প্রভাবপুষ্ট। এর দুই স্তরবিশিষ্ট দক্ষিণ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তরে রয়েছে সবদল রীতিতে তৈরি (trabeated) খড়খড়িযুক্ত সুবৃহৎ জানালা। এর মধ্য প্রবেশদ্বারে রয়েছে তুস্কান স্তম্ভোপরি সমতল কার্নিশের উপর গোলাকৃতি বহুপত্র খিলান। বৃটিশ প্রভাব এড়িয়ে নবাব যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বীয় কর্তৃত্ব এখনো জাহির করতে পারেন তা এ ইমামবাড়ার আকারের বিশালত্ব দৃষ্টে জোর দিয়েই বলা যায়। একদিকে যেমন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতো, অন্যদিকে তেমন এরই সমান্তরালভাবে মুর্শিদাবাদে শিয়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি উদ্‌যাপনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নির্মাণশিল্পে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনের বিষয়টি মূলত শাসক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সূচিত স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত থেকে যায় বলে মনে হয়। কলকাতায় যখন এক ভিন্ন শৈলীতে মসজিদসমূহ নির্মিত হচ্ছিল তখনো তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ইমারতাদি রূপায়িত হতে থাকে পূর্ববর্তী মুগল ঐতিহ্যে, যেমনটি দেখা যায় ইমামবাড়ারই নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক সাদিক আলি খান কর্তৃক ১৮৮১ সালে নির্মিত 'ছোটে চৌক কি মসজিদ'-এ।

সুস্পষ্ট ইউরোপীয় প্রভাবযুক্ত মসজিদ প্রথম আবির্ভূত হয় কলকাতায়। এসব মসজিদের মধ্যে কয়েকটি নির্মিত হয় টিপু সুলতানের বংশধরগণ কর্তৃক ১৮৩৫-৪২ সময়কালে। এগুলোর প্রবেশদ্বারের গোলাকৃতি খিলানগুলো পাখা-নকশাখচিত ও সংযুক্ত আয়োনীয় স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত। এসব প্রবেশদ্বার ও খড়খড়িযুক্ত দরজাগুলো বৃটিশদের বাংলো ও দপ্তরাদির আদলে তৈরি। এসব মসজিদের দুই-আইল ও বহু গম্বুজবিশিষ্ট পরিকল্পনা ইতিপূর্বে ১৫৮২ সালে পাণ্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদে সর্বশেষ দৃষ্ট নমুনারই অনুকৃতি। মুগল যুগের একক-আইলের পরিকল্পনা যে কেন এসময় পরিত্যক্ত হলো তার কারণ স্পষ্ট নয়।

এ ধারার মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমটি হচ্ছে গোলাম মুহম্মদ মসজিদ (ছবি ১৬)। ১৮৩৫ সালে এটি নির্মাণ করেন টিপু সুলতানতনয় গোলাম মুহম্মদ, যিনি দ্বাদশ বছর ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন। টালিগঞ্জের উপকণ্ঠে এটি অবস্থিত। ফার্সি ভাষায় লিখিত এর ওয়াক্‌ফ ফরমানে মুসলিম তারিখ ব্যবহারের রীতির স্থলে খৃস্টীয় তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে 'গভর্নমেন্ট', 'কালেক্টরশিপ' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এর পাঁচ বছর পরে টিপু সুলতানের দৌহিত্রী শাহবানী বেগম নির্মাণ করেন আরেকটি মসজিদ, যা আকারে ছোট হলেও গোলাম মুহম্মদের মসজিদেরই ঘনিষ্ঠ আদলে নির্মিত।

এ ধরনের তৃতীয় মসজিদটি সচরাচর টিপু সুলতানের মসজিদ বলে পরিচিত হলেও শিলালিপির সাক্ষ্যানুযায়ী মধ্য কলকাতায় ১৮৪২ সালে এটি নির্মাণ করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরই পুত্র গোলাম মুহম্মদ। এটিও তাঁরই নির্মিত টালিগঞ্জ মসজিদের অবিকল প্রতিরূপ। এর অভ্যন্তরে বহুপত্রের স্থলে দন্তখচিত গোলাকার জোড়া-খিলানযুক্ত মিহরাব এবং সংযুক্ত তুস্কান স্তম্ভসারি ধ্রুপদী ইউরোপীয় ইমারতের আবহ সৃষ্টি করেছে।

মুগল স্থাপত্যরীতিতে বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ ঢাকায় নির্মিত হয়। এগুলোতে অবশ্য ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য সামান্য মাত্রায় লক্ষণীয়, বিশেষভাবে খিলান ও প্রবেশদ্বারের রূপায়ণে। সাম্প্রতিককালে এসব মসজিদের প্রায় সবগুলোরই পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ সাধিত হওয়ায় এখানে শুধু এমন সব মসজিদেরই উল্লেখ করা হলো যেগুলোতে মূল বৈশিষ্টের সনাক্তযোগ্য চিহ্ন টিকে রয়েছে।

ত্রি-গম্বুজ মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে কায়েতটুলীর আবদুল হামিদ লেন মসজিদ (১৮০৪), সিংটোলার সিতারা বেগমের মসজিদ (১৮১৪, এটি উঁচু মঞ্চোপরি নির্মিত); কাজী আলাউদ্দিন সড়ক মসজিদ (১৮২৬); বাদামতলী ঘাটে দারোগা আমিরুদ্দিনের মসজিদ, এটি তাঁরই এক-গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের পাশে উনিশ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি বিশদীকৃত ও উজ্জ্বল রঙে ভাস্বর, আর আস্তরে গড়া ভেনিসীয় রীতির কৃত্রিম খড়খড়ি বিশিষ্ট বন্ধ প্রবেশদ্বারের ব্যবহারের ফলে এর পশ্চিম দেয়ালের বহিঃস্থাপিত মিহরাবগুলোর রূপায়ণ দৃষ্টি আকর্ষক হয়েছে।

উল্লেখিত সময়ের একমাত্র পঞ্চ-গম্বুজ মসজিদটি হচ্ছে বেচারাম দেউড়ি মসজিদ (১৮৭৩)। এই ইমারতে গম্বুজের বিন্যাস অসাধারণ, কারণ এর অভ্যন্তরদেশ তিন বে-বিশিষ্ট। কেন্দ্রস্থ বৃহত্তর গম্বুজটির উভয় পাশে রয়েছে দু'টি করে গম্বুজ। অভ্যন্তরে পার্শ্ব-বে দু'টিকে আনুভূমিকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে আড়াআড়ি সংস্থাপিত ছোট খিলান দিয়ে, যেন ক্ষুদ্র গম্বুজগুলোর স্থান সঙ্কুলান হয়।

এক-গম্বুজ মসজিদগুলোর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যায়, যেমন হরনাথ ঘোষ সড়ক মসজিদ (১৮০১), এটি উঁচু মঞ্চোপরি নির্মিত এবং রাস্তার দিকে রয়েছে এর দু'টি সংলগ্ন দোকান; পৌরসভা সড়ক মসজিদ (১৮১০), এটির রয়েছে একটি বাঁকানো কার্নিশ; কলুটোলা জামে মসজিদ (১৮১২) এবং লক্ষ্মীবাজারস্থ মিয়া সাহেব ময়দান মসজিদ (১৮২৫), যার চিনি-টিক্‌রী মোজাইক ১৯০৮ সালে এর নবরূপায়ণ উপলক্ষে করা হয়।

ঢাকার বাইরে এই শ্রেণীর মসজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নোয়াখালীর মাতাবী মসজিদ (১৮১৪), দিনাজপুরের কারাগার মসজিদ, রংপুরের মুন্সীপাড়া মসজিদ ও বরিশালে কারাপুর মিয়াবাড়ি মসজিদ। শেষোক্ত মসজিদটি উত্তল মঞ্চোপরি নির্মিত।

ঢাকার বকশী বাজারস্থ হোসেনী দালান বা ইমামবাড়া এই নগরীতে বিদ্যমান উনিশ শতকের একমাত্র বৃহৎ ধর্মীয় অট্টালিকা, যা এর উনিশ শতকীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট রেখে টিকে আছে (ছবি ১৭)। মূল ইমারতের সম্ভবত সতেরো শতকের একটি রজত-নকশা বর্তমানে ঢাকায় জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান অট্টালিকাটি উনিশ শতকের শেষপাদে নবাব আহসানউল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত। মূল অট্টালিকাটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর খিলানযুক্ত জানালাসহ সংযুক্ত ত্রিতল চাতাল (pavilion) ও ছাদের কান্‌জুরা (অলঙ্কৃত মারলন) আঠারো শতকের মুগল ইমারতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর দক্ষিণদিকের বারান্দার অবলম্বনস্বরূপ ধ্রুপদী স্তম্ভ চতুষ্টয় ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্দির

বাংলায় মন্দিরস্থাপত্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেমন তুঙ্গে পৌঁছে তেমনি শেষার্ধে তা লক্ষণীয়ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় এ সময়ের ইমারতগুলো ক্ষুদ্রায়তনের ও কম পরিমাণ পোড়ামাটির অলঙ্কারসমৃদ্ধ আর গুণগত দিক দিয়েও এগুলোতে তেমন কোন উন্নতি লক্ষণীয় নয়। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এ মন্থরতার কারণ সম্ভবত ঐশ্বর্যবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্যায়ন। এ শ্রেণীটি নতুন রাজধানীতে এসে ভিড় জমায় এবং পোশাকে ও শিক্ষায় ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করে। ইউরোপীয় সামগ্রীর প্রতি যে আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিফলন শুধু যে ধনিক শ্রেণীর শহর ও

গ্রামের নব্য-ধ্রুপদী রীতির ঘরবাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বরং মন্দিরের খুঁটিনাটিতেও তা অবিকল রূপায়িত হয়। এই ধারা অনুসারে সমসাময়িক গির্জাস্থাপত্যের সরাসরি প্রভাবে নির্মিত হয় চূড়াসম্বলিত (spired) মন্দিরগুচ্ছ। এ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পোড়ামাটির ভাস্কর্যের স্থান দখল করে নেয় সস্তা দামের স্টাকো (আস্তরের) শিল্পকর্ম। আর যদিও বিশ শতক পর্যন্ত ঐতিহ্যগত শিল্পরীতি ক্ষীণভাবে অব্যাহত থাকে, তথাপি উপাদান হিসেবে কংক্রিট ও লোহার প্রচলন ইট ও পোড়ামাটি ব্যবহারের প্রথাকে মারণাঘাত হানে।

পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলাতেই রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির এবং এসবের মধ্যে অধিকাংশই শিখরবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন রীতির। এর চূড়াগুলো মুখ্যত রেখা-দেউল। পশ্চিমবঙ্গের অন্য যেসব জেলায় অধিক সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বর্ধমান, হুগলী, বীরভুম ও বাঁকুড়া। বাংলাদেশে রাজশাহীর পুঠিয়ায় পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরটি ১৮২৩-২৫ সালে নির্মাণ করেন পুঠিয়া জমিদারির জনৈক মহারানী (ছবি ২০)। এটি ১৪.১৮ মিটার পরিমাপের একটি বর্গাকার দ্বিতল ভবন। এটির নিচতলার প্রতি কোণায় রয়েছে অলঙ্কৃত ক্ষুদ্রাকৃতি চৌচালা চূড়া আর দ্বিতীয় তলার উপর রয়েছে একটি বৃহত্তর চূড়া। সুসংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান এ ইমারতটির চতুষ্পার্শ্ব পোড়ামাটির অলঙ্কার ভূষিত।

খিলানযুক্ত একক প্রবেশদ্বার, সোজা কার্নিশ ও ঘন শিরাল (ridge) বিশিষ্ট রেখারীতির মন্দিরও বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় জনপ্রিয় ছিল, যদিও এসময় পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও বাংলাদেশে আটচালা রীতির মন্দির নির্মাণ অব্যাহত থাকে। উত্তমরূপে সংরক্ষিত এরকম একটি আটচালা মন্দির বিদ্যমান রয়েছে কুমিল্লার চান্দিনা অঞ্চলে সড়ক পাশে (ছবি ১৯)। অনুরূপ আরো দু'টি মন্দির মহাসড়কের কোল ঘেঁষে পাশাপাশি দণ্ডায়মান। উনিশ শতকের শেষদিকে এগুলো নির্মাণ করেন ভুঁই কৈলাসের মহারাজা। কখনো কখনো চারচালা ছাদ ঊর্ধ্বমুখী ক্রমসঙ্কোচনের ফলে চূড়ায় পরিণত হতো। এমনটি ঘটেছে পাবনার হাটি কুমরুলের শিবমন্দিরে। সুউচ্চ মঠের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উচ্চতা বৃদ্ধি করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্ভবত গির্জাস্থাপত্যেরই প্রভাবে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের মধ্যচূড়ার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ একটি রেওয়াজে পরিণত হয়। মানিকগঞ্জের শ্রীবাড়ি শিবমন্দির (১৮৪৭); রূপচন্দ্রনির্মিত কালীমন্দির (১৮৩৮-৪৩), সোনারং শিবমন্দির (১৮৮৬) ও জয়দেবপুরে কালী নারায়ণ রায় মন্দির ঢাকা জেলায় এ-রীতির মন্দিরের উত্তম দৃষ্টান্ত।

আধুনিক নির্মাণকৌশলাদির সাথে সর্বাধিক সুসঙ্গতিপূর্ণ বিধায় গুরুভার কার্নিশযুক্ত সমতল ছাদের ব্যবহার সর্বজনীনতা লাভ করে। অভ্যন্তর ছাদ প্রায়শই সমতল হয়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে গম্বুজ বা অগভীর ভল্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে রাজা বা জমিদারগণ প্রায়শই দুর্গা বা কালীদালান নির্মাণ করতেন। এগুলো ছিল একদিক থেকে

উন্মুক্ত বিশাল হলঘর এবং শেষাবধি সেগুলো আধুনিক আবাসিক স্থাপত্যেরই রূপ পরিগ্রহ করে। সমতল ছাদের চান্দনী বা দালান জাতীয় মন্দির সর্বাধিক সংখ্যায় পরিদৃষ্ট হয় মেদিনীপুরে।

দোলমঞ্চের তুলনায় রাসমঞ্চই অধিকতর সর্বজনীনতা লাভ করে। রাজশাহীর পুঠিয়ায় যেমন রয়েছে একরত্ন বিশিষ্ট একটি অষ্টভুজী রাসমঞ্চ বা রথমন্দির, তেমনি রয়েছে ১৮৯৫ সালে নির্মিত এক প্রকাণ্ড চারতলা দোলমঞ্চ (ছবি ২০)।

আঠারো শতকের শেষপাদে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে বসতিস্থাপন করে 'মগ' নামে পরিচিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরাকানী জনগোষ্ঠী। প্যাগোডা ও খিয়াং নির্মাণ করে তারা সেগুলোতে উপাসনা করতো। প্যাগোডা হচ্ছে ইষ্টকনির্মিত বৃত্তাকার ক্রমহ্রাসমান শীর্ষ ও সৌন্দর্যবর্ধক চূড়াবিশিষ্ট ইমারত, আর খিয়াং হচ্ছে ইষ্টক, মঞ্চোপরি কাঠ ও ঢেউখেলানো লৌহপাতের সমবায়ে নির্মিত গৃহ (ছবি ২১ ও ২২)। এগুলোর ধাপযুক্ত উপরিকাঠামো বেলনাকৃতির কাষ্ঠস্তম্ভের উপর সংস্থাপিত এবং প্রবেশদ্বারের উপরকার ছাদের প্রান্তস্থ শোভাবর্ধক ত্রিকোণ অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে পাকানো পুষ্পালঙ্কার।

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য

গথিক রিভাইভ্যাল[৮] ভারতে প্রবর্তিত হলে এ শৈলীর ভেনিসীয় রূপটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রয়োগোপযোগী বলে চিহ্নিত হয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বপ্রথম আবির্ভূত এ শৈলীটি ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার উপযোগী। অন্যান্য ধ্রুপদী স্থাপত্যরীতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আর এ সূত্রে যাকিছু নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় তার অধিকাংশের মধ্যে স্থাপত্যিক ব্যাকরণ তেমন কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে বৃটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতে বৃটিশ উচ্চাভিলাষ প্রকটভাবে রাজকীয় রঙে রাঙা হয়ে উঠে। নেহায়েত বণিক থেকে শাসকে বৃটিশের যে রূপান্তর তার প্রতিফলন লক্ষণীয় হয়ে ধরা দিয়েছে আয়োনীয় রীতির মধ্যমাংশবিশিষ্ট সাধারণ ব্যারাকসদৃশ রাইটার্স বিল্ডিং ও সুদৃশ্য জর্জীয় রীতির[৯] প্রাসাদ হিসেবে চিহ্নিত

---

৮. গথিক রিভাইভ্যাল : আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপে প্রাচীন গথিক স্থাপত্য-রীতির পুনঃপ্রবর্তনের এক সংগঠিত আন্দোলন। প্রধানত গির্জা নির্মাণে প্রযুক্ত এই রীতির মুখ্য লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে সূঁচাগ্র খিলান, শৈলশিরার ধনুকাকৃতি ছাদ (rib vauft), শূন্যধাবী ঠেকনো (flying buttress) খিলান সারির ব্যাপক প্রয়োগে প্রাচীরের গৌণরূপায়ণ, ও চওড়া ক্লেরেস্টোরি (Clerestory) বাতায়ন।

গভর্নমেন্ট হাউস (বড়লাট ভবন)-এর মধ্যকার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের মধ্যে (ছবি ২৩)। অথচ এ দুয়ের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কুড়ি বছরের।

বড়লাট মর্নিংটনের আর্ল ও ভাবী মার্কুয়িস ওয়েলেসলি কর্তৃক নির্মিত হয় কলকাতার নতুন বড়লাট ভবন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের ভ্রাতা ও মার্জিত রুচির এক অভিজাতরূপে ১৭৯৮ সালে ভারতে আগমন করে তিনি সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ স্থপতি পরিবারের সদস্য ও প্রখ্যাত প্রকৌশলী কর্মকর্তা চার্লস ওয়াইয়াটকে প্রস্তাবিত প্রাসাদের নকশা-পরিকল্পনার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ ভবনটি ভারতবর্ষে জর্জীয় রীতির সর্বাধিক সুরম্য অট্টালিকা হিসেবে টিকে আছে। আঠারো শতকের শেষার্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ স্থপতি রবার্ট এ্যাডাম কর্তৃক ১৭৫৯-৭০ সময়কালে নির্মিত ডারবিশায়ার কেডলস্টন হলের নকশা-পরিকল্পনার ভিত্তিতে ও বাংলার আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর সযত্ন প্রয়াসে তিনি এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রাসাদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয় ১৮০৩ সালে। ডারবিশায়ারের প্রাসাদে ব্যবহৃত বেলেপাথরের বিকল্প হিসেবে এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে রং করা পলেস্তরা। এতে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা, এবং দক্ষিণদিকে অর্ধবৃত্তাকার উদ্‌গত গাড়িবারান্দা ও স্তম্ভসারি, আর কেডলস্টন প্রাসাদের দুই কোণের দুই প্যাভিলিয়নের স্থলে এটিতে চার কোণেই প্যাভিলিয়নের সংস্থান রাখা হয়েছে। আভ্যন্তর পরিকল্পনায় পূর্বোক্ত প্রাসাদের জাঁকালো একক সিঁড়ির স্থলে এটিতে মূল অংশের চারকোণার প্রত্যেকটিতে হাতলযুক্ত ছোট সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছাব্বিশ একর ভূমির উপর পরিব্যাপ্ত এ অট্টালিকার প্রধান প্রবেশপথগুলোতে রয়েছে চারটি নব্য-ধ্রুপদী রীতির বিশাল ফটক, যা এর রাজকীয় আবহের পরিপোষক। সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষক হচ্ছে এর সুবিশাল বলরুমটি (নাচঘর), যা কাঁচ ও ঝাড়বাতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। উত্তরকালে কলকাতা নগরীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ অট্টালিকাটি এক জ্যোতিঃকেন্দ্রে পরিণত হয়।

টাউন হল, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হাউস, প্রধান ডাক কার্যালয় ও ভারতীয় যাদুঘর প্রভৃতি সরকারি অট্টালিকায় ইটের গাঁথুনির উপর সামুদ্রিক শম্বুকখোলজাত চুনকামের ব্যবহারসহ ধ্রুপদী স্থাপত্য ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে।

সন্ত জনের ক্যাথেড্রালটির নকশা ১৮৪৭ সালে উইলিয়াম নায়ার্ন ফর্বস নামক একজন সামরিক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রণীত হয় ইংলিশ উল্লম্ব গথিক রীতির ছাঁচে।[১০] বায়ুচলাচলের

---

৯. জর্জিয়ান স্থাপত্যঃ ইংল্যান্ডের আঠারো শতকের স্থাপত্য বোঝাতে ঢালাওভাবে ব্যবহৃত অভিধা। পাল্লাডীয় রীতি থেকে শুরু করে সমসাময়িক গথিক, চৈনিক ও নব্য-ধ্রুপদী রীতির প্রতি এর ঝোঁক লক্ষণীয়।

১০. ইংলিশ উল্লম্ব গথিক রীতি (English Perpendicular Gothic Style) ঃ চৌদ্দ শতকে ইংল্যান্ডে সূচিত ও পরবর্তী প্রায় দু'শতাব্দী ধরে প্রচলিত নির্মাণরীতি। এটি সরল উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক দণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপসহ লম্বভাবে বিভক্ত সরু ধেকনো ও জালি নকশাযুক্ত বৃহৎ জানালা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

অধিকতর সুবিধার্থে সঙ্গীতস্থল ও ট্রানসেপ্টের ল্যান্‌সেট্‌ (সরু ও তীক্ষ্ণাগ্র খিলানযুক্ত) গবাক্ষগুলো পীঠিকাতল পর্যন্ত নামিয়ে আনা হয়েছে, আর নেভ, খিলান ও পার্শ্ব-আইল এতে পরিহার করা হয়েছে। ১৮৮০ সালে বার্ন জোনস-এর নকশাঙ্কিত পশ্চিম দিকের রঙিন কাঁচযুক্ত জানালাটি এ গির্জার সর্বাধিক সুদৃশ্য বৈশিষ্ট্য।

পূর্ববাংলার স্নায়ুকেন্দ্র ঢাকা ইতিমধ্যে তার গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং কলকাতার স্থাপত্যসমারোহের সাথে তুলনায় ঢাকার অট্টালিকাদি কোনরকম সমকক্ষতার যোগ্যতা বহন করে না। বাহাদুর শাহ পার্কের উত্তরে জনসন সড়কস্থ সন্ত থমাসের এ্যাংলিকান গির্জার নির্মাণকাজ ১৮১৯ সালে সমাপ্ত হয় এবং ১৮২৪ সালে এতে উপাসনার উদ্বোধন করেন বিশপ হেবার (ছবি ২৪)। এর অলিন্দ, খাঁজকাটা (crenellated) প্যারাপেট, ঘটিকা বুরূজ ও গথিক খিলানগুলো বাহ্যত ইংল্যান্ডের যাজকপল্লীর গির্জারই অনুরূপ। মূল হলঘর এবং উত্তর ও দক্ষিণের ঢালু বারান্দার ছাদ কড়িকাঠের উপর সংস্থাপিত, হলঘরের অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত সুসমঞ্জস এবং সব কিছু ছাপিয়ে দৃশ্যমান হয়ে রয়েছে খাঁজকাটা স্তম্ভ দু'টি—যাদের উপর কোনরকম ভার আরোপিত হয় নি। বেদিটি পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এটি বাংলাদেশের সকল গির্জার মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী।

মুগল ও ইউরোপীয় উপাদানের পরীক্ষামূলক সমন্বিত প্রয়োগের ফলে গজিয়ে উঠে এক শঙ্কর নির্মাণশৈলী। এটি উপলব্ধি করা যায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে টাউন হল হিসেবে নির্মিত ওয়াইজঘাটের নর্থব্রুক হলটি দেখলে। ১৮৭২-৮৬ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের নামানুসারে এটির নামকরণ হয়। এর কোণাস্থিত গম্বুজবিশিষ্ট অষ্টকোণী চূড়া এবং অলঙ্কৃত প্যারাপেটের মতো মুগল উপাদান ভবনটির বহিরঙ্গে ধরে রাখার এক বিপুল প্রয়াস এতে লক্ষণীয় (ছবি ২৫)। প্রবেশদ্বারের ত্রিখাঁজ খিলান মুসলিমপূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য। লাল ইষ্টকের বহির্গাত্রের জন্য এটি 'লালকুঠি' নামে পরিচিত এবং নদীতীর থেকে দেখতে এটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম।

বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের তৈরি বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ফরাশগঞ্জের বাকল্যান্ড বাঁধের উপর রূপলাল ও রঘুনাথ দাস ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক নির্মিত বাসভবনটি অতিশয় আকর্ষণীয় (ছবি ২৬)। ১৮৪০ সালে আরাতুন নামক ঢাকার জনৈক আর্মেনীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাঁরা ভূমি ক্রয় করেন এবং কলকাতার মার্টিন কোম্পানিকে স্থপতি নিযুক্ত করেন। দ্বিতল এ অট্টালিকার নদীমুখী সদরাঙ্গন ৯১.৪৪ মিটার দীর্ঘ। এটি দু'ভায়ের মধ্যে অসম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়। রূপলাল দাসের মালিকানাধীন বৃহত্তর পশ্চিমাংশ ইংরেজি বর্ণ 'E'র আকৃতিবিশিষ্ট এবং এর তিনটি বাহুই উত্তর দিকে উদ্‌গত। প্রধান গাড়িবারান্দাটি মধ্য বাহুতে অবস্থিত এবং মূল ভবন থেকে এটি ১৮.২৮ মিটার দূরত্বে অভিক্ষিপ্ত। এটিতে রয়েছে কোরিন্থীয় রীতির খাঁজকাটা স্তম্ভসারি ও একটি ত্রিকোণী উপরিকাঠামো (পেডিমেন্ট)। এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এ্যাপার্টমেন্ট ও

একাধিক হলঘর। এগুলোর মধ্যে উপরতলার কেন্দ্রস্থিত হলঘরটি একটি 'নাচঘর' ছিল বলে অনুমিত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গজিয়ে উঠে নতুন এক অভিজাত বিত্তশালী শ্রেণী। পূর্ববর্তী মুগল যুগের যে জমিদারিগুলোর খাজনা অনাদায়ী ছিল এ শ্রেণীটি সেগুলো ক্রয় করে নেয়। এসব জমিদারিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন কলকাতায়। তবে গ্রামাঞ্চলে নিজ নিজ জমিদারিতে এদের প্রাসাদও ছিল। পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালী নিয়ে এই নব্য সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের যে আচ্ছন্নতা তার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে তাদের উদ্যোগে নিষ্পন্ন স্থাপত্যে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ধ্রুপদী স্তম্ভ, উচ্চ পিপাযুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাতায়নসারিবিশিষ্ট গম্বুজ, ত্রিকোণী উপরিকাঠামো (পেডিমেন্ট) অর্ধবৃত্তাকার রোমান খিলান, দু'ধারে কক্ষযুক্ত মূল ভবনাংশের কেন্দ্রস্থলে হলঘর ও হাতলযুক্ত সিঁড়ির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নওয়াব আবদুল গণি কর্তৃক ১৮৭২ সালে ঢাকায় নির্মিত আহসান মঞ্জিল এ- শ্রেণীর অট্টালিকাসমূহের মধ্যে অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষক প্রাসাদ (ছবি ২৭)। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পুরনো ফরাসী কারখানার নির্মাণস্থলের উপর প্রতিষ্ঠিত এ-অট্টালিকাটি আখ্যায়িত হয়েছে নওয়াবতনয় আহসানউল্লাহর নামানুসারে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াব পর পরিবর্তিত রূপ ও আঙ্গিকে এটি পুনর্নির্মিত হয়। মূল ইমারতের রৌপ্যতারে কারুকার্যখচিত নকশাটি ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সুউচ্চ মঞ্চোপরি নির্মিত দ্বিতল এ ভবনটি নদীতীর থেকে এক রাশি ধাপযুক্ত জাঁকালো সোপানপথে অভিগম্য। দ্বিতীয় তলার তিন খিলানবিশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এ সিঁড়ির ধাপগুলো ব্যাপ্ত। প্রশস্ত স্তম্ভোপরি সুউচ্চ পিপাযুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাতায়নসারিবিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য গম্বুজ প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বারের পশ্চাতে উর্ধ্বমুখী ধাবমান। নিচতলার পশ্চিম ও পূর্বভাগে রয়েছে যথাক্রমে একটি প্রশস্ত দরবারকক্ষ ও ভোজনকক্ষ। এতে আরো রয়েছে কয়েকটি এ্যাপার্টমেন্ট ও অতিথিকক্ষ। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর তাঁকে এ প্রাসাদে আতিথ্য প্রদান করেন।

ধনাঢ্য লবণব্যবসায়ী গোবিন্দ রাম সাহার পরিবার কর্তৃক মানিকগঞ্জে নির্মিত বলিয়াটি প্রাসাদ ও ১৮৩৮ সালে জমিদার কালি নারায়ণ কর্তৃক জয়দেবপুরে নির্মিত ভাওয়াল প্রাসাদও সুস্পষ্ট নব্য-ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। বাংলাদেশে জমিদার শ্রেণী কর্তৃক নির্মিত সামন্তযুগীয় অন্যান্য প্রাসাদগুলো হচ্ছে রাজশাহী শহরের আঠারো মাইল পূর্বে অবস্থিত পুঠিয়া প্রাসাদ, নাটোরের অদূরে অবস্থিত ও বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত দিঘাপতিয়া প্রাসাদ; নারায়ণগঞ্জের মুড়াপাড়া প্রাসাদ; পাবনা শহরে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত ও বর্তমানে সরকারি কার্যালয়রূপে ব্যবহৃত 'তাড়াস রাজবাড়ী'; ময়মনসিংহ শহরের ১৯ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত 'মুক্তাগাছা প্রাসাদ', যেটি বর্তমানে মুক্তাগাছা

মহাবিদ্যালয় ও একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়রূপে যুগপৎ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গনিপুর প্রাসাদ, যা শহর থেকে উনিশ কিলোমিটার পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর তীরে অবস্থিত এবং উপজেলা থানা সদর দপ্তররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ শতক

ধর্মীয় ইমারত

মসজিদ ও মন্দির এই উভয় প্রকার ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে যে মন্দা পরিলক্ষিত হয় তা বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ের ধর্মভাবমুক্ত ঐহিক (secular) শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য ব্যবস্থা গ্রহণেরই ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বৃটিশের ভারতত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ততোদিনে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ অভীষ্টের প্রশ্নে পুরোমাত্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের উপর জোর দিতে থাকে এবং বৃটিশদের ভারতত্যাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্বতন পূর্ব বাংলা এসময়ে পূর্ব পাকিস্তান নামে খ্যাত হলো এবং ঢাকা এ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পেলো।

মুসলিম লীগ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভরা জোয়ারের কালে ১৯৪২ সালে কলকাতায় নির্মিত হয় নাখোদা মসজিদ (ছবি ২৮)। জনাকীর্ণ শহুরে এলাকায় অবস্থিত প্রকাণ্ড চারতলা ইমারত এটি। সদর প্রাচীর শ্বেত মর্মর ও লোহিত বেলেপাথরে গাঁথা এই ইমারতটি এককালে গোটা ভারতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক একাধিপত্যশালী মুগলদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যকীর্তির সচেতন পুনঃপ্রবর্তন প্রমাণ করে, এবং বঙ্গীয় বলে সনাক্ত করা যায় এমন যেকোন উপাদান এতে পরিত্যক্ত হয়। এর খিলানযুক্ত মনোরম পিশ্‌তাক (প্রকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বার)-এর উভয় পার্শ্বে রয়েছে দ্বৈতখিলানের চতুর্ধাপ ফাসাদ। প্যারাপেট শোভাবর্ধক কানজুরা নকশামণ্ডিত এবং এর উর্ধ্বভাগে পিশ্‌তাকের নিমগ্ন স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত হয়েছে গম্বুজযুক্ত ছত্রী। এর প্রতি তলার মেঝে কিবলা প্রাচীর পর্যন্ত পূর্ণভাবে বিস্তৃত নয় বলে এর সুবৃহৎ মূল মিহরাবটি প্রতি তলা থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও পরবর্তীকালে একে ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম অংশহিসেবে এর চিহ্নিত হওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ১৯৪৭ সালের পরে এ দেশে নির্মিত বহুসংখ্যক মসজিদের মধ্যে যেটিতে এসব ভাবাদর্শের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে সেটি হলো ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত বায়তুল মোকাররম মসজিদ, যা এ নগরীর বৃহত্তম মসজিদও বটে (ছবি ২৯)। ষাটের দশকে নির্মিত এ দ্বিতল ইমারতের নিচতলা একটি ব্যস্ত বিপনিকেন্দ্র। উপর তলায় অবস্থিত মূল মসজিদটি ঘনক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট এবং মক্কার বায়তুল হারাম কাবাগৃহের একটি সচেতন নকল বা অনুকৃতি।

মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির শিল্পকর্মের ব্যবহার বর্তমান শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত চালু থাকে, যদিও পূর্ববর্তী শতকের মধ্যভাগ থেকেই এর বদলে বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল অধিকতর সস্তা দামের আস্তর (stucco)-এর শিল্পকর্ম। সহসাই এর একচ্ছত্র বিকল্প হিসেবে কংক্রিট ও ইস্পাতের প্রচলন শুরু হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইষ্টকনির্মিত পুরনো মন্দিরগুলো পরবর্তীকালীন কংক্রিট সংযোজনের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। তবুও অবক্ষয়ের বছরগুলোতেও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুরে মন্দির নির্মাণ কর্মকাণ্ড অধিক মাত্রায় অব্যাহত থাকে এবং চালা, রত্ন ও দালান রীতির বেশ কিছু সংখ্যক মন্দির এ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোতেও নির্মিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে যে গ্রিক স্মৃতিসৌধটি আজো বিদ্যমান সেটি সন্ত থমাস গির্জার যাজক জে. এম. ম্যাকডোনাল্ডের উদ্যোগে ১৯১৫ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয় (ছবি ৩০)। সরকারি স্থপতি প্রাচীন গ্রীসের ডরিক রীতির সর্বাঙ্গসুন্দর একটি স্মৃতিসৌধ হিসেবে এ ইমারতটির একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন করেন। এটি বর্গাকার ও সমতল ছাদযুক্ত। এর চতুর্দিকে বহির্দেয়াল প্রক্ষিপ্ত এবং একমাত্র প্রবেশদ্বারটি রয়েছে পূর্ব প্রাচীরে। আজো এর প্রাচীরে দৃঢ় সংযুক্ত রয়েছে ন'টি সমাধি-প্রস্তরফলক।

ক্যাথোলিক খৃস্টানদের বর্তমান উপাসনালয় সন্ত মেরির ক্যাথেড্রালটির নকশা প্রণয়ন করেন জনৈক কানাডীয় স্থপতি। আর্চবিশপের কাকরাইলস্থ বাসভবনের পাশে এটি নির্মিত হয় ১৯৫০-এর দশকে।

ঐহিক (secular) ইমারত

গণস্বার্থে ব্যবহারোপযোগী একরাশি অট্টালিকাও এ সময়ে নির্মিত হয়। ইঙ্গ-ভারতীয় কলা ও প্রত্নুনিদর্শন সংরক্ষণার্থে যাদুঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মারক হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। মধ্য গম্বুজের নিচে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি মর্মরমূর্তি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা স্থিরীকৃত হয়। লর্ড কার্জন এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দেন যে, কলকাতার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে 'ধ্রুপদী' বা 'রেনেসাঁ' রীতি আবশ্যক। কেননা উৎসগতভাবে কলকাতা ইউরোপীয় নগরী হওয়ায় এখানকার সব মুখ্য ইমারতই দৃশ্যত ধ্রুপদী রীতিতেই নির্মিত হতে হবে। মাকরানী মর্মর পাথর এ ইমারতটিতে ব্যবহৃত হয়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে ওয়েলস-এর যুবরাজ এটির উদ্বোধন করেন। এর কোণস্থিত গম্বুজগুলো মুগল রীতির ক্ষীণ ছাপযুক্ত এবং তৎকালীন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম বলে স্বীকৃত। এর মুখ্য গম্বুজটির শীর্ষে শোভা পায় ব্রোঞ্জে নির্মিত ঘূর্ণায়মান বিজয়দূত। এর ঠিক নিচেই স্থান পেয়েছে বালিকাবেশে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি মূর্তি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা পুনরায় স্বল্প সময়ের জন্য সরকারি মনোযোগ লাভ করে। রমনা এলাকাটিকে

পরিপাটি করে রাজধানীর ভাবমূর্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যুৎসই একগুচ্ছ ইমারত এখানে নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে বৃহত্তম ইমারতটি হচ্ছে কার্জন হল। ১৯০৪ সালে স্বয়ং লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (ছবি ৩১)। মূলত একটি নগরভবন (town hall) হিসেবে নির্মিত হলেও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের পর এটিকে ঢাকা কলেজের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এটিকে তার বিজ্ঞান শাখার অঙ্গীভূত করা হয়। লোহিত ইষ্টক বর্ণের এ দ্বিতল অট্টালিকার মধ্যস্থলে রয়েছে একটি সুবৃহৎ হলঘর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দুই প্রান্তে রয়েছে দু'টি সংযুক্ত প্রান্তভাগ। সবদিকে টানা বারান্দা সম্বলিত এ ভবনের উত্তর দিককার অভিক্ষিপ্ত ফাসাদে রয়েছে অশ্বক্ষুরাকৃতি এবং বহুপত্র খিলান। গম্বুজযুক্ত ছত্রীবিশিষ্ট সংযুক্ত পিলাস্টার, ঠেকনো (bracket)-এর উপর সংস্থাপিত ছাঁইচ ও শোভাবর্ধক ইষ্টক-কারুকর্মের সমাহার থাকায় ইউরোপীয় ও মুগল রীতির এক অপূর্ব মধুর সমন্বয় এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ফতেহপুর সিক্‌রি যে এর প্রেরণার উৎস তা সহজেই বোধগম্য হয়। কার্জন হলের প্রক্ষিপ্ত প্রবেশপথের সাথে ফতেহপুর সিক্‌রির দিওয়ানে খাস বলে পরিচিত ইমারতটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নতুন রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মুগলদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও সহিষ্ণু শাসক হিসেবে বিবেচিত সম্রাট আকবরের ফতেহপুর সিক্‌রিতে রাজধানী স্থানান্তরের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৮৭২ সালে নির্মিত নর্থব্রুক হলে যেসব লক্ষণ গোচরীভূত হয়েছিল, সেগুলো এটিতে এসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বৃটিশদের উদ্যোগে বিকশিত যে শঙ্কর নির্মাণরীতি, তা এ সুরম্য অট্টালিকায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিণতি লাভ করে।

কার্জন হলের বিপরীত দিকে অবস্থিত পুরনো হাইকোর্ট ভবনটি নির্মিত হয় এর অব্যবহিত পরেই এবং গভর্নমেন্ট হাউস বা লাটভবন হিসেবেই এটি পরিকল্পিত হয়েছিল (ছবি ৩২)। এটি প্রধানত ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতিতে নির্মিত।[১১] এর ফাসাদের ত্রিকোণী উপরিকাঠামোটি (পেডিমেন্ট) কোরিন্থীয় রীতির স্তম্ভের উপর অধিস্থাপিত এবং এর গম্বুজটির অবলম্বন হচ্ছে বৃত্তাকারে বিন্যস্ত পিল্‌পা ও স্তম্ভরাজি।

একটি ছাত্রনিবাস হিসেবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলটি নির্মিত হয় ১৯২৯ সালে। এটি সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস একটি দ্বিতল ইমারত, যার অভ্যন্তর আঙিনার চতুর্দিকে রয়েছে টানা বারান্দা। এর মূল প্রবেশদ্বারটি অবস্থিত দক্ষিণদিকে এবং হরিদ্রা বর্ণের গম্বুজযুক্ত দু'টি চৌকো বুরূজের মধ্যস্থলে এর অবস্থান।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় এখানে এক জমজমাট নির্মাণোদ্যোগ লক্ষগোচর হলেও তৎপূর্ববর্তীকালের ইমারতগুলোর

---

১১. ইউরোপীয় রেনেসাঁঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় স্থাপত্য যা গথিক রীতির বিপরীত ধ্রুপদী স্থাপত্যের বিধি-নিয়ম পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াসী। ইতালির বাইরে এ রেনেসাঁ শৈলী ইতালীয় রেনেসাঁ মটিফ অবলম্বন করে তাকে গথিক রীতির স্থলাভিষিক্ত করে।

ভাবগাম্ভীর্য ও সৌকর্যের সমকক্ষ হওয়ার মতো কিছুই নেই এ সময়ে নির্মিত অট্টালিকারাজির মধ্যে। সরকারি গণপূর্ত বিভাগের (পি.ডব্লিউ. ডি) উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক ও অফিস ভবনগুলোর নির্মাণপরিকল্পনায় কোনরকম সৌন্দর্যচেতনা অনুপস্থিত এবং স্বল্পতম ব্যয়ে সর্বাধিক স্থান সঙ্কুলানের মূর্তিমান প্রয়াস হচ্ছে এসব উপযোগবাদী ভবন। নির্মাণশিল্পে ম্রিয়মাণ এ যুগে প্রথমবারের মতো স্থাপত্যমানসম্পন্ন যে একমাত্র ইমারতটি ১৯৫৩ সালে নির্মিত হয় সেটি হলো বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট (ছবি ৩৩)। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাগ্রগণ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থপতি মাযহারুল ইসলাম এটির নকশা প্রণয়ন করেন। এতে সমকালীন আন্তর্জাতিক স্থাপত্যবিধিসম্মত কাঁচ ও কংক্রিট উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগ ঘটানোর ফলে ঢাকার অন্যান্য সর্বত্র পরিদৃষ্ট ব্যারাকসদৃশ ইমারতরাজির তুলনায় এর উন্মুক্ত নকশা-পরিকল্পনা ছিল একটি উৎসাহব্যঞ্জক ব্যতিক্রমী পরিবর্তন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদানের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে নির্মিত যথাক্রমে শহীদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ঘটনার স্মারক (ছবি ৩৪ ও ৩৫)। এগুলো দেখতে বিশাল ভাস্কর্য সদৃশ হওয়ায় এবং এগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে গণশিল্পে নানারূপে এগুলো অনুকৃত হয়েছে। ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী যে স্থানে ভাষা আন্দোলনে বিক্ষোভকারিগণ পুলিশের গুলিতে নিহত হন, ঠিক সে স্থানেই শহীদমিনারটি অবস্থিত। শিল্পী হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদ অঙ্কিত মূল নকশার স্মৃতিসৌধটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়। স্বাধীনতা- উত্তরকালে মূল নকশা-পরিকল্পনার আদলে এটি বৃহদাকারে পুনর্নির্মিত হয় এবং বর্তমানে এটি একটি নগরচত্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মঞ্চোপরি বিন্যস্ত হয়েছে কংক্রিট ও ইস্পাত সমন্বয়ে তৈরি তিনটি খাড়া অবয়ব। তন্মধ্যে মধ্যমটি দু'পাশের দু'টি দণ্ডের চেয়ে বৃহত্তর। মঞ্চে আরোহণের পথে রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী জমকালো সোপানশ্রেণী। স্থপতি সৈয়দ মঈনুল হোসাইনের নকশা-পরিকল্পনায় নির্মিত সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধটি একটি উদ্যানপরিমণ্ডলে অবস্থিত। কংক্রিটে নির্মিত এ বিশাল ভাস্কর্যটি ক্রমহ্রাসমান সমতল ক্ষেত্র সমন্বয়ে গঠিত। ভিত হতে ঊর্ধ্বমুখী উন্নীত বলে এটিকে সুউচ্চ পর্বতসদৃশ মনে হয়।

মার্কিন স্থপতি লুই কান-এর নকশা-পরিকল্পনায় নির্মিত শেরেবাংলা নগরস্থ সংসদ ভবনটি বাংলাদেশের প্রকাণ্ডতম ইমারত। পঞ্চাশের দশকে সূচিত হলেও এটির নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় এবং অবশেষে ১৯৮৪ সালে এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। ১৯৮৯ সালে এটি স্থাপত্যের জন্য আগা খান পুরস্কার লাভ করে। দ্বীপসদৃশ সলীল আবহ পরিমণ্ডলে উৎসারিত এ অসাধারণ কমপ্লেক্সটি ভরাট ও ফাঁকা এবং সমতল ও বক্রতল—এ উভয় শৈলীর সমন্বিত প্রয়োগবিশিষ্ট জমকালো অট্টালিকা। ভবনের প্রতিচ্ছবি উৎপাদক জলাধারটি এবং উন্মুক্তাঙ্গনের সাথে ঘনমান আয়তনের সুসমন্বয় এর

স্থপতির পক্ষে মুগল স্থাপত্যের সুগভীর উপলব্ধির প্রমাণ বহন করে, যদিও উক্ত স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের চিরায়ত বিধিসম্মত কোন উপাদান তিনি এতে প্রয়োগ করেন নি। এ উপলব্ধি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে অট্টালিকার অঙ্গীভূত মসজিদটিতে, যেখানে মসজিদস্থাপত্যের ঐতিহ্যের কোনরূপ উল্লেখ ছাড়াই প্রার্থনার একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্রকলা

আঠারো শতক

বাংলার চিত্রকলায় দু'টি ধারা প্রবহমান—লৌকিক ও দরবারি চিত্রশিল্প। লোক চিত্রশিল্পের ধারাটির শেকড় প্রোথিত রয়েছে বলিষ্ঠ অতীত ঐতিহ্যে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বুদ্ধ সম্পর্কিত জাতক কাহিনীগুলো চিত্রায়নের জন্য গোটানো পট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মৃত্যুদেবতা যমের হাতে পুরস্কৃত ও দণ্ডিত হওয়ার ঘটনার চিত্রায়ন যে পটুয়া বা ভ্রাম্যমাণ চিত্রকরদের দ্বারা সম্পাদিত হতো, তার একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায় বাণরচিত সপ্তম শতকের *হর্ষচরিত*-এ। রাম, কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের কাহিনীও ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শনীর বিষয়ভুক্ত ছিল। আর এসব ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ছবিগুলোর চিত্রায়ন এবং কাহিনীর ধারাবর্ণনা প্রায়শই একই ব্যক্তি কর্তৃক নিষ্পন্ন হতো।[১২]

মুসলিমদের মধ্যে গাজীর কিস্‌সার চিত্রিত রূপ 'গাজীর পট' আবির্ভূত হয় পনেরো শতক থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গাজী হচ্ছেন সুন্দরবনের কাঠুরে ও মৌ-চাষীদের রক্ষক সিদ্ধপুরুষ। বাঘের পিঠে সওয়ার অবস্থায় তাঁকে সাধারণত চিত্রিত করা হয়। কথিত আছে যে, উড়িষ্যা ও কামরূপের রাজাদের পরাস্তকারী সুলতান রুকন-আল-দীন বারবক শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজীই হচ্ছেন 'গাজীর পট' চিত্রকর্মের মূল নায়ক। যাদু-পটুয়া অর্থাৎ যাদু-পটের চিত্রকরগণ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন সাঁওতাল ও বেদীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং এ কথা মনে করা হতো যে তাঁদের ছবিতে মৃত ব্যক্তির চোখচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তারা তাকে দৃষ্টিদান করতে পারতেন এবং এরই ফলে মৃত ব্যক্তি নিজেই স্বর্গের পথ খুঁজে নিতে পারতো।

প্রাচীনতম পটগুলো অঙ্কিত হতো কাপড়ের উপর এবং পরবর্তীকালে কাপড়ে সাঁটা কাগজে। বেলফল বা তেঁতুল বীজের আঠা ও ইষ্টকচূর্ণ দিয়ে তৈরি পটভূমিতে ব্যবহৃত হতো উদ্ভিজ্জ বা খনিজ প্রাকৃতিক রঞ্জক। গোটানো পটগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ১/২

---

১২. Andrew Topfield 'Painting' in Robert Skelton and S. Mark Francis (ed.), Exhibition Catalogue *Arts of Bengal, The Heritage of Bengal and Eastern India* (London 1977), 34-38; Tofail Ahmed 'The Art of the Patuas' in কারুশিল্প পুরস্কার ১৯৮৯ (বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ, ঢাকা), ১-৬।

থেকে ৯ মিটার ও প্রস্থে প্রায় ১ মিটার পরিমাপের হতো। আনুমানিক ৩০×১৮ সে. মি. দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ক্ষুদ্র চৌকো পটের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল কলকাতার কালিঘাটের পটুয়াদের। উজ্জ্বল রঙিন ক্ষেত্রের চতুর্দিকে ভারী, পুরু বেষ্টনীরেখা ও ইষ্টকচূর্ণ ব্যবহারের ফলে প্রায়শই স্বাভাবিক লাল রঙের উজ্জ্বল পশ্চাদপটের উপরে অঙ্কিত ছবি ছিল তাঁদের অঙ্কনশৈলীর মূল লক্ষণ, যা পশ্চিম ভারতীয় রাজপুত রীতির চিত্রকলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কালিঘাটের পটুয়ারা এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হন এবং তারা প্রায় শতাব্দীকাল সক্রিয় থাকেন।* শক্তিদেবীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত একান্নটি পবিত্র পীঠের অন্যতম হিসেবে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত কালিঘাটের ক্রমোন্নতির সমকালীন ছিল তাদের জনপ্রিয়তা। এ নগরীর ক্রমসম্প্রসারণ ও তীর্থযাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি এদিকে আসতে আকৃষ্ট করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের পটুয়াদের। কাদামাটি ও কাঠ দিয়ে দেব-দেবীর মূর্তিগড়া ও পুতুল তৈরির পাশাপাশি এঁরা কাপড় ও হস্তনির্মিত কাগজের গায়ে দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন। এভাবে উন্মেষকালে 'কালিঘাট রীতি' লোকঐতিহ্যের একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর মুখ্য গুণ ছিল রেখা প্রয়োগের সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা।

দরবারি ধারার চিত্রকলার ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, বাংলায় পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নের ঐতিহ্য খৃস্টীয় দশম শতকে চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপির মতোই সুপ্রাচীন এবং দ্বাদশ শতকে বাংলায় পাল রাজবংশের পতনের পরও তা নেপাল ও তিব্বতে প্রবহমান থাকে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়েই দিল্লীর প্রভাবমুক্ত বাংলার মুসলিম সুলতানদের স্বাধীন শাসনামলে চিত্রায়িত একমাত্র পাণ্ডুলিপি *ইসকান্দারনামা* বা *আলেকজান্ডার* রোমান্সটি এখনো টিকে আছে। গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের উদ্দেশ্যে ১৫৩১-৩২ সালে প্রস্তুতকৃত ও বর্তমান বৃটিশ যাদুঘরে সুরক্ষিত এ পাণ্ডুলিপিটির চিত্রায়নে পারসিক প্রভাব প্রকটভাবে লক্ষণীয়।

বাংলায় মুগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেবল আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদই একটি সুস্পষ্ট মুগল প্রাদেশিক রীতির চিত্রকলা মুর্শিদাবাদে লক্ষ্যগোচর হয়, যদিও সতেরো শতকে ঢাকার মুগল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাব্য দিকটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১৭০৭ সালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীতে মুগল শক্তির দ্রুত অবক্ষয়ের যুগে শাহী দরবারের চিত্রকরগণ চাকুরির খোঁজে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। এ সময়ে মুর্শিদাবাদ একটি প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা কঠোর আত্মসংযমী মুর্শিদকুলী খান বা তাঁর পৌত্র ও উত্তরাধিকারী সরফরাজ খান চিত্রশিল্পের কোন পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি।

---

* Tofail Ahmed 'The Art of the Patuas' in কারুশিল্প পুরস্কার ১৯৮৯।

কেবল আলিবর্দী খানের শেষ ক'বছরের শাসনকালে মারাঠা আক্রমণের হুমকি অপসৃত হওয়ার পরই অর্থাৎ ১৭৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটি জমজমাট চিত্রকলার অস্তিত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য মিলেছে। তাঁর সময়ের চিত্রকর্মে দরবারি জীবনযাত্রার নানা দিক যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রতিকৃতিও চিত্রিত হয়েছে। এসব চিত্রকর্মে প্রায়শই পুরুষোচিত কর্মানুশীলনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। তবে অঙ্কনশৈলী ছিল রূঢ় ও আঙ্গিকসর্বস্ব এবং ধূসর ও সাদা রঙের ব্যবহার এতে প্রাধান্য পেয়েছে।[১৩]

হারেম দৃশ্যাবলীর চিত্রায়ন ও চিত্রিত রাগমালার আবির্ভাব ঘটে আলিবর্দীর শাসনের চূড়ান্ত লগ্নে এবং তাঁর তরুণ দৌহিত্র ও দরবারে প্রভাবশালী সিরাজউদ্দৌলার উদ্যোগেই সম্ভবত এর সূচনা ঘটে। মুর্শিদাবাদে চিত্রশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সিরাজউদ্দৌলার প্রায় এক বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী আমলের সাড়ম্বর কৃত্রিম অঙ্কনরীতির স্থলে এ সময়ে প্রাণবন্ত উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার সমাদৃত হয় এবং সুকোমল গঠন (modelling) ও শিথিল রেখার ব্যবহারে ছবির প্রাণবন্ততা বৃদ্ধি পায়। নারীনেত্রের ঊর্ধ্বমুখী বাঁক রাজপুত চিত্রকলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। আর দিকচক্রবালের প্রান্তঘেঁষা তমসাঘেরা পিণ্ডাকৃতির ঝোপঝাড় মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। রাগমালার দ্বিতীয় আরেক পুঞ্জ চিত্রকর্ম অধিকতর রক্ষণশীল প্রকৃতির এবং এতে সযত্নে চিত্রিত খুঁটিনাটি ও মৃদু-কোমল রঙের ব্যবহার আলিবর্দীর শাসনকালের দিকে এর পশ্চাদ্মুখিতা সপ্রমাণ করে।[১৪] মানবমুর্তিচিত্রণে এক ধরনের স্থূলতা লক্ষ্যযোগ্য হয়। এসময়ে মুর্শিদাবাদে আগত লাখনৌ-শিল্পীদের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় কিছুসংখ্যক চিত্রকর্মে চটকদার রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে। আলিবর্দীর আমলে প্রচলিত ফ্যাকাশে রঙ ব্যবহারের সুস্পষ্ট রীতির অনুসরণে এ সময়ে নওয়াব ও আমলাদের প্রতিকৃতি চিত্রায়নের পাশাপাশি এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদার ও তাঁদের আমলাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর চিত্রকর্মও তৈরি হয়। দীপচান্দ এ যুগের একজন খ্যাতনামা চিত্রকর ছিলেন।

১৭৬৩ সালে মীর কাশিমের পলায়ন ও ক্ষমতায় মীর জাফরের পুনরাধিষ্ঠানের সাথে সাথে চিত্রকলার অবনতি সূচিত হয়। কেননা তিনি এবং তাঁর নামসর্বস্ব উত্তারাধিকারীগণ এর সযত্ন লালনে কোনরকম মনোযোগ দেন নি। পরবর্তীকালে চিত্রকরগণ চাকুরির জন্য হয় হিন্দু জমিদারদের অথবা বৃটিশদের দ্বারস্থ হন। চিত্রকর্মে পৌরাণিক বিষয়াদি

---

১৩. Robert Skelton. "Murshidabad Painting", *Marg*, No. 1, Vol. X, Dec. 1956, 10-22. লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত মুর্শিদাবাদ রীতির আদিপর্বের চিত্রকর্মগুলোর নমুনা সংখ্যা হচ্ছে ডি ১১৯৯-১৯০৩ ও ডি ১২০১-১৯০৩।

১৪. The Johnson Collection, Vol. 36, India Office Library, London.

প্রাধান্যলাভ করে এবং হিন্দুদের দরবারে যে নতুন রীতি বিকাশলাভ করে, তা সমকালীন রাজস্থানী চিত্রকলার (যা হিন্দু দরবারে লালিত) সাথে তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিল না। বর্তমানে ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রতিকৃতির মতো অন্যান্য মুগল বাদশাহের প্রতিকৃতিগুচ্ছও এ সময়ে প্রস্তুত করা হয় (ছবি ৩৭)। যথার্থ মুর্শিদাবাদ রীতির বিকাশের সর্বশেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ছিল বাদামী রঙের পাতলা প্রলেপযুক্ত মাত্রাঙ্কিত মুখাবয়ব ও বেঁটেখাটো গঠন। বর্তমানে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস পাঠাগারে রক্ষিত *নলদময়ন্তীর* একটি ফার্সি অনুবাদের চিত্রিত পাণ্ডুলিপির ছবিগুলো দেখলে এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যায় (Ms. Pers. No. 2724, Ethe No. 1471)।

মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার আদিরীতির অবনতি ঘটলে সরাসরি ইউরোপীয় প্রভাবে গজিয়ে উঠে জলরঙ চিত্রকলার এক নতুন ধারা। ১৭৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে সূচিত এ ধারা বৃটিশ জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিকশিত হয় এবং 'কোম্পানি চিত্রকলা' অভিধায় এটি সাধারণভাবে পরিচিতি লাভ করে। ইতিমধ্যে বৃটিশ কর্তাকুলের বিত্ত-বৈভব কতিপয় বৃটিশ চিত্রকরকে আকৃষ্ট করে। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টিলী কেট্‌ল। এঁরা অঙ্কন করেন প্রকাণ্ড তেলরঙ ছবি, যা ছিল ভারতীয় পরিবেশে নিতান্তই অভিনব। অন্যরা প্রস্তুত করেন ক্ষুদ্রকায় গজদন্ত প্রতিকৃতি বা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর জলরঙ তুলিচিত্র। উদাহরণস্বরূপ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় উইলিয়াম হজেসের চিত্রাবলী (Select Views, 1785-88) এবং থমাস ও উইলিয়াম ডেনিয়েলস-এর চিত্রকর্মসমূহ (Oriental Scenery, 1795-1808), যা অন্য সবগুলোর চাইতে অধিক সুপরিচিত।

ভারতীয় চিত্রকরগণ বৃটিশের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলে দেয়ালে টাঙানোর উপযুক্ত ছবি ইউরোপীয় ঢঙে অঙ্কনের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়। এঁদের হাতে প্রস্তুতকৃত প্রকাণ্ড মাপের চিত্রকর্মে পরিপ্রেক্ষিতচিত্রায়ন ও আলোছায়ার বিন্যাসে বেশ এক মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দেশীয় চিত্রকরগণ এই নতুন বিদেশী অঙ্কনশৈলীর এতই বোদ্ধা ছিলেন যে, তাঁদের আঁকা চিত্রকর্মকে ইউরোপীয় চিত্রকর্ম থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য ছিল। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত মুর্শিদাবাদ ও লখনৌর জলরঙ দৃশ্যাবলী প্রসঙ্গত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় (I. S. 11-1887)।

উনিশ শতক

পটের সাহায্যে গল্প বলার রেওয়াজ গ্রামাঞ্চলে অক্ষুণ্ন থাকে। এ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যখন মন্দিরই ছিল মুখ্য তীর্থকেন্দ্র, কালিঘাটের শহুরে পটুয়া তখন যথেষ্ট যশখ্যাতি অর্জন করে এবং নানা দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি ও বিক্রয় করে একটি বেশ লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে। বাংলার লোকঐতিহ্যমূলে দৃঢ়বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ সময়ে

এদের শিল্পশৈলী ইউরোপীয় প্রভাব আত্মস্থ করতে থাকে (ছবি ৩৮)। কোম্পানিরীতির চিত্রকর্মের মতোই এ ছবিগুলোও কলে তৈরি কাগজের বড় খণ্ডের উপর জলরঙে চিত্রিত এবং আলোছায়ার যথার্থ প্রয়োগের সাথে দৃঢ় ও স্পষ্ট তুলিকর্মে সুসমন্বিত। চিত্রকর্মের উপজীব্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও ঐহিক উভয়বিধ; আবার সময়বিশেষে চলমান ঘটনাবলীও এতে স্থান পেতো। নিমেষে চিত্রায়িত এসব ছবি বিক্রিও হতো নিতান্ত স্বল্পমূল্যে।

এ সময়ে কোম্পানিচিত্রকলার ধারা অব্যাহত থাকে এবং কলকাতায় বসবাসরত বৃটিশ নাগরিকদের জন্য চিত্রগুচ্ছ অঙ্কিত হয়। কলকাতার সর্বাধিক খ্যাতিমান চিত্রকর ছিলেন কররায়ার শেখ মুহম্মদ আমির ও ই. সি. দাস। ঢাকাস্থ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার নগরীর ঈদ ও মোহররম মিছিলের দুই কেতা জলরঙ চিত্র, যার মধ্যে একটি চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বিরের নামাঙ্কিত (ছবি শিল্পী নং ৩৯)। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলোকচিত্রগ্রাহক যন্ত্রের (ক্যামেরা) আমদানির ফলে কোম্পানিরীতির চিত্রকর্মের বাজার মন্দীভূত হয়ে পড়ে।

চিত্রকলার প্রথম বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ সালে মাদ্রাজে এবং শিল্পসংক্রান্ত একটি চারুকলা বিদ্যালয় (School for Industrial Arts) ১৮৫৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে গড়ে উঠে বোম্বাই ও লাহোরে। এসব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ফলিত কলা ও নকশাঙ্কনবিদ্যার কারিগরি ও পরিকল্পনাগত মানোন্নয়ন এবং রপ্তানিযোগ্য কলা-পণ্য উৎপাদন করা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যভিত্তিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে নেমে আসে সর্বকালের অধোগতি। প্রকল্পটি তেমন বেশি কিছু সার্থকতা অর্জন করে নি। কারণ, এরই ফসল পাশ্চাত্য রীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে চিত্রকর শ্রেণী তাদের কর্মসংস্থান ছিল নিতান্ত দুঃসাধ্য।

এসব শিল্পীরই একটি দল কলকাতায় গড়ে তোলে একটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান, যার নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'। এ চিত্রশালা প্রস্তুত করে হিন্দু দেবদেবীর হাতে রং করা লিথোগ্রাফ (খোদাই করা প্রস্তর হতে ছাপানো ছবি)। এসব ছবির চিত্রকল্প রেনেসাঁ ও ব্যারক আদর্শেরই সচেতন অনুকরণ। কালিঘাটের পটুয়াদের সাথে স্বল্পকাল স্থায়ী প্রতিযোগিতার অব্যবহিত পরেই তারা সহসা মার খায় অধিকতর সস্তা ক্রমো (রঙিন) লিথোগ্রাফ ছবির সাথে প্রতিযোগিতায়। এসব ছবি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয় এবং পরবর্তীতে খোদ কলকাতায় তৈরি হতে থাকে। রঙিন ছাপচিত্রের ব্যাপক যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে কাঠখোদাই চিত্রকরদের সস্তা ছাপচিত্রের বাজারও খতম হয়ে যায়। এই শিল্পীরা ছিল স্বর্ণকার জাতিভুক্ত আর কালিঘাটের পটুয়াদের মতো এরাও ধর্মভিত্তিক ও ঐহিক বিষয়াবলীর চিত্র সযত্নে অঙ্কন করতো।

লিপিকলার (calligraphy) পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মুসলিমগণ। এঁদের মধ্যে গোঁড়া মতবাদীরা নিজেদের বাড়িঘরে মূর্তি বা মূর্তির ছবি রাখতেন না। লিপিকলার চর্চা উনিশ

শতকে যে কী বিস্তৃত পরিসরে সংঘটিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত লিপিকলার বেশ কিছু উৎকৃষ্ট নমুনা থেকে (ছবি ৪০)।

কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে ১৮৯৬ সালে ই. বি. হাভেলের নিযুক্তি ছিল এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যে ক'জন ব্যতিক্রমী ইংরেজ সজ্জন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজি ভাবধারায় ভারতকে দীক্ষিত করার নীতি ভ্রমাত্মক এবং ভারতীয় জীবনবোধই ভারতীয় কলা শিক্ষায়তনগুলোর অযথা পাশ্চাত্যপ্রীতির স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত—হাভেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইউরোপীয় ধাঁচ অনুকরণের রেওয়াজ তিনি বিলুপ্ত করেন এবং এতদ্‌বিষয়ে তিনি এও শর্তারোপ করেন যে, বৃটিশদের আগমনপূর্ব যুগের ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকেই ভারতীয় চিত্রকরদের ফিরে যেতে হবে।[১৫]

বিশ শতক

ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শনীর সংগঠক গ্রামীণ পটুয়া সম্প্রদায় বর্তমানে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এ ব্যাপারে এক অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলাদেশ কারুশিল্প পরিষদ মুন্সীগঞ্জের কালিন্দীপাড়ায় খুঁজে পেয়েছে সুধীর চন্দ্র আচার্য নামের একজন পট-শিল্পীকে যার 'গাজীর পট' চিত্রকর্মের জন্য তাঁকে ১৯৮৯ সালের কারুশিল্পী পুরস্কারে বিভূষিত করা হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষগণও ছিলেন পটুয়া। ছবি আঁকার কাজে তিনি ব্যবহার করেন প্রথাসিদ্ধ গামছা-ক্যানভাস ও প্রাকৃতিক রঙে চোবানো তুলোর সলতের তুলি।

১৯০৫ সাল থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং হাভেলের একজন যথার্থ শিষ্য হিসেবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত ভারতীয় চিত্রকলার উপজীব্য হতে হবে ভারতেরই ঐতিহ্যানুগ এবং অজন্তা, মুগল প্রভৃতি পূর্ববর্তী চিত্ররীতির কৌশলাদির ব্যবহার এর পক্ষে অপরিহার্য। চিত্রশিল্পে তিনি প্রবর্তন করেন নব্যবাঙালি ধারা, যা ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত চিত্রকলায় সনাতনী আচারনিষ্ঠ ধারারূপেই টিকে থাকে। তবে এ ধারার পাশাপাশি আরেকটি স্বতন্ত্র ধারায় বিশ্বাসী শিল্পীগোষ্ঠীর মতে, যুগোপযোগিতার খাতিরে আধুনিক চিত্রকলাকে অবশ্যই যুগপৎ ভারতীয় ও আধুনিক উভয় বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট হতে হবে এবং সেইসাথে ভারতীয় সমাজের আধুনিকত্বকেও অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। এ ধারায় আমরা পাই অবনীন্দ্রনাথের ভাই গগনেন্দ্র নাথকে, যিনি ঘনাকার চিত্রাঙ্কন রীতি (cubism) [১৬] নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এতে আরো রয়েছেন এঁদেরই খুড়ো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি কোনরকম আনুষ্ঠানিক পূর্বপ্রশিক্ষণ ছাড়াই ১৯২৮ সালে ৬৭ বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন।

---

১৫. W. G. Archer, *India and Modern Art*, (London 1959), 28-37.

১৬. কিউবিজম (Cubism): বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি শিল্প আন্দোলন, যাতে প্রকৃতির বাস্তবানুগ প্রতিরূপ-এর বদলে ঘনক (cube) ও অন্যান্য জ্যামিতিক রেখাচিত্রের দ্বারা বিমূর্ত বিন্যাস ঘটানো হয়।

যেমন লেখার ক্ষেত্রে তেমনি চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিচিত্র সৃজনশীল শিল্পী এবং তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। তিনি ছবি আঁকতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং প্রায়শই অর্ধ-বিমূর্ত ঢঙে। তাঁর আঁকা হিজিবিজি রেখা ও আঁচড়গুলো মূর্ত হয়ে উঠতো মানুষ ও অন্যান্য জীবের আকৃতিতে। একজন অভিব্যক্তিবাদী (Expressionist)[১৭] শিল্পী হিসেবে তাঁর চিত্রকর্মগুলো বিশ শতকের বড় মাপের শিল্পীদের চিত্রকর্মের পাশাপাশি জায়গা দখল করে নিয়েছে।

যামিনী রায়ও কলকাতা আর্ট স্কুলের 'নব্য-বাঙালি' রীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ রীতি তিনি ত্যাগ করেন গ্রামীণ ও কালিঘাট পটুয়াদের সহজ-সরল ও স্পষ্ট রীতির অনুশীলনের স্বার্থে। কলকাতার মালিন্য ও জীর্ণতায় বিতৃষ্ণ হয়ে এর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি সাঁওতালী বিষয়াদিতে মনোযোগ দেন এবং ১৯৪০-এর দশকে যে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে ব্যাপক ভিত্তিতে তৈরি হয় তাঁরই স্বাক্ষরযুক্ত অসংখ্য চিত্রকর্ম, যা ছিল তাঁর সহকারী শিল্পীদের যৌথ প্রচেষ্টারই ফসল।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পর জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, এস. এম. সুলতান ও শফিউদ্দিন আহমদ ঢাকায় চলে আসেন। এঁরা সবাই ছিলেন কলকাতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কলকতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন জয়নুল এবং বাংলার ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষের নকশা-চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন। কালি-তুলির প্রচণ্ড আঁচড় ছিল তাঁর বরাবরের অঙ্কনবৈশিষ্ট্য। তা দিয়েই তিনি আঁকেন এসব ছবি, যা এক মানবিক মহাবিষাদের মর্মস্পর্শী দলিলরূপে এখনো টিকে আছে। অর্ধ-বিমূর্ত রীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন সত্ত্বেও সাধারণত তাঁর অঙ্কনশৈলী ছিল বাস্তবানুগ আর তাঁর ব্যবহৃত রঙ ছিল কোমল (ছবি ৪১)। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় যে সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তন করেন সেটিই পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালে সম্প্রসারিত কলেবরে পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন চারুকলা ইনস্টিটিউট। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে তিনি সোনারগাঁও-এ স্থাপন করেন লোকশিল্প যাদুঘর। এর পরের বছরই বাষট্টি বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

প্রাচীন পটরীতি ও পাশ্চাত্য কৌশলের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে কামরুল হাসান পঞ্চাশের দশক থেকে অতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এক চিত্ররীতির বিকাশে সচেষ্ট হন। গ্রামবাংলার নৈসর্গিক শোভা তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। শক্তিশালী তুলিরেখার সীমানার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন উজ্জ্বল একবর্ণ তলের ব্যবহারে তিনি এর বিমূর্ত রূপ দিয়েছেন (ছবি ৪২)। ১৯৮৮

---

১৭. অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism): শিল্প, সাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে সমসাময়িক আর একটি আন্দোলন যাতে প্রতীক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলীর সাহায্যে অন্তরতর অভিধার বাস্তব রূপায়ণ করা হয়।

সাল পর্যন্ত আমৃত্যু এ নিজস্ব রীতির সার্থক অনুশীলনে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাচীনকাল থেকে বিশ শতকের এসকল শিল্পীদের শিল্পকর্ম পর্যন্ত রেখার প্রাধান্য বরাবরই লক্ষণীয়। শফিউদ্দিন আহমদের মুখ্য শিল্পমাধ্যম হচ্ছে খোদিত নকশার ছাপচিত্র (intaglio)। রেখায় আঁকা তাঁর ছবিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোড় নেয় বিশুদ্ধ বিমূর্ততায়।[১৮]

ভাস্কর্য

আঠারো শতক

পূজার্থ প্রস্তরমূর্তি তৈরির কাজ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা প্রাচীনকাল থেকেই একটি সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম ছিল। ক্ষুদ্রকায় ধাতব মূর্তি বিশেষকরে ভক্তিবাদীদের ব্যবহার্য কৃষ্ণমূর্তি এ সময়ে ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হতো বটে, কিন্তু চরিত্রবিচারে এগুলো যতোটা না ধ্রুপদী, তার চেয়ে বেশি লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিত।

কোম্পানি শাসনামলে মুর্শিদাবাদ গজদন্তশিল্পের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। ক্ষুদ্র মূর্তির পাশাপাশি গৃহসজ্জার সামগ্রীও এ উপাদানে প্রস্তুত করা হতো। পূর্ববঙ্গের গজদন্ত শিল্পকেন্দ্রগুলোতেও সুদৃশ্য প্যানেল ও অন্তঃখচিত কারুকর্ম তৈরি করা হতো। গজদন্তের পাতলা, সরু ও লম্বা ফালি দিয়ে বোনা একটি সিলেটী পাটি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এটির প্রান্তদেশ সুবর্ণতন্তু দিয়ে বোনা।

ভাস্কর্যশিল্পের ঐতিহ্যটি প্রবহমান থাকে কুম্ভকার শ্রেণীরই হাতে। কালপ্রবাহে প্রস্তরমূর্তির স্থান দখল করে নেয় বাঁশ ও খড়ের কাঠামোর গায়ে কাদামাটির আস্তরণযুক্ত প্রকাণ্ড চিত্রিত মূর্তি। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে জলরাশিতে নিমজ্জিত করে ফেলা হতো বলে সংরক্ষিত অবস্থায় এগুলো বর্তমানে অবিদ্যমান। বাংলার ভাস্কর্যশিল্পের দৃশ্যমান নিদর্শনাদি দেখতে হলে এ দেশের ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগুলোর পোড়ামাটির অলঙ্করণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এসব মন্দিরের কতকটির সর্বাঙ্গে রয়েছে পোড়ামাটির প্যানেল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্মুখ প্রাচীর (ফাসাদ)-এর বহির্গাত্রই সর্বাধিক অলঙ্করণসমৃদ্ধ। এর মধ্যেও আবার অকৃপণভাবে অলঙ্কারভারে সুসজ্জিত করা হয় খিলানযুক্ত মধ্য প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ ফাঁকা অংশটিকে। এসব পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন স্থান পেয়েছে সমকালীন জীবনধারার দৃশ্যাবলী, তেমনি রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যান আর মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জ্যামিতিক নকশা। রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার বিষয়বস্তুর ছড়াছড়ি এগুলোতে সর্বাধিক, আর উদ্ভিজ্জ ও জ্যামিতিক

---

১৮. Abstract Expressionism (বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে অ-জ্যামিতিক শিল্পরীতি গড়ে উঠে সেটি এই নামে পরিচিত। এটি মূর্তিহীন এবং প্রথাগত চিত্রের বিপরীত।

বন্ধনী ব্যবহৃত হয়েছে ছবির কাঠামোরেখার স্পষ্টীকরণে ও বর্ণনামূলক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রকে সুচিহ্নিতকরণে। এ শতকের পোড়ামাটি ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নমুনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরে (ছবি ৪৩)।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের পোড়ামাটির মন্দিরগুলোর সমন্বিত অলঙ্করণপদ্ধতি এ ইঙ্গিত বহন করে যে, ব্যাপক নির্মাণকর্মকাণ্ডের ফলে আঠারো শতক নাগাদ মন্দির অলঙ্করণের একটি সুনির্দিষ্ট ধরন প্রামাণ্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। পূর্ববর্তী যুগের সাদাসিধে উদ্ভিজ্জ নকশা এযুগে পরিত্যক্ত হয় এবং এর বিকল্প হিসেবে প্রবর্তিত হয় গভীরভাবে খোদাই করা পুরুপুষ্ট জটিল মূর্তি যার গাত্র অলঙ্কৃত হয়েছে নানা রকমের সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট নকশায়। মূর্তির দেহভঙ্গিমা প্রাণবন্ত এবং অবয়বের গঠন পরিপূর্ণ। স্তম্ভের নিম্নদেশের কারুকার্যময় অংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে ইউরোপীয়দের ছবিযুক্ত শিকার ও নৌকাচালনার দৃশ্যাবলী।

উনিশ শতক

মন্দির নির্মাণের বিপুলতম কর্মকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র হলো পশ্চিম বঙ্গ। আর এতে উদ্ভিজ্জ অলঙ্করণের তুলনায় মূর্তির ভাস্কর্যই প্রাধান্য পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক দৃশ্যাবলী চিত্রিত হলেও তাতে ইউরোপীয় চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, আর তা শুধু অলঙ্করণ নকশা (মটিফ) ও মূর্তির পুরুপুষ্ট গঠনেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং পুরোদস্তুর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও নব্য-ধ্রুপদী (neo-classical) স্থাপত্যিক আঙ্গিকের সযত্ন চিত্রায়নেও তা বিধৃত। আর এভাবেই কোরিন্থীয় রীতির স্তম্ভগাত্রে রাম, সীতা বা দুর্গামূর্তির রূপায়নও সম্ভবপর হয়। এসব চিত্রিত মূর্তি তিন-চতুর্থাংশ মাত্রায় দৃশ্যমান এবং এগুলোর মুখাবয়ব ভাবব্যঞ্জনাময়। খড়খড়িযুক্ত জানালা ইত্যাদির মতো বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চিত্রনির্মাণের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁক এতে বিদ্যমান। ক্রমে ভাস্কর্য ঐতিহ্যের স্থান দখল করে নেয় স্টাকো পদ্ধতি, যার প্রয়োগ অব্যাহত থাকে বিশ শতকের গোড়ার বছরগুলোতে নির্মিত অল্পসংখ্যক মন্দিরে। একটি স্থাপত্যিক অলঙ্কারকৌশলমাত্রে পর্যবসিত হয়ে স্বল্পকাল পরে এটিও বিলীন হয়ে যায়।

আধুনিককালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ভাস্কর্যকলার অনুশীলন ও বিকাশলাভ ধর্মীয় সংস্কারবশে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে নোভেরা আহমেদ কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে একজন ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি এবং শিল্পী হামিদুর রহমান আদি শহীদ মিনারের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই তরুণী স্বদেশ ছেড়ে ইউরোপে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন। স্বাধীনতাউত্তরকালে উন্মুক্ত এলাকায় কিছু মূর্তিসমৃদ্ধ ভাস্কর্য স্থান পেলেও একটি জোরালো শিল্প হিসেবে এটি এখনো বিকশিত হয় নি।

১৭

গ্রামীণ চারু ও কারুকলা

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান*

বাংলাদেশের লোক তথা গ্রামীণ ঐতিহ্য শুধুমাত্র প্রাচীন নয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক রীতিবৈচিত্র্যে ও অলঙ্করণে সমুজ্জ্বল। লোকায়ত শিল্পধারায় লোকসমাজ ও সংস্কৃতির অপূর্ব আলেখ্য ফুটে রয়েছে। লোকশিল্প যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং একাডেমিক রীতিবহির্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গ্রামীণ শিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভার মূর্ত প্রকাশ। কখনও প্রতীকী অলঙ্করণশৈলী এবং রঙের বিন্যাস রসোত্তীর্ণই নয়, বংশানুক্রমে সম্প্রসারিত। লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়ে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার লোকশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।[১]

বলাই বাহুল্য, লোকশিল্প লোকসংস্কৃতি বা 'ফোকলোর'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম প্রধান ও বর্ণাঢ্য শাখা। আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, "বাংলা-ফোকলোর বৃটিশ শাসনামলে ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত ও গবেষণালব্ধ বিভিন্ন উপকরণকে বোঝায়, যেমন গল্প, গান, প্রবাদ, ধাঁধা, টোটকা, কুসংস্কার এবং অনুরূপ ঐতিহ্যবাহী উপাদান।"[২] নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফোকলোরের একটি প্রতিষ্ঠিত শাখা হিসেবে লোকশিল্পকলা সর্বজনস্বীকৃত এবং গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য লোকশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধৃত। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন, "খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক পণ্ডিত, ইতিহাসশাস্ত্রের জনক হেরোডোটাসের কাল থেকে লোকঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল দৃষ্ট হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনার সূত্রপাত হয় নি।"[৩] মূলত ১৮৪৬

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

১. *লোকঐতিহ্য*, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ।

২. Ashraf Siddiqui, "Collections and Studies of Bengal Folklore", in Shamsuzzaman Khan (ed.), *Folklore of Bangladesh*, (Dhaka 1987), 1.

৩. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৭), ২৭।

সালে ডব্লিউ. জেটমাস সর্বপ্রথম ফোকলোর শব্দটি প্রচলন করেন। ফোকলোরের অন্যান্য শাখা থেকে লোকশিল্পের মূল পার্থক্য এই যে, লোকশিল্প গ্রামীণ সংস্কৃতির দর্শনেন্দ্রিয় ও বস্তুনির্ভর উপাদানের উপর গড়ে উঠেছে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির ধারা বিধৃত হয়েছে লোকশিল্পে, যার ব্যাপকতা ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজজীবনের উপর দিয়ে প্রবহমান, কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। সমাজ যেমন একটি জীবকোষের মতো ক্রমবিবর্তিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে, লোকসংস্কৃতিও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকে বলে তারও বিবর্তনের ধারা তার সঙ্গেই চলতে থাকে।"[৪]

লোকশিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি প্রসঙ্গে বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞগণ নানাপ্রকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাকিছু চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরা যায়, যার মধ্যে শিল্পীর মন-মানস ফুটে উঠে, জীবনবোধের উপলব্ধি রয়েছে অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ স্বকীয় শিল্পসৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, তাকেই লোকশিল্প বলা যায়, যেমন পোড়ামাটির ফলক, নকশি কাঁথা, কাঁসা-পিতলের দ্রব্যাদি, পটচিত্র, মৃৎপাত্র ইত্যাদি।[৫] এ প্রসঙ্গে কানাই সামন্তের মতবাদ প্রণিধানযোগ্য,—"যাকিছু মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, চিত্র, মূর্তি, কবিতা, থালা-বাটি, হাঁড়ি-কলসী, আসনপিঁড়ি, পুতুল, খেলনা, হাতের, পায়ের, কানের, কণ্ঠের, সিঁথির ও শিরের ভূষণ, সোনা-রূপার অলংকার ইত্যাদিকে লোকশিল্প বলা যায়। যদিও এগুলো মানুষের কঠিন শ্রমের ফসল, তথাপি এগুলো তার সৃজনশীল প্রতিভা ও পরিশীলিত রুচির স্বাক্ষর বহন করে।"[৬]

লোক বা গ্রামীণ শিল্প প্রসঙ্গে স্বভাবত গ্রামভিত্তিক আরও কিছু শিল্পের কথা এসে পড়ে, যেমন কুটির, হস্ত, কারু ও ক্ষুদ্রশিল্প। শৈল্পিক বিচারে কুটির ও লোকশিল্প এক নয়, কারণ কুটিরে যন্ত্রচালিত তাঁত, পাট ও অন্যান্য সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তাকেই কুটিরশিল্প বলে। অন্যদিকে হস্ত, কারু ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য এবং এগুলি উৎপাদনে প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য থাকে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় গ্রামের চারু ও কারুশিল্পীগণ যখন কোন শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন, তখন তাতে শিল্পবোধ, মননশীলতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন দক্ষতা প্রকাশ পায়।[৭] মূলত এগুলি কমার্শিয়াল অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ভুক্ত নয়।

লোকশিল্পের সঙ্গে একাডেমিক আর্ট বা আধুনিক শিল্পকলার প্রভেদ রয়েছে। আনন্দ কুমার স্বামী বর্ণিত মার্গ বা সনাতনী বা 'high way'-র সঙ্গে লোক বা দেশী শিল্প বা

---

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসংস্কৃতি ও তার সমস্যা—বাংলাদেশের লোকশিল্প*, (সোনারগাঁ ১৯৮৩), ২৮।

৫. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প* : সংজ্ঞা ও পরিধি; ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১।

৬. কানাই সামন্ত, *চিত্রদর্শন*, (কলকাতা ১৯৮৩), ২৭।

৭. *Encyclopaedia of World Art*, Vol. V. 470.

'by way'-র কোন মিল নেই। তোফায়েল আহমদ বলেন, "লোকায়ত শিল্প লোকবিশ্বাস ও লোকধর্ম সম্পৃক্ত বলে তার উপর একটি মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে 'একাডেমিক' আর্ট ঐতিহ্যবিরোধী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বৈষয়িক ও ভাবাবেগপূর্ণ।"[৮] ফিরোজ মাহমুদ একটি প্রবন্ধে "লোকশিল্পকে বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতির নন্দনতাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ এবং সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের ভিত্তি, সমষ্টিগত প্রয়াস এবং আবহমান ধারা বজায়কারী শিল্প বলে অভিহিত করেন।"[৯] লোকশিল্পের সঙ্গে 'পপুলার' শিল্পকলার প্রভেদ রয়েছে এজন্য যে শেষোক্ত শিল্পমাধ্যমটি সাধারণের প্রয়োজনে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। দরবারী শিল্পরীতির বিপরীতে লোকশিল্প গোটা গ্রামীণ সমাজের যৌথ অথবা একক শিল্পমাধ্যম। এই শিল্প কেবল মার্জিত ও পরিশীলিত শিল্পরসের সঞ্চারই করে না, যেন গোটা শিল্পী সমাজকে একই সূত্রে গ্রথিত করে রাখে।

গ্রামীণ শিল্পীদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে, তবে বিচ্ছিন্ন করে নয়। যেসমস্ত শিল্পীগোষ্ঠী অর্থাৎ চারু ও কারুশিল্পী গ্রামীণ শিল্পে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মালাকার, কামার, কুমার, সূত্রধর, ওস্তাগার, স্বর্ণকার, পটুয়া, চিত্রকর, ছৈয়াল, তাঁতি, সেকরা, মাদুর-নকশি কাঁথা-শিকা-পাখার নারী ও পুরুষ শিল্পী। লোকশিল্পের প্রকাশভঙ্গি তিন প্রকারের—বাস্তবধর্মী, বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও রীতিবদ্ধ বা স্টাইলাইজড। আন্তর্জাতিক কোন রীতি-কৌশল লোকশিল্পে গড়ে না উঠলেও এতে সর্বজনীন আবেদন থাকে। রেখা, রঙ, মডেলের ভঙ্গিমা ও আকৃতিতে ফুটে উঠে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বৈপরীত্য। বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যের পরিমণ্ডল খুবই ব্যাপক। এই ঐতিহ্য লোকায়ত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই শিল্পসম্ভার বাঙালির মন-মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে, যেমন মাটির পুতুল, পোড়ামাটির ফলক, সরাচিত্র, ঘটচিত্র, মুখোশচিত্র, পটচিত্র, দারুশিল্প, অলঙ্কার, ঢোকরাশিল্প, বাদ্যযন্ত্র, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, নকশি পিঠা, নকশি পাটি, বাঁশ-বেত-শোলার কাজ, বয়নশিল্প ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে চালচিত্র, পুঁথির পাটা, আলপনা, শঙ্খ, খড়ের বাস্তুশিল্প।

ক. চারুশিল্প

পুঁথিচিত্র

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পুঁথি নামে পরিচিত। পুঁথিতে বর্ণিত ঘটনাবলী অবলম্বনে শিল্পী পুঁথিটি চিত্রিত করেন। এগারো শতকে পালযুগে বাংলায় সর্বপ্রথম পুঁথিচিত্রের উদ্ভব হয়।[১০] এমন একটি পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে এন্ড্রু টপসফিল্ড বলেন :

---

৮. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ১৪।

৯. Firoz Mahmud, "*Methodologies for the Study of Folk Art of Bangladesh*" in Shamsuzzaman (ed.), *Folklore*, 449.

১০. J. C. French, *The Art of the Pala Empire in Bengal*, (New Delhi 1983), 46.

> তালপাতায় অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রাবলী তালপাতায় লিপিবদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অলঙ্করণে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যায় লিপিবদ্ধ করা হতো। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ও মনোমুগ্ধকর চিত্র বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব ও বর্জ্রায়নের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অঙ্কিত হয়।[১১]

যেসমস্ত পাণ্ডুলিপিতে পুঁথিচিত্রের নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *অষ্টসাহাসরিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, বোধিচর্যাব্রত, পাঞ্চবাকসা, মনসা-মঙ্গল* ইত্যাদি। বুদ্ধদেবের জীবনীর বিভিন্ন আলেখ্য, যেমন তাঁর জন্ম, পরিনির্বাণ, বিভিন্ন দেব-দেবী, যেমন বোধিসত্ত্ব তাতে চিত্রিত হয়েছে।

পটচিত্র

পটচিত্র মূলত গ্রামের লোকজ চিত্র। যাঁরা পটচিত্র আঁকেন তাঁদের বলা হয় পটুয়া। তাঁদের গণশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[১২] পট্ট অথবা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। পট সাধারণত মোটা সুতীপড়ের লম্বা খণ্ড, এতে বিশেষ প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণনাধর্মী কোন পৌরাণিক অথবা লোককাহিনী অঙ্কিত করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্মপ্রচারের জন্য পটচিত্র অঙ্কন করতেন।[১৩] পটচিত্রকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) জড়ানো পট ও (২) চৌকো পট। বারো থেকে ষোল ফুট দীর্ঘ এবং দুই থেকে তিন ফুট চওড়া হতো জড়ানো পট। এই জড়ানো পটে দক্ষ পটুয়া এক খণ্ডচিত্র কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করে অঙ্কিত করতো পরপর সাজিয়ে। চৌকো পট এক ফুট লম্বা, ছয় থেকে আট ইঞ্চি চওড়া হয়। জড়ানো ও চৌকো পটে আঠাল রঙ ব্যবহার করে কাপড়ের উপর চিত্র আঁকা হয়। গ্রামীণ শিল্পীগণ এসমস্ত পট নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে গান-বাজনা-নৃত্যের তালে তালে বিভিন্ন ধরনের রোমাঞ্চকর ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করে শুধু মনোরঞ্জনই করতেন না, এগুলি তাঁদের আয়েরও উৎস ছিল।

ভারত উপমহাদেশে পটচিত্রের ইতিহাস ষোল শতকের পর থেকে শুরু হয়। মুগল আমলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পটচিত্র হচ্ছে 'দাস্তান-ই-আমির হামজা'। পটচিত্রের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি, গ্রাম ও লোকসমাজের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহু পট আঁকা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী ও প্রেমলীলা বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। পটচিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে দু'টি সম্প্রদায়ের উপযোগী চিত্রাবলী রয়েছে, যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসভিত্তিক 'রামায়ণ', 'রূপকথা', 'কৃষ্ণলীলা', 'বেহুলা', 'মনসামঙ্গল', 'কমলে কামিনী', 'শিব পার্বতী',

---

১১. Andrew Topsfield, *Painting in Arts of Bengal*, (London 1979), 34.

১২. কৃষ্ণনাথ দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, ৪২০।

১৩. ঐ।

'হরিশচন্দ্রের পট' (চিত্র ১)। অপরদিকে মুসলিম সমাজের উপযোগী গাজীর পট (চিত্র ২) বা গাজীকালু-চম্পাবতীর উপাখ্যানভিত্তিক পটচিত্র।[১৪] ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও জাগতিক বিষয়বস্তু, প্রচলিত লোককাহিনী ও উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক পটও অঙ্কিত হয়েছে, যেমন রূপকথা পট (চিত্র ৩), যাদুর পট, সাহেব পট, সাঁওতাল পট, কালিঘাটের পট ইত্যাদি। খৃস্টীয় উনিশ শতকে কাগজের উপর অঙ্কিত কালিঘাটের পটচিত্র তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছে এবং সেইসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয় সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছে।[১৫] পটচিত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিবপটের আবির্ভাব ঘটে। এমনকি বন্যার বিভীষিকা ও পরিবার পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেও পটচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পাটাচিত্র

প্রাচীন পুঁথি লিপিবদ্ধ করা হতো তুলট কাগজ, তালপাতা প্রভৃতিতে এবং এই পুঁথি কাঠের দু'টি পাটা বা ফালির সাহায্যে সুতা দিয়ে বাঁধা থাকতো। কাঠের এই প্রচ্ছদকে পুঁথিপাটা বলে এবং এতে নকশা করা থাকতো। পাল আমলের বহু পুঁথিতে এ ধরনের পাটাচিত্র দেখা যায়। পনেরো শতকে চিত্রিত বিষ্ণুর দশ অবতারের যে ক্ষুদ্রাকৃতি পাটাচিত্র রয়েছে তা বৃটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। উড়িষ্যারীতিতে চিত্রিত বিষ্ণুপুরাণের একটি পুথি এই পাটায় আবদ্ধ রয়েছে।[১৬] অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণলীলা ও রসলীলার বিভিন্ন চিত্র পাটায় দেখা যাবে।

পিঁড়িচিত্র

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমানদের ঘরে এক ধরনের নকশাকৃত পিঁড়ি বা কাঠের আসন ব্যবহৃত হয়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্বণ, আহার, খৎনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে পিঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কাঠের পিঁড়ি খোদাই করে এবং তাতে রঙ লাগিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়। এই সমস্ত চিত্র প্রতিকৃতিবর্জিত গাছ-লতা-পাতা-ফল-ফুল সম্বলিত থাকতো। (চিত্র ৪)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বাংলার ব্রত* গ্রন্থে ২০টি পিঁড়িচিত্রের উল্লেখ করেন।

---

১৪. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৪৮-৫০; রজতানন্দ দাসগুপ্ত, *'ভারতীয় উপমহাদেশে পটচিত্রকলা'*; ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ৫৪-৫৫।

১৫. W.G. Archer, *Bazar Paintings of Calcutta* (London 1953), 1-5; পারেশ ইসলাম, *বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্য, কালিঘাটের পট*, (ঢাকা ১৩৮৬-৮৮), ৩১।

১৬. *লোকঐতিহ্য*, ৩।

চালচিত্র

কোন মহান ব্যক্তি, দেবদূত ও মহাপুরুষের মাথার পিছনে মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য গোলাকার বলয় বা 'হ্যালো'র ব্যবহার দেখা যায়। বাইজানটাইন ও চীনা চিত্রকলায় এ ধরনের হ্যালো ব্যবহারের প্রচলন হয় এবং পরবর্তীকালে মুসলিম চিত্রকলায় এই রীতি বিশেষ রূপ ধারণ করে। স্বর্গীয় জ্যোতির কল্পনা থেকে চালচিত্রের আবির্ভাব হয়েছে। মাটির বিগ্রহের মাথার পিছনে বাঁশের গোলাকার চাটাই-এর উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় চালচিত্র।

কুলাচিত্র

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিত্রিত কুলার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রত ও লক্ষ্মীপূজায় কুলার ব্যবহার সর্বজনীন। ডালা ও কুলায় বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করে অলঙ্করণের উপাদান সৃষ্টি করা হয়। বিবাহের লগন পাঠাবার জন্য নকশাকৃত কুলার প্রয়োগ সর্বাধিক। এছাড়া চিত্রিত কুলা দিয়ে তোরণ, মঞ্চ ও গৃহসজ্জাও করা হয়।

ঘটচিত্র

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষকরে মেলায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অলঙ্কৃত ঘট পাওয়া যায়। কুমারেরা ছোট আকারের কলসের আদলেই এই সমস্ত ঘট তৈরি করে। অবশ্য এতে লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তিও সৃষ্টি করা হয়। মনুষ্যাকৃতি এসমস্ত ঘট খুবই জনপ্রিয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবহৃত এই সমস্ত ঘটের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলঘট, মনসাঘট, নাগঘট, শীতলাঘট, লক্ষ্মীঘট। ধর্মীয় বিষয়বস্তুভিত্তিক এই সমস্ত ঘটের প্রতিকৃতিতে রঙের সাহায্যে মুখাবয়ব, ভুরু, চোখ, তিলক, চুল, হাত অলঙ্কৃত হয়। জাগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে যেসমস্ত ঘট খুবই প্রচলিত তা হচ্ছে জোড়ঘট, হাতবাইয়া, পাঁচটোপা ও তেরটোপা।[১৭]

সখের হাঁড়ি

গ্রামীণ জীবনের নিত্যব্যবহার্য হাঁড়ি খুবই সহজলভ্য। বিন্নীখই, আঁকড়ি, চিনির সাঁচ, কদমা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী রাখার জন্য ব্যবহার্য হাঁড়ি মেলাতে প্রচুর পাওয়া যায়। কুটুমবাড়িতে মিষ্টান্ন নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহৃত হয় সখের হাঁড়ি। এটি আকারে তরকারির পাতিলের মতো, কিন্তু মুখটি ঈষৎ লম্বা। এসব হাঁড়িতে সাধারণত জমিন থাকে হলদে ও সাদা এবং তার উপরে কালো, লাল, গোলাপী রঙ ও রেখার মাধ্যমে লতাপাতা ও জ্যামিতির নকশা অঙ্কন করা হয়। কখন কখন মাছ ও পাখিও আঁকা হয়। তোফায়েল আহমদের মতে :

---

১৭. প্রাগুক্ত, ৫।

> সখের হাঁড়ীর দু'টি প্রচলিত ধারা বা স্টাইল রয়েছে। একটি বাঁয়া আর একটি বাঙাল পাড়া। বাঁয়া রীতিতে হলদে জমিনের ওপর লাল রঙের মাছ, পদ্ম ও দল-দামের (গো-খাদ্য) ছবি, তার ওপর সবুজ ও গাঢ় নীল রঙের টান থাকে। এ পদ্মের অঙ্কনরীতি ভিন্ন। দেখতে অনেকটা আপেলের মতো অর্ধফুটন্ত স্টাইলাইজড চিত্র।[১৮]

অপরদিকে বাঙালপাড়া হাঁড়ির লাল জমিন তিনটি চওড়া হলদে রেখায় ভাগ করা হয়। তলদেশে তিনটি রেখার মিলনস্থলে একটি লাল রঙের অষ্টদল পদ্ম এবং তিনটি খোপে মাছ, চিরুনী ও পাখি অঙ্কিত হয়।

সরাচিত্র

রাজশাহী শহরের অদূরে বাঁয়া গ্রামে এবং পুটিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঢাকা জেলার নয়ারহাটে সরা প্রস্তুত হয়ে থাকে। সরা বলতে সাধারণত পাতিলের ঢাকনা বা বঁউউফ বোঝায়। এই ঢাকনায় দক্ষ চিত্রকর যখন নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ প্রকাশের জন্য চিত্রাঙ্কন করেন তখনই সরাচিত্রের সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন, বিবাহ উৎসব, পালা-পার্বণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীসরার ব্যবহার সর্বজনীন। একারণে সরাচিত্রে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। হিন্দু বাঙালির শুধু গৃহসজ্জার নয়, বরং লক্ষ্মীপূজার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে লক্ষ্মীসরা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ লক্ষ্মী সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের প্রতীক (চিত্র ৫)। এতে মৃৎশিল্পীগণ পটচিত্রের আদলে দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করেন। লক্ষ্মীসরার আকার, রীতি, কৌশল ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকা ও ফরিদপুরের সরাচিত্রে ধানের শীষ ও পায়ের ছাপের সাথে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি দেখা যায়। কখন কখন পেঁচা, চিরুনি, সিন্দুরকৌটা ও অন্যান্য প্রতীক অঙ্কিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মী ছাড়াও দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, মহিষমর্দিনী ও সরস্বতীর প্রতিকৃতি দেখা যায়।[১৯] মুসলিম মৃৎশিল্পী সরাতে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা বিধৃত করেন। কখন কখন মোহররমের চিত্রও অঙ্কিত হয়।

মুখোশচিত্র

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আজও নানা লোকজ-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অভিনয়, নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়। লৌকিক দেব-দেবীর আচরণ বিষয়ক ও লোকজীবনের মঙ্গলামঙ্গলচেতনা সম্পর্কিত মুখোশ পরিহিত নৃত্যশিল্পীগণ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য শিবনৃত্য, কালীনৃত্য, পালা ও যাত্রাগান বিশেষভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে পরিপুষ্ট (চিত্র ৬)। মুখোশ আসলে

---

১৮. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৪-৬৬; মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৩৬।

১৯. নিজামউদ্দিন আহমদ, *মহাস্থান—ময়নামতি ও পাহাড়পুর*, (ঢাকা ১৯৭৯), ৪২।

টোটেমের প্রতীক। অপদেবতার ক্রোধ থেকে রেহাই পাবার জন্য সরলমনা মানুষ মুখোশ পরে থাকে এবং মুখোশ পরিধানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় নানা অভিব্যক্তি, যেমন বীরত্বব্যঞ্জকভাব, করুণভাব বা সম্মোহনভাব। এধরনের মুখোশনৃত্য গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন ছৌ-নৃত্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিম বঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ছৌ-মুখোশনৃত্য (পুরুলিয়া) পুরোপুরি লোকনৃত্য না হলেও এদের বাদ্য ও সঙ্গীতে লৌকিক প্রভাব আছে।"[২০] সাধারণত মাটি, কাপড়, কাঠ ও লাউয়ের খোল দিয়ে মুখোশ তৈরি করা হয়। মুখোশে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে হলুদ, লাল, নীল এবং কালোই প্রধান। মুখোশ তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ। প্রথমে মুখোশের 'পেটা' তৈরি করতে হয় মাটি দিয়ে একটি কাঠের পাটার উপর। তারপর হাতে টিপে যে চরিত্রের মুখোশ হবে তার মোটামুটি আদল ফুটিয়ে তোলা হয়।

কুষ্ঠীচিত্র, ঘুড়িচিত্র, অঙ্গচিত্র, গৃহসজ্জা

সম্প্রতি লোকজ শিল্পকলার প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পীগণ বিভিন্ন সহজলভ্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত করে থাকেন বিভিন্ন সামগ্রী, যেমন হাঁড়, দাঁত, শিব, কাঁচ, শংখ, ঝিনুকের জিনিসপত্র, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ফুলকারী, ঘুড়িচিত্র, দশাবতার তাস, করাগুিচিত্র, বৃক্ষচিত্র, মোহররমের ঢাকচিত্র, চামড়ার কাজ, ফিলিগ্রী, বিদরী, অঙ্গচিত্র, দিঘলচিত্র, কুষ্ঠীচিত্র ইত্যাদি। কুষ্ঠীচিত্র বা বংশলতিকা একটি লম্বা কাগজ, যাতে নবজাত শিশুর জীবনবৃত্তান্ত বিধৃত থাকে। তা দেখে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে। হিন্দুপরিবারে যেমন কুষ্ঠীচিত্র থাকে তেমনি মুসলিম পরিবারে থাকে কুরসিনামা।

শিশু-কিশোরদের অপার আনন্দ দেয় বিচিত্র রঙের ঘুড়ি। গ্রাম ও শহরে এর জনপ্রিয়তা সমানভাবে বিস্তৃত। পাতলা কাগজের চারকোণা ঘুড়িতে কখন কখন লেজ দেয়া হয় এবং জমিনে বিভিন্ন রকমের নকশা, জ্যামিতিক লতাপাতা বা প্রাণীর প্রতিকৃতি থাকে। বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে বিভিন্ন রকমের ঘুড়িকে, যেমন মালাদার, চোকদার, তেলেঙ্গা, পতঙ্গা, পেটকাটা। ঘুড়িতে ব্লকের ছাপ দিয়ে অথবা আলগা পাতলা রঙিন কাগজ সেঁটে নকশা করা হয়। তোফায়েল আহমদ বলেন, "গৌরীপুর অষ্টমীর মেলায় ময়ূর ও বাঘের ছাপচিত্র সম্বলিত পেটকাটা ঘুড়ি প্রভৃতি প্রচুর আমদানি হয়।"[২১]

প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জা নারীদের স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা এবং বিবাহ উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে অঙ্গসজ্জার বিরাট সমারোহ দেখা যায়। হাত-পায়ে বিভিন্ন নকশা মেহেদি রঙে অঙ্কিত হয়, এমনকি পায়ের উপরিভাগও মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। মুখমণ্ডলের জন্য চন্দন একপ্রকার অপরিহার্য উপকরণ। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের

---

২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসংস্কৃতি*, ২৮।

২১. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৫৭-৫৮।

শরীরে উল্কি-চিত্র অঙ্কিত হয়। এই সমস্ত উল্কিতে সাপ, সূর্য, পাখি ও বৃত্ত প্রাধান্যলাভ করে। তোফায়েল আহমদের মতে, "ইন্দ্রজালে বিশ্বাস, যৌনতা এবং নান্দনিক চেতনা থেকে কষ্টকর এ আচার উদ্ভূত।"[২২]

গ্রামবাংলায় মাটির বাড়িতে মাটির প্রলেপ ও বিভিন্ন রঙের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নকশা সৃষ্টি করা হয়। উপজাতীয়দের মধ্যে গৃহসজ্জার প্রবণতা সর্বাধিক। রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতালদের ঘরে বিভিন্ন নকশা দেখা যায়। এতে যেসমস্ত মটিফ প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে মন্দির, দোলনরত ময়ূর, হাতি, ঘোড়া, সিংহ, ফুলগাছ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলপনা

মূলত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক আচারের মধ্যে সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত আলপনা অলঙ্করণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চালের গুঁড়া মিশিয়ে এক ধরনের মণ্ড তৈরি করে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আলপনা অঙ্কন করা হয়। কখন কখন চালের গুঁড়া ছিটিয়ে তার উপর আঙ্গুল দিয়ে আলপনা আঁকার প্রথা রয়েছে। সাধারণত ঘরের বারান্দায়, উঠানে ও মেঝেতে আলপনা আঁকার রেওয়াজ রয়েছে। কৃষ্ণলাল দাস আলপনাকে 'মণ্ডন শিল্প' নামে অভিহিত করেছেন।[২৩] বৈষ্ণব সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে আলপনার উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে মধ্যযুগে আলপনার প্রচলন হয়। হিন্দু, এমনকি অধুনা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আলপনার নকশা প্রাধান্য লাভ করেছে। সামাজিক, ধর্মীয়, এমনকি রাজনৈতিক (একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবস) অনুষ্ঠানে আলপনা ব্যবহৃত হয়। মূলত হিন্দু সমাজের পূজা-পার্বণের সঙ্গে আলপনা বিশেষভাবে জড়িত। লোকসংস্কার ও লৌকিক শিল্প হিসেবে আলপনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৪] তোফায়েল আহমদ বলেন, "আলপনা সাধারণত ব্রতের আনুষ্ঠানিক অলঙ্করণ।"[২৫] ব্রত তিন প্রকারের—শাস্ত্রীয়, নারী ও কুমারীব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ১২১ ধরনের আলপনা রয়েছে।[২৬] অনেকটা বিমূর্ত রীতিতে সৃষ্ট আলপনার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডায়াগ্রাম, যার মধ্যভাগে মহিলারা তাদের কাম্যবস্তুটি মণ্ডপের মধ্যে অঙ্কিত করেন। এ মটিফটি পদ্ম, সূর্য, চন্দ্র, মাতৃকা, জন্তু, পাখি বা উদ্ভিজ্জ হতে পারে। এছাড়া

---

২২. ঐ, ৫৭।

২৩. Ashraf Siddiquee, Collections, 1-161 আশরাফ সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি;* ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১৫-২২।

২৪. Hameeda Hossain, *Craft tradition of Bangladesh* in Shamsuzzaman Khan (ed.) *Folklore of Bangladesh*, 460.

২৫. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৮-৬৯।

২৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত;* তোফায়েল আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত, ৪৭-৪৮।

খগেশ কিরণ তালুকদারের মতে, সুপারি, মাছ, পান, আয়না, চিরুনি, কলমিলতা, সুবচনীয় হাঁস, পৃথিবী, পুতুল, সিন্দুর ও সিংহাসনও মটিফ হতে পারে।[২৭]

খ. কারুশিল্প

গ্রামীণ স্থাপত্য

কাদা, মাটি, ছন, বাঁশ, গোলপাতা ও খড়-কুটো দিয়ে তৈরি ঘর-বাড়ি আধুনিক স্থাপত্যের পর্যায়ে না পড়লেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রামবাংলার দো-চালা ও চার-চালা ঘর গ্রামীণ কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ শ্লিফারের মতে :

> এই পদ্ধতিতে খুব কমই অর্থব্যয় হয়ে থাকে এবং উন্নতমানের স্থানীয় সনাতনী কৌশল গ্রামীণ ঘর-বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করে। এর ফলে স্থানীয় নির্মাতারা সনাতনী নির্মাণরীতির সঙ্গে পরিচিতই হয় না, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে এবং সমবায়ের মাধ্যমে নির্মাতা পরিবার স্থানীয় উপকরণ, যেমন কাদা,কাঠ,নল-খাগড়া প্রভৃতি দিয়ে উন্নতমানের ও সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি তৈরি করতে পারে।[২৮]

বাংলাদেশের আর্দ্রতা ও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রামীণ বাংলার ঘর-বাড়িতে ঢালু ছাদ ব্যবহৃত হয় যাতে সহজেই বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। এর ফলে কার্নিস বক্রাকার হয়, ছাদও ঢালু করে তৈরি করা হয়। 'দো-চালা' ও 'চার-চালা' থেকে গ্রামীণ কারুশিল্পী ছৈয়াল, ছুতার, বেলকীর কারিগর 'আট-চালা' ও 'বার-চালা' ঘর নির্মাণকৌশল প্রয়োগ করে। *ময়মনসিংহগীতিকা* ও *আইন-ই-আকবরীতে* বাংলা ঘরের উল্লেখ আছে।[২৯] দো-চালা ও চার-চালা ঘর নির্মাণের কৌশল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। চার কোণায় চারটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে আড়াআড়িভাবে বাঁশ লাগিয়ে ঈষৎ বাঁকা করে মজবুতভাবে তৈরি করা হতো বাংলা-ঘর। গ্রামীণ বাংলার চালাঘর পরবর্তীকালে ইটের মসজিদ ও মন্দিরে ব্যবহৃত হলে বক্রাকার কার্নিস ও ঢালু ছাদের সৃষ্টি হয়। দো-চালা ইটের ইমারত দেখা যায় মালদার গৌড়ে সতেরো শতকে নির্মিত ফতেহ খানের সমাধিতে। এর প্রতিফলন দেখা যায় ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুতে নির্মিত শাহ মুহম্মদের মসজিদের দো-চালা প্রবেশপথে এবং ঢাকার বেগমবাজারে অবস্থিত করতলব খানের মসজিদের পূর্বদিকে সংযোজিত গৃহে। বক্রাকার কার্নিসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি, ঢাকার রামপালে বাবা-আদমের মসজিদ ও টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদে (চিত্র ৭)।

---

২৭. *লোকঐতিহ্য*, ৬; তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৯।

২৮. Abdullah Schleifer, 'Hasan Fathy: A Voyage to New Mexico' in *Arts and the Islamic World*, (1982-83), 32-33.

২৯. Syed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, (Dhaka 1987), ii; Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, Vol. I, 303.

মোহিত রায় বলেন, "বাঙ্গালীর বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সকল রূপ দো-চালা আদলেই বঙ্গদেশের গ্রামে পাকা-মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল।"[৩০] উদাহরণস্বরূপ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা, যশোরের চাঁচড়ার মন্দির ও রাজশাহীর পুটিয়ার গোবিন্দ মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যায়।[৩১] এক বাংলা অথবা দো-চালা থেকে চার-চালা এবং চার-চালা থেকে আট ও বারো-চালা ঘরের সৃষ্টি হয়েছে। এক বাংলা থেকে জোড় বাংলায় রূপান্তর ঘটে, যার নিদর্শন পাবনার গোপীনাথ জোড় মন্দির (চিত্র ৮), বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির প্রভৃতি। দো-চালার সম্পূরক হিসেবে চার-চালার উদ্ভব। খুলনার বাগেরহাটে ১৪৫৩ সালে নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদের মধ্যস্থলে চার-চালা ছাদ রয়েছে। পরবর্তীকালে রাজশাহীর গৌড় অঞ্চলে দরসবাড়ী ও ছোট সোনা মসজিদে চার-চালা ছাদের পুনরাবৃত্তি হয়। মন্দিরেও চার-চালার প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন যশোরের নলডাঙ্গায় গণেশ মন্দির, নদীয়ার শান্তিপুরে জলেশ্বর মন্দির। গ্রামীণ বাস্তুকলার এক আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে আট-চালা ঘর, যা চার-চালা ঘরের সম্প্রসারণ। আট-চালা মন্দিরের উদাহরণ হচ্ছে নদীয়ার শান্তিপুরের আট-চালা মন্দির ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাধাবিনোদ মন্দির। আট-চালা থেকে বারো-চালা ঘর নির্মাণ কারিগরদের সৃজনশীল দক্ষতার পরিচায়ক। তিন থাক ছাদযুক্ত বারো-চালা ইটের মন্দিরের নিদর্শন উনিশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার রাউতাড়া গ্রামের রায়পরিবারের মন্দির ও হাওড়ার দেউলপুর মন্দির।

উল্লেখ্য যে, গ্রামবাংলার নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দো-চালা ও চার-চালা নির্মাণকৌশল মুগল ও রাজপুত স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এর উদাহরণ আগ্রাদুর্গের 'বাংলা মহল', দিল্লীর লাল কেল্লার 'মতি মসজিদ' ও লাহোরের 'নৌলক্ষ্যা প্যাভেলিয়ন'। রাজপুতানার আম্বর, যৌধপুর, আলওয়ার প্রভৃতি স্থানে চার-চালা ধরনের ইমারত বাংলার গ্রামীণ বাস্তুকলার পরিচয় বহন করে।[৩২]

নকশি কাঁথা

আবহমান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নকশি কাঁথা গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সৃজনশীল বিকাশ হিসেবে পরিগণিত। পল্লীবাংলার মহিলাদের জীবনের প্রয়োজনে তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নকশি কাঁথার উদ্ভব হয়। একাধিক পুরাতন, জীর্ণ ও মলিন কাপড়ের টুকরা পাট করে একটির উপর আর একখানা রেখে অবিন্যস্তভাবে সেলাই করে তৈরি করা হয় কাঁথা। তোফায়েল

---

৩০. মোহিত রায়, *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি*, সম্পাদনায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীররঞ্জন দাস, (কলিকাতা ১৯৭৫), ১২-১৬।

৩১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *লোকস্থাপত্য, বিশ্লেষণ ও প্রভাব;* ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১০২-১১০।

৩২. প্রাগুক্ত, ১৩৯-৪০; অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য, পশ্চিম বাংলার লোকশিল্প*, (কলিকাতা ১৯৭৬), ১৩।

আহমদের মতে, সংস্কৃত শব্দ 'কন্থা' থেকে বাংলা কাঁথা শব্দের উৎপত্তি।[৩৩] কাঁথায় শাড়ির পাড় থেকে নেয়া বর্ণালী সুতা দিয়ে বাংলার প্রকৃতির অতি চেনা ফুল, ফল, লতাপাতা, পশুপাখি, মানুষের মটিফ ও জ্যামিতিক নকশার ব্যবহারে একটি সাধারণ কাঁথা রূপান্তরিত হয় নকশী কাঁথায়।

এই কাঁথায় ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস, সামাজিক রূপবৈচিত্র্য, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবাদ বিধৃত হয় শৈল্পিক লালিত্যে। এই সমস্ত বিচিত্র ধরনের কাঁথা পাওয়া যায় যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে।

উপযোগিতার ভিত্তিতে নকশি কাঁথাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) লেপকাঁথা, (খ) সুজনি কাঁথা, (গ) শিশুর কাঁথা, (ঘ) চাদর কাঁথা, (ঙ) বরের আসন কাঁথা (চিত্র ৯), (চ) দস্তরখান, (ছ) রুমাল কাঁথা, (জ) পান-প্যাচানী, (ঝ) জায়নামাজ, (ঞ) বালিশের ঢাকনা, (ট) আরশিলতা (চিত্র ১০), (ঠ) গিলাফ, (ড) বোঁচকা, (ট) বর্তনঢাকনী, (ন) নকশি থলে, (ত) কবর ঢাকনা। নকশি কাঁথায় সহজ ও সরল গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য ফুটে উঠে। মহিলাদের অসাধারণ সূচিনৈপুণ্যের ধারক এই সমস্ত নকশি কাঁথা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি লোকজ বিশ্বাস, মন-মানসিকতা ও ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। গিলাফ ও জায়নামাজে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের ফলস্বরূপ লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নকশি কাঁথায় রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে।[৩৪] কাঁথার ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যেমন বর-বধূ পালকিতে যাওয়ার সময় নকশি কাঁথা বিছিয়ে দেয়া হয় (চিত্র ১১)। প্রধান প্রধান নকশার মটিফ হচ্ছে জীবনবৃক্ষ, পদ্ম, চাঁদ, তারা, মাছ, হাতি, চিরুনি, আয়না প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে শঙ্খলতা, হৈতনের (সতীনের) মোচড়, তৈরসী ফুল, আলপনা, চাঁপা ফুল, শতদল, কালকা, পান পাতা, সয়াস্তিকা (স্বস্তিকা), গোলকধাঁধা, বেড়ি, বটি, কৃষিসরঞ্জাম, হাতি, ময়ূর, হাঁস, পরী ইত্যাদি।[৩৫]

নকশি কাঁথার সেলাই-এর মূলধারা দু'টি—যশোর এবং রাজশাহী। যশোর রীতিতে কাঁথার তিনটি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা ও পাইড় কাঁথা। রাজশাহীর কাঁথা প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন যে চার ধরনের কাঁথা বিশেষ

---

৩৩. তোফায়েল আহমদ, লোকশিল্প, ৫৯-৬০, Niaz Zaman, *The Art of Kantha Embroidery*, (Dhaka 1981), 12-17.

৩৪. সৈয়দ মাহবুব আলম, *'লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : প্রসঙ্গ নকশীকাঁথা'*, ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১৪০-৫০; Zaman, *The Art of Kantha Embroidery*, 13-14.

৩৫. Zaman, *Kantha Embroidery*, 41-61; দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ১৩৪১)।

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেমন লহরী, কার্পেট, লীক ও সুজনী।[৩৬] নকশি কাঁথা গ্রামীণ বাংলার একান্ত ও নিজস্ব মেয়েলি শিল্প। গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আহৃত নকশি কাঁথা দেখে অভিভূত হয়ে এর সূক্ষ্ম বয়নশৈলী সম্বন্ধে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন :

> কাঁথার সর্বাপেক্ষা বড় মনোহারিত্ব ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পদ। ইহার ঘন ফোড় দেখিয়া মনে হয় যে জীবন অস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় টলমল। ইহার নির্মাণে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে হইবে জীবন অমর। শিল্পের সূক্ষ্মতায় যে রূপের অবধি নাই, শিল্পীর জীবনেরও তদ্রূপ অবধি নাই। কারণ শিল্পী যদি ক্ষণতরেও ভাবিতেন যে তিনি মরিবেন তবে তিনি এরূপ কার্যে হাত দিতেন না।[৩৭]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নকশি কাঁথা একটি অবসরবিনোদনের শিল্প হয়েও এরূপ চমৎকারিত্ব ও সৌকর্য প্রদর্শনে সমর্থ। ভেরোনিকা মারফী যথার্থই বলেন, "মহিলাদের দ্বারা সৃষ্ট নকশি কাঁথা লোকশিল্পের প্রাণমূল ও স্বতঃপ্রবৃত্ততা দ্বারা সম্পৃক্ত।"[৩৮]

নকশি পাখা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক পাখার বিকল্প হিসেবে নকশি পাখার সর্বজনীন ব্যবহার দেখা যায়। বাঁশ, বেত, চুলের ফিতা, সুতা, খেজুরপাতা, তালপাতা, শন, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, শোলা কাপড়, কাশ, তাল, বিন্না, গমের ডাঁটা, মোটা কাগজ, চন্দন কাঠ প্রভৃতি উপাদানে নকশি পাখা তৈরি করা হয়। পাখা নানা আকারের হয় এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়। লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, পশু-পাখির মটিফ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে (চিত্র ১২)। সুতার তৈরি পাখার নাম শঙ্খলতা, তারাফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি; বাঁশের পাখার মধ্যে ওলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, ভালবাসা, এছাড়া হাতি, মানুষ ও ফুল রয়েছে। বেতের তৈরি পাখার মধ্যে পালঙ্কপোষ ও পাশার দান উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য, যেকোন ধরনের পাখার মূল আকর্ষণ হচ্ছে নকশা। কখনো কখনো প্রবাদবাক্য, নীতিকথা ও ছড়া নকশিতে দেখা যায়। সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘরে বাঁশের দণ্ডে লাল কাপড়ের ঝালরযুক্ত কাপড়ের যে পাখা রয়েছে তাতে জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যার উভয়পাশে লতাপাতার মাঝে দু'টি হাতি এবং উপরে গাছের ডালে অনেক টিয়া পাখি বোনা হয়েছে (চিত্র ১৩)।

নকশি সাঁচ ও পিঠা

গ্রামীণ কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নকশি সাঁচ, যা দিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। সাঁচ মাটি, পাথর, কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। পূজা-পার্বণ, পালা, বিবাহ ও

---

৩৬. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬০।
৩৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ২০।
৩৮. Veronica Murphy, *Textiles, Arts of Bengal, The Heritage of Bangladesh and Eastern India*, (London 1979), 69.

সামাজিক অনুষ্ঠানে পিঠা পরিবেশিত হয়ে থাকে। সাঁচের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের মিষ্টান্নও তৈরি করা হয় বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। মটিফের মধ্যে লতাপাতা, মাছ, ফল, পশু-পাখি প্রধান। এ ছাড়া দেব-দেবীর প্রতিকৃতিতেও সন্দেশ, আমস্বত্ব প্রভৃতি তৈরি করা হয় (চিত্র ১৪)। কখনো কখনো নকশি পিঠায় নীতিবাক্য ও সুবচন উদ্ধৃত থাকে, যেমন 'ফুলশয্যা', 'শুভবিবাহ', 'সুখে থাক' ইত্যাদি। মোহররম ও শবেবরাতের সময় মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকগণ প্রতিকৃতিসজ্জিত নকশা ব্যবহারে মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করে।

নকশি পাটি

তোফায়েল আহমদ বলেন, "সুতাবেত, মোত্রাবেত, পাটিবেত, পাটিতা বা মোস্তগ নামে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে পরিচিত গাঢ় সবুজ রঙের লাঠির মতো গাছের শক্ত অথচ মসৃণ ছাল দিয়ে শীতল পাটি বোনা হয়।" সিলেট অঞ্চলে শীতল পাটি তৈরি হয়। এই সমস্ত শীতল পাটিতে মসজিদ, মিনার, পালকি, নৌকা, হাঁড়ি, হাঁস, কবুতর, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ বোনা হয়।[৩৯] কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায়ও পাটি প্রস্তুত হয়। নানা রঙের ব্যবহারে পাটি বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করে। নকশি পাটি জায়নামাজ (চিত্র ১৫), খাবারের আসন ও বরের আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নকশি শিকা

সংস্কৃত শব্দ শিক্য থেকে শিকার উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত পাট দিয়ে শিকা তৈরি করা হয়। এছাড়া কাপড়, পুঁতি ও কড়ি দিয়েও শিকা প্রস্তুত করা হয়। এগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে গ্রামীণ মহিলাগণ নানা ধরনের শিকা তৈরি করে থাকেন। শিকার বিভিন্ন নাম রয়েছে; যেমন মাছকাটা, কউতর খোপী, জালী বেড়ী, উল্টা কেশী, গুরুর ধানধা, আউলাকেশী, জিলাপী, আমির্তি ইত্যাদি। কখন কখন অষ্টদল ও রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি সম্বলিত শিকা দেখা যায়। শিকা ঝুলানো অবস্থায় থাকে এবং লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, আয়না-চিরুনি প্রভৃতি গৃহসামগ্রী রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ-বেত-শোলার কাজ

গ্রামীণ কারুকলার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হচ্ছে বাঁশ-বেত ও শোলার তৈরি আকর্ষণীয় দ্রব্যাদি। মেলায় সহজলভ্য এই সমস্ত সামগ্রী গ্রামীণ জীবনের কেবল অপরিহার্য সম্পদই নয়, বরং ঘর-বাড়ি, বেড়া, চাল, জানালা, ভেলকী, ঝাপ, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতিও তৈরি হয় এ সমস্ত উপাদানে। আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরীতে* বলেন যে, "পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে বাঙালিরা বাঁশের সুন্দর ঘর তৈরি করতো।" বাঁশের তৈরি দরমা, ঝুড়ি, কুলা, ডালা (চিত্র ১৬), খাঁচা, চালনী, ঢোল, ডুলা, ধামা ও লাঠিও বিশেষ জনপ্রিয়।

---

৩৯. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৮১; *লোকঐতিহ্য; বাংলাদেশের লোকশিল্প*, চিত্র ১৯ ও প্রচ্ছদ।

নৌকার ছৈ, চেয়ার, ঝাঁপি, মোড়া, সাঁজি (চিত্র ১৭), কৃষকের মাথাল, গরুর গাড়ির ছৈ, খাঁচা ও খালুইও তৈরি করা হয় বাঁশ ও বেত দিয়ে। শোলার খেলনা পুতুল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শোলার পুতুল, মুকুট, মালা, চালচিত্র, কদমফুল ও টোপর ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী। হিন্দু গৃহের চৌকাঠে শোলার ফুল ধর্মীয় ভাবধারার পরিচায়ক। গ্রামীণ কারিগর শোলাকে কেটে ও বিভিন্ন রঙ দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরি করেন, যেমন দোলনা। যারা শোলার দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন তাদের বলা হয় মালাকার। পুতুলনাচের পুতুল শোলা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তোফায়েল আহমদ বলেন, "শুকনো শোলায় রঙের জলীয় অংশ তাৎক্ষণিকভাবে শুকিয়ে যাবার ফলে একটা পেলব রঙের আমেজ সৃষ্টি হয়। রঙের লালিত্য আর নমনীয়তা এ শিল্পের প্রধান আকর্ষণ।"[৪০]

মসলিন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মসলিনকে লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেন (চিত্র ১৮)। অতি উৎকৃষ্ট মানের কার্পাস দিয়ে সূক্ষ্ম ও সুপ্রসিদ্ধ মসলিন তৈরি করা হতো। আবুল ফজল সোনারগাঁয়ের মসলিনের উল্লেখ করেন। ধারণা করা হয়, মসলিনের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। মনে করা হয় যে, মিশরের মমিও তৈরি করা হতো বাংলাদেশে প্রস্তুত মসলিন দিয়ে। ঢাকাই মসলিনের কাহিনী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। বলা হতো যে, ঘাসের উপর মেলে দেয়া হলে এবং শিশিরসিক্ত হলে মসলিন নজরে পড়তো না। মুগল বাদশাহের অতি প্রিয় গৃহসামগ্রী ছিল মসলিন। মসলিনের মধ্যে জামদানি আজও প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে রেখেছে। বিভিন্ন নামে মসলিনকে অভিহিত করা হয় তাদের সূক্ষ্মতা, বৈচিত্র্য ও বুননের ভিত্তিতে, যেমন আবরোয়া, সওগাতি, শবনম, মলমল খাস, তানজেব, সরবতি। নকশার পার্থক্য অনুযায়ী মসলিনকে নানা প্রকার নাম দেয়া হয়েছে, যেমন বুটিদার, তেরসা, পান্নাহাজার ইত্যাদি।

তামা-কাঁসা-পিতল

দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী তামা, কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (চিত্র ২৯)। এসব ধাতু উত্তাপে গলিয়ে মাটি ও মোমের ছাঁচের মাধ্যমে ও পাত পিটিয়ে কারিগরেরা বিভিন্ন তৈজসপত্র ও মূর্তিপুতুল তৈরি করেন। এ পর্যায়ের গৃহসামগ্রীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পানদানী, হুক্কা, বাটি, বদনা, হাঁড়ি, কুলা (চিত্র ২০), চালনী, মাদুর, রুটি বেলার বেলন, সের (চিত্র ২০), গাড়ু, নারিকেল কুড়নী, যুদ্ধাস্ত্র, যেমন ঢাল ও রামদা। এছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক যেসমস্ত সামগ্রী তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে দেব-দেবীর মূর্তি, নাগদেবতা, প্রদীপ, রামদা ইত্যাদি। ঢাকা জেলার ধামরাই,

---

৪০. প্রাগুক্ত, ৭৯।

টাঙ্গাইলের কাগমারী, জামালপুরের ইসলামপুর ও রাজশাহীর নওয়াবগঞ্জ অঞ্চলে তামা-কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র তৈরি হয়।

মৃৎশিল্প

মোহাম্মদ শাহজালাল বলেন, "বাংলাদেশের মৃৎশিল্প একটি ব্যাপক, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প,...এই শিল্পকর্মের সাথে জড়িত হাজার হাজার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, জড়িত তাদের শিল্পকর্ম, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনসংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি।"[৪১] মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়। এতে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করা হয়, যেমন কলসী (চিত্র ২২), সরা, পেয়ালা, থালা-বাটি, ঘট, ঢাকনি। এছাড়া মাটির পুতুল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, যেমন গরু, হাতি,বানর, ভেড়া, মানুষ, গাভী ইত্যাদি। ধর্মীয় তাৎপর্যের বিচারে মাতৃকা-মূর্তি বা 'মাদার গডেস' প্রাধান্য পেয়ে থাকে। হিন্দু পাল সম্প্রদায় মৃৎশিল্পে অসামান্য অবদান রেখেছে। মাটির তৈরি দ্রব্য পোড়াবার পর এতে নানা রঙের সমাবেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ নকশা করা হয়। হাতে অথবা চাকার সাহায্যে এই সমস্ত সামগ্রী তৈরি করার রেওয়াজ রয়েছে। বহুল ব্যবহৃত তৈজসপত্রের মধ্যে দীপাধার, ফুলদানি, কুপি, পিদিম, মটকা, ছাইদান, হুক্কা ও কল্‌কি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাটির ফলক

জাতিতাত্ত্বিক বিচারে মাটির ফলক মৃৎশিল্পের এক সম্প্রসারিত ও সার্থক রূপান্তর। মাটির ফলক সাধারণভাবে 'টেরাকোটা' নামে পরিচিত। উৎকৃষ্ট গ্রামীণ শিল্পরসবোধের পরিচায়ক মাটির ফলক মুসলিম ও হিন্দু ইমারতে, বিশেষকরে মসজিদ ও মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রাচীন ঐতিহ্য দেখা যায় পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে। এসমস্ত ফলক বাংলার লোকজ শিল্পধারার পরিচায়ক। নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, "যদিও শিল্পকৌশলের দিক থেকে মূলত এগুলি ময়নামতি ও পাহাড়পুরের ফলকগুলির অনুরূপ সুপরিচিত ধারায় সৃষ্ট, কিন্তু শিল্প সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিচারে এগুলির উৎকর্ষের পরিচয় সহজেই প্রতীয়মান হয়।"[৪২] পুণ্ড্রনগরীর বসুবিহারের মাটির ফলকের প্রধান বিষয়বস্তু হলো অর্ধপুষ্প মটিফ, কিন্নর-কিন্নরী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে গ্রামীণ মানুষ, জীবজন্তু, রাজা-রানী, হস্তী, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি। ময়নামতি ও পাহাড়পুরের ফলকচিত্রগুলোর সঙ্গে মহাস্থানের ফলকের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এগুলির শৈল্পিক অভিব্যক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়বস্তু, যেমন শিব, বিষ্ণু, গণেশ, কৃষ্ণ, মঞ্জুশ্রী, তারা ও ব্রহ্মা ছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, উল্লাস-বেদনা ও জীবনধারা প্রতিফলিত হয়েছে এসমস্ত পোড়ামাটির ফলকে।

---

৪১. মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৯।

৪২. নাজিমউদ্দীন আহমদ, *মহাস্থান-ময়নামতি-পাহাড়পুর*, ৪২।

মুসলিম আমলে নির্মিত বহু মসজিদ, যেমন ষোল শতকের বাঘা মসজিদ এবং পরবর্তীকালের বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের (চিত্র ২২) ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বাঘার মসজিদ ও কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

পুতুল

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, "ইমেজ (আইকনগ্রাফী, প্রতিকৃতি, মূর্তি অঙ্কন) থেকে দৈব কিংবা দেবতা খসে গেলে পুতুল হয়।"[৪৩] গ্রামীণ শিল্পী পুতুল তৈরি করেন খেলনা হিসেবে। মহেঞ্জোদারো থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের খেলনা পুতুল তৈরি হয়ে আসছে। জীবজগতের জড় প্রতীক হিসেবে পুতুলের সঙ্গে যাদুবিদ্যা, টোটেম-বিশ্বাস জড়িত। পুতুলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[৪৪] প্রথম শ্রেণীতে ধর্মীয় প্রতীক রয়েছে, যেমন মাতৃকা দুর্গা, মনসা, শিব, নাগঘট, রাধা-কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুদের বর্ণাঢ্য রঙে রঞ্জিত পুতুল খেলনা (চিত্র ২৩), যেমন হাতি, ঘোড়া, কলসীকাঁখে বধূ, নৃত্যরত বধূ, মাছকুটনরত অবস্থায় বধূ, মা ও শিশু। মুসলিম পীর-দরবেশদের সমাধিতে পুতুল ঘোড়া (চিত্র ২৪) ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এ ছাড়াও রয়েছে দুলদুল ঘোড়া। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রামীণ শিল্পীগণ কাঠ, বাঁশ, মাটি, বেত, পিতল-কাঁসা, শোলা, কাপড়, কাগজের মণ্ড, পাথর, মহিষের শিং, চিনি, হাতির দাঁত দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পুতুল তৈরি করেন। ব্যবহার, উপকরণ, গঠনশৈলী ও আকৃতির দিক থেকে পুতুল লোকশিল্পের বিশেষ অধ্যায় দখল করে রয়েছে। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বগুড়া, শেরপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের খেলনা পুতুল বিশেষ আকর্ষণীয়। যেসব খেলনাপুতুল বিশেষ সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচায়ক সেগুলো হচ্ছে কাঠের তৈরি নৌকা, চাকাওয়ালা গাড়ি, হাতি, বাঘ, গরুর গাড়ি ও রাজা-রানীর পুতুল (চিত্র ২৫)। নানা ধরনের ফলমূল ও পশুপাখির খেলনা শিশুদের আকর্ষণ না করে পারে না যেকোন মেলায়, যেমন ময়ূর, টিয়া, ময়না, আম, কাঁঠাল, কমলা, বেদানা, রুই, কামরাঙ্গা ইত্যাদি। কাপড়ের পুতুল নারী শিল্পীদের একচেটিয়া শিল্প। এর সাথে পুতুলবিয়ে জড়িত। বস্তুত খেলনাপুতুল একটি ব্যক্তিসত্তার প্রকাশই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির মানসপট।

দারুশিল্প

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কাঠের প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা না পেলেও দারুশিল্প ছিল খুবই সমৃদ্ধ। গীতিকাব্যে এই গ্রামীণ শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়—

> কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, তাল।
>
> গাম্ভারী, তামালবহু নখে চিরে দিল বহু, ব্রহ্মা গাড়য়ে গজাল।

---

৪৩. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮২), ২৫।

৪৪. Ajit Kumar Mokerjee. *Folk Toys of India*. (New Delhi 1976); তোফায়েল আহমদ, *লোক শিল্প*, ৬৭।

দারুশিল্পের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে নকশাকৃত নৌকা—ময়ূরপঙ্খী, বজরা, ছিপ, বাইচ, ঘাড়া (চিত্র ২৬), গয়না প্রভৃতিতে। কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের মধ্যে লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সম্বলিত দ্রব্যাদি শৈল্পিক চাতুর্যের পরিচায়ক, যেমন পাটা, পিঁড়ি, সিন্দুক, জলচৌকি, ডুলী, দোলা, পালকি, বাটি, ঘটি, ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির, খাট-পালঙ্ক, দরজার কপাট, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, বারকোশ, রথ।[৪৫] হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী-উপাখ্যান সম্বলিত কাঠে উৎকীর্ণ দারুসামগ্রী শিল্পীর দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে (চিত্র ২৭)। সূত্রধরেরা অসামান্য নৈপুণ্যে কাঠ খোদাই করে দেব-দেবীর তান্ত্রিক ও লৌকিক উপাদান সৃষ্টি করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃষ কাঠ মৃত ব্যক্তির স্মরণে সৃষ্টি করা হয়। তোফায়েল আহমদ কাঁচিকাটা গ্রামের একটি সিংহাসন প্রসঙ্গে বলেন, "সিংহাসনের তিন পাশে কৃষ্ণলীলা, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, ননীচোর, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রাচীন বাংলার চিত্ররীতিতে উৎকীর্ণ। তান্ত্রিক মতে বিবসনা দুটি নারী-পুরুষের গোপন অঙ্গ তাতে প্রদর্শিত।"[৪৬]

অলঙ্কার

ঐতিহ্যবাহী ও চিত্তহরণকারী লোক-অলঙ্কারের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সোনা-রূপা-ব্রোঞ্জের অলঙ্কারের ব্যবহার পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার পাদপীঠ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দেখা যায়। ধাতুর অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় *ঋগ্‌বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ* ও *মহাভারতে*। মহাস্থানে খননের ফলে ধাতুর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন তামার বালা, আংটি, পদক, অষ্টধাতুর বালা, স্বর্ণালঙ্কার। এ ছাড়া ময়নামতিতেও সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের তৈরি অলঙ্কার পাওয়া গেছে। লোকজ অলঙ্কারের গড়ন ও উপকরণ বৈচিত্র্যময়। কাঁচ, পুঁতি, লাক্ষা, তামা, ফলের বীজ, শামুক, পিতল, সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও শঙ্খ দিয়ে গ্রামীণ অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বাংলার মেয়েদের অলঙ্কারের প্রতি রয়েছে অসাধারণ মোহ। এই সমস্ত অলঙ্কার শুধু সৌন্দর্যবোধই প্রকাশ করে না, এগুলো লোকাচার ও ধর্মবিশ্বাসেও প্রভাব রেখেছে।

নারীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য অঙ্গসজ্জা অপরিহার্য। আটটি অঙ্গ, যেমন মাথা, নাক, কান, গলা, বাহু, হাত, কোমর ও পায়ের শোভা বর্ধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের প্রচলন রয়েছে। মাথা ও কপালের জন্য সিঁথিপাটি, টিকলি, টায়রা, শিরবন্দী, চৌবন্দী, সিঁথি, অলকা; নাকের জন্য নথ, নোলক, বোলাক, নাকচাবি, নাকমাছি, বিজলী ফুল, নাকফুল; কানের জন্য কানফুল, মাকড়ি, কানপাশা, ঝুমকা, টপ, মকর, কানবালা, কুণ্ডলী; গলার জন্য হাঁসুলী, মাদুলি, হার, তাবিজ, পাঁচনরী, সাতনরী (চিত্র ২৮), চাম্বেল (চিত্র ২৯),

---

৪৫. *লোকঐতিহ্য*, ৪১।

৪৬. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৭৬।

টিকার ছড়া; বাহুর জন্য কলসী, অনন্ত, কাঁটাবাজু, তাগড়া বাজু, টেইটি; হাতের জন্য বায়লা (বালা), বেতল, রংফুল, কঙ্কন, বাউ বালা, রুলি, চুড়ি; কোমরের জন্য বিছা, তারাহার, চন্দ্রহার (চিত্র ২৯), কোমরদানী, মেখলা, কাঞ্চী; পায়ের জন্য খাড়ু (চিত্র ৩০), বাঁক, মল, মল্লতোড়, নূপুর, পাতামল। যাদুবিদ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাপের আকৃতিতে বাজুবন্ধ। কারুকার্যের চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে সাতনরীর হার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অলঙ্কার, যাতে রূপা ও মতির ব্যবহার হয়েছে। ফিলিগ্রী বা জালীর কাজও অলঙ্কারে দেখা যাবে।

বাদ্যযন্ত্র

লোকসঙ্গীত চিরায়ত শিল্প, যা বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। লোকসঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের আর্তি। লোকসঙ্গীত গান ও তানের সংমিশ্রণ, যার আবেদন চিরন্তন। লোকবাদ্যযন্ত্র চার প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন তারযন্ত্র—একতারা (চিত্র ৩১), দোতারা, সারঙ্গ; ফুৎকার যন্ত্র—বাঁশি, শঙ্খ, সানাই; ঘনযন্ত্র—করতাল, মন্দিরা; আনন্দযন্ত্র—ঢোল, ঢাক, ডুগডুগি, খোল, মাদল। বাদ্যযন্ত্র সাধারণত মাটি, কাঠ, চামড়া, বাঁশ ও কাঁসা দিয়ে তৈরি হয়। দুভাবে সঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়—আঙ্গুলের সাহায্যে এবং ধনুর সাহায্যে। রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চর্যাপদ থেকে যেমন বাংলাদেশের রাগসঙ্গীতের ধারা বহমান, তেমনি লোকসঙ্গীত সেই প্রাচীনকাল থেকে পাশাপাশি অবস্থান করছে। গ্রামীণ বাংলার জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কবিগান, বাউল, মুর্শিদী, কীর্তন, পালাগান, গম্ভীরা এই সমস্ত যন্ত্র দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত যন্ত্রগুলো হচ্ছে একতারা, দোতারা, সারিন্দা (চিত্র ৩২), বাঁশি, সানাই, শাঁখ, মন্দিরা, করতাল, সারঙ্গ, জয়ঢাক, ডুগডুগি, চটি, খমক ও খঞ্জনী। একটি শুকনো লাউ-এর তলায় একটি কাঠের বয়লা ও তার দিয়ে একতারা তৈরি করা হয়। দোতারা ও সারিন্দার শেষ প্রান্তে ময়ূর ও অন্যান্য জীবজন্তুর নকশা দেখা যায়। বাঁশ, মাটি, কাঠ, টিন ও পিতলের সাহায্যে বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশির উন্নতমানের প্রকরণ হচ্ছে সানাই। এছাড়া শঙ্খের সাহায্যে শাঁক দেয়ার রেওয়াজ হিন্দু সমাজে সমধিক প্রচলিত। কাঁসার মন্দিরা ও করতাল দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাদল, ঢোলক, জয়ঢাক, খোল (চিত্র ৩৩), খমক, ডুগডুগি ও খঞ্জনী গ্রামীণ ও উপজাতীয় জীবনের বিনোদনের অপরিহার্য সামগ্রী। পল্লীকবি ও বাউল সম্প্রদায়, রাখাল, মৈশাল ভাই আলকাপ ও গম্ভীরা, ব্রতচারী, ওরশ ও মোহররম, মেলা, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৮

আইন ও সমাজ

কাজী এবাদুল হক*

প্রতিটি স্বাধীন সমাজ নিজস্ব আইনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়, তা প্রথাগত হউক, ঐশ্বরিক হউক অথবা ইহজাগতিক হউক। কোন একটি সমাজকে বুঝবার জন্যে এবং ঐ সমাজ পরিচালনাকারী আইনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্যে "সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর পরিধির মাঝে আইনের যথার্থ স্থান নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে সমাজের এবং সংস্কৃতির সামগ্রিক অবস্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করতে হবে। আইন কি এবং আইন কিভাবে কার্যকরী হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করার পূর্বে সমাজ কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদিগকে অবশ্যই পূর্ণ ধারণা লাভ করতে হবে।"[১] একারণে মুগল আমলের আইনব্যবস্থা এবং সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদের জন্যে খুবই যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজ

প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে 'সুবাহ বাংলা' নামে পরিচিত বাংলা প্রদেশ প্রধানত কৃষি-প্রধান একটি দেশ ছিল। গ্রামবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী রায়ত ছিল। এ কৃষিজীবী রায়তগণ খুদকাস্ত বা আবাসিক এবং পাইকাস্ত বা অনাবাসিক প্রধানত এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। খুদকাস্ত রায়তেরা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের জমি চাষ করার অধিকারী ছিল, ভূমিতে তাদের দখলস্বত্ব ছিল এবং তাদেরকে কর দিতে হতো। আর পাইকাস্ত রায়তরা বার্ষিক বা অস্থায়ী চাষী ছিল। ভূমিতে তাদের কোন দখলস্বত্ব ছিল না। তারা ছিল কেবল

---

* বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

১. ই, এডামসন হোয়েবল, *ল অব প্রিমিটিভ ম্যান* (কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৫৪), ৫।

অধিকারহীন রায়ত।[২] গ্রামবাসীদের কিয়দংশ ছিল নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী হস্তশিল্পী এবং সামান্য কিছু অংশ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত সওদাগর। পরিবার ছিল সমাজের এক একটি ইউনিট বা একক এবং অধিকাংশ পরিবারই ছিল যৌথ পরিবার। কৃষিজীবী, হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী অধ্যুষিত গ্রাম ছিল মোটামুটি স্বনির্ভর এবং স্বায়ত্তশাসিত। গ্রামের অধিবাসীগণ পরস্পর ধর্ম, বর্ণ ও আত্মীয়তার স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা ধর্ম, বর্ণ ও আত্মীয়তার কাঠামোতে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে গঠিত একটি স্থায়ী পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসিত হতো। এই পঞ্চায়েত গ্রামের অধিবাসীদের মনোনীত বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা গঠিত হতো। মুকাদ্দাম, মণ্ডল অথবা গ্রামপ্রধান নামে অভিহিত ব্যক্তি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বা নেতা ছিলেন। গ্রামপঞ্চায়েত ছিল সরকারের অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই পঞ্চায়েতের এখতিয়ারাধীন গ্রামের অধিবাসীদের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পঞ্চায়েত পাটোয়ারি ও চৌকিদার প্রভৃতি কর্মকর্তাদের সাহায্যে গ্রামের বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা করতো। পঞ্চায়েতের প্রধান সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা যে জমি চাষ করতো তার খাজনা নির্ধারণ করতেন এবং তাদের নিকট থেকে বার্ষিক খাজনা আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে অথবা তার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতেন। পঞ্চায়েতনির্ভর গ্রামসমাজ অর্থনৈতিক একক হিসেবে ক্রমশ গুরুত্ব হারালেও তার সামাজিক গুরুত্ব যথার্থভাবে ধরে রাখতে পেরেছিল।[৩] শাসকশ্রেণী ও তাদের সেবা দানকারী কর্মচারীগণ এবং অন্য কারণে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শহরে বসবাস করতো। নগদ টাকায় লেনদেনের অর্থনীতির বিষয়টি গ্রামের নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত না থাকলেও তাদের নিকট পণ্য বিনিময় পদ্ধতিই আদান-প্রদানের প্রধান রীতি ছিল। সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই অর্থনীতি সক্রিয় রাখা হতো।[৪] ব্যক্তিগত আইন দ্বারা প্রধানত সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন শাসিত হতো। মুসলমানগণ ইসলামী আইনের দ্বারা শাসিত হতো এবং হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ আইনের দ্বারা শাসিত হতো। ফৌজদারি বিচার প্রধানত ইসলামী আইনের মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হতো। অমুলমানদের মাঝে দেওয়ানি বিরোধসমূহ তাদের স্ব স্ব আইনের দ্বারা পরিচালিত ও নিষ্পত্তি করা হতো। সম্রাটের আদেশ বা বাদশাহী ফরমানই ছিল দেশের অধিকাংশ ইহজাগতিক আইন। এ আইন সকলের উপর প্রযোজ্য ছিল এবং প্রধানত তা রাজস্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং তা কোন কোন সময় প্রথাগত ও ধর্মীয় আইনের কঠোরতা হ্রাস করতো।[৫] বাদশাহ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হতো না। তিনি ওমরাহ্গণ বা মন্ত্রীপরিষদ এবং সুবাদারদের সহায়তায় দেশ শাসন

---

২. এ, সি, ব্যানার্জি, *এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল* (কলিকাতা, ১৯৮০), ১৭৩

৩. আর্থার ফিলিপস, *দি 'ল রিলেটিং টু দা ল্যাণ্ড টেনিউরস অব লোয়ার ব্যাঙ্গল* (কলিকাতা, ১৮৭৬), ৬২

৪. সিরাজুল ইসলাম, *ব্যাঙ্গল ল্যান্ড টেনিউর* (কলিকাতা, ১৯৮৮), ১।

৫. ওয়াহিদ হোসেন, এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া (কলিকাতা, ১৯৩৪), ১৪-১৬।

করতেন। এসকল ওমরাহ্ এবং সুবাদার সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায়বিচার করার জন্যে সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে মানুষের জীবন ও সম্পদ সর্বতোভাবে নিরাপদ রাখার জন্যে তাদের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় ছিল। জনসাধারণের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্যজীবনে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনে কেউ বাধা সৃষ্টি করতো না। দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং রাজস্ব আদায় করাই ছিল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব।৬

মুগল আমলে আইন ও বিচারব্যবস্থা

সুবাদার (নাজিম) বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা শুধু প্রদেশের প্রধান সেনাপতিই ছিলেন না, বরং তিনি প্রদেশের সাধারণ প্রশাসনও পরিচালনা করতেন। উপরন্তু অপরাধের বিচার করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক দেওয়ান ছিলেন সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত অন্য একজন কর্মকর্তা। প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসন এবং দেওয়ানি বিষয়ক বিচারের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতির আদি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা ও আপীল বিচারের এখতিয়ার ও ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার মত একই প্রকার এখতিয়ার প্রয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তিতে নাজিম বা প্রাদেশিক প্রশাসককে পরামর্শ দেয়ার জন্যে প্রধান মুফতি অর্থাৎ ইসলামী আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকারী এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে নাজিমের আদালতে নিয়মিত আসন গ্রহণ করতেন। প্রদেশটি যেসকল সরকার বা জেলায় বিভক্ত ছিল সেগুলোর প্রতিটিতে কাজী-ই-সরকার বা জেলাবিচারক জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন এবং সকল প্রকার দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর আদিম ও আপীল এখতিয়ার ছিল। তাঁর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতির নিকট আপীল পেশ করা যেতো। জেলার আমলগুজার রাজস্ব বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক দেওয়ানের নিকট আপীল দায়ের করা যেতো। জেলার ফৌজদার জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তাঁর এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মামলাও নিষ্পত্তি করতেন। প্রতিটি জেলা যেসকল পরগনায় বিভক্ত ছিল সেগুলোর প্রত্যেকটিতে কাজী-ই-পরগনা বা পরগনার বিচারক পরগনার সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার কাজীর নিকট আপীল দায়ের করা যেতো। আমিন পরগনার রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার আমলগুজারের নিকট আপীল করা যেতো। মুফতি, মুহতাসিব, দারোগা-ই-আদালত-ই-সুবাহ, মির আদিল, পণ্ডিত, সাওয়ানেহ নবিস ও ওয়াকায়ে নিগার প্রধান বিচারপতিকে বিচারকার্যে সাহায্য করতেন। দারোগা-ই-আদালত, মির আদিল, মুফতি, পণ্ডিত, শাস্ত্রি, মুহতাসিব ও ওয়াকিল-ই-সরা জেলা বিচারককে মামলার বিচারে সাহায্য করতেন। কোতোয়াল শহরের আইন-শঙ্খলা রক্ষা করতেন। গ্রামপঞ্চায়েত

৬. বি, এন, পান্ডে, *দি ইন্ট্রোডাকশন অব ইংলিশ 'ল' ইন ইন্ডিয়া* (লন্ডন, ১৯৬৭), ৩।

গ্রামবাসীদের ছোটখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সালিসের মাধ্যমে অথবা বিচারের দ্বারা নিষ্পত্তি করতো। গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মোকদ্দমা গ্রামপঞ্চায়েত নিষ্পত্তি করতে পারতো না। তারা অপরাধীকে তিরস্কার করতে পারতো, জরিমানা করতে পারতো এবং সমাজচ্যুত করতে পারতো। পঞ্চায়েত গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্যে চৌকিদার রাখতো। চৌকিদার বা গ্রামপাহারাদার অপরাধীকে পাকড়াও করে যথাযথ সরকারি কর্মকর্তার নিকট সোপর্দ করতো। গ্রামপ্রধানকে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাজস্বের একটি অংশ তাঁর পারিশ্রমিক হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ গ্রামের যেকোন ব্যক্তি স্থানীয় আদালতে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারতো। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রথাগত আইন প্রয়োগ করে যে বিচার করতো সে বিচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যেতো না।[৭] তৎকালে মামলা-মোকাদ্দমা খুব কম ছিল। পঞ্চায়েত অধিকাংশ ছোটখাট বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করতো। তাই কাজীর নিকট অধিক মামলা আসতো না এবং গুরুতর রকমের মামলার সংখ্যা খুবই কম ছিল।[৮] মামলার এক পক্ষ মুসলমান এবং অপর পক্ষ অমুসলমান হলে কাজী মামলায় ইসলামী আইন প্রয়োগ করতেন।[৯] ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনার সময় কোন আইনগত প্রশ্ন দেখা দিলে মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যে কাজী ইসলাম ধর্মীয় আইনবিশেষজ্ঞ মুফতির মতামত গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি মুফতির মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না।[১০] কাজী রায় দেয়ার পর মির আদিল তা কার্যকর করতেন।[১১] ইসলামী আইন তখন ছিল প্রধান আইন। সময় সময় সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত ইহজাগতিক আইন, প্রথাগত আইন, হিন্দু আইনসহ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন ছিল ইসলামী আইনের সম্পূরক অতিরিক্ত আইন। ফৌজদারি মামলার বিচারে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হতো। রাজস্ব প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত করে যে দেওয়ানি বিচারের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আইন, প্রথাগত আইন এবং সময় সময় সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত আইন প্রয়োগে নিষ্পত্তি করা হতো।

জমিদার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা।

যখন মুগল প্রশাসনিক অবকাঠামো খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং বাংলার নবাবের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন কাজীর পদমর্যাদারও অবমূল্যায়ন ঘটতে থাকে। ঐ সকল পদ দীর্ঘকাল শূন্য পড়ে থাকায় অথবা অযোগ্য ব্যক্তিগণ এই সকল পদে আসীন থাকায় এবং দেশে ব্যাপক গোলযোগের কারণে দেশের অভ্যন্তরে কাজীর পদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক

---

৭. ভি. ডি. কুলশ্রেষ্ঠ, *ল্যান্ডমার্ক ইন ইণ্ডিয়ান লিগ্যাল এন্ড কনস্টিটিউশনাল হিস্টোরী,* লক্ষ্ণৌ, ১৯৬৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮১), ২৯-৩০; ওয়াহেদ হোসেন, প্রাগুক্ত, ৮০-৮৪।

৮. পি. সরন, *প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগল্স* (এলাহাবাদ, ১৯১৪), ৩৩৯।

৯. এস. এ. কিউ. হুসাইনি, *দি এডমিনিস্ট্রেশন আন্ডার দি মুগলস* (ঢাকা, ১৯৫২), ১৯৪।

১০. হুসাইনি, পূর্বোক্ত, ২০৩।

১১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী,* জেরেট কর্তৃক অনূদিত দ্বিতীয় খণ্ড (কালিকাতা, ১৯৪৯), ৪৩।

অচলাবস্থা এবং অনুপস্থিতির জন্যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন বড় বড় জমিদারগণ, যারা সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধি ছিলেন, তারাই কাজীর পদের শূন্যতা পূরণে আবির্ভূত হলো এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতে লাগলো। এভাবে অন্যায়ভাবে অধিকৃত বিচারক্ষমতা তারা একান্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রয়োগ করতো। জমিদারি আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে নাজিমের আদালতে আপীল দায়ের করা যেতো। বাংলায় কোম্পানির শাসন কার্যত আবির্ভূত হওয়ার সময় নাজিমের ক্ষমতা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর অস্তিত্ব এর সীমানার বাইরে খুব একটা অনুভূত হতো না। নাজিমের আদালত ছিল প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এ আদালত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনতো ও পর্যালোচনা করতো এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তের জন্যে প্রেরিত মামলার বিচার করতো। দারোগা-ই-আদালত-আল-আলিয়া নাজিমের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। প্রদেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে দেওয়ানের আদালত ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার বিচার করতো। দেওয়ানের প্রতিনিধি হিসেবে দারোগা-ই-আদালত-ই-দেওয়ানি দেওয়ান কর্তৃক তার উপর ন্যস্ত বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কানুনগোর আদালতে প্রেরণ করা হলে তিনি ভূমি সংক্রান্ত বিরোধে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। কাজী উত্তরাধিকার, স্থলবর্তিতা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি করতেন। মুফতি তাঁর মতামত দিয়ে কাজীকে সাহায্য করতেন। ফৌজদার মৃত্যুদণ্ডে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছাড়া অন্যান্য ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। কোতোয়াল শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং অপরাধীদের খুঁজে বের করে ফৌজদারিতে সোপর্দ করতেন। মুহতাসিব মদাসক্ত অপরাধী, মদবিক্রেতা এবং ক্রটিপূর্ণ ওজন ও মাপ সংক্রান্ত অপরাধীদের মামলার বিচার করতেন। এভাবে কাজী, জমিদার, ফৌজদার, কানুনগো এবং কোতোয়ালগণ প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[১২]

কলিকাতায় প্রচলিত আইন ও বিচারব্যবস্থা

১৬৯০ সনে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-উপনিবেশ হিসেবে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৮ সনে কোম্পানি ঐ এলাকার জমিদারিস্বত্ব অর্জন করে। ১৬৬১ সনে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে সনদ প্রদান করেন সে সনদের ক্ষমতাবলে ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী কোম্পানির গভর্নর ও তাঁর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে কোম্পানির কর্মচারী, কর্মকর্তা ও ইউরোপীয়দের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ১৭২৬ সনে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জর্জ কোম্পানিকে যে সনদ প্রদান করেন, সে সনদবলে কলিকাতা

---

১২. জৈন, *আউটলাইন্‌স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরী* (বোম্বে ১৯৭২, পূনর্মূদ্রণ ১৯৭৬), ৩৯-৪০; কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ৮৭।

প্রেসিডেন্সি শহরে একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র অথবা একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অল্ডারম্যানের পৌরোহিত্যে আরও দু'জন অল্ডারম্যান নিয়ে কলিকাতায় মেয়র-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী শহর এবং তার অধীনস্থ বাণিজ্যকুঠিগুলির এলাকার সব ধরনের দেওয়ানি মামলার বিচার করার সর্বময় ক্ষমতা এই আদালতের ছিল। যেসকল ব্যক্তি উইল বা ইচ্ছাপত্র রেখে মারা গিয়েছিল, এ আদালতের তার সত্যতা প্রমাণকরণের এবং তার প্রবেট বা সত্যায়িত অনুলিপি প্রদানের ক্ষমতা ছিল এবং যে ব্যক্তি উইল বা ইচ্ছাপত্র না রেখে মৃত্যুবরণ করেছিল, তার নিকট-আত্মীয়কে উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্যে এ আদালত ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে পারতো। মেয়র-আদালত ইংরেজদের আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতো। মেয়র-আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপীল গভর্নর এবং তাঁর কাউন্সিলে দায়ের করা যেতো। ১০০০ পেগোডা বা ৩০০০ সিক্কা টাকার অধিক মূল্যমানের মামলার আপীল পর্যায়ে গভর্নর ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিং ইন-কাউন্সিলে (প্রিভি কাউন্সিলে) আর একবার আপীল দায়ের করা যেতো। মেয়রের আদালত ছিল কোর্ট অব রেকর্ড অর্থাৎ এ আদালতের নথিপত্র সংরক্ষিত হতো এবং আদালত অবমাননার জন্যে এ আদালত শাস্তিও দিতে পারতো। গভর্নর এবং তাঁর কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত শহরের শেরিফ এ আদালতের পরওয়ানা ইত্যাদি জারি করতেন। ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন গভর্নর এবং পাঁচজন জ্যেষ্ঠ কাউন্সিলসদস্য। প্রত্যেক কাউন্সিলসদস্য ইংল্যান্ডের জাস্টিস অব দি পীসের মত সর্ব প্রকার ক্ষমতা পরিচালনাকারী জাস্টিস অব দি পীস ছিলেন। জাস্টিস অব দি পীস হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকে অপরাধীদের আটক করতে পারতেন এবং ছোটখাট অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দোষী প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তি দিতে পারতেন এবং অপর সব অপরাধীকে বিচারের জন্যে কোয়ার্টার সেশন আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন। তিনজন জাস্টিস অব দি পীস সম্মিলিতভাবে 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসেবে ইংল্যান্ডের কোর্ট অব অয়ার এন্ড টারমিনার এন্ড জেল ডেলিভারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো এবং কলিকাতা এবং এর অধীনস্থ বাণিজ্যকুঠিতে সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক গুরুতর অপরাধ ছাড়া যেকোন অপরাধের বিচার করে শাস্তি বিধান করার জন্যে বছরে চারবার কোয়ার্টার সেশন আদালত হিসেবে অধিবেশনে বসতে পারতো। কোয়ার্টার সেশন আদালতে গ্র্যান্ড জুরি (অধিকসংখ্যক জুরি) ও পেটি জুরির (স্বল্প সংখ্যক জুরি) মতামত নিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হতো। ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করা হতো ইংরেজদের দণ্ডআইন ও বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করে। ১৭২৬ সনের সনদে গভর্নর ও কাউন্সিলকে কর্পোরেশন এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের যথাযথ পরিচালনা এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের উদ্দেশ্যে উপ-আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। এসব আইন যুক্তিসঙ্গত হতে হতো এবং ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন ও বিধিবদ্ধ আইনের পরিপন্থী হতে পারতো না। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ ১৭২৬ সনের সনদ

সংশোধন করে ১৭৫৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ প্রদান করেন। এ সনদে মেয়রের আদালতের এখতিয়ার খর্ব করা হয় এবং মামলার উভয়পক্ষ এদেশীয় হলে যদি তারা মেয়রের আদালতের এখতিয়ার মেনে না নেয়, তবে এরূপ মামলা গ্রহণ করা থেকে কিংবা মামলায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে ঐ আদলতকে বিরত রাখা হয়। এ সনদবলে কোর্ট অব রিকোয়েস্ট নামক ছোট আদালত গঠন করা হয়। এ আদালত পাঁচ পেগোডা অথবা পনেরো সিক্কা টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার সংক্ষিপ্ত বিচার করে ডিক্রী দিতে পারতো। কলিকাতার জমিদার হিসেবে গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্য বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি কলিকাতার এ দেশীয় অধিবাসীদের দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেওয়ানি বিষয়ে গভর্নর ও কাউন্সিলের নিকট আপীল দায়ের করা যেতো এবং উক্ত আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে গভর্নর ও কাউন্সিল কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হতো। ১৬০০ সনে রানী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে প্রাপ্ত সনদবলে গঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ ও বিষয়াবলী আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ১৭৭৩ সনে বৃটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করে। এ অ্যাক্টটি কোম্পানির উপর বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণকে আরও দৃঢ় ও সংহত করেছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সির সাধারণ প্রশাসন ও সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তাঁর চার সদস্যের কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করা হয়। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলকে বিধি. প্রবিধান ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিধি, প্রবিধান ও অধ্যাদেশ কোন অবস্থাতেই ইংল্যান্ডের আইনের পরিপন্থী এবং অযৌক্তিক হতে পারতোনা। এসব বিধি, প্রবিধান ও অধ্যাদেশ নবগঠিত সুপ্রীম কোর্টে নিবন্ধন এবং প্রকাশ করতে হতো। রাজা তৃতীয় জর্জ ১৭৭০ সনের সনদ দ্বারা কলিকাতায় একটি সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারদের মধ্য থেকে রাজা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁরা ইংল্যান্ডের নৃপতির ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ পদে বহাল থাকতে পারতেন। তাঁদের জাস্টিস অব দি পীসও করা হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডের কোর্ট অব কিংস বেঞ্চের বিচারপতিদের মতই তাদের এখতিয়ার ও বিচারক্ষমতা ছিল। এ আদালত দেওয়ানি, ফৌজদারি ও ধর্মীয় বিষয়ে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করতো এবং এ আদালত ছিল একটি কোর্ট অব রেকর্ড অর্থাৎ এ আদালতের নথিপত্র সংরক্ষিত হতো। ফৌজদারি আদালত হিসেবে সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যান্ডের কোর্ট অব অয়ার এন্ড টারমিনার এবং জেল ডেলিভারীর ক্ষমতা পরিচালনা করতো এবং তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংল্যান্ডের রাজার যেকোন প্রজা, কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রাজার প্রজাদের কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করার জন্যে গ্র্যান্ড জুরি অর্থাৎ অধিক সংখ্যক জুরিদের ডাকতে পারতো এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে পেটি জুরি অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক জুরিদের মতামত গ্রহণ করার জন্যে

ডাকতে পারতো। দেওয়ানি বিষয়ে কোম্পানি, কলিকাতা কর্পোরেশন, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী অথবা এ সকল স্থানে ঋণগ্রস্ত বা সম্পত্তির অধিকারী বৃটিশ প্রজাগণ, কোম্পানি ও কলিকাতা কর্পোরেশনর কর্মকর্তা-কর্মচারী বা উক্ত স্থানে বসবাসকারী বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে যারা বৃটিশ নাগরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পাঁচশত সিক্কা টাকার অধিক মূল্যমানের দাবির বিষয়ে উক্ত আদালতের এখতিয়ার মেনে নিয়েছিল তাদের উপর এ আদালতের এখতিয়ার ছিল। এ আদালত কোর্ট অব ইকুইটি ও কোর্ট অব এডমিরালটির ক্ষমতাও প্রয়োগ করতো এবং 'প্রিরোগেটিভ রিট' আদেশ জারি করতে পারতো এবং কলিকাতাস্থ সকল অধস্তন আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা যেতো। এ আদালতের এডভোকেট ও এটর্নিদেরকে আইন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা ছিল। এ আদালত ইংরেজদের সাধারণ আইনের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতো। মেয়রের কোর্ট বিলুপ্ত করা হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারাধীন বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষমতাও রদ করা হয়। কলিকাতায় কোর্ট অব রিকোয়েস্টের কার্যক্রম পূর্বের মত বহাল থাকে। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সীমিত করে দেয়। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলকে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার থেকে মুক্ত রাখা হয় এবং ঐ আদালতকে রাজস্ব বিষয়ে এখতিয়ার প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার কলিকাতার অধিবাসীদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুপ্রীমকোর্ট মুসলমানদের মাঝে দেওয়ানি মামলার বিচার করার সময় ইসলামী আইন, হিন্দুদের মাঝে মামলায় হিন্দু আইন এবং মামলার একপক্ষ হিন্দু বা মুসলমান হলে বিবাদীর ব্যক্তিআইন প্রয়োগ করে বিচার করতো। এতে দেখা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট প্রধানত ইংরেজদের আইন প্রয়োগ করতো এবং কলিকাতার স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে দেওয়ানি মামলা তথা ব্যক্তিগত বিষয়ক মামলার বিচার করার সময় সুপ্রীম কোর্ট ইসলামী আইন অথবা হিন্দু আইন প্রয়োগ করতো।[১৩]

১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত বিচারব্যবস্থা

১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নাজিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে পতিত হন। ১৭৬৫ সনে সম্রাট শাহ আলম কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে সনদ প্রদান করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলার শাসকে পরিণত হয়। কিন্তু তারা তখন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা পছন্দ করে নি। কারণ বাংলায় তাদের জনশক্তি স্থানীয় অবস্থা, ভাষা এবং প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। এমতাবস্থায় বিচারব্যবস্থাসহ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব নাজিম এবং তাঁর কর্মকর্তাদের হাতেই রেখে দেয়া

---

১৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ৩৮, ৪১, ৪৩-৪৮, ৫৫, ৫৬, ৮৮-৯০, ১২২, ১২৩।

হয়েছিল।[১৪] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু এদেশী কর্মকর্তাদের কাজের তদারক করতো, কিন্তু তারা দেশের সার্বিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতো না।[১৫] এ ব্যবস্থাপনা সাধারণভাবে দ্বৈত শাসন নামে অভিহিত হয়, যা ১৭৭২ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যখন কোম্পানি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ সময় পর্যন্ত কোম্পানি কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোন অঞ্চলের আইনব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করে নি কিংবা সংশোধনও করে নি। পরবর্তী আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকেই কোম্পানি ক্রমে আইনব্যবস্থা সংশোধন করতে আরম্ভ করে এবং ১৮৬২ সন পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যখন ইংরেজদের সংশোধিত সাধারণ আইনব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারব্যবস্থা

১৭৭২ সনে কলিকাতায় কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস নাজিম-এর নিকট থেকে দেওয়ানি প্রশাসন এবং দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে তা কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায় করার জন্যে কোম্পানির একজন চুক্তিবদ্ধ পদস্থ কর্মকর্তাকে কালেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। নায়েব দেওয়ানের মত স্থানীয় কর্মকর্তাগণ, কালেক্টরের কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা, একজন মৌলবি ও একজন পণ্ডিতের সাহায্যে দেওয়ানি মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করার জন্যে তিনি কালেক্টরকে নবগঠিত জেলা দেওয়ানি আদালতের প্রধান নিযুক্ত করেন। বিবাহ, উত্তরাধিকার, বর্ণ, প্রথা, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেওয়ানি আদালত মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান বিজ্ঞ মৌলবির নিকট থেকে ইসলামী আইনের বিধান অনুযায়ী লিখিত মতামত নিয়ে এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট থেকে হিন্দু আইনের বিধান অনুযায়ী লিখিত মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতো। পরগনায় দশ সিক্কা টাকা পরিমাণ দাবির মত ছোটখাট দাবির বিষয়ে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য জমিদারগণকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। প্রতি জেলায় কাজী, মুফতি এবং দু'জন মৌলবিকে নিয়ে একটি ফৌজদারি আদালত গঠন করা হয়েছিল। এ আদালত ইসলামী আইনের মুলনীতি অনুসরণ করে হত্যা মামলাসহ সকল প্রকার ফৌজদারি মামলার বিচার করতো। জেলা ফৌজদারি আদালতের মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও দৈহিক শাস্তি প্রদান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। একশত টাকার অধিক জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সদর নিজামত আদালতের অনুমোদন নিতে হতো। মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সদর নিজামত আদালতকে নাজিমের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হতো। গভর্নর এবং তাঁর দু'জন কাউন্সিলারকে নিয়ে সদর দেওয়ানি আদালত গঠিত

---

১৪. কে. এম. মহসীন, *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্র্যান্সিশন*, মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-৯৩ (ঢাকা, ১৯৭৩), ১৫৫-৫৬।
১৫. বি. এন. পান্ডে, প্রাগুক্ত, ১২-১৩।

হয়। এ আদালত জেলা দেওয়ানি আদলতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের বিচার করতো। নায়েব নাজিম, কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি, প্রধান মুফতি এবং তিনজন মৌলবিকে নিয়ে সদর নিজামত আদালত গঠিত হয়েছিল। এ আদালত জেলা ফৌজদারি আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আনীত আপীল ও পর্যালোচনা মামলার বিচার করতো এবং এ আদালত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য আসামীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্যে ঐ প্রকার মামলা নাজিমের নিকট পাঠাতো। ওয়ারেন হেস্টিংস মামলাকারীদের নিকট থেকে ডিক্রীর চার ভাগের একভাগ আদায় করার পরিবর্তে মামলা দায়ের করার সময় মামলাকারীদের নিকট থেকে পরিমিত পরিমাণে ফিস আদায়ের বিধান করেন। তিনি বারো বছর পূর্বের দাবি আদায়ের জন্যে কোন মামলা গ্রহণ না করার বিধানও করেন। তিনি ১৭৭৩ সনের রেগুলেটিং অ্যাক্টের অধীনে ১৭৭৪ সনে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপে কর্তৃক প্রণীত সিভিল কোড বা দেওয়ানি আইনসংকলন গ্রহণ করেন। উক্ত অ্যাক্টের অধীনে হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর সাথে চারজন কাউন্সিলর বা পারিষদ নিযুক্ত করা হয়। গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল অর্থাৎ সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে দেশ শাসনের বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১৬]

১৭৮১ সনে তিনি ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত করেন এবং জেলা জজদের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বিচারের উদ্দেশ্যে জেলা ফৌজদারি আদালতে প্রেরণের জন্যে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৭৮৫ সনে ছোট ছোট অপরাধের বিচার করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেট্‌ল্‌মেন্ট দ্বারা সদর দেওয়ানি আদলতকে আপীল আদালত হিসেবে এবং কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এসব আদালতের ৫০০০ পাউন্ডের অধিক মূল্যমানের দাবি সংক্রান্ত মামলায় প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করার সুযোগ প্রদানের বিধান করা হয়।[১৭]

কর্নওয়ালিসের সংস্কার

কর্নওয়ালিসের শাসনকালের সর্ববৃহৎ উদ্ভাবন ছিল দেশের শাসনকার্যকে শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের একচেটিয়া ব্যাপারে পরিবর্তিত করা । তিনি ক্লাইভ ও হেস্টিংসের এদেশীদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। অতি ক্ষুদ্র ও নীচ কাজ ছাড়া সকল প্রশাসনিক দায়িত্বে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়। কাজী, মুফতি প্রভৃতির মতো এদেশীয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, যাঁদের খুবই সামান্য অর্থ

---

১৬. ডব্লিউ. এইচ. মরলি, *দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া* (নয়াদিল্লী) ১৯৫১), ৪৫-৪৭, জৈন, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৮; মিত্তাল, জে. কে. *ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরী* (এলাহাবাদ, ১৯৮১), ৪৮-৫০।

১৭. জৈন, প্রাগুক্ত, ১২৫, ১৫৩, ১৫৮।

প্রদান করা হতো, তাঁদেরকে ইংরেজ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অধীনস্থ করা হয়। তাঁরা যেসব মামলার বিচারে ইসলামী আইনের মূলনীতি এবং মুসলমানদের ব্যাক্তিগত আইনের মূলনীতি প্রয়োগ করতে হতো সেসব মামলায় ইংরেজ বিচারকগণকে ঐ সকল আইন ব্যাখ্যা করে সাহায্য করতে পারতেন মাত্র। অনুরূপভাবে হিন্দুদের ব্যাক্তিগত বিষয়ে মামলার বিচার করার সময় ইংরেজ বিচারকগণের নিকট হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করার জন্যে হিন্দু পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হতো।

এতকাল যাবৎ রাজস্ব বিচার প্রশাসনের অংশ ছিল। কর্নওয়ালিসের বিধানে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়। কালেক্টরগণ ছাড়া অন্য চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বেসরকারি কর্মকর্তাগণকে ওলামা ও পণ্ডিতদের সাহায্যে আদিম মামলা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে জেলা ও নগর দেওয়ানি আদালতে পৌরোহিত্য করার জন্যে জেলা বিচারক নিযুক্ত করা হয়। প্রতিটি জেলা দেওয়ানি আদালতে জেলা বিচারক কর্তৃক প্রেরিত স্বল্প মূল্যমানের মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে একজন কনিষ্ঠ চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বেসামরিক কর্তকর্তাকে রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত করা হয়। জেলা বিচারকের প্রেরিত পঞ্চাশ সিক্কা টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলা মুন্সেফ পদধারী এদেশীয় বিচারকগণ নিষ্পত্তি করতে পারতেন। জেলা বিচারকগণ এবং রেজিস্ট্রারগণকে গুরুতর অপরাধের মামলা তদন্ত করার জন্যে এবং ছোটখাট ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তারা সীমিত কারাদণ্ড দিয়ে ও জরিমানা করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারতেন এবং গুরুতর অপরাধের মামলা তদন্ত করতে পারতেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে তাঁরা চূড়ান্ত বিচারের জন্য অভিযুক্তকে ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন। অন্যথায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ অভিযুক্তকে কয়েদাবস্থা থেকে খালাস দিতে পারতেন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি বিভাগে একটি করে চারটি প্রাদেশিক আদালত গঠন করা হয়েছিল। তিনজন জ্যেষ্ঠ চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত এ আদালত যেসকল জেলা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গঠিত হয়েছিল সেসকল জেলার জেলাবিচারকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনতেন। একজন ইংরেজ রেজিস্ট্রার, একজন কাজী, একজন মুফতি এবং একজন হিন্দু পণ্ডিত এ আদালতকে আপীল মামলার বিচারে সাহায্য করতেন। প্রাদেশিক আদালতের দু'জন বিচারককে নিয়ে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত গঠিত হয়েছিল। তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রেরিত ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। উক্ত আদালত ম্যাজিস্ট্রেট-আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ও পর্যালোচনা মামলার বিচার করতো। উক্ত আদালত অপরাধীকে যেকোন প্রকার শাস্তি দিতে পারতো। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সদর নিজামত আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানের দ্বারা সংশোধিত ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে উক্ত

আদালত কাজী ও মুফতির সাহায্যে ফৌজদারি মামলার বিচার করতো। গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সমবায়ে গঠিত সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদালত যথাক্রমে প্রাদেশিক আপীল আদালত এবং ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির জন্যে গঠিত হয়েছিল। সদর দেওয়ানি আদালতে প্রধান কাজী, দু'জন মুফতি এবং দু'জন পণ্ডিত এবং সদর নিজামত আদালতে প্রধান কাজী ও দু'জন মুফতি তাঁদের মতামত দিয়ে আপীল মামলার বিচারে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সাহায্য করতেন।[১৮] কর্নওয়ালিস প্রবিধান প্রণয়ন করে মামলাকারীদের নিকট থেকে কোর্টফি নেয়া বন্ধ করেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সনদ প্রদান এবং দেশীয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের এবং বিভিন্ন মামলায় ইসলামী ও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাকারীদের বেতন প্রদানের পরিবর্তে তারা যেসকল মামলার বিচার করতেন বা বিচারকাজে সহায়তা করতেন যথাক্রমে তার সংখ্যার ভিত্তিতে তাঁদের ফি দেয়ার বিধান করেন। ১৭৯৩ সনের ১২ নং রেগুলেশন বা প্রবিধান দ্বারা এ বিধান করা হয় যে বিভিন্ন আদালতে ইংরেজ বিচারকদের সাহায্য করার জন্য এদেশীয় আইন কর্মকর্তাগণকে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ নিয়োগ দান করবেন। ১৭৯৩ সনে কোর্ট ফি রহিত করার দরুন মামলা-মোকাদ্দমার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ১৭৯৫ সনে জন শোর মামলায় কোর্ট ফি আদায়ের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। যেসকল মামলা পূর্বে কোর্ট ফি ছাড়া দায়ের করা হয়েছিল সেই সব বিচারাধীন মামলায়ও তিনি কোর্ট ফি আদায়ের বিধান করেন।[১৯]

ওয়েলেসলী ও হেস্টিংসের সংস্কার

১৮০১ সনে লর্ড ওয়েলেসলী সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালতের প্রত্যেকটিতে তিনজন করে চুক্তিবদ্ধ জ্যেষ্ঠ ইংরেজ বেসামরিক কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক বিচারক পদে নিযুক্ত করে উক্ত আদালত দুটি পুনর্গঠন করেন। ১৮০৩ সনে প্রবিধান প্রণয়ন করে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে তিনি চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মকর্তাদের জেলা দেওয়ানি আদালতে সহকারী বিচারক এবং এদেশীয়দের সদর আমিন নিযুক্ত করার বিধান করেন।[২০] মুন্সেফ এবং সদর আমিনগণ কোন বৃটিশ প্রজা, অন্য ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও বিচার করতে পারতেন না।[২১] ১৮১৪ সনে সহকারী জজের পদ লুপ্ত করা হয় এবং রেজিস্ট্রারদের সংখ্যা ও এখতিয়ার বৃদ্ধি করে ঐ শূন্যতা পূরণ করা হয়।[২২] হেস্টিংসের সরকার প্রণীত ১৮২১ সনের ৪ নং প্রবিধান দ্বারা গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদকে কালেক্টর বা অন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তাকে

---

১৮. মরলি, প্রাগুক্ত ৫৭-৬০।

১৯. কুলশেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৬৮-৬৯, ১৭৫-৭৬।

২০. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৩৩।

২১. মরলি, প্রাগুক্ত, ৬১, ৬২, ৭০।

২২. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৩৫।

ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[২৩] অনুরূপভাবে ১৮২১ সনের ৩ নং প্রবিধান দ্বারা সামান্য অপরাধের মামলা বিচারের নিমিত্ত এদেশীয় আইনকর্মকর্তাদের ও সদর আমিনদের নিকট প্রেরণের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাঁরা অপরাধীদের ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ৫০ সিক্কা টাকা পর্যন্ত জরিমানা করে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।[২৪]

ব্যান্টিংক-এর সংস্কার এবং তৎপরবর্তী সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম ব্যান্টিংক সকল কালেক্টরকেই ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন।[২৫] মূল মামলা নিষ্পত্তি ও আপীল মামলার শুনানির জন্যে তিনি জেলা দেওয়ানি আদালতে প্রধান সদর আমিনের পদ সৃষ্টি করেন এবং রেজিস্ট্রারের পদ বিলুপ্ত করেন। তিনি মুন্সেফ, সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনকে নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের আর্থিক এখতিয়ারও বর্ধিত করেন।[২৬] তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও কালেক্টরদের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ১৮২৯ সনে প্রতি বিভাগে একজন কমিশনার অব রেভেনিউ ও সার্কিট অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বিভাগীয় রাজস্ব কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাঁদের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের দায়রা বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত বিলুপ্ত করেন।[২৭] ১৮৩৩ সনে তিনি জেলা আদালতে এডিশনাল জজ বা অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করার বিধান করেন এবং বিভাগের প্রাদেশিক আদালত বিলুপ্ত করেন।[২৮]

১৮৩১ সনের ৫ নং প্রবিধান দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রেরিত ফৌজদারি মামলা তদন্ত করার জন্যে প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিনদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তাঁরা শুধু তাঁদের তদন্তের ফলাফল ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারতেন, কিন্তু আসামীদের দায়রা বিচারে সোপর্দ করার আদেশ দিতে পারতেন না। ১৮৩২ সনের ২নং প্রবিধানের দ্বারা তিনি প্রধান সদর আমিন এবং এদেশীয় আইন কর্মকর্তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে অপরাধীদের এক মাস পর্যন্ত কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড এবং রত্তন বেত দ্বারা ত্রিশ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাত করে দৈহিক শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করেন।[২৯] ১৮৩১ সনের ৭নং প্রবিধান গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদকে জেলা ও নগর বিচারকদের মধ্যে যাঁরা

---

২৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫১।

২৪. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৮১।

২৫. মরলি, প্রাগুক্ত, ৭২।

২৬. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৬৩-৬৪।

২৭. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫৬।

২৮. জৈন, প্রাগুক্ত, ৭৩-৭৪।

২৯. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫৯-৬০।

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না তাঁদেরকে কমিশনার অব রেভিনিউ এবং সার্কিটের পরিবর্তে গুরুতর অপরাধের মামলায় দায়রা বিচার করার জন্যে অধিবেশনে বসার ক্ষমতা প্রদান করার জন্যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।[৩০] কমিশনার অব রেভিনিউ এবং সার্কিট ও জেলা এবং নগর আদালতের বিচারকদের মধ্যে যাঁরা দায়রা বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা যেসকল মামলায় জুরি অথবা এসেসরদের মতামত গ্রহণ করতেন সেসকল মামলায় তাঁদের কাজী ও মুফতির ফতোয়া আগ্রাহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৩১] এভাবে পর্যায়ক্রমে জেলা বিচারকগণকে জেলার দায়রা বিচারকে পরিণত করা হয় এবং কমিশনারগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত) ব্যতীত অপর এলাকার দায়রা বিচারে বসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।[৩২] পরবর্তীকালে ১৮৪৩ সনে লর্ড এলেনবরার সরকার কর্তৃক প্রণীত ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্টের বিধান দ্বারা ছোটখাট ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে এদেশী শিক্ষিত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩৩] নওয়াব আবদুল লতিফ এবং বিখ্যাত বাঙালি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রথম নিযুক্ত বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপীয়দের জন্যে সংরক্ষিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ১৮৫৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বিধান বলবৎ হওয়ায় ঐ সকল পদে এদেশীয়দের নিযুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সনে সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এভাবে উচ্চপদে এদেশীয়দের নিযুক্ত করার বাধা পরোক্ষভাবে অপসারিত হয়। পদোন্নতি এবং মনোনয়নের দ্বারা অতিরিক্ত জেলা বিচারক এবং জেলা বিচারকের মত উচ্চ পদে এদেশীয়দের নিযুক্ত করার জন্যে পরবর্তীকালে ১৮৭৫ সনে বিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৮৬৮ সনে সদর আমিনের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং বর্ধিত ক্ষমতা প্রদান করে প্রধান সদর আমিনের পদকে সাবজজ পদে রূপান্তরিত করা হয়। উক্ত বিধানবলে অতিরিক্ত বিচারক এবং জেলা বিচারকদের পদের এক-পঞ্চমাংশ অভিজ্ঞ সাবজজদেরকে পদোন্নতি দিয়ে এবং অভিজ্ঞ এদেশীয় আইনজ্ঞদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ নিযুক্তির মাধ্যমে পুরণ করা হয়। এভাবে ঐ সকল উচ্চ পদে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র আধিপাত্যের অবসান ঘটে।

আইন সংকলন

১৮৩৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর জেনারেলকে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয় এবং গভর্নর জেনারেলের পরিষদকে আইন

---

৩০. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত ১৮৪

৩১. মরলি, প্রাগুক্ত ৭৩-৭৪।

৩২. ১৯০০ সনের চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন-এর ৮ নং রেগুলেশন।

৩৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৭১

পরিষদ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ম্যাকলেকে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। উক্ত অ্যাক্টে ভারতের আইন সংকলনের জন্যে প্রস্তাবাদি পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি আইন কমিশন নিযুক্ত করার বিধান করা হয়। লর্ড ম্যাকলেকে সভাপতি করে ১৮৩৫ সনে প্রথম আইন কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম আইন কমিশন দণ্ডবিধির খসড়া তৈরি করে ১৮৩৫ সনে সরকারের নিকট পেশ করে। কমিশন দেওয়ানি মামলার পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্যে সুপারিশও পেশ করে এবং দেওয়ানি কার্যবিধি ও তামাদি আইনের খসড়াও প্রণয়ন করে।[৩৪] ১৮৫৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা কতিপয় অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করে আইন পরিষদের পরিসর বৃদ্ধি করার বিধান করা হয়। এতে এ বিধানও করা হয় যে, গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ না করা পর্যন্ত আইন পরিষদ প্রণীত কোন আইন বৈধ ও বলবৎযোগ্য হবেনা। ক্রমান্বয়ে এ পরিষদ একটি আংশিক নির্বাচিত আইন পরিষদে পরিণত হয়। ১৮৫৩ সনের চার্টার অ্যাক্টবলে প্রথম আইন কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা এবং বিবেচনা করে ভারতীয় আইন ও বিচারপদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার জন্যে ১৮৫৩ সনে দ্বিতীয় আইন কমিশন গঠন করা হয়। অন্যান্য বিষয়াবলী ছাড়াও এই কমিশন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতদ্বয়ের সমন্বয় করেন, একটি সমন্বিত ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধি প্রণয়ন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়নের জন্যে সুপারিশ পেশ করে।[৩৫] পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে একটি মাত্র সমন্বিত আইন প্রণয়ন ও সংকলনের সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৮৬১ ও ১৮৭৯ সনে পর পর আরও দুটি আইন কমিশন নিয়োগ করা হয়। উপরোক্ত আইন কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৩ ও ১৮৫৫ সনের সাক্ষ্য আইন, ১৮৫৯ সনের দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৮৫৯ সনের তামাদি আইন, ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি ও ১৮৬১ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি ভারতীয় আইন পরিষদ হিসাবে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করে।[৩৬] লর্ড ম্যাকলে দণ্ডবিধির যে খসড়া প্রণয়ন করেন, ১৮৬০ সনে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য, পরবর্তীকালে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের শেষ প্রধান বিচারপতি এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটির সদস্য স্যার বার্নস পিকক তা ব্যাপকভাবে সংশোধন করেন এবং পরে আইন পরিষদের দ্বারা আরও সংশোধিত হয়ে তা আইন হিসেবে প্রণীত হয়। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য এবং বহু আইন প্রণয়নকারী স্যার জেমস ফিটজেমস স্টিফেন মন্তব্য করেন : "ভারতীয় দণ্ডবিধিকে বৃটিশ ভারতের অবস্থার সাথে মিল রেখে সুসংবদ্ধভাবে সাজানো এবং অল্প কিছু বিষয়ে (বিস্ময়করভাবে যা অতি অল্প) পরিবর্তিত এবং সকল ক্রটি ও বাহুল্যমুক্ত ইংল্যান্ডের ফৌজদারি আইনরূপে অভিহিত করা যায়। আমি বিশ্বাস করি না এর কোন বিষয় মুসলিম আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।"[৩৭] ১৮৬২ সনের ১৭ নং

---

৩৪. জৈন, প্রাগুক্ত, ৫১৩।

৩৫. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ৩০৪।

৩৬. জৈন, প্রাগুক্ত, ৫৩৭।

৩৭. *এ হিস্টোরী অব ক্রিমিনাল ল অব ইংল্যান্ড*, তৃতীয় খণ্ড (লন্ডন ১৮৮৩), ৩০০।

অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ঈষৎ পরিবর্তিত ইসলামী বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে ঈষৎ পরিবর্তিত ইংরেজদের সাধারণ আইনের বিচারব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৪ সনের ১১ নং অ্যাক্টবলে কাজী, মৌলবি এবং পণ্ডিতের পদ বিলুপ্ত করা হয়।[৩৮] মুসলমান এবং হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনে সামান্য পরিবর্তন সাধন ব্যতীত ঔপনিবেশিক শাসকগণ অন্য সকল আইন সংশোধন বা সম্পূর্ণভাবে বদল করে বিশেষ প্রতিকার, কার্যবিধি, তামাদি, সাক্ষ্য, কোর্ট ফিস, বিবাহ, ব্যবসা, চুক্তি, অংশিদারিত্ব, পণ্যক্রয়, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, দাসপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, সাবালকত্ব, মানসিক বিকৃতি, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, শিশুবিবাহ নিরোধ ও ভূমিসংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করেন।[৩৯] নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ১৮৬২ সনে মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা ক্রমান্বয়ে একটি নির্বাচিত সংস্থায় পরিবর্তিত হয়ে বাংলার অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতিবিধান করার জন্যে বহু আইন প্রণয়ন করেছিল।

সরকারি ভাষার পরিবর্তন

মুসলিম শাসনামলের সরকারি ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ১৮৩৭ সনে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হয়। ইংরেজির পাশাপাশি এদেশী ভাষা নিম্ন আদালত ও মফস্বল অঞ্চলের সরকারি দপ্তরে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। সদর আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে কিছুদিন উর্দু ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু পরিশেষে সেসব আদালতে ফার্সি ও উর্দু ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করা হয়।[৪০]

কোম্পানির শাসনের অবসান এবং সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্ট

রাজস্ব, আইন ও বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন, জলপথ, রেলপথ, সড়ক ও জনপথের প্রসারের ফলে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থার অবক্ষয়, বিদেশ থেকে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির আমদানির ফলে কুটিরশিল্পের ধ্বংস, একদিকে কোম্পানি ও এর কর্মকর্তাগণ, অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায্য প্রতিযোগিতার ফলে মুগল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল অভিজাত শ্রেণীর খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার এবং এদেশী ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৫৭ সন পর্যন্ত কোম্পানির অপকর্ম দেশকে এমনভাবে নিঃস্ব করে দেয় যে দেশের মানুষ প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে।[৪১] দেশের অভিজাত শ্রেণী এবং অন্যান্য যারা কোম্পানির দুঃশাসনে দুর্দশাগ্রস্ত

---

৩৮. স্যার জর্জ ক্লস র‍্যাঙ্কিন, *ব্যাকগ্রাউন্ড টু ইন্ডিয়ান 'ল'* (কলিকাতা ১৯৪৬), ১৩৯-৪০।

৩৯. কুলশ্রেষ্ঠ, পুর্বোক্ত, ৩৪২-৩৪৯।

৪০. আর. সি. শ্রীবাস্তব, *ডেভেলপমেন্ট অব জুডিসিয়াল সিস্টেমস ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন ১৮৩৩-৫৮* (লখনৌ ১৯৭১), ১২৩-২৮।

৪১. উইল ডুরান্ট, *আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ* (নিউইয়র্ক ১৯৫৪), ৬১৪।

ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা তাদের হারানো ক্ষমতা এবং মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্যে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমন করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৮৫৮ সনের ভারত শাসন আইন পাশ করে। ১৮৫৮ সনে রানী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাবলে কোম্পানির নিকট থেকে ভারতের কোম্পানিশাসিত এলাকার শাসনভার বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার ফলে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৬১ সনের ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট অ্যাক্টে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রানী কর্তৃক প্রদত্ত ১৮৬২ সনের 'লেটারস পেটেন্ট' বা সনদ দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বাংলায় দু'ধরনের আদালত ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে অবস্থিত সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যাণ্ডের কিংস কোর্টের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সামান্য অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলার বিচার করতো এবং গুরুতর অপরাধের তদন্ত করতো। উপরোক্ত সকল আদালতই ইংরেজদের আইন অনুযায়ী মামলার বিচার করতো। অপরপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী দেওয়ানি মামলা নিস্পত্তি করার জন্যে প্রতি জেলায় ছিল মুন্সেফ, প্রধান সদর আমিন, সদর আমিন, জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারকের আদালতসমূহ এবং ঐ সকল আদালতের উপরে ছিল সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে প্রতি জেলায় ছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের ও দায়রা বিচারকদের আদালত এবং ঐ সকল আদালতের উপরে ছিল সদর নিজামত আদালত। এভাবে বাংলায় ১৮৬২ সন পর্যন্ত পৃথক পৃথক এখতিয়ারসম্পন্ন দু'ধরনের আদালত ছিল এবং তারা পৃথক পৃথক আইনব্যবস্থা প্রয়োগ করতো। তখন কোম্পানির আদালতসমূহ ইংরেজদের আইন প্রয়োগ করতো না। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমায় বিচার করার সময় এদেশীয় আইন, প্রথা, প্রবিধান এবং অ্যাক্টে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে ইংরেজ বিচারকগণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে ন্যায়নীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিবেক প্রয়োগ করতে পারতেন। ইংরেজ বিচারকগণ তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় প্রায়শ স্থানীয় অবস্থার সাথে যে পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেই পরিমাণে ইংরেজদের আইনের মূলনীতি মফস্বলের আদালতেও প্রয়োগ করতেন। ঐ সকল উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের করা যেতো এবং ১৮৬১ সন পর্যন্ত প্রিভিকাউন্সিল নজীর আইন ঘোষণার মাধ্যমে বিচার প্রশাসনে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছিল।[৪২]

১৮৬২ সনে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদলতসমূহ বিলুপ্ত হয়। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে নবগঠিত হাইকোর্ট অব জুডিকেচারকে উপরোক্ত সকল আদালতের পূর্বের সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়। উপনিবেশের সর্বোচ্চ আদালতের

৪২. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৮৭-৮৮।

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলের আপীল শুনানির এখতিয়ার ছিল। তাই কলিকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উক্ত কোর্টে আপীল দায়ের করা যেতো। এভাবে বাংলায় ঐ দু'ধরনের আদালত একীভূত বা সমন্বিত হয়েছিল।[৪৩]

ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

হিন্দু আইনে যে ব্যক্তি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ভূমি চাষোপযোগী করতো সে ব্যক্তি উক্ত ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ রাজাকে দেয়ার শর্তে তা ভোগ করার অধিকারী ছিল এবং রাজা তার পরিবর্তে কৃষকদের রক্ষা করতে বাধ্য ছিলেন। গ্রামে আদি বসতকারী কৃষক এবং তাদের বংশধরগণের প্রথাগত হারে খাজনা প্রদান করে ভূমি ভোগদখল করার প্রথাগত অধিকার ছিল। পরবর্তীকালে বহিরাগতদের মধ্যে যাদেরকে স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তাদেরও একই অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু তারা একবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে তাদের পরিত্যক্ত জমি আবার ফেরত পাওয়ার অধিকার ছিল না এবং গ্রামের আদি বসতকারীদের বা তাদের বংশধরদের মত ভূমি বণ্টনের সময় উর্বর ভূমি পছন্দ করার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারতো না কিংবা তাদের দখলী ভূসম্পত্তি হস্তান্তরও করতে পারতো না। কিন্তু যারা প্রতিবেশী গ্রাম থেকে যেসব গ্রামে তারা বাস করতো না সেসব গ্রামের স্থানীয় বসতকারীদের অকর্ষিত ভূমি চাষাবাদের জন্য আগমন করতো তারা সেসব ভূমিতে অধিকারহনী রায়ত ছিল। সেসব ভূমি দখলে রাখার কোন অধিকার তাদের ছিল না এবং আদি বসতকারী ও তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে তারা সম্মানী প্রদান করতে বাধ্য ছিল। অনার্যগণ তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। আদিতে রাজস্ব আদায়কারীগণকে দ্রব্যে অথবা নগদ অর্থে পারিশ্রমিক দেয়া হতো, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির একাংশের রাজস্ব তাদের সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হতো। ঐ সকল পদ পরে বাংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল। মুসলিম শাসনের অভ্যুদয়ের সময় রাজস্ব আদায়কারীগণকে বংশানুক্রমিক পদ থেকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা এবং রাজস্বহার বর্ধিতকরণ ছাড়া আর কোন বিষয়ে পরিবর্তন সাধিত হয় নি।[৪৪] মুসলিম শাসকগণ খুদকাস্ত হিসেবে পরিচিত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের অধিকার এবং পাইকাস্ত হিসেবে পরিচিত অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের অধিকারেও কোন পরিবর্তন করেন নি। কিন্তু ১৭৯৩ সনের পূর্বে সম্পাদিত কোম্পানির অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায়কারীদের ভূম্যধিকারীতে রূপান্তরিত করায় রাজস্ব আদায়কারী ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কৃষকগণ জমিদারদের অধীনে অধিকারহীন প্রজায় পরিণত হয়। আইনত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত এ

---

৪৩. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৯২, ২২০-২১।

৪৪. আর্থার ফিলিপস, প্রাগুক্ত, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ২১-২৩, ৪৬, ৫৩।

ব্যবস্থা দেশের আইনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে কর্নওয়ালিস যে আইনসংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন তাকে বেগবান করা হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করার জন্যে। ১৮৫৯ সনের খাজনা আইন, ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন এবং ১৯৫০ সনের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন কৃষকের অধিকার রক্ষা করার জন্যে কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ছিল, যা মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত।

বৃটিশ শাসনকালে নিম্ন আদালত

বিচারপ্রশাসন সংস্কারের জন্যে আইন সংকলন ও প্রণয়নে ১৮৬২ সন থেকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ খুবই দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যান্টিংক-এর প্রশাসনকাল পর্যন্ত উদ্ভাবিত আদালতের যে ক্ষমতা ও গঠন ছিল তা ১৮৮৭ সনের দেওয়ানি আদালত আইন, ১৯০৮ সনের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়। বিচারকার্যের জন্যে প্রতিটি জেলাকে কতিপয় মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। মহকুমাসদরে তখন অবস্থিত ছিল মুন্সেফদের ও ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত। আর সাবজজ, অতিরিক্ত বিচারক, জেলা বিচারক, জেলা মেজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা বিচারকদের আদালত জেলাসদরে অবস্থিত ছিল। কতিপয় মুন্সেফের আদালত তখন দুরবর্তী থানা সদরে অবস্থিত ছিল এবং এরূপ মুন্সেফদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার এবং তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রাজস্ব আদালত হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং বিভাগীয় কমিশনার দায়রা বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। ঐ সকল আইনে নিম্ন আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পর্কে মামলা অথবা আপীল দায়ের করার স্থান এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় কি প্রকার কার্যবিধি অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান ছিল। ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন এবং উক্ত দুটি কার্যবিধিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় সুবিচার নিশ্চিত করার জন্যে বিস্তারিত বিধিবিধান ছিল। বিভিন্ন প্রবিধান ও ১৮৫৮ সনের খাজনা আইন দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারবহির্ভুত হওয়ার পর ১৮৬৯ সনের খাজনা আইন দ্বারা তা পুনর্বহাল করা হয়। ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার খাজনার দাবিসহ সর্ব প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের উপর অর্পিত হয়।

ফেডারেল কোর্ট

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী ১৯৩৭ সনে ভারতে একটি ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টসহ অন্যান্য সকল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির ক্ষমতা এই কোর্টের ছিল। কিন্তু সে আপীলক্ষমতা শুধু

আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা অন্যান্য বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলের আপীল শুনানির ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে প্রভাবিত করে নি।

বৃটিশ শাসনের অবসান

১৮৫৮ সনের ভারত শাসন আইন পাশ এবং ঐ সনে রানীর ঘোষণার মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের সূচনা হয়। কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া নামে অভিহিত পনেরো সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ গ্রহণ করে কোম্পানি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতো সেক্রেটারী অব স্টেটকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার কর্তৃত্ব দেয়া হয়, বোর্ড অব কন্ট্রোল বিলুপ্ত করা হয় এবং পূর্ববর্তী আইনের বিধানানুযায়ী ভারতে গঠিত পরিষদ ভারতের গভর্নর জেনারেলের পরিষদ নামে পুনঃআখ্যায়িত হয়। আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট দ্বারা গভর্নর জেনারেলের পরিষদে আরও বারোজন অতিরিক্ত সদস্য মনোয়নের মাধ্যমে ঐ পরিষদের গঠনকাঠামো বর্ধিত করা হয় এবং ঐ সদস্যগণ শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের সময় পরিষদে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে মনোনয়নের মাধ্যমে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের একটি পৃথক পরিষদ গঠন করার বিধানও এ আইনে ছিল। ১৮৯২ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯০৯ সনের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টে নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ সকল পরিষদে কতিপয় সদস্য বাছাই করার এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করারও বিধান ছিল এবং উক্ত পরিষদগুলিতে মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশে নির্ধারিত করা হয়েছিল। ১৯১৫ সনের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ষাটে বর্ধিত করা হয়েছিল। ১৯১৯ সনের ভারত শাসন আইনে হস্তান্তরিত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করার বিধান করা হয়েছিল এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১২৫-এ বর্ধিত করার বিধান করা হয়েছিল। প্রদেশের কতিপয় গুরুত্বহীন বিষয় গভর্নর এবং নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে হস্তান্তর করে স্থানীয় মন্ত্রীদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের জন্যে জনসাধারণের দাবি মেটাতে পারে নি। ১৯২৪ সনের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইনসভাকে ৬০ জন মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য সম্বলিত কাউন্সিল অব স্টেট্স বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং চল্লিশ জন মনোনীত এবং একশত জন নির্বাচিত সদস্য সম্বলিত ১৪০ জন সদস্যের বিধানসভায় বিভক্ত করা হয়। স্বায়ত্তশাসনের গণদাবি পূরণের জন্যে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বাংলা প্রদেশ প্রশাসনে এবং আইন প্রণয়নে অধিক ক্ষমতা লাভ করে। প্রাদেশিক আইনসভাকে অধিক সদস্য সম্বলিত আইন পরিষদ ও বিধানসভায় বিভক্ত করা হয়। গভর্নরের নিকট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে দিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়। এ আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের গণদাবি মেটাতে না পারায় ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে ভারতে বৃটিশ

শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সনে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে বৃটিশ পার্লামেন্ট এদেশকে বিভক্ত করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নূতন রাষ্ট্রকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করে। এভাবে ১৯৪৭ সনে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

পাকিস্তান আমলে আইন ও বিচারব্যবস্থা

১৯৪৭ সনে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একাংশে পরিণত করা পর্যন্ত আদালতের গঠন ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট থেকে পূর্ব বাংলার আইনব্যবস্থা ও বিচারপ্রশাসনে তেমন কোন বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সামান্যরূপে সংশোধন ও পরিবর্তন করে ঔপনিবেশিক আমলের সকল আইন ও বিচার বিভাগের গঠন ও কাঠামো গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে ১৯৪৭ সনের হাইকোর্ট (বেঙ্গল) অর্ডারের বিধান অনুযায়ী যেসকল এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা গঠিত হয়েছিল সেসকল এলাকার জন্যে ঢাকা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরপক্ষে ১৯৪৭ সনের ফেডারেল কোর্ট অর্ডারের বিধান অনুযায়ী করাচীতে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ সনের প্রিভিকাউন্সিল (এখতিয়ার বিলুপ্তকরণ) আইনের বিধান অনুযায়ী হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করার অধিকার প্রত্যাহার করা হয় এবং একই অধিকার ১৯৫০ সনের ফেডারেল কোর্ট (এখতিয়ার বর্ধিতকরণ) আইনের বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৬ সনের ইসলামিক গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের সংবিধান কার্যকরী হওয়ায় ফেডারেল কোর্টের স্থলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদালতের উপর ঢাকা হাইকোর্টসহ সকল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল এখতিয়ার ন্যস্ত করা হয়।[৪৫] উক্ত সংবিধানে সকল হাইকোর্টকে শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যাবলীর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করা নয়, বরং সংবিধানে নিশ্চিত করা কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং এরূপ আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে ঘোষণা করার জন্যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট বা পরওয়ানা জারি করার অধিকার প্রদান করা হয়।[৪৬] উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও এডমিরালটি, কোম্পানি এবং অন্য কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ে হাইকোর্টের মূল এখতিয়ার ছিল। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধানত আপীল ও পর্যালোচনা করার এবং নিম্ন আদালতের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল।[৪৭] যাহোক সংবিধানে পবিত্রভাবে সংরক্ষিত আইনের শাসনব্যবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে দেশে সামরিক আইন ঘোষিত হয় এবং সংবিধান বাতিল করা হয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট জারি করার

---

৪৫. ১৯৫৬ সনের পাকিস্তানের সংবিধান, ১৪৮, ১৫৭-৬০, অনুচ্ছেদ।

৪৬. প্রাগুক্ত, ১৭০ অনুচ্ছেদ।

৪৭. প্রাগুক্ত, তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের ৪ নং দফা।

ক্ষমতা রহিত করা হলেও ঔপনিবেশিক আমলে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল শুনার ও নিম্ন আদালতের মামলা পর্যালোচনা করার যে ক্ষমতা ছিল তা বহাল রাখা হয়। ১৯৫৯ সনের জুন মাসে দায়রা বিচারে জুরিব্যবস্থার বিলুপ্তি ছিল বিচার প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অন্যটি ছিল ১৯৬১ সনের কন্‌সিলিয়েশন কোর্টস অধ্যাদেশবলে ইউনিয়ন পরিষদকে মামলার বিচার করার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান। ১৯৬২ সনে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ দেশকে আর একটি সংবিধান উপহার দেয় এবং পরবর্তীতে সংশোধনের দ্বারা ১৯৬৪ সনে কতিপয় মৌলিক অধিকার এ সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় এবং হাইকোর্টকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৪৮]

কিন্তু ১৯৬৯ সনে উক্ত সংবিধান পুনরায় বাতিল করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্তানে কখনও আইনের শাসন তেমন গভীরভাবে সুরক্ষিত হয় নি। মানবাধিকারের নিদারুণ লঙ্ঘন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদেরকে কার্যকর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদানে অস্বীকৃতি এদেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে দেয় এবং ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। যা হোক, ঐগুলি হচ্ছে অন্য কাহিনী। ক্ষণস্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি তা সত্ত্বেও ১৯৭১ সন পর্যন্ত সময়ে সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করে দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বিচার প্রশাসনব্যবস্থা বহাল ছিল।

সমাজে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার প্রভাব

আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, সূচনায় কোম্পানির প্রশাসন এদেশীয় আইনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নি। ওয়ারেন হেস্টিংস এ দেশের আইনব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। কর্নওয়ালিস আইনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। বিচারকার্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ক্ষমতা ন্যস্ত করে জজ হিসেবে এক গুচ্ছ চুক্তিবদ্ধ বেসামরিক কর্মকর্তাকে এবং রাজস্ব ক্ষমতা ন্যস্ত করে কালেকটর হিসেবে আরেক গুচ্ছ চুক্তিবদ্ধ বেসামরিক কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে লর্ড কর্নওয়ালিস নির্বাহী ক্ষমতা থেকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা পৃথক করার জন্যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অবাধে শান্তিপূর্ণভাবে রাজস্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের দমনমূলক ক্ষমতা প্রদানের প্রক্রিয়া ১৮২১ সনে লর্ড হেস্টিংস আরম্ভ করেছিলেন এবং তার ফলে তারা জমিদারদেরকে তাদের প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতে সহায়তা দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন যেন তারা সময়মত কালেক্টরকে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়। নির্বাহী ক্ষমতা থেকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা পৃথক করা একটি খুবই ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষামূলক বিষয় ছিল। উপরন্তু ক্ষমতার বাস্তব পৃথকীকরণ সাধনের জন্যে বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের পৃথক ক্যাডার বা কর্মকর্তাকাঠামো ছিল না।

---

৪৮. ১৯৬২ সনের পাকিস্তানের সংবিধান, ৯৮ অনুচ্ছেদ।

দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির ক্ষমতা এবং মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্যে জমিদারকে পুলিশ বাহিনী প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কোম্পানি থানায় দারোগা এবং পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ পূর্বক পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং জেলাকে পরগনায় বিভক্ত করে যে প্রশাসনব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করে দিয়ে প্রত্যেক জেলাকে থানায় বিভক্ত করে। এমনকি গ্রামপঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদারদেরকে দেশীয় দারোগাদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ন্যস্ত করা হয় এবং এদেশী দারোগাদেরকেও ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিনটেন্ডেন্টদের মত ইংরেজ কর্মকর্তাদের তদারকিতে ন্যস্ত করা হয়। পরিশেষে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে তা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ পঞ্চায়েতের সদস্য মনোনীত করতে আরম্ভ করেন। বিনা খরচে নিজেদের মধ্যে সকল বিরোধ মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সংগঠন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং তা অতীতে যা ছিল তার শুধুমাত্র ছায়ায় পরিণত হয়। ১৮৮৫ সনের গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হলেও ইহার গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষমতা ছিল না এবং সার্কেল অফিসারের মত একজন নগণ্য সরকারি কর্মকর্তার তদারকির অধীনে গ্রামের অধিবাসীদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সরল, সহজ, অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামের সাধারণ মানুষ মুগল আমলে কোনদিন পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে কোর্ট-কাছারিতে যায় নি। তৎকালে গুরুতর অপরাধের মামলার বিচার এবং গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে জনগণ আইন-আদালতের শরণাপন্ন হতো। এজন্যে রাজধানী শহর, জেলা ও পরগনা সদরে এবং সকল শহরে কোর্ট-কাছারি থাকা সত্ত্বেও মামলা-মোকাদ্দমার সংখ্যা খুব কম ছিল। উপরন্তু তৎকালে উচ্চতর আদালতে আপীল করার সুযোগ থাকলেও খুব অল্প সংখ্যক লোকই আপীল করতে ইচ্ছুক ছিল।

কর্নওয়ালিস মক্কেলদের নিকট থেকে ফি নেয়ার অনুমতি দিয়ে পেশাদারী আইনজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করে বিচারব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই মক্কেলদের নিকট থেকে ফি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে উকিলগণ মক্কেলদের নিকট থেকে ফি নিয়ে বিত্তবান হওয়ার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাই তারা মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার জন্যে এবং মামলা দীর্ঘায়িত করার জন্যে আদালতকে ব্যবহার করার সুযোগ খুঁজতো এবং মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে নয়, বরং আইনের কূটতর্ক আলোচনার জন্যে আদালতকে ব্যবহার করতো।[৪৯]

১৭৯৩ সনের ১৭ নং রেগুলেশন এবং ১৭৯৯ সনের ৭নং রেগুলেশনে রায়তদের মালামাল ক্রোক করার জন্য জমিদারদের ক্ষমতা দেয়া হলেও জমিদারগণ কর্তৃক

৪৯. আর. সি. শ্রীবাস্তভ, প্রাগুক্ত. ১৯৪-৯৫

অবৈধভবে মালামাল ক্রোক এবং বিক্রয় করার বিরুদ্ধে রায়তদের দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার লাভের যে অধিকার দেওয়া হয় তাতে রায়তদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক মালামাল ক্রোক প্রতিরোধে রায়তগণ সন্ত্রাসী হয়ে উঠে। ফলে অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়। ফলে ঘুষ ও দুর্নীতি বেড়ে যায়। মামলা এগিয়ে আনা হবে এবং দ্রুত শুনানি হবে এই আশায় মানুষ আদালতের অধস্তন কর্মচারীদের অবৈধভাবে ঘুষ দিতে থাকে।[৫০] জমিদারদের ক্ষমতার অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহারের ফলে মামলার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং ১৮১২ সনের ১লা জানুয়ারিতে বিচারাধীন মূল মামলা এবং আপীল মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩৯,২৭১ তে।[৫১]

নিম্ন আদালতে বর্ধিত মামলার চাপ মোকাবেলা করার জন্যে কোম্পানি প্রথমে কমিশন প্রদানের এবং পরে নামমাত্র স্বল্প বেতন প্রদানের ভিত্তিতে এদেশীয়দের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবে শুধু মুন্সেফদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করা হয় নি, বরং সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনের মত দেশীয় পদস্থ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির শাসনামলে বিচার বিভাগের উচ্চপদগুলি ইংরেজদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং নিম্নপদে এদেশীয়দের নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির নিকট থেকে বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইংরেজদের জন্যে উচ্চপদ সংরক্ষিত রাখার নীতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং পদোন্নতির মাধ্যমে এদেশীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। এভাবে ইংরেজ বিচারকদের সংখ্যাধিক্য ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে এবং এদেশীয় বিচারকদের প্রকৃত সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদেশীয় বিচারকগণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য তাঁরা তাঁদের ইংরেজ সহকর্মীদের চেয়ে অধিকতর ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে পারতেন। ১-৩-১৮৩৭ তারিখের একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৩৬ সনে নিষ্পত্তিকৃত ১, ১২, ৩৮০ টি মামলার মধ্যে ৬৮০৩ টি মামলা ইউরোপীয় বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন এবং এদেশীয় বিচারকগণ ১, ০৫, ৪৮৭ টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। উপরন্ত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করে মুন্সেফ পদে নিয়োগ লাভ করার সুযোগ আইনের কৃতী স্নাতকদের বিচার বিভাগীয় পদস্থ চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট করতো এবং পদোন্নতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যাক্তিগণ জেলা বিচারক পদেও নিযুক্ত হতে পারতেন। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদেরকে প্রত্যক্ষভাবে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যাক্তিদেরকে বিচার বিভাগীয় চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট করতো, যাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যাক্তি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে চাকুরিজীবন শেষ করেছেন।

---

৫০. ফ্রেডারিক শোর ; *নোটস অন ইন্ডিয়ান এফেয়ার্স* (লেন্ডন ১৮৩৭), ৫০-৬৫।

৫১. জৈন, প্রাগুক্ত, ২২৩।

কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯৪৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে উক্ত সময়কালে বিচারকদের সংখ্যা (যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি) এবং বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সনে দেওয়ানি আদালতে ৫৬ জন সাবজজ, ২১ জন অতিরিক্ত বিচারক এবং ২২ জন জেলা বিচারকসহ ৩১৬ জন বিচারক ছিলেন এবং সেই বছর ৭, ১৩, ৪০৮টি মূল মামলা এবং অন্যান্য বিচরাধীন মামলা ব্যতীত ২১, ৭২৭টি আপীল মামলা বিচারাধীন ছিল। এগুলোর মধ্যে ৫, ০৯, ৭১৫ টি মূল মামলা ও ৮, ১৩৯ টি আপীল মামলা উক্ত বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন। পক্ষান্তরে, ১৯৪৬ সনে দায়রা আদালতে ৭৮ জন বিচারক ছিলেন এবং ফৌজদারি আদালতে ৬০৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই বছর ১৮১০টি দায়রা মামলার সব কয়টি উক্ত দায়রা বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং দায়রা আদালতের বিচারকগণ ৩,০০০টি আপীল মামলা নিষ্পত্তি করেন। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট দায়েরকৃত ৩, ৭৫, ৬১০টি অভিযোগের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ২, ৭৭, ৫০৭টি মামলা বিচারের জন্যে গ্রহণ করেন এবং যেসব মামলা বিচারের জন্য দায়রা আদালতে প্রেরিত হয় সেগুলি সহ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ১, ৮২. ৫৮৪ টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিনগুলোতে এভাবে এদেশীয় বিচারকদের যোগ্যতা এবং মামলা নিষ্পত্তির হার খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিল, ফলে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না। এদেশে বিচার বিভাগের কার্যকারিতা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যানতথ্য কলিকাতা হাইকোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে বিচার প্রশাসনে এদেশীয়দের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণের ফলে অবস্থার উন্নতি হয়। এমনকি বাংলায় বিদেশী বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত করা না গেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ফলপ্রসূ হয়েছিল।

মূগল আমলে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে অনুসন্ধানমূলক ছিল। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে নাজিম ও কাজীদের সাক্ষ্য ও শপথ গ্রহণের উপর সন্তুষ্ট না থেকে ঘটনা সম্পর্কে নিষ্ঠাপূর্ণ ও ব্যাপক ও অনুসন্ধান করতে বলেছেন এবং এভাবে মামলায় বিচারপ্রার্থীদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মামলার পারিপার্শ্বিকতাও জানতে বলেছেন।[৫২] অপরপক্ষে ইংরেজদের সাধারণ আইনের মূলনীতি প্রয়োগ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে কোম্পানির কর্মচারীদের বিচার করার জন্যে সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বমূলক বিচারব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের রাজার আদালতের অবিকল অনুসরণে ১৭৭৪ সনে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে এদেশের অবশিষ্টাংশে ইসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তে উপরোল্লেখিত বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

---

৫২. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ৩৮ এবং ৪৩।

নতুন বিচারব্যবস্থা শুধু কালক্ষেপণকারীই নয়, বরং ব্যয়বহুলও ছিল। বিচারক হিসেবে কর্মরত অনভিজ্ঞ ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ স্থানীয় মানুষের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে পরিচিত না থাকায় দেশীয় অধস্তনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা দুই পক্ষের মাঝে মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিরোধীয় বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় পক্ষদের মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আইনের বিভিন্ন খুঁটিনাটির প্রতি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করতেন। ফলে বিভিন্ন আদালতে প্রচুর অর্থ খরচ করে মামলা পরিচালনা করে বিচারপ্রার্থীগণ কোন প্রতিকারই পেতেন না।[৫৩] মৌখিক এবং দালিলিক সাক্ষ্যের উপর বিচারকদের নির্ভরশীলতা মামলাকারীদের জালিয়াতি করতে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দানে উৎসাহিত করতো। এসব দুষ্কর্ম দেশীয় সরকারের আমলে ততটা দৃষ্টি আকর্ষক ছিল না।[৫৪] সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনের কূটতর্ক এবং জটিলতার প্রতি ইংরেজ বিচারকদের একমাত্র নির্ভরশীলতা সুবিচার প্রদানে প্রায়শ ব্যর্থ হতো। ফৌজদারি মামলায় বাদীর প্রতি সাক্ষ্য-প্রমাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এবং অভিযুক্তকে নিরব থাকার সুযোগ দিয়ে সন্দেহের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে মামলা থেকে প্রকৃত দোষী ব্যাক্তির খালাস পাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অপরপক্ষে অকাট্য এবং সংগতিপূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রদান করে প্রভাবশালী ব্যাক্তিগণ তাদের নিরপরাধ প্রতিপক্ষকে দণ্ডিত করতো। চতুর লোক ছাড়া কোন ব্যাক্তিই অবস্থার শিকার হয়ে বাধ্য না হলে আদালতের শরণাপন্ন হতো না। প্রথম যুগের একজন বাঙালি সিভিলিয়ান আর, সি, দত্ত বলেছেন যে দেওয়ানি মামলা সময়সাপেক্ষ ও ব্যায়বহুল হওয়ায় দরিদ্র লোকেরা ফৌজদারি আদালতে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ব্যর্থ হতো।[৫৫] তাই সঠিকভাবেই বলা হয়ে থাকে যে সর্বশেষ আদালতে জয়লাভকারী একজন মামলাকারী অসংখ্য কোর্টে মামলা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যান। তাই এদেশের জনসাধারণ, বিশেষত গ্রামের সহজ সরল মানুষের পক্ষে আদালতকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ তারা মনে করতেন, সততা নয়, বরং ছলচাতুরীরই জয় হয় সেখানে। ঔপন্যাসিক প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলা কান্তের দফতরে' অত্যন্ত সার্থকভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কোর্ট-কাছারিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার প্রাণবন্ত ও সঠিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যার জন্য সাধারণ মানুষ আদালতকে খুবই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো। একাধিক আপীলের বিধানসম্পন্ন এবং মামলার নিষ্পত্তিতে অধিক বিলম্বকারী বিচারপ্রশাসন ব্যবস্থা মামলাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও হয়রানিমূলক করে তুলেছিল। এতদসত্ত্বেও এ ব্যবস্থা মামলাবাজ লোকদেরকে তাদের দুর্বল প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ ব্যাপারে মামলা করা থেকে বিরত করে নি। কারণ আদালত মামলায় বিজয়ী পক্ষকে পরাজিত পক্ষের বিরুদ্ধে সামান্যই খরচ ডিক্রী দিত। পাকিস্তানে মামলাবাজগণ কর্তৃক আইন ও বিচারব্যবস্থার এমন অপব্যবহারের

---

৫৩ আর. সি. শ্রী বাস্ত্রভ, প্রাগুক্ত, ৩।

৫৪. ঐ, পূর্বোক্ত, ৭।

৫৫. *পিজান্ট্রি অব বেংগল* (কলিকাতা, ১৮৭৪ পুনর্মুদ্রণ ১৯০০, ৮৮-৮৯।

লক্ষ্য যে সুবিচার পাওয়া নয় অন্য কিছু ছিল, তা ষাটের দশকে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ ই. এডামসন হোয়েবেলের গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়।[৫৬]

দেশে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আইনের শাসনের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেট্‌ল্‌মেন্ট দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকারের কর্মচারীদের অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের রিট জারির ক্ষমতা ব্যপকভাবে খর্ব করা হয়। উক্ত আদালতের এখতিয়ার প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট ঐতিহ্যসূত্রেই রিট জারি করে নির্বাহী কর্মের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার সীমাবদ্ধ এখতিয়ার লাভ করেছিল এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরের সীমানায় উহার প্রয়োগ করতে পারতো এবং তার বাইরে তা করতে পারতো না। এদেশীয়দের মাঝে মামলার বিচার করার সময় ইংরেজ বিচারকগণ কোন বৈষম্য না করলেও দেশীয়দের এবং বৃটিশ নাগরিকদের মধ্যে মামলার বিচার করার সময় বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ ছিল। ১৮১৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট প্রণীত হওয়া পর্যন্ত জেলা দেওয়ানি আদালতের ইংরেজ বিচারকদের বৃটিশ নাগরিকদের বিষয়ে সীমাবদ্ধ এখতিয়ার ছিল, যা ঐ আইন দ্বারা দূরীভূত হয় এবং ঐ বিষয়ে তাদের সীমাহীন এখতিয়ার প্রদান করে। কিন্তু দেশীয় বিচারকগণ বৃটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার বিচার করতে পারতো না। ১৮৩৬ সনের ১১ নং আইনে সদর আমিনদের এবং ১৮৪৩ সনের ৬ নং আইনে মুন্সেফদের ঐ অসামর্থ্য দূর করে তাঁদের আদালতে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৮৩৬ সনের ১১ নং আইন দ্বারা বৃটিশ নাগরিকদের সুপ্রীমকোর্টে আপীল করার অধিকার রহিত করা হয়। এর পরিবর্তে বৃটিশ নাগরিকগণকে কোম্পানির অধস্তন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে আপীল করার অধিকার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে কোম্পানির ফৌজদারি আদালত বৃটিশ নাগরিকদের বিচার করতে পারতো না এবং ম্যাজিস্ট্রেট জাস্টিস অব দি পিস রূপে তাদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্যে প্রেরণ করলেই মাত্র সুপ্রীমকোর্ট সেই মামলার বিচার করতে পারতো। ১৮৭২ সনের ফৌজদারি কার্যবিধিতে মফস্বল আদালতকে বৃটিশ নাগরিকদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হলেও এদেশীয় বিচারকগণ তাদের বিচার করতে পারতো না । শুধু ১৯২৩ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইনে এদেশীয় বিচারকগণ কর্তৃক ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করার বাধা দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ নাগরিকগণ, অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিকগণ এবং আমেরিকান নাগরিকগণ দায়রা মামলায় ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান জুরিদের দ্বারা বিচারের দাবি করতে পারতো। তাদের এ অধিকার ১৯৪৭ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনামলে বলবৎ ছিল। শ্বেতাঙ্গ জুরি পছন্দ করার কৌশলের দ্বারা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান নাগরিকগণ প্রকৃতপক্ষে দোষী হওয়া স্বত্ত্বেও নির্দোষ বলে জুরিদের মতামতের ফলে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতো, কারণ জুরিদের মতামত বিচারকের উপর বাধ্যকর ছিল।

---

৫৬. জে, এফ, হলম্যান,ট্রাবল কেইসেস এন্ড ট্রাবললেস কেইসেস ইন দি স্টাডি অব কাস্টমারী ল এন্ড লিগ্যাল রিফরম", *দি ল এন্ড সোসাইটি রিভিউ*, সপ্তম খণ্ড, ৪ নং গ্রীষ্ম সংখ্যা জুন-আগস্ট, ১৯৭৩, ৬০২।

এভাবে ঔপনিবেশিক আমলে বিচার প্রশাসনে এক প্রকারে বা অন্য প্রকারে বর্ণবৈষম্য বলবৎ ছিল এবং তাদের বেলায় আইনের শাসনের কোন প্রয়োগ ছিল না।

১৮৩৭ সনে সরকারি ভাষারূপে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তিত হওয়ায় যেসব এদেশীয় লোক ইংরেজি জানতেন না বা শিখেন নি তারা অধস্তন সরকারি চাকুরি থেকেও বঞ্চিত হন। এমনকি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যেসব আইনজ্ঞ ফার্সি ও উর্দু ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা জানতেন না, তাঁরা আইন পেশা ও বিচার বিভাগীয় চাকুরি হারিয়ে সমাজে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন। পণ্ডিত, মৌলবি, মুফতি ও কাজীর মত আইন-উপদেষ্টাদের ১৮৬৪ সনে আইন ব্যাখ্যাকারীর পদ থেকে অপসারণ করে তাদের শবাধারে পেরেকের শেষ ঠোকা মারা হয়। ১৮৮০ সনের আইন দ্বারা চাকুরি থেকে অপসারিত কতিপয় কাজীকে মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক আইন ও বিচারব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, যারা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আইনজীবীগণ তাদের জীবিকার জন্যে খুব সামান্যই ঔপনিবেশিক শাসকদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা প্রধানত জমিদার ও অন্যান্য পেশাদার শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। তাই তাঁরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের তোয়াক্কা না করে দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে এবং তাদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে কাজ করতে পারতেন। তারা বাংলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন দাস, প্রমথ মিত্র, আবদুর রসূল, খাজা নাজিমুদ্দীন, জে. এম. সেন গুপ্ত, শরৎ চন্দ্র বসু কিরণ সঙ্কর রায় এবং এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর মত ব্যারিস্টারগণ এবং এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ নওশের আলী, তমিজউদ্দিন খান, শামসুদ্দিন আহম্মদ, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অখিল চন্দ্র দত্ত, কামিনী কুমার দত্ত, অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের মত এডভোকেটগণ, যাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সন্ত্রাসী বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি, স্বরাজ্য পার্টি, মুসলিম লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি যেসব আন্দোলনের সূচনা করেছিল তাতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন এবং সামাজিক ও বাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে দেশে আইন শিক্ষার বিস্তার ঘটায় বিচার বিভাগে বাঙালিদের অংশগ্রহণও বেড়ে যায়। এস. পি. সিনহা, সৈয়দ আমির আলী, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, স্যার আবদুর রহিম, নওয়াব শামসুল হুদা এবং অন্যান্য বহু বাঙালি আইনজ্ঞ উচ্চতর আদালতের বিচারপতি হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগে প্রভূত অবদান রাখেন। এস. পি. সিনহা ইংল্যাণ্ডের হাউস অব লর্ডসের সদস্য হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যও হয়েছিলেন। সৈয়দ আমির আলী হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যও হয়েছিলেন। প্রজাদের ভূমিস্বত্ব অর্জন, কৃষকদের দেয় ঋণ হ্রাস, বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন করে আইনজীবীগণ বৃটিশ

শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রভাব বিস্তার করেন। আইনজীবীগণ পাকিস্তান গণপরিষদে এবং পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রভাব বিস্তার করে দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে জনগণের অধিকার রক্ষায় বহুবিধ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন প্রণয়নে সাহায্য করেন, আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার জন্যে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন, জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং সমাজে বিচার প্রশাসনে পরিবর্তন সাধনের জন্যে অন্যান্য বহুবিধ আইন প্রণয়নে সাহায্য করেন। পাকিস্তানের সংবিধান নাগরিকদেরকে শুধু মৌলিক অধিকারই প্রদান করে নি, বরং হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টকে প্রিরগেটিভ রিট জারি করার কর্তৃত্ব প্রদান করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যবস্থা করে।

আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অপরাধীদের অঙ্গহানি ও শিরচ্ছেদের মত নিষ্ঠুর ও মানহানিকর প্রথা, সতীদাহ প্রথায় বিধবাদের জলন্ত আগুনে পুড়ে মারা, দাসপ্রথা, বঙ্গোপসাগরের সাগরদ্বীপ থেকে বা অন্য স্থান থেকে সাগরে শিশু নিক্ষেপ করার প্রথা, কন্যাশিশু হত্যা এবং শিশুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, বর্ণপ্রথা বিলোপ, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণ, সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার সংরক্ষণ, বিবাহিতা হিন্দু মহিলাকে পৃথক আবাস প্রদান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকার প্রদান এবং বিবাহিতা মুসলিম মহিলার আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রদানের সকল কৃতিত্ব ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রাপ্য। ভূমিতে বিভিন্ন স্তরের ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি করে প্রণীত আইন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়নের ফলে গ্রামীণ সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। আইন ও বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তন, রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক শক্তির সক্রিয়তা, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ও যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদির ফলে নগরায়ণের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিশীল হয় এবং গ্রামবাসীদের শহরে গমন ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, যা অতীতে ঘটে নি। উপরোক্ত শক্তিসমূহের সক্রিয়তার কারণে যৌথ পরিবারব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারব্যবস্থার উত্থান ঘটে। এভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে প্রধানত প্রথাগত গতানুগতিক এবং মধ্যযুগীয় সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাশাসিত সমাজ থেকে একটি ঐতিহ্যবন্ধনে আবদ্ধ, বর্ণপ্রথায় শাসিত এবং মর্যাদাসচেতন সমাজ ক্রমান্বয়ে তুলনামূলকভাবে মুদ্রা অর্থনীতিশাসিত ও চুক্তিভিত্তিক সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্কনির্ভর একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়, যা ঔপনিবেশিক শাসকগণ কর্তৃক এদেশবাসীদের শোষণ অক্ষুণ্ন রাখার জনেই তাদের প্রবর্তিত আইন ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৬২ সন থেকে ১৮৬৯ সন পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য এবং বহু আইন সঙ্কলনকারী স্যার হেনরি সুমনার মেইন সমাজের এরূপ পরিবর্তনকে "পদমর্যাদা থেকে চুক্তিবন্ধনের দিকে অগ্রসর হওয়া" বলে অভিহিত করেছেন।[৫৭]

---

৫৭. *এন্‌শেন্‌ট্‌ 'ল* (বোস্টন, ১৯৬৩) ১৬৫।

১৯

নারী ও সমাজ

সোনিয়া নিশাত আমিন*

নারীর মর্যাদার চিহ্নিত ক্ষেত্রাবলী ও নারী সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার (বিবাহ, পণ, বৈধব্য, সম্মতিপ্রদানের বয়স, বহুবিবাহের আনুষঙ্গিকতাসহ), ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি। নারীর মর্যাদার স্বরূপ অনুসন্ধানে এ কথা পরিষ্কারভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজের এহেন বিভাজন শুধু বৈশ্লেষিক সুবিধার মূল্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য করা হয়। সমাজের কোন কোন আদর্শগত বা আচরণগত উপাদান, যেমন, কোন সামাজিক মূল্যবোধ (নারীর পবিত্রতা বা সতীত্ব) অথবা কোন সামাজিক রীতি (পর্দাপ্রথা) বহুবিধ উপায়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং সেই সাথে ধার্মিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমাত্রা গ্রহণ করতে পারে। আবার কোন এক বিশেষ সময়ে সব উপাদান একইভাবে বা একই গুরুত্ব বহন করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহপ্রথা, বিধবাবিবাহ এবং সম্মতিপ্রদানের বয়ঃসীমার সমস্যাবলী উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে সামাজিক পরিবর্তনের ঝড় তুলেছিল এবং এক গৌরবময় সংস্কারযুগের সূচনা করেছিল। এরই দ্বিতীয়ার্ধে নারী যখন 'আধুনিকীকরণে' সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে, তখন শিক্ষা প্রধান দাবিতে পরিণত হয়।

পর্দা ও নারী

সমীক্ষার আলোচ্য সময়ে পর্দাপ্রথা সর্বদাই একটা পরিব্যাপক সামাজিক রীতি হিসেবে বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা নারীর গতিরোধ করা হয়েছে এবং সমাজসংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রকৃতির প্রভাবকে খর্ব করা হয়েছে। ফার্সি ভাষায় 'পর্দা' শব্দের অর্থ যবনিকা বা অবগুণ্ঠন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় সামাজিক রীতি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হিসেবে পর্দাপ্রথা নারীকে আলাদা করার এবং নারীর শালীনতা নিয়ন্ত্রণ করার এক অধিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার পথকে রুদ্ধ করার মধ্যে পর্দাপ্রথার কঠোর বৈশিষ্ট্য নিহিত। ব্যতিক্রম শুধু কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র, যা আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

একটি সাংস্কৃতিক অধিষ্ঠান হিসেবে (বহুবিধ ধারণা ও আচরণ এবং মূল্যবোধের জটিল সংমিশ্রণ হিসেবে) পর্দাপ্রথা[১] নারীকে তার ঘরের বাইরে যেতে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয় এবং জনসমাগমক্ষেত্রসমূহে নারীর উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে থাকে শুধু পুরুষেরই অধিকার। মোদ্দাকথা, নারীর গতিবিধি তার পরিবারের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। আদর্শে ও আচরণে পর্দাপ্রথা নারীর যৌনতা, সতীত্বস্খলন, পবিত্রতা ও প্রজননের উপর পাহরাদারি ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্যই এই ধরনের ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে, যেখানে কিনা শিশুর প্রাকৃতিক (biological) পিতৃত্ব সমাজে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করার বিষয়ে পর্দাপ্রথার ভূমিকাই এখানে প্রাসঙ্গিক, যদিও পর্দাপ্রথা প্রয়োগের ধরন ও তীব্রতা সম্প্রদায়, শ্রেণী, বলয়, সংস্কৃতি ও সময়ের তারতম্যে ভিন্ন।

শিক্ষা ও নারী

সাধারণত যেকোন ধরনের নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠানগত বিদ্যার্জনকে 'শিক্ষা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এই আখ্যায়নের পরিধি পর্দাপ্রথার মতোই ব্যাপক এবং ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা ভিন্ন অর্থ বহন করেছে। আঠারো শতকে 'শিক্ষার' অর্থ ছিল শাস্ত্রীয় জ্ঞান, লেখা ও পড়ার সক্ষমতা বা বড়জোড় হিসাব রাখার বা কবিতা লেখার বা ইতিহাস লেখার সক্ষমতা। এই শেষোক্ত ক্ষমতাগুলি অবশ্য সীমিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হতো। মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানার্জনের মাত্রার বাইরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মতো মুক্তবিদ্যার বিষয়ে জ্ঞানার্জন নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো না।

উনিশ শতকে সুরুচিসম্পন্ন ও সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের সাথে 'শিক্ষা' যুক্ত হলো এবং এর ব্যাপকতা সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক বিবেচিত হলো। বিশ শতকে কর্মসংস্থানের

---

১. দক্ষিণ এশিয়ায় পর্দাবিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, Patricia Jeffery, *Frogs in a Well Indian Women in Purdah,* (New Delhi 1979); Hanna Papanek, "Purdah : Separate Worlds and Symbolic Shelter" in Hanna Papanek and Gail Minault (eds.), *Separate Worlds Studies of Purdah in South Aisa,* (New Delhi 1982); Milly Cattell, *Behind the Purdah,* (Thacker & Co. 1916), (this book discusses purdah among Hindu women); Mushir Hosain Kidway, *Harem, Purdah or Seclusion,* (Lahore 1920) (this book is a defense of purdah). and Attia Habibullah, "Seclusion of Women", in Shyam Kumari (ed.), *Our Cause*, (Allahabad 1938).

অবশ্যপূরণীয় শর্ত হিসেবে 'শিক্ষা'র নতুন অর্থ দেখা দিল এবং তা জন্মগত অধিকারের অঙ্গরূপে গণ্য হলো।

এই সমীক্ষার কাঠামো ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য সময়ে নারীর ভূমিকার সূচক ও নির্ধারক হিসেবে 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' এই দুই উপাদানকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই সেই ঘটনাবলী ও মনোবৃত্তির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যেগুলি এই দুই সমস্যাকে ঘিরে বিরাজমান এবং যেগুলি আলোচনা, বিশ্লেষণ ও কর্মধারার বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' 'প্রিজমের' মতো কাজ করে গত কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়। উপক্রমণিকা ব্যতীত এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় আরও তিনটি ভাগ রয়েছে, যা মোটামুটিভাবে সময় ও মূল সুরের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়েছে। এ তিনটি ভাগ হচ্ছে—

ক. আঠারো শতক : ব্যতিক্রমের কাল

খ. উনিশ শতক : পুনর্জাগরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ পর্যায়

গ. বিশ শতক : স্বাধীনতার সংগ্রাম

আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত বাংলার 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' সম্পর্কিত প্রধান ঘটনাবলী ও মনোবৃত্তি সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরেও প্রবেশ করা হয় নি, যদি না শিথিলভাবে শুধু ঘটনাপ্রবাহের জন্য সেসব উল্লেখের আবশ্যকতা থাকে। আলোচিত কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বিশেষ ঘটনাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রচলিত আলোচনার সাথে যুক্ত করার মতো কোন নতুন তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কারের সুযোগ থাকতে পারে, এরকম ক্ষেত্রে কোন কোন সময় প্রাথমিক তথ্যও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিরেট বাস্তব বিষয়াবলীর প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার বা উল্লেখেরও চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়াদি পরস্পর সমন্বিত বিধায় ঘটনাবলী পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা কঠিন। তাই উপস্থাপিত 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' বিষয় দুটি সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে।

এই সমীক্ষার শিরোনামের অধীনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু আলোচনাকালে প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর, যা রাজনৈতিকভাবে বর্তমান বাংলাদেশ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ইতিহাস সঙ্কলনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে বলেই সেটা করা হয়েছে। বাংলার অন্যভাগে, যা বর্তমানে পশ্চিম বাংলা নামে পরিচিত, সেখানে নারীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এই বিষয়ে বহু সমীক্ষাও বিদ্যমান। এই কারণে যেখানেই সম্ভব হয়েছে, সেখানেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি সচেতনভাবে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুই

ক. আঠারো শতক : ব্যতিক্রমের কাল

নারীঅবরোধের (পর্দাপ্রথার) উৎস

ভারতীয় নারী বিষয়ক ঐতিহাসিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, নারীর মর্যাদার উত্থান ও পতনের সুনির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মোটামুটি বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারতে নারী যথেষ্ট উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈদিক যুগের পরে এই অবস্থানের অবনতি ঘটে। পৌরাণিক শাস্ত্রজ্ঞ মনুর প্রদত্ত বিধান থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় : "জীবনের কোন পর্যায়েই নারীর জন্য কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" এই অবস্থা মুসলিম বা মধ্যযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, নারীকে অধীনস্থ করে রাখার ইসলামী রীতি এই ব্যবস্থাকে জোরদার করে। আবার অন্য মনীষীরা[২] উল্লেখ করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের আগেও হিন্দুদের মধ্যে পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। তাই ইসলামী প্রভাবেই নারীমর্যাদার অবনতি ঘটেছে—এই দাবি ইতিহাসসিদ্ধ নয়।

একথা সর্বজনবিদিত যে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সামাজিক কাঠামো দ্বারা সীমিত। এই সামাজিক কাঠামোই পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা বলবৎ করে আর শিক্ষার সুযোগ যদি থেকেও থাকে, সেখানে নারীর প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ করে দেয়। যদিও এলাকা ও সম্প্রদায়ের তারতম্যে পর্দাপ্রথার রূপও ভিন্ন হয়[৩], কিন্তু সব সম্প্রদায়ের, সব এলাকার এবং সব যুগের নারী এই প্রথা মোটামুটিভাবে মেনে চলেছে। "নারী-ভূমিকাকে পরিবেষ্টনকারী অন্যান্য প্রথা জাত... শ্রেণী ও এলাকা ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ছিল এবং ভারতের সকল নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ছিল না।"[৪]

অবরোধপ্রথা ভারতে কখন চালু হয়েছিল তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় পর্দাপ্রথার বিধান সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে, যদিও এই প্রথা প্রচলনের সূত্র হিসেবে প্রায়ই কোরানের কোন কোন আয়াত উল্লেখ করা হয়। আবার এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অনেকে ভিন্নভাবে করেন এবং এই অভিমত পোষণ করেন যে, সার্বিকভাবে অবরোধ এবং পৃথকীকরণের ব্যবস্থা প্রচলন করা কোন ক্রমেই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।

---

২. Shahida Lateef, *Muslim Women in North India*, (New Delhi 1990), 78. ইসলামের পূর্বে পর্দাপ্রথার অস্তিত্বের বিষয়ে লতিফ বলেন, "পর্দাবিষয়ের উপর এক প্রবন্ধে কে. কে. স্বামী বর্ণনা দিয়েছেন যে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে ইসলামের আগমনের বহু পূর্বেই প্রথাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল এবং এর সমর্থনে *রামায়ণ*, *পুরাণ* ও *মহাভারতে* ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

৩. শাহিদা লতিফ এই মত পোষণ করেন যে, দাক্ষিণাত্যের চেয়ে উত্তর ভারতে পর্দাকে অধিকতর রীতিমাফিক মান্য করা হয়। দেখুন, ঐ।

৪. ঐ, 75.

তাহলে একথাই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে, পূর্ব থেকেই বিরাজমান নারী অবরোধপ্রথাসমূহ মুসলিম আমলে শুধু আরো জোরদার হয়েছিল।

বাঙালি নারী বিষয়ক সমীক্ষা এবং সমসাময়িক বিবরণ

আলোচ্য সময়ে নারীর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে কালীকিংকর দত্ত ও আবদুর রহিম[৫] উভয়েই একই উৎস ব্যবহার করেছেন, যেমন সমসাময়িক পারসিক বিবরণ—*রিয়াজ-উস-সালাতিন, সিয়ার-উল-মুতাখেরিন, খুলসাত-এ তাওয়ারিখ, বাহারিস্তান-ই-গায়েবী;* কিছু বিদেশীদের লেখা বিবরণ এবং সমসাময়িক সাহিত্য (প্রধানত ভারতচন্দ্র)। তা সত্ত্বেও তাঁদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ ভিন্ন ছিল। দত্ত হিন্দু নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন; রহিম দৃষ্টি দিয়েছেন মুসলিম নারীর প্রতি। অপরদিকে মিসেস গ্রে[৬] বিদেশীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

আঠারো শতকের ভারতে বিদ্যমান পর্দাপ্রথা ও রীতির সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব নয়। গ্রের মতে, আঠারো শতকের শেষভাগে ভারতে প্রায় চার কোটি নারী পর্দাপ্রথায় আবদ্ধ ছিল।[৭] রাজকীয় ও ধনী পরিবার নারীদেরকে অবরোধে রাখতো, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও পর্দাপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আপাতবিরোধী মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায় যে, উচ্চশ্রেণীর মহিলারাই সামাজিক অঙ্গনে যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো এবং সামাজিক কার্যক্রমে অধিকতরভাবে অংশগ্রহণ করতো। সব ঐতিহাসিকই এই সময়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে বিরাজমান পর্দাপ্রথার উল্লেখের চেয়ে সামাজিক কার্যক্রমে কতিপয় নারীর (অধিকাংশই অভিজাত সম্প্রদায়ের) ভূমিকার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এতে নারীর স্বাধীনতা যে সীমিত ছিল, তাই প্রমাণিত হয়।

সাধারণ হিন্দু নারী জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে পবিত্র অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় জীবনযাপন করতো। ধর্মীয় পূজা-অর্চনা এবং সতীত্ব তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ছিল। পতির সেবার জন্যই নারী আদিষ্ট ছিল এবং সে তার আদেশ কখনই অমান্য করতো না।[৮]

পোশাককে যদি পর্দাপ্রথার একটি নির্দেশক হিসেবে ধরা যায়, তবে এই বিষয়ে সমসাময়িক ইতিবৃত্তে অনেক চমৎকার বিবরণ দেখা যায় (বিবরণে অনেক ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে)। গোলাম হোসেন সেলিম লিখেছেন :

---

৫. M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol. II, 1576-1757, (Karachi 1967).

৬. Mrs. Gray, "The Progress of Women" in L. S. S. O'Malley (ed.), *Modern India and the West,* (London 1941).

৭. ঐ, 449.

৮. মনুর নির্দেশাবলীর সাথে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন সাহিত্য-কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে ভারতচন্দ্র থেকে গৃহীত দৃষ্টান্তের সাহায্যে কে. কে. দত্ত এ বর্ণনা দেন।

> উচ্চ এবং নিম্ন উভয় শ্রেণীর পুরুষ এবং নারীর পোশাক ছিল এক প্রস্থ কাপড়, যা দিয়ে শুধুমাত্র গুপ্তাঙ্গগুলো ঢাকা যেতো... । নারীরা যে এক প্রস্থ কাপড় পরিধান করতো তাকে শাড়ি বলা হতো, যার অর্ধেকটা দিয়ে নাভি থেকে নিচে পা পর্যন্ত জড়িয়ে রাখা হতো এবং বাকি অর্ধেকটা ঘাড় পেঁচিয়ে বা পার করে রাখতো। তারা মাথা খোলা রাখতো এবং অন্য কোন পোশাক পরতো না। এমনকি, জুতা বা মোজাও পরতো না ... । বাঙালি নারীরা পর্দাপ্রথা মান্য করতো না এবং রেচন কর্মে এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজে বাড়ির বাইরে যেতো।[৯]

এই সময়ে বাংলাদেশে ভ্রমণকারী ইতালীয় পর্যটক ম্যানরিক এদেশীয় পোশাকের এক প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে গেছেন। তাঁর বিবরণে জানা যায়, নারীরা ১৮ থেকে ২০ বিঘত লম্বা সুতী কাপড়ে এবং পুরুষেরা ৭ থেকে ৮ বিঘত লম্বা কাপড়ে তাদের শরীর ঢেকে রাখতো। নারীদের ব্যবহৃত গহনার বিবরণে তিনি বলেছেন, গলায়, মুখমণ্ডলে, হাতে ও পায়ের আঙ্গুলে নারীরা গহনা ব্যবহার করতো। মনে হয় ম্যানরিক সাধারণ মানুষদের কথাই উল্লেখ করেছেন।[১০] এই বিবরণে যে অসঙ্গতি দেখা যায় তা আংশিকভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে পর্দাপ্রথার ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্য। মুসলিম নারী সারা জীবন ধরে পর্দাপ্রথা মেনে চলতো। কিন্তু হিন্দু নারীর বেলায় বিবাহোত্তর জীবনেই পর্দাপ্রথার প্রয়োজন বেশি ছিল।

পুরুষের কাছে নারীর অধীনতা প্রসঙ্গে দত্ত তাঁর নিবন্ধের এক পাদটীকায় বলেছেন যে, নারীরা সাধারণত তাদের স্বামীর আদেশ-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং স্বামীর মত গ্রহণ না করে কোন কাজ করতে পারতো না। তারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকতো এবং তাদের জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসার অনুমতি দেয়া হতো না। ভেরেলস্ট এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, "নারী-অবরোধ এমন এক আইন যার পরিবর্তন করা যায় না। সমগ্র ভারতে এই প্রথা সুনিশ্চিতভাবে বিদ্যমান এবং জনসাধারণের ধর্ম ও লোকাচারের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। নারীকে দৃষ্টিগোচর করানো যে চরম অসম্মানজনক কাজ সে বিষয়ে হিন্দুরা মুসলিমদের চাইতে কম ভীত ছিল না।"[১১]

নারীরা যে পর্দা মেনে চলতো সেকথা এম. এ. রহিমও সমর্থন করেন, "মুখ বা মাথা খোলা রেখে নারীর জনসমক্ষে উপস্থিতি হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অসম্মানজনক মনে করতো।"[১২] তথাপি বিদেশীদের সমসাময়িক ইতিবৃত্তে নারীর কেশবিন্যাসের ধারা এবং অলঙ্কারের বিবরণ এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে নারীরা বিশেষ বিশেষ সময়ে দৃশ্যমান ছিল।

---

৯. Ghulam Hussain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, (translation by Abdus Salam 903), 22.

১০. উদ্ধৃত A.C.Roy in *History of Bengal-Mughal Period*, (Calcutta 1968), 468.

১১. উদ্ধৃত, Dutta, "Position of Women", 244.

১২. Rahim, *Social and Cultural History*, 236.

অতএব দেখা যাচ্ছে, আঠারো শতকের বাংলাদেশে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আমরা পাই। এই বিভ্রান্তি কিছুটা দূর হতে পারে যদি বর্তমান কালের সমীক্ষা এবং বিশ্লেষণের দিকে নজর দেয়া হয়। পাপানেক[১৩] উল্লেখ করেন যে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল অভিন্ন, শুধু প্রকাশভঙ্গিতে তা পৃথক ছিল। মুসলিম পর্দাপ্রথার আবশ্যকতা একান্ত স্বজনদের মধ্যে আরোপ করা হতো না। এ ছিল বাইরের লোকদের জন্য। পক্ষান্তরে হিন্দু পর্দাপ্রথা নারী ও তার বৈবাহিকসূত্রে পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিহারের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রথার বিধান রয়েছে। সতর্কতার সাথে কেউ এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে পর্দাপ্রথা সামাজিক বিধির এক অখণ্ড উপাদান, যা শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের নিম্নাংশের জন্য (বিশেষত গরিব) শিথিল ছিল, কিন্তু মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর জন্য বেশ কঠোর ছিল। এ কথাও আবার সত্য যে উচ্চ শ্রেণীর নারীরাই মাঝে মধ্যে পর্দার বাঁধন ছিন্ন করতো।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে নারীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এম. এ. রহিম বর্ণনা করেছেন। সাধারণত তারা ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল, তারা হারেমের অবরোধে জীবনযাপন করতো। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাদের ছিল না (শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণী ব্যতীত) এবং অন্তঃপুরের সীমানার মধ্যেই তাদের কর্মজীবন সীমিত ছিল। হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদার তুলনায় রহিম মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদার বিষয়ে স্পষ্টত পক্ষপাতিত্ব করেন। যেকোন ব্যক্তিই লক্ষ্য করবেন যে, তাঁর লেখায় কোন এক বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে পুরো বিষয়টা যুক্তিগ্রাহ্য বা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত এই ধরনের দৃষ্টান্ত এবং ইচ্ছামতো প্রদত্ত উদ্ধৃতি যেকোন দিকেই প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণের সহায়ক হয় না। মোদ্দাকথা, এই ভিন্নতা ছিল মাত্রায়, প্রকারে নয় এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীকেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পবিত্রতা ও পর্দাপ্রথার নিগড়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকতে হতো।

এযুগের কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী নারী

আলোচ্য সময়ে সমাজের উচ্চস্তরের কতিপয় অসাধারণ মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহিলাদের উদ্দীপনা ও তেজস্বিতা দেখে অভিভূত হতে হয়। এই ধরনেরই এক মহিলা ছিলেন. উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্নর সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুননিসা, যিনি স্বামীর লাম্পট্যের কারণে তার সঙ্গে একসাথে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তিনি সুবিধামতো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন বলেও জানা যায়। উড়িষ্যার আর এক ডেপুটি গভর্নর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী দুর্দানা বেগম আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সমসাময়িক লেখকদের ধারণা, জনসাধারণ

---

১৩. Papanek, "Purdah".

দুর্দানা বেগমকে তাঁর স্বামীর চাইতেও বেশি শ্রদ্ধা করতো। মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরফুননিসা বেগম তাঁর স্বামী আলিবর্দী খাঁর সাথে ছিলেন। আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং সিরাজের খালা ঘসেটি বেগমও একজন শিক্ষিতা, প্রতিভাময়ী এবং নির্ভীক মহিলা ছিলেন এবং তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর সুবার দেওয়ান নিযুক্ত হন। মন্নুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩) হাজি মোহাম্মদ মোহসিনের বোন। তিনিই জমিদারি দেখাশুনা করতেন। মোহসিন ট্রাস্ট ফান্ড তাঁর সৃষ্টি। বাংলাদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ প্রখ্যাত মহিলাদের দৃষ্টান্ত আছে।[১৪] মীর জাফর আলি খানের স্ত্রী মুন্নি বেগম ওরফে 'কোম্পানির আম্মা'[১৫] সার্দানার বেগম সমরুর[১৬] মতোই বিখ্যাত ছিলেন।

কতিপয় হিন্দু রমণীরও বিবরণ আছে, যাঁরা নির্ভরশীলতা ও অবরোধের প্রাচীর অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এরকম বিখ্যাত কতিপয় রমণীর বিবরণ দত্ত প্রদান করেছেন। নাটোরের রানী ভবানী এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। যোগ্য জমিদার হিসেবে তিনি তাঁর বিশাল জমিদারি বেশ ভালভাবে এবং প্রজ্ঞার সাথেই পরিচালনা করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাঁর দয়া ও ব্যাকুলতা বাংলাদেশে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়। একটু কম পরিচিতি থাকলেও একই ধরনের তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন রংপুরের জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী। তিনি ঐ অঞ্চলের অপর এক জমিদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্যান্য জমিদার ও রায়তদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আঠারো শতকের আর এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেবী চৌধুরানী। জয়দুর্গার মতো তিনিও ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বদেশী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আঠারো শতকের এক আকর্ষণীয় ব্যাপার এই যে, দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা ও তেজস্বিতা প্রদর্শনের জন্য নারীকে তখনও 'রায় বাঘিনী' উপাধি দেবার রাজকীয় প্রথা বিদ্যমান ছিল। ষোলো শতাব্দীতে আকবর বাংলাদেশের ভবশঙ্করীকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন; তাঁর নেতৃত্বে আফগান আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব সাবিত্রী বাঈকে এই উপাধি দিয়েছিলেন; তিনি সাবিত্রী বাঈকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মূল ধারার বাইরের নারী

এই সময়ে বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক নারীর মধ্যে এমন সুখ্যাতি ও কর্মক্ষমতা যদিও অচিন্তনীয়, তবুও সাধারণ নারীদের কিছু অংশ সামান্য মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ

---

১৪. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Ghulam Hussain Khan Tabatabai *Seir-ul- Mutakherin*, Translation by John Briggs, (Madras,831). মন্নুজানের জন্য দেখুন, Shirin Akhtar, "Mannujan Khanam:An unrecognised Benefactor", Clio, Jahangirnagar University, Vol. viii, 1990.

১৫. Brojendranath Banerjee, *Begams of Bengal*, (Calcutta 1942).

১৬. George Huddleston's "A Calcutta Benefactoress", in *Bengal Past and Present*, 1:2 (1907).

করতো। তবে মূলধারার জীবনের মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রা এই অংশকে 'সামাজিক সম্ভ্রম'-এর সীমানার বাইরে অন্য এক জগতে নিক্ষেপ করে তাদের 'সমাজ'-এর বাইরে স্থান দিয়েছিল। এই দলের মধ্যে রয়েছে শিল্পকলা পরিবেশনকারী নানা পেশার দল, নৃত্যশিল্পী এবং 'দরবার'-এর রাজনর্তকী ও 'বাঈজী'। রাজনর্তকীদের জীবনধারার উপর ইদানিং বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। অভিজাত পুরুষের জগৎ 'কুঠি' ও 'কোঠা'য় বিভক্ত ছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল নারী দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এদের একটি ছিল পবিত্র গৃহের পরিবেশ এবং অপরটি ছিল প্রেম, মোহ এবং আনন্দের উত্তেজনাময় জগৎ। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই 'পবিত্রতা' রক্ষা ও 'আনন্দ' পরিবেশন করার ভার ছিল নারীর উপর।

এরপর ছিল বৈষ্ণবধর্মীয় নারী (বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মবিশ্বাসী), যাদের জীবনধারা 'ভদ্র' মূলধারার হিন্দু নারীর জীবনধারা থেকে অনেক শিথিল ছিল। সেখানে নারী অধিকতর স্বাধীনতা, এমনকি যৌন স্বাধীনতাও পেতো। বৈষ্ণব সমাজ এই ধরনের বিকল্প জীবনধারা অনুমোদন করেছে (হয়তো বা বিকল্প সামাজিক ধারাকে গোটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কার্যকরভাবে অঙ্গীভূত করার একটি প্রয়াস হিসেবে)। কে. কে. দত্ত এই নারীদেরকে 'কতিপয় কলঙ্কিত নারীচরিত্র' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যারা ঐ যুগের কবিগণের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছিল, যেমন ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ 'হীরা' বা রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর*-এ 'বিদুবামনী'। এই বিষয়ে দত্তের মন্তব্য, "এরা খুব সম্ভব ছিল জনপ্রিয় সহজিয়া ধর্মের বা অধঃপতিত তান্ত্রিক অর্চনাপ্রথার কুপ্রভাবে প্রভাবান্বিত কতিপয় পতিতা মানবীর সম্ভ্রান্ত চিত্রায়ন।"[১৭] চৌহদ্দির বাইরে অবস্থান ছিল সাঁওতাল ও অস্পৃশ্য উপজাতির। সবাই এ বিষয়ে একমত যে 'পারিয়া' নারী এখনকার মতো তখনও পর্দাপ্রথা বা সতীত্বের কঠোর বিধান মেনে চলতো না বা তারা মান্য করবে এ আশাও করা হতো না। সামান্য কয়েকটি সমীক্ষায় স্বল্প সংখ্যক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির বাধা ডিঙিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ করেছে। এইচ. ডব্লিউ. বি মরেনো[১৮] ভারতীয় এমনসব নারীর তালিকা দিয়েছেন, যারা পাশ্চাত্যের পুরুষকে বিবাহ করে এবং এর ফলে নিজ সম্প্রদায় থেকে জাতিচ্যুত হয়।

শিক্ষার সনাতন পদ্ধতি

বাংলাদেশের জন্য কোম্পানির শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডি. পি. সিংহ[১৯] বলেছেন যে, বৃটিশ রাজত্ব শুরু হবার আগে এক স্বদেশী ও সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি বিরাজমান ছিল। ব্রাহ্মণরা গ্রাম্য 'টোলে' শিক্ষাদান করতো এবং মুসলিমদের শিক্ষালয়

---

১৭. Dutta, "Position of women", 26.

১৮. H.W.B. Moreno "Woman's Place in the Anglo-Indian Community", *Muslim Review*, No. 1, 1929.

১৯. D. P. Sinha, *The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854*, (Calcutta 1964).

ছিল মাদ্রাসা। এগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার স্থান। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল 'পাঠশালা' ও 'মক্তব', যেখানে যথাক্রমে 'গুরু' ও মৌলবিরা এলাকার শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান দান করতেন। শুধু বালকেরাই এই ধরনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিত।[২০] মেয়েদের জন্য যেকোন রীতিমাফিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অজ্ঞাত। উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে[২১] বলেছেন যে, মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না, কিন্তু জমিদারগণ কোন কোন সময় বাড়িতে তাঁদের কন্যাদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তিনি আরও বর্ণনা দেন যে, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জন্য অধিকাংশ ভারতীয় তাদের মেয়েদেরকে শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিল না, অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সামর্থ্যই ছিল না।

ইসলাম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় রহিমের মতে মুসলিমদের আগমনে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির বন্ধ দ্বার উন্মোচিত হয়। যদিও পর্দাপ্রথা মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে (মাদ্রাসায়) শিক্ষাগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে, তথাপি মক্তব ও পাঠশালায় মেয়েরা ছেলেদের সাথেই লেখাপড়া করতো। মুগল ধারাকে অনুকরণ করে বাংলাদেশের কতিপয় শিক্ষিত সুলতান, নবাব এবং সুবাদার 'জেনানা' বা অন্দরমহলে (মহিলাদের অন্তঃপুর) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই এই ধরনের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থার কথা এ্যাডাম উল্লেখ করেছেন।

নারীদের বিদ্যাচর্চা ও সৃষ্টিশীল রচনা

উপরে উল্লেখিত বিখ্যাত মুসলিম মহিলাবৃন্দ, যাঁরা তাঁদের যোগ্যতা ও জ্ঞানের জন্য পরিচিত, তাঁরা ছাড়াও মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইরান দুখ্ত (বিবি পরী)[২২] এবং তুরান দুখ্ত (বিবি বিবান) নাম্নী শায়েস্তা খানের কন্যাদ্বয়, যাঁরা খুবই পরিমার্জিত ও জ্ঞানী ছিলেন। এ রকম কাহিনীও আছে যে, মালিকা নামের এক মুসলিম বালিকা ঘোষণা করে যে, যে পুরুষ তাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে তাকেই সে বিবাহ করবে। অনেকের ভাগ্যপরীক্ষা শেষ হবার পর জনৈক আবদুল হালিম গাজী বিজয়ী হলে সে তাকে বিবাহ করে। তবে যে সামান্য সাক্ষ্য রয়েছে তাতে এই ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য সময়ে মুসলিমদের মধ্যে নারীশিক্ষা প্রধানত গৃহশিক্ষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। বয়স্কা মহিলারা জেনানার কঠোর

---

২০. এই ধরনের শিক্ষা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। সিনহার মতে, অভিজাত শ্রেণী তাদের শিশুদেরও বাড়িতে পড়ানো পছন্দ করতো।

২১. W. Adam, *Report on Education*

২২. ঢাকার লালবাগ ফোর্টে কবর দেয়া হয়।

অবরোধের মধ্যে শিক্ষাদান করতেন, যার মধ্যে কোরান, হাদিস ও নীতিকথার উপর বেশি জোর দেয়া হতো।

মুসলিমদের মধ্যে 'পুঁথি'র আকারে এদেশের সাহিত্যের এক শক্তিশালী ধারা প্রবহমান ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগের এ সৃষ্টি বিশ শতকেও বহুল প্রচলিত ছিল। ১৯৫০ সালে *পদ্মাবতী* পুঁথি এবং এর রচয়িতার[২৩] আবিষ্কার বাংলা ভাষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বড় ঘটনা। সাহিত্য জগৎ এ কথা জেনে রোমাঞ্চিত হয় যে, ঐ পুঁথি রহিমুন্নেসা নামের এক মহিলার রচনা। তিনি চট্টগ্রাম জেলার কোন এক গ্রামে ১৭৬৩ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রহিমুন্নেসা বাড়িতে তাঁর মায়ের কাছে লেখাপড়া শেখেন। পরে তিনি একজন পুরুষ 'গুরু'র (শিক্ষক) কাছে লেখাপড়া শেখেন, যাঁর প্রতি তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। চারদিকের গ্রামীণ কৃষ্টি এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যে নতুন রচনাশৈলীর প্রসার ঘটছিল তার চিহ্ন রহিমুন্নেসার সাহিত্যকর্মে দেখা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র পরিচিত মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নেসা সবদিক দিয়েই 'বাঙালি' কবি ছিলেন। এ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কারণ, পরবর্তীকালে আরবি-ফার্সি সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম মহিলাদের কৃত সাহিত্যকর্মের বিরাট অংশ ছিল উর্দু ও ফার্সি ভাষায়।

হিন্দু রমণীদের বেলায় অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই রকম ছিল। দত্ত এবং রহিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে নারীশিক্ষা অপরিচিত ছিল না। হিন্দু ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় পড়তে যেতো। সাধারণত এগুলি কোন ধনী লোকের বাড়িতে বা গুরুগৃহের কোন গাছতলায় অবস্থিত ছিল। (কিন্তু উপরোল্লেখিত পি. সি. সিংহের অভিমত এর বিপরীত)। কোন কোন সময় মক্তব ও পাঠশালা একই সাথে ছিল। বিয়ের পর হিন্দু মেয়েদের পর্দা অবলম্বন শুরু হয় বলে তখন থেকে তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো এবং সত্যিকার অর্থে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার উপরে কখনও যেতে পারে নি। তথাপি আঠারো শতকের ইতিহাস ঘিরে রয়েছে ময়নামতি, লীলাবতী, রানী ভবানী প্রমুখ মহিলার নাম, যাঁরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একজন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত রমণী হিসেবেই ভারতচন্দ্রের এবং রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দরী* চিত্রায়িত। কবি জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী নিজেও একজন খ্যাতনাম্নী কবি ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাকার সাথে ১৭৭২ সালে যৌথভাবে 'হরিলীলা' রচনা করেন।

গ্রামাঞ্চলেও মহিলা কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ওয়ার্ডকে অনুসরণ করে দত্ত হাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাতি এক বাঙালি নারী, যিনি হাতি বিদ্যালঙ্কার নামে পরিচিতা

---

২৩. প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, *'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, (ঢাকা ১৯৬৭), ১১।

ছিলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে তিনি বিধবা হন এবং পিতৃহীন থাকায় খুবই দুর্দশায় পড়েন। তিনি বারানসিতে চলে যান। সেখানে তিনি আইন ও ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন এবং শিষ্যদের গ্রহণ করতে শুরু করেন। এরকম আরো অনেকের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈরাগিনী ও সন্ন্যাসিনীবৃন্দ (জনপ্রিয় বৈষ্ণব ও অন্যান্য ধর্মের ভিক্ষুক) অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিতও হতেন। তাদের পাঠ্যসূচির মধ্যে ছিল কবিতা, সংস্কৃত, আইন (শাস্ত্র), গান-বাজনা, গার্হস্থ্য, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি।

গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ীর *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* গ্রন্থে অভিজাত পরিবারে নারীশিক্ষার বিদ্যমান্যতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে উল্লিখিত সমস্ত দৃষ্টান্ত এ বিষয়ই নির্দেশ করে যে সাধারণভাবে নারীশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে নি।

তিন

উনিশ শতক : পুনর্জাগরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ

উদার সংস্কার এবং নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

"হিন্দু রমণীর অবস্থা যে আলোকেই দেখি না কেন, তাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা অবলোকন করলে আমরা গভীর বেদনার সাথে দেখতে পাব যে সে অবস্থা খুবই শোচনীয়। অন্তঃপুরের চিরন্তন কারাগারে বন্দি হয়ে দুঃখ ও অবরোধের মধ্যে কালাতিপাত করাই তার নিয়তি।"[২৪] ১৮৩৯ সালে 'সাধারণ জ্ঞান আহরণ সমিতির' (সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ)[২৫] কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় মহেশ চন্দ্র দেব এই কথাগুলো বলেন। এই সমিতি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সদস্যদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে সমাজের আমূল সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার ছিল। ১৮৩০ সালব্যাপী নারীর অবস্থার উন্নয়নের দাবিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' খুবই আবেগপ্রবণ এবং ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়েছে। এরাই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য মতাদর্শের ভাবগ্রাহী হয় এবং হয়ে উঠে সামাজিক পরিবর্তনের সর্বপ্রথম সমর্থক।

বৃটিশ ভারতে, বিশেষত বাংলায় উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নারীব মর্যাদা হানিকর নিপীড়নমূলক সামাজিক প্রথা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও যুক্তিবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতকে এক 'আধুনিক' রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে উনিশ শতকে উদার সংস্কারের এক মহান যুগের সূচনা হয়। বাংলায় এই আন্দোলনকে প্রায়ই 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' বা বাংলার নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়, যদিও শহুরে ভদ্রলোকদের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকেরই

---

২৪. Mahesh Chandra Deb, " A Sketch of the Condition of the Hindoo Women, Calcutta, 1839" in Goutam Chattopadhyay (ed.), *Awakening in Bengal,* (Calcutta 1965).

২৫. SAGK ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের এক সমিতি। এই গ্রুপ সামাজিক পরিবর্তনের আমুল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল।

মনে প্রশ্ন জেগেছে। যাই হোক, এ যুগের লক্ষ্য করার মতো প্রধান এক বৈশিষ্ট্য ছিল, সব সংস্কারকই নারীর ভূমিকা ও মর্যাদাকে ঘিরেই আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। নারীর সমস্যা সমাজের প্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই সময় নারীমুক্তি আন্দোলন উদারপন্থী এবং সংরক্ষণবাদী উভয় মনোভাব ও কার্যধারার সাথে যুক্ত ছিল। উপরন্তু সমকালীন নারী আন্দোলনে 'উদার উপযোগবাদী' ইউরোপীয় চিন্তা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং গতানুগতিক পুরুষশাসিত সামাজিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ—এ সমস্তের সংমিশ্রণ ঘটে। সংস্কারকগণ প্রথমেই সামাজিক সেসব অন্যায়ের প্রতিকারে এগিয়ে আসেন যেগুলো কোন না কোনভাবে পরিবার বা নারীর মর্যাদার সাথে জড়িত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের[২৬] সদস্যরাই সর্বপ্রথম সংস্কারপ্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন। এঁরা ছিলেন বাংলাদেশের নবউদ্ভূত শহুরে ভদ্রলোক, যাদের ইচ্ছা ছিল হিন্দুধর্মকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে তোলা। ব্রাহ্মরা ছিলেন ভদ্রলোক শ্রেণীর[২৭] আদর্শ প্রতিনিধি, যাঁদের চূড়ান্ত ভূমিকায় আধুনিক ভারত গড়ে উঠে।[২৮]

সংস্কারপ্রচেষ্টায় হিন্দু নারীদের বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ার কারণ হয়তো এই যে, (ক) হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ বাংলাদেশের সবচাইতে উন্নত সম্প্রদায় ছিল; (খ) তত্ত্বের দিক থেকে মুসলিম নারীরা সংস্কারকদের দাবিকৃত অধিকারগুলো আগে থেকেই ভোগ করছিল, যেমন বিধবাবিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার (অধিকন্তু এগুলো সমাজের এক বিশেষ স্তরের—উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সমস্যা); (গ) রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অবনতির দিকে যায় এবং তাদের পুনর্জাগরণ উনিশ শতক শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হয়।

প্রথম প্রথম 'ভদ্রলোক শ্রেণী' অনুভব করেন যে বহু কাঙ্ক্ষিত সংস্কারসমূহ পুরুষশাসিত পরিবারব্যবস্থাকে নতুন জীবন দেবে এবং সংরক্ষণ করবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমস্যাগুলি এক এক করে মোকাবেলা করা হয় এবং "এক একটা আইন পাশের দ্বারা"[২৯] এই সংস্কারের সফলতা নিশ্চিত করা হয়। সামাজিক সংস্কারের সকল দাবিই পরিবারকে সংশ্লিষ্ট করে এবং অনেক মনীষী মনে করেন যে তৎকালীন কিছু কিছু সংস্কারের চূড়ান্ত পরিণতি সংরক্ষণবাদকে জোরদার করেছিল।[৩০]

---

২৬. ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসের জন্য দেখুন, Sivanath Sastri, *A History of the Brahmo Community*, (Calcutta 1912)। এটি হচ্ছে একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মর বিবরণ। আবো দ্রষ্টব্য, David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, (Princeton 1979). পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের জন্য দেখুন, David Kopf, ঐ আরো দেখুন মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ (ঢাকা ১৯৮৬)।

২৭. John Broomfield এটিকে জনপ্রিয় করেন তাঁর *Elite Conflict in a Plural Society*, (Berkeley 1968) পুস্তকে।

২৮. David Kopf, *Brahmo Samaj.*

২৯. Kumari Jayawardene, *Feminism and Nationalism in the Third World*, (The Haguc 1982), 81.

৩০. Jayawardene, ঐ, Sangari and Vaid (eds.), *Recasting Women · Essays in Colonial History*, (New Delhi 1989).

প্রথমেই যে সমস্যাগুলির মোকাবেলা করা হয় সেগুলির মধ্যে ছিল সতীদাহ প্রথা এবং বিধবাবিবাহ। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), যাঁর উদার মনোভাব ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভার' মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে পুনর্গঠিত করতে উৎসাহ সৃষ্টি করে। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রায়ের এ আন্দোলন সফল হয় ১৮২৯ সালে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সরকার কর্তৃক এক আইন পাশের মাধ্যমে, যার ফলে সতীদাহ এক দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু এ আইনে 'সতী' শব্দের অর্থের কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল এবং সাঙ্গারি ও ওয়াইদ সম্পাদিত গ্রন্থে লতামনি এই অভিমত প্রদান করেন যে এই আইন পাশের পরেও সতীদাহের ঘটনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।[৩১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯১) বাংলার নবজাগরণের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণ্য করা হয় এবং তিনিই বিধবাবিবাহ বিষয়ে সর্বপ্রথম সার্থক বিজয়ী। সংবাদমাধ্যম এবং বৃটিশ প্রশাসনের সমর্থন পেয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১৮৫৬ সালে এক আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়, যা বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দেয়। কিন্তু সামাজিক প্রথা বা আদর্শ শুধু আইনের দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের দাবি কখনো গণসমর্থন পায় নি এবং সামাজিকভাবে বাস্তবেও পরিণত হতে পারে নি, যা এর প্রবক্তা চিন্তা করেছিলেন। ভারতে পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা মুসলিমদের মধ্যে সর্বস্তরে এবং হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ বা শ্রেণীতে প্রচলিত ছিল। মুসলিমদের বেলায় চারটি এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের বেলায় অগণিত স্ত্রী রাখার অনুমোদন ছিল। একজন হিন্দু কুলপতি তার নাবালিকা কন্যাকে বয়োবৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী একজন কুলীনের কাছে বিনাদ্বিধায় বিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল শুধু তার কাছে কোন অবিবাহিতা কন্যা রাখার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এমনকি এ ধরনের বিবাহ যদি তার কন্যার বৈধব্যকে ত্বরান্বিত করতো, তবুও। এই কুলীনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কারক এবং সেই সাথে নাট্যকার ও সাহিত্যিকবৃন্দ এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭০ সাল অবধি এ আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ সরকার প্রচলিত প্রথায় খুব বেশি হস্তক্ষেপের বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকায় এ বিষয়ে কোন আইন পাশ হয় নি।

সতীদাহপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহে নিষেধাজ্ঞার বিধানগুলি সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের প্রভাবিত করতো। কিন্তু বাল্যবিবাহ সকল বর্ণ এবং শ্রেণীতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা ধর্ম এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতার জন্য এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা ধনীদের হাত থেকে কন্যাকে রক্ষার উপায় হিসেবে এই প্রথা মেনে চলতো। এই প্রথার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং বিদ্যাসাগর এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭২ সালে বিবাহ আইন পাশের ফলে এই আন্দোলনে কিছুটা সফলতা দেখা যায়, যেখানে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের বেলায় ১৪ এবং ছেলেদের

---

৩১. Lata Mani, "Contentious Traditions. The Debate on Sati in Colonial India", in Sangari and Vaid (eds.) , *Recasting Women*, 88-126.

বেলায় ১৮ ধার্য করা হয়। ১৮৯১ সালে 'সম্মতির বয়স' বিল পাশ করা হয়, যার ফলে যৌনসঙ্গমে অনুমতিদানের বয়স স্ত্রীর জন্য ১০ থেকে ১২ বছরে উন্নীত করা হয়।

বিরাজমান শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ অনুসারে হিন্দু রমণী, বিশেষকরে বিধবাগণ সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮৭৪ সালে 'সম্পত্তি অধিকার আইন' হিন্দু বিধবাকে তার স্বামীর সম্পত্তিতে 'জীবনস্বত্ব' প্রদান করে এবং এ বাবদ একজন পুত্রের অংশের সমান অংশ নির্ধারণ করে দেয়। তথাপি এই আইন কিন্তু বিধবাকে সম্পত্তির স্বত্ব এবং তা হস্তান্তর করার অধিকার দিল না এবং কন্যাগণ আগের মতো কোন অংশই উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো না।

সামাজিক জাজ্বল্যমান অন্যায় দূর করে নারীর মর্যাদা উন্নীত করার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকশ্রেণীর পরিচালিত উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ১৮৬০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে আসতে থাকে। যদিও সংস্কার আন্দোলনে দৃশ্যত পর্দাপ্রথা সম্পর্কে কোন বক্তব্য ছিল না (পর্দাপ্রথার সমস্যা মুখ্য হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে), তথাপি সংস্কার আন্দোলনের স্তরগুলিকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সবসময়েই পর্দাপ্রথার সমস্যাটি কোন না কোনভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। সতীদাহপ্রথা বা বিধবাবিবাহ বা বাল্যবিবাহের প্রতিটি দৃষ্টান্তেই নারীর ভূমিকা, কার্যবিধি, সচলতা ইত্যাদির অনিবার্য প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। উল্টোভাবে বলা যায় যে, পর্দাপ্রথা আসলে নারীর ভূমিকা, কার্যবিধি, গতিবিধি (মূলত এগুলিই হচ্ছে নারীমর্যাদার উপাদান) বিষয়ে এক নিবারণমূলক অধিষ্ঠান। অবশ্য এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকে বাংলার নারীর কাছে পর্দাপ্রথার প্রচলন সবসময় অভিশাপ হিসেবে অনুভূত হতো না। এ প্রথা তার নিজস্ব প্রতীকী আশ্রয় ছিল, যা এক পৃথক সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে এবং এক সীমাবদ্ধ অর্থে কখনও কখনও মেয়েদের মধ্যে আসঞ্জন, আত্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়বোধের সৃষ্টি করে।

পুরো উনিশ শতকব্যাপী পর্দা ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ বাংলাদেশের পুনর্জাগরণে বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতা এবং পর্দার বাইরে নারীর অনুমোদিত যাতায়াতের মাত্রা (বা যেটুকু তারা নিজেরাই যেতো) পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। পর্দাসমস্যা, তার প্রয়োজনীয়তা ও পরিব্যাপকতা, তার পক্ষের এবং বিপক্ষের মানসিকতা এক ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে (যা আজও অব্যাহত)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সচেতন বিশ্লেষণ এই আলোচনার ধারাকে পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে। সতীদাহের সমস্যা থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ পর্যন্ত পর্দাপ্রথা এবং নারীর সতীত্ব ছিল এক বহুল আলোচিত বিষয়।

নারীসমস্যা বিষয়ক সমিতি এবং আন্দোলনসমূহ

শিক্ষার বিস্তারের ফলে এবং জীবনযাপনে কঠোর বিধির আংশিক শিথিলতার ফলে মহিলারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পর্দাপ্রথার সমস্ত সমস্যা, যা বহু দশক ধরে প্রচ্ছন্ন ছিল, ১৮৬৬ সালে তাই মুখ্য হয়ে উঠলো, যখন প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্মনারী কলকাতায় ব্রাহ্মদের বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবে উপস্থিত হয়।[৩২] এর কয়েক মাস পরে বরিশালে এক সভায় ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৮৭২ সালে বিষয়টা এক বিতর্কের ঝড় তোলে, যখন কেশবচন্দ্র সেন পর্দার শিথিলতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। কেশব সেন জোর দাবি জানাতে থাকেন যে মহিলারা পর্দার পেছনে বসবে। এই কারণে দাস, ঘোষ, শাস্ত্রী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁকে পর্দাপ্রথা বলবৎ করার দোষে দোষারোপ করেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নামের অন্য এক দৃঢ়চেতা ব্রাহ্ম যুবক একমত হলে প্রগতিশীল অংশ পর্দাপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপের দাবি জানান।"[৩৩] যদিও কেশব বিবাদটি মিটিয়ে ফেলেন এবং 'সমাজে'র কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, তবুও পর্দাপ্রথার আশু সমস্যা ঘিরে নারীমুক্তির মাত্রার বিষয়ে মেরুকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তী দশকগুলিতেও তা বিদ্যমান থাকে। অবশেষে 'সমাজ' নিজেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একদল তুলনামূলকভাবে 'সংরক্ষণবাদী' এবং অপর দল 'বিপ্লবী'। এই সময়ে মহিলারা তাদের নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ, ১৮৭৯ সালে বঙ্গ মহিলা সমাজ এবং ১৮৮৬ সালে সখী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। এগুলোই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সংগঠন। ব্রাহ্ম মহিলাদের বাইরে বাংলাদেশের খৃস্টান মহিলারাও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং ১৮৮১ সালে তাদের নিজস্ব সংগঠনসমূহ স্থাপন করে।[৩৪]

সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় পর্দাপ্রথা ও শিক্ষা মুখ্য সমস্যা হিসেবে দৃষ্টিগোচর হলেও অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা দেয়, তা হলো মহিলারা নিজেরাই এগিয়ে এসে কেবল সমাজসংস্কারের 'বিষয়' বা ফলভোগকারী নয়, বরঞ্চ আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়। তৃতীয় আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কম খ্যাতিসম্পন্ন অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র হতে উদ্ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'উদারনৈতিক জাগরণ' দেখা দেয়, যা বহু সংখ্যক নর-নারীর জীবনধারাকে স্পর্শ করে।

---

৩২. Ghulam Murshed, *The Reluctant Debutante, The Response of Bengali Women to Modernization 1849-1950,* (Rajshahi 1983), 90.

৩৩. David Kopf, *Brahmo Samaj.* 35.

৩৪. Murshed, *Reluctant Debutante,* 94.

নারীশিক্ষা : প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং আলোচনা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার বিস্তার কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সবসময় সময়ের ক্রমানুসারে ঘটে নি। খৃস্টান মিশনারিরা এ ব্যাপারে অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা উপনিবেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরিত করা। ছাত্রীরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছিল, কেননা কোন 'ভদ্রলোক' তাদের বাড়ির কোন বালিকাকে এই ধরনের স্কুলে পাঠাতে প্রস্তুত ছিল না।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেখা যায় কোম্পানির কর্মকর্তা এবং এ দেশে বসবাসকারী বৃটিশ নাগরিকবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের মধ্যে। তৃতীয় প্রবাহ দেখা যায় বাংলাদেশের শহরের উঠতি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে। শিক্ষা প্রসারে চতুর্থ এবং সবচাইতে শক্তিশালী প্রবাহ সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক সরকার স্বয়ং, যদিও এক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

এ সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার আবরণ যতো তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয় নি। ১৮৫০ সালে সংস্কারবাদীগণ উত্তরোত্তর অনুভব করেন যে, শিক্ষার অভাব এবং পর্দাপ্রথা নারীকে তার মুক্তির পথ থেকে সরিয়ে রেখেছে (এই মুক্তি বলতে সংরক্ষণবাদী উদারপন্থী বা বিপ্লবীরা যাই বুঝুক না কেন)। প্রকৃতপক্ষে শত শত বছরের পর্দাপ্রথা বাংলাদেশের নারীকে এতই ভীত ও অসহায় করে রেখেছিল যে পর্দাপ্রথা বাতিল না হলে প্রগতিশীল যতো আইনই পাশ হোক না কেন, তাতে কিছু লাভ হবে না এ কথা সবাই অনুভব করেছিল। কিন্তু মূল প্রশ্ন রয়ে গেল কিভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত পর্দাপ্রথা রহিত করা হবে।

যদিও নারীশিক্ষার উপর হিন্দুশাস্ত্রে কোন বাধা ছিল না, তবুও আঠারো এবং উনিশ শতকে এ শিক্ষাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে যখন উইলিয়ম এ্যাডাম[৩৫] তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন, তখন তিনি উল্লেখ করেন যে, বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো, কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো যে এর ফলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুসলিমরাও একই কুসংস্কারে ভুগছে।

ভদ্রলোক সংস্কারবাদীগণ প্রথমদিকে এই চিন্তা করেছিল যে, কিছু লেখাপড়া নারীজাতির উপকারে আসবে (একইভাবে সমাজ উপকৃত হবে), তা ভাল জননী ও সঙ্গিনী তৈরী করতে সাহায্য করবে এবং তাতে সনাতন আদর্শ অব্যাহত থাকবে। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে জি. বিদ্যালঙ্কার, দ্বারকানাথ ঠাকুর (এমনকি কট্টরপন্থী রাধাকান্তদেব),

---

৩৫. William Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar. (1868), 132.

এ. কে. দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের মতো উদারপন্থী ভদ্রলোক সংস্কারবাদীদের মধ্যে এভাবে উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে প্রত্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকজন বাদে মহিলারা নিজেরাই সহযোগী পুরুষদের সাথে একমত পোষণ করতো যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল বর পাওয়া এবং ভাল বধূ হওয়া। অবশ্য তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নারীদের বেলায়ও একই বক্তব্য সত্য ছিল।[৩৬]

উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে আনুমানিক ১৮১৭ সালের দিকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা শুধু পুরুষদের শিক্ষা দেবার কাজে লাগানো হয়। যাই হোক ১৮২০ সালে ডেভিড হেয়ার এবং কতিপয় স্থানীয় অধিবাসী মেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জে. ই. ডি. বেথুন কর্তৃক মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ছিল নারীশিক্ষার উন্নতির মাইলফলক। এর পরেও ভদ্রলোকেরা পর্দাপ্রথাকে অমান্য করে তাদের বাড়ির মেয়েদেরকে ঐ স্কুলে পাঠাবে কিনা এই ভেবে বেশ কিছু সময় নষ্ট করেন । বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভদ্রলোকদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তারা পর্দার বাধা অতিক্রম করতে পারবে ? খুব কম লোকই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

যাই হোক, নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং ১৮৬০ সালে বাঙালি ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারে যে নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তি সমাজ সংস্কারেরই পথ এবং পর্দাপ্রথা এই পথে বিরাট বাধা। কালিপ্রসন্ন ঘোষ[৩৭] এবং অক্ষয়কুমার দত্ত নারীর জন্য অবাধ শিক্ষা এবং স্বাধীনতার দাবিতে দ্ব্যর্থহীন ছিলেন। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত এ. কে. দত্তের *ধর্মনীতি* নারীমুক্তির সমস্যার উপর এক বিশদ তথ্য প্রদান করে। এতে বলা হয় :

> আগের যেকোন বাঙালি লেখকের চাইতে অনেক বেশি যুক্তি ও সমর্থন এসেছে ধর্মনীতির লেখকের কাছ থেকে । হিন্দু সমাজের সংস্কারের মূল সমস্যা দূরীকরণে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যথার্থতার যৌক্তিকতা দেখা যায়। বাঙালি পরিবারে সামাজিক অন্যায়সমূহ নিরীক্ষা করে অক্ষয়কুমার দেখতে পান যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরে নারীর হীন ও দুঃখজনক অবস্থা থেকেই সেগুলোর সৃষ্টি। অতএব এখান থেকে সমাজ-সংস্কার শুরু হতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু হওয়া প্রয়োজন।[৩৮]

নারীশিক্ষার প্রসার

নারীশিক্ষার প্রতি অক্ষয়কুমার দত্তের এই নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সব সংস্কারবাদী একমত ছিলেন না এবং বিদ্যাসাগর ও অন্য সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও

---

৩৬. সেই সময়ের নারীশিক্ষার পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, Ghulam Murshed, *Reluctant Debutante*.

৩৭. কালিপ্রসন্ন ঘোষ, 'স্ত্রীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব'।

৩৮. উদ্ধৃত, David Kopf. *Brahmo Samaj*, 53.

১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা খুবই সীমিত সফলতা অর্জন করে। জয়কৃষ্ণ মুখার্জী বেথুন মডেল অনুসরণ করে সেই একই সালে (১৮৪৯) উত্তরপাড়ায় এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিশোরচন্দ্র মিত্র পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে রাজশাহীতে অনুরূপ এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন স্কুলের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সালে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুরে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নারীশিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতার জন্য এই স্কুলগুলি অর্থাভাবে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। একজন বিশ্লেষকের মতে, বিদ্যাসাগরের স্থাপিত স্কুলসমূহ গ্রামীণ নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোন সফলতা অর্জন করতে পারে নি, কেননা একদিকে অভিভাবকদের অনীহা ছিল, অপরদিকে স্কুলের সামান্য বেতন যোগাতেও তারা অপারগ ছিল।[৩৯]

নারীশিক্ষার প্রতি ডালহৌসির অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও এবং ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষানীতিতে ভারতে নারীশিক্ষার প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন জোরালো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ১৮৬০ সাল অবধি বিষয়টি খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কেননা এই ঘটনা সাধারণভাবে যেকোন সংস্কারের এবং বিশেষকরে নারীশিক্ষার দাবির ব্যাপারে সরকারি দায়িত্বগ্রহণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে খুবই সতর্ক করে দেয়।

১৮৭০ সালে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার সংযোগে তা সম্ভব হয়েছিল। বৃটিশ সরকার শিক্ষার দায়িত্বের বিরাট অংশ নবগঠিত পৌরসভাসমূহের নিকট হস্তান্তর করে। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নারীশিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে এবং সেই সাথে গ্রামে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়ের বহুল প্রসার সম্ভব হয়। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ সালে মহিলারা তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকী, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন।

এ সময় দুইজন যোগ্য এবং নিবেদিতপ্রাণ ইংরেজ মহিলা মিস মেরি কার্পেন্টার (১৮৬৬) এবং মিস এ্যানেট এ্যাক্রয়েড (১৮৭২)-এর উপস্থিতি দেখা যায়, যাঁরা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন।[৪০] প্রগতিবাদী ব্রাহ্মরা এঁসব প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানায়। মিস এ্যাক্রয়েডের স্কুল ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় এবং মিস কার্পেন্টার ভারতে তৃতীয় বার এসে এই স্কুলকে ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত করেন। দু'বছর পর এই প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুলের সাথে সম্মিলিত হয়ে ১৮৭৮ সালে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

---

৩৯. শরিফা খাতুন, 'আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারী সমাজ', *এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা ১৯৮৫)

৪০. David Kopf, *Brahmo Samaj*. 16, 34.

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে মেরুকরণ প্রচ্ছন্নভাবেই শুরু হয়েছিল এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে এ সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। সমস্যাটি তীক্ষ্নভাবে দুটি ধারা বা দল তৈরি করে— একদল গার্হস্থ্য শান্তির জন্য প্রবুদ্ধ স্ত্রী তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে নারীশিক্ষাকে গণ্য করেছিল এবং অপর দলের দাবি ছিল, পুরুষের সমভিত্তিতে এবং সমপর্যায়ে নারী শিক্ষালাভ করবে।[৪১] এরপর বেথুন কলেজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দাবি করা হয় যাতে মহিলারা বি. এ. ডিগ্রি লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের মধ্যে এই ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলারা ছিলেন কাদম্বিনী বসু (ব্রাহ্ম) এবং চন্দ্রমুখী বসু (খৃস্টান)।

এই সময়ে শিক্ষা আর কেবল মার্জিত রুচি ও মুক্তবুদ্ধি অর্জনের উপায় থাকলো না, বরঞ্চ তা কর্মসংস্থানের এক উপায় হিসেবেও দেখা দিল। ঢাকার মহিলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রী এক বাঙালি বিধবা রাধামনি দেবী ভদ্রলোকশ্রেণী থেকে এ অঞ্চলের প্রথম মহিলাদের একজন, যিনি পেশাগত চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৬ সালে শেরপুরে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভা'তে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মহিলারা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং বেশ কিছু বাক্-বিতণ্ডার পর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও প্রবেশাধিকার লাভ করে। ব্রাহ্ম প্রগতিবাদী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ১৮৮৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার হন।[৪২] বাঙালি নারীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির জন্য ১৮৮০ সাল এক উল্লেখযোগ্য দশক। এই দশকেই শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদেরকে উপযুক্ত বেতনে সরকারি চাকুরি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের বড় বড় শহর এলাকার (কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী) মহিলারা গণপ্রতিষ্ঠানসমূহে আরও অধিকহারে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। এঁরাই ছিলেন 'ভদ্রমহিলা'দের নতুন প্রজন্ম।[৪৩] এসব পেশাজীবী মহিলাদের মধ্যে বামা সুন্দরী দেবী, মনোরমা মজুমদার ও রাধারানী লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত বিধবা মহিলার প্রচেষ্টাও বেশ উল্লেখ করার মতো। এঁদের মধ্যে ছিলেন মনমোহিনী হুইলার, পণ্ডিতা রমাবাঈ এবং স্বর্ণময়ী দেবী। রমাবাঈকে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট 'পণ্ডিতা' উপাধি প্রদান করে। "কাশিমবাজারের দয়াবতী মহিলা" স্বর্ণময়ী নারীশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশে অন্যতম শক্তিধর ও দয়াবতী জমিদার হিসেবে পরিচিত এবং পর্দার অন্তরাল থেকেই তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

---

৪১. ঐ, 34.

৪২. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Murshed. *Reluctant Debutante*.

৪৩. Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905.* (Princeton 1984). তিনি 'ভদ্রলোকে'র বিপরীতে নারীদেরকে বুঝাতে গিয়ে 'ভদ্রমহিলা' শব্দটিকে জনপ্রিয় করেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮২ সালে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার যখন শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন, তখনকার অবস্থা ১৮৩৫ সালে যা ছিল তা থেকে বেশ ভিন্ন। এই সময়ে বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০১৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪১,৩৪৯। স্কুলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল বেসরকারি, তবে এগুলি সরকার থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভ করতো। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বালিকা স্কুলের সংখ্যা ৩০৯৪-এ পৌঁছায় এবং ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,৪০৩। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের হার ছিল বালক ২৮.৯০% এবং বালিকা ১.৯০%। অথচ ১৮৮৬-৮৭ সালে এই হার ছিল বালক ২৫.৮৫% এবং বালিকা ০.৯১%। তুলনা করলে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।[৪৪] মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে বালিকাশিক্ষার ব্যাপারটা ততোখানি আশাব্যঞ্জক ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এই হারের অবনতি ঘটে। ১৮৯৬-৯৭ সালে মেয়েদের জন্য মাত্র দুটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল—কলকাতার বেথুন স্কুল এবং ঢাকার ইডেন স্কুল।

বাংলায় মুসলিম নারী

উল্লিখিত রিপোর্টে (হান্টার কমিশন, ১৮৮২) মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যজনক আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কথা বর্ণিত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত এক ব্যাপক জাগরণের সূত্রপাত করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলিম নারীর শিক্ষা ও মুক্তির বিষয়টি খুব বেশি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে নি।

বাংলার মুসলিমদের বিষয়ে বলতে হয়, এই সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল এই কারণে যে, তাতে পর্দাপ্রথার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে। ১৮৬৭ সালে 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতি'র (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন) এক সভায় যখন নবাব আবদুল লতিফ একটা সমীক্ষা পড়ে শোনান, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হিন্দু নারীদের মতো মুসলিম নারীদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসারের একই ধরনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবি আবদুল হাকিম বলেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো স্কুল-কলেজে মুসলিম নারীদের প্রেরণ করা অচিন্তনীয়। এই জবাবে কট্টর পর্দাপ্রথার পক্ষের শক্তির মত ব্যক্ত হয়, সেই সাথে

---

৪৪. পরিসংখ্যানের সংখ্যাসমূহ নেয়া হয়েছে, শরিফা খাতুন রচিত "আধুনিক শিক্ষা" গ্রন্থের ২৯০ পৃষ্ঠা দেখুন, তালিকা তৈরি করা হয়েছে *Education Department of Bengal*, 1886-87, 1899-1900-এর রিপোর্ট থেকে।

এককথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৪৫] মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রশ্নটি বেশ কিছু সময় পর্যন্ত আর তুলে ধরা হয় নি।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীই (১৮৪৭-১৯০৩) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত লোক-হিতৈষিণী মহিলা ছিলেন। তিনি কুমিল্লার পশ্চিম গাঁও-এর জমিদার ছিলেন। এ জমিদারির রাজস্ব আয় ছিল এক লাখ টাকা। লোকহিতকর কাজের জন্য রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নবাব' উপাধি প্রদান করেন এবং তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি নিজ গুণে এই উপাধি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম আখ্যানকাব্য *রূপজালাল*কে তাঁর নিজের ঝঞ্ঝাময় দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ফয়জুন্নেসার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সমকালীন এক বিখ্যাত ব্রাহ্ম কালিচরণ দে-র সহযোগিতায় ১৮৭৩ সালে কুমিল্লাতে ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই স্কুল পরবর্তীতে ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং এতে অনেক প্রতিভাধর ছাত্রী শিক্ষালাভ করে।[৪৬]

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়।[৪৭] পূর্ববাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তার, ছাপাখানার প্রসার, শহুরে সংস্কৃতির প্রচলন (যেমন নাট্যশালা) ইত্যাদির দ্বারাও এই সময়টি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আছে। ১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাদের লক্ষ্য ছিল বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, সমাজসেবা প্রদান করা এবং শিক্ষার উন্নতির (বিশেষকরে নারীদের জন্য) লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নারীর শিক্ষা ও তার সার্বিক উন্নতির জন্য নিবেদিত হলো। নারীর দুর্দশা মোচন (বিশেষকরে শিক্ষার মাধ্যমে) এদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ব বাংলার এমন ধরনের সমিতির মধ্যে ফরিদপুরের 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষাসভা' (১৮৭০) এবং 'কৌলিন্য সংশোধনী ও কন্যাবিক্রয় নিবারণী সভা' (১৮৭১), বগুড়ার 'কন্যাপণ নিবারণী সভা' (১৮৮৯) এবং ঢাকার 'বিধবা বিবাহসভা' (১৮৯৪) ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অন্যান্য শহরকেন্দ্রের পরিবর্তনের ধারার সাথে পূর্ববাংলার এই সময়ের সামাজিক পরিবর্তনের ধারার নিশ্চিত মিল থাকা সত্ত্বেও এর নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যও ছিল।

---

৪৫. শরিফা খাতুন, ঐ, ২৯৭।

৪৬. বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৪৭. মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৮৩, ৬৩-১২৫।

উপরে উল্লেখিত সমিতিসমূহের মধ্যে ঢাকার '*মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী*'[৪৮] মুসলিম নারীদের শিক্ষার বিষয়টাকে পুনরায় তুলে ধরতে প্রধান ভূমিকা রাখে। মুসলিম উদার ও প্রগতিশীলদের সৃষ্ট এই সমিতি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কাজে অগ্রসর হয়। এর অগ্রদূতদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালীর আবদুল আজিজ (তিনি তখনও ছাত্র), ফজলুল করিম, বজলুর রহিম, বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন এবং আবদুল মজিদ, হিম্মত আলি প্রমুখ। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। এই উদ্দেশ্যে বাড়িতে শিক্ষাদানের এক অনুপম পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িতেই বালিকাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকাদি এবং পাঠ্যসূচি পৌঁছে দেয়া হতো এবং পরীক্ষাও তাদের বাড়িতেই গ্রহণ করা হতো। স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অপরিহার্য উপাদান ছিল ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। উদার সমাজসংস্কারকেরা স্কুলের পাঠ্যসূচির ধর্মনিরপেক্ষীকবণের প্রচারক ছিলেন। 'সম্মিলনী' এক সাড়াজাগানো আদর্শের কাজ করে যার ফলে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে সীমিত হলেও মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বেশ কিছু মহিলা কবি এবং লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষকরে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়। এই শ্রেণীর মধ্যে একজন খ্যাতনামা কবি হলেন সিলেটের মুসাম্মৎ সহিফা বানু[৪৯] (আনু ১৮৫০-১৯২৬)। তিনি বিখ্যাত হাসনরাজার ভগিনী এবং সিলেটের আলি আমজাদ এস্টেটের ম্যানেজারের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দশকগুলো রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের প্রারম্ভিক কর্মজীবনের সমকালীন। রোকেয়া কলকাতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন প্রভাব যতদূর মনে হয় সুদূর সিলেটে বসবাসকারী সহিফার কাছে পৌঁছে নি। বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় সহিফা লিখতেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর সাহিত্যকর্ম সমকালীন সমাজের ইসলামী ও হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার মিলন প্রতিফলিত করে।

রোকেয়ার বেশ কিছুকাল পূর্বে খুলনার আজিজন্নেছা লেখালেখি শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬) জীবনীকার আবুল আহসান চৌধুরী লেখেন : "বেগম রোকেয়ার পূর্ববর্তী একজন ইংরেজি শিক্ষিতা মুসলিম লেখিকা হিসেবে তাঁর যে সম্মান, স্বীকৃতি ও মনোযোগ প্রত্যাশিত ছিল তা তিনি পাননি।" (আবুল আহসান চৌধুরী, *আজিজন্নেছা খাতুন*, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৪)। আনুমানিক ১৮৬৪ সালে আজিজন্নেছা ভারতের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর চাঁদ আলী পুলিশের দারোগা ছিলেন। আজিজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও অধ্যাপক মৌলবি মেযারাজউদ্দীনের গৃহশিক্ষায় ও যত্নে তিনি ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি রপ্ত করেন।

---

৪৮. মুনতাসির মামুন, ঐ।

৪৯. প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ৪৮-৫৬।

সংসারজীবনে তিনবার বিবাহ করেও আজিজন্নেছা বিধবা হন এবং ভ্রাতৃগৃহে তাঁর বাকী জীবন কাটে।"১৯৪০ সালের কোন এক প্রত্যুষে" তাঁর মৃত্যু হয়। আজিজনের *হারমিট বা উদাসীন* ১৮৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২ হলেও সেই যুগে সুদূর খুলনা নিবাসী এক বাঙালি মুসলিম মহিলার পক্ষে এই পুস্তক রচনা একটি কীর্তি বৈ কি। এ ছাড়া তিনি *কোরবানী* নামের এক অপ্রকাশিত কাব্য ছাড়া পত্র-পত্রিকায় কিছু (৬টি) লিখে গেছেন। এর মধ্যে *ইসলাম দর্শন* ১৩৩০ -এ প্রকাশিত হয়, *স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ* আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রোকেয়ার কিছুকাল পূর্বের পথিকৃৎ নারীদের মধ্যে অপর একটি নাম খায়েরন্নেসা খাতুন। এই অসাধারণ মহিলার জীবনীকার সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন : "খায়েরন্নেসা খাতুনের জন্মসন ও তারিখ শুদ্ধ নয়, তাঁর শৈশব-কৈশোর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি ; এমন কি তাঁর পিতা-মাতার নামও জানা যায় নি।" (সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়েরন্নেসা খাতুন,* ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮)। এতটুকু জানা যায় যে তাঁর জন্ম ১৮৭৪-৭৬-এর মধ্যে, সিরাজগঞ্জ মহাকুমা শহরের " 'মুন্সিবাড়ী' নামক এক মধ্যবিত্ত পরিবারে।" (ঐ)। খায়রন্নেসা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্প বয়সেই এক বিদ্যানুরাগী সাবরেজিস্ট্রার আসিরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খায়েরন্নেসা 'নবনূর'-এ 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' ও 'স্বদেশানুরাগী' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া তিনি ছদ্মনামেও কিছু প্রবন্ধ লেখেন (মকসুদ, পৃ. ৩১)। তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ 'সতীর পতিভক্তি' ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হয়। এই ৬১ পৃষ্ঠার বইটি নারীর জন্য একটি উপদেশমূলক বই। তবে খায়েরন্নেসা সম্পর্কে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খায়েরন্নেসা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু তা পালন করেন (১৯১০-এর দশকে ?)। 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে খায়েরন্নেসা একটি উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হন। সেই যুগে তাঁর এই উদার মনোভাব ও কর্মজীবী ভূমিকা আজ বিস্ময় জাগায় বিশেষত যখন তা রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য দ্বারা সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

আধুনিককালের প্রথম মুসলিম গদ্যলেখিকা হিসেবে তাহেরুন্নেসাকে গণ্য করা হয়। অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৫০ সালের কিছু আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে মাত্র একটা লেখাই আজও সংরক্ষিত আছে এবং উনিশ শতকের 'ভদ্রলোক'দের বিখ্যাত সাময়িকী *বামাবোধিনী* পত্রিকায় ১২৭১ (বা. স.) সনের ফাল্গুন (১৮৬৪) সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "বামাগণের রচনা"। খুবই উন্নতমানের রচনাশৈলীতে লেখা এই প্রবন্ধে নারীর সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং সেই সাথে নারীশিক্ষার উপর জোর দিয়ে তার সমাধানও উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়।

মহিলা কবি ও লেখিকাদের এই প্রজন্মের অনেকেই 'অন্দরমহলে' স্ব-শিক্ষিতা এবং প্রায়শই প্রচলিত সামাজিক বাধা-নিষেধ এবং মহিলাদের যেকোন ধরনের সামাজিক আত্মপ্রকাশ ও অংশগ্রহণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাচীর অতিক্রমে সক্ষম ছিলেন। তাঁদের কার্যাবলীও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ভদ্রমহিলা'দের মতো মুসলিম মহিলাদের মধ্যে রীতিমতো এক শ্রেণী তৈরি হতে আরও কয়েক দশক লেগে যায়।

মূলধারার বাইরে মহিলাবৃন্দ

উনিশ শতক যখন সমাপ্তির পথে, তখন বাঙালি সমাজে নিশ্চিতভাবে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই পরিবর্তনের কোন গণভিত্তি ছিল না বা তা বাংলার বিশাল নারীসমাজের অধিকাংশের জীবনধারাকে আদৌ স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। সুমন্ত ব্যানার্জীর কথায় : "আমরা এই সম্ভাবনার কথা প্রায়ই অগ্রাহ্য করি, যে সমস্যাবলি ঘিরে 'মুক্তি'র বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে তা শুধু ভদ্রবাড়ির নারীদেরকে জড়িত করে, হিসেবে যারা বাংলাদেশের সমগ্র নারীর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ।"[৫০]

এই সময়ে যদিও ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মপ্রভাবিত হিন্দু এবং খৃস্টান সম্প্রদায়ের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত নারীর দেখা মেলে, তবুও বিশাল বালিকাশ্রেণীর অধিকাংশই স্কুলে যেতো না। নারীশিক্ষা মোটামুটিভাবে বড় ও ছোট শহরভিত্তিক ছিল, যা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মিটাতো। এইভাবে পুরুষশাসন এবং শ্রেণীব্যবস্থা জোরদার করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। তাই প্রশ্ন, এই ভদ্রলোকদের এই সংস্কার আন্দোলন এবং সেসবের শিক্ষাকর্মসূচি যদি গণমুখী না হয়ে থাকে, তবে এই সময়ে বাংলার বিশাল নারী সমাজের অধিকাংশের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? পর্দা ও শিক্ষার নিরিখে তাদের মর্যাদাই বা কি ? তাদের গতিবিধির বা প্রকাশ্যে আগমনের মাত্রাই বা কেমন ছিল ? কারা তারা, যারা এই বিশাল নারীসমাজের অধিকাংশ ? এই প্রশ্নাবলী আরো অধিক গবেষণার দিকনির্দেশ করে এবং সমাজবিদ ও ঐতিহাসিকবৃন্দ আজ এই সমস্যাবলী নিরসনে সচেষ্ট রয়েছেন। নারীও যে ইতিহাসে উপেক্ষিত একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠী তা এ পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর প্রায় সকল ঐতিহাসিক গবেষণায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নারীবাদী সুধীসমাজ আজ এই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করছেন এবং তাঁরা দাবি তুলেছেন আরও যথাযথ ও পূর্ণ সমীক্ষার, যেখানে 'লিঙ্গ'কে (জেন্ডার) গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। এই প্রসঙ্গে কুমকুম সাঙ্গারি এবং সুদেশ ওয়াইদ উনিশ শতকের

---

৫০. Sumanta Banerjee, "Marginalization of Women's Popular Culture in 19th Century Bengal"; Sangari and Vaid (eds.), *Recasting Women*, 110.

বাংলার পুনর্জাগরণের বিদ্যমান ব্যাখ্যা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। "ঔপনিবেশিক শাসন সমাজ পুনর্গঠনের এমন এক প্রক্রিয়া শুরু করে, যা পিতৃতন্ত্রকে জোরদার করে।"[৫১] বাংলাদেশের পুনর্জাগরণের মানসিকতাকে শ্রেণীচেতনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের সমীক্ষা এই দিকনির্দেশ করে যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যুগপৎ শ্রেণী ও লিঙ্গবৈষম্যের কাঠামো দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বিগত শতকের মতো উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর সীমানার বাইরেও অবস্থান করছিল যেসব নারী, অবশেষে তাদের উপর গবেষণা দৃষ্টি দিচ্ছে।

গোলাম মুর্শিদ তাঁর *দি রিলাকট্যান্ট ডেবিউতাঁত* (সঙ্কোচের বিহ্বলতা) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের "শুধুমাত্র চাকরানি, অশিক্ষিতা, ধাত্রী ও বেশ্যাদেরই স্বাধীন আয় ছিল।"[৫২] নিম্নস্তরের মেয়েরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতো, যেমন পশুদের খাবার দেওয়া, ধান ভাঙ্গা, দুধ দোয়ানো এবং ক্ষেতের ফসল তোলা। তারা অর্থ আয় করুক বা না করুক, নিম্ন শ্রেণী বা বর্ণের নারীরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক ভূমিকা পালন করতো (ভদ্রমহিলাদের জন্য যা বহুদিন পর্যন্ত অস্বীকৃত ছিল)। "এই কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে (নিম্নস্তরের নারীগণকে) স্বভাবতই পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করতে হতো।...এর অর্থ এই যে, ভদ্রলোক-পরিবারের নারীদের চাইতে তারা নিজেদের পরিবারে যথেষ্ট মর্যাদা পেতো।"[৫৩] গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করেন যে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাদের যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জন কার্যক্রমে জড়িত থাকার ব্যাপারে কার্যত কঠোর কুসংস্কার ছিল।

ভদ্রলোকদের প্রচারিত 'পোশাকি সংস্কৃতি'র সাথে সাথে উনিশ শতকের বাংলাদেশে পৃথক লোকজ সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। এই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অনেকগুলো চারুকলার চর্চা হতো, যেমন কবিতা, প্রবাদবাক্য, গান, চটকা, কীর্তন, পাঁচালি, টপ্পা, ঝুমুর, খেউড়, ক্ষেমটা, নাটক, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি। এগুলি সেসব মহিলারাই গড়ে তুলেন এবং প্রচার করেন, যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমের বাইরে ছিলেন। উনিশ শতকের বাংলায় বিশেষ করে কলকাতার লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে বহুসংখ্যক মহিলা দর্শক উপস্থিত থাকতো, যাদের মধ্যে থাকতো বাজারে স্বনিয়োজিত নিম্ন শ্রেণী বা বর্ণের নারী থেকে শুরু

---

৫১. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, "Recasting Women: An Introduction" in Sangari and Vaid (eds.), ঐ, 1-26. উনিশ শতকের আগের এবং বর্তমান ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Nimai Shadhan Bose, *The Indian Awakening and Bengal,* (Calcutta 1969); বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* (কলকাতা ১৯৪৮); A. C. Gupta (ed.), *Studies in the Bengal Renaissance,* (Jadavpur 1958); Sushobhon Sarkar, *Bengal Renaissance and Other Essays,* (New Delhi 1970); V. C. Joshi (ed.), *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India,* (New Delhi 1975).

৫২. Murshed, *Reluctant Debutante,* 98-99.

৫৩. ঐ, 99.

করে ভদ্রলোকদের অন্দরমহলের কন্যা পর্যন্ত।[৫৪] এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ সকল পর্যায়ের নারীদের মর্যাদা এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত পর্দা ও শিক্ষা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

যখন ধনী নারীরা অন্দরমহলের অন্তরালে অবরুদ্ধ, তখন কর্মজীবী নারীদের বিরাট অংশ (নাপ্তিনী, ঝাড়ুদার, তরকারিওয়ালী, বৈষ্ণবী, বোষ্টমী, পথ-গায়িকা প্রমুখ) প্রকাশ্যে যাতায়াত করছে ও অন্দরমহলেও যাবার অনুমতি পাচ্ছে (শিক্ষা, আনন্দ ও সেবাদানের জন্য) এবং এইভাবে তারা অবরোধবাসিনীদের সাথে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হয়ে উঠে। এই দলের মধ্যে বেশ্যারাও অন্তর্ভুক্ত। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় বাংলাদেশে ১৭,০২৩ জন নটী, গায়িকা, নর্তকী দেখা যায়। ১৮৫৩ সালে ৪ লক্ষ লোকের কলকাতা শহর ১২,৪১৯ জন বেশ্যাকে প্রতিপালন করতো।[৫৫]

আঠারো শতকে এবং পরে উনিশ শতকে বাংলাদেশে রাস্তাঘাটে বা বাজারে যেসব গায়িকার দল দেখা যেতো তারা ছিল বৈষ্ণবী বা বোষ্টমী (চলতি ভাষায় তাদেরকে 'নেড়ী' বলা হতো)। পুরুষ ও নারীর সমমর্যাদার প্রভাব থাকায় বৈষ্ণবধর্ম সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাঙালি নারীদের, যেমন—কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা এবং জাতিচ্যুতি থেকে বা বেশ্যাবৃত্তি থেকে পরিত্রাণকামী নারীদের সমাজে স্থান করে দেয়। ভারতীয় আদমশুমারির (১৮৭২) বর্ণনামতে বৈষ্ণবধর্ম "অন্য সবাই যাদেরকে পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে গ্রহণের জন্য দুইবাহু প্রসারিত করে দিয়েছিল।" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা দেয়, সমাজের উঁচু বা নীচু যেকোন স্থানে প্রবেশাধিকার দেয় এবং পুরুষের সাথে সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এসমস্ত সুবিধা ভদ্রমহিলাদের নাগালের বাইরে ছিল।

"বৈষ্ণবী নারীর স্বাধীন জীবনধারা এবং লজ্জাবিদূরিত অবাধ যৌনসম্পর্ক একটা পাল্টা সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে উনিশ শতকের ভদ্রলোকদের নিকট চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দেয়। অন্দরমহলের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী অথচ তাদের নারীদের শিক্ষা ও মুক্তি প্রচেষ্টার সফলতা দিয়ে তাদের ইংরেজ প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে ভদ্রলোক শ্রেণী এক অদ্ভুত ফাঁদে আটকা পড়ে।"[৫৬]

নিজেদের নারীদের সতীত্ব ও আনুগত্য সংরক্ষণের ইচ্ছার তাগিদে এবং পর্দাপ্রথা থেকে নারীদের দ্রুত বের করে আনা হলেও শিক্ষার মাধ্যমে পুরুষজগতে প্রবেশাধিকার দিলে ফলশ্রুতিতে লাম্পট্যজীবন দেখা দিতে পারে এই ভয়ে ভদ্রলোকেরা এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ও অবিরাম আদর্শগত ও বস্তুগত আন্দোলন শুরু করে। এর সাথে অন্যান্য আর্থসামাজিক উপাদান (পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাহ্রাস এবং পুস্তকসংস্কৃতির উদ্ভব) মিশে এই লোকজ সংস্কৃতিকে এবং এর মহিলা অংশগ্রহণকারীকে কোণঠাসা করে শহুরে

---

৫৪. Banerjee, "Marginalization".

৫৫. ঐ।

৫৬. ঐ, 153.

সমাজ থেকে বিতাড়িত করে। ভদ্রমহিলারা এবার তাদের কাজ ও চেতনার মাধ্যমে শহর এলাকায় প্রভাবশালী দলে পরিণত হয়। পুরাতন লোকজ সংস্কৃতি, যা বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদেরকে এক সামাজিক বন্ধনে বেঁধে রাখতো, তা শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নিম্ন শ্রেণীর নারীর মধ্যে। "কিন্তু তাদেরকেও পরিবর্তিত সামাজিক জগতের যুক্তি বুঝতে হয় এবং লোকজ সংস্কৃতির এই পুরাতন ধারা উধাও হয়ে যায়।"[৫৭]

চার

স্বাধীনতাসংগ্রাম (১৯০০-১৯৭১)

জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং নারীর সমস্যা

বিশ শতকের ঊষালগ্নে ভারত তার ইতিহাসের এক জটিল সময়ে উপনীত হয়। নানাবিধ স্বার্থ, বিক্ষোভ ও আন্দোলন কোন সময় সমমুখী হয়ে, কোন সময় ভিন্নমুখী হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এর কোনটা প্রাধান্য পেতে থাকে আবার কোনটা অবদমিত হতে থাকে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, সংরক্ষণবাদী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যেকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং পুরাতন সমাজপদ্ধতি ও নতুন পদ্ধতির মধ্যেকার সংঘাত—এসব উপাদান দিয়ে গঠিত এ যুগের ইতিবৃত্ত। অবশ্য এসব মেরুকরণ সর্বদা অতোটা স্পষ্ট ছিল না, এগুলো প্রায়ই জটিল পদ্ধতিতে সমন্বিত হয়েছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তীব্রভাবে দৃশ্যপটে প্রাধান্য পেতে থাকে এবং নারীবিষয়ক সমস্যাবলী গৌণ হয়ে যাবার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বাড়ির বাইরের জীবনে এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেই এই প্রথম ভারতীয় নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত শক্তির সুবিধা দেখে এবং যে- কোন কাজে নারীর একাগ্রতার কথা উপলব্ধি করে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা নারীদেরকে ঘরের বাইরে এসে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের উৎসাহ দেন।[৫৮]

উনিশ শতকের শেষভাগে নারীসমস্যার এহেন অবস্থান সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জী কিন্তু ভিন্ন এক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা ঠিক নয় যে ভারতে তখন আরো জরুরি সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষমতার আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষভাগে এসে নারীমুক্তির বিষয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ্য কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে; বরঞ্চ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় নারীসমস্যার

---

৫৭. ঐ, 130.

৫৮. ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন Manmohan Kaur, *Women in India's Freedom Struggle*, (New Delhi 1985), and Kamala Devi Chattopadhay, *Indian Women's Battle for Freedom*, (New Delhi 1983).

বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী শক্তির অসম্মতিই এর মূল কারণ।[৫৯] উনিশ শতকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে একটা সিদ্ধান্তে আসা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কেননা ইতিমধ্যেই কিছু অঘটন ঘটে গেছে ভারতে— ভারত চলে গেছে বৃটিশের অধীনে এবং ভারতীয় জনগণের উপর নেমে এসেছে অপমান ও লাঞ্ছনার অভিশাপ।

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজের অভ্যন্তরে দুটি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত জন্ম নেয়। পার্থ চ্যাটার্জীর মতে এই সিদ্ধান্তের মূল প্রবণতা ছিল সাংস্কৃতিক বলয়কে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক, ভেতর ও বাইরের তথা *ঘর* ও *বাহিরের* বিষয় হিসেবে বিভাজন। বস্তুগত বিচারে পাশ্চাত্য জয়ী হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অন্তর্জাত আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ অপর পক্ষকে হার মানিয়েছিল এবং তাদের মনে পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এ সময়ে ভারতীয়দের মাঝে স্বরূপ অন্বেষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং কোন না কোন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভূতির প্রয়োজনীয়তাও পরিলক্ষিত হয়। তখন নারীরাই ছিল সঙ্কটময় ক্ষেত্র, যেখানে এই ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছিল।

কিন্তু পর্দার বিষয়ে প্রচলিত ধারণা এবং ব্যবহারের কি হলো ? নারীর অধিকার সম্পর্কে গান্ধীর আদর্শ ছিল—কোন কোন ক্ষেত্রে সমান অধিকার, নিজেদেরকে উন্নত করার সুযোগ-সুবিধা এবং যৌনপ্রতীক হিসেবে নারীর ভূমিকা পরিহার। কিন্তু তিনি আর্থিক ক্ষমতার বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা করেন নি। গান্ধীর আদর্শ নারী হলো সতীত্বের চরম উৎকর্ষের প্রতীক পৌরাণিক 'সীতা'। অনেক উদার মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ নেতা তখনও নারীকে বাস্তবে গৃহের পবিত্র অঙ্গনে গৃহবধূ হিসেবেই দেখতে চাইতেন।

এই শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোর ঘটনা নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে, পর্দাসমস্যা এক নতুন রূপ নেয়। নারীর সতীত্বরক্ষার জন্য শরীর ঢাকা—পর্দার এই পূর্বেকার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ শব্দের অর্থ রূপান্তরিত হয়ে বহির্জগতে নারীর অধিকার ও বিচরণ ক্রমশ স্বীকৃত হয়। পর্দা এখন এক ব্যাপক অর্থ বহন করতে থাকে। নারী এবং নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত পর্যালোচনা গুরুত্ব পায়, কেবল এ পর্যালোচনার বিশেষ উপাদান (যেমন পর্দা, শিক্ষা) পরিবর্তিত হয়। এতে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে, নারীসমস্যার সমাধান সন্তোষজনক নয়, চূড়ান্তও নয় (হয়তো বা এই চূড়ান্ত সমাধান অভিপ্রেতও নয় বা সম্ভবও নয়)। পর্দার শিথিলতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার হয়তো বা বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্যা আকারেই থেকে যাবে এবং 'সেই বহু শীর্ষবিশিষ্ট সর্পদানব' এর এক অংশে পরিণত হবে, যার বিরুদ্ধে নারীকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল, হবেও। পর্দার নতুন রূপ গ্রহণের বাস্তবতা থেকে পার্থ চ্যাটার্জীর যুক্তি খুব বেশি দূরে নয়। নারীত্বের এক নতুন ধারণা ভদ্রমহিলাদের মধ্যে গড়ে উঠে, যা পর্দার

---

৫৯. Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Women's Question" in Sangari and Vaid (ed.), *Recasting Women*, 249.

পূর্বেকার সংজ্ঞানির্ধারিত 'অন্তঃপুর' থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সক্ষম করে। ভদ্রমহিলারা নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যা পূর্বের চেয়ে উদার হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সীমাবদ্ধ বিধির দ্বারা নির্ধারিত ছিল।[৬০] পৌরাণিক 'সীতা-সাবিত্রী-সতী'র ভাবমূর্তির এহেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা নারীকে তার 'ভয়াবহ' যৌনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পবিত্র ও যৌন-উদাসীন এক ব্যক্তি হিসেবে পর্দার বেড়াজালের বাইরে যেতে সহায়তা করে। 'সতী'কে দেবীর আসনে বসানো হয়, কিন্তু 'অসতী'কে পুরুষশাসিত সমাজ কখনো ভুলে যায় না। কখনও যদি সে বিস্মৃতির আড়ালে যায়, তবু পুরুষমন থেকে বিলীন হয় না এবং বারে বারেই তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। আদর্শে ও ব্যবহারে আজও যে পর্দাপ্রথা বিদ্যমান রয়েছে তার আংশিক ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যেতে পারে। নারীর ভোটাধিকারের ঘটনায় নারীর তথা অবস্থার বৈপরীত্য এবং জটিলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে যখন সরোজিনী নাইডু এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে ভাইসরয় মন্টেগু সমীপে হাজির হন, তখন তিনি (মন্টেগু) মন্তব্য করেন[৬১], "এই সন্ধিক্ষণে ভারতের সামাজিক অবস্থা যা তাতে নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা সমীচীন হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অবরোধপ্রথা শিথিল করা না হচ্ছে, ততোক্ষণ নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা আদৌ বাস্তবসম্মত হবে না।" এই বিষয়টি প্রাদেশিক আইন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। মাদ্রাজ হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রদেশ, যেখানে ১৯২১ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং এর অনুসরণে ১৯২৩ সালে বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে এবং ১৯২৯ সালে বাংলায় নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

রাজনীতি ও গণআন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

সংস্কারবাদী আন্দোলনের এবং একইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল বাংলাদেশ। বিশ শতকের উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত মহিলারাও রাজনৈতিক বিক্ষোভে অগ্রণী ছিলেন। ১৯০০ সালের মধ্যে প্রথম মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদার সংস্কার, নারীর মর্যাদা এবং জাতীয় আন্দোলনের যোগসূত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য শক্তি যোগায় এবং নারীসমস্যা বিষয়ে সমর্থন তৈরি করে। সরোজিনী নাইডু এবং মার্গারেট কাসিন্সের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে 'ভারতীয় নারী সমিতি' এবং ১৯২৭ সালে 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' গঠিত হওয়ায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

এই সময়ের সকল গণআন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করে যদিও তাদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল। লবণ সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তারকৃত ৮০ হাজার লোকের মধ্যে ১৭ হাজার ছিল নারী। মহিলারা আরো সহিংস আন্দোলনেও অংশগ্রহণ

৬০. ঐ।
৬১. *স্ত্রী ধর্মে* প্রকাশিত, ১৯৩৪, ১০২। এটি ইন্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল।

করে। কল্পনা দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (চট্টগ্রাম রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে আক্রমণ), শান্তি ও সুনীতি (১৯৩১ সালে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা), সরলাদেবী চৌধুরানী (ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি) প্রমুখ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁদের দৃষ্টান্তে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের নারীর এক ক্ষুদ্র অংশ কোন বাধাই গ্রাহ্য করে নি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে দেয়।

নারী-অধিকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রাজনৈতিক, আইনগত, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রসমূহে বাংলার নারীসমাজ বেশ অগ্রসর হয়। কিন্তু এই উন্নতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা সাধারণভাবে জন্মায় যে, পর্দা এবং শিক্ষার অভাবের কারণে মুসলিম নারীদের আইনগত বা ধর্মসংক্রান্ত (শরিয়ত) অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। মুসলিম নারীদের চাহিদাপূরণে সমগ্র ভারতে 'পর্দা ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্যন্ত অবরোধে থাকা মহিলারা বাইরে এসে তাদের সমস্যা নিয়ে সভা ও আলোচনা শুরু করে যার ফলে সামাজিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১৮৮৬ সালে আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত স্যার সৈয়দ আহমদের 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' ১৯০৩ সালে নারীদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। এই ব্যবস্থা মুসলিম নারীর উন্নতির সহায়ক হয়। এই সমিতির সভাগুলোতে শিক্ষা এবং পর্দার উপর সিদ্ধান্তসমূহ রুটিনমাফিক গ্রহণ করা হতো। ১৯০৫ সালে আলিগড়ে 'মুসলিম মহিলা সম্মেলন' প্রতিষ্ঠালাভ করে। এর অনুসরণে ১৯০৭ সালে লাহোরে 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' এবং বাংলাদেশে 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি' গঠিত হয়।

১৯১৩ (মতান্তরে ১৯০৯) সালে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীয়া বেগম বা খুজিস্তা আকতার 'পর্দানশীন মাদ্রাসা' (অবরোধ প্রথায় বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। নবাবজাদী সারা বানু বেগম 'মহিলাদের স্বাস্থ্য ও বিনোদনকেন্দ্র' সংগঠিত করেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলির মা বিবি আম্মান প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়ে জনসভায় যোগ দেন, নারীবিক্ষোভ সংগঠনে তুরস্কের প্রতি সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করতে শুরু করেন। ১৯১৭ সালে 'লীগসভাপতি'র পুত্র জেলে আটক থাকায় বিবি আম্মান মুসলিম লীগ সভাতেও ভাষণ দেন। তিনি পর্দাপ্রথার সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে নারীর মর্যাদার উন্নতিকল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বৃহত্তর সমাজের জীবনধারায় অংশগ্রহণকারী এমন অন্যান্য বিখ্যাত মুসলিম মহিলা হচ্ছেন বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মা খুজিস্তা আখতার বানু। এই সময়ে মুসলিম নারী আন্দোলন যেহেতু শহরকেন্দ্রিক ছিল, তাই এর নেতৃত্ব কয়েকটি বিখ্যাত পরিবার ঘিরে গড়ে উঠে।

পরিবেশে তখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। পর্দাবিরোধী এবং নারীভূমিকাকে উদারভিত্তিক করার আন্দোলন গড়ে উঠছে। পর্দাপ্রথা শহর এলাকায়, বিশেষকরে উত্তর ভারতের শহরগুলোতে লোপ পেতে চলেছিল এবং অন্যান্য এলাকায়ও তা আর ততো কড়াকড়িভাবে মান্য করা হচ্ছিল না।[৬২] ১৯৩০ সালে 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে'র মন্তব্য— "অর্থনৈতিক পরিবর্তন পর্দাপ্রথাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে" এই পরিবর্তনের প্রমাণ বহন করে।

প্রথম কয়েক দশকের শেষে ভারতে নারী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়। 'ভারতীয় নারী সমিতি' এবং 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' ছিল এমন দুটি কার্যকরী সংগঠন যাদের প্রত্যেক প্রদেশেই শাখা এবং বিপুল সদস্য ছিল। হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, খৃস্টান, শিখ বা বৌদ্ধ—এই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে বিদ্যমান একতা ছিল নারী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় রাজনীতিতে একতা ছিল নারীআন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হবার পরেও 'মুসলিম মহিলা সমিতি'র মহিলারা 'ভারতীয় নারী সমিতি'রও সদস্যা হন। সাইমন কমিশন উল্লেখ করে যে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত এক ভারতের জন্য ভারতীয় নারীআন্দোলনের হাতেই সম্ভবত উন্নতির চাবিকাঠি রয়েছে। সেতুবন্ধনের প্রতিবন্ধক সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী এমন কিছু বাধা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় নারীরা নারীবিষয়ক সমস্যার বিষয়ে এক হতে পেরেছিল। 'মহীশূর প্রাদেশিক নারী সম্মেলনে'র এক সভায় সভানেত্রীর ভাষণে মার্গারেট কাসিনস্ বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারী নারীদের যে তালিকা পাঠ করে শোনান তাতে ছিলেন ভূপালের বেগম, মিসেস এ্যানি বেসান্ট, মিসেস সরোজিনী নাইডু, লেডি মির্জা ইসমাইল, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী ও কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।[৬৩] সরকারী নীতি ও আইন পরিষদের কার্যাবলী নিরীক্ষা করা এবং আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক আইনসমূহের তদারকি করা এবং (সম্ভব হলে) পরিকল্পনা করা পর্যন্ত আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত ছিল। ১৯৩৫ সালের পর মুসলিম লীগ যখন তার মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করে, তখন মুসলিম নারীদের মনোযোগ ইসলামে প্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহের দিকে আকৃষ্ট হয়।

যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনারত, তখন আন্দোলনে সক্রিয় নারীরা এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে শুরু করে যাতে ভবিষ্যতের সরকার নারীদের দাবিসমূহ পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে। তখন ভারতীয় নারীদের অধিকার ও কর্তব্যের এক সনদ তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ছিল —

> নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ : আইনের চোখে সমতা—চাকুরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম, জাত, বিশ্বাস বা লিঙ্গভেদে কোন অসমতা না থাকা, সমবেতন এবং উত্তরাধিকারের অধিকার।

---

৬২. Shahida Lateef, *Muslim Women,* 80.

৬৩. ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণের জন্য ইন্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েশনের ম্যাগাজিন *স্ত্রী ধর্ম* এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এসোসিয়েশনের ম্যাগাজিন *রোশিনি* দেখুন। মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আরও দ্রষ্টব্য, Elizabeth Hume, "Women's Part in Modern Movements in India", *The Muslim World,* 22:4 (1932), Princeton, New Jersey.

নারীর কর্তব্য : শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষাদান—সামাজিক কল্যাণ ও নীতিবোধের প্রসারণ ও বিশ্বশান্তি।

সবার মনে হতে লাগলো, পর্দার অন্তরালের জগৎ হতে ভারতীয় নারীরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এলো।[৬৪]

নারীশিক্ষার উন্নতিসাধন

পর্দার মতোই নারীশিক্ষার বিষয়টিও বিশ শতকে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। নারীকে শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তার মর্যাদা উন্নীত করা নয়, নারীর কর্মবিনিয়োগক্ষেত্রেও বাস্তব পদক্ষেপের এক শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে শিক্ষার মূল্য বিবেচিত হতে শুরু হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে শিল্পায়ন এবং আরও অধিক সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদা নারীমুক্তিকে তরান্বিত করেছিল। কিন্তু গৃহ থেকে নারীকে কর্মক্ষেত্রে আনার এই প্রক্রিয়ার (যদিও গৃহের বোঝা তার কাঁধেই রয়ে গেল, যা কখনও ঝেড়ে ফেলা যায় নি বা গেল না) সাথে শিক্ষাও এলো; একই সঙ্গে নারীকে নিয়ন্ত্রণকারী সতীত্বের কড়া বাঁধন—যেমন পর্দা শিথিল হতে শুরু করে। ভারতে সার্বিক পরিবর্তন একটু ভিন্নভাবে এসেছিল এবং নারীর ভূমিকাসংক্রান্ত সার্বিক পর্যালোচনাও ভিন্ন রূপ নেয়।

বিশ শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোতে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে ৫২.৩% মুসলিম এবং ৪৫.২ % হিন্দু ছিল। নারীর চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষার অবকাঠামোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ সরকার অনুভব করে। 'নারীশিক্ষা কমিটি' ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে আলোচনায় বসে। ১৯০১ সালে 'সিমলা সম্মেলনে' মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা ধরনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারের শুরু করা এই কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গে'র দরুন।[৬৫] সরকার তখনো বিরাজমান দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে, যেমন মক্তব ও পাঠশালাকে ব্যবহার করে এবং এক দ্বিমুখী অভিযান চালিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচিকে ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং যতোসংখ্যক সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করে। আসাম ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে নবগঠিত প্রদেশের নবাব সলিমুল্লাহ এবং রায় দুলাল চন্দ্র দেব জনশিক্ষা পরিচালককে (ডি. পি. আই.) এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁরা নারীশিক্ষার উন্নতিসাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। এই কাজের জন্য 'নারীশিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছিল।[৬৬]

---

৬৪. Shahida Lateef, *Muslim Women.*

৬৫. শীলা বসু, "রাজনীতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ", *ঐতিহাসিক*, ২, এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যা, কলকাতা।

৬৬. M. K. U. Molla, "Women's Education in Early Twentieth Century Bengal" in *The Bengal Studies*, University of Michigan, East Lansing, 1985.

এই সময়ে অর্জিত উন্নতির বেশিরভাগই ঘটেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ঢাকার ইডেন বালিকা স্কুল, ময়মনসিংহের আলেক-জান্ডার বালিকা স্কুল এবং চট্টগ্রামের ডঃ খাস্তগির স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।[৬৭] ১৯০৬ সালে প্রথমবারের মতো ইডেন স্কুলে মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং এইভাবে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের অভাবজনিত এক বিরাট সমস্যার সুরাহা হয়।

১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪ জন। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৬ সালে ১৬,৪৬৮ জনে ও ১৯১১ সালে ৫৬,৬৮৩ জনে উন্নীত হয়। মুসলিমদের মধ্যে পর্দার কঠোরতা তুলনামূলকভাবে বেশি বিদ্যমান বলে বুঝতে পেরে সরকার এই বাধা অতিক্রমকল্পে মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নতির নীতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে (যেমন মুসলিম বালিকাদের জন্য তাদের বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ ইত্যাদি)। পর্দাপ্রথা এবং বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার জন্য প্রচণ্ড বাধা হওয়া সত্ত্বেও ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

মুসলিম নারীশিক্ষার দিশারীগণ

প্রায় এই সময়ে লেখিকা, সমাজসেবী, বিদ্যানুরাগিনী, ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত এবং মুসলিম নারীমুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় কর্মজীবনের ধারার সূচনা করলেন। রংপুরের পায়রাবন্দ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি তৎকালীন উচ্চবিত্ত মুসলিম জীবনধারার কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যেই লালিত হন।[৬৮] এই জীবনধারায় কোরান পড়ার সামর্থ্যের বাইরে অন্য কোন ধরনের জ্ঞানার্জনকে একেবারে হারাম করা না হলেও খুবই অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য করা হতো। রোকেয়ার জীবনী লিখতে গিয়ে শামসুননাহার মাহমুদ বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে বাড়িতে থেকে রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ও বোন করিমুন্নেসার এবং পরে তাঁর স্বামীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্দরমহলের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ছিন্ন করে সামাজিক সংস্কারের বিশাল জগতে প্রবেশ করেন।

---

৬৭. ঐ, 43.

৬৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত (১৯৭৩) *রোকেয়া-রচনাবলী*র অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'অবরোধবাসিনী'-তে রোকেয়া বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে পর্দা তাঁর শৈশবকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর *রোকেয়া জীবনী*তে (ঢাকা ১৯৮৭) এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিছুদিন আগে সুফিয়া কামাল '*একাল সেকালের কথা*'য় (ঢাকা ১৯৮৮) তাঁর শৈশবের কথা বলেছেন এবং বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম নারীদের জীবনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল।

অবরোধপ্রথা (পর্দাপ্রথার এক বিকৃত ও অযৌক্তিক রূপ) এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জেহাদ রোকেয়ার আমরণ সাধনা। মুসলিম নারীদের মধ্য হতে এই দুই অন্যায়ের উচ্ছেদকল্পে তাঁর জীবনধারা নিবেদিত ছিল। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্মে (উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গসাহিত্য, কবিতা) এবং সামাজিক কার্মধারায় মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথা ও অজ্ঞানতার নিগড় ভাঙার প্রয়োজনীয়তার কথা অবিরাম উপস্থাপন করেছিলেন। স্বচ্ছদৃষ্টি এবং একাগ্রচিত্তসম্পন্না হয়ে (তাঁর পূর্বের বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের মতো) তিনি এক যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে সমাজ ও ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, যথা মানব-ইতিহাসে পুরুষশাসিত সমাজে বিভিন্ন যাঁতাকলে নারীদের চরম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা সে যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর চিন্তাধারার এই পরিচ্ছন্নতায় আরো বিস্মিত হতে হয় যখন বিবেচনা করা হয় যে, গৃহশিক্ষায় ও স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিতা রোকেয়া শহুরে সামাজিক পরিবেশের কোন সুযোগ-সুবিধা পান নি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ১৯০৪ সালে রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন : "...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" (*নবনূর*, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা)। এই প্রবন্ধটি যখন পরবর্তীকালে গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হয় তখন উক্ত পরিচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়।

রোকেয়া অবরোধ ও পর্দাপ্রথার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। পর্দাপ্রথা' সামাজিক ভদ্রতার পরিচায়ক বিধায় অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু 'অবরোধ প্রথা' পর্দাপ্রথার এক সামাজিক ও সাময়িক বিকৃত রূপ, তাই নিন্দনীয়। রোকেয়া নিজেও পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন (এমনকি জীবনের কোন এক পর্যায়ে বোরকাও পরেছেন)। উনিশ শতকের অন্যান্য উদার সমাজসংস্কারকদের মতো নারীমর্যাদার সমস্যাকে ঘিরেই রোকেয়ার আহ্বান ছিল এবং তিনি একই অনিশ্চয়তা, বৈপরীত্য ও অবিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন।[৬৯] পুরুষশাসিত সমাজে নারীসমস্যার সমাধান (যদিও কথাগুলো তখন ঠিক এইভাবে প্রকাশিত হয় নি) এবং নারীর আর্থিক মুক্তির উপায় হিসেবে শিক্ষাপ্রচার করতে গিয়ে তিনি এক বিরল, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

নুরুন্নেসা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫) রোকেয়ার সমসাময়িক এবং বাংলার' মুসলিম নারীমুক্তির অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও তাঁর লেখার মধ্যে *স্বপ্নদ্রষ্টা* (১৯২৩), *জানকীবাঈ* (১৯২৪) এবং *আত্মদান* (১৯২৫) উল্লেখযোগ্য। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিও প্রদান

---

৬৯. দেখুন, Sonia Nishat Amin, "Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Renaissance", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, 24: 2(1988), 185-192.

করা হয়, যা কিনা তখনকার জন্য এক বিরল সম্মান। মামলুকুল ফাতিমা খানমের সাহিত্যকর্মও ১৯১২ -১৯২১ সালের অন্তর্গত। রোকেয়া, নুরুন্নেসা ও ফাতিমা এঁরা সবাই উনিশ শতকের শেষ দশকসমূহে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় বিশ শতকে।

রোকেয়া শামসুননাহার মাহমুদকে (১৯০৯-১৯৬৪) একজন সহকর্মী এবং শিষ্যা হিসেবে পেয়েছিলেন। শামসুননাহার ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং রাজনীতিবিদ। নোয়াখালীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রথম দিশারী ছিলেন তাঁর মা এবং তাঁর উপর তাঁর নানা মৌলবি আবদুল আজিজের (পূর্বে উল্লেখিত 'মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনে'র একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) বিশেষ প্রভাব ছিল। যদিও মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে আবদুল আজিজ এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তথাপি তিনি সামাজিক নিন্দার মোকাবেলা করতে সাহস পান নি, যা নিশ্চিতরূপে দেখা দিত যদি তাঁর এই প্রতিভাময়ী নাতনী পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করে স্কুলে যেতো। তাঁর আগের ও পরের অনেক উদার মতাবলম্বী সমাজসংস্কারকের মতো সম্ভবত তিনি সাবধানতায় বিশ্বাস করতেন এবং প্রয়োজনবোধে আপোস করে নিতেন। তাই মাত্র নয় বছর বয়সে শামসুননাহারকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে আসা হলো এবং গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২৬ সালে 'প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী' হিসেবে তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন ও বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এই প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে সম্ভবত পর্দাপ্রথা ও শিক্ষার দ্বন্দ্বের বিশ শতকের গোড়ার দিকের এক সমাধান।

১৯৩৯ সালে ফজলুল হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তখন মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই শামসুন্নাহারকে একজন শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয়। কলকাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি রোকেয়ার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' (রোকেয়ার নারীমুক্তি সংগ্রামের অর্থনৈতিক ফ্রন্ট) গড়ে তোলার ব্যাপারে। "শামসুন্নাহারের কাজ শুরু হলো সেখান থেকে যেখানে রোকেয়া শেষ করেছিলেন।"[৭০] তিনি ছিলেন দুই যুগের সেতুবন্ধন— বিশ শতকের প্রথম দিকের দশকগুলো (যখন রোকেয়ার মতো নারীরা প্রায় একাই লড়াই করে চলেছেন) এবং বর্তমান যুগ (যখন একজন বাঙালি নারী, যার সামর্থ্য আছে, অন্তত পর্দার দোহাই দিয়ে তার শিক্ষাগ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না)-এ দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন।

৭০. শাহিদা পারভীন, 'বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি' (অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৮৬)— এতে লেখক শামসুন্নাহারের জীবনের এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিবিশেষই ইতিহাসে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকাকে কোনক্রমেই অতিরঞ্জিত বলা চলে না। ১৯১৬ সালে রোকেয়া কর্তৃক 'সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান' আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষাবিদদের জন্য এক আদর্শ হিসেবে কাজ করে। রোকেয়া ও শামসুন্নাহারের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের নারী ও পুরুষকে নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে কাজ করার উৎসাহ যুগিয়েছে। ১৯১৪ সালে রোকেয়ার স্কুল থেকে একটি বৃত্তি প্রদান যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই সময়ের পরিসংখ্যানে এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা হিন্দু ছাত্রীদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী স্তরে (মাধ্যমিক) এই সংখ্যা দ্রুত নীচে নেমে যায়, যার কারণ পর্দা ও বাল্যবিবাহ (যা মুসলমানদের মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হতো)। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, যেমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম নারী এই সময় খুব অল্পই উন্নতি লাভ করতে পেরেছে।

পূর্ব বাংলার শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাসে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এক যুগনির্দেশক যোজনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ, যিনি বেথুন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করার পর ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯২৪-১৯২৫ সময়ের মধ্যে ঢাকায় মেয়েদের জন্য চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত 'দীপালী সংঘ' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছাত্রীভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে থাকে এবং পরে তা বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করার পরেও ছাত্রীদের জন্য এক পৃথক সময়সূচির ব্যবস্থা করে। আরো অবাক হবার কথা এই যে, এই গুটিকতক অদম্য ছাত্রীকে পাহারা দেয়ার জন্য একজন মহিলা পরিচারিকাও নিয়োগ করা হয়েছিল। ভয় ছিল, এই কয়েকজন নারী ঘরের বাইরে আসার জন্য বহুদিনের প্রথা ভেঙেছে, না জানি কি বিপদ আসে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে ১৯২৭ সালে অঙ্কশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রির জন্য যখন ফজিলাতুন্নেসা এই বিভাগে প্রবেশাধিকার পেলেন, তখন মুসলিম সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসা মাস্টার ডিগ্রি পেলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এই ঘটনা পরবর্তী দশকসমূহে স্ত্রীশিক্ষার গতিসঞ্চার করে এবং মেয়েরা ক্রমেই বেশিকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে।

১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে করুকণা গুপ্তার নিয়োগ আর এক মাইলফলক। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৩৩ সালে করুকণা ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন। তাঁর এই নিয়োগ দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মজীবী মহিলাদের এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করে।[৭১]

---

৭১. আরো বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Nurul Huda Abul Mansur. "Participation of Women in Dhaka University : The Early Phase", *The Dhaka University Studies* , Part A, Vol. 47, NO, 2, Dec. 1989.

যুদ্ধ এবং বাংলার নারীসঙ্ঘসমূহ

দেশ যখন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদী-আন্দোলনে (separatist) নিমগ্ন, তখনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাগদানব ফণা মেলে উঠলো। এই মহাসংগ্রামের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের আনাচেকানাচে দেখা দিল। মহিলারা নতুন নতুন ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হলো। দুর্ভিক্ষ আর অরাজকতার মধ্যে নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলো। বিভিন্ন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদেরকে সংগঠিত করে। ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এই ধরনের অনেক সংগঠন ছিল। এই সমিতিসমূহ এবং সেইসাথে মাতঙ্গিনী হাজরা ও লালবিবির মতো মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন পূর্ববাংলায় পর্দাপ্রথার বন্ধন ছিন্ন করতে এক বিরাট ভূমিকা রাখে। "এই সমস্ত আন্দোলনের প্রভাবে পর্দাপ্রথার মুঠো ধীরে ধীরে শিথিল হতে শুরু করে।"[৭২]

বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি ও 'পাকিস্তানে'র দাবি ভারতীয় নারী আন্দোলনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের উপর কালো ছায়া ফেলে। 'অভিন্ন কর্মসূচি'র ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং লালিত আগের দশকসমূহের সেই একাত্মবোধ খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে যায় এবং হয়তো বা তা ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে ও ভিন্ন এক সময়ে পুনর্জন্মের অপেক্ষায় রয়ে গেল।

ভারতবিভাগ ও নতুন বাস্তবতা

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের ফলে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের সৃষ্টি হয় এবং এইসাথে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাংশরূপে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। যে ধর্মের ভিত্তিতে এই নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে, সে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, যা বিরাট আঞ্চলিক ব্যবধানে থাকা দুটো ভৌগোলিক অংশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। সাবেক পূর্ব বাংলা দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হলো এবং এভাবে হঠাৎ করেই বাংলা তার হাজার বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতোধারা হারিয়ে ফেলে। নতুন রাষ্ট্রের এই ধর্মনির্ভরতা নারীর জন্য এক সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। কেননা ধর্ম প্রায়শই কিছু লোকের ক্রীড়নক হয়ে নারীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে থাকে। ১৯৪৭ সালের পর আবার কিছু সময়ের জন্য নারীরা কঠোর 'অবরোধ', নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি হলো।[৭৩] ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র মতো সমাজে নারীর ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনে নিবেদিত কিছু সংখ্যক মহিলা সমিতি সংগঠনকে সরকার উৎসাহিত করেছিল।

---

৭২. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, (ঢাকা ১৯৮৫)।

৭৩. ঐ।

পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকশ্রেণী চব্বিশ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশে পরিণত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক কারণে। বিরাট সংখ্যায় হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় চলে গেলে পূর্ব বাংলার শিক্ষাকার্যক্রমের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এক সময়ে শিক্ষামন্ত্রী মেয়েদের স্কুল ও কলেজসমূহ বন্ধ করে দেবার কথাও চিন্তা করেছিলেন। যাই হোক, কতিপয় সাহসী মহিলা শিক্ষাবিদ এই দুঃসময়ে যেকোন মূল্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখার চেষ্টা করেন, বিক্ষোভ করেন এবং ছাত্রী সংগ্রহাভিযান চালান। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র গুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে স্কুল-কলেজে মেয়েদের আগমনে বাধা দিয়ে আবার তাদেরকে পর্দার অন্তরালে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। বুদ্ধিজীবী নর ও নারীদের অনেক যত্নে লালিত ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য নতুন রাষ্ট্রে লুপ্ত হবার আশংকা দেখা দিল।

রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। অনেক নারী এই আন্দোলনে ও ১৯৫০ সালের কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ইলা মিত্র ও নাদিরা বেগম এই সময়ের দুজন বিখ্যাত মহিলা। নারীর এই অংশগ্রহণ তাদের নিজেদের সমস্যা মিটাতেও সহায়ক হয়, অন্তত নারীর প্রকাশ্যে উপস্থিত হবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট আইয়ুব খানের সরকারে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। তবু অন্তত একটি ব্যাপারে এই সরকার গর্ব করতে পারে, তা হচ্ছে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম ফ্যামিলি'ল অর্ডিন্যান্স' (মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স) জারি এবং তা ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মাইলফলকবিশেষ। যদিও এটি ছিল অনেকখানি 'কেতাবে', বাস্তবে নয়, তবুও এই অর্ডিন্যান্স পরবর্তীকালে সংগ্রামী নারীদের সামনে এক আদর্শ হয়ে দেখা দেয়। "বৈষম্যমূলক লিঙ্গতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমগ্র পাকিস্তানী আমলে বিরোধিতা করা হয়েছে, যদিও তলে তলে।"[৭৪] রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ধর্মের বিধিবদ্ধ ও তুলনামূলক গোঁড়া ব্যাখ্যার সাথে স্থানীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গির অশান্ত বিরোধ জাতীয় চিন্তাধারার এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের বহিঃপ্রকাশ প্রায়শই দেখা যেতো এবং নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত মতাদর্শের নানা বিরোধপূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্যেই তা মূর্ত হতো। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি, এর সুপ্ত জাতীয়তাবাদের প্রতি এবং বিশেষকরে বাঙালি নারীর জীবনধারার মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রতি শাসক সম্প্রদায়ের সর্বদাই তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রাক-মুহূর্তের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাই বাঙালিজীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত সাজসজ্জা মেয়েদের পরিহিত লাল ও হলুদ বর্ণের উৎসবশাড়ি, কপালের টিপ, স্থানীয় ফুল, মেলা, বাঙালি খাবার গুড়-মুড়ি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতার আসর প্রতীকী প্রতিবাদের তথা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটি রূপ হিসেবে দেখা দিল।

---

৭৪. Naila Kabeer, "Subordination and Struggle : Women in Bangladesh", *New Left Review*, March/April, 1988.

পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের গণবিদ্রোহ আর একবার গণআন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের পথ খুলে দিল। ঐ বছরেই 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি, সমাজসংস্কারক ও নারী-অধিকারের আন্দোলনকারী বেগম সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) নেতৃত্বে এই সমিতি স্বাধীনতার পর 'মহিলা পরিষদে' রূপান্তরিত হয়। এককভাবে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশে গণভিত্তিক বৃহত্তম মহিলা সংগঠন।

যদিও ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কাল নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে, তথাপি এ কালপর্বে নারীর সমস্যাবলীর বৃহদাংশই সমাধান না করে বহাল রাখা হয়েছিল। আইনগত ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ছিল মানবেতর পর্যায়ে। আদর্শিকভাবে তখনো অব্যাহত ছিল পিতৃতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য—সমাজের অনেক গভীরে বিস্তারলাভ করেছিল তার শেকড়। তা ছাড়া তখনো নারী আন্দোলন ছিল কেবল শহরকেন্দ্রিক ব্যাপার, বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলে তা গড়ে উঠে নি।[৭৫]

এই সমীক্ষায় বহু ব্যক্তির আলোচনা বাদ পড়ে গেছে সময়, স্থান ও তথ্যের স্বল্পতার জন্য। এই প্রবন্ধকে একটি জানালা হিসেবে আমি দেখতে চেয়েছি (এবং আশা করি পাঠকও তাই চাইবেন), এমন একটি জানালা যার মধ্য দিয়ে বিগত যুগের কিছু কিছু দৃশ্য, ঘটনা ও ব্যক্তি থেকে থেকে ভাস্বর হয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। তাতে সেই কালের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি আমরা পাই না. পাই একটি স্বাদ ও ধারণা।

---

৭৫. Salma Khan, *The Fifty Percent : Women in Policy and Development in Bangladesh*, (Dhaka 1988), 107.

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি

মোহাম্মদ শাহ*

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। এসব লেখার প্রায় সবটুকুই 'এলিট' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে, যার ফলে জাতীয়তাবাদ আখ্যা পেয়েছে 'এলিট' কিংবা 'মধ্যবিত্তে'র আন্দোলন হিসেবে, যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।[১] এই মতামতকে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে 'সাব অলটার্ন গ্রুপ' নামধারী একদল ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, গুহ ১৮৬০ সালে বাংলায় নীলকর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রজাদের আক্রমণকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের একটি বাস্তব ঘটনা বলে অভিহিত করেন।[২] এই অধ্যায়ে কোন বিশেষ মতামতকে সঠিক বা ভুল বলার যুক্তি উপস্থাপন করা হবে না, তবে এখানে দেখানো হবে যে, উৎপত্তি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি বলে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' যে সূত্র রচনা করা হয়েছে, তা বাংলার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর গবেষণা করে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, হিন্দু ভদ্র সম্প্রদায় ও মুসলমান কৃষককুলের সংঘর্ষ কখনো সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় নি।[৩] এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, একটি পৃথক জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Tarasankar Banerjee, "Early Nationalism in Bengal. Its Concept and Content" , *The Quarterly Review of Historical Studies*, xxi: 4 (1981-82), 13.

২. Ranjit Guha, "Neel-Darpan : The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror", *The Journal of the Peasant Studies*, 2:1 (1974), 41.

৩. C. A. Bayly, " The Pre-History of 'Communalism': Religious Conflict in India, 1700-1860", *Modern Asian Studies*, 19: 2 (1985), 203.

বাঙালিত্বের ধারণা প্রাক-বৃটিশ যুগেই সূচিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে এই ধারণা স্তিমিত থাকে, কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের স্বার্থের পরিপন্থী শাসনের ফলে তা পুনর্জীবন ও পূর্ণতা লাভ করে। জাতীয়তাবাদের সর্বসম্মত ও পরিপূর্ণ সংজ্ঞায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবের কারণে জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ সংজ্ঞাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে একটি 'মানসিক অবস্থা' বা 'একটি চেতনা', যা কোন লোককে তার নিজের দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে তুলে ধরতে, তার পক্ষাবলম্বন করতে এবং তার জন্য কাজ করতে প্রলুব্ধ করে।[৪]

১. বাঙালি জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের উদ্ভব

বাংলায় হিন্দুধর্মের বিকাশলগ্ন থেকেই অবাঙালি ব্রাহ্মণরা বাঙালি ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার অভ্যাসটিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং তাদের সাথে একত্রে আহার করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তারা অন্যভাবেও বাঙালি ব্রাহ্মণদের কলুষিত বলে বিবেচনা করেন।[৫] হিন্দু শাসনের কেন্দ্রস্থল থেকে বহু দূরত্ব এবং নদীবহুল বাংলার দুর্গম যোগাযোগব্যবস্থার কারণে গুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু রাজবংশের শাসক বাঙালিদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে উদার নীতি গ্রহণ করেন। এইভাবে 'সহজিয়া' ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৬] মুসলমানদের বিজয়ের পর পরই আরব, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে সুফিরা সর্বজনীন প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যখন বাংলায় আগমন করেন, তখন হিন্দুরা ইসলামের ঐসব উদার গুণাবলীকে স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। অনেকে আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) তাঁর সমসাময়িক সুফিদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর নতুন বৈষ্ণব আন্দোলন 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ' ইসলাম ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর নতুন বৈষ্ণব আন্দোলনটিকে মোটামুটিভাবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। পণ্ডিতরা মূর্তিপূজা ও বর্ণহিংসার প্রতি তাঁর বিমুখতাকে ইসলামী প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।[৭] শ্রীচৈতন্য একটি নতুন অতীন্দ্রিয়বাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যার ভিত্তি হলো বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। বৈষ্ণব সাধুদের জীবনকাহিনী প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে

---

৪. Hafeez Malik, "Sir Sayyid Ahmad Khan's Contribution to the Development of Muslim Nationalism in India, *Modern Asian Studies*, 4: 2 (1970), 129; Niharranjan Roy, *Nationalism in India: An Historical Analysis of its Stresses and Strains*, (Aligarh 1973), Lectures 1-2.

৫. Ramkrishna Mukherji, "The Social Background of Bangladesh" in Kathlan Gough and Hari Sharma (ed.), *Imperialism and Revolution in South Asia*, (New York 1973), 400.

৬. M.G. Rasul, "The Advent of Islam in Bengal: Its Socio-cultural Impact" in M I. Hoque (ed.), *Society and Culture in Islam*, (Chittagong 1986), 105.

৭. ঐ, 106-107.

তাজকিরাহ-ই-আউলিয়ার অনুরূপ, বৈষ্ণব পদাবলী বা গীতিকবিতাকে উপমার ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গি বা সার্বিক আকৃতির দিক থেকে গজলের অনুকরণ বলে মনে করা হয়।[৮]

হিন্দুদের সঙ্গে শত শত বছরের সান্নিধ্যের কারণে মুসলমান সমাজে কিছুটা হিন্দু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও তা তাদের ধর্মের মূলনীতির প্রতি বিশ্বাসকে নাড়া দিতে পারে নি। কিছু বাঙালি মুসলমান কবিও যোগী এবং তান্ত্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের অন্যতম হলেন *জ্ঞানপ্রদীপ*-এর লেখক সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), *যোগ কলন্দর*-এর লেখক সৈয়দ মুর্তজা (১৫৯০-১৬৬২), *নূর জামাল*-এর লেখক *হাজি মোহাম্মদ* (১৫৫০-১৬২০), *জ্ঞানসাগর*- এর লেখক আলি রেজা (১৬৯৫-১৭৮০), *চারি মাকাম ভেদ* গ্রন্থের প্রণেতা আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) এবং *সিরনামা* গ্রন্থের লেখক শেখ মনসুর (১৭০৩ খৃ.)। তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে সুফি ভাবধারা ও তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হন। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, আলি রেজা, শাহ আকবর, নাসির মাহমুদ, সালেহ বেগ এবং করম আলি 'পদাবলী' রচনা করেন। অতীন্দ্রিয়বাদী চারণ কবি লালন শাহ (১৭৬৮-১৮৪০) গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুসরণ করেন নি। তিনি তাঁর অসংখ্য গীতিকবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের শান্তিপূর্ণ ঐক্যের বাণী প্রচার করেন এবং ধর্ম ও বর্ণের বাধা ডিঙিয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আগত লোকজনকে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইভাবে মুসলমান 'তাসাউ-উফ' বা সুফি ভাবধারার সাথে হিন্দু 'যোগ' এবং 'তান্ত্রিক' দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটে।[৯]

গ্রামবাংলার দরিদ্র এবং নিম্ন পেশাজীবী মুসলমানরা হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হবার পরও সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের পুরনো ঐতিহ্যকে বহুলাংশে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যেসব মুসলমান প্রথম প্রয়াসী হন,তাঁদের রচনাতেও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। যেমন, *গাজী কালু চম্পাবতী* কাব্যে হিন্দু দেবী দুর্গাকে মুসলমান গাজীর 'মাসী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, *জেবুল মুল্ক শামারুখ* কাব্যে হিন্দু দেবদেবীদের মুসলমান পীরদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কখনো কখনো হিন্দু দেবদেবীদের আল্লাহ ও নবীর সমমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।[১০] মুহাম্মদ

---

৮. M. Enamul Haq, "Muslim Contributions to the Development of Bengali Language and Literature" in S. Sajjad Hussain (ed.), *East Pakistan: A Profile*, (Dacca 1962), 109.

৯. Rasul, "Islam in Bengal", 110-11; Haq, "Bengali Language and Literature", 113; A. F. Salahuddin Ahmed, "Muslim Thought and Leadership in Bengal in Nineteenth Century" in Diptendra Banarjee et al. (ed.), *Essays* in Honour of Professor S. C. Sarkar, (New Delhi 1976), 639; যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি*, (কলিকাতা ১৯৬২) এবং আনোয়ারুল করিম, *বাউল কবি লালন শাহ*, (ঢাকা ১৯৬৬)।

১০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, (ঢাকা ১৯৬৫), ৮৩।

আকবর (জ. ১৬৫৭ খৃ.) তাঁর *পুঁথি কাব্যে* আল্লাহকে ঈশ্বরের, হাওয়াকে কালীর, রসুলুল্লাহর সাহাবাদের শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ রাখাল সঙ্গী এবং *কোরানকে* পুরাণের সমমর্যাদা প্রদান করেন। তিনি হিন্দু দেবদেবীদেরও নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীচৈতন্যকে রসুলুল্লাহর অবতার হিসেবে বর্ণনা করেন। সেকালের মুসলমান বাউলরা হিন্দু দেবী নিরঞ্জনের প্রশংসা করেই তাঁদের কাব্যের মুখবন্ধ রচনা করেন। পীর এবং পবিত্র নগর মক্কা ও মদীনার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো কখনো তাঁরা কাশী, বৃন্দাবন ও হিমালয়ের বন্দনা বা প্রশস্তি রচনা করেন। তাঁদের কেউ কেউ জগন্নাথ, নারায়ণ, পদ্মা এবং সীতার বন্দনাও রচনা করেন।[১১] কিছু কিছু মুসলমান আতসবাজি পোড়ানো, চৈত্রসংক্রান্তি ও দুর্গাপূজা উৎসব পালন, হিন্দু নাম গ্রহণ, কবরে চেরাগ, বাতি বা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সিজদা প্রদানের মতো হিন্দু আচার অনুসরণ করেন।[১২] এইভাবে বেশ কিছু মুসলমানের ধর্মীয় আচরণ হিন্দু আচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায় আরো একটি প্রচলিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। বাংলায় পীর নামে খ্যাত সুফিরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মাঝেই বসবাস করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে তাঁরা লৌকিক উপাখ্যানের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হন। এইভাবে 'সত্যপীরকে' (যাঁকে হিন্দুরা 'সত্যনারায়ণ' বলে আখ্যায়িত করে) কেন্দ্র করে একটি নিয়মিত ধর্মীয় আচার গড়ে উঠে।[১৩] সত্যপীর সকল মন্দের অবসানকারী এবং সকল উন্নতির বিধায়ক হিসেবে বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। মজার ব্যাপার এই যে, নিম্ন পেশায় নিয়োজিত গরিব মুসলমানরাও সত্যপীর পূজায় অংশগ্রহণ করতো বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত পোষণ করেন।[১৪] কারো কারো মতে, হিন্দু সমর্থন লাভের আশায় হুসেন শাহের মতো শাসকও সত্যপীরকে লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছিলেন।[১৫] আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে একই মঞ্চে সমবেত করার উদ্দেশ্যে সুফিরাও সত্যপীরের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন ১৫৭৫ সালে শেখ ফয়জুল্লাহ লিখেন *সত্যপীর*। আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আঠারো শতকে উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা এই বিষয়ে একটি বিশেষ সাহিত্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন।[১৬] এইসব সাহিত্যিকের অন্যতম হলেন গরিবউল্লাহ এবং আরিফ। জনপ্রিয় দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল

---

১১. প্রাগুক্ত, ৮৫।

১২. রিয়াজুদ্দিন আহমদ, *আল-এসলাম*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।

১৩. Haq , "Bengali Language and Literature", 109-110.

১৪. Aparna Bhattacharya, "Worship of Satyapir: An Example of Hindu-Muslim Rapproachment in Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress*, 32 Session, Jabalpur 1970, 204.

১৫. ঐ, 205.

১৬. Haq, "Bengali Language and Literature", 110.

হয়ে গরিবউল্লাহ লিখেন *সত্যপীর* এবং নতুন গল্প রচনার মাধ্যমে সত্যপীরের প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্যে আরিফ লিখেন *লালমনের কেচ্ছা*।[১৭]

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দের ক্ষেত্র রচনায় মুসলমান শাসকরাও সুফিদের অনুসরণ করেন। তুর্কী শাসকরা ইসলামের সাম্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। ফলে সাধারণ মানুষের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব হয়। যদিও সেন রাজারা বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন, কিন্তু মুসলমান শাসকরা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেন নি, বরং সাধারণ মানুষের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যাতে বাংলাও সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে সেই চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুযোগও তাদের ছিল না এই জন্য যে, তাঁরা স্বাধীন সুলতান হবার আশায় প্রায়ই দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসকদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। এইভাবে তাঁরা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে এর নিজস্ব গতিতে চলার সুযোগ দেন। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের 'পিতৃভূমি' থেকে বছরের পর বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার মাটিতে বসবাসের কারণেও এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে তাঁদের মনে সদিচ্ছার ভাব জাগ্রত হয়েছিল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার স্বাধীন সুলতানরা (১৩৫১-১৭৭৫ খৃ.) অত্যন্ত উদারতার সাথে বাঙালি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মধ্যযুগীয় বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৯-১৩৮৯ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। *ইউসুফ-জুলেখার* লেখক মুহাম্মদ সগীর, মিথিলার বিখ্যাত গীতিকবি বিদ্যাপতি এবং ফার্সিপ্রভাবিত বাংলা গানের রচয়িতা নূর কুতুবে আলম সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি এবং বাংলা *রামায়ণের* লেখক কৃত্তিবাসকে সম্মানিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সুলতান জালালউদ্দিন (১৪১৮-১৪৩১ খৃ.)। *ভাগবত*-এর বাংলা অনুবাদক মালাধর বসু এবং *রসুল বিজয়*-এর লেখক কবি জয়নুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খৃ.)। হুসেন শাহী বংশের সুলতানরা (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিখ্যাত *মনসামঙ্গল* কাব্যের লেখক বিজয় গুপ্ত (মৃ. ১৪৯৪ খৃ.) এবং বিপ্রদাস পিপিলাইকে (মৃ. ১৪৯৫ খৃ.) তাঁরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিদ্যাপতি নামে খ্যাত যশোরাজ খান, বাংলায় *মহাভারত*-এর অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং বিদ্যাসুন্দর বিষয়ে প্রথম গাথা রচয়িতা কনক, পদাবলীর লেখক কবিরঞ্জন, শেখ কবির এবং শ্রীধর কবিরাজ সহ এক দল কবি সুপ্রতিষ্ঠিত হন।[১৮]

---

১৭. ঐ, 117.
১৮. ঐ, 104-106; মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা", মোঃ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, (ঢাকা ১৯৮৭), ৪৬।

মুসলমান শাসকরা মনসবদারের মতো উচ্চ রাজপদে এবং জমিদার হিসেবে হিন্দুদের নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি । তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় বহু আরবি ও ফার্সি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয় এবং এই ভাষা সমৃদ্ধ হয়। এমনকি মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই আরবদের 'মিশনারি' ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলা ভাষা আরবি ও ফার্সি শব্দের সংস্পর্শে আসে। কুমিল্লার ময়নামতি ও রাজশাহীর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ আশ্রমে প্রাপ্ত নবম হতে দ্বাদশ শতকের আব্বাসীয় মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব ও পারস্য দেশের সঙ্গে পূর্ব বাংলার দীর্ঘ এবং ক্রমাগত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাংলায় সুফিদের আগমনের পর এই যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে আরব বণিক, মুসলমান শাসক ও সুফিরা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে এমনই প্রভাবিত করে যে, এর ফলে একটি মিশ্রিত নতুন বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে, যা আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে আলাদা ছিল।[১৯]

বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমানের তাঁত বা কাপড় বোনা, মাছ ধরা, তৈল-নিংড়ানো (কলু বা খুলুর পেশা) প্রভৃতি পেশায় যৌথভাবে নিয়োজিত হওয়াও হিন্দু-মুসলমানের মিলনে সহায়ক হয়েছে। ফলে প্রাক-বৃটিশ যুগে ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গোষ্ঠীগত ও জাতিগতভাবে বাঙালি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়।[২০]

২. মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

হিন্দু ও মুসলমানের উপরোক্ত মিলন বেশ কয়েক শতক ধরে চলে, কিন্তু উনিশ শতকে মুসলমান সংস্কারকরা বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনা থেকে অমুসলিম ভাবধারা বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হন।[২১] যতোদিন হিন্দু-মুসলমান মাত্র দুটি পক্ষ ছিল, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ভিন্নতর অবস্থান এবং ধর্মের মূলনীতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ততোদিন দু'পক্ষ সরাসরি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে বাঙালি সমাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। উপনিবেশপূর্বকালের বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। এ কারণে তারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি যতোটা আগ্রহী ছিল, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল ধর্মের প্রতি। ইহলৌকিক প্রসঙ্গে তাদের আগ্রহ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ফলে ইহলৌকিক জীবনযাত্রায় ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধের অবকাশও ছিল কম। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান প্রাক্তন ধর্মীয় বৈষম্য শুধু প্রকটই হয় নি, নতুন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চাপে সেই বৈষম্য ক্রমশ স্ফীত ও বিরোধমূলক হয়ে উঠে।[২২]

---

১৯. Haq, "Bengali Language and Literature", 103-104.

২০. মুখার্জী, "বাংলাদেশ", ৪০১।

২১. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, (কলিকাতা ১৯৫১), ৯৮; Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, (Dhaka 1983), xi-xiii.

২২. সুরজিত দাসগুপ্ত, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, (কলিকাতা ১৩৮৩), ১৫৪, ১৫৭-১৫৮।

মুসলমান সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব এবং এর প্রকৃতি

ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি বাড়তে থাকে প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, ইসলামবিরোধী খৃস্টান 'মিশনারি' প্রচারণা; দ্বিতীয়ত, অতীন্দ্রিয়বাদ ও সংমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং তৃতীয়ত, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। সংক্ষেপে ও পর্যায়ক্রমে নিচে এগুলি আলোচনা করা হলো।

উনিশ শতকে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *প্রফেটস টেস্টিমোনি অব খ্রাইস্ট, মোহামেডান সেরিমোনিজ,* এবং *রিজনস ফর নট বিইং এ মুসলমান* । তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে খাটো করে মুসলমানদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। যেহেতু 'মুসলমানী বাংলা' বা মিশ্রিত ভাষা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় ছিল, তাই খৃস্টান পাদ্রীরা মুসলমানী বাংলায় কিছু বই লিখেন। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একটি মিশনারি পুস্তিকায় ইসলামের নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালানো হয়।[২৩] ১৮৮৫ সালে জে. লঙ প্রণীত (শুদ্ধ বাংলায়) *মোহাম্মদের জীবনচরিত* গ্রন্থে নবীকে কোরানের প্রণেতা, মৃগীরোগী এবং বহু নারীর প্রতি আসক্ত সংসার সুখান্বেষী একজন পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪] পাদ্রী জি.এইচ. রউস প্রণীত *ফোরকান* (১৮৮৪ খৃ.) গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোরান আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ নয়।[২৫]

কিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী এবং মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তারলাভ করে তা আগে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, উনিশ শতকের শেষদিকে ঐ অতীন্দ্রিয়বাদী এবং মিশ্রিত সংস্কৃতিকে মুসলমান সংস্কারবাদীরা তাদের সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের নজির হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করে।[২৬] তাঁদের ভয় ছিল হিন্দু ও খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাবের ফলে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বুঝি হুমকির সম্মুখীন হয়। অতএব, মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে তাঁরা এক ধরনের সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত হন, যা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে জাগ্রত এবং সুসংহত করবে বলে তাঁরা ধারণা করেন। এ ধরনের সাহিত্যিকদের একজন হলেন শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), যিনি *হযরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি* গ্রন্থটি প্রণয়ন

---

২৩. M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities, 1833-1857*, (Chittagong 1965), 3.

২৪. Muslims believe that God revealed Quran to the Prophet Muhammad. Muhammad is the messenger of God rather than the author of the Quran.

২৫. *Catalogue of printed Bengali Books in the British Library* , 3 Vols., (London 1886-1939), 1, 25; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৭৫৭-১৯১৮*,(ঢাকা/কলিকাতা ১৯৬৪/ ১৯৭১), ২৫৯।

২৬ . আকরম খাঁ, *সামাজিক ইতিহাস*, ৮৫; রিয়াজুদ্দিন আহমেদ, *আল-এসলাম*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।

করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হযরত মোহাম্মদকে খৃস্টান পাদ্রীরা বহু নারীর প্রতি আসক্ত ও ভোগবিলাসী পুরুষ হিসেবে যেভাবে চিহ্নিত করেছে এবং শক্তি প্রয়োগে ইসলাম প্রচারের যে কাহিনী প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক নয়।[২৭]

মুন্সি মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ও তাঁর বন্ধু শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) খৃস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন বাংলার বিভিন্ন এলাকায়। ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদ্রীদের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য মেহেরউল্লাহ *খৃস্টান ধর্মের অসারতা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। হিন্দুপ্রভাবিত মিশ্রিত সংস্কৃতি থেকে মুসলমানদের খাঁটি ইসলামী জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি *হিন্দু ধর্ম রহস্য বা দেবলীলা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[২৮]

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ এইসব লেখককে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। উনিশ এবং বিশ শতকের জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাদের আধুনিক অগ্রগতি ও অতীত গৌরবের তুলনায় মধ্যযুগের ভারতকে অন্ধকার ও লজ্জার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে।[২৯] এমনকি, তাঁদের একজন সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) শাসনামলে বাংলার গৌরবময় যুগকেও অত্যাচারী এবং ধর্মান্ধের শাসনকাল হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩০] কেউ কেউ মুগল শাসককে 'বিদেশী' এবং শিবাজীকে 'হিন্দু জাতির' বীর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) 'আর্যসমাজ আন্দোলনও' ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামান্তর। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৩৪-১৮৮৩) বাংলায় যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন তার মূলেও ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই মুসলমানরা ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নি।[৩২] পি. সি. মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো বিপ্লবীরাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে আশা করেছিলেন যে মুসলমানরা ঐ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করবে।[৩৩] এইভাবে হিন্দু জাগরণের সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের কাছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিসেবেই

---

২৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম ইতিহাস*, ২৬১-১৬২।

২৮. শেখ মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন, *মেহের চরিত*, (নদিয়া ১৯০৯), ১১, ৭৮, ৯০-৯১; মোহাম্মদ অছির উদ্দিন, *মেহেরুল্লার জীবনী*, (জলপাইগুড়ি ১৯০৯); শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ*, (কলিকাতা ১৯৩৪)।

২৯. কাজী আবদুল ওদুদ, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধ", বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতামালা, ১৯৩৫, *বিশ্বভারতী স্টাডিজ*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৬।

৩০. R. C, Majumder (ed.), *The Delhi Sultanate*, Vol. 6, (Bombay 1966), 339-344.

৩১. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vols. 1 & 2 (combined), Bombay, xii; *Shivaji and His Times*, (Calcutta 1948), 372.

৩২. Jawaharlal Nehru, *Glimpses of the World History*, (4th edn.), 1949, 437.

৩৩. মুজফ্‌ফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি*, ১৯২০-২৯, (কলকাতা ১৯৭১), ৪৩২-৪৩৩।

প্রতিভাত হয় এবং ভারতে মুসলমানদের মনে করা হয় বহিরাগত।[৩৪] হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উষালগ্নে হিন্দুরচিত ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যা মুসলমানদের মনে এই নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি করে যে হিন্দু লেখকরা তাদের ইতিহাস ও ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) 'যবন' (মুসলমান) শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করেছে।[৩৫] দুর্ভাগ্যবশত রঙ্গলাল ১৮৫৭ সালের বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে শুধু সেই সকল সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা নেবার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান যেগুলোতে হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

রঙ্গলালের সাথে সুর মিলিয়ে হেমচন্দ্র তাঁর *বীরবাহু*-তে মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিন্দুদেরকে সচেতন হবার জন্য আহ্বান জানান।[৩৬] ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধে* ভারতে বৃটিশ শাসনকে মুসলমান শাসনের চেয়েও অধিক নিপীড়নমূলক হিসেবে দেখিয়ে মোটামুটিভাবে মুসলমান প্রশাসনের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁর *স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস*-এ তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের কাল্পনিক বিজয় প্রচার করেন এবং ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দুদের মাতৃভূমি হিসেবে বর্ণনা করেন। এখানে তিনি হিন্দুদের ভারত মাতার গর্ভজাত সন্তান এবং মুসলমানদের 'বিদেশী' না বলে ভারতের পোষ্য সন্তান হিসেবে দেখিয়েছেন। ভূদেব তাঁর *দি নাইনটিনথ পুরাণ* গ্রন্থেও মুসলমানদের বিকৃতভাবে চিত্রিত করেছেন এবং মধ্যযুগে সত্যিকারের দেশপ্রেম লক্ষ্যগোচর না হলেও তিনি তাঁর *অঙ্গুরীয় বিনিময়* (১৮৫৭)-এ শিবাজীকে হিন্দুর জাতীয় বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৭] *পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে* (১৮৫৭) নবীনচন্দ্র সেন দেখাতে চেয়েছেন যে, যবনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলার অধিবাসীরা বৃটিশের আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাঁর মতে, বাংলার জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি হীন 'যবন'দের শ্রদ্ধা ছিল না এবং সেজন্যই ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে বাংলার 'নদী ও পাহাড়' বৃটিশের গৌরবের জয়গান গায়।[৩৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪) তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যখ্যাতির পাশাপাশি হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের জনক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর সাহিত্যকর্ম হিন্দু এবং মুসলমান

---

৩৪. Bipan Chandra, "History of Modern India and Communalism" in Romila Thaper *et al.* (ed.) *Communalism and the Writing of Indian History*. (New Delhi 1973), 58

৩৫. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মিনী উপাখ্যান*, কলকাতা ১২৭৮ (১৮৭১), ভূমিকা ও ১৯, ১৫০।

৩৬. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ১৯৬৯)।

৩৭. Tapan Raychaudhuri, *Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, (Delhi 1988), 39-73; "ভূদেব মুখোপাধ্যায়", সম্পাদকীয়, *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩০১, ১০৯।

৩৮. নবীনচন্দ্র সেন, *পলাশীর যুদ্ধ*, (কলকাতা ১৩১৮), ৬৬, ৭২-৭৩।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। প্রধানত ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং স্থানীয় স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠীগুলির বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কিছু ইতিহাসভিত্তিক এবং কিছু অনৈতিহাসিক উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেসবের উপর ভিত্তি করেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত হয়। তাঁর উপন্যাসসমূহে তিনি বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে নিগৃহীত ভারতবাসীর কথা বলেছেন; অবশ্যই সে ভারতবাসীর মাঝে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি তিনি তাঁর নিজের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রথম স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে গৌরবদীপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৩৯] ইংরেজের কাছ থেকে শেখা 'নিউ লার্নিং' বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজগৎ গঠন করেছিল। ফলে তিনি শেকড়সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। যেহেতু ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান শাসকরা ছিল বহিরাগত এবং তারা স্থানীয় হিন্দু শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, তাই স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিজাত অংশের মাঝে মুসলমানের প্রতি এক ধরনের চাপা ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই অনুভূতি দ্বারা তাড়িত ছিলেন। তাই তিনি মুসলমানের হাতে হিন্দুর পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে কী ঐতিহাসিক, কী অনৈতিহাসিক যে ঘটনাবলীকেই তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন, সেখানে অনিবার্যভাবে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র এসেছে এবং সেখানে তিনি তাঁর সেই চাপা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বহুক্ষেত্রে হিন্দু শক্তির দেশপ্রেম, মহত্ত্ব এবং বীরত্বকে বিপক্ষ মুসলিম শক্তির চেয়ে উন্নত দেখিয়েছেন এবং প্রায়ই স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হিন্দু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চিত্র সাধারণ হিন্দু পাঠকের মনে দেশপ্রেম এবং মুসলমান আশরাফ শ্রেণীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এমনকি তাঁর সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাস *আনন্দ মঠ* (১৮৮২) তৎকালীন গোঁড়া মুসলমানদের এমনভাবে উত্তেজিত করেছিল যে কলকাতার রাস্তায় তারা বইটির বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করেছিল। তবে স্থানীয় সাধারণ বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় নয়, বখতিয়ার খলজী থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত যারাই এদেশ শাসন করেছে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সকলকেই বহিরাগত বা 'যবন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একে ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় বলা যায় না, কিন্তু একশ্রেণীর মুসলমান বিশ শতকের প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির চরম অবনতিকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পান এবং দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে এটাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

রমেশ দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) ঐতিহাসিক উপন্যাসেও[৪০] বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসসমূহেও হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর *মাধবীকঙ্কন*-এ আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত

---

৩৯. Kazi Abdul Wadud, Creative Bengal, (Calcutta 1950), 92.

৪০. বিশেষকরে *বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কন, জীবনপ্রভাত* এবং *জীবনসন্ধ্যা* দ্রষ্টব্য।

করে উপস্থাপনের বিষয়টি। এতে রয়েছে আওরঙ্গজেবের নারীসংসর্গলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, হারেমজীবনের প্রতি মোহ, বেগমমহল ও মিনা বাজারে মহিলাদের সঙ্গে বেফাঁস কথাবার্তার বিবরণ । মুসলমান চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি শব্দাবলীর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন।[৪১]

মুসলমান সমাজ ও শাসকদের হেয় প্রতিপন্ন করার চারটি কারণ নির্ণয় করেছেন তপন রায় চৌধুরী। প্রথমত, উনিশ শতকে অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী লেখকই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী বলেই ভাবতেন। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে মুসলমান প্রজারাও কুৎসিতভাবে চিত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের মুসলমান শাসনামলকে বৃটিশ ঐতিহাসিকরা অত্যাচারের আমল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখকরা নির্দ্বিধায় সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ভারতীয়দের চিরাচরিত, বহুকাঙ্ক্ষিত বিশ্বাস এবং আচার-আচরণকে কটাক্ষ করার ফলে ভারতীয়দের আত্মসম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে এবং তাদের আত্মসম্মানবোধ পুনর্জাগরিত করতে *আনন্দমঠে* এর রূপক সংঘর্ষ রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চতুর্থত, বৃটিশ সরকারের কর্মচারী হিসেবে তাদের পক্ষে সরাসরি বৃটিশ সরকারকে অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা 'অত্যাচারী' লেবেলটি মুসলমান শাসকদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে বৃটিশ শোষণের নিন্দা করেন।[৪২]

খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী লেখকদের মুসলমানবিরোধী প্রচারণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং মুসলমান সংস্কারবাদীদের প্রভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা আত্মরক্ষামূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। মুসলমান লেখকরা হিন্দু লেখকদের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনা করতে শুরু করেন। হিন্দু লেখকরা রাজপুত এবং মারাঠাদের হাতে আফগান এবং মুগলদের পরাজয়ের কথাই কেবল লিপিবদ্ধ করেন আর মুসলমান লেখকরা শুধুমাত্র সেই সকল যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে তার উল্টোটাই ঘটেছে। হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমানদের কুৎসিতভাবে চিত্রিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যেই কোন কোন মুসলমান লেখনী ধারণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ হিন্দু লেখকদের এই প্রবণতাকে মুসলমান বাদশাহ ও বেগমদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস বলে অভিহিত করেন।[৪৩] সম্মানীয় মুসলমানদের কদর্যভাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই তাঁরা

---

৪১. প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), *রমেশরচনাসম্ভার*, (কলিকাতা ১৩৬৪), ২৯, ৩৪, ৪৭-৪৯, ৫২, ৫৪, ৮৯, ৯১।

৪২. Raychaudhuri, *Europe Reconsidered*, 6-13, 337-338, 342.

৪৩. মুসলিম পত্র-পত্রিকায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, *আল-এসলাম*, পৌষ ১৩১০; *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০; *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১০।

সোচ্চার হন।[৪৪] কালী দেবীর সাথে ভারতমাতার তুলনা করে *আনন্দমঠ*-এ বর্ণিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত মুসলমানদের এতই বিক্ষুব্ধ করে তোলে যে তারা একে 'কুফর' বা পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করে। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে *মুসলমান* পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুদের বৈষম্যমূলক বর্ণনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[৪৫] ১৯০৭ সালে 'দি রেড প্যাম্ফলেট' 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের তীব্র সমালোচনা করে।[৪৬] ১৯২৩ সনে মওলানা সুফী সদরুদ্দীন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের বিরোধিতা করে একটি প্যাম্ফলেট লিখেন।[৪৭] ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর ঘোষণা করেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা 'বন্দেমাতরম' বা 'গান্ধী কি জয়' শ্লোগান দিয়েছে, তারা কাফেরদের দলভুক্ত হয়েছে।[৪৮]

হিন্দু সাহিত্যে বর্ণিত মুসলমান যুবতীদের হিন্দু যুবকদের প্রেমে পড়ার গল্প-কাহিনী পড়ে মুসলমান পাঠক বিব্রত বোধ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী এবং রাজসিংহ*-তে শিবাজীর প্রতি রওশন আরার, জগৎ সিংহের প্রতি আয়েশার প্রেমনিবেদন এবং রমেশ দত্তের উপন্যাস *মাধবী কাঞ্চন*-এ নরেন্দ্রের প্রতি জোলেখার প্রেমনিবেদনের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাকে কোন কোন মুসলমান লেখক পরোক্ষভাবে মুসলমান রমণীর চরিত্রহননের অপচেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৯]

মুসলমানদের প্রবন্ধ এবং উপন্যাসে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১৯০৩ সালে *ইসলাম প্রচারক*-এ তসলিম আহমদ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশ দত্তের উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* এবং রমেশ দত্তের *রৌশিনারা* এবং *মাধবী কাঞ্চন*-এর বিরুদ্ধেই তিনি বেশি সোচ্চার হন।[৫০] ১৯১৫ সালে *আল এসলাম*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আবদুল মালেক চৌধুরী ক্ষুব্ধ চিত্তে এই দাবি উত্থাপন করেন যে, হিন্দুরচিত উপন্যাসে মুসলমান মহিলা চরিত্রে যেসকল নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি যেন মুসলমান কুলরমণীদের নামের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়।[৫১] ১৯১৬ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) দুঃখ করে বলেন, হিন্দুসাহিত্য

---

৪৪. আকবরউদ্দিন, "বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান", *আল-এসলাম*, পৌষ ১৩২৩।

৪৫. *Mussalman*, 14 December 1906; *Mussalman*, 26 April 1907.

৪৬. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908, (New Delhi 1973), 243, 457.

৪৭. মওলানা সুফী সদরুদ্দীন আহমদ, *মুসলমানদের জন্য বন্দেমাতরম বলা হারাম ও কুফর*, (ঢাকা ১৩৩০)।

৪৮. Government of Bengal (Intelligent Branch), Confidential File No. 1/22; Chandiprasad Sarkar, "Bengal Muslim Politics, Society and Culture During the Khilafat and Non-Co-operation Movement", *Bengal Past and Present*, 107, Parts 1-2, Nos. 196-197, January-December 1984, 5.

৪৯. বিশী (সম্পাদিত), *রমেশরচনাসম্ভার*, ১০২, ১০৩, ১০৫।

৫০. শ্রীতঃ, "হিন্দু সাহিত্য", *ইসলাম প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩।

৫১. আবদুল মালেক চৌধুরী, "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান", *আল-এসলাম*, বৈশাখ ১৩২২।

মুসলমান যুবকদের আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে তাঁদের এতই ভীরু বানিয়েছে যে মুসলমান বাদশাহ, বেগম ও শাহজাদীদের রঙ্গমঞ্চে তিরস্কৃত এবং অপমানিত হতে দেখেও তাদের রক্ত গরম হয় না।[৫২]

সিরাজী আরো অভিযোগ করেন যে, হিন্দুসাহিত্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সদিচ্ছার ভাবকে বিনষ্ট করে দেয়।[৫৩] তাঁর সাহিত্যকর্মের সিংহভাগ জুড়ে ছিল বঙ্কিমবিরোধিতা। বঙ্কিম যেখানে দেখান মুসলমান যুবতীরা হিন্দু যুবকদের কাছে প্রেমনিবেদন করছে, সিরাজী দেখালেন তার উল্টোটা অর্থাৎ হিন্দু যুবতীরাই মুসলমান যুবকদের প্রেমভিক্ষা করছে।[৫৪] এর প্রমাণ রয়েছে সিরাজীর উপন্যাস *রায়নন্দিনী* (১৯১৫), *তারাবাঈ* (১৯০৪) এবং *নূরুদ্দিন* (১৯২৩)-এ। হিন্দু সাহিত্যে হিন্দু যুবকদের প্রতি মুসলমান যুবতীদের প্রেমনিবেদনের কাহিনী মতিউর রহমান খানকেও (১৮৭২-১৯৩৭) বিক্ষুব্ধ করে। এর উল্টো ঘটনাকে সত্য প্রমাণের জন্য তাঁর উপন্যাস *মোক্ষপ্রাপ্তি ও যমুনা*-তে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে হিন্দু যুবতীরা মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৫৫]

হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলমান যুবতীদের প্রেমনিবেদনের কাহিনী মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' এবং 'যবন' রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা সেই ঐক্যকে আরো জোরদার করে। মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি ধারণা জন্ম নেয় যে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নামের স্থলে ঐ সব বিশেষণ প্রয়োগ করে হিন্দুরা তাদেরকে ভারতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করেছে। এ ধরনের বিশেষণের আদি ব্যবহার যা-ই হোক না কেন, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই মূলত সেসব বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়। এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত সিরাজীর একটি কবিতায়। কবিতাটির একস্থানে পাপিয়া এই বলে গেয়ে উঠে যে :

গোলাম হিন্দু জাতি তাহারাও দিবারাতি
হেরে এবে ঘৃণার নয়নে,
'ম্লেচ্ছ' 'যবন' বলি দেয় সদা গালাগালি
অস্পৃশ্য ভাবিয়া মনে মনে।[৫৬]

---

৫২. ইসমাইল হোসেন সিরাজী, "*সাহিত্য ও জাতীয় জীবন*", *আল-এসলাম*, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৩, ১৩৪।

৫৩. ঐ, ১৩৩-১৩৪।

৫৪. রশীদ আল-ফারুকী, *বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান*, (কলকাতা ১৯৮৪), ৩২৫-৩৩১।

৫৫. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ৩৫১।

৫৬. "চোখ গেলো", প্রচারক, ১৩০৬; আবদুল মান্নান, *মুসলিম সাধনা*, ৩৯৯।

১৯০০ সালে *ভারতীতে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেন যে, হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা ও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে, এবং 'তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে' বলে যে প্রচারণা চালানো হয়েছে তাতে মুসলমানদের অত্যাচারের চিত্রই ফুটে উঠেছে। তবে এ ধরনের বিকৃত ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি সেসব বৃটিশ লেখকদেরই দায়ী করেন, যাঁদের দ্বারা ঐ সকল হিন্দু লেখক এবং ঐতিহাসিক দারুণভাবে প্রভাবিত হন।[৫৭]

কোন কোন মুসলমান লেখকের রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের যুক্তির প্রতিফলন ঘটে। ১৯০৩ সালে *ভারতী-তে* ইমদাদুল হক লিখেন যে, বিদেশী বৃটিশ ঐতিহাসিকরা মুসলমান শাসকদের নির্মম অত্যাচারের অলীক কাহিনী রচনা করেন এবং ঐ কুৎসিত সাহিত্য মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের মনকে বিষিয়ে তোলে।[৫৮] মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীও তাঁর *ভারতের মুসলমান সভ্যতা* (১৯১৪) নামের গ্রন্থে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পাঠে এবং তাদের অনুকরণে হিন্দু লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলীতে ভারতে মুসলমান রাজত্বের যে মলিন ও কলঙ্ক কালিমাযুক্ত চিত্র অঙ্কিত হয়, তাতে হিন্দু পাঠকদের মনে মুসলমান শাসনকর্তা ও বাদশাহদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ইসলামাবাদী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত, রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা মুসলমানদের নানারকম মিথ্যা দুর্নাম ও কলঙ্ক রটনা করে এবং নিজেদের গুণ-গরিমা প্রচার করে জনসাধারণের মনে মুসলমান শাসকদের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি এবং বৃটিশদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ও ভক্তি আকর্ষণে প্রয়াসী হয়। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কাহিনী এবং সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরতে পূর্বতন মুসলমান ঐতিহাসিকদের উদাসীনতা ও নীরবতা মুসলমান শাসনকালের গৌরবময় কীর্তি আলোচনা থেকে অমুসলমান লেখকদের বিরত রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকরা বাদশাহদের শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী অত্যন্ত যত্নের সাথে বর্ণনা করেন, কিন্তু তাদের সৎ ও জনহিতকর কাজগুলিকে রাজধর্মের অনিবার্য কর্তব্য জ্ঞান করে স্বতন্ত্রভাবে সেসবের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করেন নি।[৫৯]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পাঠ্যবইও মুসলমান লেখকদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অতীতের বিশ্লেষণ ছাড়িয়ে এই সমালোচনার পরিসর আরও বহুদূর প্রসারিত হয়। ১৮৯৫ সালে শেখ আবদুর রহিম অভিযোগ করেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু প্রভাব মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করেছে।[৬০] ১৯০০ সালে মোহাম্মদ মীর আলি স্কুল

---

৫৭. *ভারতী*, কার্তিক ১৩০৭; আবদুল মান্নান, *মুসলিম সাধনা*।

৫৮. ইমদাদুল হক , "হিন্দু মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য", *ভারতী*, বৈশাখ ১৩১০, ২৭।

৫৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *ভারতে মুসলমান সভ্যতা*, কলিকাতা ১৯১৪, ভূমিকা, ১-৪।

৬০. শেখ আবদুর রহিম, "আমাদের নিম্নশিক্ষার মান", *মিহির ও সুধাকর*, ১৮৯৫, সম্পাদকীয়।

পাঠ্যবইয়ের সমালোচনা করে বলেন, মুসলমানদের পক্ষে আপত্তিকর এই সকল বই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে সরকারি স্কুলগুলি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৬১] এই মতের অনুসারীদের ধারণা, এ ধরনের পাঠ্যপুস্তকের কারণেই পাঠশালাগুলোতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করতে যায় না। এসব পাঠশালার শিক্ষাক্রমে 'হিন্দুয়ানী' প্রভাবের সমালোচনা করতে গিয়ে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে স্বীয় পাঠশালার শিক্ষক নন্দী মহাশয়ের কাছ থেকে যে পাঠ গ্রহণ করেন তার নিম্নলিখিত বিবরণ দেন :

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্মল বরণ;
রত্ন বিভূষিত কুঞ্জল করণ।[৬২]

নিঃসন্দেহে এই ধরনের পাঠ ভগবতী ও সরস্বতী দেবীর পূজার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল। পাঠশালার পাঠ্যক্রম ছাড়াও স্কুলকলেজ পাঠ্যক্রমেও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল। মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে স্মরণ করেন যে, অনেক পাঠ্যপুস্তকে আল্লাহ ও রসুলের উল্লেখ না থাকলেও শ্যাম, হরি, কালী, দুর্গা ও রামের বহু উদ্ধৃতি ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের নির্ধারিত পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর, যা তাঁর কাছে 'হিন্দুয়ানী পোশাক' বলে মনে হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পর পরই মশাররফকে তাঁর 'মোসলমানি পোশাক' পাজামা, চাপকান ও টুপি বদল করে ধুতি ও চাদর পরতে হয়। তাঁর পাজামা ও চাপকান বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং সহপাঠীরা তাঁর টুপি পুড়িয়ে ফেলে।[৬৩]

মশাররফ হোসেন আরও অভিযোগ করেন যে, পাঠ্যবইতে হিন্দু মহত্ত্বের কথা, যেমন রাম, লক্ষণ, গোপাল, কৃষ্ণ, অর্জুন, সীতা, সাবিত্রী, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকান্ত প্রমুখ হিন্দু বীরপুরুষদের জীবনকাহিনী বেশি থাকতো। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সেই কারণেই মোল্লা ও মুন্সিরা মুসলমান ছেলেমেয়েদের পাঠশালা ও স্কুলে পড়তে নিরুৎসাহিত করেন এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৬৪]

---

৬১. মোহাম্মদ মীর আলি, "এখন কর্তব্য কি ?" *নূর-আল-আমিন*, আষাঢ় ১৩০৭।

৬২. মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা) ১৯০৮-১৯০৯, ১০৬।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. ঐ, ১০৬।

একইভাবে *প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্য* নামের একটি স্কুল পাঠ্যবইয়ে দেবেন্দ্রনাথের জীবনী অংশে উদ্ধৃত সূর্যপূজার সমালোচনা করতে গিয়ে মওলানা আকরম খাঁ (১৮৭০-১৯৬৮) এ ধরনের পাঠ্যক্রমকে মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাতের ব্যবস্থা বলে তাঁর যুক্তির সপক্ষে কোরানের নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতি তুলে ধরেন :

সূর্যের পূজা করোনা
এবং চাঁদেরও না; কিন্তু পূজা কর
আল্লাহর, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহও (১৮৮৫-১৯৬৯) স্কুল পাঠ্যবইয়ের সমালোচনা করে বলেন, ঐসব বইতে মুসলমানদের গৌরব ও মহত্ত্বের কোন উল্লেখ না থাকলেও ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ সব বইতে লিপিবদ্ধ হিন্দুগৌরবের গল্প-কাহিনী মুখস্থ করতে হয়। স্কুলবইতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের "রসুলুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের শক্তিপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারের উপদেশ দিয়েছেন"—এ ধরনের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে হয় যে, তাদের আপন সম্প্রদায়ে এমন কিছু নেই যাতে তারা গৌরববোধ করতে পারে, আর হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা শেখে, তারা তুলনামূলকভাবে উন্নত জাতির বংশধর এবং তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুসলমানদের চেয়ে উন্নততর।[৬৬]

বাস্তবে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পরও বিশ শতকের সূচনা অবধি কোন মুসলমান সাহিত্যিক নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৪-১৮৯৩) *মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি* (১৮৬৩) বা সৈয়দ আমির আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) *ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন* (১৮৭৮)-এর মতো কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হন নি। বরং ঐসব প্রতিষ্ঠানকে একজন লেখক 'জী হুজুর'-এর সংগঠন বলে সমালোচনা করেন।[৬৭] কিন্তু হিন্দু লেখকদের ক্রমাগত মুসলমানবিরোধী প্রচারণার ফলে মুসলমান লেখকরা, এমনকি যাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করেন, তাঁরা ক্রমে তাঁদের মত পরিবর্তন করেন। যেমন ১৮৯৭ সালে শেখ ওসমান আলি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান।[৬৮] কিন্তু যখন বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দু-

---

৬৫. *The Holy Quran*, Abdullah Yusuf Ali (tr.) Sura 41: 37, 1297; মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান", *মাসিক মোহাম্মদী*, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪২, ২-৩।

৬৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা", *আল-এসলাম*, ১৩২৩ এবং তাঁর "ভাষা ও সাহিত্য", ঢাকা ১৩৩৮, ১৯-২৩।

৬৭. সৈয়দ ইমদাদ আলী, "বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব", *ইসলাম প্রচারক*, ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩।

৬৮. শেখ ওসমান আলী, "কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি", *হাফেজ*, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

মুসলমান সংঘর্ষ বাঁধে, ওসমান আলি তখন হিন্দু লেখক কর্তৃক ইসলাম ও মুসলমান শাসনের উপর আক্রমণকে নিতান্তই উস্কানিমূলক বলে বর্ণনা করেন। ১৯০৩ সালে তিনি মুসলমানদের নিন্দা না করার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৯] মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বার্থে গো-মাংস ভক্ষণ এবং গো-কোরবানী না করতে মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান তাঁর *গো-জীবন* (১৮৮৮) গ্রন্থে এবং 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' নামের প্রবন্ধে । কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ ও রচনায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা উপরে আলোচিত হয়েছে। এভাবে তাঁর মতপরিবর্তনের আংশিক কারণ ছিল মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি, যেহেতু *গো-জীবন* প্রকাশিত হবার পর তাঁকে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং এই লেখার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।[৭০]

বাংলা সাহিত্যের এই একপেশে হিন্দুঘেঁষা প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হবার জন্য মুসলমান লেখকরা বাংলা ভাষায় তাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ধরনের উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুক্তিতে। তাঁর মতে, স্বীয় বক্তব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রয়োজনেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলা উচিত, কারণ—

যার কাজ তারে সাজে
অন্য লোকের লাঠি বাজে।

শহীদুল্লাহ বিশ্বাস করেন যে, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেক মার্জিত ও রুচিসম্মত লেখার চেয়েও একজন মুসলমানের কাছে অপর একজন মুসলমানের লেখা মাঝারি মানের ইসলামী কাব্য ও রচনা বহুলাংশে মূল্যবান বলে মনে হয়।[৭১] এভাবে শহীদুল্লাহ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য মুসলমান লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাহিত্যে এই প্রতিযোগিতার ফল হলো সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব। একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা নিজেদের প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলার

---

৬৯. ঐ, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়", *কোহিনুর*, বৈশাখ, ১৩১৪।

৭০. *গো-জীবন* প্রকাশিত হয় ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫। "গোকুল নির্মূল আশংকা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *আহমদী পত্রিকায়*, বৈশাখ ১২৯৫। তাঁর বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য , তাঁর *মদীনার গৌরব* (১৯০৬), *মুসলিম বীরত্ব* (১৯০৮), *ইসলামের জয়* (১৯০৮) এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা *আমার জীবনী* (১৯০৮-১৯০); ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ৮১।

৭১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "*আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা* ", ২৫।

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই সাহিত্যকে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করা। বিশ শতকের শুরু থেকেই তাই মুসলমানদের সাহিত্যে তাদের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতা ধরা পড়ে শেখ ফজলুল করিমের *পরিত্রাণ কাব্য* (১৯০৩) ও *কাসেম বধ কাব্য* (১৯০৩) গ্রন্থ, মীর মশাররফ হোসেনের *মদীনার গৌরব* (১৯০৬) ও *মোসলেম বীরত্ব* (১৯০৪) গ্রন্থ, শেখ আবদুর রহিমের *ইসলামের ইতিবৃত্ত* (১৯১০) গ্রন্থ, আবু জেকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলির *শ্রীহট্ট বিজয়* কাব্য, কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯২৫) *মহাশ্মশান* (১৯০৪) কাব্য, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *স্পেন বিজয়* (১৯১৪) কাব্য এবং মৌলবি জমিরউদ্দিনের *গ্লোরি অব ইসলাম* (১৯২৯) গ্রন্থে।[৭২]

কেবল বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণ আরবি, ফার্সি বা উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেই মুসলমান সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হয় নি, বরং ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকেও মুসলমান সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য থেকে আলাদাভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাই এই সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেসব আরবি-ফার্সি শব্দ মুসলমানের কথ্য ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে জোরপূর্বক বাদ দেবার বিরোধিতা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং এর প্রকৃতি

শ্রীরামপুর থেকে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলার হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকরা মনে করতেন যে ধর্মান্তরের ক্ষেত্র হিসেবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজই বেশি উপযোগী। কারণ, অতীতে হিন্দু সমাজ থেকে বহুলোক ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা হিন্দু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। মুসলমান এলাকায় তাদের কর্মতৎপবতা ছিল আগ্রহবর্জিত, সীমিত আকারের এবং বিলম্বিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি কম আগ্রহী ছিল বলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মিশনারিদের শরণাপন্ন হতেও মুসলমানরা তেমন আগ্রহী ছিল না। এমনকি বৃটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার আগে সরকারি কার্য পরিচালনার জন্যও তাদের ইংরেজি শেখার প্রয়োজন হয় নি। অতএব, বাংলা বা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারি তৎপরতার একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে হিন্দু সম্প্রদায়।[৭৩]

---

৭২. Mohammad Shah, " The Emergence of a Muslim 'Middle Class' in Bengal: Attitudes and Rhetoric of Communalism, 1880-1940", Ph.D. thesis, (University of London 1990), 99-101.

৭৩. Selections From the Records of Bengal Government, Vol. 14; Papers Relating to Presidency College, 10-11; M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslims and English Education, 1765-1835*, (Dacca 1973), 96-98.

মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই আর্থিক সঙ্কটের কারণেই তারা ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু মুসলমান জমিদারকে জমিদারিচ্যুত করে। পুরনো হিন্দু জমিদাররাও এই ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মধ্য থেকে সৃষ্ট নতুন এক হিন্দু জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে হিন্দু সমাজ তার প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। কলকাতা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী এসব হিন্দু জমিদার যেসব আমলার হাতে জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করেন তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ভদ্রলোক। এসব আমলা রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ছাড়াও জমিদারদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য জবরদস্তিমূলক নজরানা ও সেলামির মতো কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করতো প্রজাদের কাছ থেকে, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান কৃষক।[৭৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে মুসলমানদের মধ্যে 'আশরাফ' শ্রেণী 'মদদ-ই-মাশ' বা রাজস্ববিহীন ভূমিঅনুদান ভোগ করতো, রাজদরবারে ও কোন কোন প্রশাসনিক চাকুরিতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগলাভ করতো; মুনশি বা মৌলবির পদে নিয়োজিত হতো এবং শিক্ষকতা করে কিংবা দলিল-দস্তাবেজ নকল করে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি না হলে একমাত্র তারাই পারতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে আশরাফদের প্রিয় পেশা দলিল নকল, কাগজ তৈরি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হলে তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণেই 'ইনগিলাব-ই-জামানা' (অবস্থার সঙ্কট), 'আশরাফ গর্দিদ' (সম্মানিত শ্রেণীর দুরবস্থা) প্রভৃতি অভিযোগ মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এই আর্থিক সঙ্কটই স্কুলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের কম উপস্থিতির জন্যে বিশেষভাবে দায়ী।[৭৫]

মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হওয়ার তিনটি শিক্ষাগত কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, মুসলমান ছাত্রকে স্কুলে অধ্যয়ন শুরু করার আগে মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বলে হিন্দু ছাত্রের তুলনায় তাদের স্কুলে শিক্ষা বিলম্বে শুরু হতো।

---

৭৪. Amalendu De, "Roots of Separatism in the Nineteenth Century Bengal—A Case Study of Socio-economic and Demographic Factors" in Diptendra Banerjee *et al.* (ed.), *Essays*, 327-329.

৭৫. From Blochmann to Sutcliffe, 9 October 1871, 3; *Bengal Education Proceedings* (henceforth BEP), 1872; India Office Library and Records (IOR.), 163; From Maulvi Abul Khair Muhammad Siddique (Superintendent, Dacca Madrassa) to the District Judge, Dacca, No. 7, 8 February 1886, para 2, BEP., 1888.

দ্বিতীয়ত, আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রকে স্কুল ছাড়তে হতো। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীতে বর্ধিত বেতন ও অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য মুসলমান অভিভাবকদের অনেকেরই ছিল না। তৃতীয়ত, মুসলমান পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের পার্থিব উন্নতির কথা না ভেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানদের জন্য এমন এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বেছে নিতেন, যা তাদের আধুনিক পেশায় দক্ষ হতে কিংবা জীবনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের মাঝে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফলে যেসময় একজন তরুণ হিন্দু ছাত্র সরকারি স্কুলে ইংরেজি পড়ে এবং অংক শিখে, সেসময় একজন তরুণ মুসলমান ছাত্র মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম, ইসলামী আইন ও আরবি-ফার্সি ভাষা শিক্ষা করে। তরুণ অবস্থা থেকে মুসলমান ছাত্রের এভাবে বিদ্যাশিক্ষার কারণে তার পরবর্তী জীবনের চিন্তা-চেতনায় লাভজনক পেশায় নিয়োজিত হবার পরিবর্তে জ্ঞানচর্চার পেশায় নিয়োজিত হবার প্রতি ঝোঁক থাকে বেশি।[৭৬]

মুসলমান সংবাদপত্রে অভিযোগ উঠে যে মুসলমান স্কুলপরিদর্শক না থাকার কারণে মুসলমানদের অভাব ও প্রয়োজনাদির কথা সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করা সম্ভব হয় নি।[৭৭] বস্তুতপক্ষে ১৮৭১ সালে হান্টার কর্তৃক তাঁর *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থে ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা যে মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সরকারকে সতর্ক করার আগে এব্যাপারে সরকার তেমন মাথা ঘামায় নি। ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট তারিখে ভারত সরকারের এক প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে, যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সুশিক্ষিত হয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, সেখানে মুসলমানদের মতো একটি 'বিশাল' এবং 'গুরুত্বপূর্ণ' সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দূরে থেকে বৈষয়িক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব, সরকার মুসলমানদের সরকারি স্কুল এবং কলেজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলমানপ্রধান এলাকায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা, ঐ সব স্কুলে মুসলমানদের মধ্য থেকে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ এবং 'গ্রান্টস-ইন-এইডস'-এর মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিতব্য ইংরেজি ও মাতৃভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭৮] এই ধরনের ব্যাখ্যা এবং প্রস্তাবাবলী বাস্তব অবস্থা, প্রকৃতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের সমস্যাকে হিন্দুদের চেয়ে পৃথক বলে প্রমাণ করার জন্যেই প্রদান করা হয়।

---

৭৬. Sir Alfred Croft (Director of Public Administration in Bengal), Review of Education in India in 1886, with Special Reference to the *Report of the Education Commission* , (Calcutta 1888), 1459-60.

৭৭. উদাহরণ, *Urdu Guide,* 2 and 3 December 1885; *Bengal Native Newspaper Report* (henceforth BNNR.), 5 December 1885, 1459-60.

৭৮. From W. S. Atkison (Director of Public Instruction in Bengal) to the Secretary to the Government of Bengal, General Department, No. 135, Fort William, 12 January 1872, BEP., 1872; IOR , 165.

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা আরবি ও ফার্সি সাহিত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে লর্ড মেয়োর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কর্তৃক দুজন পরিদর্শক নিয়োগ[৭৯] মুসলমান সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার অভিপ্রায়কে আরো তীব্রতর করে।

কিন্তু এধরনের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও ভাগ্যোন্নয়নে তেমন সাহায্য করে নি। অতএব, পরিস্থিতির চাপে মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা সরকারি সাহায্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করে। আমির আলির 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' হিন্দুদের সাথে তাল মিলিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়।[৮০] ১৮৯৪ সালে কমপক্ষে দুটি বাংলা সাময়িকী মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এই শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে। মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়সমূহের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুসলমান সংবাদপত্রে জোর দাবি উঠে।[৮১]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা। বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা আরবি ও ফার্সির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন। ১৯০০ সালে কাজি গোলাম মওলা মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে *প্রচারক*-এ একটি প্রবন্ধ লিখেন।[৮২] ১৯০৪ সালে *ইসলাম প্রচারক*-এ প্রকাশিত 'বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আফতাবউদ্দিন আহমদ যুক্তি দেখান যে, আরবি ও ফার্সি ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা শিখলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা শক্তিশালী হবে।[৮৩] ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম সংস্কারের এক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন, যা উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে মক্তব পাঠ্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে

---

৭৯. Croft, *Review of Education in India,* 1886, 320-21.

৮০. Report of the Muhammadan Educational Endowments Committee, Calcutta, 1888, Appendix 3, Memorandum 2, para 3, 24-25, *Bengal General Proceedings* (henceforth BGP), January-July 1888, IOR, 316.

৮১. *Sudhakar,* 5 January 1894; BNNR. 13 January 1894, 23. *Mihir O Sudhakar,* 9, 16 Decemder 1898; BNNR., 17-24 December 1898. *Mihir O Sudhakar,* 30 June 1899.

৮২. "বসন্ত সহচর", *প্রচারক*, আশ্বিন ১৩০৭, ৯ম সংখ্যা।

৮৩. "বিজ্ঞ মুসলমানের শিক্ষা", *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ ১৩১১, ৮ম সংখ্যা।

এর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। জুনিয়র মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব বিষয়গুলো সংযোজিত করে ছাত্রদের হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার উপযোগী করে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসা কোর্সকে হাইস্কুলের সমমানে উন্নীত করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং মাদ্রাসার উচ্চতর কোর্সকে উচ্চতর মানে উন্নীত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সহসাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলনে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের সমীপে পেশ করা হয়। এত সব করার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা হলো প্রচলিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।[৮৪]

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বাংলার সরকার শিক্ষিত সমাজকে উন্মুক্ত সরকারি কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার এবং 'সংস্কৃতিবান মুসলমান' তৈরির উদ্দেশ্যে মাদ্রাসাগুলো পুনর্গঠিত করার জন্য একটি 'সংস্কার পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেন।[৮৫] তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যক্রম থেকে ঐ পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয় এবং একমাত্র কলকাতা মাদ্রাসা ছাড়া প্রদেশের সকল সরকারি এবং অধিকাংশ বেসরকারি মাদ্রাসায় ১৯১৫ সাল থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের স্বার্থে কলকাতা মাদ্রাসাকে এই পরিকল্পনার বাইরে রাখা হয়। এ পর্যায়ে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে, এভাবে জাগতিক বিষয়সমূহ শিক্ষা এবং জাগতিক জীবনে সাফল্যলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছাত্ররা কলকাতা মাদ্রাসার চেয়ে পার্থিব শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের দ্বিমুখী ব্যবস্থা নতুন সংস্কারমূলক শিক্ষার সাফল্যের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কলকাতা মাদ্রাসাকে ঘিরে ধর্মীয় গোঁড়া ও স্বার্থপর একটি দল নতুন সংস্কারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। মুসলমানদের এক বিরাট দল নতুন মাদ্রাসা-স্কিম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে এবং কলকাতা মাদ্রাসা মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান ধারা থেকে দূরে সরে পড়ে। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্বগৌরব এবং প্রতিপত্তি হারাতে থাকে।[৮৬]

মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধর্মশিক্ষার সাথে 'আধুনিক' শিক্ষার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। আর্থিক ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা মাদ্রাসার 'কলেজ ক্লাস' বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে

---

৮৪. *Report of the Committee to Advise on the Policy of Advancing Muslim Education in Bengal*, 77-78.

৮৫. ঐ, 59-77.

৮৬. ঐ, 73.

বলা হয়। তখন সমগ্র কলকাতায় শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আরবি ও ফার্সি শিক্ষা দেওয়া হতো। ম্যাট্রিক কোর্সে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেসকল ছাত্রের আরবি ও ফার্সি ছিল, তাদের প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্তি হতে হতো। মুসলমান ছাত্রদের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবি অথবা ফার্সি নিত। এছাড়াও কলকাতা মাদ্রাসার 'কলেজ ক্লাস' তুলে দেয়ায় এবং শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আরবি ও ফার্সি পড়ার ব্যবস্থা থাকায় মুসলমান ছাত্রদের ১২ টাকা মাসিক ফি-এর ১০ টাকাই মহসিন ফান্ড থেকে দেয়া হতো। কিন্তু মুসলমান ছাত্ররা প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হলে মহসিন ফান্ডের ঐ সাহায্যটি পেতো না। অন্য দিকে নিজ খরচে সন্তানদের পড়াশুনার ব্যয়নির্বাহের ক্ষমতা খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানেরই ছিল।[৮৭]

মুসলমান ছাত্রদের কলকাতা মাদ্রাসা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসার জন্য আহবান করে তাদের তেমন কোন উপকার করা হয় নি। প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলমান ছাত্রদের মহসিন ফান্ড থেকে সাহায্য প্রদান করেও মুসলমান সমাজের তেমন কোন লাভ হয় নি। কারণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে না বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমান ছাত্রদের ভর্তিতে বাধার সৃষ্টি করে। ১৯০৮ সালে কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষের ক্লাসে মাত্র ৩৫ জন মুসলমান ছাত্রকে ভর্তির কোটা নির্ধারিত করে দেয়। কলকাতা মাদ্রাসার কলেজ-ক্লাসে পড়ার সহজ সুযোগ গ্রহণ না করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতেও তারা বাধার সম্মুখীন হয়। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে *মুসলমান* পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে সিটের অভাবের অজুহাতে আই. এ. পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ২১তম এবং মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তির আবেদন নাকচ করা হয়।[৮৮] এই ধরনের অজুহাতের ফলে ভর্তি থেকে বঞ্চিত ছাত্ররা তাদের বৃত্তি পাবার অধিকার হারায়, কারণ তাদের বৃত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার শর্তসাপেক্ষ ছিল। *মোহাম্মদী* পত্রিকা সৈয়দ ইব্রাহিম, শফিউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল লতিফের মতো বহু মেধাবি ছাত্রের ভর্তির আবেদন নাকচ এবং তাদের প্রাপ্য স্কলারশীপ থেকে বঞ্চিত হবার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।[৮৯]

নিয়ম-কানুনের ত্রুটির কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অন্যান্য কলেজে মুসলমানদের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালে ফজলুল হক অভিযোগ করেন যে, কলকাতার বিভিন্ন কলেজেই দুই শতেরও অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্রের ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 'দি মুসলমানস অব বেঙ্গল : হাউ দে রিমেইন আনএডুকেটেড' শিরোনামের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত

---

৮৭. *Mohammadi, !* July 1910; BNNR., 9 July 1910, 806-807.

৮৮. *Mussalman*, 4 July 1913; BNNR., 12 July 1913, 466.

৮৯. *Mohammadi*; BNNR., 27 April 1912, 467-468.

তথ্যে ফজলুল হকের অভিযোগের প্রমাণ মেলে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুসলমান ছাত্রদের বঞ্চনার পরিসংখ্যান প্রদান করে মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধাসমূহ চিহ্নিত করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার সাথে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মুসলমানদের প্রাপ্য অংশ লাভের ব্যর্থতা যুক্ত হবার ফলে মুসলমান সমাজ দারুণ হতাশায় নিমজ্জিত হয়।[৯০] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগ মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নবজীবনের সঞ্চার করে। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নতুন প্রাদেশিক সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ১৯০৮-১৯১৩ সালের পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রত্যেক কলেজ এবং প্রায় প্রত্যেক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ। এর ফলে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এলো, তেমনি তাদের চিন্তা-চেতনায়ও পরিবর্তন দেখা গেল। কিন্তু এতে তাদের অভিযোগ কিংবা সম্প্রদায় হিসেবে তাদের মনে আলাদা হবার ধারণা মুছে যায় নি। তাদেরকে যতো বেশি সুবিধা প্রদান করা হতো, তারা তার চেয়েও বেশি দাবি করতো এবং মুসলমানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও তাদের অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য দাবি অনবরতই উত্থাপিত হতে থাকে। যেমন, মুসলমানরা অভিযোগ করে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক স্কুলের প্রতি ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা ৩০ জনে নির্ধারিত করা এবং উক্ত শিক্ষাকোর্সে আরবি ও ফার্সি পড়ার সুযোগ না রাখার ফলে মুসলমানরা সঙ্কটে পড়েছে। ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, ঠিক তখনই ঐ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয় যখন মুসলমান ছাত্ররা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দলে দলে স্কুলে যেতে শুরু করে, অথচ কিছুদিন আগেও তাদের স্কুলে যাবার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হতো।[৯১]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পূর্ব বাংলা থেকে কোন সদস্য না থাকা এবং এর একশত জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ছয়জন মুসলমান সদস্য থাকার বিষয়টির উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ১৯১২ সালে ভারত সরকার এই অভিমত প্রকাশ করে যে, মুসলমানরা তাদের ছেলেমেয়েদের অধিক হারে 'কলেজ ক্লাশে' পাঠাবেন না যদি তাদের এলাকায় ইসলাম শিক্ষাবিষয়ক অনুষদসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হয়, যার

---

৯০. A. K. Fazlul Huq's speech on the budget for 1913-14, Bengal Legislative Council Debates (henceforth BLCD), 4 April 1913, *Bengal Legislative Council Proceedings* (hereafter referred to as BLCP), Vol. 45, 1913, 576-78; *Bengal District Administration (Levinge) Report* (1913-14), 144; *Muhammadi*, 19 July 1912; BNNR., 27 July 1912; *Mussalman*, 18 April 1913; BNNR., 26 April 1913, 294.

৯১. *Sanjibani*, 6 January 1910; BNNR, 15 January 1910, 57; *Mussalman*, 16 May 1913; BNNR., 24 May 1913, 362.

পরিচালনায় তাদের নিজস্ব ভূমিকা থাকবে।[৯২] ১৯১২ সালের মে মাসে *দি মুসলমান* সব মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বার উন্মুক্ত রাখার কিংবা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করার দাবি উত্থাপন করে।[৯৩] পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সাথে উপরোক্ত দাবি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ১৯১৩-১৭ সালের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, একজন সাধারণ মুসলমান তার সন্তানকে মাদ্রাসায় মুসলিম আইন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, বিতর্ক, দর্শন, হাদিস ও তফসির পড়াতে বেশি আগ্রহী, কারণ তার চিন্তাধারা বাংলার একজন অমুসলমানের চিন্তাধারার চেয়ে ভিন্নতর ছিল। সে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে মৌলবিদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। সে কারণে যখন কোন বেসরকারি মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা উঠতো, তখন মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি উঠতো। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধা দাবি করতে গিয়ে মুসলমান আঞ্জুমানগুলো তাদের জন্য বিশেষ 'ইনস্পেকটিং অফিসার' নিয়োগের দাবি করতো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায় তার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে ব্যাকুল ছিল। সামাজিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তারা চেয়েছিল পৃথক এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহী হয়, অথচ সরকারি চাকুরির জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই ছিল অপরিহার্য। উপরোক্ত পাঁচসালা পর্যালোচনার রাজনৈতিক উপসংহার ছিল এই যে, বাংলা কখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হবে না যদি এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে মুসলমানদের সুশিক্ষিত হয়ে যথেষ্ট হারে সরকারি কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়। উক্ত পর্যালোচনায় এই আশাবাদও ব্যক্ত করা হয় যে, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে বৃটিশ রাজের প্রজা হিসেবে তারা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে।[৯৪] প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—এই প্রচলিত ধারণা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তাদের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক ধারণা জন্মলাভ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা বৃটিশ সরকারকেও সেই ধারণায় বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম হয়।

---

৯২. From H. Sharp (Joint Secretary to the Government of India, Department of Education) to the Secretary to the Government of Bengal, General Department, No. 811, Simla, 4 April 1912, 4.

৯৩. *Mussalman*, 17 May 1912: BNNR., 25 May 1912, 320-321.

৯৪. *Fifth Quenquennial Review on Education* (1912-13 to 1916-17), Calcutta, 11 January 1918, 133; *Report of the Committee Appointed by the Government of Bengal to Consider Questions Connected with Muhammadan Education*, (Calcutta 1915), 16.

মুসলমানদের মানসিকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) উল্লেখ করে যে, একজন মুসলমানের কাছে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন সচেতন সদস্য হবার কোন বিকল্প নেই, যদিও সে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি বর্জন করে সে ঐ সুযোগ নিতে মোটেও আগ্রহী ছিল না। সে এই ভেবে গর্বিত যে তার আপন সংস্কৃতি ইসলামের শৌর্য-বীর্যের দিন থেকেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এমনকি বাংলার একজন মুসলমান গ্রাম্য বালকও এই ভেবে গর্ববোধ করে যে, সে যে ধরনের ইসলামী বিদ্যাচর্চা করে তা কায়রোর আল-আজহার মসজিদের পাঠ্যক্রমের সমতুল্য। মৌলবি আবদুল করিমের মতো নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা তাই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, ইসলামী দেশগুলিতে যে শিক্ষা মহা-রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসক তৈরি করতে সাহায্য করে ভারতের মাদ্রাসাগুলোতে সে ধরনের শিক্ষাই প্রদান করা হয়। স্যাডলার কমিশন একজন ভারতীয় মুসলমানকে ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলেই বিবেচনা করে এবং যুক্তি দেখায় যে, ঐ ইসলামী মূল্যবোধই একজন মুসলমানকে তার অতীতে নিয়ে যায় যেখানে তার কল্পনা শুধুমাত্র ভারতীয় ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরো বিস্তৃত হয়। এই অবস্থার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমান প্রতিনিধিরা কমিশনকে জানায় যে, যদি কমিশন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মানসিকতার স্বীকৃতি প্রদান না করে, তবে এর কোন পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না।[৯৫] এ ধরনের মতামত সমর্থন করতে গিয়ে বৃটিশ সরকার বিতর্কের সেই যুক্তিগুলোই সমর্থন করে যেগুলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়।

১৯১০ ও ১৯২০-এর দশকে কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলার সরকার মুসলমানদের দেখায় যে তারা মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কাজ করছে। ১৯১৮ সালে সরকার ইসলামী শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী গঠনের জন্য অনুমোদন দান করেন এবং ১৯১৯ সালে ঢাকা মাদ্রাসায় এই শ্রেণী চালু করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত মাদ্রাসার চারটি উচ্চশ্রেণী এবং দুটি ইসলামিক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী নিয়ে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও ইসলামী শিক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইভাবে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকে শক্তিশালী করে। ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভূত উন্নতিলাভ করে। ১৯২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকার মুসলমানদের সরকারি স্কুলের শিক্ষক, সাব-ইন্সপেক্টর এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। ১৯২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক আদেশবলে সরকার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা ট্রেনিং কলেজে উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষিত করে।

---

৯৫. *Calcutta University (Sadler) Commission Report* (1917-19), (Calcutta 1919), 143, 209.

১৯২৪ সালের ১৭ এপ্রিল অপর এক আদেশবলে সরকার চট্টগ্রাম কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত আসনের শতকরা হার ২৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করে। ১৯২৪ সালের ১৪ নভেম্বর অপর এক আদেশের মাধ্যমে সরকার শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মান অক্ষুণ্ন রেখেই মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা যতোটা সম্ভব বাড়াতে পরামর্শ দেয়।[৯৬]

১৮৮০ সাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত মুসলমানদের অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই এই অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৯২১-২৬ সালের মধ্যে প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর হার ২৯.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬-২৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল শতকরা ৫১.৪। এই হারের তুলনায় উচ্চ ও মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৫.৫ এবং ১৯.৩। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার হারেই শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতির প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির হার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কম-বেশি হলেও মোটামুটিভাবে একইরকম থাকে। প্রতিটি স্তরেই এই অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি[৯৭] থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের আর্থিক অগ্রগতিও সাধিত হয়। উচ্চ শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্রবৃদ্ধি (সম্ভবত হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর দ্রুতগতিতে) এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি অধিকহারে ঝুঁকে পড়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে তখন এক নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

মুসলমানদের শিক্ষার এই তুলনামূলক অগ্রগতি নিজ সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য দাবি জানাতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে কিছু মুখপাত্রের উদ্ভব হয় এবং যদিও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল, তবুও কিছু মুসলমান তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে তাদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপনের জন্য তৎপর হন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের কিছুটা অগ্রগতি হলেও হিন্দুদের তুলনায় তারা পিছিয়ে আছে। তাঁরা বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসরতা মুসলমানরা অর্জন করেছে তা সম্ভব হয়েছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই। উচ্চস্তরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়েছে ১৯২১ সালে মুসলিম হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২৬ সালে বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হকের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের উপর ফজলুল হক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে

---

৯৬. *Guide to Laws and Orders in Force in Bengal*, Vol. 6, Education, Nos. 605-775, Calcutta 1926; IOR V/27/242/41f, 129-30.

৯৭. Shah, "Muslim Middle Class", 155, 167-172.

অবশেষে সফল হন। মুসলিম হলে ছাত্রসংখ্যা ১৬০ থেকে ৪০০তে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান উচ্চশিক্ষা লাভ করে বাংলার রাজনীতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তখনও অক্ষুণ্ন ছিল। বাংলার আইনসভায় মুসলমান সদস্যগণ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারি অনুদান বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকেন। মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই ছিল বেশি। এধরনের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দেবার মাধ্যমেই মুসলমান নেতারা মুসলমান ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্বাচিত হতে এবং শক্তিসঞ্চয় করতে সমর্থ হন।[৯৮]

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে পুনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ফজলুল হক ঘোষণা করেন, যে শিক্ষাব্যবস্থা অমুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক বলে ধরা হয়, তা বহুক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন যে, কোন মুসলমান পিতা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান না করে তার সন্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাগ্রহণ করতে দেবে না। অতএব, তাঁর দাবি ছিল মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন তাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৯৯] ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব থেকে এ ধারণা উদ্ভূত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি নতুন উদ্দীপনা দেখা গেলেও ধর্মশিক্ষার প্রতি তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যা তাদের ধর্মসম্প্রদায়গত সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব

উদীয়মান মুসলমান 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র উদ্বিগ্নতার অন্য দিকগুলি ছিল সরকারি চাকুরিতে তাদের অবস্থান এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত। তাঁরা এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের স্বার্থ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুসলিম রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা বাংলায় তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের অনগ্রসরতা, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রাদেশিক রাজস্বে তাদের বৃহত্তম অংশ প্রদান, ভিন্ন স্বার্থ, যোগ্যতা ও 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' বিবেচনা করে সরকারি চাকুরিতে অধিকহারে মুসলমান নিয়োগের দাবি উত্থাপন করেন।[১০০]

---

৯৮. *Report of the Indian Statutory Commission* (henceforth ISCR.), Vol. 8; *Memorandum* Submitted by the Government of Bengal to the Commission, London 1930, para 43; আরও দেখুন, *'Bengal Administration Report* (henceforth BAR.), (1926-27 to 1935-36), Government of Bengal, Revenue Department, Alipore 1939, 107-11.

৯৯. *Presidential Address* by A. K. Fazlul Huq, Chief Minister of Bengal, at the All-India Muslim Educational Conference, 51st Session, Poona, 28-30 December 1940, 3-4, 12.

১০০. Evidence of A. K. Fazlul Huq to the Royal Commission on the Public Services in India, January 1913, 159.

যে যুক্তিগুলি তাঁদের অনমনীয় এবং তাদের দাবিকে শক্তিশালী করেছে সেসবের একটি হলো বাংলার জনসংখ্যায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কারণেই জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের চাকুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তা না হলে অন্তত আগের চেয়ে অধিকহারে তাদের চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার অধিকার রয়েছে। অপর একটি শক্তিশালী যুক্তি হলো, প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের মূল উৎস খাজনা ও রাজস্ব উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি অর্থ সরকারকে প্রদান করে। সেই কারণে সরকারি চাকুরিতে অধিকহারে নিয়োজিত হবার অধিকার তাদেরই বেশি।[১০১]

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব

হিন্দু-মুসলমান মতবিরোধের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো জেলাবোর্ড এবং পৌরসভার নির্বাচন। ১৯১০, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুসলমানরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। মুসলমান নেতারা যুক্তি দেখান যে, দেশ যদি গণতন্ত্রের নীতিতে চলে, তাহলে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবি বিবেচনা করতে হবে। তাঁরা পৃথক নির্বাচন দাবি করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে, মিশ্র নির্বাচনে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হিন্দু কর্মকর্তা, উকিল, ব্যবসায়ী, জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর অশুভ প্রভাবের ফলে 'প্রকৃত মুসলমান' নেতা নির্বাচনে জয়ী হবেন না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে দুর্বল বলে একজন মুসলমান নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে তার হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সমান সম্পদ ও শক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। খান বাহাদুর আজিজুল হকের মতো মুসলমান নেতার অভিযোগ ছিল এই যে, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কংগ্রেস তার প্রার্থীদের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করে, যার ফলে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক হিন্দু জমিদার জয়লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা জাগ্রত করেও হিন্দু জমিদারদের পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। আরো অভিযোগ করা হয় যে, কিছু কিছু মুসলমানকেও কংগ্রেস অর্থপ্রদানসহ অন্যান্য উপায়ে প্রভাবিত করে যেন তারা স্বীয় মতামত বির্সজন দিয়ে স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে সচেষ্ট হয়। প্রচুর অর্থসম্পদ ও হিন্দুনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমকে সপক্ষে ব্যবহার করে হিন্দু প্রার্থীরা বহু 'প্রকৃত মুসলমান' প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।[১০২] এক কথায়, হিন্দু সমর্থন নিয়ে মিশ্র নির্বাচনে কোন মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করলেও তিনি মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি হবেন না, কারণ সেসব ক্ষেত্রে কে জয় লাভ করবেন বা

---

১০১. *Mihir O Sudhakar*, 2 December 1898; BNNR. 10 December 1898, 1050.

১০২. Director of Public Information (Bengal), *Bengal Ministry and the Hindus of Bengal*, Part 1, (Alipore 1943), 3-6.

করবেন না তা নির্ভর করবে অন্য সম্প্রদায়ের পছন্দ-অপছন্দের উপর। মুসলমান নেতাদের ধারণানুসারে একজন প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই তাঁর সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।[১০৩] অতীতে হিন্দু প্রার্থীদের কাছে মুসলমান প্রার্থীদের পরাজয় বা তাঁদের ব্যর্থতার গ্লানিতেই এ ধরনের মনোভাবের কারণ নিহিত রয়েছে।[১০৪] এ ধরনের যুক্তির মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধিদের দাবির পরিধিও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রদায়িক বাক-বিতণ্ডা

জেলাবোর্ড ও পৌরসভার ক্ষেত্রে মুসলমান নেতারা যে যুক্তি উপস্থাপন করেন আইনসভায় ঐ যুক্তিকে আরো জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। ১৯২০-এর দশকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা ভারতীয়দের হাতে বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে কি ধরনের প্রশাসন চালু হবে সে সম্বন্ধে অগ্রিম চিন্তাভাবনা থেকেই হিন্দু-মুসলমান প্রতিযোগিতায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হিন্দু নেতৃবর্গের ভবিষ্যৎ সদাচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের সংশয়ী করে তোলে। আবার এই সময় 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নামের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তারলাভের ফলে মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই নতুন মানসিকতার উদ্ভবের দরুন সাম্প্রদায়িকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি প্রবল হিন্দুবিরোধিতাকে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি প্রথম বড় রকমের আঘাত বলে বিবেচনা করে, কারণ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে তাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হবে।[১০৫] কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হিন্দু স্বার্থান্বেষী মহলের বৈষয়িক উন্নতির পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হয়। এই হিন্দু স্বার্থান্বেষী মহলের অন্যতম ছিলেন কলকাতার আইনজীবী ও সাংবাদিকগণ। নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলার মামলাকারীদের কলকাতায় না গিয়ে ঢাকায় যাবার সম্ভাবনা থাকায় কলকাতার আইনজীবীদের আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কলকাতার মতো ঢাকা ও পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান শহরে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাঠক কমে গিয়ে এগুলোর আরও হ্রাস পাবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই কারণেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে।[১০৬]

---

১০৩. ঐ, 14.

১০৪. Shah, "Muslim Middle Class", 220-49.

১০৫. ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বেশ কয়েকটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937*, (Dacca 1972), 15.

১০৬. Sir Robert Reed, "The Partition of Bengal", *The Eastern World*, London, February 1951, Vol. 5, No. 2, 11.

বঙ্গভঙ্গ রহিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনকে মুসলমান রাজনীতিবিদরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার স্বার্থে ব্যবহার করেন। অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলনে যোগ দিতে মুসলমানদের বাধ্য করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। এই আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে 'স্বদেশী' ভাবধারাকে অনেকটা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চালানো হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দানা বেঁধে উঠে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশী ভাবাদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে অস্বীকার করায় ময়মনসিংহ এবং সিলেট জেলায় হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের নানাভাবে নির্যাতন করেন। কিছু প্রজাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় এবং কোন কোন প্রজাকে প্রচুর জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে সিলেটের শিলচরের মুসলমানরা স্বদেশী নেতৃবৃন্দের কঠোর আদেশ অমান্য করে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বৃটেনের লিভারপুলের লবণ আমদানি করে। স্বদেশী নেতাদের পরামর্শে ছোট ছোট শহরগুলিতে হিন্দুরা মুসলমান জমিদারদের বয়কট করে। যেমন, বিপিনচন্দ্র পালকে অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থতার কারণে এবং তাঁর বিপ্লবী সংস্থায় চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় কুমিল্লার আইনজীবী সমিতি দুই জন মুসলমান জমিদারকে বয়কট করে। উল্লেখ্য যে, বিপিনচন্দ্র পালের বিপ্লবী সংস্থায় প্রবেশের দ্বার মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।[১০৭] ১৯০৭ সালে স্বদেশী সমর্থকরা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত নবাব সলিমুল্লাহর এক সভা পণ্ড করে এবং নবাবের ব্যক্তিগত সচিবকে মারাত্মকভাবে আহত করে। নবাবের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, নবাব তাঁর অনুগামী মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে নিয়ে যান। বস্তুতপক্ষে খুব কমসংখ্যক মুসলমান স্বদেশীসমর্থক ছিলেন। এমনকি যেসকল মুসলমান বিদেশী পণ্য ও খেতাব বর্জন করে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করার স্বদেশী কৌশলকে সমর্থন করেন নি। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বয়কটকে মুসলমান নেতারা শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি বলে বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে ফজলুল হকের একটি যুক্তি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের প্রস্তাব হিন্দুদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হবে না, কারণ হিন্দু ছেলেমেয়েরা তাদের সুশিক্ষিত পিতামাতার কাছে ঘরেই পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই বয়কট মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কারণ অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর বাবা-মা অশিক্ষিত বলে ঘরে বসে লেখাপড়া চালিয়ে নেবার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে।[১০৮]

---

১০৭. M. N. Das, *India Under Morley and Minto: Politics Behind Revolution and Reforms*, (London 1964), 43-44, 153; মুজফ্‌ফর আহমদ, *আমার জীবন*, ৪৩২-৪৩৩।

১০৮. A. S. M. Abdur Rab, *A. K. Fazlul Huq: Life and Achievements*, (Lahore 1966), 55.

এক কথায় ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্র ছিল সংঘাতময়। ইউরোপে লুজান চুক্তি স্বাক্ষর এবং কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করার ফলে খেলাফত আন্দোলন প্রত্যাহারের সাথে সাথে সে সময়কার হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্বপূর্ণ ঐক্য বিনষ্ট হয়, এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস আবার দেখা দেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খান বাহাদুর নবাব মোশাররফ হোসেন বাংলায় সব সরকারি দপ্তরের শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বাংলার আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১০৯] চিত্তরঞ্জন দাস বিলটি পাস না করার জন্য তাঁর মুসলমান অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্বরাজ যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত না হয়, তাহলে তিনি নিজেই আইনসভায় প্রস্তাব আনবেন শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগের জন্য। ঐ প্রস্তাবকে আইনে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করবেন বলেও তিনি তাদের আশ্বাস দেন।[১১০] চিত্তরঞ্জন দাসের মুসলমান অনুসারীরা তাঁর উপদেশ ও আশ্বাস মেনে নেন।

কিন্তু ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট তথা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট এবং প্রাদেশিক আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের ঘোষণা কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় তাঁর মুসলমান অনুসারীরাও স্তম্ভিত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রস্তাবানুসারে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ আসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসনের ব্যবস্থা থাকতো এবং বাংলার সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি আসন সংরক্ষিত হতো।[১১১] হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁর প্রস্তাবকে হিন্দুস্বার্থের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। হিন্দু সাংবাদিকরাও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। দাস নিজেও স্বরাজ অর্জনের আগে মুসলমানদের দেয়া তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।[১১২] ফলে হিন্দু নেতাদের আশ্বাসের প্রতি মুসলমানদের অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্টের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র প্রতিবাদ এবং স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক ১৯২৬ সালের ২২ মে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণে স্বরাজ সমর্থক ক্ষুদ্র মুসলমান

---

১০৯. BLCD.,12 March 1924, BLCP., Vol. 14, No. 4, 58.

১১০. ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। BAR, 1920-21, Calcutta 1922, 3.

১১১. BAR, 1923-24, Calcutta 1925, 2.

১১২. ISCR, Vol. 8, 1930, 58; "Communal Dissensions", in Government of India in 1924-25, Calcutta, 1926; Shah Muhammad (ed.), *The Indian Muslims: A Documentary Record, 1900-1947*, Vol. 8, (New Delhi 1985), 73-75; Kenneth McPherson, *The Muslim Microcosm: Calcutta, 1918-36*, (Wiesbaden 1974), 78-79.

গোষ্ঠীটিরও মনোভাবের পরিবর্তন হয়। কোকানাডার কংগ্রেস অধিবেশনে দাসের প্যাক্ট প্রত্যাখ্যাত হবার সাথে সাথে স্বরাজ সমর্থক মুসলমান নেতাদের অধিকাংশই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে। তাঁরা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সিরাজগঞ্জে সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনটি তাই মুসলমানবর্জিত একটি হিন্দু সম্মেলনের নামান্তর ছিল।[১১৩] সিরাজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবিই তুলে ধরে নি, কৃষক-স্বার্থের পরিপন্থী প্রচলিত আইনের সংস্কারের জন্যও তারা জোরালো দাবি উত্থাপন করে। সে সময় ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় সাহা-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের তীব্র অসন্তোষের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৪]

মুসলমান রাজনীতিবিদরা অভিযোগ করেন যে, হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেছেন[১১৫], যেমন হিন্দু নেতারা মুসলমান জনগণকে সুশিক্ষিত করে তোলার কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে একে চালু রাখার সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করলে আইনসভার হিন্দু সদস্যরা একযোগে এর বিরোধিতা করেন। হিন্দু প্রতিনিধিরা সংঘবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং মুসলমান প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা বিলটির বিরোধিতা করেন। জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমান চাকুরীজীবীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু নেতারা চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমান প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসার জন্য জেদ ধরে। অপরদিকে হিন্দু জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু প্রতিনিধিরা প্রজাস্বার্থের পরিপন্থী জমিদারের অবৈধ সেলামি গ্রহণকে বৈধ করার জন্য মুসলমান প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২৫ সালে বেঙ্গল টেন্যান্সি (সংশোধনী) বিলটি পাশ করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দের এসব গণবিরোধী ভূমিকাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে মুসলমান নেতারা অভিযোগ করেন যে, হিন্দু নেতারা মুখে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তারা গরিব প্রজাদেরকে জমিদারের কাছে দাসখত লিখে দিতে বাধ্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তারা অত্যাচারী ও চড়া হারে সুদখোর মহাজনদের পক্ষ অবলম্বন করে ১৯৪০ সালে মুসলমান নেতাদের উত্থাপিত মানি লেন্ডার বিল-এরও বিরোধিতা করেন।[১১৬]

---

১১৩. BAR., 1923-24, 6.

১১৪. BAR., 1923-24, 11.

১১৫. এই সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত একটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় সংগঠিত ভয়াবহ দাঙ্গার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কলকাতা শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় তারা লাঠি ও চাকু চালনায় প্রশিক্ষণ লাভ করে। Tanika Sarkar, "Communal Riots in Bengal", in Mushirul Hasan (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India*, (New Delhi 1982), 291-92; McPherson, *Microcosm*, 89.

১১৬. Shah, "Muslim Middle Class, 314-54.

বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দু নেতৃবৃন্দের যুক্তি-তর্ককে খণ্ডন করে বিকল্প যুক্তি উত্থাপন করার পিছনে মুসলমান নেতাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' স্বার্থ ভিন্ন প্রকৃতির এবং 'মুসলমান স্বার্থ' সাম্যবাদী ও প্রতিনিধিত্বশীল আর 'হিন্দু স্বার্থ' জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর সংরক্ষক বলে প্রমাণ করা।

১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। মুসলমান নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন সরকারি চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে। মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু নেতাদের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে তাঁরা নিজেরাও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই ব্যর্থতার গ্লানি থেকে রেহাই পান নি মুসলমান নবাব শামসুল হুদা, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু প্রতিযোগীর কাছে হেরে যান। তেমনিভাবে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ফজলুর রহমানও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী এলাকা থেকে মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ফজলুল হকের মতো জনপ্রিয় মুসলমান নেতাও কলকাতা পৌরসভার এক মিশ্র নির্বাচনে পরাজিত হন, তেমনি পরাজিত হন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুর রসুল।

এই ব্যর্থতা তাদের মনে এমন বিশ্বাস জন্মায় যে, তাদের সমস্যার মূল কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থবুদ্ধি, যা প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। স্পষ্টতই এসব মুসলমান নেতার রাজনৈতিক কৌশল তখন তাঁদের স্বীয় স্বার্থকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রযুক্ত হয়। স্বসম্প্রদায়ের পক্ষে জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরির অংশ আদায়, পৃথক নির্বাচন নিশ্চিত করা ও শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা তৎপর হন। কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। বাংলায় মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদ তাদের নেতাদের গলাবাজির ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নামান্তর মাত্র নয়। একটি বাস্তবধর্মী এবং মৌলিক মুসলমান আত্মপরিচিতিকে কেন্দ্র করেই এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। যে চেতনাকে ঘিরে এই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় তা হলো 'সকল মুসলমানই সমান বা একরকম এবং সকল হিন্দুর চেয়ে আলাদা এবং বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানরা হলো একটি পৃথক গ্রুপ'। অতএব মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ ছিল দুটি—অভিজাত শ্রেণীর প্রতিযোগিতা এবং ধর্মীয় আত্মপরিচিতি। এই উভয়বিধ কারণ থেকেই প্রতীয়মান হয় কেন ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে বাংলার রাজনৈতিক বিষয়গুলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। এইভাবে বাংলার একটি ধর্মসম্প্রদায় রাজনৈতিক আত্মপরিচয় লাভ করে এবং তা কালক্রমে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাজনৈতিক ইউনিটে রূপান্তরিত হবার দাবি তোলে।

স্বরূপ নির্ণয়

বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিবিদরা ইসলামের সাম্যবাদী নীতি অনুসরণ করে এমন একটি সমাজচিত্র কল্পনা করেন, যেখানে ইস্পাহানী, সিদ্দিকী ও অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদের স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে মৌলরি আবদুল লতিফ বিশ্বাসের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :

> বাংলার বা অন্য প্রদেশের মুসলমান ও অভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। সেই কারণেই ইসলামে এমন নিয়ম করা হয়েছে যে একে অপরের সাথে ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ মুসলমানরা জামাতে নামাজ পড়বে, প্রতি সাত দিনে একবার জুমা পড়বে এবং অন্ততপক্ষে জীবনে একবার হজ্ব করার জন্য মক্কায় যাবে।[১১৭]

তুর্কী খেলাফত রক্ষার স্বার্থে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে কিছুকাল যাবৎ এধরনের মুসলমান আত্মপরিচয় স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। খেলাফত বিলুপ্ত হবার পর প্যান-ইসলামীরা তুর্কী প্রেসিডেন্ট কামাল পাশার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদে মুখর থাকেন। খেলাফতবিলুপ্তিকে ইসলামের এক বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ একে মুসলমান সংহতি বিপন্ন করার লক্ষ্যে বৃটেনের এক সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করেন। 'ইয়ং তুর্কীরা' বলশেভিকদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বর্ণিত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলমান বিশ্বকে প্রতারণা করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।[১১৮] এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্যান-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভৌগোলিক (ভারতীয় বা বাঙালি) আত্মপরিচয়ের পরিবর্তে ধর্মীয় ও মুসলমানদের সমষ্টিগত আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পায়। এধরনের আত্মপরিচয় বিশ্লেষণ অন্যান্য বাঙালি মুসলমানদেরকেও বিভ্রান্ত করে। তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় ভৌগোলিক আত্মপরিচয় প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন।[১১৯] এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয় অতিরাষ্ট্রিক ধারণায় প্রভাবিত মুসলমানদের সমষ্টিগত পরিচয় এবং ভৌগোলিক বা ভূখণ্ডভিত্তিক বাঙালি আত্মপরিচয়ের মধ্যে টানা-পড়েনের শিকার হয়।[১২০] এই সমস্যার সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক আগে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমানদের সমষ্টিগত আত্মপরিচয়ের সমর্থকরা মনে করেন যে, ১৯২০-এর দশকে ভারতে 'জাতি' সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র; তখন পর্যন্ত ভারত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যারা স্বীয় সত্তা বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে আসছিল।

---

১১৭. কলকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধনী) বিলের উপর তাঁর বক্তৃতা; BLC., 27 February 1939, BLCP., Vol. 54. No. 2, 34.

১১৮. BAR., 1923-24.

১১৯. এস. ওয়াজেদ আলী, "বাঙালী না মুসলমান", *ভারতবর্ষ,* আষাঢ় ১৩৫১।

১২০. Asim Roy , "Bengali Muslim and the Problem of Identity", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, December 1977, Vol. 22, No. 3, 198.

তাই এক শ্রেণীর ভারতীয় আত্মপরিচয়দানকারীদের অনেকেই "আমরা প্রথমে বাঙালি এবং পরে হিন্দু বা মুসলমান" এই রাজনৈতিক ফরমুলাটি গ্রহণ করেন নি।[১২১] তাঁদের যুক্তি হলো, মুসলমান ও বাঙালি হওয়ার মধ্যে কোন সংঘাত নেই অর্থাৎ মুসলমান ও বাঙালি পরিচয় এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমান বাঙালি হতে পারে এবং ইসলাম দেশেপ্রেমের পরিপন্থী নয়।[১২২] তাঁরা আরো যুক্তি দেখান যে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক স্বার্থোন্নতির সঠিক প্রয়াস চালানোর ফলে জাতির স্বার্থের কোন ক্ষতি তো হয়ই না, বরং তা জাতীয়তার জন্য মঙ্গলজনক হয়।[১২৩] ধর্মীয় আত্মপরিচয় ও ভৌগোলিক আত্মপরিচয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই বলে সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন :

> আমরা যে ধর্ম পালন করি তার কারণে আমরা মুসলমান, আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করি তার কারণে আমরা ভারতীয়, যে প্রদেশে আমাদের জন্ম হয়েছে তার কারণে আমরা বাঙালি...ইসলাম জাতীয় বা দেশপ্রেমের পরিপন্থী নয়; তা মানবজীবনে স্বাধীনতা ও মুক্তির মহৎ কামনা ও অন্যান্য অকৃত্রিম আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী নয়।[১২৪]

এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, মুসলমানের ধর্মই তাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে।[১২৫] অতএব বাঙালি পরিচয় দিতে যদি কখনো কোন মুসলমান দ্বিধাবোধ করে থাকে, তাকে মুসলমানদের ধর্মের দোষ বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, দোষটা খুঁজতে হবে হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের (কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশদেরও) 'বাঙালি' বলতে হিন্দু সমাজকে এবং 'জাতীয় উন্নতি' বলতে হিন্দু সমাজের উন্নতিকে বোঝাবার প্রবণতার মধ্যেই।[১২৬] এই বিভ্রান্তির নজির শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও দেখা যায়। যেমন, তিনি 'বাঙালি' অর্থাৎ হিন্দু ও 'মুসলমানদের' মধ্যে ফুটবল খেলার বর্ণনা দেন।[১২৭] আত্মপরিচয়ের এ ধারণার পাশাপাশি অপর একটি ভিন্ন প্রকৃতির ধারণা বিদ্যমান ছিল স্বল্পসংখ্যক প্রতিভাবান মুসলমান চিন্তাবিদের মধ্যে। বাংলার মুসলমানদের আত্মপরিচয়কে তাঁরা 'বাঙালি মুসলমান' বলে আখ্যায়িত করেন। বাংলা এবং বাঙালি মুসলমানদের প্রতি তাঁরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং বাংলার বাইরের মুসলিম জগতের প্রতি তাঁদের আগ্রহ

---

১২১. "Nationalism Vs. Communalism", *Mussalman*, 5 March 1925, editorial.

১২২. মোঃ আবদুল জব্বার, "বাঙলার মুসলমান", *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন ১৩৫১, "চিন্তাধারা", ১৫০-১৫১।

১২৩. "Dr. Kichlew's Advice to Muslim Young Men", *Mussalman*, 21 May 1926, editorial.

১২৪. Speech of Sayed Badruddoza, Bengal Legislative Assembly Debates (henceforth BLAD.), 2 April 1942, *Bengal Legislative Assembly Proceedings* (henceforth BLAP.), April 1942, 254.

১২৫. Speech of Maulvi Sayed Majed Bakhah, BLCD., 20 August 1930., BLCP., Vol. 35, 567.

১২৬. মোঃ আবদুল জব্বার, "বাঙলার মুসলমান", ১৫৬।

১২৭. শরৎচন্দ্র, *শ্রীকান্ত*, ১ম খণ্ড।

তেমন ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরা প্রায়ই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেই থাকতেন।[১২৮] বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক পার্থক্যই ছিল এই বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিতে চমৎকার ভাষায় এই সাংস্কৃতিক পার্থক্য তুলে ধরেন :

> ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়...কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি এক একটা আস্ত জাত ? ... ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ...এই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।[১২৯]

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) মনে করেন যে, জন্মের অধিকারে বাংলার মুসলমানরা প্রথমে মানুষ, তারপর বাঙালি মুসলমান। তাঁর মতে, দেশের স্বার্থ ও সময়ের দাবি অগ্রাহ্য করে কারো প্রথমে মুসলমান হবার প্রয়োজন নেই এবং মুসলমান প্রমাণ করার জন্য কারো আরবভূমিতে যাবারও প্রয়োজন নেই। বাংলার জীর্ণ কুটিরে নিজের আত্মীয়-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকেও মুসলমান হওয়া সম্ভব।[১৩০]

কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ জাতীয়তাবাদকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতো, যদিও অনাগত দিনে বাংলা বা ভারতে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের এক সঙ্গে বসবাস করবার অপরিহার্যতার কথা তারা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নি। সহ-অবস্থান সত্ত্বেও অনেক মুসলমানই মনে করতো যে এদেশে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণে তারা যে বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তা তাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।[১৩১] সেজন্যেই তারা মুসলমান ও ভারতীয় বাঙালি এই উভয় পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।[১৩২] তাদের দাবি ছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখেই যেন ভারতীয় রাজনীতি বিবর্তিত হয়। এদের মতে, "আমরা আগে ভারতীয়, পরে হিন্দু বা মুসলমান"—এই বিশেষ তত্ত্বটি সকল সম্প্রদায়ের, বিশেষকরে মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উপযোগী নয়।[১৩৩] এইভাবে ১৯২০, ১৯৩০ এবং' ১৯৪০-এর দশকে ক্রমে 'মুসলমান' আত্মপরিচয় 'বাঙালি' আত্মপরিচয়ের চেয়ে অধিক প্রাধান্য পায়।

---

১২৮. BAR., 1928-29, 16.

১২৯. আবুল মনসুর আহমদ, মূল সভাপতির অভিভাষণ, *পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি সম্মেলনের কার্যবিবরণী,* ১৭তম বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১, ৪৩৯।

১৩০. ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ,* ৩৫।

১৩১. Khan Bahadur Azizul Huq's speech, BLCD., 14 August 1930, BLCP., Vol. 35, 294.

১৩২. "Muslims and the Congress", *Mussalman*, 17 December 1926, editorial.

১৩৩. Resolution for 50 percent appointments of qualified Muslims in government posts moved by Maulvi Abdul Quader, BLCD., 8 July 1926, BLCP., 21, 1926, 88.

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী বাংলার অখণ্ডত্ব বজায় রাখার জন্য তৎপর হন। কিন্তু সেই প্রয়াসের সমর্থনে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও জনতা ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ তখনো ঘটে নি।[১৩৪] ফলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতীয় পশ্চিম বাংলায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালিরা নিজেদের পাকিস্তানী বলে পরিচিত করে। এইভাবে জীবনযাপনের মুসলমানী প্রথার উপর ভিত্তি করে একটি জাতির জন্ম হয়।

৩. বাঙালি আত্মপরিচয়ের পুনরাবির্ভাব

১৯৪৭ সালে বাংলার দ্বিতীয় বিভক্তির কারণে হিন্দু জমিদার ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ভারতে পাড়ি দেয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে 'ক্ষমতার শূন্যতা' সৃষ্টি হয়।[১৩৫] অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমিক স্তরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় বাঙালিরা তার অনেকটাই পূর্ণ করতে সমর্থ হলেও উচ্চস্তরের শূন্যস্থানে অবাঙালি মুসলমানরাই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান শরণার্থী হিসেবে লাভ করে গুজরাট, বোম্বে প্রভৃতি স্থান থেকে আগত মেমন, বোহরা ও খোজা সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের, যারা পাকিস্তানের করাচীতে পুনর্বাসিত হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গৃহীত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারশ্রেণী তাদের আগের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বহাল থাকে। পাকিস্তানের আমলা ও সেনাবাহিনী অনেকটাই গঠিত হয় অবাঙালিদের নিয়ে। ফলে আমলা ও সেনাবাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগের সুযোগ থেকে বাঙালিরা বঞ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলি এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সে প্রদেশ শিল্পায়িত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থেই কিছু শিল্প-কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করে। সেসব শিল্প-কারখানায় পশ্চিম পাকিস্তানী ম্যানেজার নিয়োগ করার ফলে বাঙালি শ্রমিকদের সাথে তাদের একটা জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা এইসব প্রতিষ্ঠানে সস্তায় স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করে। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পাচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।[১৩৬]

পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। এই প্রয়াস সূচিত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। এই

---

১৩৪. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-47*, (Dhaka 1987), 273, 345-46.

১৩৫. Mukherjee, " Background of Bangladesh," 407, 414.

১৩৬. Feroz Ahmed, "The Structural Matrix of the Economic Struggle in Bangladesh" in Gough and Sharma (ed), *Imperialism*, 420-428.

সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে পরিষদের সদস্যদেরকে ইংরেজি বা উর্দু ভাষায় পরিষদে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। পরিষদে বিতর্কের সময় উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের মাধ্যমে। ধীরেন্দ্রনাথ কেবল পরিষদের বাঙালি সদস্যদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেন নি, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬.৪০ শতাংশ) নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বলে ঘোষণার জন্যও বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, উর্দু ছিল পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৩.৩ শতাংশের মাতৃভাষা। কিন্তু বাঙালিদের উক্ত দাবির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-জনতা 'না না' বলে চিৎকার করে জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। কারণ, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নীতি কেবল বাঙালির পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয় নি, তাদেরকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় ও অযথা হয়রানির দিকেও ঠেলে দেয়। বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ফলে মাতৃভাষার অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে উর্দু শিক্ষার জন্য বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে তাদের অভিভাবককে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক অভিভাবকের পক্ষেই এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে সরকারি চাকুরিতে বাঙালি নিয়োগের সুযোগ কমে যায়। এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা না করেই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে বাংলাদেশে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন কিছু সংগ্রামী তরুণ। এভাবে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মাঝে বিদ্যমান বিষফোঁড়াটি যখন অপসারিত হলো, তখন মাতৃভাষা আন্দোলন তাদের পুনরায় একত্রিত হবার সুযোগ এনে দিল। বাঙালি স্বার্থবিরোধী পাকিস্তানী শাসন সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে।[১৩৭]

এরপর ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তানের গণপরিষদ উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করলেও পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলা সাহিত্যের বইপত্র আমদানির

---

১৩৭. Golam Morshed. "Cultural Identity of former East Pakistan and Conflicting State Policies ", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (JIBS), 3 (1978), 65-66; S. A. Akanda, "The National Language Issue: Potent Force for Transferring East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism," JIBS., 1 (1976), 4-13.

উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য লেখকের প্রতি সরকারিভাবে নিন্দাজ্ঞাপনের নীতি অবলম্বনের ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষুব্ধ হয়।[১৩৮] বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী শাসকদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাঙালি শোষণ ও দলননীতি গ্রহণের ফলে পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে এক জাতীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের আঞ্চলিক চিন্তা-চেতনা বাঙালি জাতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়। বাঙালিরা পাকিস্তানী আত্মপরিচয় বর্জন করে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনায় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো প্রাক-বৃটিশ যুগে বাঙালি মানসে পৃথক জাতিত্ববোধের উদ্ভব। এ সম্পর্কে আলোচনায় যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, হিন্দু সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব, সুফিদের ইসলামের উদারনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের এক মিশ্রিত সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। কতগুলি প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্যে এই মিশ্রণ ধরা পড়ে । যেমন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কিছু লোকের পীরপূজা; জোলা, তেলী ও জেলের মতো কিছু পেশায় নিয়োজিত হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে মুসলমান জাতীয়তাবাদের বিকাশ। এ বিষয়ে যুক্তি হলো, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমান 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' বেশ কিছু ব্যাপারে হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সাহিত্য, শিক্ষা, চাকুরি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সুবিধা লাভে মুসলমানদের ব্যর্থতা এবং উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংহতি এবং হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্ব মুসলমানদের বাঙালি আত্মপরিচয়কে আড়াল করে এবং তাদের মুসলমান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে 'দ্বি জাতিতত্ত্বের' উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত হয়। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে বিভাগোত্তর (১৯৪৭-এর পরবর্তী) পূর্ব বাংলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্বিকাশ। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, বিভাগোত্তরকালে পূর্ব বাংলা থেকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের ফলে পূর্ব বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে একটা বড় বাধা অপসারিত হয়। পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালিবিরোধী নীতি সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক থেকে বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ আরো সুগম করে। অবশেষে 'বাঙালি' আত্মপরিচয় 'মুসলমান' আত্মপরিচয়কে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠে।

---

১৩৮. Morshed, "Cultural Identity", 67-69.

নির্ঘণ্ট